হৃদয়ে আরাধনা, রসনায় উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন শক্তির সোপান পরে।
আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন
তবু মা পালিতেছ অন্নজলে রাখি কোলে।

আরতি।*

৩

জননি জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে,
পূজিব পা দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে।

না হি মা অঙ্গে বল সম্বল অশ্রুজল,
দিব তাই ভক্তিফুলে শ্যামল পদকমলে।

হৃদয়ের ছিন্নতারে, ডাকি আজ মা তোমারে,
হৃদয়ে ভাত' তুমি ফুল শ্বেতশতদলে।

* দ্বিতীয় গানের সুরে গ্রথিত।

হৃদয়ের দুই দিক্।

" তপনমণ্ডলদীপিতমেকতঃ
সততনৈশতমোবৃতমন্যতঃ।"

একদিকে সূর্য্যের প্রখরজ্যোতিঃ, আর দিকে যামিনীর গভীর অন্ধকার। এমন স্থান কোথায়? কবি হিমাদ্রির গহ্বরকে তাদৃশ স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এ অংশে মনুষ্যহৃদয় বৈচিত্র্যের যেমন বিলাসক্ষেত্র, হিমাদ্রির গহ্বর কি তেমন হইবে? হিমাদ্রি আলোক ও আঁধার লইয়া সকল স্থলে ও সকল সময়েই এক সঙ্গে ক্রীড়া করিতে পায় না। কিন্তু বোধ হয়, মনুষ্যের হৃদয় সকল সময়েই

আধই আঁধার আধ আলোময়
আধই অমৃত আধই বিষ।

মনুষ্য সুখের আভামাত্র দেখিতে পায়, কিন্তু কোন দিনও কোন মনুষ্য দুঃখস্পর্শশূন্য পূর্ণসুখ হৃদয়ে পোষণ করিয়া কৃতার্থ হয় না। অদূরদর্শী কৃষক যেমন দূরবিলম্বি ইন্দ্রধনু দর্শনে আকুল ও উন্মত্ত হইয়া তাহারই অনুসরণে প্রধাবিত হয়, মনুষ্যও সুখের অনুসন্ধানে সর্ব্বত্রই সেইরূপ প্রধাবিত রহিয়াছে ও প্রধাবিত হইতেছে, এবং ক্ষণে ক্ষণে সুখের ক্ষণিক স্পর্শে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া আপনার সুখসমৃদ্ধির ঘটা দেখাইতেছে। কিন্তু মনুষ্যজগতে সুখী কে?--যেখানে আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্তি ও ভোগে বিড়ম্বনা, যেখানে অভাবে যন্ত্রণার উদ্যম ও বৈভবে অবসাদ,—যেখানে প্রীতি ও পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব ও পরকীয় দংশন একত্র অবস্থিত, যেখানে স্নেহের উৎসব ও শোকের অশ্রুজল, বসন্তের শীতল সমীর ও নিদাঘের জলন্ত বহ্নি একত্র বিলসিত, তা-

দৃশ স্থলে কেহই কি প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইতে পারে?

মনুষ্য এইরূপ আবার দুঃখেরও আভামাত্রই দেখিতে পায়, দুঃখের স্পর্শমাত্রেই অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু আশার দূরস্থিত আলোক দর্শনে ও আকাঙ্ক্ষার আংশিক স্ফুরণে অতিবড় দুঃখের সময়েও সে জীবন ধারণ করে, এবং পূর্ণদুঃখ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ রহে। যদি এইরূপ বলিতে সাহসী হইয়া থাকি যে, মনুষ্যজগতে সুখী কেহ—তাহা হইলে বোধ হয় ইহাও নিঃশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, মনুষ্যজগতে দুঃখী কে? যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময় সকল দুঃখ ভুলিয়া তন্মুহূর্ত্তের অভাব পূরণের নিমিত্তই অধীর হয়, তাহাকে দুঃখী বলিব কেন? যে প্রবৃত্তির ঘূর্ণপাকে পড়িয়া প্রীতির সকল কথা পাসরিয়া যায়, তাহার আবার দুঃখ কিসে? যে বুকের মধ্যে আগুণ ঢাকিয়া রাখিয়া গলায় ফুলের মালা পরিতে আনন্দ অনুভব করে,—যে দুঃখের তুষানলে জর্জ্জরিত রহিয়াও অন্যদীয় সুখে সুখী হইয়া থাকে, তাহার আবার দুঃখ কি?

এই জন্যই বলি যে, মনুষ্য সুখীও নহে, দুঃখীও নহে,সে সুখদুঃখের ক্রীড়াপুতুল;—মনুষ্যের হৃদয় আলোক ও আঁধারের বিচিত্র বিহারস্থান। মনুষ্যহৃদয়ের একভাগ অস্থিকঙ্কালময় শ্মশান, আর একভাগ প্রীতির পুষ্পিত কানন;—এক দিকে নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকার, আর এক দিকে আশার আনন্দময় উৎস। যদি অমৃত চাও, মনুষ্যহৃদয়ে প্রবেশ কর। কবিকা[illegible] সমুদ্রমন্থন করিয়াও যে [illegible] না, মনুষ্যহৃদয়ে সেই অমৃত [illegible] বিষপানে শক্তিসাধনার [illegible] রিতে অভিলাষী হইয়া থ[illegible] মনুষ্যহৃদয়ে প্রবেশ কর[illegible] নীলকণ্ঠেরও সুদুঃসহ, মনুষ্য[illegible] জড়িত গড়িত। সেখানে [illegible] তেছে, তমোরাশি কাঁদিতে [illegible] চিতেছে, বার্দ্ধক্য জীবনে[illegible] স্খলিত হইয়া ঢলিয়া পড়ি[illegible] উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে ফুলিয়া উ[illegible] দ্রবীভূত বিষাদের ন্যায় ধী[illegible] যাইতেছে;—সেখানে ফুল [illegible] ঝরিয়া পড়িতেছে, আশা কু[illegible] নিত হইয়া ভবিষ্যতের দিকে [illegible] স্মৃতি অঙ্গে অতীত সুখের [illegible] যোগিনী সাজিতেছে। সেখা[illegible] গরল সমান প্রবাহে প্রবাহিত [illegible] আলোক আঁধারকে জ্যোতির্ম্ময় [illegible] লিতেছে, আঁধার আলোকের উ[illegible] মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই [illegible] চিত্রময় অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এমন [illegible] কোথায়?

চাও মনুষ্য, একবার আপনার হৃদয়ের দিকে ফিরিয়া চাও। সেখানে কত সুখ ও কত দুঃখ তুষারনিহিত জীবদেহের ন্যায় হৃদয়ের স্তরে স্তরে মিশ্রিত হইয়া অদৃশ্য রহিয়াছে, একবার তাহা চাহিয়া দেখ। তুমি কবির চক্ষু লইয়া হিমাদ্রিশৃঙ্গে কি দেখিবে?—হৃদয় যেখানে উঠিতে পায়, অথবা হৃদ-

য়ের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা সময়ে সময়ে যেখানে উত্থিত হইয়া মনুষ্যকে উচ্চতার উচ্চতর আদর্শ দেখায়, হিমাদ্রিশৃঙ্গ ঊর্দ্ধমুখে অযুত গুণ বর্দ্ধিত হইলেও কি সেই অগম্য উচ্চতার সম্মুখীন হইতে পারে? আর, মনুষ্যের হৃদয় যখন অধঃপাতে অবনত হয়,—যখন নীচতার দিকে ক্রমে ক্রমে নাবিতে নাবিতে উহা আপনার ভারে আপনি গড়াইয়া, নীচতার নিম্নতম স্থলে পতিত হয়, তখন হিমাদ্রিগহ্বরের কোন্ স্থানের সহিত উহার তুলনা সম্ভবে?

চাও মনুষ্য, একবার আপনার হৃদয়ের দিকে ফিরিয়া চাও। সেখানে কত নূতন আগুণ জ্বলিয়া উঠিতেছে, কত পুরাতন আগুণ নিভিয়া যাইতেছে, একবার তাহা চাহিয়া দেখ। কত পুষ্পিত লতা, ফলিত পাদপ অগ্নিজিহ্বায় আহুতি হইয়া তোমাকে লোকচক্ষুর অগোচরে দাবানলের দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে,—কত দগ্ধ তরু, দগ্ধ লতা নির্ব্বাণবহ্নির নিদর্শন স্বরূপ গাঢ়তম অন্ধকারের সহিত অঙ্গ মিশাইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে, একবার তাহা নিরীক্ষণ কর।

হাঁ, ইহাই যখন মনুষ্যহৃদয়ের চিরন্তন ভাব,—এই আলো, এই আঁধার, এই উত্থান, এই পতন, এই হর্ষ, এই বিষাদ ইহাই যখন মনুষ্যহৃদয়ের চিরন্তন ভোগ, তখন মনুষ্য কেন সুখে উল্লসিত এবং কেনই বা দুঃখে ম্রিয়মাণ হয় ইহা কে আমায় বুঝাইয়া দিবে?

কৃষ্ণা।

বা

কলিকাতা শতাব্দীপূর্ব্বে।

(ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ৩৫১ পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরমোহন বাবুর বাটী।

সময়, তুমি কতই পরিবর্ত্তন দেখিতেছ। সেই সতত-আদিরসপ্রিয় সুরসিক ধনাঢ্য হরমোহন বাবু আজ কোথায়, এবং তাঁহার তৎকালীন মনোহর অট্টালিকাই বা কোথায়? এই গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাগমে যে সুন্দর পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া তিনি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা প্রমদাগণকে জল লইয়া যাইতে দেখিয়া আনন্দে সহচরদিগকে কহিতেন, 'মেদিনী হইল মাটী,' অথবা 'শিহরে কদম্বফুল,' অথবা

'জলের কলসী রেখে এস ধন,
একবার হেরি ও বিধুবদন।'

আজ সেই সুন্দর পুষ্করিণী, সেই রম্য

বাধা ঘাট কোথায়? যে পোষ্য ভট্টাচার্য্যগণ কর্ত্তাবাবুর পরিতুষ্টির জন্য 'বাহু দ্বৌচ মৃণালনাস্য কমলং' বা 'ঝটিতি প্রবিশ গেহং' প্রভৃতি সুললিত কবিতা সকল পাঠ করিয়া বাবুর হর্ষোৎপাদন ও আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন, আজ তাঁহারা, ও সেই সতত-সঙ্কেতাপেক্ষ প্রভুভক্ত রূপো খানসামাই বা কোথায়? হায় সেই গুণীয়া হরমোহন বাবু তখন কি জানিতেন যে তাঁহা পরে তাঁহার অমৃতময়ী জীবনী-মহর্ষি কৌশিক বংশাবতংশ শ্রীমান্ ক্ষেত্রপাল কবিরত্ন কর্ত্তৃক অমিয় অক্ষরে অমিয় ভাষায় লিখিত হইবে।

'গৌড় জন যাহা অনন্দে করিবে
পান বসি নিরবধি।'

সময়! তুমিই একমাত্র সাক্ষী। তুমি সেই গুণনিধির ক্রিয়া কলাপ সমস্তই দেখিয়াছ, তুমিও আমাকে লিখিতে দেখিতেছ, তুমিই সহৃদয় পাঠকগণকে বলিতে পার আমি যাহা যাহা লিখিতেছি তাহা সকলই সত্য!

আজ বৈশাখ মাসের ১২দিন। এই ১২দিন হইল কর্ত্তাবাবুর বাটীতে প্রতিদিন প্রভাতে ভারত পাঠ হইতেছে, ও অপরাহ্নে তৎসংক্রান্ত কথা হইতেছে। প্রভাতে ভারত পাঠ শুনিবার সম্পূর্ণ ভার নারায়ণের উপর সমর্পিত হইয়াছে; সুতরাং শালগ্রাম শিলা প্রতিদিন প্রাতে স্নানাদি করিয়া শ্বেতচন্দন মাল্যাদিতে বিভূষিত হইয়া কর্ত্তাবাবুর প্রাঙ্গণে স্বর্ণময় সিংহাসনে বসিয়া বা শুইয়া নিস্তব্ধে পাঠের দোষগুণ বিবেচনা করেন। অপরাহ্নে কর্ত্তাবাবু স্বয়ং আসিয়া বেদির পার্শ্বে বসিয়া কথকতা শ্রবণ করেন, কিন্তু কর্ত্তাবাবু সর্ব্বদা সুস্থির চিত্তে শুনিতে পারেন না, এই জন্য শালগ্রামশিলা [illegible] লেও উপস্থিত থাকেন, বাবুর [illegible] সহসা অসংযম হইলে, তিনি [illegible] শ্রবণ করেন।

পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তাবাবু আ[illegible] পার্শ্বে বসিয়া আছেন। ব[illegible] বেদিতে বসিয়া আচমন ও শ্রী[illegible] রণ পূর্ব্বক সমাধিতে মগ্ন হইলে [illegible] দুই পার্শ্বে নানাবিধ ফুলাভরণ প্র[illegible] সমাধি অন্তে তাঁহার পবিত্র শ[illegible] বিধ স্থানে নিহিত হইবে। [illegible] পার্শ্বে মনোহর সভা হইয়াছে [illegible] প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বসিবার জন[illegible] সন সংস্থাপিত হইয়াছে। এক[illegible] যস্থদিগের বসিবার জন্য রক্তব[illegible] অপর পার্শ্বে নবশাখদিগের জন[illegible] সুন্দর গালিচা পাতা হইয়াছে [illegible] যে সময়ের বিবরণ লিখিতেছি, [illegible] ধনের গৌরব অপেক্ষা জাতি-ম[illegible] থাকাতে বসিবার স্থানের এইরূপ বিভিন্ন আয়োজন হইয়াছে। প্রাঙ্গণের সম্মুখে দালান; এই স্থানে পল্লীস্থ কুলমহিলাদিগের বসিবার জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ জাতিভেদে আসনের স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ হইয়াছে। মুসলমানদিগের অনুগ্রহে তৎকালে অতি উত্তম চিক্ প্রস্তুত হইত, কর্ত্তামহাশয়ের ব্যয়ে অতি মূল্যবান সাতটি চিক্দ্বারা দালানের সম্মুখের আটটি থাম মোড়া হইয়াছে। কিন্তু

য়ের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা সময়ে সময়ে সেখানে উত্থিত হইয়া মনুষ্যকে উচ্চতার উচ্চতর আদর্শ দেখায়, হিমাদ্রিশৃঙ্গ ঊর্দ্ধমুখে অযুত গুণ বর্দ্ধিত হইলেও কি সেই অগম্য উচ্চতার সম্মুখীন হইতে পারে? আর, মনুষ্যের হৃদয় যখন অধঃপাতে অবনত হয়,—যখন নীচতার দিকে ক্রমে ক্রমে নাবিতে নাবিতে উহা আপনার ভারে আপনি গড়াইয়া, নীচতার নিম্নতম স্থলে পতিত হয়, তখন হিমাদ্রিগহ্বরের কোন্ স্থানের সহিত উহার তুলনা সম্ভবে?

চাও মনুষ্য, একবার আপনার হৃদয়ের দিকে ফিরিয়া চাও। সেখানে কত নূতন আগুণ জ্বলিয়া উঠিতেছে, কত পুরাতন আগুণ নিভিয়া যাইতেছে, একবার তাহা চাহিয়া দেখ। কত পুষ্পিত লতা, ফলিত পাদপ অগ্নিজিহ্বায় আহুতি হইয়া তোমাকে লোকচক্ষুর অগোচরে দাবানলের দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে,—কত দগ্ধ তরু, দগ্ধ লতা নির্ব্বাণবহ্নির নিদর্শন স্বরূপ গাঢ়তম অন্ধকারের সহিত অঙ্গ মিশাইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে, একবার তাহা নিরীক্ষণ কর।

হা! ইহাই যখন মনুষ্যহৃদয়ের চিরন্তন ভাব,—এই আলো, এই আঁধার, এই উত্থান, এই পতন, এই হর্ষ, এই বিষাদ ইহাই যখন মনুষ্যহৃদয়ের চিরন্তন ভোগ, তখন মনুষ্য কেন সুখে উল্লসিত এবং কেনই বা দুঃখে ম্রিয়মাণ হয় ইহা কে আমায় বুঝাইয়া দিবে?

কৃষ্ণা।

বা

কলিকাতা শতাব্দীপূর্ব্বে।

যষ্ঠ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ৫৫১ পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরমোহন বাবুর বাটী।

সময়, তুমি কতই পরিবর্ত্তন দেখিতেছ। সেই সতত-আদিরস-প্রিয় সুরসিক ধনাঢ্য হরমোহন বাবু আজ কোথায়, এবং তাঁহার তৎকালীন মনোহর অট্টালিকাই বা কোথায়? এই গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাগমে যে সুন্দর পুষ্করিণীর বাঁধা-ঘাটে বসিয়া তিনি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা প্রমদাগণকে জল লইয়া যাইতে দেখিয়া আনন্দে সহচরদিগকে কহিতেন, 'মেদিনী হইল মাটী,' অথবা 'শিহরে কদম্বফুল,' অথবা

'জলের কলসী রেখে এস ধন,
একবার হেরি ও বিধুবদন।'

আজ সেই সুন্দর পুষ্করিণী, সেই রম্য

বাধা ঘাট কোথায়? সে পোষ্য ভট্টাচার্য্যগণ কর্ত্তাবাবুর পরিতুষ্টির জন্য ‘ বাহু দ্বৌচ মৃণালমাস্য কমলং ’ বা ‘ ঝটিতি প্রবিশ গেহং ’ প্রভৃতি সুললিত কবিতা সকল পাঠ করিয়া বাবুর হর্ষোৎপাদন ও আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন, আজ তাঁহারা, ও সেই সতত-সঙ্কেতাপেক্ষ প্রভুভক্ত রূপো খানসামাই বা কোথায়? হায় সেই গুণাত্মা হরমোহন বাবু তখন কি জানিতেন যে তাঁহার পরে তাঁহার অমৃতময়ী জীবনী-মহর্ষি কৌশিক বংশাবতংশ শ্রীমান্ ক্ষেত্রপাল কবিরত্ন কর্ত্তৃক অমিয় অক্ষরে অমিয় ভাষায় লিখিত হইবে।

‘ গৌড় জন যাহা আনন্দে করিবে
পান বসি নিরবধি।’

সময়! তুমিই একমাত্র সাক্ষী। তুমি সেই গুণনিধির ক্রিয়া কলাপ সমস্তই দেখিয়াছ, তুমিও আমাকে লিখিতে দেখিতেছ, তুমিই সহৃদয় পাঠকগণকে বলিতে পার আমি যাহা যাহা লিখিতেছি তাহা সকলই সত্য!

আজ বৈশাখ মাসের ১২দিন। এই ১২দিন হইল কর্ত্তাবাবুর বাটীতে প্রতিদিন প্রভাতে ভারত পাঠ হইতেছে, ও অপরাহ্নে তৎসংক্রান্ত কথা হইতেছে। প্রভাতে ভারত-পাঠ শুনিবার সম্পূর্ণ ভার নারায়ণের উপর সমর্পিত হইয়াছে; সুতরাং শালগ্রাম শিলা প্রতিদিন প্রাতে স্নানাদি করিয়া শ্বেতচন্দন মাল্যাদিতে বিভূষিত হইয়া কর্ত্তাবাবুর প্রাঙ্গণে স্বর্ণময় সিংহাসনে বসিয়া বা শুইয়া নিশ্চিন্তে পাঠের দোষগুণ বিবেচনা করেন। অপরাহ্নে কর্ত্তাবাবু [illegible] আসিয়া বেদির পার্শ্বে বসিয়া কথকতা শ্রবণ [illegible], কিন্তু কর্ত্তাবাবু সর্ব্বদা সুস্থির চিত্তে [illegible] পারেন না, এই জন্য শালগ্রামশিলা [illegible]লেও উপস্থিত থাকেন, বাবুর [illegible] সহসা অসংযম হইলে, তিনি [illegible] শ্রবণ করেন।

পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তাবাবু আ[illegible] পার্শ্বে বসিয়া আছেন। ব[illegible] বেদিতে বসিয়া আচমন ও শ্রী[illegible] রণ পূর্ব্বক সমাধিতে মগ্ন হইলে[illegible] দুই পার্শ্বে নানাবিধ ফুলাভরণ প্র[illegible]য়াছে; সমাধি অন্তে তাঁহার পবিত্র শ[illegible] বিধ স্থানে নিহিত হইবে। [illegible] পার্শ্বে মনোহর সভা হইয়াছে[illegible] প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বসিবার জন[illegible] সন সংস্থাপিত হইয়াছে। এক[illegible] য়স্থদিগের বসিবার জন্য রক্তব[illegible] অপর পার্শ্বে নবশাখদিগের জন[illegible] সুন্দর গালিচা পাতা হইয়াছে[illegible] যে সময়ের বিবরণ লিখিতেছি, [illegible] ধনের গৌরব অপেক্ষা জাতি-ম[illegible] থাকাতে বসিবার স্থানের এইরূপ বিভিন্ন আয়োজন হইয়াছে। প্রাঙ্গণের সম্মুখে দালান; এই স্থানে পল্লীস্থ কুলমহিলাদিগের বসিবার জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ জাতিভেদে আসনের স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ হইয়াছে। মুসলমানদিগের অনুগ্রহে তৎকালে অতি উত্তম চিক্ প্রস্তুত হইত, কর্ত্তামহাশয়ের ব্যয়ে অতি মূল্যবান সাতটি চিক্‌দ্বারা দালানের সম্মুখের আটটি থাম মোড়া হইয়াছে। কিন্তু

স্ত্রীলোকদিগের অস্পষ্ট বা অলক্ষিত ভাবে আসিবার কোন আয়োজন হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র শুনিয়াছিলাম যে এবিষয় রূপো খানসামা অবগত ছিল, কিন্তু যেহেতু সেই প্রভুভক্ত ভৃত্য এতকাল পর্য্যন্ত এসম্পর্কে কোন কথা কহে নাই, এই জন্য উহার বিশেষ গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্ফল ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। এস্থলে নব্য পাঠকদিগের মধ্যে এরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ভদ্রস্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান অন্দরে নির্দ্দেশ না হইয়া কেন দালানে নির্দ্দেশ হইল, এবিষয়েও কর্ত্তা মহাশয়ের সহৃদয়তার একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে অনুভূত হইবে, তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। ইদানীন্তন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাটির প্রাঙ্গণের তিনপার্শ্বে বারাণ্ডা প্রস্তুত হয়, তথায় স্ত্রীলোকেরা অলক্ষিতভাবে বসিয়া যাত্রা অভিনয়াদি দর্শন করেন। পূর্ব্বে বারাণ্ডা প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কার হয় নাই; অন্দরের দিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালাছিল, তথায় পরিবারস্থ কুলকামিনীরা বা তাঁহাদিগের নিকটসম্পর্কীয়েরা মাত্র বসিয়া কথা শুনিতে পারেন, সুতরাং পল্লীস্থ কুলকামিনীদিগের জন্য আর কিরূপ উত্তম আয়োজন হইতে পারে? বিশেষ, কর্ত্তাবাবুর মতে কথকতা স্ত্রীলোকদিগের মনস্তুষ্টির জন্য, সুতরাং তাঁহাদিগের বসিবার স্থান কথক ঠাকুরের সম্মুখে নির্দ্দেশ করাই আবশ্যক। অপিচ তাঁহাদিগের প্রকৃত মনস্তুষ্টি হইতেছে কি না, অর্থাৎ কথক ঠাকুর হাস্য, করুণ, বীর প্রভৃতি রস উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিতেছেন কিনা, তাহাও তিনি সম্মুখে থাকিয়া, সুস্পষ্ট না হউক, কথঞ্চিত উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এই এক কারণেও তিনি তাঁহাদিগের বসিবার স্থান এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, সমাধি অন্তে যখন কথক ঠাকুর মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে পার্শ্বস্থ রৌপ্যময় পাত্র সকল হইতে স্তুপাকার ফুলাভরণ সকল একে একে লইয়া যাহা কর্ণের তাহা কর্ণে পড়িতেছেন, যাহা গলদেশের তাহা গলদেশে দিতেছেন, যাহা মস্তকের তাহা মস্তকে রাখিতেছেন, যাহা কণ্ঠের তাহা কণ্ঠে পরিতেছেন;—যখন দুই একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক গামছাখানি লইয়া মুখটি মুছিয়া অঙ্গ (বা অনঙ্গ) বিন্যাস ও অভিনয়োচিত হাব ভাবাদি প্রকাশের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার মাতা অতি দীনভাবে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া দালানে যাইবার উপক্রম করিতেছেন। আদ্যাশক্তি ভগবতীর রূপ বর্ণনা কালে কবি যেরূপ তাঁহার মুখ বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণের সৌন্দর্য্য গানে আপনাকে সার্থক বোধ করিয়াছিলেন, আমরাও অদ্য কৃষ্ণার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে তাহারই বাক্য অনুসরণ করিয়া গাইতেছি—

'যাঁর চরণ নখেতে কোটি ইন্দু পরকাশ'।

কৃষ্ণা একখানি সামান্য পট্ট বস্ত্রে কৌমুদীয় লাবণ্য আবরণ করিয়া যাইতেছেন।

হরমোহন বাবু দেখিলেন, দেখিয়া সহসা বিস্মিত, চিন্তিত ও অস্থির হইলেন। বহু দিন—প্রায় চারিবৎসর হইল, তিনি কৃষ্ণাকে দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণা ও তাঁহার মাতা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন, সুতরাং স্থির করিতে পারিলেন না কোন্‌জন কর্ত্তৃক তাঁহার অট্টালিকা অদ্য অপরাহ্নে অলঙ্কৃত ও পবিত্র হইল? হরমোহন বাবুর বুদ্ধির পরিমাণদণ্ড নিরন্তর হেলিতে দুলিতে লাগিল;—চিন্তারূপ পক্ষী মস্তিষ্ক নীড় পরিত্যাগ করিয়া পল্লীস্থ প্রতি গৃহস্থের বাটী অনুসন্ধান করিতে লাগিল;—অনুরাগ মার্জ্জার 'মেও মেও' রবে বাবুর হৃদয়-পুরী আকুলিত করিয়া তুলিল! বাবু এইক্ষণে সুখহীন, সহায়হীন, বিবেকহীন। তিনি সস্পৃহ নয়নে এক একবার দ্বার দেশের দিকে চাহিতে লাগিলেন, প্রভুভক্ত রূপচাঁদ তথায় উপস্থিত নাই। সহসা তামাকের অভাব হইল; তিনি রূপচাঁদকে ডাকিলেন। নির্জ্জন পার্ব্বতীয় স্থানে শব্দ করিলে যেরূপ গুহায় গুহায় উহা প্রতিধ্বনিত হইয়া ক্রমে শিখর দেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, বাবুর বাক্য মুখে মুখে সেইরূপ প্রতিধ্বনিত হইয়া দ্বারদেশ পর্য্যন্ত ছুটিল। নিকটস্থ দ্বারপাল রূপচাঁদকে খুজিবার জন্য অন্তঃপুরে একজন দাসীকে পাঠাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে শশব্যস্তে সেই নিমকের খানসামা আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। গুণনিধি তখন কথঞ্চিৎ মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন, অর্থাৎ তামাক পাল্‌টাইয়া দিতে বলিলেন। রূপচাঁদ তামাক লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলে, গুণনিধি আঁখি ঠেরিয়া তাহাকে উপস্থিত থাকিতে [illegible]লেন। রূপচাঁদের বুদ্ধির পরিমা[illegible] [illegible]লিতে দুলিতে লাগিল। সে [illegible] [illegible]গিল কি জন্য অন্যান্য চা[illegible] থাকিতে কর্ত্তাবাবু তাহাকেই ডাকিলেন; [illegible] প্রকৃত তামাক পাল্‌টাইবার আ[illegible] ইত, তাহা হইলে অন্য কোন চাক[illegible] করিতে পারিত;—অনুপস্থিত[illegible] জন্য তিনি কি মনে করিয়াছেন [illegible] কি রাগ করিয়াছেন? কৈ [illegible] বোধ হয় না। রূপচাঁদের তী[illegible] শীঘ্রই লক্ষিত হইল বাবু মুহুর্মুহু [illegible] চাহেন। রূপচাঁদ তখন কর্ত্তা[illegible] অনুরাগ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া [illegible] হার নয়ন পথের পথিক হইল। ইত্যবসরে একটি পারাবত শিশু দালানের উপর হইতে সহসা ভূমিতে পতিত হওয়াতে রূপচাঁদ অতি করুণভাব অবলম্বন করিয়া শশব্যস্তে উহাকে লইয়া দালানে রাখিয়া আসিবার জন্য গিয়া দেখিল যেদিকে কর্ত্তাবাবু চাহিতেছেন, সেই দিকে কৃষ্ণা ও তাঁহার মাতা বসিয়া আছেন। রূপচাঁদ পারাবত-শিশুটি দালানে রাখিয়া আসিলে কর্ত্তাবাবু সহাস্য মুখে ঈঙ্গিত করিয়া কহিলেন 'কেমনক্ষ?' রূপচাঁদ জোড়হস্ত করিয়া কহিল "আজ্ঞা হাঁ—এই যে—এই— ঐখানে রেখে এলুন" এদিকে কথা আরম্ভ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে যখন কথকঠাকুর নারায়ণ, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বন্দনা করিয়া * সময়োচিত

* অনর্পিতচরং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

মূলতান রাগ আশ্রয়পূর্ব্বক যথাবিধ শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা † ও ‘আত্মসার’ করিয়া কথকতার অবতারণ করিলেন, এমন সময়ে ক্ষণ-নির্ম্মল ক্ষণ-বাত্যাসঙ্কুল বৈশাখ গগনের উত্তর দিকস্থ নিবিড় মেঘরাশি হইতে ঝটিকা উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই নিবিড় মেঘরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে মুক্তকেশ-অস্থিরা কৃষ্ণবর্ণা মুখরা রমণীর বিন্দয় সময়ে ক্ষণে ক্ষণে ব্যঙ্গসূচক হাস্যের ন্যায় বিদ্যুৎ আলোক প্রকাশ পাইতে লাগিল। তৎপরে নেত্র-বিগলিত অশ্রুরাশির ন্যায় সহস্র বারিধারা পড়িতে লাগিল। কথকঠাকুর আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কর্ত্তাবাবু ও শ্রোতৃবর্গ উঠিলেন। ইত্যবসরে রূপচাঁদ শীঘ্র আসিয়া কর্ত্তাবাবুর সম্মুখস্থ হইলে, তিনি তাহার সহিত কথক ইঙ্গিতে কথক বা মৃদুস্বরে কথা কহিলে, রূপচাঁদ আগন্তুকদিগকে বাবুর বৈঠকখানায় লইয়া চলিল। এদিকে সহৃদয় কর্ত্তা মহাশয় দালানে আসিয়া অবনত মুখে জোড়হস্তে পল্লীস্থ কুলকামিনীদিগকে অন্তঃপুরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সকলেই অবগুণ্ঠিতা হইয়া অন্তঃপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। পরম দয়াবান্ কর্ত্তা মহাশয় ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি স্বয়ং অন্তঃপুরে যাইয়া কর্ত্রীমহোদয়াকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সকলকে সমাদর করিতে, ও সন্ধ্যা অতীত হইলে সকলকেই পরিতুষ্ট রূপে আহার করাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণা ও তাঁহার মাতাকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া, তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইয়া কৃষ্ণার মাতাকে কহিলেন, ‘মা আজ আমার বাড়ী পবিত্র হ’লো ; আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ’লুম যে আজ কথা হইল না, কাল অনুগ্রহ করিয়া পদার্পণ করিবেন।’ কৃষ্ণার মাতা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন, (তৎকালে অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও অনাত্মীয়দিগের নিকট অবগুণ্ঠিতা থাকিতেন) সুতরাং তিনি কোন কথা কহিলেন না। কর্ত্তাবাবুরও উত্তর পাইবার কোন প্রত্যাশা ছিলনা, তথাচ যতক্ষণ কৃষ্ণাকে সম্মুখে দেখিতে পারেন, ততক্ষণই প্রীতির বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিকট হইতে চলিয়া গেলে, কর্ত্তাবাবু অল্পে অল্পে বহির্বাটীতে আসিতে আসিতে মনে মনে কৃষ্ণার রূপের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, ‘ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন”। তিনি সংস্কৃত জানি-

---

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
তুলসীকাননং যত্রযত্র পদ্ম বনানি চ
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্।

† কুরু দীনেময়ি করুণাবলেশং।
বিধিভবভাবিতচরণসরোরুহং হর মম ক্লেশমশেষং।
নন্দতনুজ মে যাচিতমেবং শমনপুরং প্রতিযানং।
শময় রামধনে বহুজনসঙ্কিতং কলিকৃতদুরিতমশেষং॥

তেন না, সহচরব্রাহ্মণদিগের মুখে যে সমস্ত আদিরস-ঘটিত শ্লোক সর্ব্বদা শুনিতেন, তাহাদিগের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ,আজ তাহাই প্রয়োগ করিলেন। আমরাও সম্প্রতি তাঁহাকে ধন্যবাদ দি যে, তিনি আর কিছু না বলিয়া উক্ত শ্লোকের কিয়দংশ মাত্র উল্লেখ করিলেন।

এদিকে ঝড় বৃষ্টি থামিলে কর্ত্তাবাবু আগন্তুকদিগকে যথাবিধি সমাদরপূর্ব্বক বিদায় দিয়া, আপনি একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন না; [illegible] তাঁহার রুচির পরিবর্ত্তন হইল। [illegible] একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে [illegible] থক মহাশয় আহারাদি করিয়া [illegible] গান করিতে করিতে বাবুর নিকট [illegible] বসিলেন। কথক ঠাকুরকে দেখিয়া [illegible] বাবুর চিন্তার গতি ভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিল। কর্ত্তাবাবু মৃদুহাস্য-বদনে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার সহিত [illegible] বিতে নিযুক্ত হইলেন।

শারীর-ক্রিয়া-তত্ত্ব।

(৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫১০ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা যে পৈশিক তন্তুর কথা বলিতেছিলাম, উহা অন্যান্য সজীব তন্তুর ন্যায় স্নায়ু, ধমনী ও শিরা দ্বারা পরিব্যাপ্ত, এবং তৎসমস্ত কর্ত্তৃক উহার কার্য্যশক্তি বা বল পরিপোষিত হইয়া থাকে। ইহাদের বিষয় আমরা ক্রমশঃ বিশেষ করিয়া বলিব। সম্প্রতি এই টুক মাত্র বলিতেছি যে, যে সকল পেশীর চালনা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়মিত করা যায়, তাদৃশ কোন ঐচ্ছিক পেশীর ব্যবহার কালে (যথা বাহুর সঙ্কোচন), এবং অনৈচ্ছিক পেশীরও সঞ্চালন সময়ে, মস্তিষ্ক ও কাশেরুক রজ্জু হইতে স্নায়ুকাণ্ড ও স্নায়ুশাখা বহিয়া বস্তু বিশেষ (কি তাহা এক্ষণে বলিব না) পেশী শরীরে পরিচালিত হয় এবং উহা দ্বারাই পেশী স্বক্রিয়া সম্পাদনে প্রণোদিত হইয়া থাকে। সেই রূপে হৃদয় হইতে শোণিত, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ধমনী সমূহ দিয়া এবং পেশীর কৈশিকা সমূহ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবার শিরা সমূহ দিয়া প্রতিপ্রবাহিত হইয়া হৃদয় মধ্যে ফিরিয়া আইসে, এবং এই শোণিত দ্বারাই পেশী স্বক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। স্নায়বী শক্তি বিনা পেশীর ক্রিয়া হয় না, এবং স্নায়বী শক্তি বিনা শোণিতের দ্বারা উহার

সম্পোষণ ও সামর্থ্য সংরক্ষণ হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ দেখ, যদি স্কন্ধোপান্তে বেষ্টিয়া একগাছি রজ্জু শক্ত করিয়া বাঁধা যায়, তাহা হইলে বাহুতে আর বল আই থাকে না, এবং উহার এত কৌশলের কব্জা কোন কাজেরই হয় না। বাহু অসাড়, পাণ্ডুর ও শীতল হইয়া যায়; উহা অনুভাবকতা-রহিত ও গতিশক্তি-বিহীন হইয়া পড়ে; অঙ্গুলিগুলি স্পর্শজ্ঞান-রহিত হইয়া যায়; হস্তে ধারণশক্তি থাকে না। স্নায়ু ও রক্তবহা নাড়ী সমূহের উপর রজ্জুর চাপ পড়াতে পেশীর জীবনরক্ষা ও ক্রিয়া নিষ্পত্তির জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহার সমাগম রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে এই প্রকার ফলোদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সমগ্র বাহু বেড়িয়া রজ্জুগাছিকে না বান্ধিয়া যে সকল ধমনী দ্বিমূল * পেশীতে রক্ত যোগায়, কেবল তাহাদিগকে বেষ্টিয়া বন্ধন করা যায়, তাহা হইলে বাহু অসাড়, পাণ্ডুর ও শীতল হয় না, অনুভাবকতা নষ্ট হয় না; কিন্তু উক্ত পেশীটিকে সঙ্কোচন করিবার শক্তি থাকে না, সুতরাং নিম্ন বাহুকে উঠাইতে পারা যায় না। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে কোন পেশীতে রক্ত যোজনা রুদ্ধ হইলে উহা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং বলের রক্ষা ও প্রয়োগের জন্য শোণিত আবশ্যক।

কিন্তু এক্ষণে আর একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। বলের উৎপত্তি স্থান কোথায়? শোণিতের সংরচনা ও উহার অনুলোম-বিলোম-সঞ্চরণ সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বেই আমরা এই প্রশ্নের উত্থাপন করিতেছি, কারণ পৈশিক তন্তুর সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে; ফলতঃ দেখা যায় যে কায়িক বলের প্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে পেশীর পরিস্ফূর্ত্তির উপর নির্ভর করে।

ইতি পূর্ব্বে আমরা দেহের ভৌতিক উপাদান পরম্পরার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল উপাদান শোণিতের দ্বারা দেহের সর্ব্বত্র নীত হয়, এবং শোণিত উহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য হইতে সংগ্রহ করে। অগ্রক, † শ্বেতসারক, মেদ ও লবণ এই সমস্তাত্মক খাদ্যদ্রব্য শোণিতে পরিণত হয়; শোণিত সর্ব্বদেহময় বহিয়া তন্তু পরম্পরায় নীত হয়; পেশী স্বীয় অংশ প্রাপ্ত হইয়া বল নিয়োগে সক্ষম হয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের এই সকল উপাদানের মধ্যে কোন্‌টী বল

---

* Biceps Muscle. "যে পেশীর দুইটী মূল তাহাকে দ্বিমূল পেশী কহে। বাহুর যে পেশী অংশফলকের দুইটী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রগণ্ডের সম্মুখ দিয়া গিয়া প্রকোষ্ঠস্থ চক্রদণ্ডাস্থিতে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বিমূল পেশী!"

† Proteid. ইহাকে পূর্ব্বে আমরা "পৌষ্টিকা" আখ্যা দিয়াছিলাম। ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠা দেখ। আন্তশ্বৈতিক বস্তু সমূহের মধ্যে ইহা অগ্রগণ্য বলিয়া ইহাকে 'অগ্রক' আখ্যা দিলাম। ইহা ইংরাজী শব্দের সমধিক সমার্থক অনুবাদ।

রূপে পরিণত হয়? যাহারা বিচক্ষণতার সহিত আহার করিতে চায়, এবং কায়িক বল পালনের ইচ্ছা রাখে, তাহাদের নিকট এ প্রশ্নটী অবশ্যই গুরুতর।

প্রসিদ্ধ লীবিগ সাহেবের মতে পৈশিক বলবিন্যাস ব্যয়সাধ্য ব্যাপার—অর্থাৎ ইহাতে পৈশিক তন্তুর ভঙ্গ, ক্ষয়, পরিবর্ত্তন বা অম্ল বিকার * হইয়া থাকে। যতটুকু বলবিন্যস্ত হয়, ততটুক পেশী বিধ্বস্ত হয়। আমাদিগের খাদ্যস্থিত অণ্ডকবর্গ—অণ্ডশ্বেতিকা†, গাঢ়িকা‡, সৌত্রিকা, শিরিসিকা§, পৈশিক (ও অপরাপর) তন্তুকে নির্মাণ করে। এতাবতা লীবিগ সিদ্ধান্ত করেন এবং সকল শারীরক্রিয়াতাত্ত্বিকেরা মানিয়া লন, যে খাদ্যস্থিত অণ্ডক পেশী রূপে পরিণত হয়, অঙ্গচালনায় উঁহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং নিয়ত খাদ্য হইতে পুনরাহরিত হয়, পরন্তু পৈশিক বল বিনিয়োগ কালে নিঃশেষ হইতে থাকে। অপিচ লীবিগের মতে শ্বেতসারক ও মেদবর্গ কেবল তাপোৎপাদক, বলোৎপাদক নহে। সুতরাং বলের উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য ভুক্ত খাদ্য প্রধানতঃ অণ্ডক বর্গময় হওয়া আবশ্যক—যব মাংসবিধায়ক ও তন্তুপোষক হওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞানের ইদানীন্তন অবস্থায় এ সকল মত বদলিয়া গিয়াছে। এখন আর পেশী গুলিকে বলের উৎপত্তি স্থান বলিয়া বিবেচনা করা হয় না, পরন্তু তাহারা বল বহিয়া লইবার বা খাটাইবার আধার মাত্র। অঙ্গ চালনা কালে যে পরিমাণে বলের পরিব্যক্তি হয়, তাহার সমুচিত পরিমাণে পেশীর পরিবর্ত্তন, অম্ল বিকার বা ব্যয় হয় না; ফলতঃ

---

* Oxidation. যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অম্ল এবং লাবণিক গুণবর্জ্জিত কোন মূল বস্তুর সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অম্লজান সংযোগে কোন যৌগিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে অম্লপাক বা অম্লবিকার আখ্যা দিলাম। জান্তবাদি আস্থিক পদার্থে শঠন (পচন) আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বাহ্য বায়ুর অম্লজান সংশ্রবে এইরূপ রাসায়নিক অম্লপাক উপস্থিত হইয়া থাকে।

† Albumen. পূর্ব্বে ইহাকে 'অণ্ডশ্বেত' আখ্যা দিয়াছিলাম। ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ Gelatin. ইহা এক প্রকার জান্তব পদার্থ; চর্ম্ম, কোষাণব (cellular) ত্বক্ সমূহ, এবং অস্থিত্বক্ সাধারণে পাওয়া যায়। ইহার বিশেষ প্রকৃতি এই, ইহা উষ্ণজলে গলিয়া যায়, এবং শীতল হইলে গাঢ় হয়। অমিশ্রাবস্থায় ইহা বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও স্বাদরহিত। Isinglass ইহার বিশুদ্ধ ও বাজারের শিরিসাদি ইহার অবিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত স্থল।

§ Gluten. ময়দাকে পুনঃ পুনঃ জলধৌত করিয়া শ্বেতসারাদি দ্রবণীয় পদার্থ ধুইয়া গেলে যে আঠাময় পদার্থ থাকে, তাহাকে ময়দার শিরিস বা শিরিসিকা বলা যায়।

অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্র হানি হইয়া থাকে। এক্ষণকার মত এই যে দেহের, বিশেষতঃ পেশীচয়ের, নির্ম্মাণ ও সৌষ্ঠব রক্ষার জন্য যে যে বস্তু আবশ্যক, অগ্রকবর্গ কর্ত্তৃক তৎসমস্ত প্রদত্ত হয়; কিন্তু বলের প্রধান উৎপত্তি-হেতু শ্বেতসারক ও মেদবর্গ। খাদ্য মধ্যে অগ্রকবর্গের অভাব থাকিলেও লোকে কঠিন শ্রমের কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, ইহা হইতেই এই মত পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ট্রব সাহেব এরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে পৈশিক বল মাত্রেই মেদ ও উদাঙ্গারকের * অম্লবিকার হইতে উৎপন্ন হয়; অপিচ ১৮৬৪ সালে ডণ্ডার্স্ বলিলেন যে শুদ্ধ পৈশিক পরিবর্ত্তনই সকল প্রকার দৈহিক বলের একমাত্র মূল হইতে পারে না। ডাক্তর এডোয়ার্ড স্মিথ্ তাহার পরে দেখাইলেন যে অঙ্গ চালনা কালে মূত্রস্থিত মৌত্রিকা (পেশীর অম্ল বিকার দ্বারা মৌত্রিকার উৎপত্তি হয়) পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু আঙ্গারিকাম্ল (ইহা শ্বেতসারক ও মেদবর্গস্থিত অঙ্গার পদার্থের অম্লবিকার দ্বারা উৎপন্ন হয়) পদার্থের বিস্তর পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এই রূপে প্রমাণ করিলেন যে, বলবিন্যাস কালে মেদ ও শ্বেতসারকের অধিক পরিমাণে ধ্বংস হইয়া থাকে। তাহার পর আবার ১৮৬৬ সালে ফিক্ ও উইশ্লিন্স্ সাহেবেরা যবক্ষার জানিক খাদ্য বর্জ্জন দ্বারা প্রস্তুত হইয়া আল্প্স্ পর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষের শিখরারোহণ করিয়া পরীক্ষা করিলেন যে এতাদৃশ আয়াস-সাধ্য ব্যাপারে শ্বেতসারক ও মেদ তাঁহাদিগের বল রক্ষা করিতে পারে কি না। পেশীর অম্লবিকার যদি বলবিকাশের ফল হয়, তাহা হইলে সেই পেশীর মূলোপাদান যে অগ্রকবর্গ, তাহা তো তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জনই করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল এই হইল যে তাঁহারা অনায়াসেই আরোহণ করিতে পারিলেন, এবং এই ঘটনা দ্বারা তাঁহারা অন্ততঃ ইহা প্রমাণ করিলেন যে তাঁহাদের যে বল তাহা অযবক্ষারজানিক খাদ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইদানীন্তন আরও অনেক পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এতাবতা শ্বৈতসারিক ও মৈদিক খাদ্যই বলের উৎপত্তি-হেতু। এই জাতীয় খাদ্য শোণিতে পরিণত হইয়া আশু ব্যবহার যোগ্য হয়, এবং কৈশিকা সমূহে তাহাদের গুণ সঞ্চারিত করে। স্নায়বী শক্তি এবপ্রকারে উদ্ভূত হয় কি না তাহা এখনও স্থির হয় নাই, কিন্তু হওয়ারই সম্ভাবনা। পরন্তু তৎপক্ষে ফস্ফর এবং হয় তো আরও কোন্ কোন মূলভূত বা মৌলিক পদার্থের সংযোগ আবশ্যক হইয়া থাকে।

এই সমস্ত তথ্যের ব্যাবহারিক প্রয়োজন এই যে, যে সকল বস্তু তাপজনক তাহারাই বল-জনক; যে যবক্ষারজানিক খাদ্য শ্রমকারী জন সমূহের অথবা ক্ষীণ বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে, পূর্ব্বে যেরূপ বিবেচনা করা

* Hydro-carbon. রসায়ন-শাস্ত্রে উদজান গ্যাস ও অঙ্গারকের যোগোৎপন্ন বস্তুকে উদাঙ্গারক কহে।

হইত, সেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয় নহে; এবং যে, খাদ্য সম্বন্ধে সমধিক মিতাচারিতা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

পৈশিক তন্তুর সহিত শোণিতের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা যাহা উল্লিখিত হইল, অন্যান্য তন্তুর সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য জানিবে। সকলেরই বর্দ্ধন, পোষণ ও ক্রিয়াশক্তি শোণিতের উপর নির্ভর করে, সকলেই উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর পোষক বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং সকলেই অব্যবহার্য্যাংশ উহাতে সমর্পণ করে। শোণিতের সহায়তাতেই এই জটিল যন্ত্রের প্রত্যেক অংশ স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়; পেশীচয় সঙ্কুচিত হয়, মস্তিষ্কের বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি হয়, স্নায়ুগুলি অনুভবজ্ঞান ও ইচ্ছার আদেশ বহন করে, হৃদয় আঘাত করিতে থাকে, ফুস্ফুসদ্বয় শ্বসন ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে, এবং শরীরের অপরাপর করণগুলি স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। এবম্প্রকারে সমস্ত শরীর সজীব, দুর্ব্বলতা-বিকৃতি-ও ব্যাধি-বর্জ্জিত, এবং আত্মনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের উপযোগী হইয়া থাকিতে সক্ষম হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই পোষক বস্তু শোণিত কি পদার্থ? ইহা দেহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর-মাত্র দ্রব পদার্থ, জল অপেক্ষা গুরুতর ও গাঢ়তর, অতিশয় অস্বচ্ছ, কিয়ৎ পরিমাণে পিচ্ছিল, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট, লবণাস্বাদযুক্ত ও ঈষৎ গন্ধশালী। অণুবীক্ষণ দ্বারা ইহাতে প্রায় বর্ণহীন একপ্রকার [illegible] * বা মস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং [illegible] মধ্যে কতকগুলি লোহিত বর্ণ ও [illegible] বর্ণ বিম্বাণু † এবং অতিসূক্ষ্ম [illegible] তৈলকণা ‡ ভাসমান দৃষ্ট হয়। [illegible] পেক্ষা লোহিত বিম্বাণুর ভাগ [illegible] যায়।

লিঙ্গ, বয়স প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যে[illegible] ম্যানুসারে, শেষ ভোজনের [illegible] অতিবাহিত হয় তাহার প[illegible] যে স্থানের রক্ত গৃহীত হয় দে[illegible] সেই [illegible] ভেদানুসারে এবং অন্যান্য [illegible] শোণিতের ঔপাদানিক অংশ [illegible] আনুপাতিক ভাগবিধানেরও [illegible] থাকে। আমিষ ভক্ষণের [illegible] কোন কোন ঔষধ সেবনের দ্বারা লোহিত বিম্বাণুগুলির আপেক্ষিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে; রক্তমোক্ষণ, নিরামিষ ভোজন এবং অনশন দ্বারা উহাদিগের আপেক্ষিক ন্যূনতা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের, দুর্ব্বল অপেক্ষা সবলের, শিশু ও বৃদ্ধ অপেক্ষা তরুণ ও মধ্যম বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শোণিতে লোহিত বিম্বাণুর ভাগ বেশি থাকে।

---

* Plasma or Liquor Sanguines

† Corpuscles ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্ব বা গোলাকার।

‡ Oil globules.

নিম্নের লতা দৃষ্টে শোণিতের সংরচনা জ্ঞাত হওয়া যাইবে :—

জল		......	......	......	৭৭৯
অদ্রব	বিম্বাণু	গোলাণুকা	১৩৪.০	১৪১.০	
		শোণিকা	৭.০		
	অণ্ড শ্বেতিকা	....	....	৬৯.৪	
	সৌত্রিকা	....	....	২.২	২২১
	মেদপদার্থ	সাবানবৎ মেদ	১.০০	১.৬	
		ফস্ফরবৎ মেদ	০.৪৯		
		পিত্তপ্রমেদিকা *	০.০৯		
		[illegible]িকা ...	০.২০		
	নিষ্কর্ষীয় পদার্থ	....	....	৬.৮	
					১,০০০

* Cholesterin ঘনীভূত মেদকে 'প্রমেদ' আখ্যা দিলাম। পিত্ত ও পিত্তশিলা হইতে যে প্রমেদ পাওয়া যায় তাহাকে পিত্তপ্রমেদিকা নামে আখ্যাত করা গেল।

পৃথক্ পৃথক্ দেখিলে লোহিত বিম্বাণুগুলি ঈষৎ পীতাভ দৃষ্ট হয়; কতকগুলি একত্র করিয়া দেখিলে নির্ব্বিশেষে রক্তবর্ণ দেখায় এবং ইহাদিগের দ্বারাই শোণিতের লোহিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। ইহারা আকারে গোলাকার চাক্তি, চেপ্টা পিঠ, অল্প বসা বা কুব্জ * এবং তজ্জন্য প্রান্তভাগ অপেক্ষা মধ্য স্থলে অধিক পাৎলা। ইহাদের ব্যাস ১ বুরুলের প্রায় ৩২০০ তম অংশ, বেধ ব্যাসের প্রায় এক চতুর্থাংশ, কিনারায় কিনারায় মিলাইয়া ১০০,০০,০০০ একত্র রাখিলে এক বর্গ বুরুল স্থান অধিকার করে কি না, ১,২০,০০,০০,০০,০০০ এক ঘন বুরুলের অধিক স্থান লয় না। এই সকল সংখ্যাদ্বারা কোন ধারণা হওয়াই কঠিন, আবার এমন সকল কৈশিকা আছে যাহার মধ্য দিয়া এই লোহিত বিম্বাণুগুলিও যাইতে পারে না, মনে কর তাহারা কত সূক্ষ্ম! পরন্তু বিম্বাণুগুলির ব্যাসের অপেক্ষা যে সকল কৈশিকার ছিদ্র আরও সরু, তাহাদের মধ্য দিয়াও ইহারা যাইতে পারে, বাহির হইয়াই আবার আপন আকার ধারণ করে, কারণ ইহারা সুকুমার, কোমল, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক।

(ক্রমশঃ।)

আনন্দ মঠের মূলমন্ত্র।

কল্পনার আনন্দমঠ পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং কবি কার্য্যকুশল চিত্রকরের ন্যায় ইহার পট প্রদর্শন-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার বহিঃস্থ প্রাঙ্গণ, প্রকোষ্ঠ, কানন ও কুসুমোদ্যান,—ইহার অভ্যন্তরস্থ সাধনাগৃহ, ভজনাগৃহ, ভক্তিমণ্ডপ, মুক্তি-

মণ্ডপ, ইহারই দেবালয়, দেবমূর্ত্তি এবং দেব-তার দেবতা সকলই তিনি একে একে ও উপযুক্ত অবসরে চিত্রপটে আঁকিয়া আঁ-কিয়া দর্শককে দেখাইতে যত্ন পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, সেই পটপ্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের দুই এক পরিচ্ছেদ শুনাইয়া-ছেন, ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাস একটুকু মিলাইয়া এবং উপন্যাসের মধ্যে কাব্যের তরল মধু ঢালিয়া ভাবের ভাবুক, রসের রসিক ও পথের পথিককে ঐ দেবালয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা সফল হইয়াছে কি? বঙ্গসন্তান এই তান্ত্রিক উপন্যাস অথবা এই অপূর্ব্বকাব্যতন্ত্রের মন্ত্রার্থ পরি-গ্রহে সমর্থ হইয়াছে কি?

যাঁহারা আনন্দমঠকে শুধুই উপন্যাস মনে করিয়া ইহার পরিচ্ছেদনিচয়ের উপর নয়নাবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের সারল্যের অশেষ প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ 'গ্রন্থ' তাঁহাদিগের জন্য নহে। অথবা যাঁহারা ভ্রমরের প্রকৃতি লইয়া এই কাঁটাবনে কুসুম-মধুর অন্বেষণ করিয়াছেন,—ইহার কোথায় শান্তির অর্দ্ধা-বৃত হৃদয়ের কথা এবং কোথায় অর্দ্ধজীবিতা কল্যাণীর প্রতি সেই অধীর ভবানন্দের উন্মত্ত প্রণয়ের কথা, যাঁহারা ইহাতে শুধু এই সকল তত্ত্বেরই অনুসন্ধান করিয়া-ছেন, আমরা তাঁহাদিগকেও রসগ্রাহী ইয়ার বলিয়া আদর করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ 'গ্রন্থ' তাঁহাদিগের জন্যও নহে। এই দেব সেব্য পবিত্র গ্রন্থের শ্রোতা ও বক্তা, ধারক ও পাঠক ভক্তিমান [illegible] না হিলে ইহার সমস্তই প্রলাপ। [illegible] মন্ত্র—'বন্দে মাতরং'—না হইলে ইহার [illegible] দ্যোপান্ত সমুদয়ই ভস্মে ঘৃতাহু[illegible]

কিন্তু হায়! বঙ্গমাতার এই [illegible] সন্তানের মধ্যে কে তাঁহাকে মা [illegible] জানে, মা বলিয়া ডাকে, মা ব[illegible] আরাধনায় একফোটা অশ্রুজল [illegible] বল। সেই 'সুজলা, সুফলা, শ[illegible] স্নেহশীতলা জননী মূর্ত্তিময়ী হই[illegible] সমক্ষে রহিয়াছেন,—এই সপ্ত [illegible] স্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্[illegible] লন এবং অন্নজলে পালন [illegible], কিন্তু কে তাঁহার দিকে মা বলি[illegible] ফিরিয়া চায়, মা বলিয়া তাঁহার [illegible] এবং দিনান্তে কি নিশান্তে, [illegible] যুগান্তে 'বন্দে মাতরং' বলিয়া একবার তাঁহাকে আহ্বান করে, বল। ধনী আপ-নার পূর্ণ ভাণ্ডারকে পুনঃ পূরণের কামনায় সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়া, বাহাদুরীর ডিঙ্গা চালাইয়া যাইতেছে। নির্দ্ধন গলদ্ঘর্ম্ম পরিশ্রমের পরও মুষ্টিমিত ভক্ষ্য আহরণে অশক্ত হইয়া দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস উন্মোচন করিতেছে। যুবা পিপাসার পঙ্কিল স্রোতে ভাসমান হ-ইয়া জগতের উচ্চ নীচ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত পদার্থকে ভ্রূক্ষেপে উড়াইয়া দিতেছে। বৃদ্ধ অতৃপ্ত পিপাসায় দগ্ধ হইয়া অতীত স্মৃতির মালা জপিতেছে। কৃষক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দে হাসিতেছে, বণিক্ বাণি-জ্যের অধিকতর ভরসা পাইয়া ভবিষ্যতের

ফলাফল গণিতেছে। যে যশের উপাসক সে স্বকার্য্যের ভেরী বাজাইতেছে; যে মানের উপাসক, সে কোন্ ঘটে তুলশী দিবে এই চিন্তায় কার্য্য ও অকার্য্যের পার্থক্য ভুলিয়া ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই ধনী ও নির্দ্ধন, যুবা ও বৃদ্ধ, কৃষক ও বণিক্ এবং যশস্বী ও মানী বঙ্গবাসীর মধ্যে কে জন্মভূমিকে জননী এবং স্বর্গ হইতে গরীয়সী জানিয়া একবার তাঁহাকে স্মরণ করে, একবার তাঁহাকে মনন করে, একবার হৃদয়ের ভক্তির সহিত তাঁহার নাম গ্রহণ করে, বল।

এই মোহনিদ্রার অপসারণের নিমিত্তই মন্ত্রমোহময় আনন্দমঠের অবতারণা, এবং এই অপ্রাকৃত ঔদাস্য, এই অচিকিৎস্য ব্যাধি এবং এই অকালমৃত্যুর প্রতিবিধানের নিমিত্তই কাব্যে তন্ত্রোক্ত বিধানে মাতৃমূর্ত্তির আরাধনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহার মূলমন্ত্র—'বন্দে মাতরং'। প্রভাতে ও প্রদোষে, মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে সকল সময়েই আনন্দমঠে ঐ মধুর মন্ত্রগীত উচ্চারিত হইতেছে। সকলেই যেন জলদগম্ভীর নির্ঘোষে সমস্বরে গাইতেছে,—"বন্দে মাতরং"। সমুদ্রের তরঙ্গ, নদীর লহরী, বায়ুর হিল্লোল এবং বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ ইহারাও যেন ঐ ধ্বনিরই প্রতিধ্বনিতে গাইতেছে,—"বন্দে মাতরং"। গৃহে উপাসনা,—বন্দে মাতরং; কার্য্যক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গের সময়েও,—বন্দে মাতরং। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে কি? যদি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে জন্মভূমিকে জননী বলিয়া জান, জননী বলিয়া মান, জননী জ্ঞানে প্রাণের সহিত ভালবাস—জন্মদা দেবতা জানিয়া সাধনার ভাবে তাঁহার আরাধনা কর। যদি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাও, তাহা হইলে অন্তঃসারশূন্য উপেক্ষার ভাবকে উন্মূলন করিয়া ভক্তির নির্ম্মল ভাবকে হৃদয়ে প্রগাঢ়রূপে পোষণ কর, এবং বুদ্ধির বল, বাক্যের উদ্দীপনা, চিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং আত্মার উৎসাহ সমস্তই মাতৃসেবায় সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হও। যদি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাও, তাহা হইলে আপনাকে মায়ের সন্তান বলিয়া জানিয়া, সন্তান মাত্রকেই ভ্রাতৃস্নেহে ভাল বাসিতে শিখ;—স্বজাতি-বিদ্বেষ, স্বজন-হিংসা এবং স্বদেশবাসীর প্রতি বিকারের বুদ্ধিকে পরিহার করিয়া পরকে আপনার এবং আপনাকে পরের করিয়া লও;—এবং স্বজনে ও পরজনে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া সেই অসংখ্য প্রাণের পুষ্পস্তবক মাতার পাদপদ্মে অঞ্জলি দেও। পৃথিবীর যে জাতি যখন কল্যাণীর মত মরিয়া বাঁচিয়াছে, জীবানন্দের মত মৃত্যুর গ্রাস হইতে সজীবদেহে পুনরুত্থিত হইয়াছে, সেই জাতিই জন্মভূমিকে এই ভাবে মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করিয়াছে, মাতৃসেবারূপ পরমধর্ম্মকে জীবনের ব্রতধর্ম্ম করিয়া লইয়াছে। বঙ্গবাসি! পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শুধু তুমিই কি এই পবিত্রধর্ম্মে বঞ্চিত রহিয়া পুতুলের মত নৃত্য করিবে?

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ।

(ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর।)

দশম অধ্যায়।

জেরুজিলেম হস্তগত হইলে খলিফা সমস্ত সীরিয়া রাজ্য অধিকার করিতে উৎসুক হইলেন। প্রদেশটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণাংশ আবুসোফিয়ানের হস্তে এবং উত্তরাংশ আবুওবীদার হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রাচীন সভ্যতার দ্বিতীয় আশ্রয়-স্থান মিশর দেশ অধিকার করিতে খলিফার বাসনা হইল। দুরদর্শি চক্ষু তখনই দেখিতে পাইত অতঃপর একদিন ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের রঙ্গভূমি হইবে। এইসময়ে মিশর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আমরু ইবিন্ আল্ আস্ ঐ দেশ আক্রমণ করিতে প্রেরিত হইলেন। অন্যদিকে আবি ওয়াকাস্ নামক একজন সেনাপতি পারস্য দেশে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। মুসলমান বৈজয়ন্তী সহস্র সহস্র মাইল দুরবর্ত্তি স্থান সমুহে যুগপৎ শোভা পাইতে লাগিল।

ওমার মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নগরবাসিগণের হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইল। তাহাদের আশঙ্কা ছিল জেরুজিলেমের ন্যায় শাস্ত্রতঃ পবিত্র এবং ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নগর প্রাপ্ত হইলে খলিফা নিশ্চয়ই সেই নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করিবেন। সেই আশঙ্কা বিদুরিত হইলে আরবীয়গণের ধর্ম্মে আস্থা এবং খলিফার মহত্বে বিশ্বাস শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

খলিফা মদীনাভিমুখে প্রস্থান করিলে আবুওবীদা তাঁহার বিজয়ী সেনাসমভিব্যাহারে উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, কেনেসরীন্, আল্‌হাদীর প্রভৃতি নগরী আত্মসমর্পণ করিল। তাহারা পাঁচসহস্র আউন্স স্বর্ণ, ঐ পরিমাণ রৌপ্য, বহুমূল্য পট্টবস্ত্র, নানাপ্রকার ফল মূল এবং পাঁচশত উষ্ট্র উপহার দিয়া আত্মরক্ষা করিল। অনন্তর তিনি আলিপো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থানের লোকেরা বাণিজ্যব্যবসায়ী এবং অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। তাহারা লুণ্ঠনকারী মরুবাসিদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে থর থর কম্পিত হইতে লাগিল।

আলিপো সুদৃঢ় প্রাচীর পরিবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু নগরের বহির্ভাগে যে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত ছিল, তৎপ্রতিই নগরবাসিগণ প্রধানতঃ নির্ভর করিত। একটি কৃত্রিম পর্ব্বতের উপরিভাগে সুদৃঢ়

প্রস্তরে ঐ দুর্গ গঠিত ছিল। আয়তন অতিশয় বিস্তৃত, চারিদিকে সুগভীর পরিখা। কৌশল করিলে ঐ পরিখা এক মুহূর্ত্তে জলপূর্ণ হইতে পারিত। আলিপো হইতে ইয়ুফ্রেটিসনদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের শাসনজন্য সম্রাট্ হিরাক্লিয়স যাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করাতে তাঁহার দুই পুত্র যোকেনা এবং জোহানাস্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। যোকেনা জ্যেষ্ঠ, সমরকুশল, তিনি রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। জোহানাস্ কনিষ্ঠ, তিনি অধ্যয়নে, ধর্ম্মানুসরণে এবং দানাদি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিতেন। মুসলমানের আগমনে জোহানাস্ ধনী বণিক্‌সমূহের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব নাশ না হইতে পারে এজন্য অর্থ প্রদানপূর্ব্বক সন্ধি করিতে ভ্রাতাকে উপদেশ দিলেন। যোকেনা বলিলেন "তুমি সন্ন্যাসীর ন্যায় চলিতেছ; যোদ্ধৃগণের গৌরবরক্ষায় কি আবশ্যক, তুমি তাহার কিছুই জান না। আমাদের কি দৃঢ় প্রাচীর, সাহসি সৈন্য, প্রচুর সম্পত্তি নাই? আমরা কি নগর রক্ষা করিতে পারিব না? একবারও চেষ্টা না করিয়া, একবার অস্ত্র বিনিময় না করিয়া, নিতান্ত নীচাশয়ের ন্যায়, সন্ধি ক্রয় করিব? তুমি নগর রক্ষার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া অধ্যয়ন এবং উপাসনায় সময় অতিবাহন কর।"

যোকেনা পরদিন সৈন্যগণকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে টাকা দিলেন এবং উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বলিলেন "আরবীয়গণ তাহাদের সৈন্যবল বিভাগ করিয়াছে; কতক সৈন্য পালস্তিনে আছে, কতক মিশরে প্রেরিত হইয়াছে; সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে অল্পসংখ্যক সৈন্যই আসিতেছে। আমার ইচ্ছা যে তাহারা আলিপোর সমীপস্থ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধদান করি"। সৈন্যগণ উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনি দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া মুসলমানগণকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন।

এই অবিবেচক সেনাপতি সৈন্যসহ প্রস্থান করিবার পর, নগরের ভীত বণিক্ শ্রেণীর লোকগণ ত্রিশজন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অর্থ লইয়া নগর সমর্পণের প্রস্তাব করিতে পাঠাইল। এই সকল ব্যক্তি মুসলমান শিবিরে প্রবেশ করিয়া প্রধান সেনাপতি আবুওবীদার শিবিরের শৃঙ্খলা এবং সুনিয়ম দৃষ্টে আশ্চর্য্য হইল। আবুওবীদা স্থিরভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাহারা বলিল, তাহাদের বীর শাসনকর্ত্তা যোকেনা যুদ্ধার্থ বাহির হইয়াছেন, তাঁহার অত্যাচার অসহ্য, তাহারা তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আসিয়াছে। অনেক তর্কবিতর্কের পর আবুওবীদা প্রস্তাব করিলেন, তাঁহাকে কতক টাকা দিতে হইবে, তাঁহার সৈন্যগণের খাদ্য প্রদান করিতে হইবে, তাঁহার স্বার্থের পক্ষে যাহা কিছু প্রতিকূল সে সমস্ত দেখাইতে হইবে এবং যোকেনা যাহাতে দুর্গে প্রত্যাগত হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহারা এই শেষ

প্রস্তাব ব্যতীত আর সকল প্রস্তাবে সম্মত হইল, কারণ এই বিষয় কার্য্যে পরিণত করা তাহাদের অসাধ্য।

আবুওবীদা ঐ প্রস্তাব ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু অন্য কয়টি নিয়ম যথানিয়মে সম্পাদন করিতে তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। তিনি বলিলেন, যদি তোমরা নিয়ম পালন কর তাহা হইলে তোমাদিগকে রক্ষা করিব এবং সদয় ব্যবহার করিব; আর, অন্যথা করিলে রক্ষা নাই। তিনি কতকটি লোক সঙ্গে দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহারা যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে প্রত্যাগমন করিবে বলিয়া তাহা অস্বীকার করিল।

এদিকে যোকেনা সৈন্যসহ মুসলমানগণের পুরোবর্ত্তি সহস্র সৈন্য আক্রমণ করিয়া বসিলেন। ঐ সৈন্যগণ ক্যাব ইবিন্ দামারার অধীনে ছিল; যুদ্ধের কোন সংবাদ বা আয়োজন ছিল না, তাহারা অসতর্ক ভাবে অবস্থান করিতেছিল। তথাপি শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। একশত সত্তর জন হত হইল। রজনীর আগমনে অন্যান্যেরা পলায়নের সুযোগ পাইল। যোকেনার ইচ্ছা ছিল যে তিনি দামারার অনুসরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে নাগরিকগণের কার্য্য অবগত হইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সৈন্য সমাবেশ করিয়া ঘোষণা করিলেন, যদি সন্ধির প্রস্তাব রহিত না হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভস্মশেষ করিবেন; যাহারা সেই বিশ্বাসঘাতকতার নেতা তাহাদিগকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত না করিলে এবং সকলে মুসলমানের বিরুদ্ধে মিলিত না হইলে কাহাকেও ক্ষমা করিবেন না। তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, যোকেনা ক্রোধে অধীর হইয়া সৈন্যগণের প্রতি আদেশ করিলে, তাহারা তিনশত লোককে হত্যা করিল। হাহাকার জোহানাসের কর্ণগত হইলে তিনি আসিয়া নগরবাসিগণের জীবন রক্ষার্থ ভ্রাতার নিকট প্রার্থনা করিলে যোকেনা বলিলেন, "কি! যে সকল বিশ্বাসঘাতক বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিয়াছে এবং আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিপক্ষের নিকট আমাদিগকে বিক্রয় করিতেছে, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিব?"

জোহানাস্ বলিলেন, "হায়! তাহারা আত্মরক্ষার জন্য ওরূপ করিয়াছে, তাহারা ত যোদ্ধা নয়।"

যোকেনা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন. "নীচাশয় হতভাগা! তুই এই জঘন্য অপরাধের উত্তেজক।"

উলঙ্গ তরবারি তাঁহার হস্তে ছিল; তাঁহার কথা হইতে কার্য্য আরও অধিক উন্মত্তবৎ, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই নম্র, ধাম্মিক ভ্রাতার মস্তক মৃত্তিকায় গড়িয়া পড়িল।

যখন খালেদ কর্ত্তৃক একদল সৈন্য নগর সমীপে নীত হইল, নাগরিকগণ তখন বিপক্ষ সৈন্য হইতে আপন সেনাগণকে অধিক ভয় করিতে লাগিল। নগর প্রাচীর সমীপে ভীষণ সংগ্রাম হইল; যোকেনার তিন সহস্র সৈন্য শমনসদনে গমন করিল, তিনি

অবশিষ্ট সৈন্যসহ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন ; এবং সেখানে প্রাচীরোপরি যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মুসলমান সেনানায়কগণ সমবেত হইলে আবুওবীদা প্রস্তাব করিলেন, দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়া থাকিলে নাগরিকগণ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হইবে। অনলপ্রতাপ খালেদ তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ করিলেন, সকলে তাহাই অনুমোদন করিল। কারণ সম্রাট্ সাহায্য প্রেরণের পূর্ব্বে নগর হস্তগত করা তাঁহাদের পরামর্শসিদ্ধ হইল। খালেদ আক্রমণ করার ভার গ্রহণ করিলেন দুর্গ আক্রান্ত হইল। সীরিয়ায় যত যুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে এই যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ হইল। অবরুদ্ধগণ প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, অবরোধকারিগণের অনেকে হত হইল। খালেদ বিরত হইতে বাধ্য হইলেন।

নিশীথ সময়ে শিবিরের আলোক নির্ব্বাপিত হইলে, মুসলমানগণ যুদ্ধের গুরুতর পরিশ্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন যোকেনা তাঁহার সৈন্যসহ অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষমধ্যে তরবারি হস্তে বাহির হইলেন, পঞ্চাশ জন বন্দী করিয়া লইলেন, ষষ্টিসংখ্যক হত হইল। খালেদ দ্রুত অনুসরণ করিলেন, যোকেনার সৈন্য দুর্গতোরণ রুদ্ধ করিতে না করিতে শতাধিক বিপক্ষ হত্যা করিলেন। পরদিন প্রভাতে যোকেনা পঞ্চাশজন মুসলমানবন্দী প্রাচীরোপরি স্থাপন করিয়া নিতান্ত নৃশংস দস্যুর ন্যায় তাহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া ছিন্ন মুণ্ডসকল বিপক্ষ শিবিরমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। যোকেনা গুপ্তচরমুখে অবগত হইলেন, কতকগুলি মুসলমান সৈন্য একস্থানে অশ্ব উষ্ট্রাদিকে ঘাস জল দিতেছে। তখন অতি গোপনে একদল সৈন্য পাঠাইয়া প্রায় একশত চল্লিশ জন সৈন্য বিনাশ করিলেন ; অশ্ব উষ্ট্রাদি হৃত হইল। পরিশেষে তাহারা দুর্গে প্রত্যাগমন জন্য রজনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কএকজন পলায়িত সৈন্য শিবিরে এই সংবাদ লইয়া গেলে খালেদ ও দিরার এক দল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন সেই স্থান মনুষ্য ও অশ্বের মৃত শরীরে আবৃত রহিয়াছে ; তাহারা যেস্থানে লুক্কায়িত ছিল, এবং রজনীতে যে সঙ্কীর্ণ পথে ঐ স্থান হইতে দুর্গে প্রত্যাগমন করিবে তদ্বিষয় কৃষকগণের নিকট অবগত হইলেন। খালেদ ও দিরার সৈন্য সকল সংগোপনে রাখিলেন। অধিক রাত্রিতে যখন তাহারা আসিতে লাগিল তখন হঠাৎ চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া বহুসংখ্যক হত্যা করিলেন এবং তিনশত বন্দী সহ জয়োল্লাসে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। অর্থ প্রদান করিলে অন্য সময় ইহারা অনায়াসে স্বাধীনতা লাভ করিত ; কিন্তু প্রতিহিংসা লইবার বাসনা বলবৎ হইয়া উঠিল, বন্দিগণের দুর্গ সমক্ষে প্রাণদণ্ড হইল।

পাঁচমাস পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া রহি-

লেন। কিন্তু মুসলমান সেনাপতি কোন রূপেই নগর অধিকার করিতে পারিলেন না। তাঁহার আপন শিবিরে বিপক্ষের চর ছিল, তাহারা সঙ্কেত করিয়া যোকেনাকে মুসলমানের সকল প্রস্তাব, সমস্ত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিত। আবুওবীদা নিরাশ-হৃদয়ে অবরোধ পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া খলিফাকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু তাদৃশ দুর্ব্বলতা দেখাইলে বিপক্ষগণ উৎসাহিত হইবে ভয়ে খলিফা নিষেধ করিলেন এবং সেনাপতির সাহায্যার্থ কতকগুলি সৈন্য ও বিংশ উষ্ট্র পাঠাইলেন। তথাপি আরও সপ্তচত্বারিংশ দিন অবরোধ করিয়া রহিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার কোন লক্ষণই দেখিলেন না।

যখন আবুওবীদা যত্ন বিফল দেখিয়া বিরক্ত ও হতাশ হইতেছিলেন, নবাগত সৈন্যগণ মধ্য হইতে দমাস্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলিল, "যদি আপনি ত্রিশ জন অতি সাহসী সৈন্য আমার আজ্ঞাধীন করিয়া দেন তাহা হইলে আমি দুর্গ অধিকার করিয়া দিতে পারি।" এই ব্যক্তি শারীর শক্তিতে অসাধারণ ছিল, এবং অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। যদিও প্রথমতঃ একজন ক্রীত দাস ছিল বলিয়া শিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তের অভাবে তাহার মনোবৃত্তি কর্ষিত ও মার্জ্জিত ছিল না, তথাপি তাহার কার্য্য পরম্পরায় আরবদেশে তাহার বিস্তর যশঃসঞ্চয় হইয়াছিল। খালেদ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, আবুওবীদা সম্মতি দিলেন। অবরোধ পরিত্যাগ করিলেন দেখাইবার জন্য সেনাপতি দমাসের পরামর্শ লইয়া সৈন্যসহ তিনমাইল দূরে গিয়া অবস্থান করিলেন।

রাত্রি হইল। দমাস্ তাহার ত্রিশ জন লোক দুর্গের নিকট এমন সাবধানে লুকাইয়া রাখিল যে, তাহারা একটি শব্দ না করে অথবা না নড়ে। অনন্তর সে একাকী গমন করিয়া একে একে ছয়জন খৃষ্টিয়ানকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল, সে তাহাদিগকে আরবী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা বুঝিতে পারিল না, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের শিরশ্ছেদ করিল।

সে পুনরায় গমন করিল। দেখিল একজন প্রাচীর হইতে অবরোহণ করিতেছে। সে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিল। দেখিল সে একজন খৃষ্টিয়ান আরব, সে যোকেনার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতেছে। দমাস্ তাহার নিকট হইতে ঈপ্সিত তত্ত্ব অবগত হইল। সে তৎক্ষণাৎ আবুওবীদার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল যে, সূর্য্যোদয় সময়ে তাহার নিকট কএকটি অশ্ব পাঠান হয়। অনন্তর সে আপন ঝুলি হইতে একটি ছাগচর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা শরীর আবরণ করিল, এবং পশুর ন্যায় চারিপায়ে গমন করিয়া প্রাচীরের সমীপস্থ হইল। লোকগুলি পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীরবে যাইতে লাগিল। একটি শব্দ হইলে সে কুকুরের ন্যায় শুষ্ক একটি রুটি চর্ব্বণ করিত। এইরূপে প্রাচীরের যে অংশ দিয়া সহজে প্র-

বেশ করিতে পারে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। অনন্তর সে মৃত্তিকায় উপবেশন করিল; একজন তাহার স্কন্ধে বসিল, তাহার স্কন্ধে আর একজন, এইরূপে সাতজন বসিল। সর্ব্বোপরি যে লোকটি ছিল সে দাঁড়াইল, তাহার নীচেরটি তৎপর দাঁড়াইল, তাহার পর আর একটি, এইরূপ সর্ব্বশেষে দমাস দাঁড়াইয়া সকলের ভার বহন করিল। প্রাচীরাবলম্বনে শরীরের ভার কমাইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বোপরি ছিল, সে দুর্গ প্রাচীরের উপরিস্থ অনাবৃত স্থানে আরোহণ করিল; সেখানে একজন খৃষ্টিয়ান প্রহরীকে সুরাপানে অচেতন প্রায় দেখিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। মুসলমানগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিল। পাগরী খুলিয়া তদ্দ্বারা এক একজন করিয়া সকলকে উঠাইল, দমাস্‌ও উঠিল।

দমাস্ প্রাচীরস্থ সৈন্যগণকে নীরব থাকিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং যাইতে লাগিল, দুইজন প্রহরীকে দেখিয়া বধ করিল। অনন্তর তীর নিক্ষেপ করিবার একটি ছিদ্র মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিল যে, যোকেনা বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া একটি সুরম্য কক্ষে উপবেশন করিয়া বন্ধুগণসহ সুরাপান করিতেছেন। তাঁহার এবং সঙ্গীয়গণের আমোদ আহ্লাদ দেখিয়া দমাসের বোধ হইল যে, সমস্ত নগরী আমোদস্রোতে ভাসিতেছে।

দমাস্ দেখিল লোক বহুসংখ্যক, আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নয়। তখন সে আপন জনগণ মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া সাবধানে দুর্গের সকল স্থান পরীক্ষা করিল। অনন্তর রক্ষকগণের প্রতি হঠাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল, তোরণ উন্মুক্ত করিয়া সেতু স্থাপন করিল, অবশিষ্ট কয়জন মুসলমান আসিয়া মিলিত হইল। তখন নাগরিকগণ জাগরিত হইয়া অর্দ্ধোন্মত্ত অবস্থায় চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। মুসলমানগণ সেতুর উপর এবং অপ্রশস্ত পথে দণ্ডায়মান হইয়া সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র আল্লা আকবর্ নাদ শ্রুত হইল, দেখিতে দেখিতে খালেদ তাঁহার অশ্বারোহিগণ সহ নগরে প্রবেশ করিলেন।

খৃষ্টিয়ানগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দয়া প্রার্থনা করিল। খালেদ বলিলেন, মৃত্যু অথবা মুসলমানধর্ম্ম যাহা ইচ্ছা মনোনীত কর। যোকেনা সর্ব্বাগ্রে মুসলমান হইতে স্বীকার করিলেন। অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল; তাহাদের সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র রক্ষিত হইল। দুর্গ অধিকার করিলে সমস্ত লুণ্ঠিত হইল। লুপ্তদ্রব্য, এক পঞ্চমাংশ খলিফার জন্য রাখিয়া, সমস্ত সৈন্যগণ মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। দমাস্ এবং তাহার সাহসী সঙ্গিগণের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তাহাদের যশোগীতি আকাশমার্গ ধ্বনিত করিল। যাহারা জীবিত রহিয়াছিল, তাহাদের শরীরের ক্ষত স্থান সকল আরোগ্য ও শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত আবুওবীদা সৈন্য লইয়া স্থানান্তর গমন করিলেন না।

এস্থলে মহম্মদ এবং তাঁহার পরবর্ত্তিগ-

দের ইতিহাসে একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তাঁহাদের ভয়ানক শত্রু যদি একবার তরবারির সাহায্যেও মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইত, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মরক্ষা এবং বিস্তার করিতে তাহার চেষ্টা অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ পাইত। যোকেনাও সেইরূপ সীরিয়া দেশে মুসলমান ধর্ম্মের সমর্থনে দ্বিতীয় কালাপাহাড় রূপে (কালাপাহাড়ের সহ[illegible]র পূর্ব্বে) আবির্ভূত হইলেন। নূতন দীক্ষিত অন্যান্যের ন্যায় তিনিও আপন দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বধর্ম্মে থাকা সময় তিনি ভ্রাতৃহত্যা করেন, নূতন ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া একটি খুল্লতাত ভ্রাতাকে শত্রুহস্তে সমর্পণে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার নাম থিয়োডোরস্ ছিল। তিনি আজাজ্ নামক দুর্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ স্থান আয়ত্ত না হইলে মুসলমানসেনাপতি নিরুদ্বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন না। ঐ দুর্গে বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল, দুর্গটিও অতিশয় দৃঢ়। যোকেনা প্রস্তাব করিলেন যে, কৌশল পূর্ব্বক দুর্গ হস্তগত করিবেন। তাঁহার প্রস্তাব এই। একশত জন মুসলমান খৃষ্টিয়ানের বেশে তাঁহার অনুগমন করিবে; তিনি আশ্রয় লইতে যাইতেছেন প্রকাশ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবেন; থিয়োডোরস্ তাঁহার মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের বিষয় জ্ঞাত নহেন, সুতরাং সন্দেহ করিবেন না। আরবীয়গণ তাঁহাকে অনুসরণ করিবে। পরিশেষে নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিল এই ভাণ করিয়া নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকিবে। যোকেনা নিশীথ সময়ে দুর্গবাসিগণকে আক্রমণ এবং তোরণ উন্মুক্ত করিবেন। মুসলমানগণ এইরূপে সহজে দুর্গ অধিকার করিতে পারিবেন।

আবুওবীদা খালেদের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্মতি দিলেন। দশ জাতি হইতে একশত আরব সৈন্য প্রেরিত হইল। ক্ষিত অনুসরণ জন্য মালেক্ আল্স্তার এক সহস্র সৈন্যসহ প্রেরিত হইলেন।

মুসলমানদিগের ইতিহাস এইরূপ ষড়যন্ত্রে এবং প্রতিষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ। যোকেনার সমস্ত বিবরণ তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মুসলমানশিবিরে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রস্তাব হইবামাত্র আজাজের গবর্ণরের একজন গুপ্তচর যে মুসলমানশিবিরে ছিল, সে একটি কপোতের পক্ষে একখানি পত্র বাঁধিয়া দিয়া সকল অবস্থা থিয়োডোরস্‌কে জ্ঞাপন করিল। কেবল মালেকের সহিত প্রেরিত সহস্র যোদ্ধার কথা জানাইতে পারিল না। থিয়োডোরস্ সৈন্য সংগ্রহে ও নগর রক্ষায় অবহিত হইলেন।

পত্র পঁহুছিবার পূর্ব্বেই যোকেনা আজাজ্ নগরীর তোরণে উপস্থিত হইলে থিয়োডোরস্ তাঁহার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন জন্যইযেন সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া ভ্রাতার সমীপস্থ হইলেন। অনন্তর হঠাৎ যোকেনা এবং তাঁহার সৈন্যগণকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। থিয়োডোরস্ যোকেনাকে ধর্ম্মত্যাগ এবং বিশ্বাসঘাতকতা জন্য ভৎর্সনা করিলেন; তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন করিলেন, এবং তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড বিধান

জন্য সম্রাট্ হিরাক্লিয়সের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুচরগণকে বধ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন।

এদিকে তারিক্ আল্গাসানী নামক এক খৃষ্টিয়ান আরব আরাবেন্দানের শাসনকর্ত্তাকে সাহায্যার্থ আগমন করিবার জন্য বলিতে থিয়োডোরস্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল, সে মালেকের হস্তে পতিত হইল। তাহার উলঙ্গ তরবারি দেখিয়া ভয়ে সে সকল বিবরণ প্রকাশ করিল। লুকাস্ পাঁচশত অশ্বারোহী লইয়া সেই রজনীতে আসিবার কথা ছিল, মালেক তাঁহার সৈন্য খণ্ড খণ্ড করিবার কৌশল করিয়া লুক্কায়িত রহিলেন। অনন্তর তারিক্কে নগ্ন তরবারির সমক্ষে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গবর্ণরের পাঁচশত সৈন্য আসিতেছে এই সংবাদ দিতে পাঠাইলেন। একজন বিশ্বাসী মুসলমান সঙ্গে গেল। তাহার প্রতি এই আদেশ রহিল তারিক্ মিথ্যা ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করে। এদিকে পাঁচশত সৈন্য লুকাসের পতাকা লইয়া খৃষ্টিয়ানবেশে আজাজাভিমুখে যাইতে লাগিল।

তারিক্ তাহার সঙ্গীসহ অগ্রসর হইয়া নগরমধ্যে কোলাহল শুনিতে পাইল। থিয়োডোরস্ যোকেনা এবং তাঁহার সৈন্যগণকে আপন পুত্র লিয়নের অধীনে রাখিয়াছিলেন। আলিপোতে অবস্থিতি সময়ে লিয়ন যোকেনার তনয়ার অনুপম রূপমাধুরীতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াও এতকাল তাহাকে লাভ করিতে পারে নাই। এক্ষণে এই সময় কৃতকার্য্য হইতে পারিবে ভরসায় যোকেনার নিকট প্রস্তাব করিল বিবাহে সম্মত হইলে সে মুসলমান হইবে এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যগণকে ছাড়িয়া দিবে। যোকেনা সম্মত হইলেন। দুর্গস্থ সৈন্যগণ নিদ্রিত হইলে যোকেনা শতসৈন্যসহ তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কুপুত্র লিয়নের হস্তে থিয়োডোরস ও জীবন হারাইলেন।

এই সময়ে তারিক্ ও তাহার সঙ্গী উপস্থিত হইয়া সকল অবস্থা জ্ঞাত হইল। তাহারা দ্রুত প্রত্যাগত হইয়া মালেককে সবিস্তার সকল বিষয় বলিলে তিনি পাঁচশত সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া দুর্গ জয় সমাপন করিলেন। তিনি সমরাবসানে যোকেনাকে সাধুবাদ প্রদান করিলে তিনি মালেকের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "আল্লা এবং এই যুবককে ধন্যবাদ দিন।" অনন্তর সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া মালেক বলিলেন, "ঈশ্বর যখন কোন বিষয় অভিপ্রায় করেন তখন তিনিই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন।"

ছৈয়দ ইবিন্ আমিরকে সেনাপতি এবং যোকেনা ও তাঁহার শতসৈন্য নগর রক্ষায় নিয়োজিত রাখিয়া মালেক্ আলস্তার প্রচুর লুপ্ত এবং বহুসংখ্যক বন্দীসহ শিবিরে পঁহুছিলেন। আপন উপায়ে নগর অধিকার করিতে না পারিয়া যোকেনা নিতান্ত লজ্জিত ছিলেন, তিনি শিবিরে ফিরিয়া গেলেন না; উপযুক্ত বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক

প্রত্যাগমন করিবার অভিলাষে নগরেই রহিলেন। এই সময়ে আজাজ নগরে লুণ্ঠনকারী সহস্র মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে দুই শত ব্যক্তি আলিপো নগরে যোকেনার সহিত মুসলম্মানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের পরিবার তখনও আলিপোতে অবস্থান করিত। তিনি যেরূপ লোক পাইবার জন্য আশা করিতেছিলেন, দৈবাৎ সেইরূপ লোকই আসিয়া জুটিল। তখন তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ কৌশলানুসারে কার্য্য করিবার জন্য ঐ সমস্ত সৈন্য লইয়া আণ্টিয়ক্ নগর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ক্রমশঃ।

শ্রী—

বাঙ্গালার ইতিহাস।

(ষষ্ঠখণ্ড, ৫৩৬ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশ।

আসামের ইতিহাসলেখকগণ প্রথমোক্ত প্রবাদবাক্যকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট হেনরী ষ্ট্রাচি সাহেব ১৭৬৮ শকাব্দের হেমন্তকালে কৈলাসশৃঙ্গ, রাবণহ্রদ ও মানসসরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সেই কমনীয় প্রদেশের মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তদবলোকনে এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কারণ, তিব্বতবিধৌতকারী "যারকিউসাংপো"কে ব্রহ্মপুত্রের মূলস্রোত বলা হইয়া থাকে। এই নদ যে মানসসরোবর হইতে উদ্ভূত,তাহার কোনও প্রত্যয়োপযোগি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ১৭৯৯ শকাব্দে (২৮শে মার্চ্চ ১৮৭৭ খৃঃ অঃ) আবি ডিজোডিন্স সাহেব তিব্বতের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে যে পত্র লিখেন এবং যাহা "ফরাসি ভৌগলিক সভার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপাঠেও এই প্রবাদবাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারা যায় না। যাহা হউক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, মানসসরোবর কিংবা তাহার নিকটবর্ত্তি কোন স্থান হইতে উদ্ভূত "যারকিউসাংপো" তিব্বত দেশ সিক্ত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে হিমালয়ের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে উপনীত হইয়াছে। তথা হইতে বঙ্কিমভাবে গতি পরিবর্ত্তন করত মিসমি জাতির বাসপর্ব্বতের মধ্যে, দ্বিতীয় প্রবাদ উক্ত "কুণ্ড" হইতে প্রবাহিত লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র ও লৌহিত্য নামে প্রবাহিত হইয়াছে। আসাম প্রদেশে অসংখ্য নদ নদী ব্রহ্মপুত্রকে করদান করিতেছে। তন্মধ্যে দিবঙ্গ, দি-

তুঙ্গ ও সুবর্ণশ্রী সর্ব্বপ্রধান। নদরাজ ব্রহ্মপুত্র, বিচিত্র ও কমনীয় দৃশ্যসম্পন্ন আসামধুনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার সন্ধিস্থলে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। চিলমারির নিকট পুণ্যাপয়স্বিনী ত্রিস্রোতা ব্রহ্মপুত্রকে করদান করিতেছে। দেওয়ানগঞ্জের নিকট ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া, ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভৈরববাজারের কিঞ্চিৎ উত্তরে ঘোড়াউত্রার সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদ অপভ্রংশে মেঘনা নাম ধারণ করিয়াছে। দেওয়ানগঞ্জের নিকট হইতে "যিনাই" বা "যমুনা" নামক শাখা দক্ষিণবাহিনী হইয়া করতোয়া (১) সম্মিলিত ছুরাসাগরের সঙ্গমলাভ করত গোয়ালন্দের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। অধুনা ইহা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোত।

সুবর্ণগ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদ প্রবাহিত হইয়া শীতললক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এক সময়ে এই ক্ষুদ্র নদই মূল ব্রহ্মপুত্র ছিল। জগদ্বিখ্যাত সুবর্ণগ্রাম, সম্মিলিত ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের স্রোতপ্রবাহিত কর্দ্দমগঠিত একটি দ্বীপমাত্র, কিন্তু অধুনা ইহাকে কোন মতেই দ্বীপ বলা যাইতে পারে না।

যারকিউসাংপোর উৎপত্তি স্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় স্বনামখ্যাত ব্রহ্মপুত্র ১৬২ মাইল মাত্র।

মেঘনা—মেঘসদৃশ তরঙ্গনাদ বলিয়া বোধ হয় এই নদ মেঘনাদ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মেঘনা তাহার অপভ্রংশ।

মিতাই লেইপাকর (২) উত্তর পার্শ্বস্থিত বড়াইল পর্ব্বত হইতে বড়বক্র নদী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অত্যন্ত বাঁকা বলিয়া এই নদী বড়বক্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বড়াক তাহার অপভ্রংশ। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই নদী কখন পূর্ব্ব, কখন দক্ষিণ, কখন উত্তর ও কখন পশ্চিমবাহিনী হইয়া, বহুসংখ্যক গিরিনন্দিনীর করগ্রহণ করত কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দেশপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে " সাত শত নদ নদী " বড়বক্রকে করপ্রদান করিতেছে। কাছাড় রাজধানী শিলাচল নগরের কিঞ্চিন্নিম্নে ব্রহ্মা নদী বড়চক্র হইতে বহির্গত হইয়া, শ্রীহট্ট, ছাতক, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি নগরগুলির প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেই নদীতেই পতিত হইয়াছে। বড়বক্র ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ঘোড়া-উত্রা নদীর সহিত মিলিত হইয়া

(১) প্রবাদ অনুসারে—পার্ব্বতীর পরিণয়কালে গিরিরাজ, মহাদেবের করে যে তোয় অর্পণ করেন, তাহাই প্রবাহিত হইয়া "করতোয়া" আখ্যা ধারণ করিয়াছে।

(২) চৈতন্যশিষ্যদিগের দ্বারা মিতাই লেইপাক "মণিপুর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা ইহাকে " জালমণিপুর " বলিয়া থাকি। ইহার জাতীয় ও দেশীয় নাম মিতাই লেইপাক। (শ্রীহট্টের তাম্রকলক ও কাছাড়রাজবংশাবলী দেখ। ভারতী, ষষ্ঠভাগ, ৬ ও ৭ পৃষ্ঠা।)

ঘোড়াউত্রা নাম ধারণ করিয়াছে। তথা হইতে বক্রভাবে প্রবাহিত হইয়া ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলার সন্ধিস্থলে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদ অপভ্রংশে মেঘনা আখ্যা ধারণ করিয়াছে। সেই স্থান হইতে প্রায় দক্ষিণবাহিনী হইয়া ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার সাধারণ সীমা রক্ষা করত সুবর্ণগ্রামের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী চন্দ্রদ্বীপের * কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ত্রিপুরাপর্ব্বত-উদ্ভূত গৌমতী, ডাকাতীয়া এবং যমুনার শাখা,—শীতললক্ষীসম্মিলিত-ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানটি "ঝাপটার মোহানা" নামে খ্যাত। ঝাপটার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেঘনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত গঙ্গা ও মেঘনা প্রাচীন লক্ষ্মীকূল বর্ত্তমান লক্ষ্মীপুরের নিম্নে তিনভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্র গমন করিয়াছে। পশ্চিমস্রোত তেতুলিয়ার নদী, বাখরগঞ্জ ও দক্ষিণ সাহবাজপুর মধ্যে অবস্থিত। মধ্যস্রোত সাহবাজপুরের নদী সাহবাজপুর ও হাতীয়া দ্বীপের মধ্যে। পূর্ব্বস্রোত-মেঘনা, ভুলুয়া ও হাতীয়া দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। উৎপত্তিস্থানে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা যেরূপ স্বতন্ত্র, বিবেচনা করিলে সাগরসঙ্গমেও তাহাই বটে। মেঘনা পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত পর্ব্বত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকেই সাগর সঙ্গম লাভ করিয়াছে। মধ্যস্রোত বা সাহবাজপুরের নদীকে আমরা ব্রহ্মপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া পশ্চিমপার্শ্ব দিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে; তেতুলিয়ার নদীই গঙ্গা, ইহার সম্মুখে অতলস্পর্শ বা কবিকল্পিত, গঙ্গার পাতাল প্রবেশের দ্বার অতএব তেতুলীয়া মোহানাই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের "গঙ্গাসাগরসঙ্গম" মহাতীর্থ।

উৎপত্তিস্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত মেঘনার দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল।

ফণী—ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সাধারণ সীমা রক্ষা করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছে।

কর্ণফুলী—চট্টগ্রাম প্রদেশের মধ্য দিয়া সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছে।

নাভী নদী—চট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বাঙ্গালা ও রাক্ষিয়াং প্রদেশের সাধারণ সীমা রক্ষা করিতেছে।

শাখা নদী—বাঙ্গালার প্রধান নদ নদীর মধ্যে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা গুলিই সমধিক বৃহৎ।

শাখাগঙ্গা—পাশ্চাত্য লেখকগণ এই নদীকে হুগলী আখ্যা দান করিয়াছেন। দেশীয় মানবগণ ইহাকে ভাগীরথী বলিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় "ভাগীরথী" নামকরণে কিঞ্চিৎ চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে।(৩)ভাগীরথী গঙ্গার অন্য নাম,(৪)

* বর্ত্তমান রামপাল।

(৩) কৃত্তিবাস বলিতেছেন ;—

কাণ্ডরের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া॥
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়।

সুতরাং পদ্মাই প্রকৃত ভাগীরথী। যে সকল গল্প রচনা করিয়া শাখাগঙ্গাকে ভাগীরথী আখ্যা দান করা হইয়াছে, তাহা অভিনব ও অশ্রদ্ধেয়। এই নামকরণের মূলে যদি কোনও রূপ চাতুর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে পরিলক্ষিত না হইত, তাহা হইলে আমরা নদীর নাম

ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাতে গোড়ায় ॥
যোড়হস্ত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্ব দিকে যাইতে আমার নহে পথ ॥
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথের সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী ॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে ॥
একবার গেল গঙ্গা ভৈরববাহিনী।
আর বার ফিরিলেন সাগরগামিনী ॥
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ ॥
শঙ্খধ্বনি করি ঘাটে যেবা স্নান করে।
অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে ॥
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।
নিমেষেতে আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর ॥
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলিয়া ঘাটের হৈল নাম ॥
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥
চলিলেন গঙ্গামাতা করি বড় ত্বরা।
চক্ষুর নিমেষে গেল নাম মেড়াতলা।
মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ।
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ ॥
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম ॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্তগ্রাম ॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ ॥
আকনা মহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।
খিহরেদের ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ।
কত দূর তোমার দেশের আছে পথ ॥
ভ্রমিতেছি বহুকাল তোমার সংহতি।
কোথা আছে তোমার সাগর সুসন্ততি ॥
ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব দক্ষিণ দিক তার মধ্যস্থানে ॥
সেই খানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেই খানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি ॥
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে ॥
আছিল সাগরবংশ ভস্মরাশি হৈয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া ॥
হস্ত তুলি গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান।
এই দেখ তব বংশ স্বর্গবাসে যান ॥
এক জন রহিল জলের অধিকারী।
আর সব চতুর্ভুজে গেল স্বর্গপুরী ॥
বংশ মুক্তি হইল দেখিয়া ভগীরথে।
গঙ্গারে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে ॥
গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজার নন্দন।
সাগর সঙ্গমে আমি করিগে মিলন ॥

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড)

লইয়া কোনও তর্ক উপস্থিত করিতাম না। আদৌ ভগীরথের সময়ে (বৈদিক কালে) সাগর-সঙ্গম জন্য গঙ্গাকে ছাপঘাটীর মোহনা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল কিনা ইহাই সন্দিগ্ধ বিষয়। দ্বিতীয়তঃ যদি তর্ক স্থলে ডাক্তর ওল্‌ডহাম সাহেবের বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় অর্থাৎ " গঙ্গার প্রধান স্রোতটি ক্রমে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে।" তাহা হইলেও চাতুর্য্য-কলঙ্ক প্রক্ষালন করা যাইতে পারে না। কারণ কৃত্তিবাস বিবৃত গল্প সৃষ্টিকালে যদি শাখাগঙ্গা মূলগঙ্গা হইতে বৃহৎ থাকিত, তাহা হইলে "পদ্মমুনির" গল্পও মূলগঙ্গার "পদ্মা" প্রতি "শাপবাণী" সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? অতএব আমরা এই নদীকে গঙ্গা না বলিয়া শাখা গঙ্গা কিংবা শাখাভাগীরথী বলিব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে "হুগলী" আখ্যা দ্বারা আখ্যাত করিয়াছেন। তিন শতাব্দীর প্রাচীন মানচিত্রেও এই নদী গঙ্গার শাখা রূপেই চিত্রিত।

এই নদী মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে ছাপঘাটীর মোহনা নামক স্থানে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়াছে। তথা হইতে

এক্ষণ আমরা মূল রামায়ণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

*   *   *   *

ভগীরথোহি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥
প্রায়াদগ্রে মহারাজস্তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্ব্বে দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥
গন্ধর্ব্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ।
সর্পাশ্চাপ্সরসো রাম! ভগীরথরথানুগাঃ ॥
গঙ্গামন্বগমন্ প্রীতাঃ সর্ব্বে জলচরাশ্চ যে।
যতোভগীরথোরাজা ততোগঙ্গা যশস্বিনী ॥
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
ততো হি যজমানস্য জহ্নোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥
গঙ্গাং সংপ্লাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ।
তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহ্নুশ্চ রাঘব।
অপিবত্তু জলং সর্ব্বং গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতম্।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ সুবিস্মিতাঃ ॥
পূজয়ন্তি মহাত্মানং জহ্নুং পুরুষসত্তমম্।
গঙ্গাং চাপি নয়ন্তিস্ম দুহিতৃত্বে মহাত্মনঃ ॥
ততস্তুষ্টো মহাতেজাঃ শ্রোত্রাভ্যামসৃজৎপ্রভুঃ।
তস্মাজ্জহ্নুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ ॥
জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভগীরথরথানুগা।
সাগরং চাপি সংপ্রাপ্তা সা সরিৎপ্রবরা তদা ॥
রসাতলমুপাগচ্ছৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য কর্ম্মণঃ।
ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যত্নতঃ ॥
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্ গতচেতনঃ।
অথ তদ্ভস্মনাং রাশিং গঙ্গাসলিলমুত্তমম্ ॥
প্লাবয়ৎ পূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘূত্তম!

(রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪৩ সর্গ।)

শাখাগঙ্গাকে মূলগঙ্গা বা ভাগীরথী নির্ণয় করিবার জন্য কৃত্তিবাস যে সকল গল্প বর্ণনা করিয়াছেন, মূল রামায়ণে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

(৪) ইয়ঞ্চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি।
ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাথ লোকে স্থাস্যতি সা সদা ॥৫

(রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪৪ সর্গ।)

মুরশিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া, পশ্চিমে বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া ও মেদিনীপুর জেলা ; পূর্ব্বে নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জেলা রাখিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০মাইল। শাখাগঙ্গার তীরে কতকগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও নগর বিরাজিত রহিয়াছে। যথাস্থানে নগরের উল্লেখ করা যাইবে। এই সকল নগরের মধ্যে আমাদের বিবেচনায় কাটোয়াই সর্ব্বপ্রাচীন।

শাখাগঙ্গার কতকগুলি করদ নদী আছে। তন্মধ্যে দ্বারকা, অজয়, দামোদর, দ্বারুকেশ্বর, রূপনারায়ণ ও কংসাবতীই প্রধান।

জলগঙ্গা ও মাতাভাঙ্গা বা চূর্ণী নামক দুইটি শাখা গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া শাখা গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

জলঙ্গী হইতে ভৈরবনদী বহির্গত হইয়া মাতাভাঙ্গায় পড়িয়াছে।

মাতাভাঙ্গা হইতে ইছামতী, ভৈরব, কপোতাক্ষ, চিত্রা, নবগঙ্গা ও কুমার প্রভৃতি ছয়টি ক্ষুদ্র নদী বহির্গত হইয়াছে।

গড়ই নদী—কুষ্টিয়ার নিকট ডাকদহের মোহনা নামক স্থানে এই নদী গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়াছে। ব্রোকের মানচিত্রেও এই নদী গঙ্গার একটি প্রধানা শাখারূপে চিত্রিত। ফরিদপুরের পশ্চিম প্রান্তে এই নদী চন্দনা নদীর সহিত মিলিত হইয়া মধুমতী নাম ধারণ করিয়াছে। তৎপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক কয়েকটি ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অবশেষে বালেশ্বর নাম ধারণ পূর্ব্বক হরিণঘাটা নামক মোহনা দিয়া সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রাচীন ভূষণা ইহার তীরে অবস্থিত।

আরিয়ল খাঁ নদী—ফরিদপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে এই নদী গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়াছে। ব্রোকের মানচিত্রে এই নদীই গঙ্গার প্রধান স্রোত নির্ণীত হইয়াছে। এই নদী তেঁতুলীয়ার মোহনায় সাগরে পতিত হইতেছে। আরিয়ল খাঁর একটি শাখা প্রথমতঃ “বরিশালের নদী ,, তৎপর “ বিষখালী ” নামে হরিণ ঘাটার মোহনায় প্রবাহিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গঙ্গার আরও কতকগুলি শাখা প্রশাখা রহিয়াছে। সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা প্রবাহিত কর্দ্দমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্বীপ গঠিত হইয়া অধিকাংশ শাখা-প্রশাখা নদী নির্ম্মিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র নদে প্রবাহিত নদী সমূহের মধ্যে ত্রিস্রোতা বা তিস্তা, করতোয়া, অত্রী ও দর্লাই বিখ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোত যমুনাহইতে ধলেশ্বরী নামক শাখা বহির্গত হইয়া ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া মেঘনায় পতিত হইয়াছে। বৃদ্ধা গঙ্গা ধলেশ্বরীর একটি শাখা মাত্র।

তিতাস নামক একটি শাখা মেঘনা হইতে বহির্গত হইয়া, ত্রিপুরা পর্ব্বত জাত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর কর গ্রহণ করত সরাইল পরগণা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মেঘনায় পতিত হইয়াছে।

বিল—বাঙ্গলায় কোনও হ্রদ নাই। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিল আছে। বঙ্গ

বিধৌতকারী স্রোতস্বতী সমুহের গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা এই সকল বিলের সৃষ্টি হইয়াছে।

সমুদ্র—বাঙ্গালার দক্ষিণ পার্শ্বে সমুদ্র। ইহার নাম বঙ্গীয় অখাত বা বঙ্গোপসাগর। চীন দেশীয় প্রাচীন ভারতমানচিত্রে ইহাকে "পাঙ্গলার* সমুদ্র" ও প্রাচীন পর্টুগিজগণকৃত মানচিত্রে "ডি গোল্‌ফ বান বাঙ্গালি" লিখিত হইয়াছে। ক্রমশঃ।

শ্রী— সিংহ চ

* বলা বাহুল্য যে "পাঙ্কালয়" বা[illegible]মস্ত শব্দের অপভ্রংশ।

শোকাশ্রু।

এই কয়দিনের মধ্যে পৃথিবী হইতে তিনটি ভাস্বর নক্ষত্র অন্তর্হিত হইলেন। লংফেলো, ডারউইন্ ও ইমারসন্, ইহাঁরা তিন জনেই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত। ইহাঁদের মৃত্যুতে সমস্ত সভ্যজগৎ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। আমরাও এই তিন মহাত্মার পাদতলে উপবেশন করতঃ অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছি। সুতরাং আমাদেরও উচিত যে, আমরাও আজি কৃতজ্ঞহৃদয়ে এই তিন মহাত্মার চরণে অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। আশা করি, আমাদের পাঠকগণও এই পুষ্পাঞ্জলিতে যোগদান করিবেন।

লংফেলো, ইমারসন্ ও ডারউইন্ ইহাঁরা তিন জনে তিন পথের পথিক। লংফেলো পদ্যলেখক কবি, ইমারসন্ গদ্যলেখক কবি ও ডারউইন্ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু ইহাঁরা তিন জনেই চরিত্রসম্বন্ধে সমান পূজার্হ। তিন জনেই নিরহঙ্কার, বিনয়ী, নির্লোভ, শান্ত, অমায়িক ও উদারচিত্ত। পরিবার মধ্যে স্নেহ, প্রণয় ও সারল্য, বন্ধুদিগের মধ্যে সদালাপ ও আদরসম্ভাষণ, বৈদেশিকদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাহিত্য, প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য সামাজিক বলিয়া পরিচিত হয়, ইহাঁদের তিন জনেরই সে সমস্ত গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। এবং এই জন্য আজি ইহাঁরা তিন জনেই দেশীয় ও বিদেশীয়দের নিকট হইতে অজস্রধারায় পূজা ও সম্মাননা প্রাপ্ত হইতেছেন। যাঁহারা মহানুভব ও সদাশয়, তাঁহাদের জীবনে বর্ণনযোগ্য ঘটনা প্রায় কিছুই সংঘটিত হয় না। তাঁহাদের শোক, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, জয় পরাজয় সকলই তাঁহারা নিজ নিজ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সমাহিত করেন। বাহিরের লোকেরা তাঁহাদের কিছুই জানিতে পারে না। লংফেলো, ডারউইন্ ও ইমারসন্ ইহাঁদের তিনজনের জীবনেও কোন অদ্ভুত বা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে নাই। এই তিন জনের জীবন গভীর হ্রদের ন্যায় জগতের এক পার্শ্বে লুক্কায়িত ছিল। ঐ ঐ হ্রদ হইতে যে

সমস্ত সুধাময়ী তটিনী নিঃসৃত হইয়াছে, কেবল তাহাদের দ্বারাই হ্রদগণের মাধুর্য্য, শৈত্য প্রভৃতি অনুভূত হয়। ডারউইন্ বিগল্ নামক জাহাজে নানা দেশ পর্য্যটন্ করিয়াছিলেন, লংফেলো ও ইমারসন্ ইংলণ্ডে আসিয়া সকলের নিকট হইতে আদর ও সম্মাননা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন এই তিন জনের জীবনে বর্ণনার্হ কোন ঘটনাই ঘটে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অতএব আমরা ইহাঁদের জীবনাংশ পরিত্যাগ করিয়া, নিম্নে ইহাঁদের প্রতিভা, রুচি, জ্ঞান প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব।

প্রথমে ইমারসন্। ইমারসন্ কার্লাইলের শিষ্য। সুতরাং কার্লাইলের দোষ গুণ ইমারসনেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঘৃণা কার্লাইলের নীতির বীজমন্ত্র। পাপের প্রতি ঘৃণা, ভণ্ডামির প্রতি ঘৃণা, নীচতার প্রতি ঘৃণা, লর্ডের প্রতি ঘৃণা, কমন্সের প্রতি ঘৃণা, পণ্ডিতের প্রতি ঘৃণা, মূর্খের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি কার্লাইলের পুস্তকরাশির মূলমন্ত্র। কার্লাইলের একখানি পুস্তকের নাম "বিশুদ্ধীকৃত দর্জি।" অর্থাৎ কার্লাইল বলিতেছেন "তোমরা সকলে কেহ বা ধর্ম্মের পিরাণ, কেহ বা বিদ্যার পিরাণ, কেহ বা হিতৈষিতার পিরাণ পরিয়া নিজ নিজ দোষ, কুরূপ প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিয়াছ। আমি তোমাদের ঐ সমস্ত আবরণ-পটু পিরাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব এবং সকলকে দেখাইব যে, তোমাদের পিরাণ খুলিয়া ফেলিলে তোমাদের অঙ্গে অসংখ্য ক্ষতস্থল দৃষ্ট হয়, দেখাইব যে পিরাণ খুলিয়া ফেলিলেই তোমাদের অঙ্গের বীভৎস গঠন, ঘৃণাজনক দুর্গন্ধ প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে। পিরাণের বলে তোমরা সমাজে এত দিন সাধু সদাশয় বলিয়া পরিচিত হইতেছিলে, আজি আমি তোমাদের পিরাণ খুলিয়া ফেলিব এবং তাহা হইলেই লোকে দেখিবে যে তোমরা কপট, ভণ্ড ও অধার্ম্মিক।"

ইমারসনেরও ঐ উদ্দেশ্য। মনুষ্যের মধ্যে যে সমস্ত কপটতার আবরণ আছে, সে গুলি উন্মোচন করাই কার্লাইল ও ইমারসনের জীবনের ব্রত ছিল। কিন্তু কার্লাইল ঘৃণাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কার্লাইল যখন ঘৃণা করেন, তখন তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে, এবং নাসারন্ধ্র দিয়া উষ্ণ শ্বাস নিঃসৃত হয়। সে ঘৃণার তীব্র জ্বালায় তোমার অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। কার্লাইলের প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক বিশেষণে সেই ঘৃণার তীব্র রশ্মি আসিয়া তোমার হৃদয়কে দগ্ধ ও অবসন্ন করে। কার্লাইলের জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কার্লাইলের মনেও ঐ ঘৃণাশক্তি অতীব প্রবল ছিল। বাস্তবিক মনে বিজাতীয় ঘৃণা না থাকিলে মুখে কার্লাইলের ন্যায় প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ইমারসনের মনে ঘৃণার ভাব প্রবল ছিল না। ইমারসনের মন অপেক্ষাকৃত অনেক কোমল। ইমারসনের মনে স্নেহ, ভক্তি, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতি কোমল ভাবের উৎস বহিত। এই কোমল অন্তঃকরণ লইয়া কে ঘৃণা করিতে পারে? সুতরাং

ইমারসন্ মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ সম্বন্ধে তাদৃশ ফললাভ করিতে পারেন নাই।

আর এক বিষয় কার্লাইল ও ইমারসন্ উভয়েই সমান অপরাধী। ইহাঁদের দুই-জনেরই ভাবগুলি কথাচাপা পড়িয়া যায়। যেমন রাশি রাশি তৃণ বা শুষ্কপত্রের মধ্যে দুই একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না সেইরূপ কার্লাইল ও ইমার্সনে রাশি রাশি কথা ও বর্ণনাচ্ছটার মধ্যে ভাবগুলি অতি অস্পষ্টভাবে প্রতিভাসিত হয়। তবে কার্লাইলের ভাবগুলি অতীব প্রদীপ্ত বলিয়া পত্ররাশির মধ্যেও তাহাদের উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ইমার্সনের ভাবগুলি অনেক সময়ে কথা চাপা পড়িয়া আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন কার্লাইল যেমন প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক বিশেষণে নিজ কবিত্ব নিজ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন, ইমার্সন্ সেরূপ পারেন না। কার্লাইল পাঠে সহজেই শ্রান্তি বোধ হয়। কার্লাইলের অভ্রভেদী কল্পনার অনুসরণ করিতে করিতে আমরা সহজেই শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু ইমার্সন্ পাঠে অনেক সময়ে বিরক্তি জন্মে। মনে হয়, এই এক কথা লইয়া এত মারামারি কেন?

কিন্তু এক বিষয়ে কার্লাইল ও ইমার্সনের নিকট সংসার দুশ্ছেদ্য ঋণ-পাশে আবদ্ধ। অনেক সময়ে আমরা সংসারের নীচতা ও অসারতা দেখিয়া সংসারের উপর বিরক্ত হই। এই সময়ে উচ্চ উচ্চ ভাব ও উচ্চ উচ্চ আদর্শের প্রতি মন স্বভাবতঃই ধাবিত হয়। কার্লাইল ও ইমার্সন আমাদের জন্য রাশি রাশি উচ্চ ভাব ও আদর্শ তাঁহাদের পুস্তকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সমস্ত উচ্চভাব ও আদর্শের মহত্ব দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে আমরা সেই সমস্ত উচ্চ আদর্শের দিকে তাকাইয়া থাকি এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য আমরা সংসারের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, অসারতা প্রভৃতি ভুলিয়া যাই। মনে হয়, যেন কোন দেবতা আমাদিগকে স্বর্গীয় বিমানে অধিরূঢ় করাইয়া স্বর্গের বিমল শোভা আমাদিগকে দেখাইতেছেন।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা আমাদের ইমার্সনের সমালোচনার উপসংহার করিব। ইমার্সনের ভাষা মোহকরী। যেমন নিপুণ চিত্রকরের লিপিকৌশলে দূরস্থ বস্তু নিকটস্থ বলিয়া এবং অতীত বস্তু বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ ইমার্সনের ভাষার গুণে অনেক কাল্পনিক কথাও প্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

লংফেলোর কবিতা চন্দ্ররশ্মির ন্যায় মধুর, কোমল ও স্নিগ্ধ। লংফেলো হৃদয়ের মধুর ও কোমল ভাবগুলি লইয়া অতি মধুর ও কোমলভাবে তাহাদের বর্ণনা শেষ করেন। গভীর তত্ত্ব, গভীর ভাব বা গভীর উপদেশ লংফেলোতে পাওয়া যায় না। এবং যদিও লংফেলো স্থলে স্থলে হৃদয়বিদারক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বর্ণনার মাধুর্য্যে বিষয়গুলি আমাদের নিকট হৃদয়বিদারক বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে কোন প্রকারের কলরব বা কোলাহল আছে সেখানে লংফেলো

প্রবেশ করেন না। যেমন বায়ুর মধ্যে মলয়ানিল, ফুলের মধ্যে কামিনীফুল, বাদ্যের মধ্যে বংশীরব, এবং গন্ধের মধ্যে সুবাসিত গোলাপজল, সেইরূপ কবির মধ্যে লংফেলো। আমরা কিয়দ্দিন পূর্ব্বে লংফেলোর "মৃত্যু" নামক একটা কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলাম। অদ্য, এই উপলক্ষে পাঠকগণকে ঐ কবিতাটি উপহার প্রদান করিলাম। কবিতার ভাবটি এইরূপ। বৃদ্ধগণ পক্ক শস্য স্বরূপ। মৃত্যু তাহাদিগকে কর্ত্তন করিয়া নিজের নিকট রাখে। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ কোমল পুষ্পস্বরূপ। যখন মৃত্যু তাহাদিগকে কর্ত্তন করে, তখন সে তাহাদিগকে নিজের নিকট না রাখিয়া পরমেশ্বরের কাছে লইয়া যায়। অনুবাদে কবিতার মাধুর্য্য থাকে না। তথাপি আশা করি যে, এই প্রবন্ধে লংফেলোর কবিতার সামান্য অনুবাদও পাঠকের বিরক্তিকর হইবে না।

"মৃত্যু

(১)

মৃত্যু নামে ছেত্তা এক অতি নিদারুণ,
তীক্ষ্ণ কর্ত্তরিকা লয়ে,
(মৃত্যু) কাটে পক্ক শস্যচয়ে,
(কিন্তু) তার সনে আরও কাটে কোমল প্রসূন।

(২)

"বলে মৃত্যু 'পাব না কি কিছুই সুন্দর,
'(শুধু) পাকা শস্য আমার সম্বল,
'পুষ্প যত পূর্ণ-পরিমল,
'অন্য হস্তে তুলে দেই ক্ষুভিত-অন্তর।'

(৩)

"পুষ্প পানে চাহে মৃত্যু সজল-নয়নে;
চুম্বে তাদের পাপড়ি মলিন,
(আর) স্বর্গপ্রভু যথায় আসীন
লয় তথা পুষ্পগুলি পরম যতনে।

(৪)

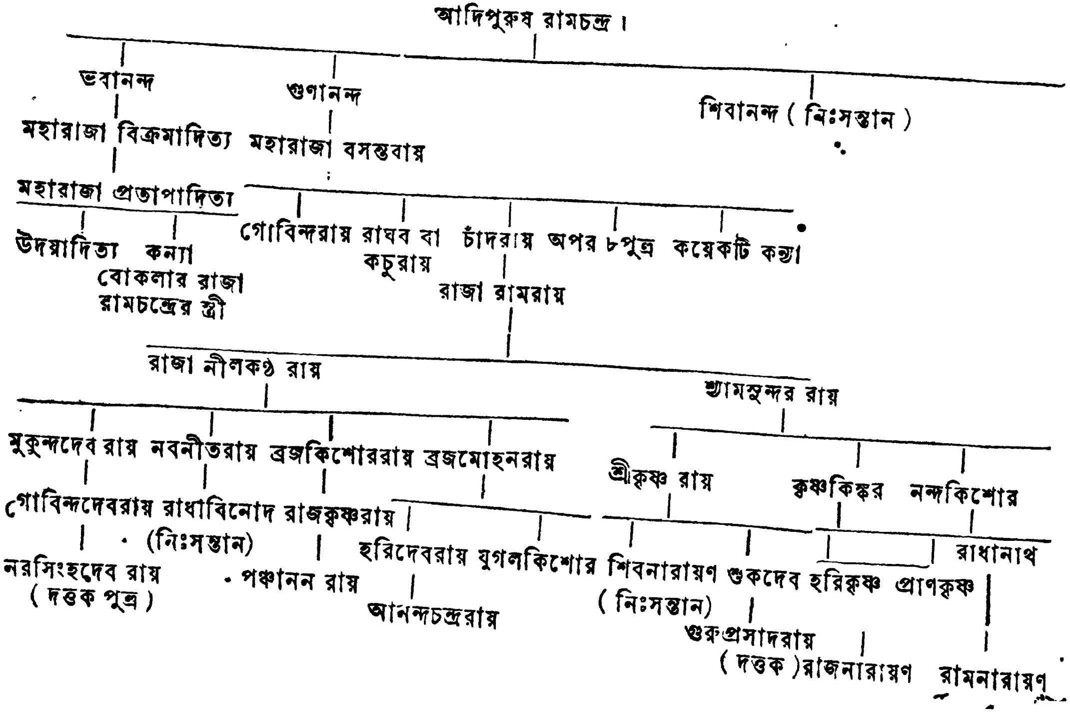
"নৃশংসের ভাবে নয়, নয় ক্রুদ্ধভাবে,
এসেছিল ছেত্তা সেই দিন;
লয়ে গেল কুসুম নবীন,
যেন কোন দেবদূত দেবের প্রভাবে।"

আমরা ডারউইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও তাঁহার প্রতিভা প্রভৃতির সমালোচনা আগামী বারে প্রকাশ করিব। শ্রীনীঃ

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক।

(ষষ্ঠ খণ্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠার পর।)

প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত লিখিবার পূর্ব্বে আমরা এই বংশীয়দিগের একটি কুর্চিনামা নিম্নে দিতেছি।



১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সৈনাম খাঁ মোগল সম্রাটের অধীন গৌড়ের নবাব হন। ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ পর্য্যন্ত দিল্লীর জনৈক সেনাপতি বাঙ্গালার অনেকগুলি স্থান জয় করেন; এবং প্রতাপাদিত্যের চারিটি পরগণা জয় করিয়া চাঁচড়ার রাজার পূর্ব্বপুরুষকে প্রদান করেন। ১৬। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে যাইয়া যশোহরের জমিদারির সনন্দ লইয়া আসেন, কতিপয় বৎসর রাজত্বের পর বিদ্রোহী হন। বাঙ্গালাতে কেহ বিদ্রোহী হইলে তাহার তত্ত্ব দিল্লীতে পৌছন, এবং তৎপর তাহার দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ, ইহাতে অন্ততঃ ৫ বৎসর গত হইবার সম্ভব। অন্ততঃ তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজা হইয়া থাকিবেন। অতএব যদি ধরা যায় যে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা হইয়াছিলেন; তবে বলিতে হইবে অনুমান ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হইয়া থাকিবে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে দাউদের জীবিত কালে গৌড় নগরেই প্রতাপাদিত্যের জন্ম হইয়াছিল।

প্রবাদ আছে যে প্রতাপাদিত্যের জন্মমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছিলেন যে, কুমার সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইবেন; কিন্তু তাঁহার কালে পিতৃদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা আছে। পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ হইল, এবং দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম কালেই তিনি সংস্কৃত আরবী, পারসী ও বাঙ্গালা ভাষাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। কোন কোন ইংরাজ লিথক ৺রাম রাম বসুর এ কথাগুলি কল্পিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আমরা অগ্রাহ্য করিবার কিছুই দেখি না। প্রসিদ্ধ বহু লোকের জীবনী দেখাইয়া এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা যাইতে পারে। আমরা অনর্থক অনেকের নাম করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিব না। সংশয়কারীদিগকে এই মাত্র বলিব যে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের স্বরচিত জীবনীটিতে তাঁহার শৈশব শিক্ষার বিবরণটি পাঠ করিলে প্রতাপাদিত্যের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিবে না। গ্রন্থপাঠদ্বারা যে সকল বিদ্যা জানা যায়, তদ্ব্যতীত প্রতাপাদিত্য ব্যায়াম, অস্ত্রচালন, সংগীত প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইলেন। প্রথমে তাঁহার চরিত্রটিও বিদ্যানের অনুরূপ হইয়াছিল। তীর চালন সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। একদা কয়েকটি চীল উড়িতেছিল; প্রতাপাদিত্য তন্মধ্যে একটিকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যে শরক্ষেপ করিলেন। চীলটি শরবিদ্ধ হইয়া তাঁহার পিতার সম্মুখে পতিত হইল। অনুসন্ধান পূর্ব্বক চীলহন্তার পরিচয় পাইয়া বিক্রমাদিত্য সুখীও হইলেন, আবার ভীতও হইলেন। সন্তান কৃতী বা বিদ্বান্ হইলে পিতা মাতার আনন্দের সীমা থাকে না; সুতরাং প্রতাপাদিত্যকে ধনুর্বিদ্যা বিশারদ্ দেখিয়া বিক্রমাদিত্য সুখী হইলেন; কিন্তু জ্যোতিষী গণনার কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। বিক্রমাদিত্য নির্জ্জনে ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, পুত্র অতি দুর্জ্জন্ হইতেছে, ইহার

দ্বারা আমার না হউক তোমার নিশ্চয়ই কোন অনিষ্ট ঘটিবে; অতএব ইহাকে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। বসন্ত রায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন; তিনি জ্যেষ্ঠের এই অসঙ্গত প্রস্তাবে অত্যন্ত দুঃখিত ও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে এই অবৈধ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন।

এইরূপে কতিপয় বর্ষ গত হইল; পুত্রের ভাবগতি সূক্ষ্মরূপে লক্ষ্য করিয়া বিক্রমাদিত্য ভ্রাতাকে পুনর্ব্বার সাবধান করিলেন। কিন্তু স্নেহবশতঃ বসন্তরায় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। প্রতাপাদিত্যের বিনাশে মহাত্মা বসন্ত রায় যখন কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না, তখন পুত্রকে স্থানান্তর করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভ্রাতার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক প্রতাপাদিত্যকে বাদসাহের নিকট আপনাদের ভূসম্পত্তির দরবার করিবার জন্য দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। এবিষয়ে যদিও বসন্ত রায়ের সম্পূর্ণ অসম্মতি ছিল, তথাপি প্রতাপাদিত্য বিবেচনা করিলেন, বসন্ত রায়ের পরামর্শেই তাঁহার এই নির্ব্বাসন হইল এবং মনে মনে তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন খুল্লতাতকে সত্বরই ইহার প্রতিফল দিবেন।

দিল্লীতে পৌঁছিয়াই তথায় আপনাদের যে সকল উকিল ও আমলা ছিল, তাহাদিগকে কোন না কোন ব্যপদেশে বিদায় করিলেন। কৌশল করিয়া * বাদসাহের নিকট পরিচিত হইলেন, এবং আমির ওমরাওদিগেরও প্রিয়পাত্র হইলেন। কিস্তিমত যশোহর হইতে দিল্লীর রাজস্ব প্রেরিত হইত; কিন্তু তাহার এক কপর্দ্দকও বাদসাহের সরকারে প্রদান করিতেন না। এইরূপে ৫।৬ বৎসর একবারে রাজস্ব বন্ধ করাতে বাদশাহের নিকট তত্ত্ব গেল যে যশোহরের রাজা বিক্রমাদিত্য বিদ্রোহী হইয়াছেন। এইরূপ জনরব প্রতাপাদিত্যের কৌশলেই প্রচারিত হইল; এবং আরও রাষ্ট হইল যে বিক্রমাদিত্য স্বয়ং কিছুই করেন না। বসন্তরায়ের হস্তেই সমস্ত ভার; এবং তিনিই দুষ্টামি করিয়া রাজস্ব বন্ধ করিয়াছেন; এবং বঙ্গদেশে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। বাদশাহ জনৈক সেনাপতিকে বিক্রমাদিত্যের দমনের নিমিত্ত যশোহরে প্রেরণ করিতেছিলেন। তখন প্রতাপাদিত্য আবেদন করিলেন যে, যদি তাঁহাকে যশোহরের রাজত্ব অর্পিত হয়, তবে তিনি যেরূপে হউক ৫।৬ বৎসরের বাকি রাজস্ব প্রদান করিবেন; এবং সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের বশংবদ হইয়া বঙ্গদেশ শাসন করিবেন। আমির ওমরাওদিগের সাহায্যে প্রতাপাদিত্য বাদশাই পাঞ্জা ও রাজ্যের সনন্দ পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সঞ্চিত অর্থ হইতে বাকি রাজস্ব প্রদান করিলেন। প্রতাপাদিত্যের প্রতি সম্রাট্ পূর্ব্বেই সদয় হইয়াছিলেন; সংপ্রতি বাকি রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়াতে মহাসন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ অর্দ্ধেক রাজস্ব প্রত্যর্পণ করিলেন।

* এই কৌশলটির কথা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

প্রতাপাদিত্য সিদ্ধকাম হইয়া বহুল সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। যশোহরে পৌঁছিয়া গৃহে গমন করিলেন না। নগরময় ও দেশময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, বিক্রমাদিত্য রাজ্যচ্যুত ও তিনি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। এদিকে সৈন্য দ্বারা রাজকোষ প্রভৃতি হস্তগত করিলেন। পুত্রের দুরাচারিতায় মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভগ্নহৃদয় হইলেন; কিন্তু মহাত্মা বসন্ত রায়ের মনে তখনও কোন বিকার জন্মে নাই। তিনি সস্নেহে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে পুরপ্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। বসন্ত রায়ের সৌজন্য দেখিয়া প্রতাপাদিত্য যার 'পর নাই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসন্তরায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া এবং শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন 'বৎস, তোমার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি রাজ্য শাসনের সম্যক উপযুক্ত হইয়াছ; অতএব তুমি রাজা হওয়াতে আমরা পরম- সুখী হইয়াছি।'

খুল্লতাতের সদ্ব্যবহারে লজ্জিত হইয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক পূর্ব্ববৎ পিতৃব্যের হস্তেই রাজ্যভার রাখিয়া প্রতাপাদিত্য কিছুদিনের জন্য সৌম্যভাব অবলম্বন করিলেন। কালে বসন্তরায়ের একাদশ পুত্র ও কয়েকটি দুহিতা হইল; প্রতাপাদিত্যেরও উদয়াদিত্য নামে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য পুত্রের দুর্ব্বৃত্ততা বিলক্ষণ জানিতেন; সুতরাং মৃত্যুর পর বসন্ত রায়ের পুত্রদিগকে বিত্ত হইতে একেবারে বঞ্চিৎ করিবে, এই ভয়ে জমীদারী দশ আনি ছয়আনি করিয়া বণ্টক করিয়া দিলেন। এবং যশোহরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ধুমঘাট নামক স্থানে স্বতন্ত্র একটি বিচিত্র পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য এই নূতন পুরীতে গমন করিলেন। বসন্তরায় সপরিবারে যশোহরের বাটীতেই রহিলেন। কিছুকাল পরে বিক্রমাদিত্য পরলোক গমন করিলেন; মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ সমাধা হইয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্য দৈনন্দিন অধিকতর দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। তখন বঙ্গদেশবাসী অপর ভৌমিকদিগকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার দুহিতার পরিণয় হইল। এই বিবাহ সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ইতিহাস আছে। রাজা রামচন্দ্রকে বিনাশ করিবার জন্য প্রতাপাদিত্য এইরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলেন যে, রাত্রি প্রভাতে যখন রামচন্দ্র শয়নাগার হইতে বহির্গত হইবেন, তখন গুপ্ত ঘাতুকেরা তাঁহার প্রাণবধ করিবে। কেহ বলেন যে, চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী হস্তগত করিবার জন্য এই অবৈধ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কেহ বলেন প্রতাপাদিত্য স্বীয় শয়নাগারে স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়া করিতেছিলেন; এমন সময়ে জামাতার (রাজা রামচন্দ্রের) জনৈক বিদূষক স্ত্রীবেশে সেই গৃহে উপস্থিত

হইয়াছিল, এই কথা পরে প্রকাশ পাওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতার প্রাণ সংহার করিতে মনস্থ করেন। রাজা রামচন্দ্র শ্বশুর গৃহে একাকী আছেন; তদীয় সমভিব্যাহারী লোক সমস্ত রাজবাটী হইতে দূরে নৌকাতে ছিল। কেবল রামমোহন মাল নামে একটি বিশ্বাসী ভৃত্য নিকটে ছিল। রাজকন্যা পরম্পর স্বামীর বধমন্ত্রণা শুনিতে পাইলেন, এবং রাত্রিতে স্বামিগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পিতার দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত করাইলেন। নিরুপায় রামচন্দ্র শুনিয়া অবাক্। নিজের লোক জন নিকটে নাই, নানা স্থানে প্রতাপাদিত্যের দূতেরা সতর্কভাবে আছে সুতরাং প্রস্থান করিবারও উপায় নাই। স্বামীকে নিতান্ত চিন্তিত দেখিয়া পতিব্রতা রাজবালা কহিলেন 'এখন আর বৃথা চিন্তায় সময় ক্ষেপণের কর্ম্ম নয়, যাহা করিতে হয় শীঘ্র করুন। কেবল যে গুপ্তরক্ষীরা আপনাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, এরূপ নহে। পুরী হইতে কোন ক্রমে বহির্গত হইতে পারিলেও উদ্ধার নাই। চতুর্দ্দিকে যতগুলি খাল আছে, বৃহৎ কাষ্ঠ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আপনার নৌকা নদীতে যাইতে পারিবে না। তবে একমাত্র উপায় এই আছে যে, অদ্য আর কিছুকাল পরে আমি পিতৃব্য বসন্ত রায়ের গৃহে যাত্রা শুনিতে যাইব, তখন আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে মশাল লইয়া চলিবেন। এইরূপে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া যদি কোনক্রমে প্রস্থান করিতে পারেন তবেই রক্ষা। রামচন্দ্র প্রাণভয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন; এবং সেই বেশে একবার কোনক্রমে যাইয়া রামমোহন মালকে বিপদের সংবাদ দিলেন। কিছুকাল পরে পত্নীর পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে মশাল ধরিয়া বসন্ত রায়ের গৃহে গমন করিলেন। এদিকে বিশ্বস্ত মোহনমাল অতি গোপনে রাজা রামচন্দ্রের ভাওয়ালিয়া নৌকাখানি নদীতে লইয়া গেল। রাজা রামচন্দ্র বসন্ত রায়ের গৃহ হইতে গোপনে নৌকায় গমন করিলেন। ৬০ দাঁড়ের ভাওয়ালিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। রাজবাটী হইতে অনেক দূর যাইয়া কামান শব্দের দ্বারা প্রতাপাদিত্যকে আপনার প্রস্থান ব্যাপার অবগত করাইয়া গেলেন। কিন্তু কেহ আর তাঁহার অনুসরণ করিল না।

এইরূপে রাজা রামচন্দ্র স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা পিতৃগৃহেই রহিলেন। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা শ্বশুরালয়ে একবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাকে গৃহে আনিলেন না, অথবা তাঁহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিলেন না। পিতার অপরাধজন্য দুহিতার প্রতি, পতিপ্রাণা প্রাণদা ভার্য্যার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করা রামচন্দ্রের মনুষ্যোচিত কার্য্য হয় নাই। পতির নিষ্ঠুরাচণে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া সরলা সাধ্বী আর পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলেন না, একেবারে কাশীধামে যাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। প্রতাপাদিত্যের কন্যা যে স্থানে আসিয়া নৌকা লাগাইয়াছিলেন, তথায়

একটি হাট ছিল। এখন আর সেখানে হাট নাই, কিন্তু উক্ত স্থানকে লোকে অদ্যাপি "বধূ ঠাকুরাণীর হাট" বলিয়া থাকে।

সকল বিষয়ের ন্যায় মনুষ্যের উন্নতিরও একটা সীমা আছে। বন্যার জলে কোন বাপী যখন পরিপূর্ণ হয়, তখনই প্রতিস্রোত বহিতে আরম্ভ করে। মনুষ্যের উন্নতিও যখন চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার অদৃষ্টস্রোত অবনতির দিকে গমন করিতে থাকে। প্রতাপাদিত্য বাহুবলে, বুদ্ধিবলে, এবং বিবিধ সদ্‌গুণে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন—বঙ্গভূমের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু আতান্তিকী উন্নতিতে তিনি ভয়ানক গর্ব্বিত, ভয়ানক দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অত্যাচারে দেশ ব্যতিব্যস্ত—কম্পিত হইয়া উঠিল। রামচন্দ্রের প্রস্থানে বসন্তরায় সাহায্য করিয়াছিলেন কিনা, এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু প্রতাপাদিত্য নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারই চক্রে রামচন্দ্র প্রস্থান করিয়াছে। তখন কৃপাণহস্তে পিতৃব্যের প্রাণ নাশার্থ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের দুষ্ট চরিত্র দেখিয়া বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায় সর্ব্বদা পিতার শরীর রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন, এবং বসন্তরায়ও সর্ব্বদা "গঙ্গাজল" নামে এক খানি তলোয়ার নিকটে রাখিতেন। কিন্তু নিয়তির বিরুদ্ধে মনুষ্যের চেষ্টা বিফল। বসন্ত রায় আহ্নিকের কোঠায় বসিয়া পূজা করিতেছেন; তখন গোবিন্দ রায় স্থানান্তর ছিলেন এবং স্বীয় অসিও নিকটে ছিল না। এমন সময় কৃপাণহস্ত প্রতাপাদিত্য কৃতান্তের ন্যায় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, বসন্তরায় তাঁহাকে দেখিবা মাত্র "গোবিন্দ" "গোবিন্দ" বলিয়া বারংবার ডাকিলেন। গোবিন্দ রায় ভাবিলেন পিতা গৃহস্থিত গোবিন্দ রায় নামক বিগ্রহের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, এই বলিয়া তথা গেলেন না। তখন প্রাণভয়ে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বসন্ত রায় ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন "শীঘ্র গঙ্গাজল দে"। ভৃত্য সে বাক্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া এক পাত্র গঙ্গাজল লইয়া আসিল, ইত্যবসরে দুরাত্মা প্রতাপাদিত্য এক আঘাতে পিতৃব্যের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তৎপর তথা হইতে বহির্গত হইয়া বসন্ত রায়ের অপরাপর পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূকে হত্যা করিলেন। কেবল ছোট রাণীর কৌশলে সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাঘব রায়ের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। রাণী উক্ত শিশুকে গবাক্ষ দ্বার দিয়া কচুবনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন; সেই জন্য রাঘবরায় পরে 'কচু রায়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কচু রায় হইতেই প্রতাপাদিত্যের প্রাণ নাশ ও রাজ্য নাশ হইয়াছিল। রায় গুণাকর নিম্নলিখিত শ্লোকে এই ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন।

"তার খুড়া মহাকায়, আছিল বসন্ত রায়,
রাজা তারে সবংশে কাটিলা।
তার বেটা কচু রায়, রাণী বাঁচাইলা তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইলা॥
ক্রোধ হৈল পাতশায়, বান্ধিয়া আনিতে তায়

রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।”

সগোষ্ঠি বসন্ত রায়কে নিপাত করিয়া প্রতাপাদিত্য ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইহার উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে। কমল খোজা নামে প্রতাপাদিত্যের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ অনেক দিন রাত্রে পাহারা দেওয়ার সময় দেখিতে পাইত যে, নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষেত্র হইতে একটি প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া গগণ স্পর্শ করে, কিছুক্ষণ পরে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই কথা সে অনেক দিন প্রতাপাদিত্যকে জানাইয়াছে, কিন্তু রাজা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। একদা কয়েকটি গোপাল ঐ ক্ষেত্রে কালীপূজার অভিনয় করিতেছিল। একজন রাখাল বলি হইল, অপর এক রাখাল তাহাকে কৃত্রিম হাড়ি কাঠে বাঁধিয়া একটি কুশা দ্বারা তাহার গ্রীবাতে আঘাত করিবামাত্র শিরশ্ছিন্ন হইয়া গেল। অপরাপর গোপালেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া প্রাণভয়ে স্বস্ব গৃহে পলায়ন করিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রতাপাদিত্যের গোচরীভূত হইলে, রাজা মৃত শিশুর শির ও দেহ একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং নিশাকালে কমল খোজাকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বোক্ত আলোকের অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবা মাত্র কমল খোজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ; আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে প্রতাপাদিত্য তন্দ্রাবাপন্ন হইলেন। কিন্তু মোহাবস্থায় শুনিতে পাইলেন কেহ কহিতেছে, “যে স্থানে আলো দেখিয়াছ, তাহার নিম্নভাগে এক কালীমূর্ত্তি আছে। উহা উত্তোলন পূর্ব্বক এক মন্দির স্থাপন কর ; কালী তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এবং যে পর্য্যন্ত তুমি তাঁহাকে বিদায় না দিবে, তাবৎ তিনি তোমার গৃহে অবস্থান করিবেন।” রাজা আরো শুনিতে পাইলেন যে, দিনের বেলা যে শিশু ছিন্নশির হইয়াছিল, সে মরে নাই, নিদ্রিতাবস্থায় তাহার মাতৃ অঙ্কে শায়িত আছে। নৃপতি ও সেনানী উক্ত রাখাল গৃহে যাইয়া দেখিলেন বালক যথার্থই মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত আছে ; এবং রাজান্তঃপুরস্থ বাক্স শূন্য রহিয়াছে। পরদিন লোকদ্বারা মৃত্তিকা খনন করাতে এক কালী মূর্ত্তির মুখ ও বক্ষ উত্তোলিত হইল, তখন দৈববাণী হইল, আর খনন করিও না। মহারাজা সেই মূর্ত্তির উপরে এক বিচিত্র মন্দির স্থাপন করিয়া নিত্য নিত্য পূজা দিতে লাগিলেন। ঐ মূর্ত্তির নাম যশোহরেশ্বরী। কালীর কৃপায় প্রতাপাদিত্যের দিন দিন সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপাদিত্য যখন ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, তখন কালী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। যে কালী প্রতাপাদিত্যের “যুদ্ধ কালে সেনাপতি ছিলেন ; তিনি প্রতাপাদিত্যের পাপাচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।”

ইতি পূর্ব্বেই প্রতাপাদিত্য দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করিয়াছিলেন ; এবং বাদশাহের অনেক দেশ স্বীয়রাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের পতন বর্ণনার পূর্ব্বে একবার দেখা যাউক, তাহার আধিপত্য কত বিস্তৃত ছিল। শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেব বলেন যে, পিতার জীবদ্দশায়ই প্রতাপাদিত্য ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্ব তীরে ২৪ পরগণার যে অংশ অবস্থিত, তাহা এবং উত্তর ও পূর্ব্বোত্তরাংশ ব্যতীত সমগ্র যশোহর জিলা করায়ত্ত করিয়াছিলেন। পরে বাঙ্গলার অন্যান্য ভৌমিকদিগকে পরাস্ত করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাঙ্গলার সমস্ত দক্ষিণ ভাগ জয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁহার প্রশমনার্থ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আজিম খাঁ নামে দিল্লীর জনৈক সেনাপতি বাঙ্গলায় আগমন করেন। ইহার সহিত ক্রমে দুই বৎসর প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য অনেকগুলি পরগণা হারান। চাঁচড়ায় রাজ পরিবারের আদি পুরুষ মহাতাবচন্দ্র রায়ের পুত্র ভবেশ্বর রায় এই যুদ্ধের সময় বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন; তাহার পুরস্কার স্বরূপ আজিম খাঁ প্রতাপাদিত্যের জমিদারীর যে সকল পরগণা তৎকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সৈদপুর, আহাম্মদপুর, মুরাগাছা এবং মাণিকপুর, এই চারিটী পরগণা ভবেশ্বর রায়কে প্রদান করেন।

রাম রাম বসু কহেন, প্রতাপাদিত্যের দমনের জন্য ক্রমে দ্বাবিংশজন সেনানী দিল্লী হইতে প্রেরিত হয়, প্রতাপ সকলকেই বিনষ্ট করেন। একথার সহিত অপর কোন লেখকের ঐকমত্য নাই, এবং আজিম খাঁর বিবরণ পাঠ করিলে, ইহা অলীক বলিয়াই বোধ হয়। সে যাহাইউক কচু রায় দিল্লীতে যাইয়া প্রতাপাদিত্যের সমস্ত দুষ্কর্ম্ম বিদিত করিলেন, তখন আমির ওমরাওগণও বাদশাহের নিকট প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিলেন। জাহাঙ্গীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিখ্যাত সেনানী রাজা মানসিংহকে প্রতাপের বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন। মানসিংহের যশোর যাত্রা কবি কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥
ঘোড়া উট্ হাতী পৃষ্ঠে নাগারা নিশান।
গাড়িতে কামান চলে তূণপোরা বাণ॥
হাতীর আমারী পরে বসিয়া আমির।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লাল পোশ খাস বরদার।
সিপাই সকল চলে কাতার কাতার॥
তবকী ধানকী ঢালী রায়বাঁশী মাল।
দফাদার জমাদার চলে সর্দ্দীয়াল॥
আগে পাছে হাজারীরা হাজার হাজার।
নট নটী হরকরা উরুদু বাজার॥
* * *
আগে পাছে দুইপাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোরনগর॥"

ভারতচন্দ্র।

এই সময় যশোহরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যকে পরিত্যাগ করিলেন। কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্য দ্যূতক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় একটি কাঙ্গালিনী আসিয়া

ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে প্রতাপাদিত্য তাহার স্তন দুটি ছেদন করিয়া দেন। কেহ কহেন, প্রতাপাদিত্যের জনৈক দুশ্চারিণী দাসী পলায়ন করিয়াছিল, সেই অপরাধে রাজা তাহার স্তনদ্বয় কাটিয়া দেন। আবার তৃতীয় পক্ষ বলেন, রাজপ্রাসাদ পরিষ্কার করিতে বিলম্ব হওয়াতে রাজা মেথরাণীর শিরশ্ছেদন করেন। প্রতাপাদিত্য যখন দরবারে বসিয়া এই নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেছেন, কথিত আছে তখন কালী রাজার কন্যার মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সেই প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত। প্রতাপাদিত্য অতিশয় বিরক্ত হইয়া দুহিতাকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে বলিলেন। কালী দাঁড়াইয়া রহিলেন, রাজা বলিলেন, "তুই এখনই আমার পুরী পরিত্যাগ করিয়া যা।" কালী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তবে কি আমি যথার্থই যাব?" প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রুষ্ট হইয়া কহিলেন "তুই আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিস্ না। আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন তোর মুখ আমাকে দেখিতে না হয়। যা শীঘ্র আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যা।" মায়ারূপিণী মহামায়া তৎক্ষণাৎ চকিতার ন্যায় অন্তর্হিতা হইলেন। তখন প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য জন্মিল; ক্ষিপ্তের ন্যায় কালীর মন্দিরে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন দক্ষিণবাহিনী কালী মূর্ত্তি পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য বাতাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রায় গুণাকর নিম্নলিখিত শ্লোকে এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।—

"শিলাময়ী নামে, ছিলা তার ধামে,
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাশাতে ফিরিয়া, বসিয়া রুষিয়া,
তাঁহারে অকৃপা করি।"

মানসিংহ যশোহরে উপস্থিত হইয়া শত প্রহরণে তাঁহার পুরি বেষ্টন করিলেন; এবং
"শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ি তলোয়ার।"

প্রতাপাদিত্য রাজার বেটা রাজা, তাহাতে স্বয়ং অমিততেজা বীরপুরুষ। মানসিংহের সঙ্কেত বুঝিতে পাইয়া, অসী গ্রহণ পূর্ব্বক, শৃঙ্খলটি দূতের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া সদর্পে কহিলেন,—

"কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলোয়ার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলোয়ারে॥"

রাজপুত্রের মত, রাজার মত, বীরের মত উক্তিই বটে। এরূপ উক্তি এক শোভা পাইত গ্রীকদিগের মুখে; আর শোভা পাইত জগদ্ বিখ্যাত আর্য্যসন্তান দিগের মুখে। কিন্তু, হায়! অবনত ভারতে আর বীরত্বের কথা কেন? এ ভীরুযোনি বঙ্গে শৌর্য্যবীর্য্যের গৌরব করিয়া লাভ কি?

"পিতার গৌরব, আর খোরাসান যশঃ
করিয়া তোমার বল হবে কি পৌরষ!!"*

উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সমরে পরাস্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়া

* একটি পারস্য কবিতার অনুবাদ।

মানসিংহ মণিমুক্তা, স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসাদি ব্যতীত নগদ এককোটী মুদ্রা পাইলেন। কচুরায়কে যশোহরের সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক, প্রতাপাদিত্যকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বারাণসীতে পৌঁছিলে প্রতাপাদিত্যের প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু একজন ইংরেজ লেখক * বলেন, প্রতাপাদিত্য জীবিতাবস্থায়ই দিল্লীতে নীত হইয়াছিলেন, এবং জাহাঙ্গীর তাঁহার পূর্ব্বের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে যশোহরের রাজত্ব প্রদান করেন। প্রতাপাদিত্য দিল্লী যাইবার সময় এক জোড়া পারাবত সঙ্গে লইয়া যান, বাটীর সকলকে বলিয়া যান, আমার বিপদ হইলে এই পারাবত-মিথুন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র, তোমরা সগোষ্ঠি জলে নিমজ্জিত হইও। দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন সময় অসতর্কতা নিবন্ধন ঐ পারাবত দুটি উড়িয়া যেই যশোহরে আসিল, অমনি রাজার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া রাজপরিবারস্থ সকলে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। প্রতাপাদিত্য দেশে আসিয়া পরিবার সম্বন্ধে এই দুর্ঘটনা অবগত হইবামাত্র আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার বীরত্ব সূর্য্য জন্মের মত অস্তমিত হইল।

প্রতাপাদিত্যের জীবনের প্রধান ঘটনা গুলি আমরা বর্ণন করিলাম। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কি আমাদের গৌরবের বিষয় না লজ্জার বিষয়? সত্য বটে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা বিবেচনা করিলে, তাঁহাকে একজন দুর্বৃত্ত অসুর বলিয়াই আপাততঃ প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু সেরূপ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে একবার দেখা কর্ত্তব্য প্রতাপাদিত্য বাস্তবিক কতদূর দোষী ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে তিনটি প্রধান দোষ দেখা যায়। প্রথমতঃ তিনি স্বীয় পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং অধীশ্বর হন। দ্বিতীয়তঃ তিনি পরম মহাত্মা পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সপরিবারে প্রাণ নাশ করেন। তৃতীয়তঃ তিনি স্বীয় জামাতার প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। এতদ্ব্যতীত লঘুপাপে কিঙ্করীর বা কাঙ্গালিনীর প্রাণনাশও একটি কলঙ্ক বটে, কিন্তু সে ঘটনাটি অতি সামান্য। তদীয় চরিত্রের যে তিনটি প্রধান কলঙ্কের উল্লেখ করা গেল, উহার সকল গুলিই এক কারণ হইতে সমুদ্ভূত। তিনি ভয়ানক লোভী ছিলেন; এবং রাজ্যলোভেই ঐ তিনটি গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করেন। বসন্ত রায় নির্দ্দোষী ছিলেন, একথা প্রতাপাদিত্য জানিতেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দিল্লীতে নির্ব্বাসন ও রামচন্দ্ররায়ের প্রস্থান এ উভয় ব্যাপারই বসন্ত রায়ের দ্বারা সম্পন্ন। রামচন্দ্র রায়ের প্রস্থান সম্বন্ধে বসন্তরায়ের হস্ত ছিল কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। প্রতাপাদিত্যকে দিল্লীতে প্রেরণ বিষয়ে বসন্ত রায়ের পরামর্শ দূরে থাকুক, সে বিষয়ে তাঁহার অমতই ছিল। কিন্তু সে সকল কথা প্রতাপাদিত্য জানিতেন না। বসন্ত রায়ের উপর প্রতাপাদিত্যের সন্দেহ নি-

* Majo Smyth's Report, pp 100-101

তাস্ত অনৈসর্গিকও নহে। তবে তিনি যতদূর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, ততদূর করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু নৃপতি-দিগের মধ্যে এমন অনেক উদাহরণ আছে যে, তাঁহারা পিতা এবং সহোদর ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। নৈতিকের উপদেশ পুস্তকে যতদূর দেখা যায়, সংসারে সেই উপদেশ মত কার্য্য প্রায়ই হয় না। আমরা প্রতাপাদিত্যের কার্য্যকে নির্দ্দোষ বলিতেছি পাঠক যেন এরূপ মনে না করেন; আমরা এইমাত্র বলিতেছি, প্রতাপাদিত্যের যে দোষ, অনেক নৃপতিই সে দোষে দোষী। লোভ জগতের পরম শক্র। আমরা যখন অল্প বিষয়ের লোভে প্রতিদিন শত শত গর্হিত কার্য্য করিতেছি, তখন রাজ্যলোভে মুগ্ধ হইয়া প্রতাপাদিত্য যে পিতৃদ্রোহী কি জামাতৃদ্রোহী হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এবং প্রতাপাদিত্যকে নিষ্ঠুর অসুর বলিবার পূর্ব্বে আমাদের হৃদয়ের প্রতি একবার দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনের পর বসন্তরায় যখন সস্নেহভাবে প্রতাপাদিত্যকে গৃহে আনয়ন করিতে যান, তখন তাঁহার সদ্ব্যবহারে প্রতাপাদিত্য মহা লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া স্বীয় দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রামরাম বসুর গ্রন্থ যিনি আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন প্রতাপাপাদিত্য সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে পিতা ও পিতৃব্যের একান্ত বশংবদ ও বিনীত ছিলেন। অসুরের মনে কখনো অনুতাপের উদ্রেক হয় না, অসুরের হৃদয় কখনও বিনয়ী হয় না। সেই জন্যই আমরা বলি, পাঠক যখন প্রতাপাদিত্যের দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন, তখন যেন তাহার স্মরণ থাকে প্রতাপাদিত্য পাপপ্রবণ মানব; সুতরাং মানবীয় দুর্ব্বলতা তাঁহাতে থাকা বিচিত্র নহে। যিনি আপনার হৃদয়ে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক বলিতে পারেন "আমি ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ নিষ্পাপ পবিত্র" তিনি প্রতাপাদিত্যকে অসুর বলুন; কিন্তু আমরা বলিব দশজনের ন্যায় প্রতাপাদিত্যও একজন দুর্ব্বল মানব ছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে প্রভূত গুণও ছিল। দান বিষয়ে প্রতাপাদিত্য একজন অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তাঁহার দানের তিনটিমাত্র উদাহরণ আমরা নিম্নে দিতেছি, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ তাঁহার দানশৌণ্ডতার পরিচয় পাইবেন। একদা প্রতাপাদিত্য সস্ত্রীক বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি কাঙ্গালিনী আসিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। একটি থলিয়া হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া রাণী কাঙ্গালিনীকে দিতেছিলেন, দৈবাৎ ঐ মুদ্রাটি থলিয়ার মধ্যে পড়িয়া গেল। রাণী পুনর্ব্বার উহা উত্তোলন পূর্ব্বক কাঙ্গালিনীকে দিবেন, এমন সময় প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঙ্গালিনীকে দিবার কামনা করিয়া তুমি প্রথমে যে মুদ্রাটি উত্তোলন করিয়াছিলা, এটি কি সেই মুদ্রা?" রাণী কহিলেন "থলিয়াতে সহস্র মুদ্রা আছে, তা-

হাতে কেমন করিয়া বলিব যে এইটিই সেই মুদ্রা ?” প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “যদি তাহা নির্ণয় করিতে না পার, তবে অজ্ঞাতসারে তোমাকে ‘দত্তাপহার’ পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। অতএব সকল গুলি মুদ্রাই কাঙ্গালিনীকে প্রদান কর” রাণী সেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটি কাঙ্গালিনীকে প্রদান করিলেন।

একদা প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হইয়াছিলেন। তাঁহার বদান্যতার পরীক্ষার্থ জনৈক ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিলেন “মহারাজ আমাকে আপনার সালঙ্কৃতা মহিষীকে প্রদান করুন।’ প্রতাপাদিত্য তৎক্ষণাৎ রাণীকে বলিলেন “তুমি এখনই এই ভাবে ব্রাহ্মণের অনুগমন কর। ” পাত্র মিত্র বলিতে লাগিল “মহারাজ, একি করিতেছেন? মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পাটরাণী, এবং কুমার উদয়াদিত্যের জননী কি এক জন সামান্য ব্রাহ্মণের কিঙ্করী হইবেন?” রাজা সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাণীকে ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারিণী হইতে পুনরায় আদেশ করিলেন। রাজমহিষী ব্রাহ্মণের নিকট তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া করপুটে নিবেদন করিলেন “মহারাজ, আপনার দান শক্তির পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই কেবল আমি এই অনুচিত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজমহিষী আমার দুহিতা স্বরূপ, ইহাঁকে আপনি পুনর্ব্বার গ্রহণ করুন।” প্রতাপাদিত্য কহিলেন “আমি একবার দান করিয়া কিরূপে উহা প্রতিগ্রহণ করিব?” ব্রাহ্মণ কহিলেন “মহারাজ, আমি আপনার দান গ্রহণ করিলাম। ইনি আমার পুত্রী, অতএব ইহাঁকে আপনার নিকট সম্প্রদান করিলাম, আপনি রাজা হইয়া, কখনই ব্রাহ্মণের দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না।” ব্রাহ্মণের যুক্তিগর্ভ ও শাস্ত্রসম্মত বাক্যে প্রতাপাদিত্য রাণীকে পুনর্গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তদীয় অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার ও আরো বহুমূল্য ধন রত্নাদি ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

কোন সময়ে দিল্লী হইতে একটি বন্দী তাঁহার সভায় আগমন করে। চারিমাস পর্য্যন্ত রাজার সন্দর্শন পায় নাই। পরে একদা রাজা মৃগয়ার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময়ে বন্দী রাজার সম্মুখীন হইয়া আশীর্ব্বাদ ও যশোবর্ণন করিয়া আপনার পরিচয় দিল। রাজা কহিলেন “তুমি রাজধানীতে অপেক্ষা কর, আমি মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তোমাকে বিদায় করিব।” বন্দী কহিলেন “মহারাজ চারি মাস পর অদ্য মৃগয়া উপলক্ষে মহারাজের সন্দর্শন লাভ করিলাম, আর কতকালে যে মহারাজের সন্দর্শন লাভ করিব, তাহার নিশ্চয়তা কি? অতএব যৎকিঞ্চিৎ দিতে ইচ্ছা হয়, এখনই আদেশ করুন।” প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “বিলম্ব করিলে ভাল হইত” কিন্তু বন্দীর অসহিষ্ণুতা দেখিয়া আদেশ করিলেন, ‘ইহাকে নগদ লক্ষমুদ্রা একটি হস্তী, ও পাঁচটি অশ্ব প্রদান কর।” বন্দী আশাতিরিক্ত দান পাইয়া কহিল, “মহারাজ, আমি হিন্দুস্থানের ছোট বড় সকল

রাজার সভাতেই গিয়াছি। কিন্তু আপনার তুল্য দাতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। জানিলাম জগতে তিনটি মাত্র প্রধান অধীশ্বর আছেন,—

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকী পাতালে।
প্রতাপ আদিত্যরায় অবনী মণ্ডলে।"

সংপ্রতি প্রতাপাদিত্যের ও তদীয় পরিবারের বর্ত্তমান কয়েকটি কীর্ত্তি চিহ্নের বর্ণনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

১। সাতক্ষিরা সবডিবিসনের অন্তর্গত সরকার নকিপুরে ঈশ্বরীপুর; সরকার ধুলিয়া পুরে কালিন্দী যমুনার সঙ্গমস্থিত বসন্তপুর, এবং সরকার জামিরাপুরে প্রতাপনগর এই তিনটি স্থান প্রতাপাদিত্য ও তৎপরিবারের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বসন্তপুর সংপ্রতি একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান।

২। হণ্টর সাহেব বলেন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যশোহরে প্রাচীন প্রাসাদের অনেক গুলি ভগ্নাবশেষ, বিশেষতঃ পাঁচ গুম্বেজ নামক টেঙ্গামজিদ, একটি দুর্গ, এবং একটি মন্দিরের অংশ বিদ্যমান ছিল।

৩। যশোহর নগরের অত্যল্প ব্যবধানে "চাঁদ রায়" নামে একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। চাঁদরায় বসন্তরায়ের জনৈক উত্তরাধিকারী ছিলেন; তিনিই উক্ত দীঘি খনন করান। দীঘিটি মৃত্তিকায় প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একাংশে মাত্র জল আছে, এবং তথাহইতে একটি অপ্রশস্ত নালা বহির্গত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্য ঈর্ষাপরবশ হইয়া মৃত্তিকা দ্বারা এই বাপীটি পূর্ণ করিয়া ফেলেন। ইহার তীরে অনেকগুলি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। নালার মধ্যেও ইষ্টকের চিহ্ন দেখাযায়, সেই জন্য অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বকালে তথায় একটি কুতঘাট ছিল।

৪। পূর্ব্বোক্ত দীঘির নিকট "মাণিক রায়" ও "রূপ রায়" নামে আরো দুইটি দীঘি আছে। চাঁদরায় হইতে ইহারা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের জল এখনও অতি পরিষ্কার ও তৎপ্রদেশবাসী লোকেরা এই দুই দীঘির জলই পান করে। এই তিনটি দীঘিই গ্রামের পশ্চিম দিকে। বসন্ত রায়ের পরিবারস্থ দুই ব্যক্তি এই দুটি দীঘি খনন করান।

৫। গ্রামের পূর্ব্বদিকে, যশোহরেশ্বরীর মন্দিরে যাইবার রাস্তার পার্শ্বে "বারদ্বারী" নামে একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই গৃহটি প্রতাপাদিত্যের বিলাসভবন ছিল। এই গৃহের পুরোভাগে একটি দীর্ঘিকা আছে, তাহাতে ছয়ফিটের অধিক জল নাই।

৬। "বারদ্বারীর" পশ্চিমে কিছু দূরে কচুরায়ের গৃহ ছিল। ঐ স্থানে স্তূপাকার মৃত্তিকাভিন্ন গৃহের অন্য কোন চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু ভূমি খনন করিলে অট্টালিকার কোন কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে বোধ হয় যে উক্ত গৃহটি মৃত্তিকায় বসিয়া গিয়াছে।

৭। "বারদ্বারীর" পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে "হাকিজখানা" অর্থাৎ কারাগৃহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ই-

হার গাঁথনি এত দৃঢ় যে, এখনও ছাদটির একাংশ ভিন্ন পড়িয়া যায় নাই। এই গৃহটি ত্রিতল ছিল; দুইটি তালা মৃত্তিকা গর্ভে নিহিত হইয়াছে, কেবল তৃতীয় তলটি উপরে আছে। প্রবাদ আছে যে, উক্ত গৃহের নিম্ন ভাগে একটি গভীর গর্ত্ত ছিল, ভয়ানক অপরাধে অপরাধী বন্দীদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করিয়া হত করা হইত এবং এক পার্শ্বে একটি দ্বার ছিল, তদ্দ্বারা মৃতদেহ গুলি বাহির করিয়া ফেলাইত। গৃহতলে এখনো বলে আঘাত করিলে যে শব্দ হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে নীচটি ফাঁকা।

৮। হাফিজখানার পশ্চিমদিক দিয়া গ্রামের মধ্যে একটি পয়ঃপ্রণালী প্রবেশ করিয়াছে। ঐ নালার পশ্চিমদিকে একটি অতি বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা মজিদ কি দেবমন্দির তাহার নির্ণয় করা যায় না। বোধ হয় উহা পূর্ব্বে দেবালয় ছিল, পরে মুসলমানেরা ঐ দেবালয়ের উপর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল *। কেহ কেহ অনুমান করেন উহাই ' টেঙ্গামজিদের ভগ্নাবশেষ।'

বোধ হয় যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তিটিও মুসলমানেরা ভগ্ন করিয়াছিল। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুগণ সে কলঙ্কের কথা গোপন করিবার জন্য প্রাগ্বর্ণিত গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যের বংশে কেহই নাই। কিন্তু বসন্তরায়ের বংশ অদ্যাপি নগণ্যভাবে চব্বিশ পরগণার কোন কোন স্থানে জীবিত আছেন। ত্রিপুরার জিলাতেও বসন্তরায়ের বংশধরেরা কেহ কেহ বাস করিতেছেন †। তাঁহারা কুমিল্লাতে কি কারণে কখন গেলেন, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা চেষ্টিত রহিলাম। শ্রীজ—

* মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ করা অথবা মন্দিরের উপর নূতন প্রলেপন ও নূতন কারুকার্য্য বসাইয়া, তাহাতে মস্‌জিদের মূর্ত্তি দেওয়া একটুকুও বিচিত্র নহে। মুসলমান বাদসাহ ও নবাবদিগের মধ্যে বরং ইহা বিশেষ পৌরুষের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল; এবং তাঁহারা যে এইরূপ পীড়নকেই পৌরুষের পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন, বারাণসী, ইন্দ্রপ্রস্থ, এবং আরও বহুতর স্থানে তাহার বহুসংখ্যক নিদর্শন আজও প্রত্যক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

† ত্রিপুরার জেলাতে যেই কেন মুখের জোরে আপনাকে আপনি বসন্তরায়ের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিউক না, তাহাকে কায়স্থকুলজ্ঞ কোন ব্যক্তিই বসন্তরায়ের সন্তান বলিয়া স্বীকার করিবে না। মোচরা ও মামুদাবাদ প্রভৃতি স্থানের ঘোষেরা যেমন আপনাদিগকে পদ্মনাভের কুলভ্রষ্ট সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানের অনেক ' গুণ ' বংশীয় কায়স্থ সেইরূপ আপনাদিগকে প্রথমতঃ ' গুহ ', তাহার পর গুহশ্রেষ্ঠ বসন্তরায়ের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এইরূপ হাতগড়া ঘোষ ও গুহের সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে নিতান্ত অল্প নহে। বাঃ সং।

নিশীথ-চিন্তা।

(কলিকাতা।)

আজি কি মধুর মধুর রজনী,
কিবা চারু সাজ পরেছে ধরণী,
রজত বরণে শোভিছে জগত
চাঁদের কিরণ মাখিয়া গায়।
অই পাখীগুলি খেলিছে কেমন,
কেমন নিস্তব্ধ স্বভাব এখন,
নিশার ভূষণ অই তারাগণ
বিপুল গগনে কি শোভা পায়!
মৃদুল মৃদুল বহিছে পবন,
কানন বল্লরী কাঁপিছে কেমন,
যেন প্রেমভরে করে আলিঙ্গন
হৃদয়-আধার বিটপী রাজে।
তা দেখিয়া যেন কর প্রসারিয়া
প্রাণের প্রতিমা হৃদয়ে বাঁধিয়া
পুলকিত তরু দুলিছে আদরে,
চারু বনলতা আনতা লাজে॥
সমীর সোহাগে খুলিয়া হৃদয়
লতাপুঞ্জ কোলে দোলে ফুলচয়,
অনুরাগ ভরে হাসিয়া ঢলিয়া
এ যেন পড়িছে উহার গায়।
সরসীর গলে মালার মতন
ললিত-লহরী দুলিছে কেমন,
যেন সচঞ্চল সরল মুকুর,
শতচন্দ্রমুখ দেখিছে তায়!
সভয় হৃদয়ে লুকাইয়া লাজে
সারাদিন ছিল অবরোধ মাঝে,
স্বাধীনতা পেয়ে এবে বাহিরিয়ে
উঁকি ঝুঁকি মারে তারকাগুলি
তারা রূপে যেন সুরবালাগণ,
পার্থিব ললনা কে কোথা কেমন
জানিবার তরে উৎসুক অন্তরে
দেখিছে গগন-গবাক্ষ খুলি।
হাসিছে প্রশান্ত স্বচ্ছ সরোবর,
হাসিছে প্রকৃতি হাসে চরাচর,
প্রফুল্ল রজনী হাসিতেছে ধনী,
প্রাণের আমোদে সবাই হাসে।
অনন্ত আকাশ সমুজ্জ্বল করি
সুগোল সুন্দর চারুবেশ ধরি
আজি পূর্ণিমার সুবিমল শশী
কৌমুদী সঞ্চারে তিমির নাশে॥

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক

(সপ্তম খণ্ড ৪৮ পৃষ্ঠার পর।)

(৩) ভুলোয়ার—লক্ষ্মণমাণিক্য।

প্রবাদ আছে যে, অযোধ্যা প্রদেশীয় কায়স্থবংশোদ্ভব বিশ্বম্ভর শূর বা বিশ্বম্ভর রায় বাঙ্গালা ৬১০শাকের ১০ই মাঘ তারিখে অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে চন্দ্রনাথ দর্শনার্থ নৌকাযোগে চট্টগ্রাম যাইতেছিলেন। নৌকা মেঘনাদ নদ দিয়া যাইতেছে, রাত্রি উপস্থিত হইল; নৌকা একটি চরে যাইয়া বাঁধিল। সুতরাং সে রাত্রি তাঁহাকে সেই চরেই বাস করিতে হইল। নিদ্রিত হইয়াছেন, এমন সময় বিশ্বম্ভর স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন তিনি যেন সেই স্থান ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের রাজা হইয়াছেন। নিশাবসান হইল,কিন্তু নৌকা কোথা আসিয়াছে, কোন্ দিকে যাইবেন, এবং কোন্ দিক হইতেই বা আসিয়াছেন, বিশ্বম্ভর অথবা তৎসঙ্গীয়গণ কেহই দিঙনির্ণয় করিতে পারিলেন না। ভ্রম অর্থাৎ ভুল হইয়াছে বলিয়া, বিশ্বম্ভর রায় কৌতুক করিয়া কহিলেন,এস্থানের নাম ভুলোয়া এবং তদবধি উহা ঐ নামেই প্রসিদ্ধ হইল। এবং কালে বিশ্বম্ভরের বংশধরেরা ভুলোয়ার অধিপতি হইলেন।

শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেব তদীয় "ভারতসাম্রাজ্যের ভূ-বৃত্তান্তে" সময় সম্বন্ধে একটি বিষম ভুল করিয়াছেন। তিনি বলেন ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নোওয়াখালীতে প্রথমতঃ হিন্দুগণ বসতি করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত শাকেই বিশ্বম্ভর শূর তথায় বাস করেন; এবং তদীয় সন্তানসন্ততিগণ দিল্লীর সম্রাটকে আবশ্যকমত সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবেন এই নিয়মে উক্ত স্থানে আধিপত্য করেন। আমাদের অনুমান হয়, "১৭২০" অঙ্কের স্থানে ৭২০ হইবে; এবং "খৃষ্টাব্দের" স্থলে বঙ্গাব্দ হইবে। অর্থাৎ ১৭২০ খৃষ্টাব্দের স্থলে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ লিখা উচিত ছিল। ডাক্তর ওয়াইজের নির্দ্দিষ্ট ১২০৩ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা আমাদের অনুমিত ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ হওয়া যে অধিক সম্ভবপর তাহা আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

বিশ্বম্ভর রায়ের পর ছয় পুরুষের কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের ভৌমিক লক্ষ্মণ মাণিক্য বিশ্বম্ভরের অধস্তন সপ্তম পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহাঁর জীবনের শেষভাগে লক্ষ্মণ মাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। যদি ১৫৮৬ হইতে ৫ বৎসর

বাদ দেওয়া যায়, তবে ১২০৩ ও ১৫৮১ এই দুই অব্দের অন্তর ৩৭৮ বৎসর; ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৫৪ বৎসর হইবে। কিন্তু ১৫৮৬ ও ১৩১৩ এই দুই অব্দের অন্তর ২৭৩ বৎসর, ৭ দিয়া ভাগ দিলে ভাগ ফল ৩০ বৎসর হইবে। সাধারণতঃ প্রতি পুরুষের গড় ২৫ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত ধরিবার নিয়ম; কখনও ৩০ এর ঊর্দ্ধ ধরা হয় না। কিন্তু ওয়াইজ সাহেবের শাক সত্য বলিয়া ধরা হইলে গড়ে প্রতিপুরুষের বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর হইয়া পড়ে।

লক্ষ্মণ মাণিক্য সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব প্রবাদ আছে, তাহা ৺ ব্রজসুন্দর মিত্রের গ্রন্থ হইতে অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "রাজা কন্দর্পনারায়ণ অতি বলিষ্ঠ ও যোদ্ধা ছিলেন, রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যও সেইরূপ বলিষ্ঠ ও বীর ছিলেন। অধিকন্তু তিনি অতি গর্ব্বিত ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে পরস্পরকে বিশেষ জানিতেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইলে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য রাজা রামচন্দ্রকে নিতান্ত বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া কথা বলিতেন। তাহাতে রাজা রামচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য শ্রবণ করিলেন, তাঁহার তুচ্ছীকৃত বালক রাজা রামচন্দ্র যুদ্ধার্থী হইয়া তাঁহার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি ক্রোধে ও গর্ব্বে পরিপূরিত হইলেন, এবং অবলীলাক্রমে সেই বালককে পরাভব ও নিধন করিতে পারিবেন, এই বিশ্বাসে একাকী রাজা রামচন্দ্রের নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা রামচন্দ্রের এইরূপ আগমনে তাঁহার এতদূর কোপ ও অভিমান জন্মিয়াছিল যে, তিনি নদীতীরে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, অমনি রাজার নৌকোপরি লম্ফ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু দৈব যোগে এইরূপ হইল যে, তিনি নৌকার উপরিভাগে পতিত না হইয়া তাহার ডহরের মধ্যে পতিত হইলেন। সেই সময়ে রাজা রামচন্দ্রের × × রামমোহন মাল প্রভৃতি সামন্তগণ সতর্ক ছিল, তাহারা তাঁহাকে ডহর হইতে আর উঠিতে দিল না। সেই খানে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া নৌকা কাষ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক, তাহারা অমনি নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকা তীর-বেগে পশ্চিমাভিমুখে ধাবমান হইল। লক্ষ্মণমাণিক্য তদবস্থাতেই রহিলেন। কিয়দ্দিন পরে নৌকা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল।

"এইরূপে রাজা রামচন্দ্র দুর্দ্দান্ত লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্ধন করিয়া স্বদেশে আনিয়া তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা লক্ষ্মণ মাণিক্যের দীর্ঘাকৃতি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর দর্শন করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে নিষেধ করিলে, রাজা তাঁহাকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখেন। এক দিবস রাজা তৈল মাখিতেছেন, এমন সময় তাঁহাকে লৌহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছিল। লক্ষ্মণমাণিক্য এক নারিকেল বৃক্ষের নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি রাজা রামচন্দ্রের উপর বৈব-

নির্য্যাতন করিবার অবকাশ অন্বেষণ করিতে ছিলেন, এক্ষণে সেই নারিকেল বৃক্ষে হেলান দিয়া রাজার অভিমুখে এমনি চাড় দিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন হইয়া রাজার অতি নিকটেই পতিত হইল—ধর্ম্মে ধর্ম্মে রাজার প্রাণ রক্ষা পাইল। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজমাতা এরূপ আতঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, সেই প্রবল শত্রুকে তিনি গৃহে রাখিতে একান্ত সঙ্কুচিতা হইলেন। পরে তাঁহার সম্মতি হইলে রাজা রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে হত্যা করিয়া ফেলাইলেন।”

লক্ষ্মণমাণিক্যের অধস্তন পুরুষদিগের বিষয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। লক্ষ্মণ মাণিক্যের কয়টি সন্তান ছিল তাহা পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞেয়। শ্রীরামপুরের (ভুলোয়ার অন্তর্গত) বর্ত্তমান কায়স্থ বংশীয়েরা লক্ষ্মণমাণিক্যের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। লক্ষ্মণমাণিক্যের তৃতীয় পুত্রের নাম বিজয় মাণিক্য ছিল। ইনি আবুল ফজলের সমকালীন। এইজন্য ডাক্তর ওয়াইজ অনুমান করেন, ইহারই বিষয় আইন আকবরীতে উল্লেখ আছে। কিন্তু এ অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আইন আকবরীতে স্পষ্ট লেখা আছে যে “ত্রিপুরা স্বাধীন, ইহার রাজা বিজয়মাণিক্য; এই বংশীয় সকল রাজারই মাণিক্য উপাধি।” ত্রিপুরার রাজমালা ও শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্রসিংহের সংগৃহীত ত্রিপুরার ইতিবৃত্তেও এই বিজয় মাণিক্যের কথা আছে।

কালক্রমে লক্ষ্মণমাণিক্যের জমিদারির অধিকাংশ সুধারাম মজুমদার ক্রয় করেন। নোওয়াখালী সহরের উত্তরাংশে অদ্যাপি উক্ত মজুমদার পরিবারের ভদ্রাসন বিদ্যমান আছে। এই সুধারাম মজুমদার হইতেই নওয়াখালীর অপর নাম সুধারাম হইয়াছে। মজুমদার পরিবার অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতি ক্ষুদ্র কারণে কোন রাজপুরুষের বিরাগ ভাজন হওয়াতে সুধারাম মজুমদার ভুলোয়ার জমিদারি হারাণ। সে দুঃখের কাহিনী তুলিয়া আমরা পাঠকবর্গকে ব্যথিত করিব না। মজুমদার পরিবারের এখনও কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে। কিন্তু ভুলোয়ার জমিদারি এক্ষণ পাইকপাড়ার রাজাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অন্যায় রূপে বাকিখাজানার জন্য জমিদারি নিলাম হওয়াতে রাণী কাত্যায়নীর দেওয়ান বসরা নিবাসী ভগীরথ সিংহ চৌধুরী রাণীর পক্ষ হইতে অতি সুলভ মূল্যে ঐ জমিদারি ক্রয় করেন। ত্রিপুরার বসরথ আলী চৌধুরীর মেনেজার শ্রীযুক্ত বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদার সুধারাম মজুমদারের বংশধর।

(৪) বিক্রমপুরের—চাঁদরায় কেদার রায়।

আকবর সাহের ১২০ বৎসর পূর্ব্বে দে বংশীয় কর্ণাটী কায়স্থ নিমচাঁদ রায় নামে এক ব্যক্তি বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া ঢাকা জিলার অন্তর্গত আড়া ফুলবাড়িয়া গ্রামে বাস করেন। হুমায়ুন বাদসাহের নিকট হইতে ইনি পুরুষপারম্পারিক “ভৌমিক” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। চাঁদকেদার এই নিমচাঁদ রায়ের প্রপৌত্র কি বৃদ্ধ প্রপৌত্র হইবেন।

চাঁদ কেদার খিজিরপুরের ইসাখাঁ মসনদ্‌-

আলীর সমসাময়িক ছিলেন। যেস্থলে মেঘনাদের সহিত পদ্মার সঙ্গম হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে এবং লাঠিভাঙ্গা (চাঁচড়তলা বা ঠাকুরুণ বাড়ীর) খালের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে ইহাঁরা আপনাদিগের রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাঁরা কর্ণাটী কায়স্থ হইলেও কালক্রমে এদেশীয় কায়স্থদিগের সহিত ইহাঁদের করণ কারণ চলিত হয়। এমন কি প্রাগুক্ত রাজধানীর নিকটে বাহেরক-গ্রামস্থ বসু পরিবার প্রভৃতি ইহাঁদের স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। ইহাঁরা দেশ মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ইহাঁদের বহুল রণতরী (কোষ নৌকা) ও সৈন্য সামন্ত ছিল। বিক্রমপুরের আর কুত্রাপি কোষ নৌকা এখন প্রচলিত আছে কিনা জানিনা, কিন্তু রাজাবাড়ীর নিকট অনেক ধীবর প্রভৃতির কোষ নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ইহাঁদিগের কোষ নৌকা রাখিবার জন্যই লাঠিভাঙ্গার খাল খনিত হয়। মেঘনাদ নদের ন্যায় এখনও এই খালে জোয়ার ভাটা বহে। এই খালের উত্তরপারে চাঁচড়তলার কালীবাড়ী। এখানে একটি বটবৃক্ষে অতি প্রকাণ্ড একটি স্থান ব্যাপিয়া একটি সুন্দর নিকুঞ্জ হইয়াছে। উহার ঠিক মধ্যস্থানে একটি ইষ্টকময় দেউল, তন্মধ্যে একটি ঘট স্থাপিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত মন্দিরটির ছাদ নাই। পূজকেরা কহেন যে কালী স্বপ্নযোগে উহাতে ছাদ দিতে নিষেধ করেন। শনি মঙ্গলবার ঐ কালী বাড়ীতে বিস্তর ছাগ বলি হয়। লোকে বলে মেহেরেশ্বরীর কালীবাড়ীর ন্যায় ঐ স্থানটি সিদ্ধিপীঠ হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, চাঁদরায় কেদাররায়ই উক্ত কালীর প্রতিষ্ঠাতা।

চাঁদ রায়ের স্বর্ণময়ী নামে পরমরূপবতী একটি কন্যা ছিল। খিজিরপুরের ইসাখাঁ সেই কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তাহার করপ্রার্থী হয়। এই সূত্রে চাঁদ কেদার রায়ের সহিত তাহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। পরিশেষে ইসাখাঁ বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে চাঁদ কেদার রায়ের রাজধানী আক্রমণ করে। তাহাতে উভয় ভ্রাতাই বিনষ্ট হন। বিজয়ী যবন রাজ স্বর্ণপ্রতিমা স্বর্ণময়ীকে তখন বলে হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করিল। চাঁদ রায়ের আর সন্তানাদি হয় নাই। কনিষ্ঠ কেদার রায়ের সন্তানেরা সেই যুদ্ধের পর স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। শুনাযায় এই বংশীয়েরা অদ্যাপি মুন্সিগঞ্জের দক্ষিণে মূলচর গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি উদরসাৎ করিয়া বিক্রমপুরের নিকট পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়াছেন, অনেক বিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিয়াছি এ প্রবাদ সত্য নহে। তাহারা অনুমান করেন যে চাঁদ রায় কেদার রায়ের কীর্ত্তিনাশই কীর্ত্তিনাশা নামের নিদান। কীর্ত্তিনাশা নাম বহুকাল হইতে প্রচলিত, সুতরাং শেষোক্ত অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রায় ২১। ২২ বৎসর হইল আমরা রাজাবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। ঐ স্থানে একটি প্রাচীন মঠ ভিন্ন অন্য অট্টালিকা প্র-

ভূতির চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। তবে স্থানে স্থানে রাশি রাশি ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজাবাড়ীর নিকটস্থ দুটি লোক আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন অনেকেই উক্ত স্থান হইতে সময়ে সময়ে বহুতর ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। স্থানে স্থানে তাদৃশ ক্রিয়ার চিহ্নও লক্ষিত হইল। তাঁহারা আরো বলিলেন, একদা কোন ব্যক্তি ইষ্টক সংগ্রহের জন্য অনেকটা স্থান খনন করাতে তিন চারি হস্ত মৃত্তিকার নীচে একটি গৃহের ছাদ বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমান মঠের প্রায় অর্দ্ধেক মৃত্তিকাগৃহে নিহিত হইয়াছে, ইহাতে প্রাগুক্ত বাক্য অনৃত বলিয়া বোধ হইল না। মঠের যে ভাগ এইক্ষণে মৃত্তিকাতে স্থাপিত, তাহার এক এক দিক ২৯ ফিট, প্রাচীরের ঘনত্ব ১১ ফিট। ইষ্টকগুলি দীর্ঘ প্রস্থ উভয় দিকে ৮ ইঞ্চি ও ১½ পুরু। এতকাল গত হইয়াছে তথাপি ইষ্টক গুলি লাল টক্ টক্ করে; এবং উহাতে নানা ফল ফুল পাতা লতা ও জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত। গ্রন্থন এত দৃঢ় যে, এখনো কুঠারাঘাতে তাহার একখানি ইষ্টক স্খলিত হইবার নহে। মঠের অভ্যন্তর বাদুড়ের মলে এত পরিপূর্ণ যে দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া যায় না। উহার উপরে নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা জন্মিয়াছে। শুনিতে পাইলাম উহার উপর অনেক গোলমরিচের গাছ জন্মিয়া থাকে। চাঁদ রায় কেদার রায় পরম শৈব ছিলেন; এবং এই মঠে তাঁহাদিগের ইষ্ট শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। নয়াপাড়ার বৈদ্য চৌধুরীরা চাঁদ কেদারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইসা খাঁ কর্ত্তৃক রাজধানী ধ্বংসের পর উক্ত চৌধুরী পরিবার প্রভুর জমিদারি আত্মসাৎ করেন। রাজা রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের সময়, উক্ত চৌধুরী পরিবারের নিকট হইতে তিনি উক্ত জমিদারি ক্রয় করিয়া লয়েন।

পদ্মা নদীর উত্তরপারে আড়া ফুলবাড়িয়াতে কেদারবাড়ী নামে একটি স্থান আছে, এবং তথায় কেদাররায়ের খনিত বৃহৎ দীর্ঘিকাও দৃষ্ট হয়। পদ্মার তীরে কেদারপুর নামে যে একটি বন্দর আছে, বোধহয় কেদার রায়ের নামের সহিত উহার কোন সংস্রব থাকিতে পারে। রাজাবাড়ীর নিকট 'কেশারমার দীঘি' নামে একটি অতি বৃহৎ বাপী আছে। প্রবাদ আছে চাঁদরায় কেদার রায় উক্ত দীঘি খনন করান। কিন্তু উহাতে জল উঠে না। একদা রাজা স্বপ্ন দেখেন যে, উক্ত দীঘিতে একটি নরবলী প্রদান করিলে জল উঠিবে। রাজার কেশব নামে একজন দাস ছিল; কেশবের মাতা বহু অর্থ পাইয়া স্বীয় পুত্রের বলিদানে সম্মতা হয়। কেশব অশ্বারোহণে ঐ দীঘির মধ্যে বেগে গমন করিতে করিতে উহাতে এত জল উঠিল যে, কেশব আর উঠিতে পারিল না। সেই হইতেই ঐ দীঘির নাম 'কেশার মার দীঘি' হইল। আমরা এতক্ষণ যে রাজাবাড়ী গ্রামের উল্লেখ করিয়া আসিলাম; বোধ হয়, চাঁদ রায় কেদার রায়ের আবাস গ্রাম বলিয়াই উহার ঐ নাম হইয়াছে। এই রাজাবাড়ীতে পূর্ব্বে একটি পুলিসের থানা ছিল, সংপ্রতি একটি আউট পোষ্ট আছে। শ্রীজ—

কৃষ্ণা

বা

কলিকাতা শতাব্দী পূর্ব্বে।

(সপ্তম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠার পর।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাসাধিক নৌকাযাত্রার পর চন্দ্রশেখর নির্ব্বিঘ্নে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার মাতামহের বন্ধু শ্রীযুত রায় লোকনাথ চৌধুরী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহের সহিত আপন আলয়ে রাখিতে যত্ন করাতে, চন্দ্রশেখর তাঁহারই আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। স্থাবর সম্পত্তি সমস্ত বিক্রীত হওয়া অল্প দিনের কার্য্য নহে, সুতরাং তাঁহাকে দীর্ঘকাল পাটনায় থাকিতে হইবে। অস্থাবর সম্পত্তি সকল তত্রস্থ ভদ্রলোকেরা একত্র হইয়া যেরূপ মূল্য স্থির করিলেন, চৌধুরী মহাশয় সেই মূল্য চন্দ্রশেখরকে দিয়া, তাহার সম্পত্তি সমস্ত আপনি রাখিলেন। উক্ত সম্পত্তি সকল বিক্রয়ে চন্দ্রশেখর প্রায় চারি সহস্র মুদ্রা পাইলেন। একদা চন্দ্রশেখর স্নানহেতু নদী-কূলে আসিয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার নিকটে একটি ভগ্নমন্দির; তথায় একজন সাধু পুরুষ একাকী বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার অল্প বয়স ও সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে চন্দ্রশেখর সহসা আকৃষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইনি অল্পবয়সে কি হেতু বিষয় বাসনা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক তথায় অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল না। তিনি তখন স্থির করিলেন অপরাহ্নু বা সায়ংকালে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন।

চন্দ্রশেখর পূর্ব্বোক্ত রূপ চিন্তা করিতে করিতে চলিতেছেন। তাঁহার স্বাভাবিক সুশ্রী মুখকান্তি মাসাধিক নৌকা যাত্রায় ও নির্ম্মল বায়ু সেবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অতীব মোহন ভাব ধারণ করিয়াছে। একে সুন্দর ব্রাহ্মণদেহ, তাহাতে নির্ম্মলজীবনের জ্যোতিঃ, তাহাতে নীহারসিক্ত প্রফুল্লকুসুমসদৃশ নবপ্রেম-রঞ্জিত যৌবন, তাহাতে আবার সুশিক্ষার ভাতি, একেবারে এই সমস্ত শোভা একত্র হওয়াতে, চন্দ্রশেখর দর্শকমাত্রেরই শ্রদ্ধা, অনুরাগ বা প্রীতির পাত্র

হইয়া যাইতেছেন। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর উচ্চ অট্টালিকা ও তদাশ্রিত বহুদূরব্যাপি এক সুরম্য উপবন। চন্দ্রশেখর যখন উহার নিকট দিয়া গমন করেন,তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে নয়ন-স্নিগ্ধকর এক নবীন রূপরাশি দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। ঐ রূপরাশি এক জন যবন কন্যার। ইনি বাতায়নে স্বীয় নবীন যৌবনের ভার দিয়া একটি পুষ্প-গুচ্ছের প্রতি চাহিয়া আছেন ; নিম্নস্থ পথ-গামী চন্দ্রশেখরের প্রতি সহসা দৃষ্টিনিক্ষেপ হওয়াতে কিঞ্চিৎ অস্থিরা হইলেন। চন্দ্র-শেখর সেই মনোরমা মূর্ত্তির প্রতি আর এক-বার চাহিলেন—বিধাতার সুকৌশল সম্পন্ন কোন পদার্থের প্রতি জনগণ-মাত্রই যে-রূপ বিস্মিত-নয়নে চাহেন, তিনিও সেই ভাবে চাহিয়া চলিলেন ; কিন্তু যবনকন্যার তিনি তদবধি সস্পৃহ অনুরাগের পাত্র হ-ইলেন।

সায়ংকাল হইলে,চন্দ্র শেখর যখন নদী-তটে পূর্ব্বোক্ত সাধু পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হেতু যাইতেছেন, দেখিলেন, সেই সুন্দরী অতি মূল্যবান্ পরিচ্ছদে শোভিতা হইয়া উপবনে বসিয়া সহচরীদিগের সহিত হাস্য আলাপন করিতেছেন। তিনি নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন।

চন্দ্র শেখর নদীতটে উপনীত হইয়া দে-খিলেন, ভগ্ন মন্দিরে সেই সাধু পুরুষ বসিয়া একমনে পাঠ করিতেছেন। তিনি মন্দি-রের দ্বার দেশে আসিয়া, প্রণত হইয়া, স-ম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, সাধু পুরুষ তাঁহাকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে,কি হেতু আমার ন্যায় সঙ্গিহীন সম্পত্তিহীন জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ? তাঁহার বাক্য শুনিবামাত্র চন্দ্র শেখরের বোধ হইল যেন কোন মর্ম্মস্থ দুঃখ ও সাধারণ জনের প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিহিত আছে। তিনি উপস্থিত কৌতূহল অপ্রকাশ রাখিয়া কহি-লেন 'ভগবন্! পবিত্র সুখের প্রস্রবণ দয়াময় ঈশ্বর যাঁহার সতত সঙ্গী এবং ধর্ম্ম ও তদনু-ষ্ঠান যাঁহার সম্পত্তি, তিনি কি প্রকারে বন্ধু-হীন বা সম্পত্তিহীন হইতে পারেন ?' চন্দ্র শেখরের সদুত্তর শুনিয়া তিনি প্রীত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেন, যেন সেই দৃষ্টিতে তাঁহার হৃদয় পরীক্ষা করিলেন, চন্দ্র শেখর অটল ভাবে পরীক্ষা দিলেন। তিনি তখন যত্নের সহিত চন্দ্র শেখরকে সম্মুখে বসিতে আদেশ করিলেন। চন্দ্র শেখর বসিয়া ভাবিলেন, তিনি ইতি পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় ভিত্তিশূন্য। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে-ছেন, এখন সময়ে সাধু পুরুষ তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সহাস্য বদনে কহিলেন, আপনি আমার সম্পর্কে যাহা ভাবিতেছেন তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। চন্দ্র শেখর তাঁহার এই বাক্য শুনিবামাত্র চমকিত হ-ইয়া কহিলেন, ' ভগবন্ বস্তুতঃ আমি আ-পনকার সম্পর্কে কিছু চিন্তা করিতেছিলাম, কিন্তু আমি কি চিন্তা করিতেছিলাম, এবং আমার চিন্তার বিষয় যে নিতান্ত ভিত্তিশূন্য নহে তাহা আপনি কি প্রকারে জ্ঞাত বা

অনুমান করিলেন?' সাধু পুরুষ তাঁহার এই কথার সবিশেষ কোন উত্তর না করিয়া, তাঁহার নাম, ধাম ও পাটনায় আসিবার উদ্দেশ্য বিষয়ে আলাপন করিয়া কহিলেন, 'এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত, আপনি যদি কল্য আসিয়া অনুগৃহীত করেন, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের আলাপ করিব।' চন্দ্রশেখর প্রণামান্তে উঠিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন, পথি মধ্যে পুনরায় সেই সুরম্য অট্টালিকার বাতায়নে সেই সুন্দরী যবনকন্যাকে দেখিলেন। তাহার বাটী হইতে খানিক দূর যাইতে না যাইতে, রাস্তার অপর দিক হইতে অবগুণ্ঠিতা একজন রমণী তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি এ স্থানে অতি অল্প দিন আসিয়াছেন?' চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন 'হাঁ, আমি কলিকাতা হইতে অতি অল্প দিন আসিয়াছি'। তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল 'আপনার পাটনায় আসিবার উদ্দেশ্য কি?' তিনি অকপটে কহিলেন, তাঁহার স্বর্গীয় মাতামহের কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রীত হইলে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। তৎপরে তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, এ বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে কহিলেন 'তুমি স্ত্রীলোক হইয়া তোমার এ সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি?' স্ত্রীলোকটি আর কোন কথা না কহিয়া অল্পে অল্পে সান্ধ্যতিমিরে বিলোপিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রশেখর আবাসে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলেন এ স্ত্রীলোকটি কে? কি জন্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, এবং তাঁহার পাটনায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উহার কি মনোরথ সিদ্ধ হইল? তিনি উহাকে অকপটে আত্মপরিচয় দিয়া কি ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলেন? উহার জিজ্ঞাস্য সকল কি সামান্য কৌতূহল চরিতার্থ মাত্র, বা কোন অভিসন্ধি-সম্ভূত? প্রকৃত রূপবান্ বা গুণবান্ ব্যক্তি আপন রূপ বা গুণকে সামান্য বিবেচনা করেন,—যদি তা না হইত, তাহা হইলে প্রকৃত গুণের বা সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী কয় জন হইত?—তিনি এরূপ চিন্তা করেন নাই যে, তাঁহার রূপের পক্ষপাতিনী হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটি স্বয়ং বা অন্য কোন জন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিল। চন্দ্রশেখর সরল হৃদয়ে তাঁহার মাতামহের বন্ধুকে এই ঘটনা সবিস্তার বর্ণন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কি হইতে পারে?" তিনি চন্দ্রশেখরের মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সহাস্য বদনে কহিলেন "কি জানি বাপু সে বিষয় তুমি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পার।" ইহাতেও চন্দ্রশেখরের চৈতন্য হইল না। তিনি তৎপরে সাধু পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন, "আমি লোকমুখে তাঁহার ক্ষমতার কথা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারি নাই, যেহেতু আমি বিষয় কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, তবে এই মাত্র

বলিতে পারি যে, তিনি একজন প্রকৃত পূজ্য ব্যক্তি ''।

রাত্রি অবসান হইলে, প্রত্যূষে চন্দ্র শেখর নদীতীরে আসিয়া স্নান বন্দনাদি সমাপন করিয়া আবাসে ফিরিয়া আসিতেছেন, পথি মধ্যে পূর্ব্ব-রাত্রে যে অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে নিকটে আসিয়া বন্দনাদি করিয়া কহিল 'আপনি যে জমি বিক্রয়ের কথা গত রাত্রিতে কহিয়াছিলেন আমি তাহার খরিদার জোগাড় করিতে পারি, আপনি বলুন শত করা কিরূপ দালালি দিতে পারেন'। চন্দ্র শেখর স্ত্রীলোকের মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খরিদার কে'? সে উত্তর করিল 'শাহাজাদী জুরজিহান্'। তৎপরে কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিয়া কহিল 'আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি'। চন্দ্র শেখর কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া কহিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ হইয়া যবনীর নিকট যাইতে পারিব না, আর জমি বিক্রয় সম্বন্ধে ভার শ্রীযুক্ত রায়লোকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের উপর আমি সমস্ত দিয়াছি, তিনি যাহা করেন, তাহাই হইবে'। সুতরাং স্ত্রীলোকটি ভগ্ন চিত্তে চলিয়া গেল।

প্রায় দুই সপ্তাহকাল চন্দ্র শেখর প্রতি দিন প্রভাতে ও সায়ংকালে পূর্ব্ব মত সেই পথ দিয়া গমনাগমন করেন। ক্রমশঃ সেই সাধু পুরুষের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রালোচনে, তাঁহার প্রতি চন্দ্র শেখরের ভক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চন্দ্র শেখরের পক্ষে এক্ষণে একমাত্র কৃষ্ণার বিরহ-তাপ ব্যতীত বিদেশে আর কিছুই কষ্ট নাই। যাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তিনি প্রতি দিন সাধু পুরুষের সহিত শাস্ত্রালাপন সুখ উপভোগ করেন। তিনি লোকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আত্মীয় বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি সকলের নিকট সম্মানিত, ও দুষ্ট জন কর্তৃক পরিহার্য্য; তথাচ, দুরদৃষ্টের লক্ষ্য ভ্রষ্ট। উহার অলক্ষ্য নিষ্ঠুর শরের শরব্য। সে শর পরিহার করা মনুষ্যের সাধ্য বা আয়ত্তাধীন নহে। উহা কি সদসৎকর্ম্মের ফলাফল? কি নিয়তি? কি যোজনান্তরিত গ্রহগণের ঐশিক, কি বৈদ্যুতিক, কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি? অস্ফুট মনুষ্য বুদ্ধি বা বিজ্ঞতায় নির্ণীত হয় নাই।

একদা সায়ংকাল সমাগমে চন্দ্র শেখর আবাসে ফিরিয়া আসিতেছেন, আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। চন্দ্র শেখর অনন্যমনে দ্রুত পদে চলিয়া আসিতেছেন। পথে লোক জন নাই, অন্ধকার গাঢ়। পূর্ব্বোক্ত উপবনের কয়েকটি দ্বারের মধ্যে একটি দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। উহার পার্শ্ব দিয়া একটি বক্র পথ, এই পথ দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে। তিনি ভ্রমক্রমে উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে না যাইতে, তাঁহার ভ্রম অবসান হইতে না হইতে, দুই জন বলবান্ ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইলেন। তিনি বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কেহই কিছু বলিল না;

তাঁহাকে লইয়া চলিল। তিনি ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, নির্জ্জন উপবনে তাঁহার করুণ আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইল মাত্র, সাহায্যার্থে কেহই আসিল না। পথ অন্ধকারময়, চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বিশাল তরুশ্রেণি। মনোহর কুঞ্জ, লতাবিতান প্রভৃতি কোথায়? প্রকৃতির ও আপন অবস্থান্তরে যাহা অতি সুন্দর ও সুরম্য তাহা এক্ষণে কদর্য্য ও ভীষণ। তিনি বন্দী হইয়া চলিলেন; সহসা দূরে আলোকিত পুরী, তথায় দুইজন বলবান্ পুরুষ তাঁহাকে লইয়া চলিল। পুরীমধ্যে চন্দ্রশেখর আনীত হইলে, তিনি দেখিলেন যে দুই জন পুরুষ তাঁহাকে আনিয়াছে, তাঁহারা অল্পবয়স্ক, অজাতশ্মশ্রু, কিন্তু বিশেষ বলিষ্ঠ। তাহাদিগের মস্তকে উষ্ণীষ; পরিধান ধুতি, গলদেশে যজ্ঞোপবীত। গৃহ সুসজ্জিত, জনশূন্য। চারি দিক্ বর্ত্তিকালোকে সমুজ্জ্বল। এক দিকে মূল্যবান সুবর্ণ মুক্তাদি খচিত সিংহাসন। তিনি সেই দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি অপরাধে বা উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সেস্থলে লইয়া আসিয়াছে; ইহা কাহার বাটী এবং তাহারাই বা কে? তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন কি অপরাধে ধৃত হইয়াছেন, তাহারা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল "রাজকুমার আসিলে সে বিষয়ের মীমাংসা হইবে।" প্রায় দুই দণ্ড অতীত হইল, তথাপি রাজকুমার আসিলেন না। চন্দ্রশেখর দণ্ডায়মান। পরে দূরে শঙ্খধ্বনি হইল ও সুমিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর নিঃস্বন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া সহসা নিস্তব্ধ হইল। চন্দ্রশেখর স্থিরকর্ণে শুনিতেছিলেন, সহসা চমকিত হইলেন, পার্শ্বের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, অতীব মধুর রূপসম্পন্ন তরুণবয়স্ক এক যুবা আসিয়া অবনতবদনে সেই স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কর্ম্মচারীদ্বয় যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিল, "রাজকুমার! এই ব্যক্তি অদ্য অন্ধকারের উপলক্ষ করিয়া কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ে আপনকার রাজপুরীতে প্রবেশ করিতেছিল, আমরা উহাকে ধরিয়া আপনকার সমীপে আনিয়াছি।" চন্দ্রশেখর আত্মপরিচয় ও তাঁহার উপস্থিত আবাস প্রভৃতি পরিচয় দিয়া করযোড়ে কহিলেন যে, তিনি বিদেশী বলিয়া অন্ধকার ও অমনোযোগ বশতঃ হঠাৎ তাঁহার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায় কিছুই নাই যেহেতু তিনি অসৎ লোক নহেন, এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়। রাজকুমার কোন কথা শুনিলেন না, গম্ভীরস্বরে অবনতমুখে কহিলেন "তুমি এক্ষণে আমার বন্দী।" এবং উক্ত কর্ম্মচারী দ্বয়কে তাঁহাকে বন্দীভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, কহিলেন পশ্চাতে সাবকাশ মত তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করা হইবে। কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার উপবনের পথ দিয়া অপর একটি পুরীতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে কহিল।

চন্দ্রশেখর রাজকুমারের আজ্ঞা শুনিবামাত্র

ব্যাকুল ও অস্থির-বুদ্ধি হইলেন। অন্ধকূপ, পরাধীনতা শৃঙ্খল, অনশন, অপবাদ, দৈহিক যন্ত্রণা প্রভৃতির চিন্তা সকল স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিহ্বল, হতবুদ্ধি ও নিতান্ত কাতর করিল। তথায় কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নাই যে, তিনি এই অশুভ সংবাদ তাঁহার মাতামহের বন্ধুর নিকট প্রেরণ করেন। অভিজ্ঞান বা বিজ্ঞতা কিছুই নাই যে, উপস্থিত বিপদ হইতে শীঘ্র পরিত্রাণ পাইবার কোন যুক্তি স্থির করেন। স্রোতে চালিত বৃক্ষ-পত্রের ন্যায় তিনি রাজ-কর্ম্মচারী দ্বয়ের সহিত কারাগারাভিমুখে চলিলেন। রাজকুমারের গৃহ হইতে নামিয়া পুনরায় অন্ধকার ময় উদ্যানে আসিলেন, কিয়দ্দূর চলিয়া একটি বৃক্ষ বাটিকার দ্বারে উপনীত হইলেন। উহার উপরে উঠিলেন, রাজকুমারের গৃহ যেরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত, এ গৃহও সেই রূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত এবং বর্ত্তিকালোকে সমুজ্জ্বল;—দেখিলেন, গৃহের চারি পার্শ্বে চারিখানি লম্বমান মুকুর, কয়েক খানি মনোহর চিত্র, মুক্তাবান্ ঝাড়, নয়ন-তৃপ্তিকর পর্য্যঙ্ক, রৌপ্যময় পুষ্পপাত্র সান্ধ্য-বিকশিত পুষ্প সকল গুচ্ছাকারে শোভিত;—দেখিয়া ভাবিলেন এই কি কারাগার? কর্ম্মচারী দ্বয় তাঁহাকে তথায় অবস্থিতি করিতে কহিলে, তিনি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'মাদৃশ বন্দীজনের প্রতি এরূপ দয়া কেন'? কর্ম্মচারী দ্বয় ঈষৎ হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, তাহারা কহিল 'রাজাজ্ঞা'। তিনি ও বিস্মিত ভাবে কহিলেন, 'রাজ চরিত্র'। চন্দ্র শেখর উপবিষ্ট হইলে, একজন কর্ম্মচারী সুবর্ণময় পাত্রে পান, ও মণিময় আলবালায় তামাক দিয়া আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। চন্দ্র শেখর হতবুদ্ধি। নানা রূপ চিন্তা তাঁহার চিত্তে ঘা দিতে লাগিল, কোনটি যুক্তি সঙ্গত বোধ হইল না। ইত্যবসরে আহারের বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি কহিলেন 'রাজকুমারের জাতি কি ও তাহারা বা কি জাতির লোক, তাহারা কহিল রাজকুমার ক্ষত্রিয় ও তাহারা ব্রাহ্মণ। কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন, দুগ্ধ ও ফল মূল ভিন্ন রাত্রিতে আর কিছুই খাইবেন না। একজন শশব্যস্তে তাহাই আনিতে গেল। তিনি দেখিলেন কর্ম্মচারী দ্বয়ের ব্যবহার এক্ষণে ভিন্ন রূপ। যাহারা ইতি পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাপেক্ষ। তিনি ভাবিতে লাগিলেন রাজবন্দিগণ কি এই রূপ সম্মানিত হইয়া থাকে? কিয়ৎক্ষণ পরে একটি ভিন্ন গৃহে আহারাদি করিয়া তথায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কর্ম্মচারী দ্বয় উলঙ্গ তরবারী হস্তে তাঁহার গৃহের দ্বারে পাহারা দিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ।)

শারীর-ক্রিয়া-তত্ত্ব।

(১৪৭ পৃষ্ঠার পর।)

প্রত্যেক বিম্বাণুর অভ্যন্তর এক প্রকার দ্রব বা অর্দ্ধদ্রব লাল পদার্থে পূর্ণ, তাহার নাম শোণগোলিকা (hemoglobin.); এই পদার্থ ব্যাহরণ * দ্বারা দুটি ভিন্ন পদার্থে বিভাজিত হইয়াছে; একটি অণ্ড শ্বেতবৎ পদার্থ নাম গোলাণ্ডকা (globulin), অপরটি রঞ্জক পদার্থ নাম শোণিকা (hematin), যাহার জন্য শোণিতের লাল বর্ণ। লোহিত বিম্বাণুগুলির প্রধান কার্য্য ফুসফুস হইতে অম্লজান বায়ুকে সকল তন্তুর সর্ব্বাংশে বহন করা; অপিচ অধ্যাপক ষ্টোকস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই অম্লজান বহনের ক্ষমতা শোণিকার অস্তিত্ব নিবন্ধনই হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এই বিম্বাণুগুলির পরিমাণ গঠন, ও আকৃতি অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা দ্বারা, এবং শোণিকায় যে সকল অশোষণ-বন্ধ † দৃষ্ট হয়, অণু-কিরণ বীক্ষণ ‡ যোগে তাহাদের পরীক্ষাদ্বারা, অন্যান্য জন্তুর শোণিত হইতে নরশোণিতের প্রভেদ করা যায়, তাই রক্তের দাগ পরীক্ষা করিয়া খুন ধরিতে পারা গিয়া থাকে।

বর্ণহীন বিম্বাণুগুলি অনেকাংশে লোহিত বিম্বাণু হইতে বিভিন্ন। তাহারা গোলাকার; তাহাদের আকার-বন্ধ (outline) অনিয়ন্ত্রিত, এবং কোন প্রকার চাপ না পাইলেও তাহাদের অবয়ব পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; এতাবতা তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত সঙ্কোচ্যতার সহজ ও সরল রকমের দৃষ্টান্ত স্থল। লোহিত সহচরদিগের অপেক্ষা তাহারা কিয়ৎপরিমাণে বৃহত্তর; তাহাদের ব্যাস এক বুরুলের প্রায় $\frac{১}{২৫০০}$ তম অংশ।

* Resolution রাসায়নিকাদি প্রক্রিয়া দ্বারা কোন যৌগিক বস্তুকে তাহার ঔপাদানিক মূল বস্তু পরম্পরায় বিভাগ করার নাম ব্যাহরণ।

† *Absorption bands.* অগ্নিশিখায় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে দগ্ধ বা উদ্বাত করিলে, কিরণ-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সেই শিখা মধ্যে কতকগুলি রেখাবন্ধ দৃষ্ট হয়; এই রেখাবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কোন্ বস্তুর কি রকম রেখাবন্ধ তাহা রসায়নবিদেরা নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল রেখাবন্ধ দৃষ্টে তাঁহারা বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া থাকেন।

‡ Micro Spectroscope সূর্য্য রশ্মি বিচ্ছিন্ন করিয়া তদন্তর্গত বর্ণপরম্পরা পৃথক্ পৃথক্ দেখিবার জন্য, এবং অন্যান্য নানাবিধ রাসায়নিকাদি পরীক্ষার জন্য Spectroscope ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রত্যেক শ্বেত বিম্বাণুর অভ্যন্তর ভাগ এক প্রকার পরিষ্কার অথবা দানা বিশিষ্ট দ্রব পদার্থে পূর্ণ, এই দ্রব মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটি কোষিকা (vesicle) বিলম্বিত থাকে, ইহাকে অষ্ঠি (Nucleus) কহে। লোহিত-বিম্বাণুগুলি যে কোন অনির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা শ্বেত গোলাণু হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা কতকটা নিশ্চিত, এবং তাহারা যে বৃহৎ অষ্ঠি—শ্বেত বিম্বাণুর গাত্র স্ফুটিত করিয়া মুক্ত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার বিলক্ষণ হেতু আছে। কিন্তু শ্বেত বিম্বাণুগুলি কোথা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

মাতৃকা-দ্রব বা শোণিত-মস্ত এক প্রকার পরিষ্কার, প্রায় বর্ণহীন, অণ্ডশ্বেতবৎ তরল পদার্থ; তাহাতে বিম্বাণুগুলি ভাসমান আছে, এবং তদবলম্বনে উহারা দেহের সমস্তাংশে বাহিত হয়। উহা কৈশিকাচয় হইতে তন্তুসমূহের মধ্যে নিঃস্রুত হইয়া তন্মধ্যে পোষকদ্রব্য বহন করিয়া লইয়া দেয়। অপিচ উহা দেহের সর্ব্বাংশ হইতে আবর্জ্জিত পদার্থ অপসারিত করিয়া তৎসমস্তকে ভিন্ন ভিন্ন উৎসর্গমার্গে আনিয়া উপস্থিত করে; ঐ সকল মার্গদ্বারা উহারা নিষ্কাশিত ও অপসারিত হয়। ইহাতে কতক অদ্রব পদার্থ গলিতাবস্থায় থাকার দরুণ এই মাতৃকা-দ্রব ঈষৎ পিচ্ছিল; এই সকল পদার্থ এবং বিম্বাণুগুলি থাকাতে শোণিত জল অপেক্ষা গুরু হইয়া থাকে।

জীবন্ত শরীর হইতে রক্ত নিঃসারণ করিলে প্রথমতঃ উহা সম্পূর্ণ দ্রবাবস্থায় থাকে, কিন্তু কএক মিনিটের মধ্যেই সংহত * হইয়া (অর্থাৎ জমিয়া) কোমল, লোহিতবর্ণ, আঠা আঠা হইয়া যায়। আরো কিছুকাল পরে এই বস্তুর উপাদানগুলি পৃথক্ হইয়া এক প্রকার স্বচ্ছ, পীতাভ দ্রব (ইহার নাম মস্ত †), এবং এক প্রকার লোহিতবর্ণ গাঢ় বস্তু (ইহার নাম কূর্চিকা ‡), এই দুই রস্তুতে পরিণত হয়। মস্ত সৌত্রিকা-বর্জ্জিত মাতৃকা-দ্রব, এবং লোহিত ও শ্বেতবিম্বাণুগুলি সৌত্রিকার তন্তুচয় দ্বারা ওতপ্রোত ও আবদ্ধ হইয়া কূর্চিকাকে উৎপন্ন করে। এই কূর্চিকা ক্রমশঃই সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং শ্বেতবিম্বাণুগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়—সম্ভবতঃ সংহতির অবস্থায় তাহারা সৌত্রিকাবস্তুতে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু সৌত্রিকার উৎপত্তি কোথা হইতে হয়? আর কেনই বা উহা আপনা আপনি মাতৃকা-দ্রব হইতে পৃথক্ হয়, এবং গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়? এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় নাই। কেহ কেহ সংহতিকে জীবনী ক্রিয়ার§ মধ্যে গণ্য করেন, কেহ কেহ ভৌতিক-রাসায়নিক ¶ ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অধ্যাপক হক্স্লী এবং ফষ্টারের মত এই যে, সাধারণ জীবন্তশোণিতে দ্রবীভূত সৌত্রিকা থাকে না। কিন্তু উহাতে গোলাণুকা ও সৌত্রিকা-জননী ** পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি

---

* Coagulated.

† Serum.

‡ Clot, Cruor or crassamentum.

§ Vital process.

¶ Physico-chemical.

** Fibrinogen.

করে, এবং জীবন্ত শরীর হইতে যখন রক্তকে নিঃসারণ করা যায়, তখন উহারা সংযুক্ত হইয়া সৌত্রিকা উৎপন্ন করে। যে সকল অবস্থা বিশেষে সংহতি ক্রিয়া ত্বরিত, বিলম্বিত, অথবা তৎকাল জন্য স্থগিত হইয়া থাকে, তাহাদের আমরা এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি না, কিন্তু ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, জীবন্ত পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ সংশ্রব থাকিলে উহা বিলম্বিত বা স্থগিত হয়, আবার জীবন শূন্য পদার্থের সহিত সংশ্রবে উহা ত্বরিত হইয়া থাকে। পরন্তু জীবন্ত শরীরের রক্তাশয় সমূহের মধ্যে গোলাণুকা ও সৌত্রিকা-জননীর সংযোগ বা অন্যোন্য ক্রিয়া দ্বারা সৌত্রিকার নির্মিতি ও সংহতি কেন যে হয় না, তাহা কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই। ফল কথা, জীবন্ত তন্তুমধ্যে শোণিত দ্রবাবস্থায় থাকে, কিন্তু অজীবন্ত পদার্থের সহিত, এবং বাহ্যবায়ুর সহিত সংশ্রবে উহা সংহত হইয়া থাকে। অধিক কি, অজীবন্ত পদার্থের এতই প্রভাব যে, জীবন্ত শিরার মধ্যে যদি একটি তার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা সৌত্রিকাবৃত হইবে, অথচ তাহার চতুষ্পার্শ্বে দ্রব শোণিত বহিতে থাকিবে।

এই বিষয় লইয়া এত অধিকক্ষণ আন্দোলন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সংহতি প্রক্রিয়াটি বিশেষরূপে জানিবার বিষয়। সাধারণতঃ এটি স্থির বলা যাইতে পারে যে, যাবৎ শোণিত দেহমধ্যে থাকে তাবৎ কোন না কোন হেতু বশতঃ উহা জমিতে পারে না। কিন্তু তথাপি কোন কোন স্থলে উহা জমিয়া থাকে। যখন পূয়-কণা অথবা অন্য পদার্থের কণিকা শোণিতে প্রবেশ লাভ করে, তখন উহারা সংহতির সূত্রপাত করিয়া এবং কূর্চিকা উৎপন্ন করিয়া রক্ত চলাচল রুদ্ধ করিয়া দেয়; তাহাতে স্থানিক বা সার্ব্বাঙ্গিক নষ্টতাকে উৎপন্ন করে। যে ধমনী চক্ষুর চিত্রপত্রে * রক্ত যোগায়, তাহার মধ্যে অনুবাধক †, অর্থাৎ কূর্চিকা, আবদ্ধ হইয়া তামস ‡, অর্থাৎ দৃষ্টিহানি রোগ (বিশেষতঃ আকস্মিক) উৎপন্ন করিতে পারে। যে ধমনী ফুসফুসের পোষক, তন্মধ্যে সৌত্রিকা-ময় কূর্চিকা প্রবেশ করিলে রক্ত চলাচল একবারে বন্ধ হইয়া সহসা জীবন-লক্ষণ স্থগিত হইয়া যাইতে পারে।

আবার সামান্য আঘাতাদিতে সংহতির বড় উপকারিতা আছে, কারণ রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিতে কূর্চিকা সংঘটনই শ্রেষ্ঠতর উপায়। আহত স্থানের উভয় প্রান্ত যোজনা করিয়া দিয়া অনেক সময়ে প্রকৃতিকে সাহায্য করা আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু যাহাদের শরীর বেস সুস্থ তাহাদের পক্ষে (অত্যধিক রক্তস্রাব না ঘটিলে) আর বড় কিছু করিতে হয় না। সংহতিদ্বারা অনেক সময়ে আ-

---

* Retina চক্ষুর অভ্যন্তর স্থিত যে ত্বকে দৃশ্য পদার্থের ছবি অঙ্কিত হইয়া আমাদের দর্শন জ্ঞান হয়।

† Embolus কোন কারণে সৌত্রিকা সংহবিপ্রাপ্ত হইয়া রক্তাশয় মধ্যে আবদ্ধ হইলে, তাহাকে অনুবাধক বা অনুসমবরোধক, এবং সেই অবস্থাকে অনুবাধা বা অনুসমবরোধন (Embolism) বলা যায়।

‡ Amaurosis.

ভ্যান্তরিক রক্তক্ষয়ও বন্ধ হইয়া থাকে; তত্তৎস্থলে প্লাষ্টর বা ব্যাণ্ডেজ কিছুই প্রয়োগ করিবার উপায় থাকে না। সেরূপ স্থলে বিশ্রাম নিতান্ত আবশ্যক; তাহাতে কূর্চিকা সংঘটনের অবসর হয়, এবং পীড়িত স্থানে শৈত্য প্রয়োগে উহার সহায়তা করে। এই রূপে অনেক সময়ে আহত রক্তাশয়ের মুখ রক্তকূর্চিকাদ্বারা আবদ্ধ হইয়া রক্তক্ষয় হেতুক মৃত্যু হইতে রক্ষা হইয়া থাকে।

রক্তক্ষয়কে যথাসম্ভব নিবারণ করা ইদানীন্তন অস্ত্রচিকিৎসার অভিপ্রেত। আজ কাল এস্মার্কের ব্যাণ্ডেজ ও অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ দ্বারা বিনা রক্তপাতে ছেদনাদি শল্য ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। কারণ, দেখা যায় যে, রক্ত হানি হইলে বল রক্ষা ও জীবন রক্ষার উপায়েরই হানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন কথায় কথায় রক্ত মোক্ষণ করা হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। হোমিওপ্যাথিক মতাবলম্বীরা রক্ত মোক্ষণ করেনই না। তাঁহারা ছুরিকা (Lancet) ব্যবহার অপেক্ষা সহজ উপায় দ্বারা উৎকৃষ্টতর রূপে প্রদাহের হ্রাস ও জ্বরের দমন করিতে সক্ষম। এবং এই ক্ষুদ্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহারা এরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন দেখিয়া সাধারণে রক্তমোক্ষণ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। শোণিতই জীবন, এবং যদিচ এই শোণিত বিকার প্রাপ্ত হয়, শোণিতকে ক্ষয় করিয়া পীড়াকে প্রতিরোধ ও পরাজয় করিবার শক্তিকে নষ্ট না করিয়া, শোণিতের সেই বিকৃতি যাহাতে সংশোধিত হয় তাদৃশ চেষ্টা করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত।

সংহতি ক্রিয়া সংঘটনকালে মাতৃকাদ্রবের মস্ত হইতে সৌত্রিকা কিরূপে পৃথক্ হয় তাহার আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কূর্চিকা সংঘটন হইতে না দিয়া এই পৃথক্‌ করণ কৃত্রিম উপায়ে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। শরীর হইতে নিঃসারিত করার পর যদি রক্তকে একটি ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছের দ্বারা ধীরে ধীরে আলোড়ন করা যায় তাহা হইলে উহা না থিতাইয়া তরল রহিবে। ক্রমাগত নাড়িতে নাড়িতে দৃষ্ট হইবে যে, ঐ তৃণগুচ্ছ একপ্রকার কোমল, লোহিতাভা আঠা আঠা পদার্থে আবৃত হইয়া যাইবে। এই পদার্থ ধৌত করিলে শ্বেতবর্ণ হইবে, এবং সূক্ষ্ম, সুকুমার, স্থিতিস্থাপক সূত্ররূপে অবস্থিত করিবে। ইহাকেই সৌত্রিকা কহে। আধার পাত্রে যাহা রহিয়া যাইবে উহা মস্ত ও বিম্বাণুচয়, তাহাদের আর সংহতি হয় না। কাহারও অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে এই দ্রব পদার্থকে তাহার শিরার মধ্যে অন্তঃক্ষেপ (Injection) করা যাইতে পারে; এবং দেখা গিয়াছে তাহাতে যথেষ্ট প্রশমন হয়। এই প্রক্রিয়াকে অনুদ্রাবণ (Transfusion) বলা যায়। সৌত্রিকাকে প্রথমতঃ অপসারিত না করিলে মৃত্যু সংঘটন হইতে পারে। অনুদ্রাবিত শোণিত স্বজাতীয় প্রাণীর দেহজাত হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু নিকট শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক। যথা, অশ্বের শোণিতের দ্বারা অশ্বকেও বাচাইতে পারা যায়, এবং গর্দ্দভকেও বাঁচাইতে পারা যায়। ইদানীং এইরূপ প্রক্রিয়া মনুষ্যের প্রতি প্রয়োগ করিয়াও সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ।

রাজপুতানার ইতিহাস।

(ষষ্ঠ খণ্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠার পর।)

দশম অধ্যায়।

বনবীর মিবারসিংহাসনে আরোহণ করিলে রাজপুতপ্রধানেরা মনে মনে স্থির করিলেন যে, যত দিন সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, তত দিন তাঁহারা বনবীরের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যরক্ষা করিবেন। তখন উদয়সিংহের বয়ঃক্রম ছয় বৎসর মাত্র। বনবীর রাজপুতপ্রধানদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই হউক, অথবা সিংহাসনের ভাবি কণ্টক দূর করিবার জন্যই হউক, উদয়সিংহের জীবনসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বনবীর তামসী রজনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা উদয়সিংহ সায়াহ্নিক পানভোজন সমাপন করিয়া নিদ্রিত আছেন, ইত্যবসরে ধাত্রী অন্তঃপুরমধ্যে চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরিক আসিয়া ধাত্রীকে রাণার দুরভিসন্ধি জ্ঞাপন করিল। ধাত্রী অনন্যোপায় হইয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে ফলপূর্ণ পেটিকামধ্যে উদয়সিংহকে সংস্থাপন পূর্ব্বক ক্ষৌরিকের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিয়া দিল, যেন সে সাবধানে দুর্গ হইতে পলায়ন করে। ধাত্রী তাহার নিজ পুত্রকে রাজকুমারের শয্যায় শোয়াইয়া রাখিল। বনবীর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই শিশুরাণার অনুসন্ধান করিলেন। ধাত্রী ভয়ে কথা কহিতে পারিল না, কেবল মাত্র অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা শয্যা দেখাইয়া দিল। ধাত্রী স্বচক্ষে দর্শন করিল, তাহার পুত্রের বক্ষে ছুরিকা প্রবিষ্ট হইল। ধাত্রীপুত্রের সৎকার হইয়া গেল: সকলেই সংগ্রামসিংহের শেষ চিহ্ন অপনীত হইল ভাবিয়া যার পর নাই শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। পরমবিশ্বাসময়ী ধাত্রী নয়নাসারে নিজ পুত্রের চিতাভস্ম সিক্তিত করিয়া ক্ষৌরিকের অনুসন্ধান উদ্দেশে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল। ধাত্রী খিচিবংশীয় রাজপুত্রী, তাহার নাম পান্না। উত্তর কালে উদয়সিংহ এতদূর হীনবীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়া মিবারের যশঃশিখরে কলঙ্কপাত করিয়াছিলেন যে, বনবীরের ছুরিকা স্বকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া মিবাররাজশ্রেণীর মধ্য হইতে উদয়ের নামোচ্ছেদ করিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের কোনই কারণ ছিল না।

চিতোরের কিয়দ্দূর পশ্চিমে বেরিসনদীতীরে ক্ষৌরিক ধাত্রীর প্রতীক্ষা করিতেছিল;

ধাত্রী আসিলে উভয়ে মিলিত হইয়া শিশু-কুমারকে নিঃশঙ্ক প্রদেশে রাখিবার উদ্দেশে যাত্রা করিল। দেওলার সামন্তপ্রধান যে বাঘ্‌জি চিতোরের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারই উত্তরাধিকারী সিংহ রাওএর নিকট ধাত্রী রাজকুমারকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। সিংহরাও বনবীরের ভয়ে কুমারের রক্ষাসাধনে সমর্থ হইলেন না। তৎপরে তাহারা ডুংগড়পুরের সামন্ত রাওল ঐশকর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিল। শিশু রাণাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তিনি স্বীয় রাজধানী নিতান্ত নিরাপদ নহে বিবেচনায় বিপদের আশঙ্কা করিলেন। ধাত্রী তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ইদরের মধ্য দিয়া আরাবলীর দুর্গম-পথসমূহ পার্ব্বত্য ভীলদিগের সাহায্যে অতিক্রম করতঃ কমলমেরুতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তত্রত্য শাসনকর্ত্তা আশাসাহ দেপ্রার বণিগ্‌জাতীয় এবং জৈনধর্ম্মাবলম্বী। ধাত্রী শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইল; শাসনকর্ত্তার সম্মুখে উপনীত হইয়া তদীয় ক্রোড়ে শিশুকুমারকে সমর্পণ করত কহিল "তোমার রাজার জীবন রক্ষা কর।" আশা সাহ ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দয়াশীলা জননী পুত্রকে ভৎর্সন পূর্ব্বক কহিলেন,— "বিশ্বাস রক্ষায় কখনই বিপদ নাই; এই কুমার সংগ্রামসিংহের পুত্র এবং তোমার রাজা, ইহাকে রক্ষা করিলে জগদীশ্বরের কৃপায় তুমি যশস্বী হইবে।" ধাত্রী পান্না এক্ষণে নিরুদ্বেগচিত্তে প্রস্থান করিল; উদয়সিংহ আশা সাহের ভাগিনেয় পরিচয়ে কমলমেরু দুর্গে শৈশবকাল অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

আশার ভাগিনেয় সম্বন্ধে সকলের মনেই সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। আশার বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক রাজপুত ও ধনবান্ অন্যান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উদয়ের আচার ব্যবহার দর্শনে তাঁহাকে রাজপুত বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন। একদা শনিগর্‌রা সামন্তপ্রধান কমলমেরুতে আগমন করেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উদয়সিংহ নিযুক্ত হন। সামন্তপ্রধান উদয়ের অনুষ্ঠিত রীতিনীতি দর্শনে মনে মনে সন্দিহান হইয়া কহিলেন "এ বালক কখনই আশা সাহের ভাগিনেয় নহে।" এই কথা চারিদিকে বিস্তারিত হইলে রাজপুতপ্রধান ও সামন্তগণ দলে দলে আগমন করিয়া সংগ্রামতনয়কে দর্শন করিতে লাগিলেন। চণ্ডাবংশের প্রতিনিধি সালুম্ব্রার সাহিদাস, কৈলবার জগ্‌গু, বাগোরের সংগ্রাম, চন্দ্রোৎবংশীয় সমস্ত সামন্তপ্রধান, কোটারিও এবং বৈদলার চোহানগণ, বিজোলীর প্রমর আখিবাজ, সাঞ্চরের পৃথ্বীরায় এবং লূণকর্ণ জৈতয়ৎ প্রভৃতি সকলেই কমলমেরুর দুর্গে সমবেত হইলেন। ধাত্রী ও ক্ষৌরিক আসিয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিল।

সভাস্থলে সকলে উপবিষ্ট হইলে আশা সাহ কুমারকে বৃদ্ধতম কোটারিও চোহানের ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। অন্যান্য সম-

যেত ব্যক্তির সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য রাজপুত সামন্তবর্গ উদয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলেন। শনিগর্রা রাও উদয়কে আপনার কন্যা সম্প্রদানে প্রতিজ্ঞা করিলেন। যদিও হামিরকে বিবধা কন্যা সম্প্রদানজনিত অপমানের জন্য শনিগর্রাদিগের কন্যা গ্রহণে হামির নিজ বংশীয়দিগকে বার বার বারণ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাহা উপেক্ষা করিয়া এই বৈবাহিক ব্যাপারে সকলেই অনুমোদন করিলেন। কুম্ভদুর্গে উদয় সিংহ রাজটীকা ধারণ করিলেন ; সে সময়ে মিবারের প্রায় সকল সামন্তপ্রধানই তথায় উপস্থিত ছিলেন।

লোকপরম্পরায় এই সমাচার বনবীরের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া গর্ব্বিতভাবে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এখন অবধি তিনি চিতোরের প্রকৃত রাজাদের ন্যায় সমস্ত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ‘ দুনা ’ উপলক্ষে এক মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল।

মিবারের রাণারা ভোজন সময়ে নিজ পাত্র হইতে খাদ্য তুলিয়া স্বহস্তে যে রাজকুমারের পাত্রে অর্পণ করেন, তিনি সামন্তগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। ইহারই নাম ‘ দুনা বা দুয়া।’ ভোজ উপলক্ষে রাণার সহিত সকল সামন্তে মানপর্য্যায়ক্রমে একত্র উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। রাণা ভোজনপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া পরিচারকের হস্তে দিয়া জনৈক সামন্তকে তাহা প্রদান করিতে আদেশ করেন। সেই সময়ে তাঁহারা সকলেই ভাবিতে থাকেন যে, “ অদ্য কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।” দিন দিন রাণারা হীনদশাপন্ন হইয়াছেন বটে, তথাপি দুনার পদ্ধতি অপনীত হয় নাই। এস্থলে উর্শিরাণার সাময়িক একটি বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে। উর্শিরাণা কৃষ্ণগড়ের ঠাকুর উপাধিধারী রাঠোর সামন্তকে এই সম্মান সম্প্রদান করিলে বিজোলীর অধ্যক্ষ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন “ কচবহ বা রাঠোর এই সম্মান লাভে অধিকারী নহেন, আমিও তাহা পাইতে আশা করিতে পারি না ; আমরা মহারাণার পাত্রাবশিষ্ট আহার করিতে পারি। এ অতি অপমানের বিষয়, কেন না, কৃষ্ণগড়ের ঠাকুর সম্মানে আমা অপেক্ষা অনেক লঘু।”

এই পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ছিল যে, ক্রমে রাণার সহিত একপাত্রে ভোজন করা যার পর নাই সম্মানের সীমা হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, মানসিংহকে এই সম্মানদানে কৃপণতা করায় মিবারের উৎসন্নদশা উপস্থিত হয়।

মিবারের সদ্বংশজাত সামন্তগণ জারজ বনবীরের হস্তে ঈদৃশ সম্মানলাভের প্রত্যাশা রাখিতেন না। একদা দুনাদানের উপক্রম হইলে প্রখর বীর্য্যবান্ চন্দোৎসামন্ত সাহস সহকারে কহিলেন “বাপ্পা রাওলের পুত্রগণহস্তে প্রদত্ত এবংবিধ সম্মান পরিচারিকা শিতলসেনীর গর্ভজাত ‘ মিবারের পঞ্চম পুত্র’ বনবীরের হস্ত দ্বারা প্রদত্ত হইলে যার পর নাই অসম্মানের বিষয় সন্দেহ নাই।” সা-

মন্তপ্রধানেরা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলমেরুতে উপস্থিত হইয়া উদয়ের সংবর্দ্ধনা করিলেন। বনবীরের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কচ্ছ হইতে পঞ্চশত অশ্ব ও দশ সহস্র বলীবর্দ্দ পৃষ্ঠে বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী আসিতেছিল, সঙ্গে এক সহস্র ঘড়্য়াল রাজপুত রক্ষী ছিল। সেই সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়া উদয়ের বিবাহব্যাপারে ব্যবহৃত হইল। ঝালোর সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী বাহ্লী নামক স্থানে উদয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইল; তদুপলক্ষে প্রায় সমস্ত রাজপুতপ্রধান সমবেত থাকিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র মাহোলীর শোলাঙ্কী ও টানা মালোজী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বনবীর তাঁহাদের উভয়কে আক্রমণ করেন, মালোজী যুদ্ধে হত হন, এবং শোলাঙ্কী বশ্যতা স্বীকার করেন। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে সকলেই বনবীরকে ত্যাগ করিলে, তিনি রাজধানী মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে উদয়কে লইয়া রাজপুতপ্রধানেরা চিতোরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুর্গদ্বার তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। বনবীর সপরিবারে পলায়ন করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দক্ষিণাপথে গমনপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বংশেই নাগপুরের বিখ্যাত ভোঁসলারা জন্ম গ্রহণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৫৪১–২ অব্দে (১৫৯৭ সংবৎ) রাণা উদয়সিংহ মিবারসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই ব্যাপারে প্রজালোকের আনন্দের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে আনন্দগীতির মনোহর ঝঙ্কার শ্রুত হইতে লাগিল। অদ্যাপি রাজপুতানায় ঈশানীর উৎসবে "কমলমেরুর বিদায়"* গীতি লোকের মানস রঞ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু সে সকল আনন্দস্রোত দীর্ঘকাল প্রবাহিত হইল না। মিবারের অশুভ-দিন, দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। কি অশুভ ক্ষণেই উদয়সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রত্ন ও বিক্রমজিতের অনুষ্ঠিত পাপাচারগুলিও উদয়ের কার্য্যপরম্পরার তুলনায় পুণ্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

উদয়সিংহের রাজ্যোপযোগী কোন গুণই ছিল না। রাজপুতগণের স্বভাবসিদ্ধ, অযত্নলব্ধ সাহস বিক্রমও তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না, সুতরাং তাঁহার কোন গুণই ছিল না, ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নহে। তথাপি তিনি সম্রাট্ হুমায়ুনের শান্তিময় শাসনসময়ে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে পারিতেন, কিন্তু মিবারের ভাগ্য তেমন নহে। তখন এক রাজকুমার নিভৃতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃক্রোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক হিন্দুজাতির জন্য দুর্ভেদ্য নিগড় প্রস্তুত করিতেছিলেন। হিন্দুজাতিকে তিনি যে নিগড় দিয়া বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ক্রমে ঐ জাতির অধঃপতন হইয়াছে।

যে বৎসর কমলমেরুর মেঘাবৃত রাজপ্রাসাদে † উদয়ের মঙ্গলগীতি গীত হইয়াছিল, সেই বৎসরেই অমরকোটের প্রাচীর বেষ্টিত প্রকোষ্ঠমধ্যে শোকসূচক শব্দ সঞ্চ-

* Komalmeer biddaona.

† Badul Mahl.

রিত হইয়া বায়ুপ্রবাহদ্বারা চতুর্দ্দিকে আকবরের জন্য সমাচার প্রচারিত হয়। পাঠানজাতীয় সের (সিংহ) সাহ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া সম্রাট্ হুমায়ুন ১০ দশবৎসর কাল ভারতের নানা স্থানে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিয়া বেড়ান। তিনি সময়ে সময়ে এমন বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন যে, তাহা হইতে উদ্ধারের কোন আশাই ছিল না। কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই, বরং কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল। কান্যকুব্জের সমরক্ষেত্রে তিনি রাজাহারা হইয়া স্বগণসমভিব্যাহারে পলায়নপরায়ণ হন। সেরসাহের দৌরাত্ম্যে তিনি কোন স্থানে নিরুদ্বেগে বিশ্রামলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ক্রমে আগ্রা, লাহোর, মূলতান প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী স্বগণেরাও শেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে; পরিশেষে তিনি তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া একাকী যাত্রা করেন। যশলমীর ও যোধপুরে আশ্রয় পাইলেন না, রাঠোর ও ভট্টীরাও তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন না। মল্লদেব তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে অমরকোটের পরমদয়ালু নরপতি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এই স্থানেই মহাত্মা আকবর জন্মগ্রহণ করেন। আমরা নিম্নে আকবরের জন্মবিবরণ ফেরেস্তা হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"হুমায়ুন মধ্যরাত্রে অশ্বারোহণে টাট্টা হইতে অমরকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অশ্বের মৃত্যু হইল। তদীয় অনুচর তাঙ্ বেগের নিকট হুমায়ুন অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি এরূপ নীচমনা ছিল যে সে তাহাতে স্বীকৃত হইল না। তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাতে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্রাট্ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। নিধিম খোকা নামক জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর নিজ মাতাকে অশ্বহইতে অবতরণ করাইয়া সম্রাটকে অশ্ব প্রদান করিল। শেষে তাহার মাতাকে উষ্ট্রে চড়াইয়া আপনি পদব্রজে পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল।

"যে স্থান দিয়া তাঁহারা পলায়ন করিতে ছিলেন, তাহা বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি। জলাভাবে সকলের প্রাণ বাহির হইতে লাগিল, কতকগুলি যেন উন্মত্তের ন্যায় হইল, কেহ কেহ পড়িয়া মরিয়া গেল, চারিদিকে কাতর স্বর ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। একে এই বিপদ, তাহার উপর আবার সমাচার আসিল, শত্রুসৈন্য পশ্চাতে। হুমায়ুন আদেশ করিলেন, যাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম তাহারা অগ্রসর হউক, স্ত্রীলোক ও দ্রব্যসামগ্রী পশ্চাতে থাকুক। শত্রু তখন উপস্থিত হইল না, সম্রাট্ সপরিবারে অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

"রজনীর সমাগমে পুরোবর্ত্তিগণ পথহারা হইল; প্রাতঃকালে তাহারা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। শেখ আলী নামক জনৈক সাহসী বীরপুরুষ বিংশতিসংখ্যক সেনানী সমভিব্যাহারে জীবন সঙ্কল্প করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল। ঈশ্বরের নাম লইয়া প্রাণ-

পণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক তীরে বিপক্ষ অধ্যক্ষ গতাসু হইল, অপরেরা এই কয় জন মাত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। তখন অনেক মোগলেরাও তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কতকগুলি উষ্ট্র ও ঘোটক কাড়িয়া লইয়া আসিল। যেদিকে সম্রাট্ গমন করিয়াছেন, এখন তাহারা সেই দিকে চলিল, এবং পথিমধ্যে একটি কূপের নিকট হুমায়ুনকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল।

"পরদিবস তাহারা সেখান হইতে যাত্রা করিল, পথিমধ্যে তাহাদের প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। দুই তিন দিবস কেহই জলপান করিতে পাইল না, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে লাগিল। চতুর্থ দিবসে তাহারা একটি কূপ দেখিতে পাইল, তাহাও আবার এত গভীর যে, এক এক পাত্র জল উঠাইতে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। কূপহইতে এক একবার জল তুলিয়া চেঁড়াদ্বারা সেই সমাচার প্রচারিত হইতে লাগিল। চেঁড়ার শব্দ শুনিয়া ক্রমান্বয়ে সকলে আসিয়া জল পান করিতে লাগিল। তৃষ্ণায় সকলে এমন অধীর হইয়াছিল যে, জলপাত্র উঠিবামাত্র সকলে শশব্যস্তে তাহার উপর গিয়া পড়ায় জলপাত্র ছিন্নসূত্র হইয়া কূপমধ্যে নিপতিত হইল, সেই সঙ্গে পিপাসাতুর কতকগুলি ব্যক্তিও কূপে পতিত হইল। এই ব্যাপারে চারি দিকে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল। কেহ বা জিহ্বা বাহির করিয়া উত্তপ্ত বালুকায় ঘর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ বা এ সময়ে মৃত্যুই সকল যন্ত্রণা দূর করিবে বলিয়া কূপে নিপতিত হইল! বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের দারুণ দুর্দ্দশা দর্শনে সম্রাটের যে কি উৎকণ্ঠা ও শোক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।

"পরদিবস তাহারা জল প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তাহাতে আরও বিপদ ঘটিল। উটেরা অনেক দিনের পর এত জল খাইল যে, অনেকগুলি পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল। অনুচরবর্গের মধ্যেও অনেকে জল পানের অর্দ্ধ ঘটিকা পরে মরিয়া যাইতে লাগিল।

"এই অশ্রুতপূর্ব্ব দারুণ দুর্দ্দশার পর হুমায়ুন অতি অল্পসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে অমরকোটে উপস্থিত হইলেন। তথাকার ন্যায়পরায়ণ দয়াবান্ নরপতি সম্রাটকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক যারপর নাই শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

"৯৪৯ নয়শত উনপঞ্চাশ হিজরা, রাজিবের পঞ্চম দিবস, রবিবার অমরকোটে হামিদা বানুবেগম আকবরকে প্রসব করিলেন। হুমায়ুন জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক রাজারাণার আশ্রয়ে পরিবার রক্ষা করিয়া শত্রু বিপক্ষে যাত্রা করিলেন।"

বাবরের ন্যায় আকবরও দুঃখের ক্রোড়ে লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। নবকুমার জন্মিবার দ্বাদশ বৎসর পর পর্য্যন্ত হুমায়ুন নানাস্থানে পলায়ন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময়ে ছয় জন সের বংশীয় পাঠান ক্রমান্বয়ে দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শেকন্দর সেরের রাজত্ব সময়ে বিবিধ গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। হুমায়ুন এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ত্বরায়

সিন্ধুনদ অতিক্রম করত শিরহিন্দে উপস্থিত হন। শেকন্দর সসৈন্যে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে দ্বাদশবর্ষীয় শিশু আকবর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রবীণেরা আকবরের অমানুষী শৌর্য্যপ্রকাশকে নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হুমায়ুন সেরূপ ভাবেন নাই। তিনিই আকবরকে সৈনাপত্য কার্য্যে আদেশ করিয়াছিলেন। বালকের বীরত্ব দর্শনে সেনাগণ এবংবিধ উৎসাহিত হইয়াছিল যে, অনধিক সময় মধ্যে তাহারা অধিক সংখ্যক সৈন্যের উপর জয়লাভ করিয়া যশঃপতাকা উড্ডীন করিল। আকবরের ভাবী খ্যাতি প্রতিপত্তির এই প্রাথমিক সূত্র। আকবর যে বয়সে এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন, ঠিক্ সেই বয়সে তাঁহার পিতামহ বাবর বিবিধ বিপত্তি অতিক্রম করিয়া স্বীয় বীর্য্যবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বাবরের উপযুক্ত পুত্র ও আকবরের উপযুক্ত পিতা হুমায়ুন জয়োল্লাসে দিল্লি প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তিনি আর অধিক দিন রাজমুকুট ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় পুস্তকালয়ের সোপানে পতিত হইয়া বিগতজীবিত হন।

আকবর সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছু দিনের মধ্যেই দিল্লি ও আগ্রা তাঁহার হস্তবহির্ভূত হইয়া যায়। এই সময়ে পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র তাঁহার অধিকারভুক্ত থাকে। কিন্তু তাঁহার সুবুদ্ধি সচিব অদ্ভুতকর্ম্মা বইরাম খাঁর বীর্য্যবলে অনধিক কাল মধ্যে লুপ্তাধিকারগুলি পুনরায় হস্তগত হইল। কল্পী, চাঁদরী, কালিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব ত্বরায় তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আকবর স্বহস্তে সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। অনতিকাল মধ্যেই তিনি রাজপুতদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। পিতার প্রতি শত্রুতা করিয়াছিল বলিয়াই কি তিনি মল্লদেবের প্রতি প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া রাঠোরদিগের বিপক্ষে যাত্রা করত মাড়বারের দ্বিতীয় নগর মৈর্ত্তিয়া অধিকার করিলেন! অম্বরেশ্বর বহরমল্ল ও তাঁহার পুত্র ভগবানদাস আকবরের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রধান সভাসদরূপে বাস করিতে লাগিলেন। বহরমল্ল আকবরকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিলেন। তদবধি অম্বর মিত্ররাজ্যে পরিণত হইল। এই সময়ে উজবেকদিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তাহার নিবারণ জন্য কিছু দিন আকবর রাজপুতানার দিক্ হইতে দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন পূর্ব্বক চিতোরের প্রতি অস্ত্রচালনার সময় পাইলেন।

যদিও চিতোরের জন্য অনেকানেক বীর পুরুষ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি যে তথায় আর বীর ছিল না এমন নহে। কিন্তু উদয়ের কোন বিষয়েই সুশৃঙ্খলা ছিল না। তিনি নিজেও ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন না, কাহারও পরামর্শ শুনিয়াও কার্য্য করিতেন না। তাঁহার উপপত্নীই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল, তাহারই আদেশে উদয়সিংহ ও মিবার শাসিত হইত।

উদয়সিংহ যে বয়সে মিবার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, দিল্লির সিংহাসনে উঠিবার সময়ে আকবর তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক হন নাই। উভয়েরই বয়ঃক্রম ত্রয়োদশবর্ষ অতিক্রম করে নাই। অসামান্য রাজনীতিসম্পন্ন বইরাম এবং জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক চূড়ামণি আবলফজল, আকবরের পরামর্শদাতা ছিলেন। উদয়ের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। আকবর জন্মাবধি অবস্থাবৈচিত্র মানবস্বভাব অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু উদয় জন্মাবধি সাধারণ চক্ষের অলক্ষ্য স্থানে অবস্থিত থাকিয়া শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে নিতান্ত হীনদশাপন্ন হইয়াছিলেন।

• প্রকৃতপক্ষে আকবরই মোগলরাজ্যসংস্থাপন করেন এবং রাজপুতদিগের স্বাধীনতাহরণপক্ষে একমাত্র তিনিই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে বীরতা ও ধার্ম্মিকতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" কহিয়া থাকে। বিজিতেরাও তাঁহাকে "জগদ্গুরু" বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তিনি সাহাবুদ্দিন ও আলার ন্যায় দুষ্ক্রিয়াশাল বলিয়া দুর্নাম পাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি রোগের ঔষধ দিবার ব্যবস্থা জানিতেন বলিয়াই তাহা ঘটে নাই। তিনি একলিঙ্গের মন্দিরে মস্‌জিদ করিয়া তথায় কোরাণ পাঠ করাইয়াছিলেন। তিনি শেষে এই সকল দুষ্ক্রিয়ার প্রতিকার করিয়াছিলেন, বিবিধ সৎকার্য্যের দ্বারা শেষে তিনি সকলের চিত্তরঞ্জন করিয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

উদয়সিংহের রাজোপযোগী কোন গুণই ছিল না। তাঁহার সময়েই চিতোরের রাজলক্ষ্মী দূর হইয়া যান। প্রথমবারে অল্লার আক্রমণ সময়ে দ্বাদশ কুমারের বলি প্রাপ্ত হইয়া দেবী সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার, যখন দক্ষিণ দেশ হইতে রাজবাহাদুর আসিয়া আক্রমণ করেন তখন দেওলার সামন্ত আপনার জীবনদানে রাজলক্ষ্মীকে স্থানভ্রষ্ট হইতে দেন নাই। এবার উদয়ের গুণে রাজবলি কেহই উপস্থিত নাই।

আকবর কর্ত্তৃক চিতোর দুর্গ আক্রান্ত হইলে উদয়ের উপপত্নী বীরবেশে সজ্জিত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বীরোচিত কার্য্য করিয়াছিল; এমন কি, মোগল শিবির পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতেও পরাঙ্‌মুখ হয় নাই। তাহার সেই উদ্যম সন্দর্শনে আকবরকেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। হীনবুদ্ধি উদয় প্রচার করিয়া দিলেন যে,এই স্ত্রীলোকের জন্যই নগর রক্ষা হইল। সামন্তেরা ও কথায় যারপরনাই বিরক্ত হইয়া একটি চক্রান্ত করত ঐ রমণীর প্রাণ বধ করিল। ইহাতে যে গৃহবিচ্ছেদ ও আত্মবিবাদ উপস্থিত হইল, তাহারই সূত্র ধরিয়া আকবর পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। আকবর তখন পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবা পুরুষ। চিতোর আক্রমণে তাঁহার নবানুরাগের সহিত বলবতী স্পৃহা জন্মিল। অদ্যাপি তাঁহার শিবিরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পাণ্ডোলী নগর হইতে প্রায় পঞ্চক্রোশ

স্থানে ব্যাপৃত হইয়াছিল। এই শিবির মধ্যে যে স্থানে আকবরের অবস্থান ছিল, তাহারও চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে একটি শ্বেত প্রস্তরখণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছিল— উহার নাম "আকবার কা দেওয়া।"* চিতোরের সম্মুখে আকবর উপবেশন করিবামাত্র রাণা পলায়ন করিলেন। সাহসী রাজপুত বীর পুরুষগণ সেই সঙ্গে চলিয়া না গিয়া চিতোর রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। চণ্ডাবংশীয় বহুসংখ্যক বীর পুরুষ সমভিব্যাহারে সাহীদাস দুর্গদ্বার রক্ষায় সন্নদ্ধ হইলেন, কিন্তু সেই খানে শত্রুহস্তে তাঁহার পতন হইল। মাদেরিয়ার দুদা রায়ত স্বদলসহ অগ্রসর হইলেন। দিল্লির পৃথ্বীরাজ বংশীয় বৈদ্‌লা ও কোটারিয়ার মিত্র সামন্তদ্বয়, বিজোলীর প্রমর সামন্ত, সাদ্রীর ঝালা প্রভৃতি মিবার সর্দারগণ আপন আপন সম্প্রদায়কে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক শত্রুনিপাতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এতদ্ভিন্ন ঝালোরের শনিগররা রাও ঈশ্বরীদাস রাঠোর, করমচাঁদ কচ্‌বহ্, দুদা সাদনী, গোয়ালিয়রের তুয়ার রাজ এবং দেওলা সামন্ত প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গ চিতোর রক্ষায় যত্নবান্ হইলেন।

এই ব্যাপারে যিনি যতই কেন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করুন না, মিবারের ষোড়শ প্রধান সামন্তের মধ্যে বেতনোরের জয়মল্ল, এবং কৈলয়ার পট্ট এই বীরদ্বয় যেরূপ অলৌকিক বলবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এমন আর কেহই নহেন। রাজপুত কবিগণ এই বীর যুগলের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আকবর স্বহস্তে তাঁহাদের বীরকার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমোক্ত বীর জয়মল্ল, মাড়োয়ারের অতি সাহসী মৈর্ত্তি বংশীয় রাঠোর, দ্বিতীয় বীর পট্ট চণ্ডাবংশীয় জগৌৎদিগের প্রধান সামন্ত। জয়মল্ল ও পট্টের নাম রাজস্থানে সকলের মুখেই উচ্চারিত হইত; এবং যত দিন তথায় প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি জাগরূক থাকিবে, ততদিন এই উভয় নাম লুপ্ত হইবে না, মিবারের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে গ্রথিত রহিবে।

দুর্গদ্বার রক্ষায় যখন সালুম্ব্রার পতন হইল, তখন পট্ট অগ্রসর হইয়া সৈনাপত্য ভার গ্রহণ করিলেন। চিতোরে যে দ্বিতীয় আক্রমণ হয়, তাহাতেই পট্টের পিতা লীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে পট্টের বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র, তিনি এই বয়সেই রাজপুত বীরধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। তিনি তদীয় বীর-মাতার আদেশে রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইলেন। মাতাও স্বয়ং বীরবেশে ভূষিতা হইয়া বালিকা বধূকেও বীরবেশে সাজাইলেন। চিতোররক্ষক বীরগণ স্বচক্ষে দেখিলেন, বীরমাতা ও বীরবধূ শত্রু নিপাত করিতে করিতে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন। রাজপুত বীরগণ এই ব্যাপার দর্শন করত সকলেই জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া রণসাগরে লম্ফপ্রদান করিল। সকলেই রণোন্মত্ত, কাহারও মন অপর কোন দিকে ধাবিত নহে। বীর নারীদ্বয়ের পতনে তাহারা যেন আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। জীবনের শঙ্কা নাই—কেবল শত্রু নিপাত-

* Akber's Lamp.

নের বাসনা মাত্র হৃদয়ে জাগরূক। এমন সময়ে দূর হইতে একটি গুলি আসিয়া জয়মল্লের পতন সাধন করিল। ইতি মধ্যে দুর্গদ্বারে পট্ট অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক রণশয্যায় শায়িত হইয়াছেন। মর্ম্মান্তিক জহর ব্রতের আয়োজন হইতে লাগিল। অষ্টসহস্র পরিমিত রাজপুত শেষ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রণে প্রবেশ করিল। চিতোর-দ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত হইল, অভ্যন্তরে 'জগদ্গুরু' র নিষ্ঠুর আচরণ আচরিত হইতে লাগিল। সকলেই রণযজ্ঞে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছে—কে আর আকবরের পথরোধ করিবে? ন্যায়দৃষ্টিতে দেখিলে এটিকে আকবরের অযশস্কর কার্য্য বলিব তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আকবর—জগদ্গুরু আকবর,—ন্যায়বান্ আকবর,—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বিশেষণীভূত মহাত্মা আকবর ত্রিংশৎ সহস্র বলি গ্রহণ করিলেন। সপ্তদশ সহস্র রাজকুটুম্ব ইহাতে জীবনদান করিলেন। কেবল মাত্র গোয়ালিয়রের তুয়ার রাজকুমার আর একদিনের যশোলাভের জন্য জীবিত রহিলেন। কিন্তু কেহই আকবরের বেগ সংবরণে কৃতকার্য্য হইল না। নয় রাজ্ঞী, পাঁচ রাজকুমারী, দুইটি শিশু রাজকুমার, এবং বহু সংখ্যক অনুপস্থিত রাজপুত-সামন্তের মহিলা জহরে জীবনার্পণ করিলেন। রাজলক্ষ্মী এবার নিতান্তই চিতোর পরিত্যাগ করিলেন। রবিবারে এই ধ্বংস কার্য্য সম্পন্ন হইল। * ধ্বংসের আর কিছুই শেষ রহিল না; পূর্ব্ব দুইবারে চিতোরের সৌন্দর্য্যসম্পন্ন আর্য্যশিল্পের অধিকাংশ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু 'গুণগ্রাহী' আকবর তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। তিনি চিতোরের সমস্তই নষ্ট করিলেন। 'আকবরাবাদ' নগর সংস্থাপনের উপযোগী অধিকাংশ উপকরণ এখান হইতে লইয়া গেলেন। চিতোরের সমস্ত রাজচিহ্ন বিধ্বংসিত হইল।

জয়মল্লকে স্বহস্তে নিপাত করিয়াছেন বলিয়া আকবর অহঙ্কার করিয়াছিলেন। জয়মল্ল ও পট্টের বীরত্ব দর্শনে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, দিল্লির রাজ-প্রাসাদের সম্মুখেই তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কার্থেজবীর কেনী যুদ্ধে রোমকদিগের উপর জয়লাভ করিয়া বিজিত অশ্বারোহিগণের অঙ্গুরি সমূহ একত্রিত করত তাহার গণনা দ্বারা নিজ কৃতার্থতার পরিমাণ গণনা করিয়াছিলেন। আকবর এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করেন। মৃতশত্রুর রত্নকণ্ঠীর পরিমাণ ৭২॥০ সাড়ে বায়াত্তর মণ হয়। তদবধি রাজপুতানায় ৭২॥০ সাড়ে বায়াত্তর অঙ্ক অতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়া আছে। যে পত্রের শিরোনামা পৃষ্ঠে ৭২॥০ অঙ্ক থাকে, তাহা অপর ব্যক্তি উদ্ঘাটন করিলে তাহার উপর চিতোর ধ্বংসের পাপ নিপতিত হইবে, ৭২॥০ অঙ্ক ঠিক ঐ অর্থে না হউক, উহা যে নিবারণ সূচক শপথ, তাহা রাজপুতানা ভিন্ন ভারত-

* সূর্য্য তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। সেই নামাঙ্কিত বারে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল।

বর্ষের অন্যান্য স্থানেও অবিদিত নাই। বঙ্গদেশেও পত্রের শিরোনামের পৃষ্ঠে ৭২॥০ এই অঙ্ক সন্নিবেশিত করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

চিতোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদয়সিংহ রাজপিপলীর অরণ্যে গোহিলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথা হইতে তিনি আরবেলীর উপত্যকায় গমন করেন। এই উপত্যকার প্রবেশ-পথে বহুকাল পূর্ব্বে উদয়সিংহ একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন; ঐ সরোবরের নাম 'উদয় সাগর।' এই স্থানে তিনি এখন 'নচৌকী' নামে একটি ছোট রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত করিলেন—তাহার চারিদিকে আরও কতকগুলি প্রাসাদ প্রস্তুত হইলে ঐ স্থানটি নগরে পরিণত হইল,ঐ নগর উদয়পুর নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই উদয়পুর এখন মিবারের রাজধানী।

চিতোর ধ্বংসের চারিবৎসর পরে দ্বাচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে গোগুন্দা নগরে উদয়সিংহের জীবলীলার অবসান হয়। তাঁহার পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পুত্র ছিল, কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া প্রিয়পুত্র জগমলকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। মিবারের সামন্তপ্রধানেরা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রতাপসিংহকেই সিংহাসন অর্পণ করেন। প্রতাপ রাজাসনে আসীন হইয়াই আগামি বর্ষের শুভাশুভ ফল নির্ব্বাচন জন্য চির প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সামন্তপ্রধানদিগের সহিত মিলিত হইয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। তাহাতে আগামি বর্ষের ফল শুভজনক রূপে পরিণত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইলেন। ক্রমশঃ—

রাজা রাজবল্লভ সেন।

মোগলাধিকার কালে মালখাঁনগর নিবাসী বসু মহাশয়দিগের হস্তে বিক্রমপুরের কার্য্যগুই ভার ন্যস্ত ছিল। বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে বিলদাওনীয়া নিবাসী কৃষ্ণজীবন মজুমদার উক্ত বসু মহাশয়দিগের সেরেস্তায় মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত কৃষ্ণজীবনই রাজা রাজবল্লভসেনের পিতা।

প্রবাদ আছে রাজবল্লভ যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় একদা নিশীথকালে কৃষ্ণজীবনের পত্নী স্বপ্নে দেখিলেন যেন একটি পূর্ণচন্দ্র তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে।* এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অমনি তিনি তাঁহার স্বামীকে জাগরিত করিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। তৎশ্রবণে মজুমদার বিনা বাক্যব্যয়ে পত্নীর কপোলে এক চপেটাঘাত করিলেন। মজুমদার-পত্নী

* ভারতী পত্রিকায় "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" দেখ।

রোদন করিয়া অবশিষ্ট রজনী যাপন করিলেন্। নিশা অবসান হইলে মজুমদার স্বীয় পত্নীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার অভিলাষে আমি চপেটাঘাত করি নাই। তোমাকে নিদ্রা যাইতে না দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন, সুস্বপ্ন দর্শন করিয়া নিদ্রা গেলে সে স্বপ্ন কখনই সফল হয় না। মজুমদার-পত্নী পতির এই সকল বাক্য শ্রবণে বিষাদ পরিত্যাগ করিলেন। কালক্রমে এই গর্ভে চন্দ্রমার অবতার রাজবল্লভ জন্ম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে মগধদেশের অধীশ্বর খ্যাতনামা জরাসন্ধ কৃষ্ণজীবনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবল্লভ আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন।*

বলা বাহুল্য যে নীচাশয় চাটুকারবর্গ এই সকল প্রবাদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যদি পুরাণ হইতে চন্দ্রমার ঘৃণিত কার্য্যের বর্ণনা উল্লেখ করিয়া রাজবল্লভের কুকার্য্যের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে আমরাও শ্লেষবাক্যে রাজবল্লভকে চন্দ্রমার অবতার বলিতে পারি।

রাজবল্লভ শিশুকালে পৈতৃক প্রভু বসুদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি মুরশিদাবাদ যাইয়া জগৎসেঠের সরকারে এক মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদন্তে সুযোগ ক্রমে নবাব সরকারে প্রবেশ করেন। ১৬৫১ শকাব্দে মুরাদ আলী যখন ঢাকার নবাব হইয়া প্রেরিত হন, সেই সময় রাজবল্লভ তাঁহার সহিত "নাওরা" মহালের পেস্কার হইয়া আসেন।†

মুরাদ আলী ও রাজবল্লভ ক্রূর, নির্দ্দয়, ও স্বার্থপর ছিলেন। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহারা প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মহাশয় যশোবন্ত সিংহ ঢাকা "নেবায়তের" দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুরাদ ও রাজবল্লভের আচরণে নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন। যশোবন্তের কার্য্য পরিত্যাগে সেই দুর্বিনীতদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কি প্রজা কি ভূম্যধিকারী রাজবল্লভকে উৎকোচদ্বারা সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না। এই সময় রাজবল্লভ জমিদারদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া জমিদারি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ভাটী প্রদেশস্থ বোজরগ উমেদপুর তাঁহার প্রথম ভূসম্পত্তি।

* "আদৌ রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভঃ"।

† ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, প্রভৃতি জেলা সমূহের অন্তর্গত কতকগুলি পরগণা মোগল সরকারে 'নাওরা' মহাল নামে পরিচিত ছিল। এই সকল পরগণার রাজস্বদ্বারা মোগলদিগের রণতরীর ব্যয় নির্ব্বাহ হইত, তদতিরিক্ত এই সকল পরগণার জমিদারগণ কোষ নৌকা রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন।

১৬৬২ শকাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব নাজিম হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ জামাতা সুবার দেওয়ান সহমত জং নিবাইস মহম্মদকে ঢাকার নবাবের পদে নিযুক্ত করেন। নিবাইস মহম্মদ রাজবল্লভকে তাহার পূর্ব্ব পদে স্থির রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অত্যাচারের লাঘব হইয়াছিল। রাজবল্লভ কিছুকাল বিড়াল তপস্বীর ন্যায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। অনন্তর নিবাইস মহম্মদ অকালে পরলোক গমন করিলে আলিবর্দ্দি স্বীয় দুহিতাকেই তাহার স্বামীর সিংহাসনে স্থির রাখিলেন। এই সময় রাজবল্লভই ঢাকার প্রধান রাজপুরুষ; ক্রমে তাঁহার সহিত বিধবা শাসন কর্ত্রীর একটি ঘৃণিত সম্পর্ক সৃষ্ট হইল। জনৈক প্রাচীন বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, নিবাইস-পত্নীর সহিত রাজবল্লভের যে সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা জাতি, ধর্ম্ম, ব্যবহার ও বিধিবিরুদ্ধ বটে। যদিচ রাজবল্লভ এই সময়ে নবাব উপাধি ধারণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ নিবাইস মহম্মদের সমস্ত সম্পত্তি ও অধিকার তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে রাজবল্লভ বিস্তৃত জমিদারী ও বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিলেন। তিনি নানাবিধ অট্টালিকা নিজ নিকেতনে নির্ম্মাণ করিয়া বিলদাওনীয়াকে 'রাজনগর' আখ্যা প্রদান করিলেন। তিনি যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন তৎসমস্তই করাল কালরূপা কীর্ত্তিনাশার * উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। "বিক্রমপুরের ইতিহাস" নামক একখণ্ড ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

"নৃপতির বহির্বাটীস্থ সিংহদ্বারোপরি উত্তুঙ্গ চূড়াসম্বলিত একবিংশতি রত্ন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সিংহদ্বার ধনু আকারে ইষ্টক নির্ম্মিত। অনেকে ঐ রত্নরাশি গণনাকালে ভ্রমপ্রমাদে নিপতিত হইয়াছেন। সচরাচর সাধারণ লোকে উহাকে "একুশরত্ন" শব্দে অভিহিত করে। রত্নরাজি প্রোক্তাবস্থায় বিরাজমান থাকিয়া নানা দেশীয় ভ্রমণকারী ও দর্শকবৃন্দের মনোনেত্র আশ্চর্য্যরসে পরিপ্লুত করিতেছে। কিয়দ্দূরে ইষ্টকগঠিত একটি দোলমঞ্চ সংস্থাপিত রহিয়াছে, দোলমঞ্চ এরূপ উচ্চ যে তাহার চূড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বকীয় নেত্রের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। দোলটি সপ্তদশ রত্নে মণ্ডিত ও সুশোভিত। মূলপ্রদেশে চতুষ্কোণে চারিটি, তদনন্তর দোলমন্দির প্রথম স্তম্ভের চারিকোণে চারিটি, তৎপর মধ্য স্তম্ভে চারিটি, তদূর্দ্ধ স্তম্ভদেশে অপর চারিটি রত্ন এবং চূড়ার উপর অবশিষ্ট রত্নটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রত্নাবলী ক্রমান্বয়ে উচ্চ। এই দোলের সর্ব্বোচ্চ শিখরোপরি উত্থিত হইয়া অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে পথবর্ত্তী গমনশীল লোকদিগকে ক্ষুদ্র বিড়াল অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না, এবং ঈদৃশী তরঙ্গময়ী সুবিস্তৃতা পদ্মাকেও একখানি ক্ষুদ্রপরিসর ধৌত উত্তরীয় বসনবৎ ভ্রম

* বীরকেশরী চাঁদরায় ও কেদার রায়ের কীর্ত্তিপুঞ্জ গ্রাস করিয়া, বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা—"কীর্ত্তিনাশা" আখ্যা ধারণ করিয়াছেন।

হয়। বস্তুতঃ একুশরত্ন হইতে সপ্তদশরত্ন যে অপেক্ষাকৃত সমধিক আশ্চর্য্য দর্শন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।* দোলমঞ্চোপরি একাদিক্রমে সোপানপংক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে দুই তিন বার বিশ্রাম করিতে হয়।

*   *   *   *

*   *   *   *

"শ্রুত আছে, নৃপতি-পুঙ্গব রাজবল্লভের আদেশানুসারে ছয়পশুরি (ত্রিশসের) সুবর্ণ দ্বারা একটি কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। প্রতিদিন মহা আড়ম্বর সহকারে উহার অর্চ্চনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। অধুনা তাহার চিহ্নও আছে কি না সন্দেহস্থল। রাজবাটীর অধিকাংশ স্থলই সম্প্রতি ভয়ানক ভুজঙ্গ ও হিংস্র জন্তুনিচয়ের আবাসভূমি হইয়াছে। তাহাদিগের ভীম গর্জ্জনে নিকটস্থ হওয়া কাহার সাধ্য ?

*   *   *   *

*   *   *   *

"রাজবল্লভ কতকগুলি সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করাইয়া যান। তৎসমুদায়ের এক একটি এরূপ দীর্ঘ যে,এক তট হইতে বন্দুক ধ্বনি করিলে তটান্তরস্থ লোকেরা শুনিতে পাইত না। ব্যবহারানুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ যে দীর্ঘিকায় স্নান করিতেন তাহার নাম 'রাজসাগর,' রাজ্ঞীদিগের স্নান-দীর্ঘিকার নাম 'রাণীসাগর' ধাত্রীদিগের স্নান জন্য খনিত দীঘি 'ধাইসাগর' এবং অনুচরগণ যে জলাশয়ে শুক পক্ষীকে স্নান করাইত, তাহা 'শুকসাগর' বলিয়া অভিহিত। তদতিরিক্ত আর আর অনেকগুলি পুষ্করিণী ছিল। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে যে চৌগাড়া ছিল তাহার পরিসর পদ্মার কোন কোন শাখা নদী অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না।"

প্রোক্ত বিক্রমপুরের ইতিহাস ১২৭৫ বঙ্গাব্দে লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর রাজবল্লভের কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তিনাশায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ভগবান মনু বলিয়াছেন ;—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

রাজা রাজবল্লভ "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাকে বলিলেন মহারাজ উপবীতধারী বিশুদ্ধ আর্য্য ব্যতীত ইহাতে অন্যের অধিকার নাই। তৎশ্রবণে রাজবল্লভ বৈদ্যজাতির উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। অর্থের অসাধ্য কিছুই নাই। দেখিতে দেখিতে দশলক্ষ টাকা রাজবল্লভের ধনাগার হইতে অন্তর্হিত হইল। নানা প্রকার গ্রন্থ হইতে বৈদ্যজাতির বিশুদ্ধত্ব বিষয়ী প্রমাণ বাহির হইতে লাগিল, বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় করা হইল, (কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং) গৌড়েশ্বর সেনরাজগণকে বৈদ্য নির্ণয় করিয়া রাজবল্লভ আপনাকে তদ্বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

* এরূপ একটি সপ্তদশ রত্ন কুমিল্লা নগরে বিরাজিত থাকিয়া প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের উপবীত ছিল না। * পাঠক একবার সিন্ধুনদের তীরভূমি হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত পর্য্যটন কর, দেখিতে পাইবে অম্বষ্ঠ একপ্রকার কায়স্থ। কায়স্থগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—করণ কায়স্থ ও অম্বষ্ঠ কায়স্থ। †

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ কায়স্থদিগের উপনাম ধারণ পূর্ব্বক জাতীয় প্রাধান্য সংস্থাপনের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

আমরা "অম্বষ্ঠসম্বাদিকা" নামে বৈদ্যদিগের একখণ্ড কুলজী গ্রন্থ দর্শন করিয়াছি। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বৈদ্যদিগের পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত ছিল। কিন্তু তাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়া যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করায় রাজবল্লভ অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বৈদ্যদিগকে পুনর্ব্বার যজ্ঞসূত্র ধারণ করাইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, বৈদ্যগণও প্রকারান্তরে আমাদের বাক্য স্বীকার করিতেছেন।

আমরা বঙ্গদেশীয় কুলজী গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য এক কপর্দ্দকও স্বীকার করিতে পারি না। অধিকন্তু বৈদ্যকুলজীগুলি নিতান্ত অভিনব। আমাদের সুম্মুখস্থিত অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা, (১৭৭১ শক) ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে লিখিত হই-

*বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাক্তর বকনন ও ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখিয়াছেন,—

"Rajballabh, the grand father of the present representative, was in very affluent circumstances, and purchased from the Brahmans at a great expense (it is said 10 lakhs of Rupees) the previlege for the medical caste of wearing a thread like the sacred order."

Eastern India Vol. II page 615.

"বাদসাহি দেওয়ান নবাব শহামৎ জঙ্গ বড় দাতা ছিলেন, তাহার দেওয়ান বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ ছিলেন, তিনিও বড় দাতা ছিলেন, তিনি বৈদ্যদিগকে যজ্ঞোপবীত দিলেন। পূর্ব্বে বৈদ্যবদের যজ্ঞোপবীত ছিল না।" রাজাবলী ১১০ পৃষ্ঠা।

† বাঙ্গালায় করণ ও অম্বষ্ঠ কায়স্থ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। "বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাসে" আমরা তাহার দুই একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিব। প্রায় ৩। ৪ বৎসর অতীত হইল আমরা দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে "চন্দ্রদ্বীপের ভৌমিক" বংশের বিবরণ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

* ডাক্তর বকনন মালদহ অবস্থানকালে শুনিতে পান যে, রাজবল্লভ ও তদ্বংশধরগণ আপনাদিগকে বল্লালবংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি এই বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামে পদার্পণ করেন। সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন "ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজগণ চন্দ্রবংশজ, এই উক্তি যেরূপ হাস্যজনক ও অকর্ম্মণ্য, রাজবল্লভ ও তাহার সন্তান সন্ততির উক্তিও তদ্রূপই বটে।"

আছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই প্রকার অভিনব ও মূল্যহীন পুস্তক হইতে বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কোনও কোনও লেখক বিশ্ববিজয়ী বীরপুরুষের ন্যায়, সাহিত্য রণাঙ্গণে পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক " যুদ্ধং দেহি " বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক জাতীয় পক্ষপাতান্ধ "অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা" লেখকও প্রকারান্তরে আমাদের উক্তির সত্যতা পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা আমাদের সুখের বিষয়।

রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেন রাজগণ সমাজে "অম্বষ্ঠ" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তদনুসারে সচিবকুলতিলক আবুলফজল ও জোসেফ টিফ্‌ফিন তল্লার তাহাদিগকে কায়স্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

রাজবল্লভ এইরূপ আপনাকে বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ রাজবংশজ স্থির করিয়া* "অগ্নিষ্টোম" ও " অত্যগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

রাজবল্লভের সাতপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাস পিতার সহকারী স্বরূপ ঢাকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। রামদাস নিতান্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন। সতীর সতীত্ব নাশ তাহার নিত্য কার্য্য ছিল। অদ্যাপি ঢাকানিবাসিগণ তাহার এই কার্য্য স্মরণ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। দুর্ব্বৃত্ত রামদাস ও তাহার অনুজ কেবল কৃষ্ণ পিতার সাক্ষাতে জীবলীলা সংবরণ করেন। কেবলকৃষ্ণের কনিষ্ঠ গঙ্গাদাস। ইনিও রামদাসের ন্যায় কুকার্য্যপরায়ণ ছিলেন, তৎকনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষ বলেন " ইনিই বাঙ্গালার নবাব দুর্ব্বৃত্ত সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে ভীত হইয়া ইংরেজকর্ম্মচারি ড্রেক্‌ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন।" আমরা বলিতেছি, অম্বিকাবাবু ঐতিহাসিক তত্বানভিজ্ঞ, তিনি অন্যায়রূপে সিরাজের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক নরাধম রাজা রাজবল্লভ ঢাকার রাজকীয় ধনাগার হইতে ২০০০০০০০ দুই কোটী টাকা অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সিরাজ যখন ঢাকা নেবায়তীর নিকাশ ও রাজস্ব তলব করেন, তখন কৃষ্ণদাস সেই সকল লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। এক্ষণ পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন, সিরাজ "দুর্ব্বৃত্ত" কি "রাজবল্লভ ও তাহার পুত্র দুর্ব্বৃত্ত।" ঐতিহাসিক কুলকলঙ্কগণ সিরাজকে যেরূপ ইতিহাস পটে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা দর্শন করিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ গোপালকৃষ্ণ। প্রবাদ অনুসারে গোপাল কার্ত্তিকপুরের মুন্সীদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তৎকনিষ্ঠ রাধামোহন ও কেবলরাম।

রাজবল্লভের একটি কন্যা অষ্টমবর্ষ বয়ক্রমে বিধবা হইয়াছিলেন। রাজবল্লভ সেই বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার নিমিত্ত নানা প্রকার যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু হিংসাবৃত্তিপরায়ণ নবদ্বীপপতি কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে পূর্ণমনস্কাম হইতে পা-

* আমরা প্রাচীন তাম্রশাসনেও বৈদ্যজাতির উল্লেখ দর্শন করিয়াছি। তাহাতে অম্বষ্ঠ লিখিত হয় নাই।

রেন নাই। কার্ত্তিকেয় চন্দ্রবাবু তাঁহার ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতে লিখিয়াছেন “বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য-যন্ত্রণা দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিতহৃদয় হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি নানা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য,রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ, তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, অনায়াসে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের নিকটও ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব।’ তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে উপনীত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র অতীব আদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্ট সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদনন্তর সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে গোপনে রাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থা দেখাইলেন। তাঁহারা ইহা পাঠকরণান্তর, ‘এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত’ কহিলেন। ইহা শ্রবণমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিরতিশয় ঈর্ষাদগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন ‘এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া, রাজবল্লভকে নিরাশ করিতে হইবেক। একজন বৈদ্যজাতীয় যে এই চির-অপ্রচলিত ব্যবহার করিয়া যাইবেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় নহে। কিন্তু এক্ষণে রাজবল্লভের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে আমি কোন মতেই তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারি না। অতএব তাহার সন্তোষার্থ আমি আপনাদিগকে এই ব্যবস্থা স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত, যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করিব, আপনারা এই কহিবেন যে, মহারাজ বা কাহারও অনুরোধে আমরা এরূপ ব্যবস্থা দিয়া, পাপগ্রস্ত হইতে পারিব না।’

“অনন্তর পরদিবস রাজবল্লভের পণ্ডিতেরা রাজার সভাস্থ হইলে, রাজা নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, ‘রাজা রাজবল্লভ যে ব্যবস্থা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত হইবেক। যদি শাস্ত্রসম্মত নাও হয়, তথাপি, যখন তিনি ইহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে এ ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিতে হইবেক।’ পণ্ডিতেরা রাজার পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে, নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া, উক্ত ব্যবস্থাতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণ, নিরাশ হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া,এই মহৎ অনুষ্ঠান সাধনে ক্ষান্ত হইলেন।” * (ক্রমশঃ)

* প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রেতপুরে গমন করিয়া-

ফেসিয়ান

উপাধি প্রাপ্তির আশয়ে মনুষ্য ধনরাশির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে। প্রণয় বা আদর প্রাপ্তির আশয়ে মনুষ্য বহুকালার্জ্জিত সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে। অন্য কথা কি, পণ্ডিত বিদ্যালাভার্থ, যোদ্ধা দেশরক্ষার্থ, ধার্ম্মিক ঈশ্বরনামপ্রচারার্থ, নারী সতীত্ব রক্ষার্থ, প্রাণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কি ধনী কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি যোদ্ধা কি নিরস্ত্র, কি কুলাভিমানী কি নিষ্কুলীন, কি নর কি নারী কেহই কোন অবস্থায় ফেসিয়ানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। অনেকে প্রকাশ্যে সমাজ, ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রভৃতির অবমাননা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু এমন বীরপুরুষ কে আছেন যিনি ফেসিয়ানের পদানত না হয়েন?

অথচ ফেসিয়ানে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। ফেসিয়ান দুর্ম্মূল্য বস্তুর প্রতিপোষক। যাহা স্বল্পমূল্য, ফেসিয়ান তাহা অনুমোদন করেন না। আজি কালিকার দিনে উদরে অন্ন ও পৃষ্ঠে বস্ত্র দিয়া কোনরূপে দিন যাপন করা দুরূহ। তাহাতে ফেসিয়ানের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দুর্ম্মূল্য দ্রব্যের আহরণ করিতে যে জীবনসংশয় উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

লোকে মনে করে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা ফেসিয়ানের অধিকতর প্রিয়। কিন্তু আমার মনে হয় কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই সমভাবে ফেসিয়ানের ক্রীতদাস। ইহাতে প্রীতি বা অপ্রীতির বিচার উপস্থিত হয় না। যাহা ফেসিয়ান, তাহা করিতেই হইবে। জলে ডুবিয়াই হউক, বা আগুণে পুড়িয়াই হউক, ফেসিয়ানের আজ্ঞা সম্যক্ প্রতিপালন করিতেই হইবে। যিনি না করিবেন, তাঁহাকে কেহ কোনরূপ দণ্ড বা

ছেন। এই কাল মধ্যে সমাজের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সময় শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণ মনোযোগ করিলেই হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও মতে যাহারা বিধবা বিবাহ করিয়াছে, তাহারা সকলেই সমাজচ্যুত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদ্বারা বিশেষ ফললাভ হয় নাই। আমরা বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিতেছি, শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করুন।

শাস্তি প্রদান করিবে না। তাঁহার নিজেরই মন পুড়িতে থাকিবে, লজ্জায় তাঁহারই মুখ মলিন হইবে, কেহ অন্য বিষয় লইয়া চুপি চুপি কথা কহিলে বা হাস্য করিলে তাঁহার নিজেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে, তিনি সেই দণ্ডেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, ধন যাউক, মান যাউক, প্রাণ যাউক, তিনি আর কখনই ফেসিয়ানের বিরুদ্ধে অঙ্গুলি উত্তোলন করিবেন না।

আবার যাহা ফেসিয়ান, তাহা ফেসিয়ান ভিন্ন অন্য কেহ পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন না। রাজার ইচ্ছা প্রজায় দমিত করিতে পারে, প্রজার ইচ্ছা রাজায় দমিত করিতে পারে, কিন্তু ফেসিয়ানের ইচ্ছা ফেসিয়ান ভিন্ন অন্য কেহই দমিত বা শমিত করিতে পারে না। কি এক অজ্ঞাত কারণে, অজ্ঞাত শক্তিতে ফেসিয়ানের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ফেসিয়ান আমাদের লক্ষ্মীর ন্যায় অদৃশ্য—

"আজগাম যদা লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্বুবৎ।
নির্জগাম যদা লক্ষ্মী গজভুক্ত কপিত্থবৎ।"

এই সর্ব্বশক্তিমান্ ফেসিয়ান দেবের যথাযথ বর্ণন প্রয়োজনীয়। এই দেবতার সকল মূর্ত্তিগুলির বর্ণন বা নামকরণ মৎসদৃশ লোকের ক্ষমতার অনায়ত্ত। নিম্নে কয়েকটি মাত্র মূর্ত্তির অবতারণা করা যাইতেছে।

১ম মূর্ত্তি। ছাদিকা। ইনি বস্ত্রবিভাগের অধিষ্ঠাত্রী। ইনি আমাদের দেশের পুরুষদের, কালাপেড়ে ফিন্‌ফিনে ধুতী, সাহেবী ধরণের চায়নাকোট, অতিমিহি চাদর ও হাফ্‌ষ্টকিং বিধান করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদের জন্য কালাপেড়ে শান্তিপুরী, সাটিনের কুর্ত্তা ও মিহিতর হাফ্‌ষ্টকিং এর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২য়। রাজিকা। ইনি অলঙ্কার বিভাগের অধিনায়িকা। ইনি পুরুষদের অনামিকায় মুদ্রিত-নাম অঙ্গুরীয়ক, বক্ষোদেশে সঘটিক স্বর্ণশৃঙ্খল ও নাসিকোপরি স্বর্ণচস্মার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নারীদিগের জন্য ইনি বহুতর ইংরাজী, বাঙ্গালা, সেকেলে, একেলে মুসলমানী ও আরমাণী প্রভৃতি অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহার প্রভাবে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে।

৩য়। চিত্রিকা। ইনি চিত্রবিভাগের অধিষ্ঠাত্রী। ইনি পুরুষদের বৈঠকখানায় কোথাও বা অর্দ্ধনিমীলিতাক্ষি, প্রেমালিঙ্গনালিঙ্গিত, অতিসন্নিহিতকপোল, প্রণয়ীযুগলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আবার কোথাও বা অশ্বারূঢ়, পরিহিতযোদ্ধ্‌বেশ, গন্ধবিস্ফারিতনেত্র, ভ্রূকুটীকুটিলানন কোন ইয়ুরোপীয় যোদ্ধার সন্নিবেশ করিয়াছেন। আর্টকুলপ্রসূত প্রতিমূর্ত্তিগুলিও দুই এক স্থানে আদর পাইতেছে। ইনি স্ত্রীদের অন্দর মহলে কোথাও বা অর্দ্ধদিগম্বরী, কেশবিন্যাসনিযুক্তা, বীভৎসবেশা, কটাক্ষপূর্ণনয়না কোন বারবিলাসিনীর অবতারণা করিয়াছেন, আবার কোথাও বা বঙ্গবংশাবতংশ পত্নীবদনোন্মুখ বঁটিধারী নবীনের প্রতিমূর্ত্তি দেখাইতেছেন।

৪র্থ। পাঠিকা। ইনি শিক্ষাবিভাগের

ডাইরেক্টরী। ইহাঁর প্রভাবে পুরুষেরা মিল্ স্পেন্সার প্রভৃতির মস্তক চর্ব্বণ করিতেছে। নারীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে মেলেরিয়া প্রপীড়িত দেশের কুইনাইনের ফাইলের সমবস্থ করিয়া তুলিয়াছে। কুইনাইনের জ্বর কুইনাইন ভিন্ন অন্য কিছুতে বিরাম পায় না। বঙ্কিম জনিত হৃদ্বিকার বঙ্কিম প্রসূত নবেল ভিন্ন অন্য কিছুতে শান্তি পায় না। পাঠিকা দেবীর প্রসাদাৎ বঙ্গে সকল নরনারীই গ্রন্থকার মুণ্ডাহারে নিমগ্ন। মুণ্ডগুলি অনেক স্থলেই অজীর্ণ দোষ উৎপাদন করিতেছে।

৫ম। লেখিকা। ইনি রচনাবিভাগের কর্ত্রী। ইনি পুরুষদিগকে আমার ন্যায় বাঙ্গালা, ও বাবু ইংরাজী লিখিতে শিখাইতেছেন। ইনি নারীদিগকে কিরূপ গদ্য পদ্য লিখিতে শিখাইতেছেন, নিম্নে তাহার নমুনা প্রদত্ত হইল।

গদ্য (বামাগণের রচনার নমুনা)

'হায়, দুঃখীর রোদন কে শুনিবে? যেহেতুক দুঃখীর রোদন, অরণ্যে রোদনের ন্যায় বৃথা। শরৎকালে যে মেঘ ডাকে, সে মেঘে বারি হয় না। সেইরূপ দুঃখীর রোদন কেহ শুনে না। যদি কেহ শুনেন, তাহা হইলে তিনি মহৎ। কিন্তু অনেকেই শুনে না। যাহারা শুনে তাহারা হায় হায় মনোযোগ করে না' ইত্যাদি।

পদ্য।

'একে দুয়ে তিন হয় তিনে তিনে ছয়,
ছয়ে তিন নয় হয় একথা নিশ্চয়।
পূর্ব্বদিকে উঠে সূর্য্য কিবা মনোহর,
পশ্চিমেতে অস্ত যায় মরি কি সুন্দর।
হায় হায় প্রাণ যায় করি কি সজনি,
দিবা অবসানে দেখ আইসে রজনী।
এতেক কৌশলে যাঁর রচিত সংসার,
ধন্য সেই দেব তাঁর পায়ে নমস্কার।'
ইত্যাদি।

যৎকালে এই সমস্ত সারগর্ভ গদ্য প্রবন্ধ ও সুললিত পদ্য সন্দর্ভ রচিত হয় তৎকালে ভাত আঁকিয়া যায়, ডালে নূণ বেসি হয়, ঝোলে নূণ হয় না, পায়েসে চিনি দেওয়া হয় না এবং ছেলেটা পাতকূয়ার ভিতরে পড়িয়া যায়।

৬ষ্ঠ। শিল্পিকা। ইনি শিল্পবিভাগের কর্ত্রী। ইহাঁর প্রসাদাৎ রাজরাণী হইতে ঘুঁটে কুড়ানী পর্য্যন্ত সকলেই উল বুনিতেছে। শ্যামাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী গৌরাঙ্গী, বিশালনয়না, সঙ্কুচিতনয়না, বালা, যুবতী, প্রৌঢ়া, কেহ বা রাঁধিতে রাঁধিতে, কেহ বা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ বা হাসিতে হাসিতে, কেহ বা কাঁদিতে কাঁদিতে, কেহ বা স্বাধীনভর্ত্তৃকা হইয়া, কেহ বা প্রোষিতভর্ত্তৃকা হইয়া উলের দর বাড়াইতেছেন। রূপগর্ব্বিতা সুন্দরীরা উল বুনিলে তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কারণ যিনি সুন্দরী তাঁহার সকলই সুন্দর। কিন্তু যিনি কাঁকে একটা ছেলে, কোলে একটা ছেলে করিয়া ব্যতিবস্ত, তিনি কেন উল বোনেন তাহা ভগবান্ জানেন। শিল্পিকা দেবী স্ত্রীজগতেই তাঁহার ক্ষমতা প্রচার করিতেছেন। ইনি পুরুষ দিগের স্কন্ধে অধিরোহণ করিবার অবসর এখনও পান নাই।

৭ম। ধার্ম্মিকা! ইনি ধর্ম্ম বিভাগের

অধিষ্ঠাত্রী। ইহাঁর প্রভাবে আজি কালি পুরুষেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলাইতে লজ্জিত হন। ইহাঁর প্রভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল পুরুষেই স্বাবলম্বী (Free thinker), স্ত্রীলোকেরা ধার্ম্মিকা মূর্ত্তির প্রসাদাৎ একেবারে হিন্দু, ব্রাহ্ম, ক্রীশ্চান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন।

৮ম। দেশহিতসংসাধিকা। ইহাঁর প্রভাবে অজাতশ্মশ্রু বালক ও অশীতিপর বৃদ্ধ, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী, জমীদার ও রাইয়ৎ সকলেই ভারত ভারত করিয়া চীৎকার করিতেছে। আর কিছু কর বা না কর দুইবার ভারত-মাতা ভারত-মাতা বলিয়া চীৎকার করিলেই আজি কালি সকলের প্রিয় হওয়া যায়। বঙ্গীয়া নারীরা আজিও এই দেশহিতৈষীর পদবীতে আরোহণ করিতে শিখেন নাই। ভুবনমোহিনী ভারত ভারত করিয়া কাঁদিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু আজি কালি ভুবনমোহিনী ভুবনমোহন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন।

৯ম। স্বকীয়া। ইনি স্বাধীনতা মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী। ইহাঁর প্রভাবে পুত্র পিতার অবমাননা করিতেছে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে ঘুসা দেখাইতেছে, ছাত্র শিক্ষকের টীকী কাটিয়া লইতেছে, পত্নী পতির বক্ষে পদাঘাত করিয়া শ্যামা মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। হুট্‌হাট্ শব্দে গমন, ড্যাম্ ডোম শব্দে কথোপকথন প্রভৃতি স্বকীয়া মূর্ত্তির নিত্য সহচর। ইহাঁর যন্ত্রণায় দেশে অবস্থান করা অতীব কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

১০ম। গর্ব্বিতা। ইনি গর্ব্ববিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ইহাঁর প্রভাবে দুইশত মুদ্রাবেতনভোগী, একশত মুদ্রাবেতন ভোগীর সহিত আলাপ করিতেছে না। শেরেস্তাদারের স্ত্রী পেস্কারের স্ত্রীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে। যে এমে পাস করিয়াছে সে পৃথিবীকে সরাখানা জ্ঞান করিতেছে। এবং যে গর্ব্বে অপটু সে কাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেছে।

এইত দশ মূর্ত্তির নামকরণ ও কথঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গেল। এক্ষণে এই দশমূর্ত্তির পূজার জন্য একটি স্তোত্র নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ফেসিয়ান স্তোত্র।

জয় বেশ-বিধায়িনি, দরিদ্র-মর্দ্দিনি
দুঃখ-প্রদায়িনি, শক্তিমতি।
জয় অর্থ-বিনাশিনি, সম্মান-শোষিণি,
স্ত্রীকোপবর্দ্ধিনি, মানবতি।
জয় চিত্র-বিলাসিনি, নবেল মালিনি,
পদ্য-প্রসবিনি, শিল্প করে।
জয় ধরম গ্রাসিনি, পাপ সংবর্দ্ধিনি,
ত্রিলোকনাশিনি, মুখ্যতরে।
জয় হিতৈষী জননি, দম্ভ বিধায়িনি,
গর্ব্ব প্রসারিণি, অমঙ্গলে।
জয় সভ্যতা-নন্দিনি, সর্ব্ববিনাশিনি,
বাঙ্গালি-ঘাতিনি, শীতলে॥

শ্রী—

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ।

(সপ্তমখণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠার পর।)

একাদশ অধ্যায়।

কোন জাতির উত্থান পতন সাবধানতার সহিত আলোচনা করা বড় কৌতূহল জনক। একদিকে রোম সাম্রাজ্য তাহার জীর্ণ শরীর একত্র রাখিতে না পারিয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করিল, অন্য দিকে (এক মৎস্যের ছিন্ন দেহ যেমন অন্য মৎস্যে গ্রাস করে) ইশ্‌লেম সাম্রাজ্য একে একে তাহা গ্রাস করিতে লাগিল। প্রথমতঃ রোম সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, পশ্চিমভাগের রাজধানী রোম, পূর্ব্বভাগের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল্। অনন্তর এলারিক্, জেন্‌সেরিক্, ওডোসাব প্রভৃতি অসভ্য ভীষণ সেনাপতিগণ পাশ্চাত্য রোমসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলে পূর্ব্বভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিল; মহাবৃক্ষের দুইশাখা মৃত্তিকা হইতেই উঠিয়া দুইদিকে গিয়াছিল, জর্ম্মণ জাতির কুঠারাঘাতে একশাখা ভূশায়ী হইল, অন্য শাখা মুসলমানগণ ক্রমে ক্রমে পত্র পল্লব, প্রশাখা হইতে ছেদন করিয়া আসিতে লাগিল।

পূর্ব্ব সাম্রাজ্যও নামতঃ রোমসাম্রাজ্য রহিল; মুসলমানগণ ঐ বিভাগ হস্তগত করিয়াও তাহা রুম নামেই অভিহিত করিল। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমের কনষ্টাণ্টিনোপল; আরবীয়গণ ঐ নগরীকে রুম বলিত, তুরুষ্কবাসিগণ ইস্তাম্বল বলিত, কেহ কেহ বিজান্সিয়ম্ বলিয়াও জানিত। কনষ্টাণ্টিনোপল একমাত্র শাসনকেন্দ্র ছিল না, তাহাও দুইভাগে বিভক্ত ছিল; পূর্ব্বভাগে সীরিয়া রাজ্যের রাজধানী আণ্টিয়ক্ রোম রাজ্যের রাজধানী হইল, পশ্চিমে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান কনষ্টাণ্টিনোপলই সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল।

আণ্টিয়কের অবস্থান বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্র, মধ্যে বহুসংখ্যক পয়ঃপ্রণালী, রক্ষার্থ প্রস্তরময় প্রাচীর এবং বহু সংখ্যক দুর্গ, নানাবিধ অট্টালিকায় নগরী চিত্র বিচিত্র, দেখিতে অতি সুন্দর। এক দিন গ্রীকগণ এই স্থান বীরদর্পে অধিকার করিয়া সভ্যতা ও প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু এই সময়ে তাহারা বিগতবীরত্ব এবং বিলাসের কুসুমিত অঙ্কে শয়ান। সম্রাট্ হিরাক্লিয়স এই নগরীতে আপন রাজধানী স্থাপন করিয়া বসতি করিতেছিলেন।

যোকেনা দুইশত লোক সহ নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সৈন্যগণকে বলিয়া দিলেন, তাহারা আলিপোবাসী,

মুসলমানের ভয়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। ইতি মধ্যে তিনি তাঁহার দুইজন আত্মীয় সহ সম্রাটের লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আলিপোর ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং অশ্বারোহী প্রহরীসহ সম্রাট্‌সদনে প্রেরিত হইলেন। সম্রাট্ উপর্য্যুপরি পরাভবে এবং মুসলমানের ভয়ে অনবরত ভীত ও ভগ্নহৃদয় ছিলেন, যোকেনাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতা এবং ধর্ম্মত্যাগ জন্য ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যোকেনা ভীত হইলেন না, স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, পরিণামে সম্রাটের জন্য গুরুতর কার্য্য সকল সাধন করিতে হইবে এইজন্য এত ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে এই সকল কৌশলে জীবনরক্ষা করিয়াছেন, এবং তাঁহারই আজ্ঞা বহন জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। এক দিন যোকেনা সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ মধ্যে একজন বিলক্ষণ সাহসী ও বিশ্বাসী ছিলেন, সম্রাট্ সহজেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেন, পারিষদবর্গও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল। তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা প্রদান করিয়া আলিপো হইতে প্রত্যাগত দুইশত লোক তাঁহার আজ্ঞাধীন করিয়াছিলেন, যোকেনাও সেই সমস্ত আপন অনুচর প্রাপ্ত হইয়া অতি সহজে স্বকার্য্য সাধন করিতে সুযোগ পাইলেন। সম্রাট্ যোকেনাকে যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাহা দেখাইতে আপন সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যাকে নিকটস্থ এক গ্রাম হইতে আনয়ন জন্য দুইসহস্র লোক সহ প্রেরণ করিলেন। এই কার্য্য সম্পাদিত হইল। নিশীথ সময়ে যখন তিনি সম্রাট্‌পুত্রীকে লইয়া আসিতেছিলেন, অশ্বের হ্রেষারব শ্রবণে তাঁহারা সতর্ক হইয়া নিশ্চয় সংবাদ জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়া অবগত হইলেন যে, একদল মুসলমান নিদ্রিত ছিল, তাহাদের অশ্ব নিকটে ঘাস খাইতেছিল, ইতিমধ্যে হেইম (জাবালার পুত্র) সহস্র খৃষ্টিয়ান অনুচরসহ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাহারা দুইশত মুসলমান ছিল, দিরারও সেই সঙ্গে বন্দী হইয়াছেন। সকলে একত্র আন্টিয়কে পৌঁছিলেন; সম্রাট্ আপন তনয়াকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং যোকেনাকে একজন প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করিলেন।

মুসলমানগণ ও দিরার, সমীপে আনীত হইলে সম্রাট্ তাহাদিগকে প্রণত হইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু দিরার যেন তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না, যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনই রহিলেন। উগ্রভাবে আদিষ্ট হইলে দিরার বলিলেন, "আমরা সৃষ্ট কোন প্রাণীর নিকট প্রণত হই না, প্রেরিত আমাদিগকে কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইতে আদেশ করিয়াছেন।"

সম্রাট্ এই উত্তরে মোহিত হইলেন, এবং মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শব্দে উত্তর দান দিরারের কার্য্য নহে, তিনি বৈান ইবিন আমীরকে উত্তর দিতে বলিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের পবিত্রতা, মহম্মদের অমানুষিক ক্ষমতা প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন,

সম্রাট্ চমৎকৃত হইলেন। এক বৃদ্ধ বিশপ সে সমস্ত সহিতে না পারিয়া মহম্মদকে প্রতারক নাস্তিক বলিয়া গালি দিলেন। দিরারের তর্কশাস্ত্র,—বীরের তর্কশাস্ত্র উন্মুক্ত হইল, চারি দিক হইতে অসি নিষ্কোষিত হইতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত লোক দিরারকে লক্ষ্য করিল। কিন্তু যোকেনার কৌশলে দিরারের জীবনরক্ষা হইল। সম্রাট্ও সেই স্থানেই দিরারকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, যোকেনা তখনও রক্ষা করিলেন। মুসলমানগণ বলেন, অমানুষিক দৈবঘটনা প্রযুক্তই দিরারের জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

এদিকে আবুওবীদা পরাক্রমের সহিত সমস্ত সীরিয়া রাজ্য বশীভূত করিতেছিলেন। দুর্ব্বল সম্রাট্ সমস্ত সৈন্য ও নগর যোকেনার আজ্ঞাধীন করিয়া দিলেন। সম্রাট্ দিরার ও তাঁহার সৈন্যগণকে পুনরায় নিহত করিতে চাহিলেন; যোকেনা বলিলেন, যে সমস্ত খৃষ্টিয়ান শত্রুহস্তে পতিত হইবে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা ব্যতীত আর উপায় থাকিবে না,এ জন্যই তৃতীয়বার দিরারের প্রাণরক্ষা হইল। তাঁহারা বিশপের হস্তে ন্যস্ত হইলেন। বিশপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ;—

প্রঃ। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধা কি ?

উঃ। আমাদের ধর্ম্মের সত্য।

প্রঃ। তোমাদের খলিফা এত সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া হস্তগত করিয়াছেন, তিনি অন্যান্য রাজগণের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান না করার কারণ কি ?

উঃ। এ পৃথিবীর জন্য তিনি চিন্তা করেন না, যাহাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকে তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি।

প্রঃ। তাঁহার রাজপ্রাসাদ কেমন ?

উঃ। মৃত্তিকা গঠিত।

প্রঃ। তাঁহার অনুচর কিরূপ লোক ?

উঃ। দরিদ্র ও ভিক্ষুক।

প্রঃ। কিরূপ আসনে উপবেশন করেন ?

উঃ। ন্যায়পরতা ও সুবিচার।

প্রঃ। সিংহাসন কি ?

উঃ। ঈশ্বরে বিশ্বাস।

প্রঃ। রক্ষক কে ?

উঃ। সাহসী একেশ্বরবাদী বীরগণ।

বন্দীগণের মধ্যে একটি যুবকমাত্র মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। গ্রীকললনাগণের রূপলাবণ্য সন্দর্শনে তাহার চিত্ত মোহিত হইয়াছিল, প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সম্রাট্ তাহাকে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করামাত্র অতিশয় সমাদর সংবর্দ্ধনা করিলেন, এক পরমসুন্দরী গ্রীকললনা তাহার সহধর্ম্মিণী হইলেন, সম্রাট্ একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব তাহাকে পারিতোষিক দিয়া জাবালার সৈন্য মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু ঐ যুবকের পিতা বন্দী ছিল, সে ঐ যুবককে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

এদিকে নগরের রক্ষাকার্য্যে আয়োজনের ত্রুটি হইল না। সম্রাট্ স্বয়ং সৈন্যসমাবেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। লৌহসেতু রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করিলেন

এবং সর্ব্ব প্রকারে প্রস্তুত হইলেন। এক সময় একজন খৃষ্টিয়ান সৈনিকপুরুষ সেতু-রক্ষকগণকে সুরাপানে উন্মত্ত এবং নানা রূপ অবীরোচিত কুকার্য্যে রত দেখিয়া প্রত্যেককে পঞ্চাশত বেত্রাঘাত করেন, তাহারা সে অপমান তখন সহ্য করিয়াছিল। এক্ষণে মুসলমানসৈন্যের আগমনমাত্র সেতু সমর্পণ করিয়া নীচাশয়গণ তাহার প্রতিশোধ লইল। মুসলমানগণ নগরসমীপস্থ হইতে আর শোণিতপাত হইল না। নেষ্টোরিয়স্ নামে একজন খৃষ্টিয়ান সেনাপতি সৈন্যগণের মধ্য হইতে বাহির হইয়া মুসলমানগণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্পর্দ্ধা করিলেন। ভীমবীর আলিপোবিজেতা দমাস্ বাহির হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অশ্ব স্খলিতপদ হইলে তিনি পড়িয়া গেলেন, নেষ্টোরিয়স্ তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া খ্রীষ্টিয়ান শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। দেহাক নামক অন্য এক জন মুসলমান বাহির হইলেন, উভয়েই সমান বলবান, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়েই পরিক্লান্ত,কেহ কাহাকে পরাভব করিতে না পারিয়া উভয়ে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে এই যুদ্ধ দেখিবার জন্য দুই দিকের লোক এমনই বেষ্টন করিয়া লইল যে, কাহারও অন্য দিকে জ্ঞান ছিল না। নেষ্টোরিয়সের বস্ত্রগৃহ পড়িয়া গেল; তিন জন ভৃত্য তাহার রক্ষাকার্য্যে ছিল, তাহারা ভীত হইয়া তাহাদের সাহায্যার্থ ভীমবীর দমাস্‌কে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিল। দমাস্ লম্ফ দিয়া দুই ভৃত্যকে এক হস্তে এবং তৃতীয়কে অন্য হস্তে ধরিয়া এমন জোরে পরস্পরের মস্তকে আঘাত করাইলেন যে, তিন জনই মৃত হইল। অতিক্রুত একটি বাক্স হইতে নেষ্টোরিয়সের পরিচ্ছদ বাহির করিয়া পরিধান করিলেন; নিকটে একটি সজ্জিত অশ্ব ছিল তাহাতে আরোহণ করিয়া খৃষ্টিয়ান শিবির মধ্য দিয়া মুসলমান শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরে এই সমস্ত কাণ্ড হইতেছিল, অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতকতা দ্রুতহস্তে কার্য্য করিতে লাগিল। যোকেনা, দিরার ও তাঁহার সঙ্গীয়গণকে মুক্ত করিয়া দিলেন, সকলকে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলেন, এবং আপনার সঙ্গীয় সৈন্যগণকে সঙ্গে দিয়া মুসলমান শিবিরাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে এবং আপন সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইবে আশঙ্কায় সম্রাট হিরাক্লিয়স্ একবারে ব্যাকুল হইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কে যেন তাঁহাকে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল, রাজমুকুট তাঁহার মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল, তিনি সেই স্বপ্ন সফল হইল ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আর ফল কি হইবে দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া কয়েক জন ভৃত্যসমভিব্যাহারে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হিরাক্লিয়সের সৈনিকগণ সম্রাটাপেক্ষা সাহসী ছিল। তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। কিন্তু হঠাৎ দিরার সঙ্গীয়গণ লইয়া আক্রমণ করাতে এবং যোকেনার বিশ্বাস-

ঘাতকতায় সকল চেষ্টা বিফল হইল। যুদ্ধে পরাজয় হইল দেখিয়া নাগরিকগণ প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ টাকা প্রদান পূর্ব্বক নগর রক্ষা করিল। আবুওবীদা জয়োল্লাসে সীরিয়ার প্রাচীন রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। ৬৩৮ খৃঃ অব্দের ২১শে আগষ্ট এই ঘটনা সম্পাদিত হইল।

নগর অবরুদ্ধ হইবার সময় লঘুচিত্ত সম্রাট কএক জন কুলোকের সহিত পরামর্শ করিয়া খলিফা ওমার নিহত হইলে সকল বিপদের অবসান হইবে ভরসায় বাথেক্ ইবিন্ মোসাফার নামক এক জন জাবালা আরবকে এই কার্য্য সাধন জন্য পাঠাইয়া দেন। সে মদিনায় উপস্থিত হইয়া প্রাচীরের বহির্ভাগে একটি বৃক্ষোপরি লুকায়িত থাকে। খলিফা প্রতিদিন উপাসনান্তে ঐ স্থানে ভ্রমণ করিতেন। সে দিন একাকী ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া খলিফা বৃক্ষের নিম্নভাগে অনাবৃত মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। বাথেক্ হৃষ্টচিত্তে স্বকার্য্য সাধনে আগ্রহের সহিত অবতরণ করিতেছিল, তখন দেখিতে পাইল একটি সিংহ পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পাদলেহন করিতেছে, এবং নিদ্রিত খলিফার শরীর রক্ষায়ই যেন নিয়োজিত আছে। খলিফা জাগরিত হইলেন, সিংহ অন্তর্হিত হইল। বাথেক্ এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া ওমার যে ঈশ্বরানুগৃহীত একথা বুঝিতে পারিল, এবং বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার পাপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া খলিফার হস্ত চুম্বন করিল, এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উৎসাহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। এদিকে আবুওবীদা দেখিতে পাইলেন, রূপবতী গ্রীকললনাগণের সৌন্দর্য্যে তাঁহার সৈন্যগণ মুগ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে বিলাসের সুকোমল হস্তস্পর্শ করিতে হস্তপ্রসারণে উদ্যত আছে। তখন তিনি মাত্র তিন দিন বিশ্রামের পর সৈন্যসামন্তসহ নগর হইতে বাহির হইলেন এবং খলিফাকে বিজয় সংবাদ, সৈন্যগণের পরিণয় বিষয়ে আশক্তি এবং এইরূপ পরিণয় কোরাণবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে বিরত করা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। খলিফা মহম্মদের সহধর্ম্মিণীগণ সহ মক্কা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। পত্র পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং উপাসনা করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণের প্রতি তাদৃশ কঠিন শাসন দেখিয়া অশ্রুপাত করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিজয়ে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এবং সৈন্যগণের প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক সদয় ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়া পত্রোত্তর লিখিলেন। " যাহারা যুদ্ধে পরিশ্রম করিয়াছে তাহারা বিশ্রাম করিতে পারে এবং যে সকল সুখসেব্য সামগ্রী লাভ করিয়াছে, তাহা উপভোগ করিতে পারে; যাহাদের গৃহে স্ত্রী নাই তাহারা সীরিয়ায় বিবাহ করিতে পারিবে; যাহারা দাসী আনিতে ইচ্ছা করে তাহারাও যত ইচ্ছা আনিতে পারিবে। " পত্রমধ্যে একথাও লিখিত হইল।

আণ্টিয়ক জয় হইলে অশ্রান্ত খালেদ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ইয়ুফ্রেটিস নদীপ-

র্যান্ত স্থান আয়ত্ত করিলেন। তিনি মেম্বিজি এবং প্রাচীন হিরাপোলিস নগরী বল পূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং বিরা, বালেস ও অন্যান্য স্থানবাসিগণ আত্ম সমর্পণ করিয়া এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক সন্ধি করে এবং সকলে করদ হয়।

এপর্য্যন্ত আরবসৈন্য সমতলক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল, উষ্ণ দেশবাসীলোক উষ্ণ দেশেই যুঝিতেছিল, এক্ষণে প্রধান সেনাপতি পর্ব্বত অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শীতকাল, পর্ব্বত তুষারাবৃত, বিজেতাগণ মরুবাসী, প্রথমতঃ কেহই সাহস পাইল না। পরিশেষে মীসারা ইবিন্ মেসরুদ নামে এক ব্যক্তি সম্মত হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণবর্ণপতাকায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল "ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই; মহম্মদ তাহারই দূত।" দমাস্ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ ইথিওপিয়াবাসীসহ অনুগমন করিলেন। কষ্টের পরিসীমা রহিল না। অনেক চেষ্টায় একজন পর্ব্বতবাসী ধৃত হইল, আর সকলে স্বস্ব কুটির পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। তাহার নিকট অবগত হইল সম্রাটের বহুসংখ্যক সৈন্য কএক মাইল দূরবর্ত্তী এক উপত্যকায় লুকায়িত আছে, হঠাৎ আক্রমণ করিয়া সমস্ত সৈন্য বিনাশ করা তাহাদের অভিপ্রায়। দূত পাঠাইয়া জানা হইল সংবাদ সত্য। তখন একটি দূত এই সংবাদ লইয়া আবুওবীদার নিকট উপস্থিত হইল। সে এত দ্রুত গিয়াছিল যে, পঁহুছিবা মাত্র অজ্ঞান হইয়া সেনাপতির নিকট পড়িয়া গেল। সংজ্ঞালাভ করিয়া সে সেই ভয়ঙ্কর বিপদের সংবাদ প্রদান করিল। সংগ্রামসিংহ অমিত পরাক্রম খালেদ তখন জয়লাভ করিয়া মাত্র শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি তৎক্ষণাৎ তিনসহস্র সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আয়াদ্ ইবিন্ গানাম্ আরও দুইসহস্র সৈন্য লইয়া রওয়ানা হইলেন।

খালেদ পঁহুছিয়া দেখিলেন, মীসারা অল্পসংখ্যক সৈন্য সহ অগণ্য দ্বিষদ সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন। গ্রীকগণ এই পরাক্রান্ত সৈন্য ও খালেদের আগমনে ভীত হইয়া তাঁবু প্রভৃতি রাখিয়াই পলায়ন করিল, কিন্তু আবদুল্লা ইবিন হদাফা নামক মহম্মদের স্বগণ এবং খলিফা ওমারের প্রিয়পাত্রকে রণভূমি হইতে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। তিনি অগৌণে কনষ্টান্টিনোপলে সম্রাট সদনে প্রেরিত হইলেন। মুসলমানগণ গ্রীকগণের অনুসরণ করিলনা, তাহারা লুপ্তসহ শিবিরে প্রত্যাগত হইল।

খলিফা ওমার, আবদুল্লা ইবিন হদাফা বন্দীহওয়ার সংবাদ শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি সম্রাট হিরাক্লিয়স্কে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পত্র লিখিলেন। সম্রাট ভীত হইয়া বন্দীকে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন এবং খলিফার জন্য বৃহদায়তন একটি হীরক উপহার পাঠাইলেন। মদীনার মণিকারগণ তাহার মূল্য অবধারণ করিতে পরিল না। খলিফা নিজে ঐ হীরক ব্যবহার না করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলি-

লেন। কথিত আছে সম্রাট হিরাক্লিয়স প্রকাশে না হউক, হৃদয়ে মুসলমান হইয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকে গুরুতর পীড়া হয়, কিছুতে তাহার উপশম হয় না। পরিশেষে খলিফা ওমার একটি টুপী পাঠাইয়া দেন। যতক্ষণ ঐ টুপী মাথায় থাকিত, ততক্ষণ কোনরূপ অসুখ রহিত না, টুপী খুলিয়া রাখিলেই অসুখ আরম্ভ হইত। তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া টুপীটি ছিন্ন করিলেন, তাহাতে 'করুণাময় পরমেশ্বরের নামে' এইরূপ একখণ্ড কাগজে লিখিতছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ টুপী খৃষ্টিয়ানগণের নিকট ছিল, যখন যে ব্যবহার করিয়াছে, সেই উপকার পাইয়াছে। পরিশেষে একটি নগর অবরুদ্ধ হইলে নগরের শাসনকর্ত্তা, খলিফা আলমতাসেমকে ঐ টুপী প্রত্যর্পণ করিয়া নগর রক্ষা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ।)

কুম্ভপত্য।

এই পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়েরই মধ্যে নানা প্রকার মত-ভেদ পরিদৃষ্ট হয়; একই ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মতের প্রচলন আছে। মূল ধর্ম্মসংস্থাপয়িতা একই ব্যক্তি হইলেও তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণের জ্ঞানের তারতম্য বশতঃ নানাবিধ অভিনব ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে; যতই শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ততই ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি সাধন হয়। এইরূপে ক্রমশঃ মূলধর্ম্মের ভিতর এরূপ কুসংস্কার-রাশি প্রবেশলাভ করে যে, তখন বহুচেষ্টাতেও তাহার গার বাহির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। খৃষ্টধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা যীশুখৃষ্টের পরবর্ত্তি সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের অবস্থা একরূপ ছিল; কিন্তু যেমন শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল সেই রূপই তাহার ভিতর হইতে নানারূপ শাখা, প্রশাখা বহির্গত হইল; ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট, পিউরিটান প্রভৃতি নূতন নূতন আকার ধারণ করিয়া সমধর্ম্মীয় সকলে ক্রমশঃ পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল; বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপে বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার, মাধ্যমিক প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; মহম্মদীয় ধর্ম্মও এইরূপ সিয়া, সুন্নী প্রভৃতি নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে আমরা যে ধর্ম্মই দেখি, তাহারই অভ্যন্তরে এবংবিধ নানা প্রকার বিভিন্নতা দেখিতে পাই—তাহারই অভ্যন্তরে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখি। হিন্দুধর্ম্ম যে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না তাহাতে আর বিচিত্র কি? হিন্দুধর্ম্মের অস্থি, মজ্জা, চর্ম্ম, শোণিত লইয়া সময়ে সময়ে নব নব ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে ও কালক্রমে কতক নষ্টও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এক্ষণেও যাহা আছে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তদ্ব্যতীত ইদানীন্তন কালেও তাহা হইতে নিত্য নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে; আমরা অদ্য শীর্ষদেশে যে নাম

স্থাপন করিয়াছি, ইহাও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত একটি নূতন ধর্ম্ম বিশেষ। দাক্ষিণাত্যের সম্বলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, এই ধর্ম্মের বিষয় অনেকে সম্যক রূপে অবগত নহেন, সেই জন্য অদ্য আমরা এই প্রস্তাবটি বান্ধবে প্রকাশিত করিলাম।

কুম্ভপত্য কথাটি দুইটি শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কুম্ভ ও পত; প্রথমটি একটি বৃক্ষের নাম, দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ বল্কল; ইহারা কুম্ভবৃক্ষের বল্কলে রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তাহা কটিদেশে জড়াইয়া রাখে বলিয়া কুম্ভপত্য নামে অভিহিত; কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রকৃত নাম "আলেখ ধর্ম্ম"। কুম্ভপত্যগণের মধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী যে আলেখ স্বামী হিমালয় পর্ব্বতের কোন নিরালয় প্রদেশে বাস করিতেন; ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কটক জেলান্তর্গত মলবহরপুর নামক গ্রামে আগমন করিয়া তথায় চতুঃষষ্টি ব্যক্তিকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ দাস সর্ব্বপ্রধান এবং ইহার ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক হয়, এই চতুঃষষ্টি শিষ্যের সমবেত চেষ্টায় এক্ষণে এই অভিনব ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মলবহরপুরে শিষ্য প্রশিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে আলেখস্বামী করদ রাজ্য ঢেঁকানলে গমন করেন; তথায় তিনি ব্রহ্মচারী অবস্থায় প্রায় তিন বৎসর যাপন করিয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহার মৃত্যু হয়। যদিও কটকে এই ধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব হয়, তত্রাপি সম্বলপুর অঞ্চলেই ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন; কুম্ভপত্যগণ ব্রাহ্মণকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে, এই জন্য ব্রাহ্মণ তাহাদের দলে মিশিতে পারেন না।

ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; তাহাদের একের সহিত অন্যের কোন সংস্রব নাই। প্রথম বিশুদ্ধ কুম্ভপত্য, ইহারা কুম্ভবৃক্ষের বল্কল ধারণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় কণপত্য, ইহারা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে; এবং তৃতীয় আশ্রিত,বা গৃহস্থ,ইহারা সাংসারিক সমুদায় ব্যাপারে পরিলিপ্ত। প্রথম দুই শ্রেণী জাতিভেদ স্বীকার করে না ও উদাসীন ব্রতাবলম্বী। ইহারা রাজা, ব্রাহ্মণ, রজক ও হাড়ী ভিন্ন সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে; ইহাদের মতে রাজন্য বর্গ লোকের উপর অযথা অত্যাচার করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিলে সেই সঙ্গে তাঁহাদের পাপেরও অংশ গ্রহণ করিতে হয়; ব্রাহ্মণগণ ভাণ্ডারীস্বরূপ, কেননা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধার্থে যেসকল দ্রব্য প্রদান করা হয়,তাহা তাঁহারাই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্য বিধান করিয়া সমুদায় সামগ্রীই তাঁহারা পরিশেষে আত্মসাৎ করিয়া পাপযুক্ত হন। সুতরাং তাঁহারা চিরকালই অশুচি; রজক সকলেরই বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া থাকে বলিয়া অশুচি এবং হাড়ীর বৃত্তি অতিশয় জঘন্য সুতরাং তাহারা অস্পৃশ্য। তৃতীয়দল জাতিভেদ স্বীকার করে ও তাহারা সংসার বিরাগী নহে; ইহারা প্রথম দুই দলকে আপনাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে;

এবং তাহাদেরই মতানুযায়ী এবং ইহারা প্রাতঃস্নায়ী।

ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা-মন্দির আছে ও সকলেই একেশ্বরবাদী এবং ঈশ্বরকেই আলেখ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। সত্য ও বিশ্বাস এই ধর্ম্মের মূল ও সর্ব্বস্ব; সাধারণতঃ কুম্ভপত্যগণ সত্যবাদী ও বিশ্বাসী। আলেখ ব্যতীত ইহারা হিন্দুগণের ত্রিংশৎ ত্রিকোটি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি কল্পনা ও পূজার একান্ত বিরোধী। ইহারা বলিয়া থাকে দেবতা যখন কেহই কখন দেখে নাই, তখন তাঁহাদের মূর্ত্তি কিপ্রকারে কল্পিত হইতে পারে; তাঁহাদিগকে অন্তরেই নমস্কার করা উচিত। কিন্তু কুম্ভপত্যগণ মুখে হিন্দু দেব দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও হিন্দুগণ যেসকল দ্রব্যে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন, উহারা সে সকলকে ঘৃণা করিয়া থাকে;—তুলসী হিন্দুগণের মহা আদরের সামগ্রী, কিন্তু ইহাদের অতি ঘৃণার জিনিষ; হিন্দুদের দেবীর নিকট ছাগোৎসর্গ হইয়া থাকে, ছাগ ইহাদের নিকট অপবিত্র জন্তু—তাহারা ইহার মাংস ভক্ষণ করে না। এইরূপ নানা বিষয়ে ইহারা হিন্দুগণের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে। রামানন্দ-কবির-চৈতন্য শিষ্যগণ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিশ্লিষ্ট হইলেও তাহারা কিয়দংশে হিন্দু মতানুযায়ী যেন হিন্দুধর্ম্ম তাহাদের অস্থি ও মজ্জায় মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; প্রতি চৈতন্য-শিষ্যের প্রতি ধমনীতেই হিন্দু-শোণিত প্রধাবিত হইতেছে। কিন্তু কুম্ভপত্যগণের সেরূপ নহে; ইহারা নামতঃ হিন্দু দেবদেবী স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহারা সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী।

কুম্ভপত্যগণ রাত্রিকালে অন্ন গ্রহণ করেনা; এমন কি যদি কেহ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে তাহা হইলেও কোন দ্রব্য আহার করিবার উপায় নাই; আহারাভাবে মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইলে কেবল অল্পপরিমাণে জল পান করিতে পারে মাত্র। ইহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে, উপাসনার সময় দুটি হস্ত যোড় করিয়া নাসিকার উপর রাখে এবং সূর্য্যের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে; গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা হয় না, কেননা তাহা হইলে সূর্য্যদর্শন হইবে না। যদি চারি পাঁচজন একত্রিত হইয়া উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন ঈশ্বরের স্তুতি উচ্চারণ করে এবং অপর সকলে সূর্য্যপানে তাকাইয়া তাহাই শ্রবণ করে ও ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিয়া থাকে। উপাসনার সময় ইহারা চতুঃষষ্টি প্রধান শিষ্যেরও অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সুতরাং চতুঃষষ্টিবার মস্তক অবনত ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে।

ইহারা অতিশয় অপরিষ্কার; কখন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে না; সর্ব্বদাই কদর্য্যভাবে বসবাস করিয়া থাকে। ইহারা এতদূর ঈশ্বর-ভক্ত যে কোন কঠিন পীড়াক্রান্ত হইলেও আলেখের নামোচ্চারণ ভিন্ন কোন ইষ্টকর ঔষধই গ্রহণ করে না;—

যখন রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় না থাকে, তখন উপাসনা স্থলের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে।

অধুনা কুম্ভপন্থ্যগণ দুই প্রধান দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; সোনপুর-নিবাসী ভীম কোঁড় আলেখ স্বামীর চতুঃষষ্টি শিষ্যের মধ্যে একজন প্রধান। এ ব্যক্তি জন্মান্ধ; কিন্তু তাঁহার নিকট উড়িয়া ভাষায় অনুবাদিত মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি নানা বিধ গ্রন্থ আছে, সুতরাং তাঁহার নিকট লোকে সতত ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে যাইত; ভীম কোঁড় তাহা অতি যত্নের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং ক্রমশঃ ঐ সকল গ্রন্থ তাঁহার এতাদৃশ আয়ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি ঐ সকল গ্রন্থ অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এই স্মারকতা শক্তির জন্য তিনি অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন; এইরূপ স্মারকতা এবং এই সকল গ্রন্থের সতত আলোচনা জন্য তাঁহার কবিতা প্রস্তুত করিবার বিলক্ষণ অধিকার জন্মে। ভীম এইরূপ ক্ষমতা-সম্পন্ন হইয়া দুই তিন খানি বৃহৎ কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এই সমুদায় কবিতাই আলেখের উপাসনা ও স্তব পরিপূর্ণ। তাঁহার এইরূপ অনন্যজনসুলভ ক্ষমতা দৃষ্টে অনেকেই তাঁহার প্রতি প্রীতি সম্পন্ন হইল, এবং তাঁহার উপর আলেখের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ আছে জ্ঞান করিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল; এইরূপে ভীমের শিষ্য সংখ্যা সামান্য দিনের মধ্যে অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

দুই তিন বৎসর এই রূপে অতিবাহিত হইলে ভীমের কোন একটি কার্য্যের জন্য অনেকেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু কেহই তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। সে কার্য্যটি এই;—ভীমের নিকট একটি রমণী সতত বাস করিত, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হয়; কিন্তু কেহ কখন তাহাদের অপবিত্রতা সম্বন্ধে কিছুই প্রত্যক্ষ করে নাই, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতেও সাহসী হয় নাই। ক্রমে সেই স্ত্রীলোকটি অন্তর্ব্বত্নী দশায় উপস্থিত হইল, তখন সকলেই ভীমের উপর নিতান্ত খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। ভীম অনন্যোপায় হইয়া আপন দোষক্ষালনার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বনে ব্রতী হইলেন। তিনি বলিলেন 'আলেখের অনুগ্রহে এই স্ত্রী অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন—তাঁহার এইরূপ আদেশ যে ইহার গর্ভে অর্জ্জুন জন্ম গ্রহণ করিবেন ও তাঁহা হইতে সমুদায় পৌত্তলিকতা বিনষ্ট হইবে; অর্জ্জুন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সকল প্রকার উপধর্ম্মের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।' সকলেই এই কথায় আশ্বস্ত হইতে এবং সন্তানের ভূমিষ্ঠ সময় আহ্লাদের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল; প্রসবের দিন নিকটবর্ত্তি হইয়া আসিল; প্রসব সময় উপস্থিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল; ভীম এতদ্দৃষ্টে অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া আলেখের নূতন প্রত্যাদেশ জানাইলেন। তিনি বলিলেন 'গত রাত্রে আলেখ আমাকে স্বপ্ন দ্বারা বলিয়াছেন যে, এই একটি কন্যা প্র-

সূত হইবে; এবং সেই কন্যাই তাঁহার ভুবন বিজয়ি রূপে সকলকে মোহিত করিয়া সকল উপধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিবে।' অনেকে ইহাতেও বিশ্বাস স্থাপন করিল, কিন্তু সূতিকা গৃহেই এই কন্যাটি বিনষ্ট হয়। ভীম দেখিলেন তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ও প্রবঞ্চনাই নিষ্ফল হইয়া পড়িল; তখন কি উপায়ে তদীয় শিষ্যগণকে বশীভূত করিতে পারেন, তদুপায় চিন্তনে ব্যাপৃত হইলেন; অনেক চিন্তার পর তিনি শিষ্যগণকে ডাকাইয়া বলিলেন 'এই পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ—সকল মনুষ্যই পাপ কার্য্যে রত—এ পাপ সংসারে কিছুকাল বাস করিলেই পাপ সঞ্চয় করা হইবে, অপ্সরী ইহাই আমাকে জানাইয়া স্বর্গধাম গমন করিলেন।' কিন্তু ভীমের এই প্রবঞ্চনা বাক্য অনেকেই বুঝিতে পারিল; এবং অধিকাংশ লোকই তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল; কিন্তু অপর কতকগুলি তাঁহার প্রতি সেই রূপই আস্থাসম্পন্ন রহিল।

ভীম একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন; প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপাসনার সময় ভীম এবং তাঁহার স্ত্রী বেদীর উপর বসিয়া থাকেন; শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া অর্চ্চনা করে; এই রূপে মধ্যাহ্লাহারের সময় পর্য্যন্ত শিষ্যগণ ভীম ও তাঁহার স্ত্রীর পাদবন্দনা করিয়া থাকে; আহার প্রস্তুত হইলে উভয়ের পদযুগল দুগ্ধ দ্বারা বিধৌত করিয়া সকলে তাহা আনন্দে পান করে। ভীম শিষ্যগণ ভীমকেই ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে; এবং ভীমও আপনি ঈশ্বর বলিয়া সকলকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

কুম্ভপত্যগণ স্বপ্নের প্রতি অতিশয় আস্থাসম্পন্ন। ইহারা মনে করে ঈশ্বর রাত্রিকালে স্বপ্ন দ্বারা যাহাকে যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে তাহার উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং স্বপ্নের অনুযায়ি কার্য্য না করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় ও তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। এই বিশ্বাস জন্যই তাহারা সময়ে সময়ে অতিশয় গর্হিত কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

ইহাদের প্রধান গুণ এই যে ইহারা ভ্রমেও মিথ্যা কথা কহে না। যদি এই ধর্ম্মাবলম্বী কেহ কখন কায্যানুরোধে মিথ্যা কথা কহে, বা ধর্ম্মের অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ করে, সে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়; পরিবারস্থ কোন লোক এইরূপ করিলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই ধর্ম্ম প্রচলনাবধি দক্ষিণাঞ্চলে পাপের স্রোত অনেকটা হ্রাস হইয়াছে; মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধ সকল ক্রমশঃ অপনীত হইতেছে। পূর্ব্বে কটকস্থিত অঙ্গুল প্রভৃতি প্রদেশে নানাপরাধে অনেকেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত, কিন্তু তথায় কুম্ভপত্য ধর্ম্মের প্রচলন হওয়া অবধি দোষের ভাগ অনেকটা হ্রাস হইয়াছে এবং সেই জন্য অনেক রাজ কর্ম্মচারী এই ধর্ম্ম প্রচলনের জন্য সময়ে সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

আগুন আর আকাঙ্ক্ষা।

আগুন আকাঙ্ক্ষার মত, অথবা আকাঙ্ক্ষা আগুনের মত। এ উভয়ে কত বিষয়েই যে কি বিচিত্র সাদৃশ্য আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে; মনে একটুকু ভয়সঞ্চারও হয়।

আগুন কিসে না আছে? বন জঙ্গল, গাছ পাথর, তৃণ লতা, সোণা লোহা, ইহার কোন্ বস্তু আগুন ছাড়া? যতক্ষণ না ফুটিয়া বাহির হয়, ততক্ষণ আমরা দেখি না বটে। কিন্তু যে তৃণখণ্ডকে নখে ছিঁড়িয়া শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিতেছ, তাহার মধ্যেও আগুন আছে; এবং ঐ যে সুনীল কাদম্বিনী, জলভারে পরিপূর্ণ হইয়া, স্নিগ্ধমধুর গম্ভীর নির্ঘোষে লোকের হৃদয়ে আতঙ্কের সঙ্গে আনন্দ জন্মাইতেছে,—এই আপনার শীতল ছায়া দানে শস্যক্ষেত্র ও পুষ্পকানন ঢাকিয়া রাখিতেছে, এই আবার দামিনীর অলৌকিক ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিতেছে, উহারও বুকের মধ্যে আগুন আছে। অন্তরে অতলস্পর্শ ও অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড আছে বলিয়াই সর্ব্বংসহা পৃথিবী, সময়ে সময়ে ভূকম্পে বিদীর্ণ হইয়া, অগ্নির তরল প্রবাহ উদ্গীরণ করে, এবং অগাধ জলধির অভ্যন্তরেও আগুন আছে বলিয়াই উহা হইতে মাঝে মাঝে আগুনের শিখা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাই বলি, আগুন কিসে না আছে?

আর আকাঙ্ক্ষা? আকাঙ্ক্ষাও কোথায় না আছে? এ সংসারে কে এত বড় যে, বড় বলিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই? এ সংসারে কে এত ছোট যে, ছোট বলিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা জন্মে না? বস্তুতঃ বড় ছোট জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সুরূপ কুরূপ, কাণ খঞ্জ, কুব্জ ক্লিষ্ট, এই পৃথিবীতে ইহার কেহই আকাঙ্ক্ষাশূন্য নহে; এবং কুঞ্জ অথবা আশ্রম, মঞ্চ অথবা মঠ, উদ্যান অথবা শ্মশান, কারানিবাস অথবা কেলিগৃহ, ইহার কোন স্থানই আকাঙ্ক্ষার অনধিগম্য বলিয়া প্রতীত হয় না। যতক্ষণ না ফুটিয়া বাহির হয়, ততক্ষণ আমরা পরিচয় পাই না বটে। কিন্তু যাহাকে এইক্ষণ তৃণজ্ঞানে পাদতলে দলন করিতেছি, হয় ত তাহার চিত্তনিহিত আকাঙ্ক্ষা দারুনিহিত অগ্নির ন্যায় এক সময়ে আমাদিগকে দগ্ধ করিবে, এবং যাহাকে এইক্ষণ শ্যামল জলধরের ন্যায় সুখশীতল মনে করিতেছি, হয় ত তাহারই বক্ষোবিনিঃসৃত বহ্নি বজ্রস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মাথায় পড়িবে।

আগুন ও আকাঙ্ক্ষার আর এক সাদৃশ্য বিকাশে। আগুন প্রথমতঃ একবারে ফোটে না। একটুকু জ্বলে কি না জ্বলে এবং জ্বলিয়াই নিভিয়া যাইতে চাহে। যেন উহা আপনার বিকাশে আপনি ভীত। আকাঙ্ক্ষাও সেইরূপ ফুটিতে যাইয়াও ভাল করিয়া ফোটে না। একটুকু পরিস্ফুট হয় কি না হয় এবং পরিস্ফুট হইতে না হইতেই বি-

লীন হইয়া যায়। যেন উহা আপনার বিকাশে আপনি লজ্জিত। কিন্তু যখন প্রদীপ্ত ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন উভয়েরই লক লক জিহ্বা দিগন্তপ্রসারিণী ও সর্ব্বগ্রাসিনী হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তখন উভয়েই ভয় ও লজ্জার সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু সম্মুখে থাকে তাহা পুড়িয়া ভস্ম করিয়া ফেলে।

গৃহদাহের অগ্নি দেখিয়াছ কি? গভীর রাত্রি, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, অবনী অন্ধকারে অন্ধকার, সেই সময়ের অগ্নিলীলা দেখিয়াছ কি? উহা প্রথমতঃ গৃহের একপ্রান্তে ধীরে ধীরে কেমন প্রধুমিত হয়, তার পর অতি সুখদৃশ্য সুবর্ণরেখার ন্যায় ধীরে ধীরে কেমন প্রসারিত হইতে থাকে, এবং তাহারই পরক্ষণে লোকভয়ঙ্কর গর গর গর্জ্জনে সহসা কেমন জ্বলিয়া উঠে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ কি?

হৃদয়দাহের অগ্নিলীলাও এমনই ভয়ঙ্কর, এবং পরিণামফলের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহা অপেক্ষাও সহস্রগুণ অধিক শোচনীয়। যখন আকাঙ্ক্ষার আগুন হৃদয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রধুমিত এবং ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করে, কখন কেহই উহার প্রতি ফিরিয়া চায় না। যদি কেহ ফিরিয়া চায়, সেও উহার স্বর্ণোজ্জ্বল শ্যামরেখা দেখিয়াই মোহিত রহে, এবং আগুনকে আনন্দের উৎস জ্ঞানে আদরে পোষণ করে। কিন্তু যখন সেই আকাঙ্ক্ষা অথবা সেই আগুন আপনার ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠে,— তখন উহার সন্তাপে আত্মা জর্জ্জরিত এবং উহার সংস্পর্শেই সমস্ত ভস্মীভূত হয়—তখন হৃদয়ের কুসুমকানন উহার গ্রাসে পড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়; হৃদয়ের ফুল ফল, শোভা সম্পদ সমস্তই ক্রমে ক্রমে বিনাশ পায়।

আবার দেখ, তোমার অসাবধানতায় অথবা তোমার ত্রুটিতে তোমার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, কিন্তু যাহারা কোন অংশে দোষী নয়, কোন অপরাধে অপরাধী নয়, সেই আগুনে তাহাদিগের ঘরও পুড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ তোমার অসাবধানতায় অথবা তোমার ত্রুটিতে তোমার আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যাহারা কোন দোষে দোষী নয়, কোন অপরাধে অপরাধী নয়, তাহারা সেই আগুনে জ্বলিয়া মরিতেছে। রাবণের হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছিল। সেই আগুনে অযোধ্যার অশোকবন শোকভবনে পরিণত হইল, অযোধ্যার লক্ষ্মী বনবাসিনী হইলেন, রাক্ষসবংশ নির্ব্বংশ হইল। কুরুরাজের হৃদয়ের আগুনে সোণার ভারত শ্মশান হইল, ভারতের রক্তগঙ্গায় প্রবাহ বহিল, ভারতবাসীর আশালতা জন্মের মত পুড়িয়া ফেলিল। পেরীসের প্রেমের আগুন এবং হেলেনার রূপের আগুন একত্র মিশিয়া ট্রয় ও গ্রীস এই দুইটি রাজ্যের অসংখ্য যুদ্ধবীরকে তাহাতে আহুতি দিল। বোনাপার্টির আকাঙ্ক্ষার আগুন পৃথিবীর একার্দ্ধকে এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কাল জ্বালাইয়া পোড়াইয়া, মানবজগতে মানবীয় আকাঙ্ক্ষার পরিচয় রাখিয়া গেল।

তবে, আগুনে আর আকাঙ্ক্ষায় এই এক প্রভেদ দেখি; যে সকল স্থান আগুনে পোড়ে, তাহাতে অচিরেই আবার নূতন তরু, নূতন লতা, নূতন ফুল ও নূতন ফলের আবির্ভাব হয়। একটুকু যত্ন করিলেই সেই স্থান আবার যেই সেই নূতন কান্তি ধারণ করে। কিন্তু যে সকল হৃদয় আকাঙ্ক্ষায় পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া রহে, হায়! কোনরূপ যত্ন, কোনরূপ চেষ্টাতেই সেই হৃদয়ে শীঘ্র আবার নূতন আশা ও নূতন সুখের সঞ্চার হয়না।

মানুষ মন খুলিয়া হাসিতে পারে না কেন? মন খুলিয়া কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না কেন? ইহার প্রধান কারণ এই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই পোড়া মানুষ। কেহ আধ পোড়া, কেহ বা একবারে পোড়া। কিন্তু কোন না কোন প্রকারের আকাঙ্ক্ষার আগুনে পোড়া পোড়া হয় নাই এমন মানুষ অতি অল্প আছে। পোড়া মাটিতে কি কখনও ফুল ফোটে, না ফল ফলে? কোন কোন স্মরণীয় মহাত্মা নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন যে, যদি অনুতাপের অশ্রুজলে প্রকৃত প্রস্তাবে আর্দ্র হয়, তাহা হইলে মানবহৃদয়ের পোড়া মাটিও আবার নূতন প্রাণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। যাঁহারা নিজ হৃদয়ের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিয়া মনুষ্যকে আশার মোহনস্বরে এইরূপ উপদেশ দিতে অধিকারী হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে বন্দনা করি।

ইহার পর এইরূপ বিতর্ক হইতে পারে যে, আকাঙ্ক্ষা যদি এত অনর্থের মূল, তবে কি ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্মূলনই মনুষ্য জীবনের প্রধান কার্য্য? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বোধ হয় এইরূপ প্রশ্নান্তরই আপনা হইতে উত্থাপিত হয় যে, আগুণ যদি এত অনর্থের মূল তবে কি উহাকে একবারে নিভাইয়া ফেলানই বুদ্ধিমান্ গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য? এ সংসারে আগুণেরও প্রয়োজন আছে, আকাঙ্ক্ষারও প্রয়োজন আছে। আগুণেরও ব্যবহার আছে, আকাঙ্ক্ষারও ব্যবহার আছে। যে প্রয়োজন ও ব্যবহার বুঝিয়া পোষণ করিতে পারে, তাহার পক্ষে আগুণ ও আকাঙ্ক্ষা সুখের মুখ্য সাধন ও শক্তি সাধনার মঙ্গল ঘট।

একটি স্বপ্ন।

কার্ত্তিক মাস, অমাবস্যার রাত্রি, সেই রাত্রিতে কালীপূজা। যেখানে সিরাজ ও ক্লাইবের যুদ্ধ হইয়াছিল, পলাশীর সেই সুপ্রসিদ্ধ ময়দানের একদেশে একটা বৃক্ষতলে ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া বসিয়া গাঁজায় দম দিতেছি। ক্রমে ভরপূর নেশা হইয়া আসিল। ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে বসিলাম। দেখিতে দেখিতে অনন্ত-শিরো-ধৃত ধরণীমণ্ডল বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। ধুনীর আলো একবার বড় দেখাইতে লাগিল, একবার ছোট দেখাইতে লাগিল; একবার লম্বা একবার গোল! বিকটমূর্ত্তি পিশাচ, উলঙ্গিনী

প্রেতিনী, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, মহিষ, কুক্কুর, বিড়াল, শৃগাল, মূষিক, ছুছুন্দর —কত কি চক্ষের সামনে আসে আর যায়!! দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ আম্রবাগান— গোরাসৈন্য, ক্লাইব ; নবাবী সেনা—সিরাজ, মীরজাফর, মীরমদন, মোহনলাল! তোপের শব্দ, বন্দুকের শব্দ—কত কি দেখিলাম, কত কি শুনিলাম!! শক্রধর্ষণ তুমুল সংগ্রামের মধ্যে নির্ভীক মোহনলাল মূর্ত্তিমান্ বীরত্বের ন্যায় অগ্রসর হইতেছেন। —ক্লাইবের মুখ নির্ম্মোকমুক্ত গৃহগোধিকার শরীরের ন্যায় পাণ্ডুতা-প্রাপ্ত হইতেছে। হঠাৎ কেন মোহনলালের ললাটগগণে বিরক্তি মেঘের উদয় হইল? ও কি? বিজয়শ্রীর অঞ্চল স্পর্শ করিয়াও কেন নবাবী সেনা শক্রকে পৃষ্ঠ দেখাইতেছে? হুড় মুড় গুড়ুম! ও কি? আকাশ ভাঙিয়া পড়িল না কি? না! ইংরেজের কামান-ধ্বনি! ধূমে ধূমময়! অন্ধকার ঘুরঘুট্টি! আর কিছুই দেখিতে পাই না!!

ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলাম। ত্রিশূলকরে কাল-ভৈরব জগদ্গ্রাসন বিকট হাস্য করিলেন। তাঁহার বদন-কন্দর বিনিঃসৃত, অপরাজিতা-কুসুম দ্যুতি নীলাগ্নিশিখার আলোকে দিগন্ত পর্য্যন্ত বিকটশোভন রঙ্গে রঞ্জিত হইল! দেখিলাম, বিমানপটে উজ্জ্বল-লোহিত-অগ্নিময় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, বিধাতৃ-বিহিতং মার্গং বদ কেন নিবার্য্যতে। চক্ষু ঝলসিয়া গেল, ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া রহিলাম!

আবার যখন চাহিলাম, তখন কিছুই নাই। শ্মশানভূমিতে বসিয়া আছি। গণ্ডায় গণ্ডায় মৃতদেহ গড়াগড়ি যাইতেছে, বসাধবল শৃগাল কুক্কুরে টানাটানি করিয়া খাইতেছে; পুণ্ডরীক-কান্তি প্রমথগণ আসিয়া শববক্ষে পদাঘাত করিতেছে, মুখোচ্ছ্বলিত শোণিতধারা পান করিতেছে; খল খল হাসিতেছে, ধেই ধেই নাচিতেছে; জলচ্চিতার কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করিতেছে! তখন নিদারুণ ভয়ে "মা! মা!" বলিয়া ডাকিলাম। পশ্চাৎ হইতে ক্ষীণস্বরে কে বলিয়া উঠিল, "কিরে! আমার বাছা কি আজো কেহ বেঁচে আছে যে আমায় মা ব'লে ডাকে?" ফিরিয়া দেখিলাম —ভাইরে, আমাদের সেই জননী অন্নপূর্ণা —মসীবর্ণা, শতগ্রন্থিচীরবসনা, দৃশ্যমানাস্থিপঞ্জরা, দীননয়না, নিরশনশুষ্কবদনা; তাহাতে আবার সেই ক্ষীণতর হস্তপদ দারুণ রজ্জুবন্ধনগ্রপিত! মর্ম্মাহত হইয়া কহিলাম, "মা! তোমার আ'জ এদশা কে করিল?" শ্যামাঙ্গী কহিলেন, "যে রজত-কান্তি ভৈরবকে শিবজ্ঞানে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলাম, সেই আজি আমার অশিবের মূল হইয়াছে। যে আমার দ্বারের ভিখারী ছিল, আমি রাজার দুহিতা হইয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিলাম। সে এখন আমার সেই উপকারের বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিতেছে। আর দুঃখের কথা বলিব কি, আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, আর সুখে কৈলাসশিখরে বিহার করিতেছে। নিজে নিয়ত গরল পান করে, আর সেই গরলে আমার প্রজাকুলের ধনপ্রাণ নাশ করিতে

বসিয়াছে। সকলি সহিতেছি, বাছা, তবু দেখ, অপরাধিনীর ন্যায় আমার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। একে শক্তি নাই, বেশি কথা কহিতে পারি না; আবার শিবনিন্দার কোন গন্ধ পাইলেই এখনি তাহার অনুচর পিশাচগণ তুমুল কাণ্ড বাঁধাইবে।"

বলিতে বলিতে সেই শ্মশানচারী শৃগাল, কুক্কুর, ভূত, প্রেত, পিশাচগণ বিবিধ বিকট স্বর একতানে মিলাইয়া ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং মহারোলে আমাদের অভিমুখে ধাবমান হইল। ভয়ব্যাকুলা জননী কোথায় লুকাইলেন আর দেখিতে পাইলাম না।

ত্রস্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া "জয় জননি দুর্গে! রক্ষ রক্ষ" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিলাম। সহসা আকাশবাণী হইল 'মা ভৈঃ, বৎস, মা ভৈঃ! সম্মুখে দেখ, ভারতী-প্রদত্ত শৃঙ্গ রহিয়াছে—ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ কর; এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেবা করিও। উহার নিনাদে শবদেহে জীবন আইসে, দুর্ব্বলের বল হয়, নিদ্রিতের চৈতন্য হয়। উহা আদ্যাশক্তির প্রসাদ, শক্তিমন্ত্রে অভিষিক্ত!'

আবার শ্মশানচারী-বর্গের ভৈরব বিরাব। তখন 'জয় মা ভারতী' বলিয়া সভক্তি প্রণাম পূর্ব্বক শক্তি-প্রসাদলব্ধ সেই দুর্ভর শৃঙ্গ নিনাদিত করিলাম। ভীষণ নির্ঘোষে গগণ মেদিনী বিকম্পিত হইল। সান্দ্রতমোরাশি দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। দলিত-কজ্জলনিভ জলদ-জালে বিয়ন্মণ্ডল নিস্তারক হইল। লোলতরা তড়িল্লতা লক্ লক্ করিল। ভীমগম্ভীর জীমূতমন্দ্রে বসুন্ধরাধর নাগেন্দ্র-মস্তক আতঙ্কে টলিয়া উঠিল। বন্ধনমুক্ত কেশরীর ন্যায় উনপঞ্চাশৎ পবন হুহুঙ্কার করিয়া দশদিকে ছুটিল। মহাসমুদ্র তরঙ্গবাহু আস্ফালন পূর্ব্বক গর্জিয়া উঠিল।

তখন কক্ষদেশে শৃঙ্গ ধরিয়া আকাশের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া যুগল করে কহিলাম, 'মা! শক্তিরূপিণি! প্রকৃতিরূপিণি! সৃষ্টিরূপিণি! এই তোমার কালী মূর্ত্তি মা! তোমার এ মূর্ত্তি আমি বড় ভাল বাসি! যে মূর্ত্তিতে নিজহস্তে নিজের মুণ্ড ছিন্ন করিয়াছিলে, মা! সে মূর্ত্তি মনে হইলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! অহো! এখন কি অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়াছ! মেঘ তোমার কান্তি মা—সৌদামিনী তোমার রসনা! আবার বজ্রনাদ কর, মা অসুর-নাশিনি! দৈত্যদলনি! সংগ্রামাঙ্গনরঙ্গিণি! রক্তবীজবিনাশিনি! বসুন্ধরার ভার হরণ কর, মা!—লক্ লক্; লক্ লক্! কড়্কড়্, কড়্ কড়্, গুড়ুম্, গুড়্ গুড়্, গুড়্ গুড়্!!'

শৃঙ্গ ধরিলাম। ভোঁ ভোঁ! শৃঙ্গ নিনাদ মেঘশব্দকে ঢাকিয়া গর্জিয়া উঠিল। শ্মশানবাসী শববৃন্দ নড়িয়া উঠিল। আবার ভোঁ ভোঁ। শবরাশি উঠিয়া বসিল,—দাঁড়াইল। পুনরপি দ্বিগুণ তেজে শৃঙ্গ-গর্জ্জন! সেই সঙ্গে 'জয় ভারতী, জয় মা!' বলিয়া প্রাপ্তজীব শব-পুঞ্জ নির্ঘোষ করিয়া উঠিল। শ্মশানচারী শৃগাল, কুক্কুর, পিশাচ, প্রমথ—কে কোথা পালাইল। প্রবল পবন-তাড়নে অঙ্গার-পাংশুরাশি প্রমার্জ্জিত হইল। বারি-

দরাশি মুষল ধারে বর্ষিয়া শ্মশান ভূমি ধুইয়া পবিত্র করিল।

পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল। চাহিয়া দেখিলাম, বাল সূর্য্য মধুরমূর্ত্তি ধরিয়া গগণোপান্তে ধীরে ধীরে উদিতেছেন। অঞ্জলিবদ্ধ করে আরক্তমণ্ডলে দৃষ্টিপ্রোত করিয়া 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলাম।

অকস্মাৎ চারিদিকে মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেখিলাম যেখানে চিতাভস্মবিকীর্ণ শোচনীয়-দর্শন শ্মশান ছিল, আজি সেখানে রম্যহর্ম্মারাজি শোভিত বিচিত্র আনন্দময় নগর। প্রতি রাজ পথে নাগরিকগণ সচন্দন কুসুমমালা পরিয়া 'জয় ভারতীর জয়' গাইতে গাইতে চলিয়াছে। ছাদ হইতে কুলাঙ্গনাকুল হুলুধ্বনি করিয়া তাঁহাদের শিরে কুসুম বর্ষণ করিতেছে। শিশুরা আনন্দোজ্জ্বল নয়নে পৌরাঙ্গনাগণের মুখ প্রতি চাহিয়া, হাস্য-বিকশিত সুকুমার অধরোষ্ঠে অস্ফুট মৃদুস্বরে 'জয় ভারতীর জয়' গাহিতেছে। ছাদে ছাদে বাসন্তী রঙ্গের পতাকা মৃদু মলয়-ভরে হেলিয়া দুলিয়া 'জয় ভারতীর জয়' প্রকটিত করিতেছে। দুয়ারে দুয়ারে কুমারীরা আলিপণা চিত্রিত করিয়াছে 'জয় ভারতীর জয়'। চারিদিকে ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঁঝর, নহবৎ শব্দবহ বায়ুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বোপরি শানাইয়ের সম্মোহন স্বর উদার সপ্তমে গাইতেছে,

'ওমা দিগম্বরি! নাচো গো মা রণ মাঝে!'

আমি তখন আনন্দে বিভোর হইয়া বগল বাজাইয়া দুহাত তুলিয়া নৃত্য করিতেও গাইতে লাগিলাম,—

(সুর—শ্যামারে কেউ পার রে চিন্তে।)

শ্যামা মায়ের কি শোভা আজি।
সমরে অসুর-শোণিতে সাজি॥
শ্বেত গিরি প্রায়,
ভীম মহাকায়,
ভৈরব-হৃদয়ে চরণ রাজি॥

অরি-মুণ্ডমালা গলে শোভা করে,
অরি-কর কাটি সরম সম্বরে,
আনন্দে মগন,
হের সুরগণ,
হরষে বরষে রাজীব রাজী॥

আমি উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছি, সহসা পশ্চিমদিক্ হইতে এক তুষার ধবল নৃসিংহ মূর্ত্তি সগর্জ্জন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আমার বক্ষঃস্থলে নখর নিপাতন করিল। আমি বীরপুরুষ—ভয় না পাইয়া, কর যোড়ে অনুনয় করিয়া বলিলাম, 'হে নৃসিংহরূপি, হে অবতার! আমি হিরণ্য কশিপু নই! আমি সংসারত্যাগী, আমার বক্ষ বিদারণ করিয়া নখর কলঙ্কিত করিবেন না। আর দেখিবেন, প্রভু! আমার গললম্বিত গাঁজার পুঁটুলিটি যেন না ছিঁড়িয়া যায়!'

তখন অবতার মহাশয় কোপ কষায় লোচনে আমার দিকে তাকাইয়া আমার যুগল গণ্ডে স্বীয় কর-পল্লবের বজ্রোপম যুগল চপেট প্রদান পূর্ব্বক আমার সর্ব্বস্ব ধন গাঁ-

জার পুঁটলীটি কাড়িয়া লইয়া অধর কোণে ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষদ্ধাস্যচ্ছটা প্রকটন পুরঃসর কহিলেন, "ভণ্ড ফকির! জানিস না 'নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার? জাগে সে কাঁদিতে'।" এই বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শোভন লাঙ্গুল আন্দোলন করিতে করিতে যদৃচ্ছা চলিয়া গেলেন। আমি গাঁজার পুঁটলী হারাইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া উঠিলাম, এবং একটু জ্ঞান হইবামাত্র অগ্রে পুঁটলীটি অনুসন্ধান করিয়া যখন সেটি পাইলাম, তখন আমার ধড়ে প্রাণ আসিল। তখন জানিলাম, এটা স্বপ্ন বই কিছুই নয়।

ভোলানাথ—

সেই দিন।

সেই দিন—জীবনের সেই এক দিন—
গিয়াছে পলায়ে পুনঃ, ফিরিবে না আর;
জলে জলবিম্ব মত,
হইয়াছে পরিণত,
ডুবেছে কালের গর্ভে অকূল পাথার!
আর কি সে সুখদিন ফিরিবে আমার!

২

সেই দিন হায়!
এই জীবনের সেই ক্ষীণতর স্রোত
বহিল প্রথম স্থির, নির্ব্বাত, নিথর,—
একটি তরঙ্গ হায়!
কখন বহেনি যায়,
ছিল যে জীবন চিরশান্তির নিদান,
আজি সে নিথরে কেন এ ভীম তুফান।

৩

অহো! কি ভীষণ!
এবে সেই জীবনের ক্ষীণতর স্রোত
ছুটিতেছে শতমুখ করিয়া ব্যাদান;
ক্রমে অলক্ষ্যেতে হায়!
হতেছে বর্দ্ধিত কায়,
উন্মত্ত তরঙ্গচয় করে আস্ফালন,
প্রবল ঝটিকাবেগ—ভীম দরশন।

৪

প্রগাঢ় ঘনান্ধকার মস্তক উপরে
হইতেছে গাঢ়তর জীবন আঁধারি;—
নৈরাশ্য অশনিপাত,
আশার ঝটিকাঘাত,
করিতেছে বিচূর্ণিত হৃদয় পঞ্জর;
সেই আর এই দিন কতই অন্তর!

৫

যে ভীম জীবনস্রোতে আজি ভাসমান,
কি জানি কোথায় পরে ফেলিবে আছাড়ি;
সদাই অস্থির চিত,
সদা প্রাণে সশঙ্কিত,
ভাবিতাই কিসে ইহা হবে পরিণত;
কেমনে বা কতদিনে হইবে সংযত।

৬

মনে পড়ে আজ
হায়! সেই মধুমাখা সুখের শৈশব—
জীবন-প্রবাহ-মূলে সুশান্তির ছায়া;
আজি মনে পড়ে কত,
শৈশবের সুখ যত,

সেই খেলা, সরলতা, অক্ষুণ্ণ হৃদয়,
সেই সহচর প্রেম,—মধুরতাময়।

৭

জননীর স্নেহ দৃষ্টি, জনকের আশ,
সোদরের সৌহার্দ্রাতা, বন্ধুর প্রণয়;—
হায়রে! এসব যবে
বাজিত মধুব রবে
মাতায়ে হৃদয়, মনে, জুড়ায়ে শ্রবণ,
মনে পড়ে—কিন্তু এবে সুদূর স্মরণ।

৮

আজি—
পথশ্রান্ত পান্থ যথা ক্লান্ত কলেবরে
দিবা শেষে নদী পাশে না দেখি তরণী,
ভাবে মনে আরবার,
কেমনে হইব পার,
তাহাতে সম্মুখে দেখে আঁধার রজনী
সংসার বেলায় বসি, আমিও তেমনি

৯

লয়ে এই ছিন্ন ভিন্ন দগধ হৃদয়,
ভাবিতেছি দিবানিশি কোন সুউপায়ে
এ দুস্তর পারাবার
নির্ব্বিঘ্নে হইব পার
কিসে এ ঝটিকাবেগ হইবেক স্থির,—
হইবে না;—এ যে সিন্ধু,নাহি যার তীর।

১০

অনন্ত সময়-স্রোতে, ক্ষুদ্র বিম্বাকারে
ডুবিতেছে দিন পুনঃ, উঠিছে আবার;—
এইরূপে আসে যায়
(কেহ না ফিরিয়া চায়)
ভাসাইয়া লয়ে দুঃখী মানবের আশ;
রেখে যায় প্রাণে সুধু গভীর নৈরাশ।

১১

ওই শুনি!
কুটিল ভ্রূকুটী সহ কালের বচন—
ওরে মূঢ়নর, তোর কিসের তরাস,
এ ভীম তরঙ্গ যুদ্ধ
রবেনা, হইবে রুদ্ধ,
স্নেহের বাঁধন তোর টুটাব রে বলে,
আশার সুবর্ণ তরী ডুবাব অতলে।"

১২

তবে কেন আর
যে ক্ষীণ আশ্রয় ধরে, এভব সংসারে
আছি পড়ে, সহি বুকে এ ঘোর তুফান;
তাও যদি ভেসে যাবে
হায়! মিছে কেন তবে
আশার আশ্বাসে ভুলি, আপনার মনে
কত ভাঙ্গি, কত গড়ি,গোপনে নির্জ্জনে।

১৩

ভবিষ্যৎ!
অনন্ত আঁধার সেই গরভে তোমার
আর কিবা রাখিয়াছ অভাগার তরে,
আশার ঝটিকাঘাতে
নৈরাশ্য অশনি পাতে
ভাঙ্গিয়াছ অভাগার হৃদয় পঞ্জর
এতেও কি পুরিল না তোমার উদর!

১৪

এসো, পাতি বক্ষঃস্থল দিতেছি তোমায়
বাছি বাছি লহ অস্ত্র, করহ প্রহার,
হৃদয় হয়েছে খাক্
জীবতারা অস্ত যাক্
পারিনা সহিতে আর নৈরাশ্যের ভার
লও সব—একি! এ যেসব অন্ধকার! (শ্রী—

রামানন্দ চক্রবর্ত্তী।

অদ্য আমরা আর একজন কবিকে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। ইঁহার বিষয় অনেকে অবগত থাকিলেও ইহাঁর যথার্থ বিবরণ কেহই অবগত নহেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ বহুকাল হইতে পঠিত হইয়া আসিলেও তিনি প্রায় অপরিচিতের মত হইয়া রহিয়াছেন। এই কবির নাম রামানন্দ চক্রবর্ত্তী। ইনি নিজে কবিত্ব শক্তি প্রদর্শনে ততদূর কৃতকার্য্য না হইলেও, বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী স্বভাব-কবি ইহাঁর স্বীয় ভ্রাতার জন্যই তাঁহারও নাম গৌরবান্বিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার এই সুকবি ভ্রাতার নাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। কবিকঙ্কণের ন্যায় স্বভাব-কবি বঙ্গে আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নামের সহিত তদীয় ভ্রাতা রামানন্দের নাম সংযোজিত হওয়ায়, কবিকঙ্কণ রূপ, গুণ, কুল, শীল সম্পন্ন বিদ্বান্ জামাতা সম্বন্ধে "গজদন্ত কণকে জড়িত" যাহা বলিয়াছেন সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। যদিও রামানন্দ উচ্চ কবি নহেন ও তাঁহার কবিত্ব শক্তি সকল স্থলে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই; তত্রাপি কবিকঙ্কণের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত থাকায় তাঁহার শোভা দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। রামানন্দ প্রণীত গ্রন্থের নাম "গোবিন্দমঙ্গল"। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় বৃন্দাবনলীলা বর্ণন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে শিশুবোধ নামক পুস্তকে যে "দাতাকর্ণ" পাঠ করিয়াছি, তাহা এই রামানন্দ প্রণীত ও তাঁহার "গোবিন্দ মঙ্গলের" অন্তর্গত। মুকুন্দরাম যেরূপ কবিকঙ্কণ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, রামানন্দও সেইরূপ কবিচন্দ্র নামে বিশেষ বিখ্যাত। কবিচন্দ্রের নাম যে রামানন্দ চক্রবর্ত্তী তাহা বোধ হয় অনেকের নিকটই অজ্ঞাত। কবিকঙ্কণের ন্যায় কবিচন্দ্রও প্রায় তাঁহার সমুদায় রচনায় কবিচন্দ্র বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। যে সময়ে কবিকঙ্কণ বা কবিচন্দ্রের কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইতেছিল সে সময়ে মুসলমানগণ এদেশের রাজা। তাঁহাদের সময়ে এদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা যাঁহারা কবিকঙ্কণের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষরূপে অবগত আছেন, এস্থলে তাহা উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কবিকঙ্কণ মুসলমান-অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া স্বদেশ ও স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সঙ্গে আর কেহ নাই—স্ত্রী পুত্র ও প্রিয় ভ্রাতা। ইহারা ক্রমশঃ মেদিনীপুর জেলায় যাইয়া উপস্থিত; তথায় আড়রা গ্রামে রঘুনাথ রায়ের সহায়তা প্রাপ্ত হই-

লেন! রঘুনাথ রায় আড়রার ভূস্বামী; তিনি ইহাদিগকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। রামানন্দ ও মুকুন্দরাম তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন; এইস্থলে রামানন্দ "কবিচন্দ্র" ও মুকুন্দরাম "কবিকঙ্কণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। রামানন্দ ও মুকুন্দরাম যে একত্র দেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—

গোথড়া ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রামানন্দ ভাই
আড়রায় গিয়া উপনীত।

অন্য এক স্থলে

সঙ্গে ভাই রামানন্দি যে জানে স্বপ্নের সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।

এইরূপে চণ্ডীমঙ্গলের আরও দুই এক স্থলে রামানন্দের নামোল্লেখ আছে।

যে সমস্ত গুণের জন্য কবিকঙ্কণ বিদ্বৎসমাজে পূজা পাইয়া আসিতেছেন, কবিচন্দ্রে সে মোহিনী ক্ষমতা নাই; এমন কি তিনি যদি এরূপ গুণসম্পন্ন কবিকঙ্কণের ভ্রাতা না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম এতদিন জগতীতলে থাকিত কি না সন্দেহ। তবে তিনি যে নিতান্তই কবিত্বশক্তিবিহীন ছিলেন তাহা নহে; তাঁহারও রচনার স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বের বিকাশ পাইয়াছে। তবে তাঁহার অদ্বিতীয় ভ্রাতার মানবস্বভাবপরিজ্ঞানে—কল্পনার স্ফুরণে—করুণরসের উদ্দীপনায়—কি বাহ্যজগৎ বর্ণনায় যে নৈপুণ্য ছিল, কবিচন্দ্রে তাহা ছিল না। আমরা গোবিন্দ মঙ্গল হইতে এই স্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। কৃষ্ণ ও রাধিকা একটি পালঙ্কের উপর আছেন, কবি সেই সময়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

রাধিকার প্রেম নদী রসের পাথার।
রসিক নাগর তাহে দেন যে সাঁতার॥
কাজলে মিশাল যেন নব গোরোচনা।
নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচ সোণা॥
কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম।
কালো মেঘ মাঝেতে বিজুলী অনুপম॥
পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার কোলে।
কালিন্দীর জলে যেন শশধর হেলে॥
বেণী চূড়া হেরি ফিরাফিরি করি বাহু।
শারদ পূর্ণিমা চাঁদে গরাসিল রাহু॥

আমরা গোবিন্দ মঙ্গল হইতে আর একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম; যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন আর গোপীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান, সেই সময়ের একটি দৃশ্য আমরা পাঠক সমক্ষে ধরিলাম;—

গোপী সব মুখ চেয়ে, রাণী কান্দে ফুকরিয়ে
দেখ সবে গোপালের মুখ।
মরণের চিহ্ন হয়, কপালেতে কিবা হয়,
মুখ দেখে ফেটে যায় বুক॥
সব গোপী আইসহেথা, বাছাধনে কহাও কথা
একবার মা বলিতে বল।
আর দিন কতবার, ননী মাগে বারে বার,
আজি বিধি নৈরাশ করিল॥
শ্রীনন্দের শব্দ শুনি, উঠ বাছা নীলমণি,
বাধা নিতে ডাকে তোর বাপ।
মায়ের কথাটি রাখ, আঁখিমেলি চেয়ে দেখ,
না চাহিলে জলে দিব ঝাঁপ॥
আর না যাইবি গোঠে, কালিন্দী যমুনাতটে,
বংশীবট কদম্বের তলে।

সন্ধ্যার সময় কানু, আর না পূরিবে বেণু,
গোঠের বেশে না আসিবে কোলে॥
ইত্যাদি।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাঁর দাতাকর্ণ বোধ হয় সকলেই পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতে নিরস্ত হইলাম। এক্ষণে কবির বাসস্থানাদি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়ণার তিন ক্রোশ দক্ষিণ দামুন্যা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হৃদয় মিশ্র ও পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র। মুকুন্দরাম তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলের এক স্থলে আপন পরিচয়জ্ঞাপক দুই চারি কথা বলিয়াছেন;—

তার সুত জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বঙ্গীয় সাহিত্য" নামক পুস্তকে মুকুন্দরামের জীবন চরিত লিখিতে বলিয়াছেন, মুকুন্দরামের কবিচন্দ্র নামে এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন।* কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি কবিচন্দ্র তাঁহার উপাধি মাত্র, তাঁহার প্রকৃত নাম রামানন্দ চক্রবর্ত্তী।

এক্ষণে দেখা যাউক তিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। চণ্ডীমঙ্গলে অবগত হওয়া যায় যৎকালে অম্বররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই সময়ে কবিকঙ্কণ ও কবিচন্দ্র মামুদ সরিপের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দামুন্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ মানসিংহ দিল্লীশ্বর আকবর সাহের সভাসদ ছিলেন; তিনি ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। তাহা হইলেই আমাদের কবি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কবিকঙ্কণ ১৪৯৫ শকে অর্থাৎ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীকাব্য রচনা আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। আকবর সাহ যে বৎসর মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন সেই বৎসরই চণ্ডী রচনা সমাপ্ত হয়। কবিচন্দ্র যে সময় স্বগ্রাম হইতে পলায়ন করেন, তখন তাঁহার বয়স ন্যূনপক্ষে ২৫ বৎসর হইয়াছিল। তাহা হইলেই তিনি ৩৩২ বৎসর পূর্ব্বে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম পরিগ্রহ করেন; ইহাই অনুমিত হয়। এই কবি সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই জানিবার উপায় নাই; ইহাঁর বংশধরগণ অদ্যাপি রায়ণা থানার অধীন ছোট বৈনান গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ

* 'And he had an elder brother of the name of Kabichandra.'
Literature of Bengal ch. XII.

গৌর-বঙ্গ-বিবেচনা।

পূর্ব্বকালে গ্রন্থকারগণ যে দেশকে গৌড়দেশ বলিয়া এবং যে স্থানের ভাষাকে গৌড়ীয় ভাষা বলিয়া আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন গ্রন্থকারগণ তাহাকেই বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। এই উল্লেখ সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। যদি উহা যথার্থতঃ ভ্রমাত্মক হয়, তবে সেই ভ্রমের নিরসন একান্ত আবশ্যক। এ নিমিত্ত তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ বঙ্গ ও গৌড় এই দুই শব্দ এক পর্য্যায়ক কিনা; যদি না হয়, তবে তত্তৎ শব্দে কোন বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিনা, তাহা দেখা আবশ্যক। প্রাচীন গ্রন্থরাশি আলোড়ন করিলে বঙ্গ ও গৌড় এই শব্দ দ্বয়ের পর্য্যায়তা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যুত, এতদুভয়ের ভেদই সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। শক্তি সঙ্গমতন্ত্রে এক কালেই ঐ উভয় স্থানের সীমা সহিত উল্লেখ আছে। যথা, "রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্ম পুত্রান্তগং শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদর্শকঃ॥ বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনে শান্তগং শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥" এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গদেশ ও গৌড়দেশ পরস্পর পৃথক্‌ এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমসীমাবধি ভুবনেশ পর্য্যন্ত স্থান গৌড়দেশ। কিন্তু ভুবনেশ শব্দে কোন্ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত, এক্ষণে তাহা জানিবার কোন উপায় না থাকায় উহার সীমা ও বিস্তার স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে না। কিন্তু গৌড়দেশ যে অতি বিস্তীর্ণ তৎপক্ষে বহুল প্রমাণ আছে। মানবসংহিতার সুবিখ্যাত টীকাকার কল্লূকভট্ট স্বকীয় পরিচয় প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন, "গৌড়ে নন্দনিবাসিনাম্নি সুজনৈর্ব্বন্দ্যো বরেন্দ্র্যাংকুলে" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বরেন্দ্রভূমি গৌড়দেশের অন্তর্গত। সুবিখ্যাত মৈথিল গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণমিশ্র তদীয় প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থে অহঙ্কারের উক্তিতে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী। ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম ধামপরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা"। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে রাঢ়দেশ গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত। ঐ রাঢ়াদেশে ভূরিশ্রেষ্ঠি নামক যে প্রসিদ্ধ স্থানের কথা লিখিত হইয়াছে, উহাই আধুনিক হুগলি জেলার অন্তর্ভূত ভুরশিট পরগণা।

বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত-শিরোমণি হলায়ুধ অনেকস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি গৌড়াধীশ্বরের ধর্ম্মাধিকরণিক ছিলেন।

যথা ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে—" হলায়ুধেন গৌড়েন্দ্র ধর্ম্মকোষাধিকারিণা। এতৎ পুরুষসূক্তস্য ব্যাখ্যানং প্রতিপদ্যতে" ॥ "যো গৌড় বসুধাধীশধর্ম্মাধ্যক্ষো হলায়ুধঃ। স্মার্ত্তাগ্নিপদ্ধতেরেষ নিবন্ধস্তেন নির্ম্মিতঃ॥" ইত্যাদি। তৎকালীন গৌড়াধীশ্বর লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিক্রমপুর গৌড়দেশের সীমান্তর্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দিনাজপুরে বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরের প্রস্তরে এইরূপ খোদিত লিপি দেখা গিয়াছে,—"কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং। প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥" এতদ্দারা দিনাজপুর যে গৌড়াধিকারের অন্তর্ভূত ছিল,তাহা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে।

এই সকল প্রমাণানুসারে বঙ্গদেশ হইতে গৌড়রাজ্যের শুদ্ধ পার্থক্য নহে, তাহার সীমাধিকার পর্য্যন্ত অনেকাংশে অবধারিত হইতেছে। ইহাও নির্ণীত হইতেছে যে, গৌড় এককালে সর্ব্বত্র সুগণ্য ও সুবিখ্যাত হইয়াছিল। * গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চ ব্রাহ্মণশ্রেণির অন্যতম আদিম ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য ছিলেন †। গৌড়বাসিগণ সভ্য, সুশিক্ষিত এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও সমৃদ্ধ ছিলেন। ‡ তাঁহাদিগের রচনারীতির স্বয়ংসিদ্ধ এক প্রকার স্বাতন্ত্র্য থাকায় গৌড়ী রীতি নামে তাহা শাস্ত্রে খ্যাত হইয়াছিল। গৌড়রাজ্য অল্পকালের নহে, বহুপূর্ব্ব হইতে তাহার নাম বিখ্যাত হইয়াছে এবং গৌড়ের অধিপতিও প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। গৌড়বাসীরা সারঙ্গরাগিণীর যে নূতন আকার দিয়াছেন, তদনুসারে তাহার গৌড়-সারঙ্গ এই এক নূতন নামই হইয়াছে। অধিক কি, গৌড়বাসীদিগের সর্ব্ব বিষয়ক অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তির ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রদত্ত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমরা এই বহুমানাস্পদ প্রখ্যাত নাম স্বয়ং লোপ করিয়া ফেলিলাম। আমরা গৌড়দেশ ও গৌড়ীয়ভাষার স্থলে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়ভাষা এই পদদ্বয় লিখিত ভাষায় ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক সমূহে ও প্রাচীন নিবন্ধমাত্রে ঐরূপ পদ প্রয়োগ দেখিয়া ঘৃণাবশতঃ আমরা তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম, অথবা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এখন যেমন সকল বিষয়ের সংস্কার করিতে যাইতেছি, তেমনি সংস্কার ভ্রমে একটি উৎকৃষ্ট বস্তু লোপ করিয়া বসিলাম, বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আ-

* অর্ঘ্যংদত্ত্বারগস্ত্যায় গৌড়দেশনিবাসিনঃ। ইতি স্মৃতিঃ।

† সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিল উৎকলাঃ।

‡ ইয়ংপুনস্ততোপি পুরস্তাৎ চম্পানাম গৌড়ানাং বিনয়মধুরশৃঙ্গারবিভ্রমরমণীয়া মকরকেতোঃ কুমারব্রতচর্য্যাতপোবনমিব রাজধানী। অনর্ঘরাঘব।

গৌড়ানামিব নীতিমৈথিলপাশ্চাত্যদাক্ষিণাত্যানাম্। বিদ্যালঙ্কারসুধীরালোচ্যালোচ্য নীতিমারেভে॥ কাব্যপ্রকাশসুদর্শন টীকা।

মাদিগের এই অসমীক্ষ্যকারিতা যে নিতান্ত শোচনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেকে বলিতে পারেন যে, ইহাতে দুঃখের বিষয় কিঞ্চিৎ থাকিলেও তাহা অবাস্তর প্রয়োজনের নিমিত্ত পরিহরণীয়। আমরা যে নামে একভাষাভাষী বলিয়া একপ্রাণ হইতে পারি, তাহার প্রতিকূলতা করা কিরূপে যুক্তিযুক্ত বোধ হইতে পাবে? আমি বলি, এতদ্দ্বারা আশঙ্কিতরূপ প্রতিকূলতাচরণ কিছুই করা হইতেছে না। "প্রধানেন ব্যপদেশা ভবন্তি" অর্থাৎ প্রধানের নামেই সাধারণতঃ নাম হইয়া থাকে, এই ন্যায়ানুসারে গৌড়ীয় ভাষা বলিলেই ভাষার নামগত একতা রক্ষিত হইতে পারে। আর, কার্য্যে এক হইলে নামের পার্থক্যে কিছু যায় আসে না। তাহা নিতান্ত অনভিমত হইলেও উপায়ান্তর আছে। এক বাঙ্গালা শব্দ দ্বারাই উভয়দেশ, এক বাঙ্গালি শব্দে উভয়দেশবাসী এবং এক বাঙ্গালাভাষা শব্দে উভয়দেশবাসীর ভাষা যখন আখ্যাত হইতেছে, তখন ঐ শব্দ প্রয়োগেই আমাদিগের একপ্রাণতা রক্ষিত হইতে পারে। মূল উদ্দেশ্যের যদি কোন রূপে ব্যাঘাত না হয়, তবে বঙ্গদেশ পদের যে পৃথগর্থবোধক শক্তি আছে,তাহা লোপ করিয়া নূতন অর্থে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দ সকল বাধাবাতিরেকে তদ্ভাষানুযায়ী অর্থেই বাঙ্গালাভাষাতে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এখনও বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বাবয়ব সুগঠিত হয় নাই। এসময়ে ক্ষতিলাভভাগী গঠনকারিগণ এসকল বিষয়ে সবিশেষ অবধান দান করেন, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীশা।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়।

যে বাঙ্গালাভাষা অধুনা একটি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত সুরম্য হর্ম্ম্যরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে,বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়ই তাহার ভিত্তি সংস্থাপক। ইহাঁরা প্রথমে যে ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই উপর অন্যান্য অনেক কারু নানা দেশ বিদেশ হইতে নানাপ্রকার উপকরণ আনিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায়ই সূর্য্যবংশাবতংস ভগীরথের হিমালয়ের নিরালয় প্রদেশস্থিতা পূত-সলিলা সুরধুনী আনয়ন করিবার ন্যায় দুরবগাহ্য সংস্কৃত সাহিত্যের নির্জ্জন প্রদেশ হইতে বঙ্গভাষা আনয়ন করিয়া সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন; সুরধুনী বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম হইতে বিনির্গত, বঙ্গীয় সাহিত্যও সেই বিষ্ণুর প্রিয় সেবক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে সমুদ্ভূত; সুরধুনী মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া অন্যান্য সুধীর সহিত সম্মিলিত হই-

বার পূর্ব্বে কেবল বিষ্ণুরই পাদ-বিনির্গত স্বেদজল বক্ষে ধারণ করিয়া উৎফুল্লা হইয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্যও সেইরূপ অন্যান্য স্রোতের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে কেবল বিষ্ণুভক্তগণের ভক্তির উচ্ছ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিবৃন্দ বঙ্গভাষার মহান্ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারাই ইহার জন্মদাতা—তাঁহাদের যত্নবারি সিঞ্চনেই ইহার শৈশবোন্নতি এবং তাঁহারাই ইহার প্রথম যৌবনের সহায়; আমরা এক্ষণে ভাষার এতাদৃশ উপকারক কবিবৃন্দের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিবৃন্দের কথা উঠিলেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম অগ্রে আমাদের মনে সমুদিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যকলাপ ও জীবন বৃত্তান্ত এতাদৃশ সমালোচিত হইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম অবগত নহেন এমন কোন বাঙ্গালি আছেন কি? নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলাম না; তবে এই মাত্র বলি বঙ্গীয় কাব্যকাননে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ন্যায় মধুর কলকণ্ঠ সুদুর্ল্লভ; তাঁহাদের তুলনাস্থল কেবল বঙ্গ-সাহিত্যে কেন, অনেক সাহিত্যেই নাই। তাঁহারা একটি ভাষা সৃষ্টি করিয়াই তাহাতে যেরূপ স্বভাবের চিত্র আঁকিয়াছেন, এমন আর কোন সাহিত্যে কোন প্রথম কবিই অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের রচনা যেন স্বভাবের নিষ্কলঙ্ক কোমল কর হইতে আপনা হইতেই নিঃসৃত,—যেন তাহাতে কি মধুরিমা—কি মাদকতা আছে, তাহা অন্যের রচনায় নাই; যাহা দেখিলেই নয়ন মন ভুলিয়া যায়; দেহ প্রাণ সুশীতল হয়, আর হৃদয়ে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয়, তাহা আর বলিতে পারা যায় না।

যখন বিদ্যাপতির

"সখি কি পুছসি মোয়।
সোই পিরীতি, অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম, রূপ নেহারনু,
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুননু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন, রসে অনুমগন,
অনুভব কাহে না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে,
লাখে না মিলল এক॥"

কিংবা চণ্ডীদাসের

"রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহরও কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে,

যেমত যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী, খুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠ করি, ময়ুর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে ॥"

ইত্যাদি পাঠ করি, তখন মনে যে কি অপূর্ব্ব-ভাবের উদয় হয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব? ইহাঁদের গাঁথনীতে পারিপাট্য কিছুই নাই, কৌশল নাই—কষ্ট কল্পনার লেশ মাত্র নাই, সমুদায়ই যেন কৌশলবিহীন শিশুর অর্দ্ধাবরুদ্ধ মনোহর বাক্যবিন্যাস; তাহাতে কপটতা নাই—লুকোচুরি নাই,—সকলই সরল—সকলই সরস—সকলই মধুর।

বিদ্যাপতী ও চণ্ডীদাসের পর চৈতন্যচন্দ্র নবদ্বীপে উদিত হন। এই সময়ে ধর্ম্মের উৎসাহে মাতিয়া বঙ্গীয় কবিসম্প্রদায় দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে মধুর রস বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি দুই একজন মনস্বীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, চৈতন্যচন্দ্রের উদয়ের পর সেই মধুর রস সকলেরই উপর সমান রূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাধা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কোমলভাব সকলেরই অন্তরে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণ এক্ষণে সকলের কণ্ঠেই বিরাজ করিতে লাগিলেন—তাঁহাদের অপার্থিব প্রেমে সকলেরই চিত্ত বিগলিত হইল—সকলেই কৃষ্ণ প্রেম-রসে বিভোর হইলেন; সুতরাং এই সময়েই যে বঙ্গীয় কবিবৃন্দ সেই মধুর রসে আত্মবিহ্বল হইয়া যাইবেন তাহাতে আর বৈচিত্র কি? চৈতন্যচন্দ্রই সমাজে এই মধুর রস প্রবেশ করাইলেন; তিনিই নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে, 'পথিকে—গৃহস্থে রাজে কাঙ্গালে তাপসে' যেখানে যাহারে পাইয়াছেন তাহারই নিকট 'প্রেম ধর ধর লওরে' বলিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রেম শিক্ষা দিলেন। সেই শিক্ষা দান সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইল; সমাজ একবার সমুদায় ভুলিয়া প্রেমরসে—ভক্তিরসে নিমজ্জিত হইল। সুতরাং এই সময়েই যে প্রেমপূর্ণ—ভক্তিপূর্ণ পদাবলী সকল বিরচিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাই দেখিতে পাই গৌরাঙ্গ প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরই শত শত ভাবুক-প্রেমিক, সমাজে প্রেম সুধা বিতরণ করিতেছেন, শত শত কলকণ্ঠ নানাবিধ মধুরস্বরে নানা দিক হইতে প্রভাতীয় সঙ্গীত গাইতেছে, শত শত কবি দেশের নানা স্থান হইতে সুধাময় ঝঙ্কারে লোকের মনোমোহন করিতেছেন। চৈতন্যচন্দ্রের পরই আমরা বঙ্গীয় সমাজে কবির সমাজ দেখিতে পাই। এই সময় বঙ্গের কোন স্থানই প্রেমিক কবি বিরহিত ছিল না; যেখানে অনুসন্ধান করিবে সেই স্থানেই কোন না কোন কবি তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের লক্ষ্যস্থানীয় হইবেন।

আমরা এক্ষণে গৌরাঙ্গ অবতারের পরবর্ত্তী বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিবৃন্দের পদাবলী ও পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু

প্রত্যেক কবির সমুদায় পদাবলী প্রকাশ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমরা প্রত্যেক পরিচিত ও অপরিচিত কবির দুই একটি করিয়া পদাবলী উদ্ধৃত করিব ও দুই এক কথায় তাহাদের পরিচয় দিব; এবং পরে সময়মত তাঁহাদের সমুদায় পদাবলীই প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। এই স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; যে সকল কবি পদকর্ত্তা নহেন—অথচ কোন সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহাদের নামোল্লেখ মাত্র করিব—তাঁহাদের রচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিব না।

চৈতন্য চন্দ্রের সময়েই শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ বর্ত্তমান ছিলেন। রূপ ও সনাতন, মথুরা ও বৃন্দাবনের গুপ্ত তীর্থ সকল আবিষ্কার করেন। পূর্ব্বকালে মথুরা ও বৃন্দাবনের যথেষ্ট মাহাত্ম্য ছিল; কিন্তু মুসলমানাধিকারের সময় হইতে ঐ তীর্থদ্বয় যবন কর্ত্তৃক বিধ্বংসিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান ছিল। যৎকালে সুলতান্ মামুদ মথুরা আক্রমণ করেন তখন উহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও হিন্দুগণের প্রধান তীর্থ স্থান ছিল; কিন্তু মামুদ উহা আক্রমণ করিয়া উহার অনেক মন্দির ও দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংস করতঃ আপন উদর পরিপূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিবার পর হইতেই মথুরা ও বৃন্দাবন বনরূপে পরিণত হইয়াছিল। রূপ-সনাতন বহু কষ্টে সেই গুপ্ত তীর্থ সকল পুনরাবিষ্কৃত করিয়া তাহাদের মাহাত্ম্য পূর্ব্বের ন্যায় খ্যাপন করেন; তদবধি এই স্থান দ্বয় পুনরায় হিন্দু গণের প্রধান তীর্থ ক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই গোস্বামীগণ চৈতন্যের অতি প্রিয় লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা এবং তাঁহাদের সমকালীন অন্যান্য অনেক ব্যক্তিও ভক্তি রসাশ্রিত বহুবিধ কাব্য প্রণয়ন করেন; কিন্তু এই সময়ের অধিকাংশ গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত, সুতরাং সে সকলের এস্থলে উল্লেখ না করিয়া তাঁহাদের প্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থেরই উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী রিপুদমন বিষয়ে 'রাগময় কণ', সনাতন গোস্বামী 'রসময় কলিকা', ও জীব গোস্বামী 'করচাই', প্রণয়ন করেন। চৈতন্য দেবের অব্যবহিত পরেই বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবৎ', কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃত', ও লোচন দাস 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল' রচনা করেন। এসকল গ্রন্থ পদাবলী নহে; ইহাদের কোনটিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কার্য্য,—কোনটিতে তাহাদের প্রতি উপদেশ,—কোনটিতে চৈতন্য দেবের জীবন চরিত ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং আমরা এই প্রবন্ধে এসকল গ্রন্থ হইতে কোন কিছুই উদ্ধৃত করিলাম না। এক্ষণে আমরা চৈতন্য দেবের পরবর্ত্তী কোকিলকণ্ঠি পদ কর্ত্তৃগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি; ইহাঁদেরই সুধাময় পঞ্চম স্বরে এক সময় বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল—বঙ্গবাসী অনেক দিনের পর আরও একবার প্রাণ খুলিয়া ভক্তিপূর্ণ প্রেম-রসে অঙ্গ ভাসাইয়া দিতে পারিয়াছিল। যাঁহাদের পঞ্চম গা-

নের মনোমুগ্ধকর আলাপে প্রায় তাবৎ ব্রাহ্মণেতর বঙ্গীয় প্রাচীন উচ্চ বংশীয়ই বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই কলকণ্ঠি বিহঙ্গম গণের সঙ্গীত-প্রবাহের বিষয় এক্ষণে আলোচনা করা যাইতেছে। চৈতন্যচন্দ্রের তিরোধানের কিছু দিন পরেই নানা কবি জন্ম গ্রহণ করেন। এই সকল মধ্যে প্রথম গোবিন্দ দাস; যদিও গোবিন্দ দাসের পূর্ব্বে দুই চারিজন কবি বর্ত্তমান ছিলেন, তত্রাপি গুণগরীমায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে হইলে আমরা গোবিন্দ দাসকেই প্রথম আসন দিতে পারি। অন্যান্য অনেক কবিই ইহাঁর পরবর্ত্তী। গোবিন্দের পর রায় শেখর, রায় বসন্ত, নরহরি দাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, জ্ঞান দাস, বৈষ্ণব দাস যদুনন্দন, রামানন্দ বসু, প্রেম দাস, বাসুদেব ঘোষ, বাসুদেব দাস, প্রসাদ দাস, ভীম দাস, কৃষ্ণ দাস, রসময় দাস, বংশী দাস, পীতাম্বর দাস, গোপাল দাস, বল্লভ দাস, সুখময় দাস, লোচন দাস, প্রভৃতি শত শত কবি জন্ম গ্রহণ করেন; আমরা এক্ষণে ইহাঁদেরই বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা এই স্থানে যে কৃষ্ণ দাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি ইনি কৃষ্ণ দাস কবিরাজ নহেন; ইনি রূপ গোস্বামী প্রণীত রিপুদমন বিষয়ে 'রাগময় কণ' সংক্ষিপ্ত করেন; এবং রসময় দাস, জয়দেব গোস্বামী প্রণীত 'গীত গোবিন্দের' বাঙ্গালা সরল পদ্যে অনুবাদ করেন, সুতরাং ইহাঁদের কথা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিব না।

গোবিন্দ দাস। এই কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দ দাসই সর্ব্ব প্রধান; গোবিন্দ দাস আনুমানিক ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ চৈতন্য দেবের তিরোধানের প্রায় পঞ্চ ত্রিংশৎ বৎসর পরে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বুধুরি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। গোবিন্দ দাসপ্রণীত পদাবলীর নাম 'পদমালা'; তিনি ইহাতে বহু সংখ্যক পদ প্রণয়ন করিয়াছেন। কবিত্ব-শক্তি-বিষয়ে গোবিন্দ দাস নিতান্ত সামান্য ছিলেন না; তবে তিনি স্বভাব-কবিদ্বয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডী দাসের নিকট তিষ্ঠিতে পারেন না; তাঁহার রচনার—কেবল তাঁহার কেন, এই সময়ের প্রায় তাবৎ কবিরই রচনার—একটি প্রধান দোষ এই যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস যেমন অন্তরের অন্তস্তল হইতে অন্তঃপ্রকৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন ইহাঁরা তাহা পারেন নাই। ইহাঁদের সকলই যেন বহিঃপ্রকৃতির বিষয়ীভূত; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রেম বর্ণনায় যেন ঐশী প্রেম উক্ত হইয়াছে, আর গোবিন্দ দাস প্রভৃতির প্রেম বর্ণনা যেন মানুষী প্রেম; তাহাতে গভীরতা নাই;—প্রেম যেন মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, উপর লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহা হউক গোবিন্দ দাস যে একজন প্রকৃত কবিত্ব শক্তি-সম্পন্ন লোক ছিলেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; এই স্থলে আমরা গোবিন্দ দাস প্রণীত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণী,
অবনী বহিয়া যায়।

ঈষৎ হাসির, তরঙ্গ হিলোলে,
মদন মূরছা পায়॥
কিবা সে নাগর, কি খনে দেখিনু,
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর, চিত বেয়াকুল,
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে, বিষম বিশিখে,
পরাণ বিঁধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের, মালাটি গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া, মাতল ভ্রমরা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা,
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাধল,
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন, নারীর পরাণ,
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি, হয় পরিণাম,
দাস গোবিন্দ কয়॥

রায়শেখর। ইহঁার প্রকৃত নাম শশিশেখর রায়; ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শশিশেখর নিত্যানন্দবংশসমুদ্ভূত ও গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী লোক; ইনি অনেক পদাবলী রচনা করিয়াছেন; সে গুলি সামান্য প্রীতিকর নহে। ইহঁার রচিত কোন কোন পদ গোবিন্দদাসের রচনা হইতেও উৎকৃষ্টতর। আমরা এই স্থানে তাঁহার প্রণীত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম; পাঠক! ইহাতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। কবি রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন;—

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী যোর
দোঁহার রূপের নাহিক উপমা,
প্রেমের নাহিক ওর॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর মুকুট,
আধ শিরে দোলে বেণী।
শিরীষ কুসুম ঝলমল করে,
ফণী যেন উগারল মণি॥
একই শ্রবণে মকর কুণ্ডল,
একই রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয়,
আধ কপালে রবি॥
আধ পহিরণ হিরণ কিরণ,
আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ গলে বনমালা বিরাজিত,
আধ গলে গজমোতি॥
সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন,
তরু লতা দোলে মন্দবায়।
নিকুঞ্জ মন্দিরে রসের সায়র,
বাহিরে শেখর রায়।

রায় বসন্ত। ইনি রায়বসন্ত বলিয়া অভিহিত হইলেও ইহঁার প্রকৃত নাম বসন্তকুমার রায়। অনেকে রায়বসন্ত ও বিদ্যাপতিকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন; তাঁহাদের মতে বিদ্যাপতিরই প্রকৃত নাম বসন্ত রায়, "বিদ্যাপতি" ও "কবিরঞ্জন" তাঁহার উপাধি মাত্র, ও ইহার বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত ভুর্ষটুর গ্রাম ছিল।

প্রমাণীকৃত হইয়াছে বিদ্যাপতির বাসস্থান কখনও যশোহর জেলায় ছিল না ও তাঁহার নামও বসন্তরায় থাকে নাই। বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত রচনার সহিত রায়বসন্ত ভণিতাযুক্ত পদের এত প্রভেদ যে, তাহা কখনই এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনেও করা যাইতে পারে না। রায়বসন্ত-ভণিতাযুক্ত গীত বিদ্যাপতির লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে বলিতে গেলে কার্য্যতঃ বিদ্যাপতিরই অবমাননা করা হয়; তবে রায়বসন্ত যে প্রাচীন কবি ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; তিনি যে গোবিন্দ দাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা গোবিন্দ দাস প্রণীত "রায় বসন্ত মধুপ আনন্দিত, নিন্দিত দাস গোবিন্দ" ইত্যাদি দুই একটি পদে অবগত হওয়া যায়। গোবিন্দদাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাপতি, রায় বসন্ত প্রভৃতি কবির কোন কোন কবিতা সংস্করণ করিয়া তাহাতে আপনার নামও সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। অনেকে বিদ্যাপতি ও রায় বসন্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিদ্যাপতির বাসস্থান যশোহর জেলায় ছিল প্রতিপন্ন করিয়াছেন; আমরা তাহাই রায়বসন্তের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করি। রায় বসন্তই যশোহর জেলার অন্তর্গত ভুর্ষটুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, বিদ্যাপতি নহে। যাহাহউক রায় বসন্ত একজন বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন কবি ছিলেন না; তাঁহার রচনার বিশেষ কিছুই পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তত্রাপি তাঁহার দুই একটি গীতি নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু তাঁহাকে আমরা যখন বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের সময়ের মধ্যে পাইতেছি, তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর তৃতীয় কবি বলিয়া তাঁহার এই দোষ পরিহার করিতে পারি। যাহাহউক আমরা এইস্থানে রায়বসন্ত প্রণীত একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

ওহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ পুতলি তুমি, জীবনের সখি॥
অঙ্গ আভরণ তুমি, শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন॥
নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।
রায় বসন্ত কহে পঁহু প্রেম রাশি॥

জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস একজন অতি পরিচিত প্রাচীন কবি; ইনি গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী লোক; ইহাঁর রচিত বহু সংখ্যক সুমধুর পদাবলী নানাস্থানে প্রচলিত আছে। প্রায় তৎ সকল গুলিই সুন্দর ও সুচিক্কণ। তিনি সামান্য কবি ছিলেন না; তাঁহার রচিত গীত গুলি অতিশয় প্রীতিপ্রদ ও মনোহর। আমরা এই স্থলে জ্ঞানদাসের একটি সর্ব্বত্র পরিচিত পদ উদ্ধৃত করিলাম—

সুখের লাগিয়া, এঘর বান্ধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি রে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,

পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাঁইতে, দারিদ্র্য বাঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কয়, কিসের লাগিয়া,
পাছে কর অনুতাপে॥

বাসুদেব ঘোষ। ইনি কবি-সমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহেন; তবে তাঁহার প্রণীত পদ অনেক নাই। তত্রাপি তিনি নিতান্তই অল্পসংখ্যক কবিতা রচনা করেন নাই; এবং এ সকলের স্থানে স্থানেও বেশ কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে। আমরা এই স্থানে বাসুদেব প্রণীত একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম;—

নিরমল গোরা তনু, কষিত কাঞ্চন জনু,
হেরইতে পড়ি গেল ভোর।
বাহু ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মনে,
অন্তর কাপয়ে মোর॥
সজনি! যব হাম পেখনু গোরা।
আকুল দিক বিদিক, নাহি পাইয়ে,
মদন লালসে মন ভোরা॥
অরুণিত নয়নে, তেরহ লোকনে,
বরিখে কুসুম শর সাধে।
জীবইতে জীবন, অহি নাহি পায়ল,
ডুবল অঙ্গ অগাধে॥
মন্ত্র মহৌষধি, উঁহু জানসি যদি,
মঝুলাগি করহি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে, শুন শুন এ সখি,
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

প্রসাদ দাস। প্রসাদ দাসের ভণিতা-যুক্ত কতকগুলি গীত দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলি মন্দ নহে; তাহাতে স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে। আমরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যতই কবিতা দেখিতেছি, প্রায় তৎসকলই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অনুকরণে রচিত, কিন্তু অনুকরণ হইলেও তাহা শ্রীহীন নহে। বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন, সুতরাং সকল কবিরই রচনা প্রায় এক প্রকার। প্রাচীন কবি মাত্রেই প্রায় পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা উপরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, এবং জ্ঞানদাস ও বাসুদেব ঘোষের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি; এক্ষণে প্রসাদ দাস হইতেও একটি পূর্ব্বরাগ বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক এ সকলের পার্থক্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন;—

জলদ বিলোকনে, চপল পবাণ।
ঢল ঢল লোচন, মলিন বয়ান॥
শিখিকুল নিরখি, বিকুলী-চিত দূর।
না জানি কতহুঁ, মনোরথ পুর॥
মোহন কুসুম, শয়ন পরিহারি।
অঞ্চলে ধরণি, শুতই বরনারী॥
নিশ যই সঘনে, সকল নিশি ভোর।
আদরে নীল, বসন ধরি কোর॥
অনিমিখে ঘন ঘন, কানন হেরি।
বিলসই কতহুঁ, পুলক বেরি বেরি॥
ক্ষণে মন্দিরে, ক্ষণে থারই পন্থ।
ঐ ছনে করু ধনি, নিতি নিশি অন্ত॥
কোজানে কৈছনে, লালস জাগ।
না জান প্ররসাদ, সরম কি রাগ॥

ভীমদাস। ভীমদাস একজন বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের কবি ; কিন্তু তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না; তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। পদ-রচয়িতা গোবিন্দ দাস বৈদ্যবংশীয় এবং রামানন্দ বসু ও বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি পদ-কর্ত্তৃগণ কায়স্থ ছিলেন। যাহা হউক ভীমদাসের ভণিতা-যুক্ত গীত পদকল্পলতিকায় কতক গুলি দেখিতে পাওয়া যায় ; আমরা এই স্থলে তাঁহার প্রণীত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম ;—

কিরূপ দেখিনু, মধুর মুরতি,
পীরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে,
তুলনা নাহিক যার ॥
বড়ি বিনোদিয়া, চূড়ার টাননি,
কপালে চন্দন চাঁদ।
যিনি বিধুবর, বদন সুন্দর,
ভুবন মোহন ফাঁদ ॥
নব জলধর, রসে ঢর ঢর,
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন,
মণি মুকুতার মালা ॥
জোড় ভুরু যেন, কামের কামান,
কেনে কৈল নিরমাণ।
তরুণ নয়নে, তেরন চাহনি,
বিষম কুসুমবাণ ॥
সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী,
হাসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজভীমে কয় ওরূপ নাগর,
দেখি কি পরাণ রয় ॥

সুখময় দাস। আমরা উপরে যে সকল কবির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা অনেকের পরিচিত হইলেও আমরা এক্ষণে যাঁহাদের বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাঁরা সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। আমরা এই প্রাচীন অপরিচিত কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছি এবং হস্ত-লিখিত পুঁথি হইতেই তাঁহাদের এক একটি গীত উদ্ধৃত করিব। সুখময় দাস একজন যথার্থ কবিত্ব-গুণ-সম্পন্ন কবি ছিলেন ; তাঁহার যে কবিতা পাঠ করিয়াছি তাহাতেই আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি ; এক্ষণে তাঁহার রচিত একটি পদ যথেচ্ছায় উদ্ধৃত হইতেছে। সুখময় দাস রাধাকৃষ্ণের রূপের তুলনা এই রূপে করিতেছেন ;—

কেদার।

দেখ সই দুহাঁর তুলনা দিতে নাই।
রসের সায়র মাঝে, দুচান্দ উদয় করে,
পিরীতি করিয়া এক ঠাঁই ॥
রাই মোর সোণার চাঁদ, নাগর কালিয়া চাঁদ,
দেখিতে সুন্দর বড় শোভা।
ও চাঁদ কলঙ্ক সুধা, এ চকোর মাতিয়া যায়,
এ চান্দেতে জগজন লোভা ॥
অঙ্গে অঙ্গে কত সুধা, চুয়ায়ে পড়েছে গো,
দেখ দেখ অপরূপ রঙ্গ।
ভুবন ভুলাইতে, রূপে গুণে এক ঠাঁই,
ও যোর হয়েছে দুহাঁর অঙ্গ ॥
তড়িত লতায় যেন, জড়িত হয়েছে ঘন,
কিয়ে বা তমালে হেম লতা।
যেনই অতসীফুলে, নানা রতন দিয়া গো,
কনক চম্পক গেল গাঁথা ॥
দেখ সই দুহুঁ রূপ কেনা নিরমাল্য।

পিরীতি সুধায়ে পুরি, রসের লাবণ্য দিয়া,
ছটায় করেছে কুঞ্জ আল॥
তাহে আর অপরূপ, রাই বদন মাঝে,
ভ্রমর ভাঙ্গুরি দিয়া যায়।
নয়ান নাচনি দেখি, খঞ্জনী রয়েছে ভুলি,
চকোরী অমিঞা লোভে ধায়॥
সিন্দুর অরুণ দেখি, কুবলয় হয়েছে সুখী,
লাজে চাঁদ লয়েছে শরণ।
সুখময় দাস কহে, তুলনা দিবার নহে,
দুহাঁর তুলনা দুইজন॥

হস্তলিখিত পুঁথি।

কিঙ্কর দাস। কিঙ্কর দাস একজন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কবি; তিনিও নিতান্ত অবহেলিত হইবার লোক ছিলেন না। আমরা এই স্থানে কিঙ্করদাস-বিরচিত একটি পদ প্রদান করিলাম; ইহাতেই পাঠক তাঁহার ক্ষমতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক, আমরা হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই সকল অপরিচিত কবির রচনা যদিচ্ছায় উদ্ধৃত করিতেছি; ভাল মন্দ অনুসন্ধান করিবার অবসর আমাদের নাই।

এস এস প্রেমময়ী দেখি গো নয়নে।
তিলে কত যুগ বাসি তোমার বিহনে॥
তোমার লাগিয়া রাধা গোলোক তেজিয়া।
রাখিহ আমারে ধনি আপন করিয়া॥
আমার পরাণ রাধা জানিহ নিশ্চয়।
তুয়া প্রেম লোভে আমি হয়েছি বিক্রয়॥
রসবতী রাধা বলে শুন নাগর শ্যাম।
তুয়া প্রেম গুণে আমার প্রেমময়ী নাম॥
তুমি সে আমার শ্যাম এরূপ যৌবন।
ক্ষিরোদে পেয়েছি বহু করিয়ে সাধন॥
দুহাঁর পিরীতি রসে দুহুঁ ভেল ভোর।
কত রস জানে দুঁহে না জানে বেওর॥
নিধুবনে রাধা শ্যাম হইল মিলন।
দাস কিঙ্কর তায় হরিল চেতন॥

রামচন্দ্র দাস। রামচন্দ্র দাস আর একজন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কবি। ইনি বিখ্যাত পদ-রচয়িতা গোবিন্দদাসের সহোদর। রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস উভয়েই পূর্ব্বে তন্ত্রোপাসক ছিলেন, পরে রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন-কালীন শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই আচার্য্য প্রভুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রাপ্তে তিনি সেই স্থলেই সস্ত্রীক বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি বৈষ্ণব। রামচন্দ্র কবিত্বশক্তিবিহীন ছিলেন না। যদিও তাঁহার রচিত অধিক সংখ্যক পদ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি যাহা পাওয়া যায় সেগুলি সামান্য প্রীতিকর নহে। আমরা এই স্থলে তাঁহার রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম। কবি রাধিকার পূর্ব্বরাগ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

অনুক্ষণ কানুর ভাবনা মনে।
শ্রীঅঙ্গ সঙ্গম, বিরলে চিন্তই,
মরম সখির সনে॥
অসিত বসন, পরয়ে কখন,
করে কুবলয় দাম।
মণি মরকত, মালায় সজ্জিত,
জপয়ে শ্যামের নাম॥
কখন সজল, নয়ানে কাজর,
কালা সে মুরতি লেখে।

সিন্দুরে কাজরে, আঁখি নিরমায়ে,
তাহে রূপখানি দেখে ॥
কদম্বতলায়, বিনোদ নাগর,
তাহে মন রহল বাঁধা।
মনমথ শরে, অন্তর জর জর,
গুমরি কাঁদয়ে রাধা ॥
কানুর পিরীতি, ঐছন নিতি নিতি
অবলা কতেক সহে।
রামচন্দ্র কহে, এমতি হইলে,
তার কি পরাণ রহে ॥

রামানন্দ। রামানন্দ বসু বৈষ্ণব না থাকিলেও একজন প্রধান বিষ্ণুভক্ত কায়স্থ ছিলেন। বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীনগ্রাম ইহাঁর বাসস্থান ছিল। ইহাঁর বংশধরগণ এক্ষণেও পরম বিষ্ণুসেবক হইয়া বৰ্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে বসবাস করিতেছেন। রামানন্দ বসু চৈতন্য দেবের সমকালীন লোক। ইঁহার সহিত চৈতন্য দেবের প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী এখনও এ প্রদেশে প্রচলিত আছে। যাহা হউক ইনি কবিত্বে ততদূর শ্রেষ্ঠ না থাকিলেও ইঁহার রচনা যে একজন প্রধান ভক্তের লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বেশ প্রতীয়মান হয়। আমরা এই স্থলে রামানন্দ প্রণীত একটি গীত উদ্ধৃত করিলাম ;—

চরণে চরণ দিয়া, তরুতলে দাঁড়াইয়া,
মৃদু হাসি তেরছা নয়নে।
অঙ্গুলি দোলাইয়া শ্যাম, কি জানি কি দেখাইল।
সেই কথা পড়িয়া গেল মনে ॥
মলাম মলাম শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর, মুরতি নব কৈশোর,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥
জিতেকি পাসরিতে নারি, বলনা কি বুদ্ধি করি,
শ্যাম-শেল সাভায়ে রৈল বুকে।
বারি হয়ে নাহি যায়, টানিলে সে নাবেরয়,
অন্তরে জ্বলিছে ধিকে ধিকে ॥
বসুরামানন্দের বাণী, রাত্রি দিবা নাহি জানি
গুপতে গুমরি মরি।
কিছু নাহি সয় গায়, কেবা পরতীত যায়,
তিলে প্রাণ তিন ঠাঁই করি ॥

যদুনাথ দাস। যদুনাথ দাসের রচনা পাঠ করিলে তাঁহাকে বিশেষ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন কবি বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে কবিত্ব নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে। আমরা এই স্থলে তাঁহার রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম ;—

অহে কানাই বুঝিনু তোর চরিত।
যত জীয়ে তত দেখি বিপরীত ॥
সুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু ইন্দুমুখ শোভা।
রঙ্গিম অধরে কিবা কাজরের আভা ॥
আর না কহিও মধু সুচাতুরী কথা।
নারী হইলে অহে বঁধু আর কি করিতা ॥
এমন বেশে কেমনে আইলা ব্রজমাঝ।
ভুবনে শুন নাই যারে বলি লাজ ॥
তনু পরশহ বিনু যমুনা সিনানে।
যদু নাথ দাস হাসেন মনে মনে ॥

দুর্ল্লভ দাস। কবি দুর্ল্লভ একজন বৈষ্ণব কবি। ইহাঁর রচিত দুই চারিটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ল্লভ অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়

কবি ছিলেন। পূর্ব্বতন কবিমাত্রেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুকরণ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু কবি দুর্লভ যেমন বিদ্যাপতির দুই একটি পদ অবিকল উদ্ধৃত ও সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আপনার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এমন আর কোন কবি করেন নাই। আমরা দুর্লভদাস হইতে এই স্থলে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা এইরূপ কবিতা। দুর্লভ, বিদ্যাপতি হইতে এই গীতটি অবিকল নকল করিয়া লইয়াছেন। আমরা বিদ্যাপতিরচিত এই গীতটি যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে দুর্লভের অনুকৃত পদটি প্রদান করিলাম ;—

অনুভব কথই না হোয়।
সই পিরীতি, অনুরাগ বাখানিয়ে,
অনুক্ষণ নৌতন তোয়॥
জনম অবধি ভরি, রূপ নেহারনু,
নয়ান না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে মুখে মুখ,
হৃদয়ে জুড়াই না গেল॥
বচন অমিঞা রস, অনুদিন শুননু,
শ্রুতিপথে পরশ না ভেল।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়ায়িনু,
না বুঝিনু কৈছন কেল॥
কত বিদ্যা ধন জন, রসে অনুমোদন,
অনুভব কথিহ না দেখ।
কবি দুর্লভ কহে, অতএব দুঃখ রহে,
লাখে না মিলয়ে এক॥

রাধাবল্লভ দাস। রাধাবল্লভ আর একজন অপরিচিত বৈষ্ণব কবি। ইঁহার রচনা অধিক দেখিতে পাইলাম না ; এবং যেগুলি পাইয়াছি সেগুলিও বেশ প্রীতিকর নহে। তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা নিতান্ত মন্দ নহে। আমরা এইস্থানে ইহাঁর রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম ;

খেলত দোঁহতরঙ্গে।
ফণি উগারয়ে মণি, খেলত ঐছন,
বিনোদিনী সঙ্গে॥
নীলমণি জিনি, শ্যামসুন্দর,
মনমথ নয়ান চকোর।
চন্দ্র পাঁতি ভাতি, জিনি সুন্দর,
রাইকো বদন উজোর॥
নব নব বৃন্দাবন, কুসুমিত কানন,
নব নব বয়ান কি বোল।
কোকিল ভ্রমর নব, গৌরবরণ ভেল,
প্রেমরসে কুহুকুহু বোল॥
উনমত দুঁহুজন, প্রেমের বাজনু ঘন,
বেশ বসন গেও দূর।
শ্রমে কুম্‌কুম ভাসে, গায় রাধাবল্লভদাসে,
বাজত কনক নূপুর॥ *

মুরারিগুপ্ত। মুরারি গুপ্ত বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, কিন্তু বাসুদেব ঘোষ বা রামানন্দ বসু যেরূপ কায়স্থ হইয়াও বৈষ্ণব ছিলেন, ইনিও সেইরূপ। ইহার রচিত অধিক গীতি আমরা হস্তলিখিত পুঁথিতে পাই নাই ; আমরা তাহার একটিপদ উদ্ধৃত করিলাম ;—

মরম সই ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,

---

* ইহার শেষাংশটি অতিশয় অশ্লীলতা দুষ্ট।

তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ান পুতলি করি, নিয়াছি শ্যামের রূপ,
হিয়ার মাঝারে থুয়ে প্রাণ।
পিরীতি আগুনি জ্বালি, এতনু পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না বুঝিয়া মূঢ়লোকে, কেবা কেনা বলে মোকে,
না শুনিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথা জলে, এতনু ভাসাইয়াছি,
কি করিবে কুলের কুঃকুরে ॥
রজনী দিবস চিতে, জাগিতে ঘুমাইতে,
মোর মনে আন নাহি ভায়।
শ্রীমুবারি গুপতি বলে, এমনি পিরীতি হলে,
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

দম্পতীনাথ। অনেকে বলিয়া থাকেন, বিদ্যাপতি ও দম্পতীনাথ অভিন্ন ব্যক্তি। আমরা এসম্বন্ধে কোন কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিনা, তবে এই মাত্র বলি রায় বসন্ত ও বিদ্যাপতির রচনায় যত পার্থক্য আছে, দম্পতীনাথ ও বিদ্যাপতির রচনায় তত অধিক পার্থক্য নাই; এই উভয় ভণিতাযুক্ত কবিতাই বেশ মনোহর ও প্রীতিকর, সরস ও সুন্দর ও প্রায় একই ধরণের। আমরা এই স্থানে দম্পতীনাথ-ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। কবি শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মান এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

মাধব দুর্জ্জয় মান মানি।
বিপরীত চরিত, পেখি চকিত ভেল,
না ফুরল আধ আধ বাণী ॥
তুয়া নাম গুণ, আথর নাহি শুনত,
তুয়া রূপ রিপুকরি মানি ॥
তুয়া নিজ জন সঙ্গে, সম্ভাষণ না করই,
কৈছে মিলায়ব আনি ॥
নীল বসন বর, কাঁচ কবরী ভার,
পৌতিক মাল উতারি।
করি বস চোরি, মোতিগহর পহিরনি,
উজ্জল মনোহর সারি ॥
অসিত চিত্রক পর, উরুপর আছিল,
ঝাপল মন জনে পাই।
মৃগমদ তিলক, ধোই যুগ অঞ্জন,
কুচযুগে মলয় লেপই ॥
জলধর পেখি, চন্দ্রাতপ টানাওলি,
শাঙরি সখি দূরপাস।
তমাল তরুগণে, চুন লেপাওলি,
শুক পিক দূর নিরাস ॥
এক তিল ছিল, চারু চিবুক পর,
নিন্দি মধুপ সুত শ্যাম।
তৃণ অগ্রে করি, মলয়জ বঞ্চক,
তাহে লেপাওলি বাম ॥
তুয়া গুণ বোলত, এক শুক পণ্ডিত,
তম ভরে উঠনি রোসাই।
পিঞ্জর ঝটিতি, পটক পর পটকিত,
ধাই ধবল হাম জাই ॥
মধুকর ডরে ধনি, চম্পক তরুতলে,
লোচনে জলভরি পুর।
শ্যাম চিকুর হেরি, দরপ ঝপট,
টুটিতে ভৈল সত চুর ॥
কা বলিমু বলিতে, ওর না পাওল,
শ্রবণ মুদমু দুহুঁপাণি।
ঐছন গাঢ়, মান ধরি সুন্দরী,
কৈছে মিলায়ব আনি ॥

মেরু সমান মান, কোণেতে হেরিয়া,
তৈভঁগেণু রেণু সমান।
দম্পতীনাথ কহে, রাই অব আনব,
আপ সিধারও কান॥ (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণা

বা

কলিকাতা শতাব্দী পূর্ব্বে।

(৬০ পৃষ্ঠার পর।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রশেখর দুগ্ধ ও ফলমূলাদি আহার করিয়া অতি মূল্যবান পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু সুরম্য সুসজ্জিত বৃক্ষ-বাটিকা বা দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যাই সুনিদ্রার উপাদান বা আশ্রয়স্থান নহে। চন্দ্রশেখরের মন অসুস্থ, সুতরাং নানারূপ দুঃখ চিন্তায় নিরন্তর পীড়িত। নিদ্রা আসিল না; মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা আসিয়া নানারূপ দুঃস্বপ্ন দেখাইয়া তাঁহার উপস্থিত অসুখকর অবস্থা শতগুণ ক্লেশকর করিয়া তুলিল। অসুখী জনের পক্ষে অতি নির্ম্মল সুখদ যামিনীও কি বিষময় সময়! ক্রমশঃ দুর্ভার যামিনী যখন গভীরতর হইতে লাগিল, যখন দুঃখময়ী চিন্তা ক্রমশঃ হৃদয়-সাগর উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, তখন দূর হইতে অতি সুললিত রমণী-কণ্ঠ-ধ্বনি আসিয়া তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়ে কিয়ৎকালের জন্য শান্তি-তৈল নিক্ষেপ করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্বীয় অবস্থা বিস্মৃত হইয়া স্থির কর্ণে সেই স্বর্গীয় স্বর-মাধুরী পান করিতে লাগিলেন;—নব-প্রেমাশ্রিত নবীন হৃদয়ের সুতন্ত্রী বাজিয়া উঠিল—"হা কৃষ্ণে! হা প্রিয়তমে!"—ক্রমশঃ শত ক্রোশ বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইল, কাল-ভেদ অন্তরিত হইল, কৃষ্ণা সম্মুখবর্ত্তিনী!—সেই রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, সেই মনোহর কবরী-বন্ধন, সেই মৃণাল-লাঞ্ছিত সরল ভুজলতা, সেই সোহাগ-সুগঠিত, সুলজ্জা-সুরঞ্জিত সুদৃশ্য নয়ন-পলাশ, সেই কুসুম-হৃদয় নিঃসৃত মধুময় বিশ্বাস-বায়ু, সেই সুমন্দ জলধি-কল্লোল-নিন্দিত সুমিষ্ট কণ্ঠ-ধ্বনি একে একে সমগ্র অনুভূত হইতে লাগিল, চন্দ্রশেখর কল্পনার সত্য-ভ্রমে কহিলেন "কৃষ্ণে"!

"আমার অন্তর যদি দেখাবার হ'ত
বিদরিয়া দেখাতাম ভালবাসি কত"—

সহসা সেই দূর-বাহিত কণ্ঠধ্বনি স্তব্ধ হইল, চন্দ্রশেখরের মোহের অপনয়ন ও নিজ অবস্থার উপলব্ধি হইল। ক্রমশঃ স্থান

ও কালভেদ বিচ্ছেদ নামে পরিচয় দিলে, পুনরপি কহিলেন "হা কৃষ্ণে! হা প্রিয়তমে"—

চন্দ্রশেখরের প্রথম ক্লেশময়ী রজনী অতিবাহিত হইল। বেলা তিন দণ্ড অতীত। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুইজন প্রহরী যথাবিহিত প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাদিগকে কোন কথা না কহিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উৎসুক নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন তাঁহার নব আবাস চারিদিক্ উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত একটি সুরম্য বৃক্ষবাটিকা। প্রাচীরের নিম্নে মণ্ডলাকারে একটি শাখা নদীর ন্যায় ক্ষুদ্র ঝিল এই বৃক্ষ-বাটিকাকে বেষ্টন করিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে সেতু ও স্থানে স্থানে সুন্দর কুঞ্জ ও লতা বিতান;— তথায় নানা বর্ণের পক্ষী ও পশু সকল ক্রীড়া করিতেছে। তিনি পূর্ব্বে এরূপ রমণীয় স্থান কখন দর্শন করেন নাই, সুতরাং অনিমেষ লোচনে দর্শন করিয়া অর্থের মহিমা ও গরিমা দুই এককালে উপলব্ধি ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা ইন্দ্রিয়-সুভোগ্য ও পরিতোষক তাহাই অর্থের সাপেক্ষ। পৃথিবীতে না হউক সমাজে অর্থই যে এক মাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তাহা তাঁহার দুরবস্থা প্রথমেই শিক্ষা দিয়াছিল, অদ্য সেই শিক্ষা পরিস্ফুট হইল। অর্থের গরিমা আছে, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। অগ্নি না থাকিলে অন্ধকার দূর হয় না, অর্থ না থাকিলে দুরবস্থা দূরীকৃত হয় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি সত্ত্বে উহা প্রতি দিন সেব্য, অর্থেরও গরিমা সত্ত্বে উহা প্রতি দিন আরাধ্য। তিনি এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রহরীদ্বয় তাঁহার স্নান ও আহারাদির বিষয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন নিকটস্থ ঝিলে স্নান ও অন্ন আপনি পাক করিয়া খাইবেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে চলিল।

এইরূপ ভাবে প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে চলিল, তথাপি রাজকুমার তাঁহার মুক্তির জন্য আজ্ঞা দিলেন না। তিনি অতি কাতর ভাবে প্রহরিদ্বয়কে রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে, একজন কহিল "তিনি মৃগয়ায় গিয়াছেন, সুতরাং যতদিন না ফিরিয়া আইসেন ততদিন তাঁহাকে এই মত থাকিতে হইবে"। তিনি হতাশ হইয়া অধোমুখে অশ্রু জল ফেলিতে লাগিলেন।

এক দিবস আহারাদি করিয়া চন্দ্রশেখর বিশ্রাম করিতেছেন, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, তাঁহার সম্মুখস্থ এক লতাবিতানে গৈরিক বসনাবৃতা ভস্মবিভূষিতা জটাজূটধারিণী পাশুপত-ব্রত-চারিণী তুষার-নিন্দিত-বর্ণা অতীব মনোহরা এক রমণী একটি মৃগশিশু ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। চন্দ্রশেখর দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। রমণী তালনয়-বিশুদ্ধ মধুর স্বরে গীত আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রশেখর প্রথম রাত্রে যে স্বরশ্রবণে কিয়ৎকাল মোহাবৃত হইয়াছিলেন, এই

ক্ষণে জানিলেন সেই জনই গাহিতেছেন; দূর হইতে শব্দার্থ কিছু বুঝিতে পারিলেন না; তৃষিত চাতকের অদৃষ্টে সুধাবারির ন্যায় তিনি সেই স্বর পান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রহরীদিগকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কোন কথা কহিল না, তিনি তাঁহার নিকটে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কেহই বাধা দিল না। তিনি নামিয়া লতাবিতানাভিমুখে চলিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি সেই স্থানে নাই, চারিদিক্ অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাইলেন না। আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিবস গেল। পর দিবস অপরাহ্ণ সময়ে সেই রমণী সেই লতা বিতানে আসিয়া সেইরূপ গীত আরম্ভ করিলে, চন্দ্রশেখর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে চলিলেন; লতা বিতানের নিকটবর্ত্তী হইলে গীত সমাপ্ত বা নিস্তব্ধ হইল। তিনি ভৈরবী ভ্রমে প্রণাম করিলেন, তিনি ঈষৎ প্রহাস্য বদনে কহিলেন "চন্দ্রশেখর, আমি তোমার মুক্তির জন্য রাজকুমারকে কহিয়াছিলাম, তিনি মৃগয়ায় গিয়াছেন, ফিরিয়া না আসিলে মনোরথ সিদ্ধি হইবে না"। বিমুগ্ধ চন্দ্রশেখর তাঁহার বাক্য শুনিয়া সমধিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! আপনাকে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, কি প্রকারে আপনি আমাকে জানিলেন? আমার মনোরথ কি, আপনি কি তাহাও জ্ঞাত আছেন বা আমার মুক্তিলাভ মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছেন?" রমণী চতুরতার সহিত অবনত বদনে কহিলেন "চন্দ্রশেখর এ সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ করা এস্থলে সহসা উচিত নহে, তবে তুমি এই মাত্র জানিও যে আমি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত কাতর আছি।" চন্দ্রশেখর করযোড়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন "ভগবতি! কোন্ দিন কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন?" রমণী কহিলেন "কল্য রাত্রে চন্দ্রোদয়ের পর এই লতা বিতানে সাক্ষাৎ হইতে পারে"। তাঁহার এই কথা শুনিয়া দুঃখিতস্বরে কহিলেন, 'সে হতাশমাত্র যেহেতু আমার রক্ষকেরা আমাকে এসময়ে আসিতে দিবে না।" রমণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাব অবলম্বন করিয়া স্বীয় পরিহিত বসনের অঞ্চলভাগের কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া কহিলেন "তুমি রক্ষকদ্বয়কে ইহা দেখাইলে তাহারা কোন বাধা দিবে না।" চন্দ্রশেখর কৃতজ্ঞতাভাবে প্রণাম করিয়া নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস নিশীথ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হইলে, চন্দ্রশেখর আশ্বাসিত হৃদয়ে লতাবিতানাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি তখনও আসিয়া উপস্থিত হয়েন নাই; ভাবিতে লাগিলেন আশ্বাস দিয়া পশ্চাতে কি প্রবঞ্চনা করিলেন। প্রায় একদণ্ড অতীত হইল তথাপি তিনি আসিলেন না, চন্দ্রশেখর দুঃখে কপালে করাঘাত করিয়া দুঃখে অ-

ধোমুখে অবলা-জনের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। একান্ত উৎসুক হৃদয়ে সহসা আশা প্রতিহত হইলে বীরজনেরাও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তখন সাহস ও বিবেক দ্বয়েরই শক্তি কিয়ৎক্ষণের জন্য লোপ পায়, —হৃদয়েরই উচ্ছ্বাস মাত্র প্রবল হইয়া মনুষ্যকে অভিভূত ও বিকলেন্দ্রিয় করে।

চন্দ্রশেখর যখন অবনত-বদনে রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই জটাজূটধারিণী পার্শ্বস্থ এক লতাকুঞ্জের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সহ। চন্দ্রশেখরের পশ্চাতে আসিয়া পরিহিত বসনের অঞ্চলভাগ লইয়া তাঁহার নয়নজল স্নেহভরে মুছাইয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন "কেন, চন্দ্রশেখর, কেন কাঁদিতেছ?"

চন্দ্রশেখর। দেবি! আপনার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, দেখুন চন্দ্রদেব অনেকক্ষণ উঠিয়াছেন।

রমণী। (সস্নেহে নয়নজল পুনরায় মুছাইয়া) আমি ত আসিয়াছি আবার কেন কাঁদিতেছ?

চন্দ্রশেখর। দেবি! গতি সহসা রোধ হয় না, দুঃখেরও গতি আছে।

রমণী। এত কি দুঃখ চন্দ্রশেখর?

চন্দ্রশেখর। ভগবতি! আমি আপনার দুঃখে এত কাতর হই নাই।

রমণী। (শিহরিয়া, সোৎসুকে) কাহার জন্যে চন্দ্রশেখর—কাহাকে, তুমি,—চন্দ্রশেখর—কাহাকে ভালবাস? (স্বগতঃ) এ নবীন বয়সে কেনই বা না হবে (প্রকাশ্যে) হায় আমি ভাবিয়াছিলাম এটি স্নেহ-কুসুমকলিকা আ—আমারই উদ্যানে ফুটিবে, হায়! এ—এ—এযে বিকসিত কুসুম, চন্দ্রশেখর?

চন্দ্রশেখর। (সচকিতে) দেবি! দেবি!

রমণী। (দুঃখে) গতি সহসা রোধ হয় না, চন্দ্রশেখর দুঃখেরও গতি আছে—

চন্দ্রশেখর। দেবি! ও—ও—যে আমারই কথা?

রমণী। সত্য যে, সকলেরই বস্তু চন্দ্রশেখর, আমারও কি হইতে পারে না?

চন্দ্রশেখর। দেবি! এ—এ—বেশ! এ আচার!! আ—আপনি কি—কাহাকে স্নেহ করেন?

রমণী। (অবনত বদনে ঈষৎ হাসিয়া) চন্দ্রশেখর তোমার বুদ্ধি অস্থির হইতেছে—

চন্দ্রশেখর। দেবি! আমি জানি না ক্ষমা করুন,—ক্ষমা করুন—

রমণী। ক্ষমা করিলাম; চন্দ্রশেখর তুমি কি প্রার্থনা কর?

চন্দ্রশেখর। মুক্তি, আপনি রাজকুমারকে বলিয়া আমাকে মুক্তি দান করুন।

রমণী। তা'হলে তুমি কি সুখী হও চন্দ্রশেখর?

চন্দ্রশেখর। আপনার নিকট চিরঋণী হই।

রমণী। (দুঃখিত স্বরে) আমি ওরূপ উত্তর চাহি না।

চন্দ্রশেখর। আজ্ঞা হাঁ, সুখী হই।

রমণী। কেন?

চন্দ্রশেখর। সম্পত্তি সকল শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া যাই।

রমণী। তার পর?

চন্দ্রশেখর। অর্থের অধিকাংশ পিতাকে দি।

রমণী। তার পর?

চন্দ্রশেখর। গোপনে কিছু (নিশ্বাস ছাড়িয়া)—কিছু কৃ—কৃষ্ণাকে দি।

রমণী। কেন?

চন্দ্রশেখর। তা না হইলে আমাদের বিবাহ হইবে না।

রমণী। কত অর্থ হইলে তুমি সুখী হও, চন্দ্রশেখর?

চন্দ্রশেখর। দেবি! আমি তা জানিনা।

রমণী। সে কি?

চন্দ্রশেখর। দেবি! আমি সত্যই বলিতেছি আমি জানি না, যেহেতু আমি গরিব।

রমণী। চন্দ্রশেখর যদি—এ—এই—বৃক্ষবাটিকা—এ—এই লতাবিতান—নি—নিকুঞ্জ সমস্ত সমস্তই য়—যদি—য—যদি—কৃষ্ণার সহিত পাও—

চন্দ্রশেখর। নির্ধনের প্রতি উপহাস উচিত নয়, এমন সুন্দর অট্টালিকায় এরূপ মনোহর স্থানে থাকিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বস্তুতঃ দেবি! যে রাত্রে আমি প্রথমে এই বৃক্ষবাটিকায় বন্দী হই, যে রাত্রে দেবি! আপনার স্বরমাধুরী শুনিয়া বিমোহিত হই, দেবি! সেই রাত্রে রাজকুমারের অতুল সুখ সম্পত্তি দেখিয়া ইচ্ছা ও উহার সহচরী কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ সুখদ অট্টালিকা এইরূপ সুরম্য স্থানের স্বজন ও বসতিসুখ কতই উপলব্ধি করিয়াছিলাম, দেবি! তাহা আর কি বলিব, সেই মোহ পরদিবস পর্য্যন্ত ছিল।

রমণী। তুমি কিরূপে জানিলে যে—যে—আ—আমি গাহিয়াছিলাম? চন্দ্রশেখর তোমার কি সে গান ভা—ভাল লাগিয়াছিল?

চন্দ্রশেখর। দেবি! বন্দী অবস্থায়ও কিয়ৎক্ষণের জন্যে বিমোহিত হইয়া একান্ত স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছিলাম।

রমণী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) চন্দ্রশেখর যদি আমি তো—তোমার—নিকট থাকিয়া সর্ব্বদা গান শুনাই—তা—তা=তাহলে—

চন্দ্রশেখর। আমার নির্জন বন্দী অবস্থার কষ্ট অনেক লাঘব হয়।

রমণী। (হেটমুখে) চ—চন্দ্রশেখর আ—আর কিছু হয় না?

চন্দ্রশেখর। দেখি! আ—আপনি কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন আ—আমি সত্যই বুঝিতে পারিতেছি না।

রমণী। (পূর্ব্ববৎ হেটমুখে, ছল ছল নেত্রে) চন্দ্রশেখর স্নেহ—অনুরাগ—ভালবাসা—

চন্দ্রশেখর। দেবি! আপনার রূপ সম্পত্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি রাজনন্দিনী—বা রাজমহিষী হইবেন; কিন্তু আপনার যে বেশ দেখিতেছি—আপনি কি বিবাহিতা না কুমারী—

রমণী। (ছল ছল নয়নে) চন্দ্রশেখর আমি—আমি—কুমারী—চন্দ্রশেখর তুমি সুখী হও—তুমি—সুখী—হও—দেখিলেও আমি সুখী হইব (রোদন)।

শারীর-ক্রিয়া-তত্ত্ব।

(৬৪তম পৃষ্ঠার পর।)

রক্তবিকার নিবন্ধন যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তের বিষয় আমরা এ-স্থলে বাহুল্যরূপে বলিতে পারিলাম না। তাহাদের সকল গুলিতেই শোণিতের বিকার বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অনেক স্থলে বিশেষ-ধর্ম্মী বিষের দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া থাকে। তাহাদের অনল্প সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট গতিক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও চর্ম্মে স্ফোট হইয়া থাকে। কতকগুলি ন্যূনাধিক পরিমাণে এক ব্যক্তি হইতে ব্যক্ত্যন্তরের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কতকগুলির বিশেষ ধর্ম্ম এই যে যে ব্যক্তি একবার আক্রান্ত হয় তাহাকে প্রায় দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে না। সস্ফোট জ্বর সমূহকে ইংরেজী চিকিৎসা-গ্রন্থ নিচয়ে Zymotic Diseases জাইমোটিক ব্যাধি সমূহ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই শব্দের তাৎপর্য্য এই যে বিষবিশেষ কর্ত্তৃক শোণিত মধ্যে উৎসেচন ১ ক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়া এই সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু যেসকল কথা বলা গেল, তদ্দ্বারা বুঝা যাইবে যে বিষদ্বারা উৎসেক হউক বা না হউক, অথবা শোণিত যেপ্রকারেই দূষিত হউক না কেন, উহার ঔপাদানিক কণিকাসমূহ এত সুকুমার ও এমন সূক্ষ্ম প্রণালীতে সমঞ্জসীকৃত, যে অত্যল্প পরিবর্ত্তনেও গুরুতর বিকৃতি উপস্থিত করিতে পারে। এইরূপ বৈগুণ্য অনুচিত খাদ্য, অপবিত্র বায়ু, অথবা দেহতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার অসমুচিত নির্ব্বাহ, ইত্যাদি কারণজাত হইতে পারে।

পঞ্চম প্রস্তাব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে দৈহিক তন্তু মাত্রেরই সংবর্দ্ধন, পরিপোষণ, ও ক্রিয়া সামর্থ্য শোণিতের উপর নির্ভর করে; প্রত্যেকেই উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর পোষকবস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই অব্যবহার্য্যাংশ উহাতে সমর্পণ করিয়া থাকে। এক্ষণে জ্ঞাতব্য, উহা কিপ্রকারে তন্তু পরম্পরায় নীত, এবং কিপ্রকারে বা তথা হইতে অপনীত হয়? উহা কি উপায়ে আপনার অঙ্গীভূত পোষক বস্তু গুলিকে প্রদান করে এবং কি উপায়ে বা দেহতন্ত্র হ-

১ Fermentation ইক্ষুরসকে অনাবৃত অবস্থায় অধিককাল যাবৎ রাখিলে উহা গাঁজিয়া উঠে এবং অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এই গাঁজিয়া উঠা উৎসেক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

ইতে আবর্জ্জনীয় বস্তু গুলিকে অপসারিত করে? এই প্রশ্ন গুলির উত্তর দিতে হইলে শোণিতের অনুলোম বিলোম গতি ব্যাপারের এবং সেই গতিবিধায়ক দেহকরণ সমূহের বর্ণনা করা আবশ্যক। হৃৎপিণ্ড স্বীয় সঙ্কোচন জন্য বলের দ্বারা আপন প্রকোষ্ঠ হইতে বেগে রক্তকে বহিষ্কৃত করিয়া ধমনী সমূহের পথে, পরে সর্ব্বতস্ত পরিব্যাপিনী কৈশিকা সমূহের পথে, তদনন্তর শিরা সমূহের পথে পরিচালিত করিয়া দেয়। শিরাবৃন্দ কৈশিকা নিচয় হইতে শোণিত প্রবাহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি উহাকে হৃদয়াধারে বহন করে। এইরূপে শোণিত চক্রগতিক্রমে দেহ মধ্যে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে ৩০ সেকণ্ডের মধ্যে একবার চক্র ঘুরিয়া আইসে। এবম্প্রকারে মনুষ্যের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া প্রতি বর্ষে, প্রতিদিনে, প্রতি মিনিটে এই আশ্চর্য্য জীবন প্রবাহ প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে।

এই এক মাত্র সাধারণ সঞ্চালনপ্রণালীর উল্লেখ করা গেল, কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহার অন্তর্গত তিনটি প্রণালী আছে। (১) প্রধান বা সার্ব্বদৈহিক, ইহার দ্বারা শোণিত বিশুদ্ধ অবস্থায় হৃদয় হইতে তাড়িত হইয়া দেহের সর্ব্বাবয়বের পোষণার্থ পরিধাবিত হয়, এবং অবিশুদ্ধ অবস্থায় পুনরায় হৃদয়মধ্যে ফিরিয়া আইসে। ইহা হৃদয়ের বামভাগ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ ভাগে ফিরিয়া আইসে। (২) অপ্রধান বা ফৌসফুসিক, ইহার দ্বারা শোণিত অবিশুদ্ধ অবস্থায় হৃদয় হইতে তাড়িত হইয়া ফুস্‌ফুসে গমন করে, সেখানে বায়ুসংশ্রবে পরিশোধিত হইয়া পুনরায় বিশুদ্ধ অবস্থায় হৃদয়ে ফিরিয়া আইসে। ইহা হৃদয়ের দক্ষিণভাগ হইতে বাহির হইয়া বামভাগে ফিরিয়া আইসে। (৩) প্রবাহক, (Portal) ইহা প্রধান সঞ্চালন প্রণালীর অধীন শাখাপ্রণালীমাত্র। যে শোণিত, আমাশয়, প্লীহা, পাললিক (Pancreas) ও অন্ত্রচয়ে প্রবাহিত হয়, উহা বরাবর হৃদয়ে ফিরিয়া যায় না, পরন্তু যকৃতে উপনীত হইয়া পরিবর্ত্তন বিশেষ (এই পরিবর্ত্তনের কথা পরে বলিব) প্রাপ্ত হয়, এবং তথা হইতে হৃদয়ে গমন করে। অতএব একটি শোণিতবিম্বাণু হৃদয়ের বাম ভাগ হইতে বাহির হইয়া দুটি অথবা তিনটি পথে ভ্রমণ করিতে পারে। যদি উহা (ধর) পদে যায়, তাহা হইলে তদভিমুখবাহিনী ধমনীসমূহ দিয়া (১) তত্রত্য কৈশিকাসমূহে, তথা হইতে হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগাভিমুখবাহিনী শিরাসমূহে, এবং তথা হইতে ফুসফুসাভিমুখবাহিনী ধমনীসমূহে, (২) ফুসফুসের কৈশিকাসমূহে, এবং ফুসফুস হইতে হৃদয়ের বামভাগাভিমুখবাহিনী শিরা সমূহে সঞ্চরণ করিবে। অথবা মনে কর উহা আমাশয়ে যাইবে, তাহা হইলে তদভিমুখবাহিনী ধমনীসমূহ দিয়া (১) তত্রত্য কৈশিকাসমূহে, তথা হইতে যকৃদভিমুখবাহিনী শিরাসমূহে, (২) যকৃতের কৈশিকাসমূহে, তথা হইতে হৃদয়ের দক্ষিণভাগাভিমুখবাহিনী শিরাসমূহে, তথা হইতে ধমনীসমূহের দ্বারা ফুসফুসে, (৩) ফুসফুসস্থিত

কৈশিকাচয়ে এবং ফুসফুস হইতে হৃদয়ের বামভাগাভিমুখবাহিনী শিরাচয়ে সঞ্চরণ করে। রক্তসঞ্চালনের গতি এইরূপ। এক্ষণে দেহকরণগুলির কথা বলিব।

হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড একটি ফাঁপা মাংসপেশী, কিংবা কতকগুলি পেশী-পরম্পরা এমন ভাবে বিনান যে, চারিটি প্রকোষ্ঠ গঠিত হইয়াছে। শরীরের সামান্য মাংসপেশীতে পেশীনির্ম্মাপক সূত্রগুচ্ছগুলি পার্শ্বাপার্শ্বি অবস্থিত থাকে, কিন্তু হৃদয়ের পেশীগুলি সেরূপে অবস্থাপিত নহে। ইহারা বহুসংখ্যক সুদৃঢ় স্তবকের এরূপ সংস্থান দ্বারা গঠিত যে, ইহাদের সঙ্কোচন জন্য বলের দ্বারা হৃৎপ্রকোষ্ঠের প্রাচীরগুলি সত্বর ও সবলে চাপিত হইতে পারে, এবং যুগপৎ উহাদের সমস্ত আধেয় (অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য) উদ্গীর্ণ করিতে পারে। হৃদয়ের আকার সুপরিচিত। উহার আয়তন বদ্ধমুষ্টির অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে বৃহৎ; উহা বক্ষঃস্থলের মধ্যাংশে অবস্থিত, প্রায় বুকাস্থির ঠিক্ পশ্চাতে, এবং দুটি ফুসফুসের দ্বারা প্রায় সমন্তাৎ পরিবেষ্টিত। হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধতন ও বিস্তৃতাংশ ঠিক্ বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে অবস্থিত; নিম্নতন ও সঙ্কীর্ণাংশ তির্য্যগ্‌ভাবে বামাংশে অবস্থিত; এই অগ্রভাগই প্রত্যেক পৈশিক সঙ্কোচন কালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পশুর্কার মধ্যস্থানে বক্ষঃপার্শ্বে আঘাত করিতে থাকে। হৃদয় মধ্যস্থলে একখানি লম্বায়ত ছদ অর্থাৎ পর্দ্দাদ্বারা দুই সমাংশে বিভাজিত, একটি দক্ষিণভাগ, ও আর একটি বামভাগ। এই বিভাগ এমন সম্পূর্ণ যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোনই সমাগম নাই। কিন্তু একটি হইতে আর একটিতে রক্ত যাইতে হইলে রক্তসঞ্চালনের দ্বারা ভিন্ন যাইতে পারে না। এই দুই ভাগের প্রত্যেকটি আবার এক একটি প্রস্থায়ত পর্দ্দা দ্বারা একটি উর্দ্ধ ও একটি নিম্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উর্দ্ধপ্রকোষ্ঠদ্বয়কে হৃৎকোষ (Auricles) ও নিম্ন প্রকোষ্ঠদ্বয়কে হৃদুদর (Ventricles) কহে। শিরাসমূহ হইতে যে রক্ত হৃদয়ে আইসে, তাহা প্রথমতঃ হৃৎকোষে আসিয়া, তথা হইতে আপন রুজু হৃদুদরে যায়; হৃদুদর দ্বারা তাড়িত হইয়া সার্ব্বদৈহিক বা ফৌসফুসিক সঞ্চালনপ্রণালীসংলগ্ন ধমনীচয়ে গমন করে। অতএব হৃদয় ডবল; প্রত্যেক সঞ্চালনপ্রণালীর জন্যে আধখানি নির্দ্দিষ্ট। কোষদ্বয়ের প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা, কারণ তাহাদের সন্তাড়ন শক্তি তত বেসি হইবার প্রয়োজন নাই। ফলতঃ, হৃৎকোষ হইতে তাহার রুজু হৃদুদরে শোণিতের সঞ্চরণ হৃৎকোষের সন্তাড়নের উপর ততদূর নির্ভর করে না; কিন্তু হৃদুদর প্রাচীরের বিস্ফারণ জন্য হৃৎকোষে যে চোষ উপস্থিত হয় উহাই উক্ত সঞ্চরণের মুখ্য কারণ। হৃদুদরদ্বয়ের প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পুরু ও মজবুত; কারণ তাহাদের সঙ্কোচ্যতার বলেই শোণিত সঞ্চালনপ্রণালী মধ্যে সবলে গমন করিতে সমর্থ হয়। বাম হৃদুদর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরু ও মজবুত অংশ, উহার প্রাচীর ৳ তিন চতুর্থক ইঞ্চ করিয়া পুরু। ইহারই পৈশিক বলের দ্বারা সার্ব্বদৈহিক রক্ত-

সঞ্চালন ব্যাপার সমাধা হইয়া থাকে।

যখন উভয় হৃৎকোষ রক্তের দ্বারা পূর্ণ হয়—বাম হৃৎকোষ,ধামনিক অর্থাৎ ফুসফুস হইতে প্রবাহিত বিশোধিত শোণিতের দ্বারা ; দক্ষিণ হৃৎকোষ, শৈরিক অর্থাৎ দেহের অপরাপর অংশ হইতে প্রবাহিত অবিশুদ্ধ শোণিতের দ্বারা—তখন তাহারা যুগপৎ সঙ্কুচিত হয়, এবং আপনাদের নিম্নতলের ভিতর দিয়া শোণিতকে অধঃস্থিত হৃদুদরদ্বয়ে নিক্ষিপ্ত করে। এই সঙ্কোচনকে হৃৎকোষের 'সমাস্থান' (Systole) কহে। যখন হৃদুদরদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া হৃৎকোষ হইতে শোণিত গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তাহারাও যুগপৎ সঙ্কুচিত হয় এবং আপনাদের আধেয় পূর্ব্বোল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চালনপ্রণালীতে পরিচালিত করিয়া দেয়। এই সঙ্কোচনকে হৃদুদরের 'সমাস্থান' কহে। তৎসমকালে ধমনীচয়ের যে বিস্ফার হয়, তাহাকে ধমনীর ' ব্যাস্থান ' (Diastole) কহে। অতএব হৃদয়ের দুই পার্শ্ব একযোগে গতিশীল হইয়া থাকে। হৃৎকোষদ্বয় সঙ্কুচিত হয় (সমাস্থান), তাহার অব্যবহিত পরেই হৃদুদরদ্বয় সঙ্কুচিত হয় (সমাস্থান), এবং হৃৎকোষদ্বয় বিস্ফারিত হয় (ব্যাস্থান), তাহার পরে বিশ্রামের জন্য একটু বিরতি হয়, এই নিষ্ক্রিয় বিরতি কাল ক্রিয়াযুক্ত সঙ্কোচন কাল অপেক্ষা দীর্ঘ ; তাহার পরে হৃৎকোষদ্বয় আবার সঙ্কুচিত হয়, এবং হৃদুদরদ্বয় বিস্ফারিত হয় (ব্যাস্থান.)। কিন্তু এই তাবৎ সঙ্কোচন ও বিস্ফারণ পরম্পরা এক সেকণ্ড কালও অধিকার করে কি না, কারণ পূর্ণবয়স্ক মানবের হৃদয় মিনিটে প্রায় ৭৫ বার আঘাত করিয়া থাকে। বক্ষঃস্থলের উপর হস্ত স্থাপন দ্বারা হৃদয়ের আঘাত অনুভব করিতে পারা যায়, এবং হৃদয়ের সমাস্থান দ্বারা এই আঘাত উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের যে প্রকার পৈশিক সঙ্কোচন হয়, তাঁহাতে উহার নিম্নতন অগ্রভাগ ঊর্দ্ধাভিমুখে উন্নত হইয়া, ঠিক্ পঞ্চম পর্শুকার নিম্নভাগে, বক্ষঃপ্রাচীরের গাত্রে আঘাত করিতে থাকে।

(ক্রমশঃ।)

হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ।

" মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী। "

কৃত্তিবাস।

হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের উপর যে শত শত ভীষণ আক্রমণ হইয়া গিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বুদ্ধদেব, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, নানক, যীশুখ্রীষ্ট, রামমোহন ও কেশব সকলেই যাঁহার যত শক্তি, কেহ বা ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া, কেহ বা দর্পোন্মত্ত হইয়া,

কেহ বা বলোন্মত্ত হইয়া, কেহ বা প্রেমোন্মত্ত হইয়া, কেহ বা বৈরাগ্যোন্মত্ত ও কেহ বা সত্যোন্মত্ত হইয়া, এই জরাজীর্ণ, স্থবির, চলৎশক্তিরহিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। প্রত্যেক আক্রমণেই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ আমূলে বিকম্পিত হইয়াছে। শত শত হিন্দু-সন্তান দলে দলে আক্রমণ কারীদিগের সহিত যোগ দিয়া শত্রুর বল বৃদ্ধি করিয়াছেন। সহস্র সহস্র হিন্দুসন্তান এই সমাজ বিপ্লব দেখিয়াও চিরকালোচিত নিশ্চেষ্টতা ও আলস্য পরিত্যাগ করেন নাই। দুই চারিজন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য ভিন্ন কেহই হিন্দুত্বের সাহায্যে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত উত্তোলন করেন নাই। হিন্দুত্বের বিনাশ সাধন-মানসে নানা দেশ হইতে নানা জাতি প্রচুর অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, ধন, মান, গৌরব প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। হিন্দুসন্তানেরা বলদর্পী নবানুরাগোন্মত্ত প্রচণ্ড শত্রুর বলবৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু, হায়! হিন্দু-সমাজ ভুক্ত কেহই দুর্ভাগ্য হিন্দুত্বের সাহায্যে কোন ক্ষতি বা ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। এ অবস্থায় হিন্দুত্ব যে অনেক রত্নরাশি হারাইবে, হিন্দুত্ব যে অনেক বিষয়ে কেবল কথাশেষ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ফলতঃ ইহাই আশ্চর্য্য যে আজিও হিন্দুত্ব সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। ইহাই আশ্চর্য্য, যে হিন্দুত্ব একেবারে বিধ্বস্ত ও চূর্ণীকৃত হয় নাই। ইহাই আশ্চর্য্য যে আজিও হিন্দু-সমাজের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

কি কারণে বা কি গুণে বা কি দৈববলে হিন্দুত্ব এই সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, আজিও কোন রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করা এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু মুখ্য বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে, হিন্দুত্বের প্রতি কিরূপ ভীষণ আক্রমণ হইয়াছে তাহার দুই চারিটি নিদর্শন দিতেছি।

বুদ্ধদেব কিরূপে নিজ চরিত্র মাহাত্ম্য দেখাইয়া সহস্র সহস্র হিন্দুকে নিজ বৈরাগ্যপ্রচুর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় ঐতিহাসিকেরা ও প্রবন্ধ-লেখকেরা অনেকবার অনেকরূপে দেখাইয়াছেন। * কিরূপে মহম্মদীয়েরা এক হস্তে তরবারি ও অন্য হস্তে কোরাণ লইয়া অস্মদ্দেশীয় কাফরদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও অনেক অনেক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজাধিকারের সময় হইতে হিন্দুত্বের প্রতি কিরূপ অব্যক্ত, অনন্ত আক্রমণ চলিতেছে, তাহা আজিও অনেকে অবগত নহেন। এজন্য ইংরেজাধিকারের সময় হইতে হিন্দুত্বের উপর যে সমস্ত বিপৎ-পাত হইয়াছে, নিম্নে তাহাই বর্ণনা করা যাইতেছে।

কলিকাতা ইংরেজ-শাসনের প্রথম রঙ্গভূমি। যব চার্ণাক হুগলী হইতে বিতাড়িত হইয়া কলিকাতার নিমতলাঘাটের নিম্ববৃক্ষতলে নিজ কুঠী সংস্থাপিত করিলেন। ঐ দিন ভবিষ্যৎ ইংরেজ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি

* বান্ধবের পূর্ব্ব এক সংখ্যায় "শাক্যসিংহ" নামক পুস্তকের সমালোচনা দেখ।

ভারত-বক্ষে চিরদিনের জন্য প্রোথিত হইল। আর্য্য হিন্দুরা এদেশে আসিয়া কৃষ্ণ বর্ণ আদিম নিবাসীদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, যব চার্ণাক হিন্দুদিগের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। যব চার্ণাকের চতুষ্পার্শ্বস্থ তন্তুবায়েরা (যাঁহাদের অর্থে চার্ণাক, চার্ণাকের কুঠী, চার্ণাকের নিযোক্তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিপালিত ও প্রতিপোষিত হইতেন) ক্রন্দনধ্বনিও আর্ত্তনাদের দ্বারা যব চার্ণাকের শ্রুতি সুখ বিধান করিতে লাগিলেন। যব চার্ণাকের অন্তঃপুর, সুন্দরী হিন্দু ললনা দ্বারা পরিপূরিত হইতে লাগিল। যে হিন্দুসতীকে যব চার্ণাক চিতা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সুন্দরী যব চার্ণাকের পাটরাণী হইলেন। এইরূপে, দুর্ব্বল অসহায় দরিদ্র হিন্দুজাতির ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদের মধ্যে, অপহৃতা, সুন্দরী হিন্দুললনাগণের দীর্ঘশ্বাস ও বিষাদাশ্রুর মধ্যে, ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থ প্রথম ইষ্টক প্রথম প্রোথিত হইল।

কলিকাতার প্রথম রাজা যব চার্ণাক এইরূপে পাঁচ বৎসর অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড রাজত্ব করিলে পর, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি "সার জন গোল্ড্স বরোকে" যব চার্ণাকের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী গোল্ড্স বরোকে একটি উপদেশ প্রদান করেন। সেই উপদেশটি এই "যখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে, তখন ইহাও বলিতে হইবে যে, 'হে ঈশ্বর! যে হিন্দুজাতির মধ্যে আমরা বাস করি, তাহারা আমাদের বিনীত ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ বাক্যালাপ শুনিয়া, আমাদের বিশুদ্ধ সনাতন খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ হউক'।" এই উপদেশের সহিত আমাদের দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হইল। এক দিকে দরিদ্র হিন্দু-প্রজার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত হইতেছে, এক দিকে তাহার শ্রমার্জ্জিত অর্থ আত্মসাৎ করা হইতেছে, অন্য দিকে তাহার কর্ণে খ্রীষ্টনামের দীক্ষা হইতেছে! যেখানে যেখানে অসভ্য জাতিদিগকে ইয়ুরোপীয়েরা খ্রীষ্টান করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই পূর্ব্বোক্ত প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। "তুমি অসভ্য, তুমি স্বর্ণ রৌপ্যের খনি লইয়া কি করিবে? তুমি শস্যশালিনী ভূমি লইয়া কি করিবে? আইস আমরা তোমাকে খ্রীষ্টান করিয়া গোলোক ধামে পাঠাইয়া দিই" এই বলিয়া সভ্য জাতিরা অসভ্য জাতিদিগকে দলে দলে পৃথিবী হইতে বিদায় দিতেছেন। ঐ দেখ আমেরিকার আদিম নিবাসীরা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ দেখ অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়াতেও প্রায় সেই কথা। আফ্রিকাতেও যে কিছু দিন পরে ঐ কথাই প্রমাণীকৃত হইবে এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে।

কিন্তু যতদিন শুদ্ধ বাক্যালাপের উপর খ্রীশ্চান্ ধর্ম্ম নির্ভর করিল, তত দিন মূর্খ হিন্দুরা বড় একটা খ্রীশ্চান হইতে চাহিল না। ভারতবর্ষের অর্থে বিলাতের সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল, বিলাতে মাংস মদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া হংস ডিম্বটি পর্য্যন্ত

মহার্ঘ হইয়া উঠিল, ডান্ বুল, টমাস্ উল্ফ, ও ফ্রেডেরিক বেয়ার, বিলাতে গিয়া "ভারতবর্ষীয় নবাব" আখ্যা পাইলেন, কিন্তু ভারতীয় লোকেরা খ্রীশ্চান হইতে চাহিল না। ভারতীয় দিগের এই সময়ের দুরবস্থা একজন সাহেব এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার কালে জাতিভেদ ও দেব পূজা অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। নরবলি ও ঠগী পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে চারিটি খ্রীষ্ট সভা ও প্রায় বারজন পাদ্রী কার্য্য করিতে ছিল। দশবৎসরে প্রায় ১৫ জন ভারতবাসী খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল"।

দুর্ভাগ্য হিন্দু দিগের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিলাতে ইংরেজী পাদ্রীরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, যে যদি বৎসরে গড়পড়তা দেড়টি করিয়া ক্রীশ্চান হয় তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষ ক্রীশ্চান হইতে অন্ততঃ ১০ কোটী বৎসর লাগিবে। তাঁহারা মনে মনে স্থির করিলেন যে শুদ্ধ বাক্যালাপে হিন্দু খ্রীশ্চান হইবে না, অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তখন হিন্দুসমাজের বিনাশ-সাধনার্থ যে উপায় অবলম্বিত হইল, তাহা ইংরেজ জাতির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও দূরদর্শিতার প্রবল পরিচায়ক। আমরা সেই উপায়টি নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। *

নবাগত ইংরেজগণ হিন্দুদিগের পক্ষে স্পর্শমণির তুল্য হইয়া উঠিয়াছিল। যে ইংরেজকে স্পর্শ করে সেই বড় মানুষ হইয়া যায়। নবকৃষ্ণ (ক্লাইবের মুন্সী) মাসিক ৬০্টাকা মাত্র বেতন পাইতেন, কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধের সময় নবকৃষ্ণ নয়লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করিলেন। এক্ষণে যে কয় ঘর বড় মানুষ আছেন, ইহাঁদের প্রায় সকলেই ইংরেজ-সংস্পর্শে প্রথম বড় মানুষ হন। রামচাঁদ দেওয়ান, গোবিন্দরাম (তহশীলদার), বনমালী সরকার, প্রভৃতি বিখ্যাত বড় মানুষ সকলেই ইংরেজের নিকট চিরঋণে বদ্ধ। হিন্দুরা দেখিলেন যে ইংরেজসংস্পর্শেই, বুদ্ধি বিদ্যা না থাকিলেও, বড় মানুষ হওয়া যায়। হিন্দুরা যে দিন একথা বুঝিলেন সে দিন হইতেই ইংরেজ সংস্পর্শ ও ইংরেজীশিক্ষার লালসা হিন্দুদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। যে ইংরেজসংস্পর্শে অক্ষম, যে ইংরেজের ঘাড় ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ আত্মসাৎ করিতে অপারগ, সে মনুষ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইত না। ইংরেজী লিখিতে না জানিলে, ইংরেজী লিখা ভাল না হইলে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া দুষ্কর হইত। যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু তাঁহারাও ধন কুবের ইংরেজ সংস্পর্শে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইংরেজী লিখিতে শিখিব, ইংরেজীতে কথা কহিতে শিখিব, এবং ইংরেজ সংস্পর্শে দুই পয়সা ঘরে আনিতে পারিব, এই আশা হিন্দু সমাজস্থ সকলকেই বিচলিত করিল। হিন্দুদিগের এই আশা পরিপূরণ করিবার জন্য, নানা স্থানে, নানা স্কুল, সংস্থাপিত হইল। এ-

* যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা ডফ্ সাহেবের জীবন-চরিত পাঠ করিলে এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিতে পারিবেন।

দেশী ইংরেজেরা কতক গুলি স্কুল খুলিলেন। হেয়ার সাহেব, রাম মোহন রায় প্রভৃতির যত্নে হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইল। হিন্দু কলেজের সংস্থাপকেরা কতকদিন উৎসাহ ও যত্নের সহিত কার্য্য করিলেন। কিন্তু অচিরেই ইহার প্রায় উচ্ছেদদশা সমুপস্থিত হইল,। হিন্দু-কলেজের সংস্থাপকেরা তখন গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিলেন। এবং প্রসিদ্ধ উইল্সনকে হিন্দুকলেজের প্রথম পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন। ইংরেজদের মধ্যে অনেক প্রকৃত হিন্দু হিতৈষী তৎকালে বিলাতে ও এদেশে ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে ও প্রবর্ত্তনায় হিন্দু কলেজে ইংরেজী-সাহিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞান প্রচলিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, যে হিন্দু কলেজের সংস্থাপক দিগের কি উদ্দেশ্য ছিল। এই সংস্থাপকেরা সকলে এক প্রকৃতির ছিলেন না। কাহারও (যথা চিরস্মরণীয় ডেবিড্ হেয়ার) মনে শুদ্ধ জ্ঞানালোক ও বিদ্যালোক বিতরণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কেহ বা (যথা মহাত্মা রামমোহন রায়) পতিত হিন্দুদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মালোক দেখাইবার আশা করিতে লাগিলেন। কেহ বা (যথা জেম্স্ মিল) মনে করিলেন যে, বিদ্যালোক পাইয়া হিন্দুরা আপনাপন দোষ গুণ বুঝিতে পারিবে এবং আপন আপন উন্নতি সাধনও করিতে পারিবে। কেহ বা ভাবিলেন (যথা মেকলে) যে এই বিদ্যালোকে হিন্দুদিগের কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি দূরীভূত হইবে। ফলতঃ যিনি যাহা ভাল বাসিতেন, তিনি হিন্দু কলেজ হইতে তাহারই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে ইহাও দেখা উচিত, যে যাঁহারা হিন্দুকলেজে পুত্রাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের কি উদ্দেশ্য ছিল? আমাদের মনে হয়, যে ইংরেজ-সংস্পর্শে অধিকার লাভ, ও অর্থাহরণ ইহা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যে উদ্দেশ্যে হিন্দু মুন্সী রাখিয়া হিন্দু গোলেস্তাঁ, সাদি, হাফিজ পাঠ করিয়াছিল, ঠিক্ সেই উদ্দেশ্যেই হিন্দু ইংরেজী পড়িতে গেল। ইংরেজী রাজভাষা, ইংরেজী না পড়িলে অর্থাগমের দ্বার সম্যক্ উন্মুক্ত হয় না, সুতরাং হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিল।

কিন্তু উদ্দেশ্য যাঁহার যাহা থাকুক না কেন, হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষার ফল কি হইল? হিন্দুপিতার উদ্দেশ্য কতক সংসাধিত হইল, বিদ্যালোকে মনের মলা, অনেক ঘুচিয়া গেল। যাঁহারা হিন্দুসমাজের বিনাশাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের উদ্দেশ্যও কতক সংসাধিত হইল, শিক্ষিতদের মন হইতে অনেক কুসংস্কার, অনেক পৌত্তলিকতা চিরকালের জন্য বিদায় লইল। কিন্তু এ সমস্ত ভিন্ন আরও এক ফল হইল। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা করিলেন, তাঁহাদের মন হইতে, ভয়, ভক্তি, বিনয়, শিষ্টাচার, সম্মান, প্রভৃতি কতকগুলি সদ্গুণ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। পিতা যে শালগ্রামের নিকট ধূল্য-

বলুণ্ঠিত, পুত্র সেই শালগ্রামের উপর পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। পিতা গুরুজনের নিকট মিতভাষী পুত্র বাচাল। পিতা অভ্যাগতের নিকট বিনয়ী, পুত্র দর্পী। পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাদোদক পায়ী, পুত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি কাটিয়া লইতে লঘুহস্ত। পিতা নিরামিষাশী পুত্র গোমাংস ভোজী। পিতা পরিজনানুরক্ত, পুত্র স্ত্রৈণ। হিন্দু সমাজ এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। যাঁহারা হিন্দু তাঁহারা স্ব স্ব ইষ্টদেবের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হে দেব, সৃষ্টি যায়। শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে পদছায়া দাও।" কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যুবক পিতার মনস্তাপ, মাতার ক্রন্দন প্রভৃতি অবহেলা করিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশের পথে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল।

হিন্দু সমাজের এই যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল, ইহার কারণ কি? পূর্ব্বেও ত হিন্দু আরবী, পারসী পড়িত। কিন্তু পূর্ব্বেত হিন্দু নিজধর্ম্ম নিজসমাজ পরিত্যাগ করিত না। হিন্দুর আরবী পারসীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি জন্মিত। কারণ কথায় কথায় হিন্দুকে বয়েৎ আওড়াইতে দেখা যাইত। কিন্তু হিন্দু স্বধর্ম্ম বা স্বসমাজ ছাড়িত না। কিন্তু এ কি হইল? পাঁচ ছয় বৎসর ইংরেজী পড়িতে না পড়িতেই সকল মত ঘুরিয়া গেল। হিন্দুসমাজ এত কাল যাহা কিছু এত যত্নে সঞ্চয় করিতেছিল, দুই দিনের ইংরেজী শিক্ষা তাহা উড়াইয়া দিল। তবে ত ইংরজী শিক্ষাই সত্য। তবেত হিন্দু-সমাজ অজ্ঞানান্ধাকারাচ্ছন্ন। যেখানে হিন্দুসমাজ দুই দিনের ইংরেজী-আলোক সহ্য করিতে পারিল না, সেখানে হিন্দু-সমাজ ভ্রমান্ধ বই আর কি?

এই রহস্যের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, সেই সময়ের ইয়ুরোপীয় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ফরাসিস্ রাজবিদ্রোহের সময় ইয়ুরোপে যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, এবং যে অগ্নি এখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই, সেই অগ্নিতে ইয়ুরোপেও ভয়, ভক্তি, ধর্ম্মনীতি, বিনয়, শিষ্টাচার, সম্মান সদাচার প্রভৃতি পুড়িতেছিল। রাজাকে আবাব ভক্তি করিব কি? রাজা ত প্রজাদের প্রধান ভৃত্য। গুরুকে আবার ভক্তি করিব কি? তাঁহাকে ত যথেষ্ট ধনদান করিয়াছি। পিতামাতাকে আবার ভক্তি করিব কি? তাঁহারা ত ছোলার খোসা। ধর্ম্ম কি? সে ত কয়েকজন অর্থগৃধ্নু পাদ্রীর কাল্পনিক বিজৃম্ভণ। নীতি কি? সেত কয়েকজন দার্শনিকের উন্মত্ত প্রলাপ। উদারতা কি? সেত নির্ব্বোধের আত্মপ্রবঞ্চনা। ক্ষমা কি? সেত দুর্ব্বলের চিত্তদৌর্ব্বল্য। পৃথিবীতে এক কথা সার—সে কথা "আমি"। পৃথিবীতে এক যুক্তি সার—সে যুক্তি—"আমার যুক্তি"। পৃথিবীতে এক উদ্দেশ্য সার—সে উদ্দেশ্য "আমার সুখ"। অন্যে যাহা বলিয়াছে বা বুঝিয়াছে, তাহা তুমি ইচ্ছা করিলে অগ্রাহ্য করিতে পার। কিন্তু তুমি যাহা বোঝ বা বল তাহা বেদবৎ অকাট্য জানিও। যাহা তুমি বোঝ না, তাহার অস্তিত্ব মানিও না। ঈশ্বর তুমি বুঝিতে পার না? বেস কথা ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন

নাই। পরোপকার তুমি বুঝিতে পার না? পরোপকার মানিও না।

এই সমস্ত মত-বিবর্ত্তনে ইয়ুরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে যে কি প্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকদিগকে বলিতে হইবে না। যে খাণ্ডবদাহন ইয়ুরোপকে ভস্মরাশিতে পরিণত করিতেছিল, সেই খাণ্ডবদাহন ভারতবর্ষে ইংরজে-সাহিত্য ইংরজে-বিজ্ঞান দ্বারা আসিয়া পঁহুছিল। প্রাচীন হিন্দুরা জানিতেন, এবং এখনও দুই একজন হিন্দু জানেন, যে যদি স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একজন নরগণ ও অন্য একজন দেবগণ হয়, যে নরগণ সে দেবগণকে খাইয়া ফেলে। আবার যে রাক্ষসগণ সে নরগণকে খাইয়া ফেলে। যখন ফ্রেঞ্চ বিদ্রোহের প্রচণ্ড দাবানল ভারতবর্ষে আসিয়া পঁহুছিল, তখন চন্দ্ররশ্মি-তুল্যা সুকুমারাবয়বা, সুসৌষ্ঠবা, শান্তিময়ী, সৌম্যা, হিন্দুসমাজলতা প্রথম উত্তাপতাপেই দগ্ধ হইয়া গেল। হায় হায়! সেই কুদিনে কত মাধুর্য্য, কত সারল্য, কত বিনয়, কত ভক্তি, কত সুশীলতা, কত ঔদার্য্য, কত ক্ষমা পুড়িয়া গেল, তাহা আজি আমরা হৃদয়ে ধারণাও করিতে পারি না। আজিও সেই ভস্মরাশির মধ্যে দু একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র জ্বলিতেছে। কিন্তু তাহাও শীঘ্র নির্ব্বাপিত হইবে।

সে যাহা হউক, দেখা গেল যে ইংরেজ-সাহিত্য ও ইংরেজ-বিজ্ঞান, ফরাসিস রাজ-বিদ্রোহ কালীন মত গুলিন আমাদের দেশে প্রচার করিয়া আমাদের সমাজে মহা-বিপ্লব উপস্থিত করিল। সমাজের মধ্যে ছোট বড় বলিয়া বড় একটা বিভেদ রহিল না। তুমি যদি বিশকর্ম্মা আমি তোমার উপর বেয়াল্লিশ কর্ম্মা। হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হিন্দু কম্পিত ও বিত্রস্ত হইল। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সমাজের বিনাশাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা কি ভাবিলেন শ্রবণ করুন। "এইরূপে (ইয়ুরোপীয় শিক্ষা-দ্বারা) হিন্দুসমাজের বিনাশ সাধন আরম্ভ হইল। হিন্দুরা নিজেই তাহাদের অলীক দেব দেবীর উপর প্রথম অস্ত্রাঘাত করিল" ইংরেজ-পাদ্রীরা হিন্দুসমাজের বিনাশ-সাধন দেখিয়া হর্ষ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং যাহাতে বিনাশের গতি আরও প্রবল হয়, তখন সেই চেষ্টা হইতে লাগিল।

এই স্থলে একটি কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। বিলাতীয় জনকতক ইংরেজ ও ইংরেজ পাদ্রী ভিন্ন অন্য কেহই হিন্দু-সমাজের বিনাশ কামনা করিতেন না। যে সকল ইংরেজ আমাদের শাসনকর্ত্তা তাঁহারা বরং সময়ে সময়ে হিন্দুসমাজের সংরক্ষণার্থ যত্নবান্ হইতেন। এই সমস্ত উদারচেতা, দূরদর্শী, ইংরেজ শাসনকর্ত্তা-দিগের প্রবর্ত্তনায় বা নিবর্ত্তনায় হিন্দুকলেজে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন শিক্ষা দেওয়া হইত না। সুতরাং হিন্দু কলেজস্থ হিন্দু যুবাগণ হিন্দুধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ করিতেন না। মনে মনে শিক্ষিত যুবকেরা প্রায় সকলেই নাস্তিক হইলেন, তাঁহারা তর্ক করিতেন, হিন্দুধর্ম্ম অযৌক্তিক; কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম যৌক্তিক? ধর্ম্মমাত্রেই অযৌক্তিক। অতএব একধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই।

এই সময়ে ইংরেজ-পাদ্রীরা আপনাদের স্কুল কলেজ খুলিতে লাগিলেন। অল্প বেতনে হিন্দুকলেজের ন্যায়, অথবা হিন্দু কলেজ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, ইংরেজী শিক্ষা পাওয়া যাইবে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিমান্ হিন্দুসন্তানগণ ইংরেজ-পাদ্রীদিগের স্কুলে ও কলেজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত স্কুল কলেজে ইংরেজ পাদ্রীরা হিন্দুদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। ডফ্ সাহেব তাঁহার একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'Ox' মানে কি। ছাত্র উত্তর করিল 'গোরু'।

ডফ্—"গোরুর ন্যায় আর কি কথা তোমাদের ভাষায় আছে?"

ছাত্র—গুরু।

ডফ্ সাহেব তখন ছাত্রদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, গুরু গোরুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

এতদ্ভিন্ন দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের নিকট-দুরন্ত-নরকযন্ত্রণা বর্ণনা করা হইতে লাগিল। এবং যাহাতে হিন্দুসমাজের প্রতি ঘৃণা ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি ভক্তি ছাত্রদিগের মনে জন্মিতে পারে, তদ্বিষয়ে খৃষ্ট পাদ্রী চেষ্টার কোন ত্রুটি করিলেন না।

পাছে কেহ মনে করেন, আমি খৃষ্টীয় পাদ্রীদিগের অযথা নিন্দা করিতেছি, এইজন্য, আমি নিম্নে খৃষ্টীয় পাদ্রী বর্ম্মা সিঙ্গাপুরে ও চীনে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একজন ইংরেজ সিঙ্গাপুর হইতে বিলাতের টাইমস্ পত্রে লিখিয়াছেন

"মনুষ্যকে সুখী, শ্রমশীল বা সমাজোপযুক্ত করা খৃষ্টপাদ্রীর অভিপ্রেত নহে। মনুষ্যকে খৃষ্টান করাই খৃষ্টপাদ্রীর একমাত্র বাসনা। খৃষ্টপাদ্রীরা অনেক সময়ে তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যত্নও করিয়া থাকেন, কিন্তু এ সমস্ত প্রলোভন মাত্র। প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে আনয়ন করাই পাদ্রীদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য"।

আবার "এই সমস্ত যুবা পাদ্রীরা অধিবাসীদের বিশ্বাস, চিরাগত প্রথা, পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি সকলকেই ঘৃণা করেন, এবং তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহাদিগকে সেই সমস্ত ঘৃণা করিতে উপদেশ দেন এবং বলেন যদি তোমরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না কর, তাহা হইলে অনন্ত নরকে পুড়িয়া মরিবে।"

ফলতঃ আজি খৃষ্টপাদ্রী, চীন, সিঙ্গাপুর ও বর্ম্মায় যে প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন, বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। খৃষ্টপাদ্রীরা নিজমুখে এই কথা স্বীকার করেন এবং ইহা লইয়া স্পর্দ্ধাও করিয়া থাকেন।

যৎকালে খৃষ্ট পাদ্রী তাঁহার বিলাতী গোলাগুলি লইয়া হিন্দুত্বের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিতেছিলেন, তৎকালেই হিন্দুত্বগগণে আর একটি কালমেঘ সজ্জিত হইতেছিল। মহাত্মা রামমোহন রায় এই কালমেঘের

সূত্রপাত করেন। হিন্দু-সমাজের পরিবর্ত্তন বোধ হয় রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ছিল না। হিন্দু হিন্দু থাকুক, কিন্তু হিন্দুত্বের পঙ্কোদ্ধার আবশ্যক। ফলতঃ রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম প্রচার-প্রণালী পবিত্র, উদার ও নিষ্কলঙ্ক ছিল। কাহাকেও নরক যন্ত্রণার ভয় না দেখাইয়া, কাহারও মনে এক কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে অন্য কুসংস্কার উত্থাপিত না করিয়া, রামোহন রায় নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম প্রচারে হিন্দু সমাজ বড় বিচলিত হইল না। হস্তী মক্ষিকা-দংশনকে যেমন উপেক্ষা করে, হিন্দু-সমাজ রামমোহন রায়ের ধর্ম্মকে সেইরূপ উপেক্ষা করিতে লাগিল। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম গুরু দেবেন্দ্রনাথও হিন্দু-সমাজকে বিচলিত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। ফলতঃ হিন্দু-সমাজকে বিচলিত বা ব্যতিব্যস্ত করা রামমোহন রায় বা দেবেন্দ্রনাথ কাঁহারও উদ্দেশ্য ছিল না, হিন্দু-সমাজকে বিশুদ্ধীকৃত করাই তাঁহাদের জীবনব্রত ছিল। তৃতীয় ব্রাহ্মগুরু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হইলে হিন্দু সমাজ বড়ই বিকম্পিত হইয়া উঠিল। রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বাঙ্গালা অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়াই হউক বা বাঙ্গালি বাঙ্গালাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল না বলিয়াই হউক, বাঙ্গালায় ধর্ম্ম প্রচার বাঙ্গালির হৃদয়গ্রাহী বা হৃদয় স্পর্শী হইল না। কিন্তু যখন কেশবচন্দ্র ইংরেজীতে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন বাঙ্গালি একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

একেই ত হিন্দু-সমাজ একরূপ টলমল করিতেছিল, তাহাতে আবার কেশবচন্দ্র একাধারে অনেক গুলি গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, অনিন্দ্য রূপপ্রভা, বীণাবিনিন্দীত স্বরমাধুর্য্য, প্রগাঢ় বিদ্যা, গভীর চিন্তা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অমানুষী বক্তৃতা-শক্তি, উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও পাতালস্পর্শী ঈশ্বর প্রেম লইয়া কেশব যখন দ্বিতীয় গৌরহরির ন্যায় কলিকাতায় অবতীর্ণ হইলেন, তখন হিন্দু সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা চমকিত হইল। অনেক কাল বাঙ্গালি এরূপ চমকিত হয় নাই। অনেক কাল বাঙ্গালির ধমনীতে রক্তস্রোত এরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় নাই। আবার কেশবচন্দ্রের সকলই বিলাতী ধরণের। স্ত্রী শিক্ষা দাও, স্ত্রী দিগকে বাহির কর, প্রভৃতি যে সকল বিলাতী প্রথা বাঙ্গালি ভালবাসিতে শিখিতেছিল, কেশবচন্দ্র সে গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের দলবলে বাঙ্গালা পূরিয়া গেল। অনেকে মনে মনে কেশবচন্দ্রকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনেকে প্রকাশ্যে কেশবচন্দ্রের সমাজ-ভুক্ত হইলেন। ফলতঃ কেশবচন্দ্রের ন্যায় হিন্দু-সমাজের বৈরী ব্রাহ্মদের মধ্যে পূর্ব্বে কেহই আবির্ভূত হন নাই।

আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের দুইটি প্রবল শত্রুর কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। আ-

মরা দেখাইলাম খৃষ্টান পাদ্রীরা কিরূপে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজের বিনাশ-সাধনের জন্য গোলা গুলি সাজাইতেছিলেন। আমরা আরও দেখাইয়াছি যে ব্রাহ্মেরাও হিন্দুত্বের বিনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিরূপে হিন্দু-শত্রু খৃষ্টান্ পাদ্রীদের সহিত যোগ দিতেছিলেন। খৃষ্টান্ অপেক্ষাও ব্রাহ্মদের দ্বারা হিন্দু-সমাজের অধিকতর ক্ষতি হইল। কারণ জ্ঞাতি-শত্রুর ন্যায় প্রবল শত্রু আর হইতে পারে না। কিন্তু এই দুই দল প্রবল শত্রু ভিন্ন, আরও একদল শত্রু হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতেছিলেন। আমরা নিম্নে এই তৃতীয় দলের কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

আমাদের দেশে দুই দল বড়মানুষ আছেন। একদল বহুকালাগত প্রাচীন বংশ-মর্য্যাদা-বিমণ্ডিত। দেশে কত বার কত রাজ-পরিবর্ত্তন, মত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ইহাঁরা 'নির্ব্বাত, নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁদের রাজসরকারে প্রতিপত্তি নাই। ইহাঁরা রাজাবাহাদুর বা রায়বাহাদুর বা মহারাজ বাহাদুর প্রভৃতি কোনি সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইহাঁদের শ্যালক, মাতুল, ভগিনীপতি, ভাগিনেয় প্রভৃতিরা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইতে পারেন না। অথচ ইহাঁরা দেশবিখ্যাত। ইহাঁদের কীর্ত্তি কলাপ—দেবমন্দির স্থাপন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা, সদাব্রত, দান, ধ্যান প্রভৃতি। ইহাঁরা আজিও হিন্দুসুলভ ঔদার্য্য, মহত্ব প্রভৃতি পরিত্যাগ করেন নাই। ইহাঁরা যে সমাজের অধিনায়ক, সে সমাজে আজিও অনেক সদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত প্রাচীন বুনিয়াদি বংশের লোপ হইয়া আসিতেছে। এবং ইহাঁদের স্থলে আর একদল বড়মানুষ আমাদের সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন। ইহাঁরা ইংরেজের পদলেহন করিয়া বড়মানুষ হইয়াছেন। ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষেরা "Bone mouth vulture fly, fall বি ত fall Picture এর উপরেই fall" * "সাহেব you die I die, you live I live" † প্রভৃতি চিরস্মরণীয় ইংরাজীশিক্ষার উৎকর্ষ দেখাইয়া মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, জাল, জালিয়াত, প্রভৃতি দ্বারা আপনাদিগকে বড়মানুষ করিয়াছেন। ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কেহ বা পেশ্‌কারী কেহ বা সেরেস্তাদারী করিয়া, ১০ টাকা মাহিয়ানায় চাক্‌রী করিয়া ১০ লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের প্রভাবে বাঙ্গালির চরিত্র গৌরব দেশে দেশে বিঘোষিত হইতেছে। ইহাঁদের কল্যাণে, বাঙ্গালির চরিত্র গৌরব মেকলের রচনাতে অক্ষরে অক্ষরে বিরাজিত হইয়াছে। ইহাঁদের প্রভাবে আজি বাঙ্গালিরা মিথ্যাবাদী, প্র-

* অর্থাৎ একটা শকুনি একটা হাড় মুখে করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। হাড় খানা পড়্‌বিত পড়, একেবারে ছবির উপরেই পড়িয়া গেল।

† অর্থাৎ সাহেব তুমি মারিলে মরি, বাঁচালে বাঁচি।

তারক বলিয়া সর্ব্বদেশে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। যাঁহারা এই সমস্ত পুণ্যশ্লোকের বংশধর, তাঁহারাও নিজ নিজ চরিত্রে নিজনিজ আকরের দোষ গুণ দেখাইতেছেন। মহারাজ হরেকৃষ্ণ ঢেঁকিরাম লাটসাহেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন, লাট সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, " ঢেঁকিরাম তোমরা বড় প্রতারক। " ঢেঁকিরাম আসন হইতে একটু উঠিয়া বলিলেন, " ধর্ম্মাবতার, তাহার আর সন্দেহ কি ? আমাদের তুল্য প্রতারক জাতি আর নাই। " লাট সাহেব পুনরপি, হাসিয়া বলিলেন, " Dear ঢেঁকি ! তোমাদের স্ত্রীলোকেরা চৌদ্দ আনা অসতী।" ঢেঁকি হাসিয়া বলিলেন—" ধর্ম্মাবতার। সমাজের যে অবস্থা তাহাতে স্ত্রীলোকেরা অসতী না হইয়া থাকিতে পারে না।" লাট্ সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "Dear ঢেঁকি ! What can I do for you ?"। ঢেঁকি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,"আমার শালার শালা তস্য শালা ফার্ষ্ট বুক্ অফ্‌রিডিং পড়িয়াছিল, কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছে,তাহাকে একটি চাকরী দিতে আজ্ঞা হয়।" লাট্ সাহেব বলিলেন— "Well ঢেঁকি,I will try." পরদিন শালার শালা তস্য শালা নেটিভ্ সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত হইলেন। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়া, তাহারা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। এবং ঢেঁকি লাট্ সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়া আসিলেন " বাঙ্গালির মত পাজী জাতি আর নাই।"

পাঠক মনে করিবেন না, যে আমি এই ঢেঁকিরামদিগের অযথা বর্ণনা করিতেছি। কলিকাতার একজন ঢেঁকি, কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতিদিগের সহিত যুবরাজের পরিচয় করাইয়া আপনার পদোন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কয়েক দিন হইল, কলিকাতার আর একজন ঢেঁকি ইডেন সাহেবকে পাদ্যার্ঘ, পুষ্প, বিল্বপত্র প্রভৃতি দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। আর হে ঢেঁকিগণ, মনে করিও না, আমি তোমাদের অযথা নিন্দা করিতেছি। তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি উজ্জ্বল করিতেছ। যে ইংরেজের পদলেহন করিয়া তোমরা সমাজের নিম্নদেশ হইতে এত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছ, সেই ইংরেজের পদলেহনে তোমাদের লজ্জা কি ?

সে যাহা হউক, এই সকল ঢেঁকিরামেরা বাহিরেও যেরূপ ইংরেজ ভক্ত, অন্তরেও সেইরূপ। ইহাঁদের গৃহাদি ইংরেজী ধরণে গঠিত। ইহাঁদের আসন, উপবেশন, ভোজন প্রভৃতিতে ইংরেজীর অনুকরণ। ইহাঁদের স্ত্রীলোকেরা (রংটুকু ছাড়া) ইংরেজী বিবি। এবং এই সকল কারণে এই ঢেঁকিরামেরা হিন্দু সমাজের প্রবলতম শত্রু। সকল দেশেই সমাজের বড়মানুষেরা আপামর সাধারণের আদর্শ স্বরূপ। যখন হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানে, অমায়িক, নিরহঙ্কার, সদাশয়, দেবপূজক, অতিথি-সেবক হিন্দু বিরাজ করিতেন, তখন, হিন্দু সমাজের আপামর সকলেই ঐ সমস্ত মহাপুরুষ দিগের অনুকরণ করিতেন। আর এখন, হিন্দু সমাজের আপামর সকলেই, হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ঢেঁকিরামদিগের অনুকরণ করিতেছেন!

ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমাদের সকলেরই গৃহে ইংরেজী আসন, ইংরেজী ভোজন, ইংরজী বিবি প্রবেশ করিতেছেন। যাহা আমাদের সমাজস্থ তাহা উৎকৃষ্ট হইলেও নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতেছে। যাহা বিলাতী, তাহা নিকৃষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট বলিয়া আদর পাইতেছে। ঢেঁকিরামদের অনুকরণে পবিত্রচিত্ত সৌম্য হিন্দুসমাজ, মদ্য, মাংস ও বেশ্যার আদর করিতেছেন। ঢেঁকিরাম-রমণীদিগের অনুকরণে হিন্দুসমাজের রমণীগণ চিরকালোচিত লজ্জা, বিনয়, শালীনতা, মাধুর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নির্ল্লজ্জা, দাম্ভিকা, নিষ্ঠুরহৃদয়া ও পরুষস্বভাবা হইতেছেন। হিন্দুসমাজ হিন্দুসুলভ গুণ গুলি হারাইয়া ইংরেজসুলভ দোষগুলি অবলম্বন করিতেছেন।

(What of the *Mass*, I have been so long speaking of the ভদ্র লোক)

আমরা এক্ষণে আমাদের প্রবন্ধের ২য় ও মুখ্য অংশের অবতারণা করিব। কি কারণে বা কি গুণে বা কি দৈববলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ আজিও সজীবতার লক্ষণ প্রকটিত করিতেছে এক্ষণে তাহারই অনুসন্ধান করা যাইবে।

১ম। হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ। পৃথিবীতে নানাবিধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মসমূহের সহিত বর্ত্তমান ধর্ম্মসমূহের বিস্তর বিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মযাজক বলিতেন "হে ভাই সকল! তোমরা প্রকৃত ঈশ্বরকে দেখিতে পাও নাই। আমি ও মৎসম্প্রদায়স্থ সকলে প্রকৃত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছি। যদি মুক্তি চাও, অনন্ত স্বর্গভোগ চাও, তাহা হইলে আইস আমাদের ধর্ম্ম অবলম্বন কর। আর যদি নরক ভোগ তোমাদের প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে নিজ ধর্ম্মে থাক।" বর্ত্তমান ধর্ম্মযাজক বলেন—"ভাই সকল ঈশ্বর কি ও কিরূপ তাহা তুমিও জান না আমিও জানি না। সেই অব্যক্ত অনাদি অনন্ত অব্যয় অক্ষয় পুরুষকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রধারণা, ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া বুঝিব কিরূপে? ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমিও যেরূপ অন্ধ, আমিও সেইরূপ অন্ধ। কিন্তু এক কথা তুমি আমি দুই জনেই বুঝিতে পারি। আমরা সকলেই জানি যে, পাপ নরক ও পুণ্য স্বর্গ। পাপ যে নরক, তাহা কি কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয়। পাপানুষ্ঠান করিলেই বুঝা যায় পাপ কি ভীষণ নরক। অতএব পাপ পরিত্যজ্য। আইস ধর্ম্মসাহায্যে, ঈশ্বরসাহায্যে, পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি।" এস্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমান ধর্ম্মযাজক বলিতে বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় বা বঙ্গীয় ধর্ম্মযাজক বুঝিতে হইবে না। কারণ, আমার বোধ হয় ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মযাজকদিগের মৌলিকত্ব নাই। ইয়ুরোপে ধর্ম্মযাজকেরা যে দুই এক গদ্‌ বা ধুয়া ধরেন, ভারতবর্ষেও সেই গদ বা ধুয়া প্রতিধ্বনিত হয়। ইয়ুরোপের বড় বড় পাদ্রীরা (যথা হেনরী বিচার প্রভৃতি) এক্ষণে এই ধুয়া ধরিয়াছেন যে "Creed is nothing" "culture is everything"

অর্থাৎ "ধর্ম্মপ্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশ্বাস নিষ্প্রয়োজন" "ধর্ম্ম হইতে যে মানসিক উন্নতি লাভ করা যায় তাহাই সর্ব্বস্ব।" অর্থাৎ ঈশ্বর ও তাঁহার গুণনিচয় সম্বন্ধে কেহই কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং সে সমস্ত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করা বিড়ম্বনা। ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্য মানসিক উন্নতি। যে ধর্ম্মে মানসিক উন্নতি হয় সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। আর যে ধর্ম্মে মানসিক উন্নতির ব্যাঘাত হয় সেই ধর্ম্মই নিকৃষ্ট। *

যদি ইহাই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্ম কোথায় পাওয়া যাইবে? এত দেবভক্তি, দেবোপাসনা কোন্ ধর্ম্মে পাইবে? শয়নে, উপবেশনে, আহারে, বিহারে, প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে, শয়নকালে আর কোন্ জাতি দেবতার নাম গ্রহণ করিয়া থাকে? হাই তুলিলে, নিশ্বাস ফেলিলে, হঁচোট খাইলে, হাঁচিলে, কাসিলে, অঙ্গস্পর্শ করিলে, কেশস্পর্শ করিলে, আর কোন জাতি দেবতার নাম গ্রহণ করিয়া থাকে? সম্পদে, বিপদে, জন্মকালে, মৃত্যুকালে, স্বাস্থ্যাবস্থায়, রোগে, কোন্ জাতি হিন্দুর ন্যায় ভক্তিভাবে দেবতার নাম স্মরণ করিয়া থাকে? দেবতার প্রতি এত ভক্তি, এত প্রেম, এত অনুরাগ আর কোথায় দেখিতে পাইবে? শূদ্র ব্রাহ্মণের অধীন বলিয়া তোমারা দুঃখ করিয়া থাক। কিন্তু শূদ্র কি ব্রাহ্মণের অধীন? শূদ্র দেবভক্ত। ব্রাহ্মণ দেবসম্পর্কে সম্পৃক্ত বলিয়া শূদ্র তাহাকে ভক্তি করে। আর যে শূদ্রের সেই ভক্তি দেখিয়াছে, সে কি বলিবে যে শূদ্রেব জীবন বৃথায় ব্যয়িত হইয়াছে? ভক্তি সভ্যসমাজের মধুর ফল। যে জাতি আজিও ভক্তি করিতে শিখে নাই, তাহার সভ্যতা আজি সম্পূর্ণ হয় নাই। শূদ্র জমিদার, ব্রাহ্মণ রাইয়ৎ, অথবা শূদ্র রাজা, ব্রাহ্মণ প্রজা। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ ধার্ম্মিক বলিয়া শূদ্র তাহার পদানত। খৃষ্ট পাদ্রীসমাজের উপহাসের স্থল, খৃষ্ট পাদ্রী লর্ডের ভোজনাবশিষ্ট পাইবার জন্য লালায়িত। খৃষ্ট পাদ্রী লর্ডের পদলেহন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ব্রাহ্মণ জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া, জীর্ণ গৃহে বাস করিয়া, এক বেলা এক মুষ্টি কদন্ন ভক্ষণ করিয়াও সহস্রপতি রাজার নিকটেও সম্মাননা প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মের প্রতি এত সম্মান কোথায় দেখিতে পাইবে? যখন খৃষ্টপাদ্রী হিন্দুব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বা অর্থগৃধ্নু বলিয়া নিন্দা করে তখন আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। যিনি নদীতীরে, দ্বিতল হর্ম্ম্যে বাস করেন, চিরকাল ব্যজনানিল ভোগ করেন, যাঁহার পরিচ্ছদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মহামূল্য, যাঁহার গৃহিণী অশ্বযান না হইলে বায়ুসেবন করিতে পারেন না,

* ঢাকাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুযোগ্য আচার্য্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন সাধনার পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনিও বলেন যে প্রাণের উন্নতিই সাধনা। ঈশ্বরের অভাবাত্মক বা স্বরূপাত্মক বর্ণনা সাধনা নহে।

তিনি নির্লোভ মহাপুরুষ! আর, যিনি আজানুলম্বিত বস্ত্র পরিধান করেন, পর্ণকুটীর যাঁহার হর্ম্ম্য, তালবৃন্ত যাঁহার একমাত্র ব্যজনোপায়, যাঁহার গৃহিণী অহর্নিশি ঢেঁকিতে পা দিয়া পরিবারের ভোজনোপায় প্রস্তুত করেন, বৃক্ষস্থ ফল, পুষ্করিণীস্থ লতা পাতা যাঁহার উদর পূর্ত্তির একমাত্র উপায়, যাঁহার দরিদ্র গৃহ ছাত্রবৃন্দে কলকলায়মান, তিনি লোভী, স্বার্থপর অর্থগৃধ্ন! হা ভগবন্! "ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে"! সে যাহা হউক, যিনি হিন্দুসমাজে বাস করিয়া, হিন্দুর স্বভাব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, যিনি ইংরেজী পুস্তক হইতে হিন্দুর চরিত্র প্রভৃতির শিক্ষা করেন নাই, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুর মতি যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোন জাতিরই নহে।

(ক্রমশঃ) শ্রীঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

"ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত, অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ। শ্রীকার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত।" বঙ্গদেশে এত লোক এত নাটক, এত উপন্যাস, এত কাব্য এবং এত অকাব্য লিখিল, অথচ আজি পর্য্যন্ত কেহই বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিয়া বাঙ্গালিকে উপহার দিতে সাহস পাইল না, ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয়। কিন্তু এ দুঃখ যে শীঘ্র ঘুচিবে এমনও ভরসা করা যায় না। ইতিহাস সংকলনের জন্য যে সকল সামগ্রীর আবশ্যক, এদেশে তাহার বড়ই অভাব। তবে এক ভরসা এই, কার্ত্তিক বাবু যেমন কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন, এইরূপ যদি বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য স্থানের বড় বড় রাজবংশ কিংবা ভূম্যধিকারীদিগের ইতিহাস সংকলিত হয়, তবে ভবিষ্যতে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা মূর্ত্তি গঠিত হইতে পারে। এ বিষয়ে কার্ত্তিক বাবুর পরিশ্রম সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় এবং পাঁচজনে তাঁহার অনুকরণ করিয়া ঐ পথের পথিক হন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে ভাল বাসেন, তাঁহারা ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতের আদ্যোপান্ত সমস্ত স্থলেই জানিবার উপযুক্ত অনেক কথা জানিতে পাইবেন।

রাজপুতানার ইতিহাস।

(৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

একাদশ অধ্যায়।

প্রতাপ সিংহ শূন্যগর্ভ রাণা উপাধি গ্রহণ করিয়া মিবারের নাম মাত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজ্যে রাজধানী নাই, ভাণ্ডারে ধন সম্পত্তি নাই, স্বজনগণের মনে ফূর্ত্তি ও উৎসাহ নাই। কিন্তু স্বভাব-তেজস্বী প্রতাপ এক মুহূর্ত্তের জন্যও হীন-সাহস হন নাই। চিতোরের উদ্ধার-সাধন, বংশ মর্য্যাদার পুনরুদ্ধার এবং ক্ষত্রিয়-বলের বিলোপদশার পুনঃসংস্কার প্রভৃতি গৌরবাত্মক কার্য্যকলাপ তাঁহার সর্ব্বদা আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। এবম্বিধ স্বদেশ ও স্বজাতি-বৎসলতার প্রাবল্যে উৎসাহিত হইয়া তিনি বিবিধ প্রতিবন্ধক বিচ্ছিন্ন করত প্রবল শত্রু রণকৌশল-সম্পন্ন আকবরের বিপক্ষে পঞ্চবিংশতি বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই প্রতাপ স্বদেশের ইতিবৃত্ত পাঠ করিতেন, তাহাতে পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ তাঁহার মনে জাগরুক থাকিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিত! তিনি সেই ইতিবৃত্তে ইহাও পাঠ করিয়াছিলেন যে,চিতোর একাধিক বার শত্রুগণের কারাগার স্বরূপ হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার মনে এমন বিশ্বাস হইয়াছিল যে চেষ্টা করিলে দিল্লির অদৃঢ়বদ্ধ সিংহাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া স্বদেশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পুনঃস্থাপন সিদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু সে সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে আকবর ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি সমাসীন থাকিলে প্রতাপ তাঁহার সমস্ত আশাই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। মোগল-কুলতিলক কৌশলী আকবর মিবার করতলস্থ করিবার জন্য যে কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বে প্রতাপ কিছু মাত্রই অবগত হইতে পারেন নাই। যখন আকবরের অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন প্রতাপ সিংহ এককালে চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, মাড়োয়ার, অম্বর ও বিকানীরের অধীশ্বরেরা আকবরের সহিত মিলিত হইয়া স্বজাতির শোণিত-পাতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। এমন কি, কিছুকাল পূর্ব্বে যে বুন্দির অধীশ্বর মিবার-পতির দৃঢ়বদ্ধ সুহৃৎ ছিলেন, তিনিও আকবরের প্রলোভনে স্বজাতি গৌরব বিস্মৃত হইয়া মোগল দলে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার নিজ ভ্রাতা সাগর জিও *

* সাগরজি কান্ধারের দুর্গ ও তদধিকৃত ভূমির আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত-

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপে বংশীয় প্রাচীন রাজধানী ও রাণা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রতাপ একদিনের জন্যও হীনসাহস ও বিচলিত-চিত্ত হন নাই। তিনি সাধ্যমত প্রতিজ্ঞা পালনে ত্রুটি করেন নাই। একাকী, নিঃসহায় প্রতাপ পঞ্চবিংশতি বৎসর কাল ব্যাপিয়া সম্রাটের মিলিত শক্তির সম্মুখীন হইয়া আপনার ভুজবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কখনও পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করিতেছেন, কখনও বা বিপক্ষ-বিনাশ-ব্রতে ব্রতী হইয়া করে করবাল ধারণ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত কলেবরে সমর-ক্ষেত্রে নৃত্য কবিতেছেন। “বাপ্পা রাওলের বংশধরগণ মরণধর্ম্মশীল মানবের নিকট নতশির হইবে” ইহা তিনি নিতান্ত অসহনীয় ব্যাপার মনে করিতেন। তাতার বংশীয়েরা অসংখ্য মানবের উপর আধিপত্য লাভ করুক, তাহাদের প্রবল প্রতাপ সম্মুখে নত হইয়া বৈবাহিক সূত্রছলনায় সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক নির্ম্মল কুলে কলঙ্কপাত করাকে তিনি মনের সহিত ঘৃণা করিতেন।

তাঁহার তৎসাময়িক উজ্জ্বল কীর্ত্তি সমূহ প্রত্যেক উপত্যকা ভূমিতে অদ্যাপি যেন সজীব ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—প্রত্যেক স্বদেশ বৎসল অকপট রাজপুতের হৃদয়ে সে গুলি জাগরূক রহিয়াছে, এবং ইতিবৃত্ত পত্রে সে সমুদায় সমুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি যেরূপ ক্লেশ-সহিষ্ণু হইয়া ঐ সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া সেই সকল ব্যাপার বর্ণন করিতে হইলে অদ্ভুত উপন্যাস হইয়া পড়ে। অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিসংগীতে রাজস্থান প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এখনও সকলে তাঁহার নাম করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে।*

প্রতাপের পক্ষে যে কয়জন সামন্ত ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত নির্ধন অবস্থায় পতিত হইয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ

দীয় বংশধরেরা সগরৌৎ নামে বিখ্যাত। অম্বরেশ্বর শওয়াই জয়সিংহের প্রাদুর্ভাব সময় পর্য্যন্ত সগরৌতেরা কান্ধারে বদ্ধমূল ছিল। জয়সিংহ সম্রাট-সভায় একাধিপত্য লাভ করিয়া তাহাদের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে বদ্ধ হইতে অভিলাষী হইলে, তাহারা জাতীয় গৌরব লোপ আশঙ্কায় সে প্রস্তাব অস্বীকার করে। ইহাতে জয়সিংহ ক্রোধপরবশ হইয়া তাহাদিগকে কান্ধার হইতে অধিকারচ্যুত করেন। জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি রণবিশারদ দুর্দ্ধর্ষ মহাবেত খাঁ একজন সগরৌৎ ছিলেন। তাহারা কান্ধারে অধিকারচ্যুত হইয়া মধ্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। মহাবেত সাগরজির পুত্র।

* মহামতি কর্ণেল টড কহেন যে তিনি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া প্রতাপের কীর্ত্তিনিকেতন স্বরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহ দর্শন করত জয়মল্ল ও পত্তুর বংশধরগণের সহিত সেই সকল বীর-কীর্ত্তির আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহারা সেই সকল ব্যাপার বর্ণন সময়ে অশ্রুপ্রবাহে ভাসমান হইয়াছিল।

করেন নাই। এই দুঃসময়ে প্রতাপকে পরিত্যাগ করা যে ঘোরতর বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্য তাহা তাঁহাদের মনে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। জয়মল্লের পুত্রগণও পত্তুর বংশধরবর্গ, রণক্ষেত্রে প্রতাপের নিরন্তর সহকারিত্ব করিয়াছে। বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে সালুমব্রা অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রতাপের এই দুঃসময়ের পঞ্চবন্ধুব কীর্ত্তিকলাপ মিবারের ইতিবৃত্ত-পৃষ্ঠে উজ্জল বর্ণে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। কতিপয় নিম্নশ্রেণীস্থ অধ্যক্ষ ও সামন্ত প্রতাপের দুঃসময়ে দ্রবচিত্ত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করত যুদ্ধে জীবনদানে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইহাদিগের মধ্যে দৈবলবর সামন্তই সর্ব্বপ্রধান। ক্রমে ক্রমে তিনি রাণার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন।

চিতোরের দারুণ দুর্দ্দশা * চিরস্মরণীয় করিবার জন্য মহারাণা প্রতাপসিংহ সমস্ত আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উত্তরাধিকারীগণকেও তদনুরূপ ব্যবহার পরম্পরার আচরণে অনুরোধ করিয়া যান। চিতোরের হতগৌরব পুনরুদ্ধার পর্য্যন্ত তাঁহারা এবম্বিধ ব্যবহার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সুবর্ণ ও রজত ভোজনপাত্রের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্রে তাঁহারা ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন, তৃণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন এবং অশৌচ ধারণের ন্যায় শ্মশ্রু বৃদ্ধির অনুমোদন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর পতন-পরিচয় বিশদরূপে প্রদান করিবার জন্য রাণা আদেশ করিয়াছিলেন যে, যে রণদামামা সৈন্যশ্রেণীর পুরোভাগে বাদিত হইত তাহা অদ্যাবধি পশ্চাৎভাগে বাজিতে থাকিবে। হীনাবস্থার পরিচায়ক এই রীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্মশ্রু রাখা তদবধি এক প্রকার প্রচলিত রীতি হইয়া পড়িয়াছে। যদিও এখন বর্ত্তমান রাণারা সুবর্ণ ও রজতপাত্রে ভোজন ও দুগ্ধ-ফেননিভ উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তথাপি তখনকার সেই হীনদশা ও স্বদেশবৎসল প্রতাপের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ভোজন পাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র ও শয্যার নিম্নে তৃণরক্ষা করিয়া থাকেন।

প্রতাপ সর্ব্বদাই বলিতেন “ যদি উদয় সিংহ জন্মগ্রহণ না করিতেন, অথবা সংগ্রাম সিংহ ও তাঁহার সময়ের মধ্যে আর কেহই মিবার সিংহাসনে আরোহণ না করিতেন, তাহা হইলে কোন তুর্কীই রাজস্থানে আপনাদের অভ্যুদয় বিস্তার করিতে পারিতেন না। ” এ কথার এক কণিকাও মিথ্যা নহে। এ সময়ে হিন্দুসমাজ এক প্রকার নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল ; গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী ভগ্নরাজ্য সমূহ দিন দিন নিস্তব্ধভাবে উন্নতশির হইয়া সাধারণের গণনা মধ্যে আসিতে লাগিল ; অম্বর ও মাড়োয়ার ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল ;

---

* চিতোরের এই ধ্বংশ অবস্থাকে রাজপুত কবিগণ ‘ চিতোর নগরীর বৈধব্যদশা ’ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিধবাগণ যেরূপ অলঙ্কারাদি ধারণ করেন না, চিতোরও সেইরূপ বিলুপ্তশোভা হইয়াছিল। উপমাটী সুন্দর!

এমন কি সিংহবিক্রম শের সাহের বিপক্ষে মাড়োয়ার পতি একাকী অস্ত্রধারণে সক্ষম হইয়াছিলেন; এদিকে আবার চর্ম্মন্বতী নদীর উভয় তীরবর্ত্তী অতি ক্ষুদ্রতম জনপদসমূহ ক্রমে ক্রমে পরিচয়ীভূত জনস্থানে পরিণত হইয়া নিজ নিজ সামন্তের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এবম্বিধ সময়ে এক জন রণপণ্ডিত সুকৌশলসম্পন্ন রাজ্যনেতা উপস্থিত হইয়া ঐসকল উদিত ও উদয়োন্মুখ সামন্তের সহকারিত্বে যে মুসলমান-করকবলিত ভারতীয় রাজদণ্ডের উদ্ধার সাধন করিতে পারিত, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সংগ্রাম সিংহ একজন সেইরূপ নেতা। তাঁহার বংশমর্য্যাদা, রণপাণ্ডিত্য, রাজনীতিকৌশল, প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহে, হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভারতীয় জনগণের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাঁহার ইঙ্গিতে সমস্ত ভারত রণমদে মাতিতে পারিত। এরূপ অধিরাজের আদেশমতে কার্য্য করিতে কোন সামন্তই হীনপ্রভ হইতেন না। তাঁহারই পৌত্র সেইরূপ নেতৃত্বগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। যদি মধ্যে উদয়ের উদয় না হইত অথবা দিল্লির সিংহাসনে আকবর অপেক্ষা লঘুচিত্ত ও হীনবীর্য্য ব্যক্তির আবির্ভাব হইত তাহা হইলে ভারতভাগ্য এরূপ বিপর্য্যস্ত হইত না।

কতিপয় বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সামন্তের সহিত একমত হইয়া প্রতাপ রাজ্যনীতির পুনঃসংস্কার করিলেন। নব নব সনন্দ প্রদত্ত হইল। তৎকালীন রাজধানী কমলমের ও গোগুন্দা নগরী দৃঢ়রূপে দুর্গবদ্ধ করা হইল। অন্যান্য গিরিদুর্গ গুলি সংস্কৃত হইতে লাগিল। রণ-বিষয়ে অক্ষম ব্যক্তিবর্গ রাণার আদেশে পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই দীর্ঘকালব্যাপী সমর-সময়ে বনাশ ও বেরিশ নদীর মধ্যবর্ত্তি উর্ব্বর প্রদেশ আরাবলী হইতে পূর্ব্ব মালভূমি পর্য্যন্ত যেন মরুভূমি সদৃশ জ্ঞান হইত;—সন্ধ্যার দীপমাত্র প্রজ্বলিত হইত না। *

প্রতাপ তাঁহার এই কঠোর আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কখন কখন নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কতিপয় অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া দেখিতেন, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে কি না। মালভূমি মরুর ন্যায় নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছে, ক্ষেত্র সমূহ শস্যের পরিবর্ত্তে তৃণগুল্মাদিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে; রাজপথ-সমূহ কণ্টকী বাবল বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়াছে, প্রকৃতি-পুঞ্জের সুরম্য বাসস্থান হিংস্র পশুগণের আশ্রয়-ভূমি হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে কেবল ধ্বংসের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নেত্র-গোচর হইত না, জলশূন্য মরুভূমি দৃষ্টি-কেন্দ্র পর্য্যন্ত ধূ ধূ করিতে দেখা যাইত। জনৈক মেষপালক "কে আর তাহাকে দেখিতে পাইবে" ভাবিয়া চণ্ডালের ক্ষেত্রে পশুচারণ করিতেছিল। কতিপয় প্রশ্ন করায় সে কোন সদুত্তর দানে সমর্থ হইল না, তৎক্ষণাৎ তাহার সংহার সাধন করিয়া বৃক্ষে এই ভাবিয়া তাহার মৃতদেহ লম্বমান করা হইল, যেন অপর কেহ রাণার আদেশ

* বেচেরাগ (be cherag) without a lamp.

এরূপে অবহেলা না করে। ফলতঃ প্রতাপ রাজস্থানের উর্ব্বর ক্ষেত্র সমূহের এরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন যে তাহা বিজয়ীদিগের চক্ষে যেন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় অসার পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে ইউরোপের সহিত মোগলদিগের যে বাণিজ্য চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সৌরাষ্ট্র বা অন্যান্য বন্দর হইতে মিবারের মধ্য দিয়া চালিত হইত। প্রতাপ সদলে তাহা লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আকবর রাজস্থানের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া আজমীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের দ্বাবিংশ সংখ্যক সুবার মধ্যে এই বিখ্যাত আজমীর দুর্গও পরিগণিত ছিল, এক্ষণে ইহা কিছু দিনের জন্য রাজকীয় সমর ভাণ্ডাররূপে পরিণত হইল। মাড়োয়ারের মল্লদেব যিনি শের সাহের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া বীরত্বের একশেষ দেখাইয়াছিলেন, তিনিও অম্বরেশ্বর ভগবান দাসের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আকবরের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতাপের রাজ্য প্রাপ্তির দুই বৎসর পরে সাহসিকতার সহিত মৈর্ত্তা ও যোধপুর রক্ষায় অসমর্থ হইয়া মল্লদেব স্বীয়পুত্র উদয়সিংহকে আকবর সমীপে প্রেরণ করেন। আকবর আজমীর গমনসময়ে পথিমধ্যে নাগোর নগরে উদয়কে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে এই ব্যাপার সম্পাদিত হয়। মণ্ডরের রাও এক্ষণে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মাড়োয়ার রাজপুত্র অতিশয় স্থূলকলেবর ছিলেন বলিয়া সকলে তাহাকে "মোটা" বলিয়া সম্বোধন করিত। এই সময় হইতেই কান্যকুব্জেশ্বরেরা মোগল সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন। এই উদয়সিংহের দ্বারাই প্রথমে নির্ম্মল রাঠোর কুলে কলঙ্ক লেখা অর্পিত হইল। ইনিই জাঁহাঙ্গীরকে যোধ বাই * নাম্নী অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনার বিষয় সম্পত্তি দ্বিগুণিত করিয়া লইলেন। † অম্বর ও মাড়োয়ারের দৃষ্টান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণ লুব্ধ হইয়া দিল্লীশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বন্ধন পূর্ব্বক স্ব স্ব অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত করিয়া তুলিতে লাগিল। মোগল ইতিহাসবেত্তারা ইহাঁদিগকে সম্রাট সিংহাসনের দৃঢ়বদ্ধ স্তম্ভ ও অলঙ্কার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

প্রতাপ দেখিলেন, বুঁদী ভিন্ন প্রায় সমস্ত রাজপুত্র রাজেরা মোগল হস্তে জাতীয় গৌরব সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে স্বদেশীয়

* আগ্রার নিকট সেকন্দ্রায় আকবরের জগদ্বিখ্যাত সমাধি মন্দির আছে, তাহারই নিকটে সা জাহান জননী যোধ বাইয়ের অতিসুন্দর সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে।

† মাড়োয়ার-পতি উদয়সিংহ যোধ বাই বিনিময়ে চারিটী প্রদেশ প্রাপ্ত হন, তাহাদের নাম ও বার্ষিক উপস্বত্ব এই;—গড়বার ৯,০০,০০০ নয়লক্ষ টাকা; উজ্জয়িনী ২,৪৯,৯১৪ দুইলক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার, নয়শত চৌদ্দ; দেবলপুর ১,৮২,৫০০ একলক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত; বুদনাকর ২,৫০,০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

ও স্বজাতীয় লোকেই তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু ইহাতেও তিনি বিচ্যুত-বীর্য্য বা হীন-সাহস হন নাই। জাতিগৌরবের নিকট তিনি নিজ জীবনকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন। তিনি দিল্লী, পত্তন, মাড়োয়ার ও ধারের অতি প্রাচীন রাজবংশীয় সামন্তগণকে সযতনে আপনার সম্প্রদায় ভুক্ত করিলেন। প্রতাপ ও তাঁহার বংশধর গণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি গৌরবের বিষয় হইতে পারে যে, মোগল রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনাদিগের মান মর্য্যাদা ও বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই যে কেবল তৃপ্ত ছিলেন এমন নহে, অম্বর ও মাড়োয়ারের কুলাঙ্গার নরপাল দিগের সহিত অমিশ্র ও বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন? উক্ত কলঙ্কিত কুলদ্বয়-সম্ভূত মান-মর্য্যাদা সম্পন্ন বল-বীর্য্য-সম্পত্তিশালী বক্তসিংহ ও জয়সিংহ আপনারাই লিখিয়া গিয়াছেন যে, যখন তাঁহারা সম্রাট-প্রদত্ত মান সম্ভ্রমে ভারতীয় রাজন্য বর্গের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং মিবার-সূর্য্য দিন দিন অস্তমিত হইতেছে, তখন তাঁহারা রাণার নিকট পূর্ব্বরূপ মান-মর্য্যাদা ও সম্বন্ধ-বন্ধন নিবন্ধন বার বার প্রার্থনা করিয়াও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রকৃত রাজপুতের উপযোগী সম্মান প্রাপ্ত হইতেন না, রাণার নিকটে তাঁহারা "জাতিভ্রষ্ট" "পতিত" ইত্যাদি ঘৃণাসূচক অভিধানে অভিহিত হইতেন। হিন্দুসমাজে এখন আর এরূপ জাতিগৌরব নাই, সমাজ-শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অতি উত্তর কালে তাঁহারা রাণাবংশীয় কন্যা গ্রহণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ পণ নির্দ্ধারিত ছিল যে, অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যমানেও রাণাবংশীয়া কন্যার গর্ভসম্ভূত পুত্রই রাজসিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইবে।

পরবর্ত্তী ঘটনার অত্যন্ত অনুকূল বলিয়া এস্থানে একটি জাত্যভিমান-ঘটিত বৃত্তান্ত বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে। ভগবান দাসের পর সুবিখ্যাত মানসিংহ অম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন; প্রকৃতপক্ষে, মানসিংহ হইতেই অম্বরের অভ্যুদয় গণিত হইয়া থাকে। বাবর নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্য রাজস্থানপতিদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিবার যে কৌশল অবলম্বন করেন, মানসিংহ সেই কৌশলের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর মানভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। মানসিংহ আকবরের প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। তাঁহার বিবিধ সদ্গুণ ও বীরত্ব দেখিয়া আকবর তাঁহাকে যারপর নাই সমাদর করিতেন। সেনাপতিগণ মধ্যে তাঁহারই অত্যন্ত প্রভুত্ব হইয়াছিল। বলিতে কি, আকবরের সময়ে তিনি একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারই ভুজবীর্য্যে আকবর এতদূর অধিকার বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কচবহ কবিগণ সানন্দে মানের বিজয়গীত গান করিয়া বেড়াইত। কাবুল হইতে আরাকান, হিমালয় হইতে কুমারী, এই চতুঃসীমার মধ্যে প্রায়

সর্ব্বস্থানেই আকবরের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, মানসিংহের ভুজবলই তাহার প্রধান কারণ। রাজপুতসেনা ও সেনাপতি রাজা মানসিংহ কর্তৃক আকবর ভারতে পরাক্রান্ত রাজগণকে অবনত করিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুগণের চিত্তভূমি অধিকারের কৌশল আকবর অতি সুন্দররূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন। যে অসাধারণ কৌশলবলে তিনি বিজিত রাজগণের নিকট হইতেও আন্তরিক ভক্তি আকর্ষণ করিতেন, সেই কৌশল শক্তির বার বার ধন্যবাদ করিতে হয়।

মানসিংহ শোলাপুরে বিজয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ মানসে কমলমেরুতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রতাপ উদয় সাগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। এই সরোবরতীরেই মানসিংহের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত হইল। রাণাপুত্র অমরসিংহ তথায় উপস্থিত রহিলেন। মানসিংহ আহার করিতে বসিয়া দেখিলেন, রাণা তথায় উপস্থিত নাই, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অমরসিংহ কহিলেন, মহারাণা শিরঃপীড়ায় অতিশয় কাতর হইয়া আসিতে পারিলেন না, কহিয়া দিলেন, রাজা মানসিংহ যেন কিছু মনে না করিয়া আহারাদি করেন। রাজা মানগর্ব্বিত স্বরে কহিলেন, "রাণার শিরঃপীড়ার ছলনা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু সে ভ্রম আর সংশোধিত হইবার নহে, তিনি যদি আমার সমক্ষে ভোজন পাত্র সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হন, তবে আর কে করিবে?" রাণা প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন, "যে রাজপুত তুর্কিকে ভগিনী সম্প্রদান ও সম্ভবত তাহার সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছে, রাণা সেই জাতিচ্যুত রাজপুতের সহিত একত্রে কখনই আহার করিতে পারেন না।" মানসিংহ অন্ন স্পর্শ করিলেন না, কেবলমাত্র অন্নদেবের উদ্দেশে দুই চারিটি অন্ন লইয়া উষ্ণীষ সীমায় * বন্ধন করত গমনোদ্যত হইয়া কহিলেন, "তোমাদের গৌরব ও সম্মান রক্ষার জন্যই আমরা আপনাদিগের কুলমর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছি; এখন যদি তোমরাই আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার কর তবে কখনই সুখে থাকিতে পারিবে না, শীঘ্রই অধিকার চ্যুত হইবে।" মান অশ্বারোহণ করিয়া গমন সময়ে সম্মুখে মহারাণাকে দেখিতে পাইলেন। প্রতাপ তাঁহার আকস্মিক বিদায় নিবারণের চেষ্টায় আসিতেছিলেন। মানসিংহ ক্রোধবিকম্পিত স্বরে প্রতাপকে কহিলেন "আমি যদি তোমার এই দর্প চূর্ণ করিতে না পারি তবে আমার নাম মানসিংহ নহে।" প্রতাপ গর্ব্বিতস্বরে কহিলেন, "তুমি রণসজ্জায় আসিলে আমি সানন্দে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব;

* আহার করিতে বসিয়া প্রথমে দেবতার প্রতি নিবেদন করিয়া দেওয়া কেবল যে হিন্দুদিগেরই রীতি এমন নহে, গ্রীক ও অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যেও এরূপ রীতি প্রচলিত আছে। অন্নদেব—the god of food

কিন্তু তোমার আকবর ফোপাকে * সঙ্গে আনিতে বিস্মৃত হইও না।'' মানসিংহ চলিয়া গেলেন। যে পাত্রে তাঁহার আহার্য্য পরিবেশিত হইয়াছিল, অশুচি হইয়াছে বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন করা হইল; সেখানে তিনি বসিয়াছিলেন, সেস্থান অপবিত্র জ্ঞানে গঙ্গাজলে ধৌত করা হইল; সে যে সামন্ত তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা মানের সংস্পর্শে আপনাদিগকে অশুচি বোধে স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। এই ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক আকবরের কর্ণগোচর হইলে তিনি আপনাকে যারপরনাই অপমানিত বোধ করিলেন। হিন্দুর সামাজিক আচার ব্যবহার অনেকাংশে শিথিলশাসন হইয়াছে বলিয়া আকবরের মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, এই ঘটনায় সেই বিশ্বাস কিয়দংশে অপনীত হইল। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য হল্‌দিঘাটের সুবিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাণা প্রতাপসিংহ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মিবারের হল্‌দিঘাট কখনও বিস্মৃত হইবার নহে।

আকবর যুবরাজ সেলিমের (জাহাঙ্গির) উপর এই যুদ্ধের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ এবং সাগরজির ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্র মহাবেত্‌ খাঁ উভয়ে সেলিমের পরামর্শদাতা সহায় রূপে তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিলেন। মিবারের পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রতি প্রতাপের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল; তিনি দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত সেনার সহিত নির্ভয়ে সমর-সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। নূতন রাজধানীর চারিদিকে বহু দূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতময়। উত্তর দক্ষিণে কমলমের হইতে রিকমনাথ পর্য্যন্ত প্রায় চত্বারিংশ ক্রোশ দীর্ঘ; পশ্চিমে মীপুর হইতে পূর্ব্বে সমতোল্লা পর্য্যন্ত প্রস্থ পরিমাণও প্রায় চত্বারিংশ ক্রোশ হইবে। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ কেবল পর্ব্বত, বন, উপত্যকা ও নদী সমূহে সমাচ্ছন্ন। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমের যে কোন স্থান হইতে রাজধানী যাইবার প্রশস্ত পথ নাই, যে পথ আছে তাহা নিতান্ত সংকীর্ণ; তাহার উভয় পার্শ্বে লম্বভাবে পর্ব্বত সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে; মধ্য দিয়া দুই খানি শকটও যাতায়াত করিতে পারে না। ইহা প্রকৃত পক্ষে গিরিসঙ্কট ভিন্ন আর কিছুই নহে। পথের প্রবেশ-মুখ প্রশস্ত বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া রেখামাত্রে পরিণত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিণামে ঘোরতর বিপদে পতিত হইতে হয়। হল্‌দিঘাট এবম্বিধ দুর্গম প্রদেশ। ইহার প্রবেশ পথেই পর্ব্বত এরূপ ভাবে রহিয়াছে যে উপত্যকা ভূমিতে কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারা যায় না। অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় দুর্গম। এই পর্ব্বতের উপর ও নিম্ন ভাগে রাজপুতসেনা সমাবেশিত ছিল। যে সকল গিরিচূড়া হইতে সমর-

* পিতৃষস্বপতিকে চলিতভাষায় পিসা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় ফোপা বলে।

ক্ষেত্র স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, তদুপরি চির-বিশ্বাস-ভাজন ভীলেরা ধনু ও তীর লইয়া সু-সজ্জিত ছিল; তাহারা অতি বৃহৎ প্রস্তর-পিণ্ড সকল এরূপ ভাবে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, বিপক্ষ পক্ষ তাহার নিম্ন ভাগে আসিলেই তাহারা সেই পিণ্ড গড়াইয়া দেয়, তাহাতে বহুতর শত্রুর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে।

মিবারের বীরপ্রধান সামন্তগণ সমভি-ব্যাহারে প্রতাপ এই পার্ব্বত্যপথমুখে অবস্থিত থাকিয়া শত্রুপ্রবেশ নিবারণ করিতেছেন। দলে দলে রাজপুতবীর আসিয়া প্রতাপের সাহচর্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। যে দিকে যখন যুদ্ধের ঘোরতর আড়ম্বর দৃষ্ট হইতেছে, সেখানেই রক্তচ্ছত্রশোভিত প্রতাপমুকুট শত্রুবিনাশে তৎপর বজ্রমুষ্টি দেখিয়া রাজপুতগণ উৎসাহে সমরাঙ্গণে নৃত্য করিতেছে। প্রতাপ মানের দর্প চূর্ণ করিবার আশয়ে চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু একবারও সেই কুলাঙ্গারকে সম্মুখে পাইলেন না। সে সময়ে সেই নরাধম কুলপাংশুলের সাক্ষাৎ পাইলে তিনি তাহাকে বিলক্ষণ শিক্ষাদান করিতে পারিতেন। এইরূপে তাঁহার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে করী-পৃষ্ঠে সেলিম বিদ্যমান থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, একবারে প্রতাপ সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সেলিমের রক্ষিবর্গ প্রতাপের ভুজবলে বিগতপ্রাণ হইল; সেলিম হস্তী-পৃষ্ঠে নিঃসহায়—প্রতাপ বল্লম চালনা করিলেন, যদি লৌহপত্রে সেলিমের চতুর্দ্দোল সমাচ্ছাদিত না হইত, তবে সেই মুহূর্ত্তে আকবর উত্তরাধিকারী-শূন্য হইতেন। প্রতাপের লক্ষ্য কখনই অব্যর্থ হইত না। এই ব্যাপারের চিত্র কি চমৎকারজনক! প্রতাপের সুবিখ্যাত অশ্ব চৈতক প্রভুর ন্যায় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। রাজপুতানার ঐতিহাসিক চিত্রে এই আলেখ্য দর্শন করিলে চমৎকারসংবলিত আনন্দরসে নিমগ্ন হইতে হয়! চৈতকের এক পদ সেলিমের হস্তীপৃষ্ঠে অর্পিত হইয়াছে, প্রতাপ শত্রু লক্ষ্য করিয়া বল্লম ধরিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন্ পুণ্যফলে যে সেলিম সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন, বলিতে পারি না; অথবা ভারতের রাজলক্ষ্মী নিবাসভূমির প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছেন বলিয়াই সেলিম প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হস্তীপক বিনষ্ট হইল, হস্তী অস্ত্রাঘাতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অপ্রতিহতবেগে পলায়ন করিল, সেলিম সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সেলিমকে রক্ষা করিবার জন্য মোগলসেনা ধাবমান হইতেছে, এদিকে আবার প্রতাপের সাহচর্য্যে রাজপুতগণ আসিয়া মিলিত হইতেছে। এই ব্যাপারে প্রতাপ সাতটি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। —তিনটি তরবারির, একটি গুলির আর তিনটি বল্লমের আঘাত। রণক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও প্রতাপ রাজচ্ছত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। ঐ রাজচ্ছত্র লক্ষ্য করিয়াই শত্রুগণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহারই বধসাধনে সযত্ন হইতে লাগিল। প্রতাপ তিন বার শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া-

ছিলেন। একবার তিনি শত্রুমধ্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন প্রায় হইতেছেন দেখিয়া পরম বিশ্বাসভাজন ঝালাসামন্ত আপন জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে বিপমুক্ত করিয়াছিলেন। ঝালাসামন্ত মানা মিবারের রাজচ্ছত্রে স্বীয় মস্তক শোভিত করিয়া ঘোরতর সমরসঙ্কটের সম্মুখীন হইলে শত্রুগণ তাঁহাকেই মহারাণা জ্ঞানে সবলে আক্রমণ করিল; মানার বীরসহচরেরা তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মহারাণাকে কৌশলে রণভূমি হইতে অপসারিত করা হইল। ঝালা সামন্ত স্বদল সমভিব্যাহারে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এবম্বিধ রাজভক্তি অতিশয় বিরল! এই অলৌকিক ব্যাপার চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাণা ঝালাসামন্তকে রাজচিহ্ন প্রদান করিলেন; মানার উত্তরাধিকারী রাণার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইলেন। তাঁহারা রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রাসাদদ্বারে নহবৎ বাদ্যের আদেশ পাইলেন। অদ্যাপি রাজপ্রসাদলব্ধ মাদ্রী প্রদেশ তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। ঝালাসামন্ত প্রাণ দিয়াও সে দিনের মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। মুসলমানদিগের বিপুলসেনাতরঙ্গে দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত জলবুদ্বুদ মাত্র। হল্‌দিঘাট রক্ষায় যে দ্বাবিংশ সহস্র সংখ্যক রাজপুত সমবেত হয়, তাহার মধ্যে আট সহস্র মাত্র জীবিত ছিল।

চৈতকারোহী প্রতাপ একাকী একদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চৈতক সমস্ত দিন তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও কর্ত্তব্য বিষয়ে তাহার অবহেলা নাই। তাঁহার পশ্চাতে দুই জন মোগল সামন্ত ধাবিত হইয়াছে দেখিয়া প্রতাপ প্রবলবেগে অশ্বচালনা করিলেন। চৈতকও স্বীয় প্রভুর ন্যায় ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াছে—ক্রমে ক্রমে সে শ্লথগতি হইল, এমন সময়ে পশ্চদ্বর্ত্তী অশ্বারোহী প্রতাপকে সম্বোধন করিয়া কহিল "হো নীলা ঘোড়াকা আশোয়ার!" প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, দুই জনের পরিবর্ত্তে একজন মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে—দেখিয়া চিনিলেন, সে আর কেহই নহে, তাঁহারই ভ্রাতা শুক্তসিংহ।

প্রতাপের সহিত শত্রুতা নিবন্ধন শুক্তসিংহ মিবার পরিত্যাগ করিয়া মোগলদরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দূর হইতে শুক্ত দেখিলেন, নীলাশ্ব বেগে পলায়ন করিতেছে। অশ্ব দর্শনেই তিনি জানিতে পারিলেন, প্রতাপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পলাইতেছেন। অমনি তাঁহার হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল, সমস্ত শাত্রবতা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। দেখিলেন, প্রতাপকে ধরিবার জন্য কয়েকজন ধাবিত হইয়াছে, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, পশ্চাতে প্রবল বেগে অশ্বচালনা করিলেন; প্রতাপকে ধরিবার জন্য নহে, কেবল পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রু নিবারণের জন্য পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুগণ শুক্তহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। জীবনের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের এই স্নেহালিঙ্গন হইল। এইখানে চৈতক পড়িয়া গেল, শুক্ত নিজের উঙ্কার্ নামক অশ্ব প্রতাপকে অর্পণ করিলেন;

রাণা চৈতকের সজ্জা উষ্কারুপৃষ্ঠে স্থাপন করিতে করিতে চৈতকের মৃত্যু হইল। অদ্যাপি সেই স্থানের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই থানে চৈতকের সমাধিমন্দিব * প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজধানীর অনেক গৃহ-প্রাচীরে এই সুন্দর চিত্র আলেখিত আছে।

বলা বাহুল্য যে ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নেহালাপ অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল। "সুযোগমতে সাক্ষাৎ হইবে" এই কথা বলিয়া শুক্তসিংহ মোগলশিবিরে চলিয়া গেলেন। শুক্ত সেলিমের নিজ সেনামধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। শুক্ত সেলিমের নিকট কহিলেন যে প্রতাপ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত অশ্বারোহীগণেব বধসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার উষ্কারু নামক প্রিয়তম অশ্বটিরও প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। সুতরাং শুক্ত নিরুপায় হইয়া মৃত খোরাসানীর অশ্বে আরোহণ করত প্রাণ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। রাজকুমার সেলিম এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া শুক্তকে কহিলেন, "সত্য কথা কহিলে তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিব।" শুক্ত তখন নির্ভীকচিত্তে কহিলেন, "একটি রাজ্যের সমস্ত ভার আমার ভ্রাতার উপর পড়িয়াছে, সেই ভ্রাতার বিপদে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না।" সেলিম তাঁহাকে কিছুমাত্র না বলিয়া কেবল নিজ সেনাদল হইতে অপসৃত হইবার আদেশ করিলেন। শুক্ত পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত নজরাণা স্বরূপে ভিনসোর প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতাপও তাঁহাকে জায়গীর দিলেন, বহুকাল শুক্তবংশীয় শুক্তবতেরা তথায় বাস করিয়াছিল। † শুক্ত খোরাসান ও মূলতানের সামন্ত বধ করিয়া প্রতাপের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া রাজপুতকবিগণ কর্ত্তৃক তদীয় নামে "খোরাসানী মূলতানীকা আগল" ‡ এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছিল।

সংবৎ ১৬৩২ শ্রাবণ সুদী সপ্তম দিবস (জুলাই ১৫৭৭ খৃঃ অঃ) মিবার ইতিবৃত্তের একটী স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য; হলদিঘাট ক্ষেত্র ঐ দিনে মিবারের উৎকৃষ্ট শোণিত-পাতে প্লাবিত হইয়াছিল। নিকটসম্পর্কীয় পাঁচ শত রাজপুত্র জীবলীলা সম্বরণ করেন; গোয়ালিয়রের বিদূরিত রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রামসাহ ও তদীয় পুত্র খণ্ডিরাও ¶ সার্দ্ধত্রিশত সা-

* জাড়োলের নিকট "চৈতকৃকা চবুতারা।"

† শুক্তের জননীকে সকলে 'বাইজীরাজ' (Royl mother—Queen Dowager) বলিত। তিনি শুক্তকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন বলিয়া উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিনসোরে গিয়া সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। স্নেহের অনুরোধে পদগত মান মর্য্যাদা ত্যাগ করার ইহা একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। ইহাই স্মরণ রাখিবার জন্য শুক্তবতের জ্যেষ্ঠশাখার জননীগণ 'বাইজিরাজ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

‡ The barrier to khorasan and Mooltan.

¶ গোয়ালিয়র-রাজ রামশাহ বাবর কর্ত্তৃক রাজভ্রষ্ট হইয়া স্বদল সমভিব্যাহারে মি-

হস্তী তুয়ার সহচর সমভিব্যাহারে রণযজ্ঞে জীবনাহুতি প্রদান করিলেন ; সার্দ্ধশত সহচর সহিত ঝালা প্রাণত্যাগ করিলেন ; বলিতে কি, মিবারে এমন গৃহ ছিল না, যে কোন না কোন আত্মীয়ের জন্য অশ্রুবর্ষণ করে নাই।

জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া সেলিম পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা যুদ্ধের উপযুক্ত সময় নয় বলিয়াই প্রতাপসিংহ কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিলেন। বর্ষার অপগমেই শত্রু আসিয়া দেখা দিল, প্রতাপ পুনরায় পরাজিত হইয়া কমলমেরুতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।* কোকা সাবাজ খাঁ ঐ দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু প্রতাপ অতিশয় সাহসিকতার সহিত দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। আবুর বিশ্বাসঘাতক দেওরা সামন্তের উপদেশে সাবাজ খাঁ কমলমেরুর 'নগুণ' কূপে অপবিত্র কীট পতঙ্গ নিক্ষেপ দ্বারা তদীয় বারি অস্পৃশ্য করিয়া তুলিলে প্রতাপ দুর্গত্যাগ করিয়া চাওণ্ড নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য সোনিগরুরা সামন্ত তাঁহার প্রবেশ নিবারণের অনেক চেষ্টা করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়। এই ব্যাপারে রাজকবি বিগতজীবিত হন। এই কবির উৎসাহপূর্ণ সুললিত কবিতা শ্রবণে রাজপুতগণ রণোল্লাসে মাতিয়া উঠিতেন।

কমলমেরুর পতনে ধর্ম্মেতী ও গোগুন্দার দুর্গ মানসিংহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। মহাবেত খাঁ উদয়পুর অধিকার করিলেন। খাঁ ফরিদ চপ্পন অধিকার করিয়া ক্রমে ক্রমে চাওণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপ এককালে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন বটে কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও হীনসাহস হন নাই। বন হইতে বনান্তরে, গুহা হইতে গুহান্তরে পলাইয়া বেড়াইতেছেন, আবার মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য সঙ্কেতে সহচর সংগ্রহ করিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা শত্রু সংহার করিতেছেন। একদা তিনি কোন গিরিসঙ্কটে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া খাঁ ফরিদ তাঁহাকে বন্দী করিবার মানসে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সহচরবর্গের নিকট গিরিসঙ্কটের পথ বিলক্ষণরূপে পরিচিত, তাহারা অনায়াসে সরিয়া গেল, ফরিদ স্বীয় সম্প্রদায় সহ তন্মধ্যে বন্দী হইল। তাহারা পলাইতে না পারিয়া প্রায় সকলেই প্রতাপের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। মধ্যে মধ্যে প্রতাপ এই রূপে বিপুল শত্রুর প্রাণবিনাশ করিতে লাগিলেন। মুসলমান দিগের এসকল পথ পরিচিত ছিল না, কোন্ সময়ে প্রতাপ আসিয়া তাহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিবে এই ভাবিয়াই তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অলক্ষিত ভাবে শত্রু আসিয়া সর্ব্বনাশ করিবে এই ভয়ে তাহারা নিতান্ত ব্যস্ত হইল। আবার বর্ষা আসিল, কিছুদিনের জন্য তাহাদেরও ভয়

বারের রাণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাণা তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য ৮০০ আটশত টাকা দৈনিক বৃত্তি অবধারিত করিয়া দেন।

* সম্বৎ ১৬৩৩—মাঘসুদী সপ্তম (১৫৭৭ খৃঃ অঃ)

ঘুচিল, প্রতাপও বিশ্রামের সময় পাইলেন।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, তাহাতে প্রতাপের দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল ভিন্ন তাঁহার উবস্থা উন্নতির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। ক্রমে ক্রমে তিনি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তিনি আত্মীয় পরিজনের ভাবনায় নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। পাছে তাহারা বন্দী হয়, এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইলেন। একবার কাভার বিশ্বাসী ভীলেরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা রাণার পরিজনবর্গকে বিপদে পতিত দেখিয়া ঝাঁপীতে বসাইয়া গোপনে লইয়া যায় এবং জাওরার টীন খনির নিকট রাখিয়া তাহাদের লালন পালন দ্বারা জীবন রক্ষা করে। অদ্যাপি জাওরা ও চাওণ্ডের বনবৃক্ষ-শাখায় লৌহ কীলক গ্রেথিত দেখিতে পাওয়া যায়। হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভীলেরা রাণার পরিজন পূর্ণ ঝাঁপী গুলি বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া রাখিত। এরূপ বিপদের সময়েই প্রতাপের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার পর নাই অবিচলিত ছিল। আকবরের জনৈক গুপ্তচর আসিয়া দেখিয়া যায় যে প্রতাপের দেশহিতৈষিতা এবং সামন্তবর্গের রাজভক্তি অদ্যাপি অবিচলিত রহিয়াছে। ফল মূল মাত্র আহার, তাহারও দুনাদান, প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কিছু মাত্র ত্রুটি নাই। এই ব্যাপার শ্রবণে আকবরের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। এই সময়ে খান খানান যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রতাপকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাহার ভাবার্থ এই,—'পৃথিবীতে সকলই অস্থায়ী; ভূমি ও ধন সম্পত্তি কিছুই চিরদিন স্থায়ী হইবে না, কিন্তু মহৎ নামের গৌরব চিরকাল থাকিয়া যায়। প্রতাপ ধন ও ভূমি শূন্য হইয়াও মস্তক নত করেন নাই; ভারতীয় রাজগণ মধ্যে একাকী তিনিই হিন্দু জাতির মান সম্ভ্রম ও গৌরব বজায় রাখিলেন।'

সময়ে সময়ে প্রতাপ আপন পরিবারের ভাবনায় পাগল হইয়া উঠিতেন। পার্ব্বত্য প্রদেশে বা গিরিগুহায় তাঁহার পরম প্রিয়তমা প্রণয়িনী নিরাপদ নহেন; তাঁহার বালক বালিকাগণ—যাহারা অতি যত্নে ও আড়ম্বরে প্রতিপালিত হইবে—ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার চারিদিকে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। মুসলমানেরা অবিরত তাঁহার এরূপ অনুসন্ধান করিয়া ভ্রমণ করিতেছে যে, পাঁচবার খাদ্য প্রস্তুত হইয়া একবারও আহারের অবকাশ হইয়া উঠিল না। একদা তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রবধূ তৃণজাত পদার্থবিশেষ হইতে রুটী প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একখানি অর্পণ করিলেন; সেই এক একখানি রুটীতে দুইবার আহার হইবে, অর্দ্ধেক তখন, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দ্বিতীয়বারের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল। অদূরে প্রতাপ শষ্পশয্যায় শয়ান হইয়া আপনার দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। অকস্মাৎ রোদন চীৎকারে তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার কন্যার নিকট হইতে একটি মার্জার অবশিষ্ট খাদ্য কাড়িয়া লইয়াছে, পরে কি আহার করিবে ভাবিয়া তাঁহার

কন্যা কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার দুরন্ত প্রতিজ্ঞা অবিচলিত ভাবেই ছিল। যে প্রতাপ সমর-সময়ে পুত্র ও আত্মীয় কুটুম্বের পতন দেখিয়া কহিয়াছেন 'এই জন্যই রাজপুতের জন্ম;' সেই প্রতাপ ক্ষুধিত বালক বালিকাগণের ক্রন্দনে একবারে শিথিল প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। যদি এবংবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রাজ্যভোগ করিতে হয় তবে রাজ নামে ধিক্! তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, আকবরের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

এই অভাবনীয় সমাচারে আকবরের আনন্দের পরিসীমা রহিল না—তিনি সর্ব্বসাধারণকে জয়োল্লাসে মগ্ন হইতে আদেশ করিয়া গর্ব্বিত-ভাবে পৃথ্বিরাজকে রাণার পত্রখানি দেখাইলেন। পৃথ্বিরাজ বিকানীর পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ বিজয়ী আকবরের পার্শ্বচর হইয়াছেন। মাড়োয়ারের রাঠোর বংশীয় মালদেব হইতে বিকানীরের অভ্যুদয় হইয়াছে মাত্র। পৃথ্বিরাজ একজন যথার্থ বীরপুরুষ এবং সুকবি, রাজস্থানের কবিগণ একবাক্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। প্রতাপের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ছিল, এই সংবাদে তিনি শোকে আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি বিনীতভাবে রাজ সমীপে জ্ঞাপন করিলেন 'প্রতাপের যশে ক্ষুণ্ণ হইয়া কোন ব্যক্তি আপনাকে কৃত্রিম পত্র লিখিয়াছে; আমি প্রতাপকে বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি, আপনার রাজমুকুট বিনিময়েও তিনি বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। যদি অনুমতি হয়, আমি প্রতাপকে পত্র লিখিয়া এবিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইব।' আকবর স্বীকৃত হইলে পৃথ্বিরাজ অত্যন্ত মনঃসংযোগ সহকারে প্রতাপকে একখানি পত্র লিখিলেন। এবিষয়ের সত্যাসত্য তত্ত্ব অবগত হওয়া পত্র খানির উদ্দেশ্য হইলেও, প্রতাপকে বশ্যতা স্বীকারে নিবারণ করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পত্র খানি পৃথ্বিরাজ এরূপ কবিত্বশক্তি সহকারে রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে এতদূর শুভফল প্রসূত হইয়াছিল, যে অদ্যাপি কেহ তাহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। অনেকের মুখেই সেই উৎসাহপূর্ণ শ্লোকাবলী শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়। পত্র খানির ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইল;—

'হিন্দুর আশা ভরসা হিন্দুর উপরেই নির্ভর করিতেছে, তথাপি রাণা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রতাপ না থাকিলে এতদিন সকলেই সমান অবস্থাপন্ন হইত। কারণ আমাদের সামন্তবর্গ বীর্য্যচ্যুত এবং রমণীবর্গ ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় আপনে সর্ব্ব; সংহারক আকবর প্রবেশ করিয়াছে; উদয়ের পুত্র ভিন্ন সকলকেই সে কিনিয়া ফেলিয়াছে; তাহার প্রদত্ত মূল্যে উদয়ের পুত্রকে পাইবার উপায় নাই। নরোজার দিন কোন্ রাজপুতের মান রক্ষা হইয়া থাকে? চিতোরও কি এই পদবিতে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করে? ক্ষত্রিয়ের আর কি আছে? যদিও প্রতাপ ধনশূন্য দরিদ্র হইয়াছেন তথাপি তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মরূপ সম্পত্তি বজায় রাখিয়াছেন। হতাশ হইয়া অনেকে এই বাজারে আসিয়া আপনার মান

নষ্ট করিয়াছে, কেবল হামীরের বংশধর আসেন নাই। সকলেই জিজ্ঞাসা করে কোন্ গুপ্ত বলে বলীয়ান হইয়া প্রতাপ এতদিন অপ্রতিহত প্রভাবে জাতীয় মান রক্ষা করিতেছেন? কোন গুপ্ত বল প্রতাপের সহায় নহে। কেবল মনুষ্যত্ব ও তরবারী তাঁহার সহায়, ইহাতে তিনি ক্ষত্রিয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। এই নরসর্ব্বনাশক একদিন না একদিন আয়ত্তে আসিবে; চিরদিন কিছু ইহার জীবন রহিবে না, তখন আমাদের জাতি প্রতাপের শরণাপন্ন হইবে—আমাদের এই মরু সদৃশ প্রদেশে আবার রাজপুত বীজ বপিত হইবে। প্রতাপের প্রতিই সকলের লক্ষ্য, প্রতাপ ভিন্ন তাহাদিগকে কে রক্ষা করিবে? কাহার দ্বারা আবার আমাদের কুল পবিত্র হইবে?'

দশ সহস্র লোকের উত্তেজনায় যাহা না হইত, পৃথিরাঠোরের এই কতিপয় বাক্যে তাহাই হইল; প্রতাপের নিমগ্ন মন উন্নত হইল; আবার তিনি কার্য্য ক্ষেত্রে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। স্বজাতীয় সমস্ত লোকের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত রহিয়াছে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

কবিশ্রেষ্ঠ পৃথিরাজার পত্র মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, যে 'নরোজার দিন কোন্ রাজপুতের মান রক্ষা হইয়া থাকে,' এতদ্বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন বিবেচনায় এস্থলে বিবৃত হইতেছে, নরোজার শব্দের অর্থ নববর্ষের প্রথম দিবস। মুসলমান রাজগণ ঐ দিবসে একটি পর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। পৃথিরাজের লিখিত নরোজা শব্দের অর্থান্তর আছে বলিয়া আবুল ফজেলের লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ অনুবাদিত হইল;—

এই নরোজা আকবরের সৃষ্ট, 'খোষরোজ' অর্থাৎ আনন্দের দিন ইহার নামান্তর। প্রতি মাসে মুসলমানদিগের যে এক একটি পর্ব্ব হইয়া থাকে, তাহারই পর নবম দিবসে আকবরের খোষরোজ হইত। 'নরোজা' ইহার 'ন' অক্ষরে নূতন না বুঝাইয়া এখানে নবম বুঝাইতেছে। এই দিনে সম্রাটের দরবার হইত, সমস্ত মোগল ওমরাও ও রাজপুত সামন্ত তথায় উপস্থিত হইতেন। অন্তঃপুরে সম্রাটপত্নীরও একটি দরবার হইত, তথায় ওমরাও পত্নী ও সামন্তপত্নীগণ উপস্থিত হইতেন। কিন্তু নরোজার প্রধান ব্যাপার 'স্ত্রী লোকের বাজার।' ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই স্ত্রীলোক সদাগরপত্নীগণ দিগ্‌দেশীয় বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী আনিয়া দোকান সাজাইয়া বসে, অন্তঃপুরবাসিনী ও ওমরাও এবং সামন্তপত্নীগণ তাহা ক্রয় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সম্রাট ছদ্মবেশে থাকিয়া দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য, বাণিজ্যের অবস্থা, সাধারণের রাজভক্তি, রাজকর্ম্মচারীর ব্যবহার প্রভৃতির আলাপ পরম্পরা অবগত হইতে থাকেন। এস্থলে আবুল ফজল প্রভুভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সত্য কথা কহেন নাই। পৃথিরাজ যথার্থ কহিয়াছেন, নরোজায় রাজপুত-মান চ্যুত হয়। অনেক রাজপত্নী এই দিনে সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি প্রদান করে। রাজা সম্পর্কীয় বিষয় ব্যাপার অবগত হইবার কি এই

একমাত্র উপায়? আমরা বলি, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র জানিবার উপায় নাই। আকবরের মহত্ব ও গুণের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু সৎনীতি বিষয়ে সময়ে সময়ে তাঁহার চিত্তে দৌর্ব্বল্যের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তি হইয়া নরোজায় লোকের সর্ব্বনাশ করিবেন একথা শুনিলে আপাততঃ শরীর লোমাঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু তাহার কৌশল কলাপ পুংখানুপুংখ রূপে বিচার করিলে এসকল ব্যাপারে কোনমতেই অবিশ্বাস হয় না। যুদ্ধ বা গ্রহ বৈগুণ্যে যে নৃপতি-নিচয় তাঁহার পদানত হইয়া ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহাদের প্রতি এবম্বিধ অত্যাচার অনুষ্ঠান করায় আকবরের কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ঐ নরোজার বাজারে * অনেক রাজপুত-পত্নীর সতীত্ব বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। পৃথিরাজ এবিষয়ে সকলের অপেক্ষা ভাগ্যবান তাহার সন্দেহ নাই। তদীয় পতিব্রতা, ধর্ম্মানুরতা ও সাহস-সম্পন্না বনিতাই তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার পত্নী মিবার রাজকুমারী; তিনি প্রতাপ ভ্রাতা শুক্তের কন্যা; মিবারের স্বভাব-সিদ্ধ তেজস্বিতা তাঁহার অন্তরে দেদীপ্যমান ছিল। একদা খোষ রোজের আনন্দ সময়ে মোগলপতি আকবর পরমাসুন্দরী পৃথিপত্নীর অপরূপ রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া অনঙ্গপীড়ায় পীড়িত হইলেন। তাঁহাকে পৃথিপত্নী জানিতে পারিয়া রমণীরত্ন লাভ লালসায় আরও যত্নবান হইলেন। ইহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে যে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল রাণাবংশীয়া রমণীর সতীত্ব হরণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিবেন এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি লোলুপ হইলেন। পৃথিপত্নী 'রমণীর হাট' হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এমন একটি প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে তথা হইতে বহির্গত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম সময়ে দেখিলেন, সম্মুখে আকবর। আকবর এই সুবর্ণ সুবিধা পাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে রমণী তৎক্ষণাৎ কটিদেশ হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বাহির

* এই রমণীহাটে রাজশিল্পিদের অনেক দ্রব্য সামগ্রী বিক্রীত হইত। রাজা, রাজকুমার, রাজপত্নী, রাজবধূ, রাজকন্যা প্রভৃতি রাজপরিজনেরা স্বহস্তে যে সকল শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন তাহা এই বাজারে বিক্রীত হইয়া তাঁহারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিতেন। আরঙ্গজীব উত্তম টুপি প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এই বাজারে তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহাতেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি কার্য্যের সমস্ত ব্যয় সংকুলান হইয়াছে। আরঙ্গজীবের আদেশ ছিল, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যেন তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

† গোঁপ কামাইলে শোকচিহ্ন প্রদর্শিত হয়।

করিয়া আকবর-বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধারণ করিলেন। এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শনে বীরাগ্রগণ্য আকবরের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। বীরাঙ্গনা কহিলেন ‘দুরাত্মন্! এক পদ অগ্রসর হইলে নরহত্যা-পাপে ভীত হইব না।’ অসীম সাহস-সম্পন্ন দিল্লীশ্বর স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পৃথিপত্নী পুনরায় কহিলেন ‘দুর্ব্বৃত্ত! প্রতিজ্ঞা কর, আর কখন কোন রমণীর সতীত্ব হরণে লোলুপ হইবে না!’ আকবর নিরুপায় হইয়া তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই গল্পটি নানাবিধ রূপে রঞ্জিত হইয়া রাজস্থানে প্রচলিত হইয়াছে। তাহা এই;—“পৃথিপত্নী ঐ নিভৃত প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া বিপদাপন্না হইলে ব্যাঘ্রারোহণে বর্গভীনা ‘মাতা’ দেবী আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার দর্শনে রমণী সাহস পাইলেন। দেবী বীরপত্নীকে মন দৃঢ় করিতে আদেশ দিলেন, এবং তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান করিয়া কহিলেন—ইহার দ্বারাই ধর্ম্ম রক্ষা হইবে।” পৃথির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় সিংহ এরূপ ভাগ্যবান্ ছিলেন না। তাঁহার পত্নী নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। তিনি সতীত্ব রক্ষায় অসমর্থ হইয়া বহু রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। পৃথি কহিলেন,—‘রায় পত্নীর রত্নালঙ্কারের ঝঙ্কারে চারিদিক শব্দায়মান হইল—অঙ্গ স্বর্ণ রত্নে খচিত হইয়াছে—কিন্তু ভাই তোমার গোঁপ * কোথায়?’

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক, পৃথির পবিত্র পত্র পাঠে প্রতাপের মন ফিরিয়া গেল—তিনি আর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তিনি এখন অন্যবিধ উপায় অবলম্বনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি সহচরবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, মিবার পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদতীরে গমন পূর্ব্বক বসতি বিস্তার করেন। তাঁহাদিগের রক্তপতাকা পুনরায় প্রাচীন পার্ব্বত্য প্রদেশে স্থাপিত হইবে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। মিবার শত্রুগণ-কর্তৃক অধিকৃত হউক, কিন্তু তাহা এক্ষণে মরুভূমি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার আত্মীয় স্বজন, সহকারী সামন্ত, বিশ্বাস ভাজন সহচর,—যাহারা মোগলের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক অবনত হওয়া অপেক্ষা জন্মের মত জন্ম ভূমি ত্যাগ করাও শ্লাঘার বিষয় মনে করে,—তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রতাপ আরাবলী হইতে অবতরণ পুরঃসর বনভূমির প্রান্ত পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন এমন সময়ে একটি অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া তাঁহার বিদেশ যাত্রা এককালে স্থগিত হইল। প্রভুভক্তির এবংবিধ অপূর্ব্ব নিদর্শন ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। রাজস্থানের অলৌকিক ব্যাপার-সমূহ স্মৃতিপথে উদিত হইলেও মন আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে। প্রতাপের মন্ত্রী ভামা সাহ পুরুষানুক্রমে ঐ পদ ভোগ করিতেছেন। অনেক দিন হইতে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহারা ধন-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। ভামা সাহ পৈত্রিক সমস্ত সম্পত্তি আনিয়া প্রতাপের

* গোঁপ কামাইলে শোক চিহ্ন প্রদর্শিত হয়।

করে সমর্পণ করিয়া যদৃচ্ছা ব্যয় করিতে অনুরোধ করিলেন। দরিদ্র প্রতাপ ধন পাইয়া আর পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ ধন নিতান্ত অল্প নহে, উহাতে পঞ্চবিংশতি সহস্র লোক দ্বাদশ বৎসর প্রতিপালিত হইতে পারে। ভামা সাহ মিবারের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া ইতিবৃত্তে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। একে পৃথিরাজের উৎসাহপূর্ণ পত্র, তাহাতে ভামা সাহের প্রদত্ত অর্থ, এতদুভয়ের সাহায্যে প্রতাপ দ্বিগুণতর বলে বলীয়ান্ হইলেন। আর তাঁহাকে কে পায়— কে তাঁহার গতিরোধ করে? তিনি অচিরকাল মধ্যে সেনাসংগ্রহ করিলেন। শত্রুগণ ভাবিতেছে, প্রতাপ বনে বনে পলায়ন করিতেছেন, কিন্তু হঠাৎ দেউবরে সাবাজ খাঁর শিবির আক্রান্ত হইয়া সমস্ত মুসলমান সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। যে কয়জন জীবিত ছিল তাহারা অমৈতের দুর্গে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতাপ যাইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিলেন। দেখিতে দেখিতে কমল মেরুর দুর্গ আক্রান্ত ও পুনর্গৃহীত হইল। মুসলমানেরা কোন প্রকার আয়োজনের অবকাশ পাইতেছে না। তাহারা যে দিকে গমন করিতেছে, সেই দিকেই প্রতাপ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাল-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছেন। আবদুল্লা সদলে রাজপুত খড়্গে নিহত হইল। এইরূপে দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক দুর্গ প্রতাপের হস্তগত হইল। শত্রুসেনা অতি নৃশংসরূপে নিহত হইতে লাগিল। ইতিবৃত্ত পাঠে অবগতি হয় যে, প্রতাপ মিবারকে মরু সদৃশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছে, তাহারই তিনি ধ্বংস সাধন করিয়াছেন। অধিক কি, এই যাত্রায় (সংবৎ ১৫৮৬—খৃঃ ১৫৩০) তিনি চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত মিবারের সমস্ত ভূভাগ আপন করতলে আনিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “ তুমি সুখে থাকিবে না, ” সে কথা হাতে হাতে ফলিয়াছিল; প্রতাপ মানের সেই উপহাসের প্রতিশোধ দিবার জন্য অম্বর আক্রমণ করিয়া তাহার প্রধান বাণিজ্য বন্দর মালপুর ধ্বংস করিয়াছিলেন।

উদয়পুর পুনরধিকৃত হইল—কিন্তু ইহাতে কোন বিশেষ লাভ হইল না। শত্রুর আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই বোধ হয় প্রতাপ-কর্ত্তৃক উদয়পুর পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক মিবারের অন্যান্য ভূভাগ আসিয়া প্রতাপের করতলগত হইতে লাগিল। আকবর এ সময়ে নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন, কোন কোন ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হয় যে খান্ খানান্ প্রতাপের মহত্ত্বে মোহিত হইয়া আকবরকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে অনুরোধ করেন। একথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে যে তখন আকবর অন্যান্য দিকে নব নব অধিকার আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সে যাহা হউক, জীবনের শেষ কালে প্রতাপ কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিসুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় উৎসাহশীল উন্নত চিত্তের প্রকৃত শান্তি কোথায়? যখন তিনি

স্বদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন তখন আর তাঁহার জ্ঞান থাকে না। যখন তাঁহার নয়ন-যুগল চিতোরের ভগ্ন চূড়ার উপর বিন্যস্ত হয়, তখন তিনি একবারে পাগলের মত হইয়া উঠেন। পাঠক! একবার বীরের উদ্ভ্রান্ত চিত্তের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। পিতৃপুরুষের শোণিত রঞ্জিত গিরি-শৃঙ্গে যখন তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে; যখন তাঁহাদিগের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে; তখন শত্রুর শোণিত-পাত ও দেশের উদ্ধারসাধন, যুগপৎ তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবে তাহার আর সন্দেহ কি? শৈশব বাপ্পার মোরি হইতে কিরীট গ্রহণ; রাজপুত—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃশদ্বতী তীরে পৃথ্বিরাজের সহিত একত্রে সমর শেখর সমরসিংহের জীবন বিসর্জ্জন; উর্ষির দ্বাদশ পুত্রের ক্রমে ক্রমে অভিষেক ও রাজলক্ষ্মী রক্ষার জন্য যবন-হস্তে জীবন দান প্রভৃতি অলোক-সাধারণ ব্যাপার পরম্পরা স্মৃতিপথবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে যার পর নাই আকুল করিয়া ফেলে! আবার দেওলা সামন্ত জয়মল ও পত্তুর অসাধারণ দেশহিতৈষিতা ও বীরত্ব; কন্যার হস্ত ধরিয়া চন্দোৎ বধুর রণ-প্রবেশ-ব্যাপার তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইয়া স্বদেশের জন্য তাঁহাকে উন্মত্ত করে। তাহার পরই কৃষ্ণমেঘ আসিয়া চিতোর-তপনের কিরণ আবরণ করিল; রাজলক্ষ্মী পলায়ন করিলেন; দুর্ভাগ্য কাপুরুষ উদয়সিংহ প্রাণভয়ে পূর্ব্বপুরুষ কৃত কীর্ত্তিকলাপে চিহ্নিত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন;—দেখুন পাঠক; এই সকল ভাবনায় প্রতাপের চিত্ত কি কখন প্রকৃত শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারে? এই ব্যাপার পরম্পরা পর্য্যালোচনায় তাঁহার অন্তস্তল ভেদ হইতে লাগিল। তাঁহার চিত্ত এই সকল বিষয় চিন্তনে যে পীড়িত হইয়াছিল, শত্রুর নিষ্কোষিত অসির আঘাতে তিনি তদনুরূপ পীড়া প্রাপ্ত হন নাই।

আর অধিক কাল প্রতাপ মরণধর্ম্মশীল এই জগতে বাস করেন নাই। অচিরে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে চির-শান্তি প্রদান করিল। তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়ান হইয়া উত্তরাধিকারী ও অনুচরবর্গকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া যান। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, অমরসিংহ ক্লেশ-সহিষ্ণু নহেন, তাহার দ্বারা রাজপুত-গৌরব কোন মতেই রক্ষিত হইবে না। মৃত্যুযাতনা অপেক্ষা এই ভাবনাতেই তাঁহাকে অধিকতর কাতর করিয়াছিল। মুমূর্ষু বীর একটি নিম্নতল প্রকোষ্ঠে নীত হইলে তদীয় বিশ্বাস ভাজন সহচরবর্গ চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার যার পর নাই মানসিক ক্লেশ বুঝিতে পারিয়া সালুম্ব্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার চিত্তের এবংবিধ অশান্তি দেখিতেছি ইহার কারণ কি?' তিনি কহিলেন, 'আমার একমাত্র যাতনা এই যে, আমার জীবনাবসানে জন্মভূমি তুর্কের কর-কবলিত হইবে। অমরসিংহের প্রতি আমি ততদূর আশা

ভরসা স্থাপন করিতে পারি না—তাহার স্বভাব তাদৃশ বিপৎসহিষ্ণু নহে। যদি তোমরা এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে আমার জীবনান্তে কথনই যবনের পদানত হইবে না, তবে আমি এই মুমূর্ষু সময়েও শান্তি লাভ করিতে পারি।' রাণা এই কথা বলিয়া নিম্নলিখিত বিষয় বিবৃত করিলেন ;—

পেশোলা সরোবরের তীরে প্রতাপ ও তদনুচর সামন্তবর্গের রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য কতিপয় কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুটীর যে অতি নিম্ন, অমরসিংহ তাহা বিস্মৃত হইয়া একদা তথা হইতে বহির্গত হইবার সময় একখানি কাষ্ঠদণ্ড তাঁহার উষ্ণীষে সংলগ্ন হয় ; তাহাতে তিনি নিজে সাবধান না হইয়া কাষ্ঠখণ্ড উৎপাটন করিয়া ফেলেন। প্রতাপ তদ্দৃষ্টে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রাজকুমারের সহিষ্ণুতা অপেক্ষা সুখেচ্ছাই প্রবল, তাঁহার দ্বারা স্বদেশের উদ্ধার সাধনের সম্ভাবনা অতি অল্প। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুমূর্ষু রাণা কাতর স্বরে কহিলেন, 'এই সকল কুটীরের পরিবর্ত্তে সুন্দর প্রাসাদ সমূহ নির্ম্মিত হইয়া প্রবলতর সুখেচ্ছার পরিচয় প্রদান করিবে, বিলাসপ্রিয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জাতীয় গৌরব নষ্ট করিবে, যে মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রক্তস্রোত বহিয়া গেল—বিলাসপ্রিয়তার নিকট তাহাও বলিরূপে প্রদত্ত হইবে, এবং তোমরাও সেই সঙ্গে মিলিত হইয়া আপনাদের উচ্চমান জন্মের মত ঘুচাইবে।' রাণা নিস্তব্ধ হইলে, সকলেই বাপ্পার নাম করিয়া শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল, 'যত দিন মিবার সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীনতা প্রাপ্ত না হইবে, তত দিন সে থানে প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হইবে না।' আরও তাহারা অমরসিংহের জন্য দায়ী থাকিবে বলিয়া রাণাকে আশ্বস্ত করিল। প্রতাপ সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দের সহিত জীবন ত্যাগ করিলেন।

এই রূপে স্বদেশবৎসল বীরচূড়ামণি প্রতাপের পরলোক প্রাপ্তি হইল। অদ্যাপি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রাজপুতানায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক রাজপুত, বিশেষতঃ শিশোদীয়ার হৃদয়ে আজি পর্য্যন্ত তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন। যতদিন দেশহিতৈষিতার স্ফুলিঙ্গমাত্র রাজপুত-হৃদয়ে বিরাজিত থাকিবে, তত দিন তাঁহার এই দেব ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সে দিনের আগমন প্রার্থনীয় নহে! 'যদি মিবারের থিউছিদিদিস অথবা জেনোফন * থাকিতেন, তাহা হইলে 'পেলপনিসসের † সমর' অথবা 'দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন' ‡ কখনও এই রাজপুত-শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুর ভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুত-

* উভয়েই বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা।

† গ্রীসের অন্তর্গত এথিনীয় ও স্পার্টা এই উভয় জাতির যে জগৎ বিখ্যাত সমর হয় তাহার নাম পেলপনিসসের সমর।

‡ গ্রীক ও পারসিক সমরে ১০ সহস্র গ্রীস সেনার পলায়ন এক বিখ্যাত ব্যাপার ও নেতার কীর্ত্তিকুশলতার পরিচায়ক।

পূর্ব্ব অধ্যবসায়-সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবল পরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায় সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন।' আ-রাবলীতে এরূপ গিরিসঙ্কট দুর্লভ যথায় প্রতাপের অতুল কীর্ত্তি,—অত্যুজ্জ্বল জয় বা গৌরবাত্মক পরাজয়ের চিহ্ন অঙ্কিত নাই। হলদিঘাট মিবারের থার্ম্মাপিলি, এবং দে-ওয়ার ক্ষেত্র তাহার মারেথন। *

* থার্ম্মপিলি ও মারেথস গ্রীসের জগদ্বিখ্যাত সমর-ক্ষেত্র।

রাজা রাজবল্লভ সেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৬৭৮ শকাব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। সুতরাং আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর সিরাজ বাঙ্গালার সিংহাসন আরোহণ করেন।

যদি মহাত্মা এণ্টনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে মহাত্মা জুলিয়স সিজার আমাদের নিকট নরাধম বলিয়া পরিচিত হইতেন, সিরাজের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। সিরাজের জন্য অসংখ্য ব্রুটাস জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা সিরাজের রাজ-সিংহাসন রাজমুকুট অপহরণ করিল—তাহাতেও তৃপ্তি নাই, সিরাজকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করত হস্তী-পদে বন্ধন করিয়া দিলেন, রাজাধিরাজ সেবিত শেষ বঙ্গেশ্বরের রত্ন-মুকুট-শোভিত মুণ্ড ধূলি বিলুণ্ঠিত করিয়া সেই হস্তী মুরশিদাবাদের পথে পথে ভ্রমণ করিল। ব্রুটাসদিগের তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, সিরাজের মৃত দেহে কলঙ্ক-কালি বিলেপন পূর্ব্বক ইতিহাস পটে তাহার এক বিকৃত ছবি উদ্ধৃত হইল।

আমরা বাল্যকালে যে সকল অকর্ম্মণ্য ইতিহাস বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে "দুর্ব্বৃত্ত সিরাজ সিংহাসন আরোহণ করিয়াই নিবাইস পত্নীর সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ও সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন।" যদি সেই সকল "ইতিহাস" লেখককে জিজ্ঞাসা করা যায় এরূপ করার কারণ কি? তাহা হইলে অমনি তাহাদের চক্ষুঃ স্থির হইয়া যাইবে। কারণ, সেই "কারণ" অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া লওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত। ঈশ্বর যাহাদিগকে প্রতিভা দেন নাই, মাছি-চিত্র যাহাদের ব্যবসায়, ঐতিহাসিক লেখনী ধারণ করা তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। * এরূপ অনেক বিচারক

* এরূপ মাছি-চিত্রকরের বাঙ্গালায় অভাব নাই। বঙ্গীয় সমালোচকগণ তা-

দেখা গিয়াছে যাহারা নিম্ন আদালতের রায় বহাল ব্যতীত রদ করিতে জানেন না, কারণ রদ করাতে কিছু বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় সেই সকল ঐতিহাসিককে এবম্প্রকার বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন জজদিগের সহিত এক রজ্জুতে বন্ধন করিয়া দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ যাঁহারা সিরাজের কলঙ্ক রটনা করেন, তাঁহাদের এরূপ করিবার কতদূর স্বার্থ ও প্রয়োজন ছিল ইহা বিবেচনা করা স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন ঐতিহাসিকের কার্য্য নহে। মহাত্মা টরনস ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

পরের দোষগাণ করিতে হইলে, মনে মনে আপনাকে সেই অবস্থায় স্থাপন পূর্ব্বক বিচার করা উচিত। পাঠক! তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যদি তুমি তোমার মাসীকে জনৈক ভৃত্যের সহিত কুক্রিয়াসক্ত দেখিতে পাও তাহা হইলে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিবে? যদি পার তবে হিমালয় পর্ব্বতে চলিয়া যাও, যদি না পাব তাহা হইলে সিরাজের গুণ গাণ-কর। ইংরাজের উদার নীতি গ্রহণ করিওনা। ঠিক মুসলমান বা হিন্দু হইয়া মনে মনে বিচার কর।

জমিদার পাঠক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি তোমার কোনও মহালের নায়েব সেই মহালের উপস্বত্ব আত্মসাৎ ও স্থিতের কাগজ নদীতে বিসর্জ্জন করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে জেলে না দিয়া নিরস্ত হইতে পারিবে? যদি না পার তাহা হইলে সিরাজকে নিন্দা করিওনা।

সিরাজ তাহার ব্যভিচারিণী মাসীর দণ্ডবিধান না করিয়া বিরত হইতে পারেন নাই। বোধ হয় তজ্জন্য কোনও সহৃদয় ব্যক্তি তাহার নিন্দা করিবেন না। রাজবল্লভ যে কেবল নিবাইস পত্নীর উপপতি বলিয়া সিরাজের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন এমত নহে। তিনি ঢাকার রাজকীয় ধনাগার হইতে দুই কোটী টাকা অন্যায় রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। নিবাইস মহম্মদের শাসন কালে ঢাকা "নেয়াবতীর" যে জমাবন্দী প্রস্তুত হয়, তাহাতে সেই প্রদেশের রাজস্ব ৫৬ লক্ষ টাকা স্থির হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। নরাধম রাজবল্লভের চক্রান্তে সেই কাগজ নবাবের হস্তে আসিল না। নবাব যখন নিকাশী কাগজ ও রাজস্ব তলপ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলেন না, তখনই তিনি রাজবল্লভের বাস ভবন অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। পামরের পুত্র পাপিষ্ঠ কৃষ্ণ দাস সেই সময় সঞ্চিত ধন ও কাগজ পত্র লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিল।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্যগণ যেরূপ গায় পড়িয়া অন্যের সহিত কলহ করিয়াছে, ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জগতে তাহার তুলনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজদিগের কলহের সূত্রপাত হয় তখন ডাইরেকটারগণ তাহাদিগের কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারিদি-

---

হাদিগকে স্বর্গে তুলিয়া দিতেছেন। আমাদের সেই সকল চিত্রকরগণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের দশায় পতিত হইবেন।

গকে লিখিয়া পাঠান যে, " আমরা তোমাদিগকে দৃঢ় ভাবে আদেশ করিতেছি যে, দেশ কাল বিবেচনা করিয়া আমাদের বাঙ্গালা দেশস্থ সম্পত্তি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে, অধিকন্তু নবাবের অনুকম্পায় আত্মরক্ষার জন্য যত্ন করিবে এবং ইহাই তথায় আমাদের সম্পত্তি রক্ষার একমাত্র ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।" এই চিঠী আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বেই কলিকাতার ইংরেজ গবর্ণর কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান করেন। (বোধ হয় ধন লোভেই আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল।) নবাব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইংরেজদিগের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরেজগণ যে কেবল কৃষ্ণদাসকে নবাবের হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এমত নহে, তাহারা নবাব-দূতকে অপমান করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন, অগত্যা নবাব সিরাজ উদ্দৌলা নিতান্ত লাচার হইয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। প্রথমতঃ কাসিমবাজারস্থ ইংরেজ কুঠী নবাবের হস্তগত হয়, সেই সময় ওয়াট্স্, হেষ্টিংস প্রভৃতি ইংরেজগণ কারারুদ্ধ হন। কিন্তু নবাব তাহাদের প্রতি কোনরূপ নির্দ্দয় কিম্বা অভদ্র ব্যবহার করেন নাই। এই ঘটনার সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে তথায় নিতান্ত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। অধিকাংশ ইংরেজ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। কেবল মাত্র হলওয়েল সাহেব কতকগুলি সৈন্য লইয়া দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময় মদের গুদামের চাবি কাণ্ড-জ্ঞান-হীন গোরা সৈন্য-গণের হস্তে পতিত হওয়ায় তাহারা অল্পকাল মধ্যেই কিস্কিন্দার অভিনয় আরম্ভ করিল। তৎপর যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা আমরা মহাত্মা টরন্সের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

'১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০জুন 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ বিনা যুদ্ধে নবাবের হস্তে অর্পিত হয়। হলওয়েল ও তাহার অনুচরগণ বন্দিভাবে নবাব-সমক্ষে নীত হইলেন। নবাবের প্রতি যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহার বিপরীত-ভাব সম্পন্ন (অর্থাৎ দয়ালু) নবাব দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগের বন্ধন মোচন করিতে আদেশ করিলেন এবং প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় বন্দিবর্গের শরীর রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই যে লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল, যদিচ ইহা কোনরূপ আকস্মিক দৈব ঘটনা না হউক তথাপি তাহার জন্য নবাবকে দোষী করা যাইতে পারে না। রাত্র কালে বন্দিগণকে অন্ধকূপ নামক এক ক্ষুদ্রগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। অশ্রুজল, বিনয় কিংবা উৎকোচ, কিছুতেই নির্দ্দয় প্রহরীদিগের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। প্রভাতে ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে কেবল ২৩ জন মাত্র অন্ধকূপ হইতে জীবিত বহির্গত হইল। কতকগুলি লোকের এইরূপ কষ্টকর অস্বাভাবিক মৃত্যু অবশ্যই দুঃখজনক, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা সত্যের অপলাপ করিতে পারি না। নবাবের অনুমতি মতে কিংবা তাহার জ্ঞাত-

সারে যে এই ঘটনা হইয়াছিল, তাহার বিন্দু মাত্রও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, এই ঘটনার পূর্ব্বে কিংবা পরে কোন সময়েই নবাব বন্দীদিগের প্রতি শারীরিক দণ্ডবিধান করেন নাই। যদি নবাব যথার্থই নির্দ্দয় হইতেন এবং ইংরেজ বন্দীদিগের প্রাণ দণ্ড তাহার অভিপ্রেত ছিল তাহা হইলে অবশিষ্ট ২৩ জনকে তিনি কখনই জীবিত ছাড়িয়া দিতেন না। কারণ এই ২৩ জনের প্রাণ দণ্ড করিলে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ আমরা ইতিহাসে পাঠ করিতে পাইতাম না। যাহারা 'দয়া' 'দয়া' বলিয়া পশ্চাৎ চীৎকার করিয়াছিল, তাহাদের অনুচিত ব্যবহারই এই দুর্ঘটনার প্রথম সূত্র।'

অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ করিয়া মেকলে ও অন্যান্য ইংরেজ লেখকগণ যখন নির্দ্দোষী সিরাজকে savage tyrant প্রভৃতি অভদ্রোচিত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন মুহূর্ত্তকালের জন্যও কি গ্লেঙ্কোর হত্যাকাণ্ড তাহাদের স্মৃতি পথে উদিত হয় নাই? সিরাজের দাসানুদাসের তুল্য ক্ষমতা না পাইয়াই যাহারা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যকে পশু পক্ষী হইতে অধম বিবেচনা করেন, যাহারা হাসিতে খেলিতে মনুষ্য গুলিকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বধ করিয়া ফেলে, তাহাদের মুখে এই সকল কথা ভাল শুনায় না।

প্রকৃত পক্ষে মেকলে একজন অদ্বিতীয় অভদ্র ও নীচাশয়। তাহার নিকটে যে কেবল সিরাজ দোষী এমত নহে। তিনি বঙ্গবাসীদিগকে প্রকাশ্য ভাবে যথা সাধ্য গালি গালাজ করিয়াছেন, এবং বোধ হয় যদি নরাধমদিগের জন্য ইংরেজি অভিধানে আরও কোন সংজ্ঞা থাকিত তাহা হইলে হতভাগা বঙ্গবাসীদিগের জন্য তিনি তাহা বাছিয়া বাছিয়া প্রয়োগ করিতেন। মেকলের আত্ম চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছু উল্লেখ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার ন্যায় অসচ্চরিত্র লোক ব্যতীত অন্য কেহই এক দেশের সমস্ত লোককে এরূপ গালি গালাজ করিতে পারে না। মেকলের ন্যায় নীচাশয় ব্যক্তি পণ্ডিত না হইয়া মূর্খ হইলেই ভাল হইত।

মেকলে একস্থানে লিখিয়াছেন 'From a child Surajah Dowlah had hated the English. It was his whim to do so; and his whims were never opposed.' মিথ্যাবাদী মেকলের এই বাক্যগুলি যে সম্পূর্ণ অসত্য তাহা টরনসের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যাইবে।* কিন্তু কোম্পানীর ভৃত্যগণ যে নিতান্তই ঘৃণার পাত্র ছিল, তৎপক্ষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। সামান্য বণিক হইয়া যাহারা রাজ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইত কে তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া বিরত হইতে পারে।

আমাদের বিবেচনায় যদি লোমহর্ষণ অন্ধকূপ-হত্যার জন্য কাহাকেও দায়ী করিতে হয় তাহা হইলে ইংরেজ কোম্পানীর

* See Torren's Empire in Asia. page 25.

দুর্বিনীত ভৃত্যবর্গকেই দায়ী করা উচিত। পাঠক বিবেচনা কর, এক্ষণ ইংরেজগণ আমাদের রাজা। চীনাগণ তাহাদের অধীনে একটি কুঠি খুলিয়া কোনও স্থানে কারবার আরম্ভ করিল। গবর্ণমেণ্টের খাস মহালের জনৈক তহসীলদার তহবীল তছরূপ ও সেই মহালের জমাবন্দী ও ওয়াশীল বাকী প্রভৃতি কাগজ পত্র লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক চীনাদিগের কুঠীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গবর্ণমেণ্ট বন্ধুভাবে চীনাদিগকে লিখিলেন যে 'আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন।' চীনাগণ তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্টের পত্রবাহককে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিল। এই ঘটনার পর অবশ্যই একটি লোমহর্ষণ নাটকের অভিনয় হইবে। পাঠক, তখন তজ্জন্য তুমি কাহাকে দায়ী করিবে? যদি এ অবস্থায় চীনাগণকে দায়ী করা তোমার বিচার সঙ্গত হয়, তাহা হইলে অন্ধকূপ হত্যার জন্যও নির্দ্দোষী সিরাজকে মুক্ত করিয়া কোম্পানীর দুর্বিনীত ভৃত্যগণকে অবশ্যই দায়ী করিবে। টরন্‌স্ যথার্থই লিখিয়াছেন "যাহারা পশ্চাৎ 'দয়া' 'দয়া' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, তাহাদের অনুচিত ব্যবহারই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ।" প্রজ্বলিত পাবক-শিখায় হস্ত অর্পণ করিয়া পশ্চাৎ 'রক্ষাকর' 'রক্ষাকর' বলিয়া চীৎকার কি মূঢ়ের কার্য্য নহে? কিন্তু যাহাদের অনুচিত ব্যবহার অন্ধকূপ-হত্যার প্রথম সূত্র, আমরা তাহাদিগকে মূঢ় না বলিয়া, উদ্ধত, একগুঁয়ে, অহঙ্কারী প্রভৃতি সংজ্ঞা দান না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।

এই ঘটনার পর নবাব অল্প কতকগুলি সৈন্য কলিকাতায় রাখিয়া মুরশিদাবাদ গমন করিলেন। মাদ্রাজবাসী ইংরেজগণ কলিকাতায় সংবাদ অবগত হইয়া বৃহৎ একদল সৈন্য সহ কর্ণেল ক্লাইব ও এডমিরেল ওয়াটসনকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। অল্লায়াসে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তাহাদের হস্তগত হইল।

আমরা চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্বে বলিয়াছি যে 'রাষ্ট্র বিপ্লব ক্রূরমতি দস্যুদিগের বাঞ্ছনীয়"। তস্করের অগ্রজ 'দস্যু' ব্যতীত ভদ্রাভরণে অলঙ্কৃত এরূপ অনেক দস্যু জগতে বাস করিতেছে, যাহাদিগকে কেহই তাহাদিগের উপযুক্ত অভিধানে পরিচয় করিতে পারে না। বঙ্গদেশীয় সেইরূপ কতকগুলি ক্রূরমতি পামরের হৃদয়ে এক্ষণ সেই বাঞ্ছা বলবতী হইল। রাজবল্লভ ও তৎসদৃশ বঙ্গ-কুলাঙ্গারগণ নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন। (তাহা না হইলে রাজবল্লভ কখনই টাকা ও কাগজ পত্র গুলি জীর্ণ করিতেন না।) গর্দ্দভ-শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মিরজাফরকে সিংহাসনের প্রলোভন দেখান হইল। তাঁহারা ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, মনসা দেবী ধূনার গন্ধ পাইলেন। তৎপর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে দ্রষ্টব্য। এইরূপ চক্রান্ত করিয়া পামরেরা সিরাজের ধন, প্রাণ, যশঃ সকলই হরণ করিল।

আহা, সিরাজ! যত দিবস পর্য্যন্ত এ-

দুর্ব্বল হস্ত হইতে ঐতিহাসিক লেখনী স্খলিত না হইবে তত দিবস তোমার জন্য রোদন করিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিব।

বঙ্গবাসীগণ একবার তোমরা সিরাজের জন্য একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন কর। কখনও তোমরা বুঝিতে পার নাই যে, পামরেরা তাহাদের কুকার্য্য ঢাকিবার জন্য—তোমাদের হৃদয়-সিংহাসন হইতে সিরাজকে দূরীকৃত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে নির্ব্বিঘ্নে 'ক্লাইবের গাধা' কে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্বার্থ সাধন জন্য সিরাজের কলঙ্করটনা করিয়াছিল। বিশেষ রূপে অনুসন্ধান কর দেখিবে সিরাজের নামে যে সকল কলঙ্ক ঘোষণা হইয়াছে তৎসমস্ত প্রায় প্রমাণহীন কল্পিত বাক্য বলিয়া জানিতে পারিবে।

গর্দ্দভ-শ্রেষ্ঠ মিরজাফরের শাসন কালে রাজবল্লভ ও তৎসহযোগীগণ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়াছিল। অবশেষে সুযোগ্য নবাব কাসিম আলী খাঁর আদেশে রাজবল্লভ ও তৎসদৃশ কয়েকজন (১৬৮৫ শকাব্দে) দুরাত্মার মুঙ্গেরে প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল।

মহমতজং নিবাইস মহম্মদের শাসনকালে ঢাকা নেয়াবতীর যে জমাবন্দী হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় রাজবল্লভ নদীতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। * নবাব সিরাজ উদ্দৌলা তাহা প্রাপ্ত হন নাই। পশ্চাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্যগণ তাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই। ১১৩৫, ১১৭০ ও ৭২ বঙ্গাব্দের ঢাকা নেয়াবতীর স্থিতের কাগজ কোম্পানীর ভৃত্যগণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিবার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গবাসী পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে; অতএব আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। প্রাচীন জমিদার বংশজগণ এস্থলে সকলেই স্ব স্ব পূর্ব্ব-পুরুষগণের নাম ও তাঁহাদের জমিদারীর পূর্ব্ব অবধারিত জমা দেখিতে পাইবেন। হৃতসর্ব্বস্ব জমিদার নন্দনগণ ইহা পাঠ করিয়া অবশ্যই দুই একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন।

ঢাকা নেয়াবত।

চাকলে জাহাঁঙ্গির নগর।

ওয়াসীল জমা তুমারি, ১১৩৫ সাল।

সরকার।	বার্ষিক।
পরগণা।	রাজস্ব।

সরকার বাজু (বা বাজুয়া)। *

* কোনও কোনও ব্যক্তি অনুমান করেন যে এই জমাবন্দী নবাব কাসিম আলী খাঁ কৌশল ক্রমে রাজবল্লভ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালার বন্দোবস্ত কালে এই কাগজ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* রাজা তোড়লমল্ল বাঙ্গালাকে ১৯ সরকারে বিভক্ত করেন। বাজু শব্দের বহুবচন বাজুয়া (পারস্য) তাহার অন্যতম ও সর্ব্ব প্রধান সরকার। তোড়লমল্ল এই সরকারের ৩২ পরগণা ও মহালের কাত ৯৮৭৯২১ টাকা রাজস্ব ধার্য্য কার্য্য করেন। সরকার বাজুর কিয়দংশ মাত্র চাকলে জাহাঁঙ্গিরনগরের অধীন হইয়াছিল, দেখা যাইবে যে এই কিয়দংশের রাজস্ব ১১৩৫ সালে ৭৬৯৫৬১ টাকা অবধারিত হয়।

আসা আকবাদ	৯০৯১
এব্রাহেম পুর	৪৪৩৪
অরঙ্গা বাদ	২১০
এনাইত নগর	১৪৭৫
আইদ গাঁও	১৩৪৪
আলিপুর	২৩৩৯
বুজরগ উমেদপুর	৪৬৪৭
ভাওয়াল	৬৬৫৫২
পাদসায়ীবাগ	২৩২
বাড়িসাগদী	৭৯৬
বড় বাজুনছরতসাহী	১১৬৩৪৬
বড়পুর	১০৫০
বড়পুর ভেলীয়া	১৩০
চাঁদপ্রতাপ	৩৬১৪৫
দড়িবাজু	৯৫৮৬
গুঞ্জিশঙ্করাবাদ	১০৪
গোবিন্দপুর	১১৬৬
হাট হুসনাবাদ	২৯
হুসনসাহী চরবাজু	২৯৮৯৪
হাওলী জাহঙ্গিবনগর	৪১৯৬১
জাহাঙ্গিন বলদা	১২৩৭১
জাহানাবাদ	২০৪২
জোতছোবতরাই	২৬৯১
জাহানপুর	১৫৫৯
জাফরাবাদ	৪০
খাঁনজান বাহাদুরনগর	৯
খালুনাবাদ	৯০৪৫
কাসিমনগর	৩৭৯৪৯
কাসিমপুর, সুসিন, বাসিন	২৫৬৪
কাসিমপুর কিলান বাড়ি	২০৬৪
খালিজুরি.	২২৬১

খোদা হুসননগর	৯৬২
কাশীপুর	৪৬৩৪
মৌবারকওয়াজল	১৫৯১৭
মহম্মদপুর	৩১৯২
মহম্মদপুর ওরফে নুরলহুসন	৮৪৭
নন্দলালপুর (এলাকে চাঁদ-প্রতাপ)	১৫৪
নসর ওয়াজল	৫৬২৪০
নুরউল্লাপুর	২২৫০০
রায়পুব নন্দলালপুর	৩০৬৪
রসিদপুর	২৩৪৩
রফিয়া নগর	১২৫
সেলিমপ্রতাপ	৬০৩৩
ছৈয়দ প্রতাপ	১০৬
সৈয়পপুর	২০০৩
সুলতান প্রতাপ	৩৮২২৬
সৈয়দপুব নওয়াবাদ	৭৭
সেরাই মোলিদেহাব	৪৩৬
সাগবদি	২৫৪৬
সুজাআবাদ	৫৮৮৮
সাহাজানপুর	১৫৮৯
সাহাজাদপুব	৫২৪৪
সাহাওয়াজিল	২১৭২৩
সাইস্তাবাদ	৭২৬
সাহেব আবাদ	১৭৩৫
তালিপাবাদ ও আজিমাবাদ	৩৫৮০
ওয়াছপপুর (খেয়াবলাবাদ)	২৬৯৮
জাফব ওয়াজল	৬৯৮৯
বাজুব পেসকস	৪৮০৯
	৯৫৬৭৬১

সরকার উদয়পুর *

আঁগরতলা	৭৫
আম্বরপুর, ধর্ম্মপুর প্রভৃতি	৪৪৫১
দাউদপুর	৬৮৬।
হাবিলীরায়পুর	৯৩৭
কতুয়ালী প্রভৃতি	২৯৯২৫
কুমিল্লাগড়	১৮৮
কুমিল্লা কুঠী	৮০
নুরনগর	২৫০০০
রাজগাও	৩২৫
	৬১৮৬০

সরকার জরদখানা †

আকলি	৬৪৪৪
বুঞ্জর	২৩৩২
	৮৭৭৬

সরকার দুরলজেরাব †

জাহাঙ্গীর নগর টাকসাল	১৭২১৬
	৮৬৩৪১৬

সরকার সোনারগাও †

উত্তর সাহাপুর	৮৬৮৩

* ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে যে আকবর ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরকুলতিলক বিজয়মাণিক্য আকবরের সমসাময়িক। গোপীপ্রসাদ নামে রাজসরকারে একজন সামান্য ভৃত্য ছিল। ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে গোপীপ্রসাদ, বিজয়মাণিক্য কর্ত্তৃক প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। গোপী প্রসাদের কন্যার সহিত বিজয়ের কনিষ্ঠপুত্র অনন্তের বিবাহ হইয়াছিল। গোপীপ্রসাদ চক্রান্ত করিয়া বিজয়মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করেন। সুতরাং বিজয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসন লাভ করিলেন। মেকবেৎ প্রকৃতিসম্পন্ন গোপীপ্রসাদ ইহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে জামাতাকে বিনষ্ট করিয়া গোপীপ্রসাদ "উদয় মাণিক" নাম ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুররাজাসন অধিকার করেন এবং স্বীয় নামানুসারে রাজধানীকে "উদয়পুর" আখ্যা প্রদান করেন। সাহজাহান পাতসাহের শাসনকালে আত্মকলহ নিবন্ধন ত্রিপুররাজধানীতে মোগলপতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ছত্রমাণিক্য "সরকার উদয়পুরের" করদলপতি বা "জমিদার" বলিয়া স্বীকৃত হন। তৎপর ত্রিপুরবংশধরগণ পুনর্ব্বার স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিপুরা তখনও মোগলদিগের নিকট "সরকার উদয়পুর" ও সর্ব্বসাধারণ নিকট 'উদয়পুর রাজ্য' বলিয়া পরিচিত হইতেছিল। বান ডিন ব্রোকে ত্রিপুরাকে এই নামে পরিচয় করিয়াছেন।

† রাজা তোড়লমল্লের ওয়াশীল তোমার জমাতে আমরা এই দুটী নাম দেখিতে পাই না। সুলতান সুজার জমা তোমারিতে ইহার প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হইল। তাহাতে মোরাদখানা ওরফে জরদখানার ৮৪৫৪ টাকা ও দুরলজেরাবের ৩২১৩২ টাকা রাজস্ব লিখিত হইয়াছে।

আসপুর	১১৮৩
উমরাবাদ (বিক্রমপুর)	৪৪০৩
উমরাবাদ (ভুলুয়া)	২৮৯
উমরাবাদ (হাওলী সোণার গাও)	৩০২১
উমরাবাদ (দান্দরা)	৪৬৭১
ওরঙ্গাবাদ	২৩
দাক উমরাবাদ (দান্দরা)	১১৭৩
এলাহাবাদ	৪৫৫
বগাসাইর	২৪০০
ভুলুয়া	৫৪১২
বওয়াসিক	৭০৪১
বারদক	৫৩৮৪
বুগী	১০৪৬
বাবুপুর	৩৫০
বিক্রমপুর	১০৩০০১
বোয়ানগর	৫০৯২
বলদাখাল *	৬২৬৪৪
বন্দর একরামপুর	৪১০২
বাগুণ্ডী	২৯৭২
বলীমপুর	৬২৭
বদক গাওঁ	১৬০২
তিফ্ঝা	৩৬০০
তুল্লাই	৪৭২৩
ধুয়াই	৮৭৮৭
দক্ষিণ সাহাপুর	৩৪১৭
দান্দরা	৭০৩০

ইক্তাদপুর	২৭৩১
গঙ্গামণ্ডল	১৬৩৮৯
গোপালনগর	১১৮১০
গোপালনগর (ভুলুয়া)	৭৯৬৩
পুঞ্জর	৬২
হোমনাবাদ	২৬৮১৭
হাট এসলামাবাদ	১১৮৭
হাওলী সোণার গাও	৮০৯২
জোগীদিযা	১৬৯৮৪
খিজিরপুর	১৫১৬৩
কার্ত্তিকপুর	৮৪৭৩
কাঞ্চনপুর	২০৯০
কের্দি	৩০৫৮
কাসিমপুর মাছুয়াখাল	৬১০
কাসিমপুর সেলামতি	৮৫০০
কাদরা	৩৫৪০
লোহাগারা	৪৬৯০
মির্জাপুর	২৮২৪
মহম্মদপুর	৪৬
মির্জানগর, গোপালনগর	১৪।৩
মোহবকুল	১৮০০০
মহবৎপুর	৬৪৫৬
মৈচাইল	৩৩২২
মানুহপুর	২০৩০
মওয়াজিমপুর	৫২৩৮
মেহার	৭৮৯৪
মোবারিক নগর	১৩৯
মোসরিপুর	৪১১
মহি অলদ্দিনপুর	৫৭৯২
নারায়ণপুর	৭০৮৪
নওয়াবাদ	৩৪০১

* বলদাখালকে "বরদাখাত" লিখিলাম না বলিয়া কি বলদাখালবাসীগণ আমাদের উপর রাগ করিবেন ? করিলে আমরা লাচার। আইনআকবরীতেও আমরা ইহার নাম "বলদাখাল" ই পাইয়াছি।

রঘুকানন গুইর পেসকস	১০০০
পাইটকারা *	২২৩৭৭
রিণঘাট	২০৬২
রছুলপুর	১৬৯৭৪
রামপুর	৯১১
রায়পুর	৮৬৪
সিংহগাও	১৪৭৯৭
শ্যামপুর	২২৪৯
শ্যামনগর	৪১
শ্রীচাইল	১৩২১
সিঙ্গাইর	৩৫১৬
সাইস্তানগর	৯৯৩
সুজাদি	২৯৪২
সুজানগর	১৭১৯
সাহাজাসপুর	২৯৯৪
সাইস্থানগর (ফতেজংপুর)	১৩
সুজাবাদ	১২৮৩
সাহাবন্দর (বিক্রমপুর)	১১৫০০০
টুরা	১৪৩৮১
খণ্ডল	৮০০০
	৭১৬৯২৪

* বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে পাইটকারা ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি পরগণা। কিন্তু ব্রহ্মার ইতিহাস লেখক ফেয়ার সাহেব বিক্রমপুরকেই পাইটকারা নির্ণয় করিয়াছেন। সাহেবেরা ইতিহাস লিখিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে নিতান্ত গোড়ামি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ফেয়ার সাহেব, ব্রহ্মা, পিগু ও রাক্ষিয়াং রাজবংশের ইতিহাস লিখিয়াছেন, অথচ ত্রিপুরা যে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ইহা তাহার জ্ঞানই ছিল না। আমরা বারংবার ফেয়ার সাহেবের এই সকল ভ্রম দেখাইয়া আসিয়াছি।

সরকার বাকলা †

এগারবস্তী	৪৮৩১
ওরঙ্গাবাদ	১১৯৯
আগরবিল্লা	৯৫২
এদারকপুর	১০৮০৭
আদিলপুর (বর্ত্তমান ইদিলপুর)	৪৭৭০৪
বুড়ামোহন	৫২৮৮
বিল্লাড়ি	৭৬১৮
বঙ্গরওয়ালা	১১০৪৪
রংপুর	৫১১৪
বান্ধাঘাটি	১৪৮৮
চর আমনদি	৩৬৬

* দেখা যাইবে যে সরকার সুবর্ণ গ্রামের অধীন মহাল গুলি অধুনা ঢাকা, ত্রিপুরা ও নওয়াখালির অন্তর্গত। তোড়ল মল্লের জমাবন্দী কাগজে এই সরকারে ৫২ পরগণা ও রাজস্ব ২৫৮২৮৩ টাকা লিখিত অছে। কিন্তু 'হফ্‌ত ইকলাম' গ্রন্থে ৩১০০০০ টাকা দৃষ্ট হয়।

† তোড়ল মল্লের জমাবন্দীতে সরকার বাকলা ৪ মহালে বিভক্ত যথা বাকলা, শ্রীরামপুর সাহাজাদপুর ও আদিলপুর (অপভ্রংশ ইদিলপুর)। ইহার বার্ষিক রাজস্ব ১৭৮৭৫৬ টাকা। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খ্যাতনামা রাজস্বসচিব 'সেরেস্তাদার' গ্রাণ্ট সাহেব ১৭৮২৬৬ টাকা লিখিয়াছেন।

চন্দ্রদ্বীপ	৬৬০৮
দক্ষিণচর	৭১৭
চন্দ্রকুল	৭১৭
দিনারপুল	১৪৭৪৭
ফুরছুতপুর	২৪৩৪
ফতেজংপুর	৩৯২৬
গুণানন্দী	৩৮৯
হাজুপুর	১০৮৫
জানপুর	৬৭১
খাঁন জাহানপুর	১২
কালীস্নন্দী	২১
খেলাদী	৪৮৬৮
কন্দরপুর	৫৭৫৪
কুণ্ডরপুর	১৩
কতুয়ালিপাড়া (কোটালিপাড়)	৬৯২৬
খেতামনগর	২১
মহম্মদপুর	২৭১১
মহবৎপুর	২৯২৯
মৌবারিকনগর	৯১
মুজারদি	৬২৫৭
নারায়ণপুর	২৩৭
নজুপুর	২৪৯
পূর্ব্বচর	৪৮১৬
রামনগর	১০৯৫
রসিদ আবাদ	৬৬৩
শ্রীরামপুর	৮৬০৫
সাহাজাদ	১০৩৫২
সুলতানাবাদ	৩৬৩
সাইস্থানগর	৩৯৫৬
সাইস্থানগর (আদিলপুর)	১৬১১
	১৯২৪৪৮

চাকলে জাহাঙ্গিরনগর

মোট জমা ১৯ ৩০২৯১

গত—

খারিজ বিতং—

ত্রিপুরার জমিদারি সরকার উদয় পুরের অধীন ২০ পরগণা দাউদপুর ব্যতীত ৬০৯৯৩

সরকার সোণার গাবের অধীন ৪ পরগনা মেহেরকুল, বগাসাইর, খণ্ডল, তিষ্ণা ৩০০০০

৯ ৯৯৩

রাজসাহির জমিদারি ৮ পরগণের কাত ২৮৬২১

রুক্মিণীপুরের জমিদারি ১২ পরগনার কাত ২২৯২০

১৪৩৫৩৪

১৭৬৮৫৫৭

আগত—

দাখিল বিতং

চাকলে ঘোড় ঘাট হইতে সরকার ঘোড়াঘাট পং জাফর সাহি ১৭০০৮

সরকা বাজু পং আলাপসিংল ৪৪৯৫৫

" ময়মনসিংহ ৪৪৪৭৬

আইনমহাল ভাওয়াল ২১৫

১০৬৬৫৫

চাকলে শ্রীহট্ট হইতে পং সরাইল সতর খণ্ডল * ১১১০৮৪

* ত্রিপুরার মধ্যে সরাইল উন্নত পরগণা একমাত্র বলদাখাল ব্যতীত ইহার আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার প্রাচীন নাম "সতর খণ্ডল" কিন্তু অধুনা সরাইলের মধ্যগত

" জোয়ানসাহী	৩৩৮২০
". তরপ মোটজমা ১৬-১৭ টার মধ্যে	
আগত অংশের	১১৮৩৬
	১৫৬৭৪০
চাকলে কড়ই বাড়ি হইতে সরকার বাজু	
পং সেরপুর দশকহনীয়া	১৬৭৫০
" সুসং	১৮৮৫০
কড়ই বাড়ি সায়েরি মহল	১৫০৬৪
	৫০৬৫৪
চাকলে যশোহর হইতে সরকার খালেপ্রাক-	
দের অধীন ৬ পরগনা	৪৮২৯
চাকলে ভূষণা হইতে ১৭ পরগণায়	১০৮০৯১
	২১৯৫৫৩৬
বাদশানকার	৯০৬৩৪
	২০৯৮৯০২

১১৭০ ও ৭২ সালের ঢাকা নেযাবতীর কুল জমা ওয়াশীল ময় আবওয়াব।

জমিদারি ও জমিদার	জমিদারির সংখ্যা	মহালের সংখ্যা	মোট জমা
জেলালপুর প্রভৃতি			
নুরউল্লা ও রুহিউল্লা	৩	১৮	১৫৩০০৫
রাজনগর প্রভৃতি			
লক্ষ্মীনারায়ণ	১	৩৮	৮৮৩৮০
চন্দ্রদ্বীপ			
রাজা উদয়নারায়ণ	১	২২	৬৮৫০৯
আদিলপুর			
রমাবল্লভ	৩	৮	১০৬২৭০
বুজরক উমেদপুর			
মহম্মদ সাদক	১	৮	২০১২৭৪
সেলিমাবাদ			
জয়নারায়ণ, ভবানীচরণ চৌধুরী	৪	২	৪০১৯০
রতনদী কালীকাপুর			
কাসিম	১	১	১৮৬৪৭
রসুলপুর, কার্ত্তিকপুর প্রভৃতি			
আবদুল্লা	৪	৫	৫০৩৮৭
এদ্রাকপুর, সাইস্থানগর প্রভৃতি			
মির আলা	২	২	২৩১৭৩
রামনগর প্রভৃতি			
রামদাস সেন	১	৩	১৩৯৫২
বৈকুণ্ঠপুর			
(বিক্রম নছরতসাহী হইতে খারিজ)			
কীর্ত্তিনারায়ণ	১	১	১৭০৬১
দক্ষিণ সাহাবাজপুর ও শিবরামপুর প্রভৃতি			
ভূষণ উল্লা	৩	৩	৭৮১৬৪
উত্তর সাহাবাজপুর			
শিবরাম প্রভৃতি	৩	১	১৩৭৭৭
সনদ্বীপচর			
বক্তারসিংহ প্রভৃতি			
চৌধুরীগণ	৩	১	১৮০৪৭০

কয়েকখানি গ্রাম মাত্র সতরখণ্ডল নামে পরিচিত। প্রায় চারি শতাব্দী অতীত হইল শ্রীহট্টের মুসলমান-শাসনকর্ত্তা ইহা ত্রিপুরেশ্বর হইতে গ্রহণ করেন, তৎপর দীর্ঘকাল "সরাইল" শ্রীহট্টের অধীন ছিল। রাজা তোড়লমল্লের বন্দোবস্ত কালে সরাইল বা সতরখণ্ডল শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে দৃষ্ট হয় প্রতাপগড়, বালিয়া চং, বাজু, জয়ন্তীয়া, সতরখণ্ডল, লাউড় ও হরিনগর প্রভৃতি ৮টি মহালে শ্রীহট্টসরকার বিভক্ত ছিল।

গুণানন্দী			
হরিয়া	৬	১	২৫৬৩৩
সিংহ গাওঁ, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি			
কৌ প্রভৃতি	৩	২	২২০২৮
টুরা, এব্রাহিমপুর			
রসুল, কাসিম, সুফা	৪	২	৩৯৫৮৮
মেঁহার			
হিংরাজ দোনা	৩	১	৩০৯১৪
ছুল্লাই			
তোতা ও মৈরম	২	১	৪০৫১৯
সুনদী			
সাহাবাজ চৌধুরী প্রভৃতি	৫	১	১১১১৮
কাসিমপুর মাছুয়াখাল			
নরোত্তম	১	২	৯৮৪৪
হোমনাবাদ			
দৌলত জেলালবক্স	২	১	১০৯২৩১
কাদবা আমিরাবাদ			
বিজয় নারায়ণ	৩	৩	৩৮৩০১
ভুলুয়া			
রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ	৩	১	১৩৫৯৮২
জুগিদিয়া			
রঘুরাম প্রভৃতি	৩	১	১৭৭৩৭
দান্দরী, এলাহাবাদ			
মহম্মদ আরিয়ত	২	২	৫৮৬৩৮
সুয়াগাও			
মধু প্রভৃতি	৫	১	১৩৪১১
বাবুপুর			
উদয়নারায়ণ	১	১	১২৯৮৩
গোপালপুর মির্জানগর			
সফিয়দ্দিন	২	২	১৫৮৮৯
মৈচাইল			
নরসিংহ	৪	১	১৪৯২
গঙ্গামণ্ডল প্রভৃতি			
মহম্মদ জাফর	১	৭	১০৩৭২৫
পাইটকারা প্রভৃতি			
আবদুল হুসন	২	৪	৯৪৬৩৮
নসিরওয়াজ্জল			
কুরঙ্গনারায়ণ	৭	১	৪৮০৭০
জোয়ানসাহি			
* * *	১	১	২৩৪০৭
সেরপুর দশকাহনীয়া			
বিন্দুনারায়ণ	১	১	২৫১৮৬
ময়মনসিংহ			
প্রেমকৃষ্ণ প্রভৃতি	২	২	১০৭৪৩৮
আলাপসিংহ			
হরিরাম	১	১	৬৯৩৮৭
সুসং ও নছরতসাহি			
রতনসিহং। *	২	১	৩৫১৯২
তরপ			
* * *	১	১	৩০৪০৪

* পুরাতত্ত্বানুসন্ধান কালে আমরা কোন কোন স্থলে ঘটনা ক্রমে সুসং রাজবংশের উল্লেখ দর্শন করিয়াছি। সুসংপতিগণ নব্য জমিদার নহেন। যদি কোনও পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই রাজবংশের ঘরানা ইতিহাস ও বংশাবলি, বান্ধব সম্পাদক মহাশয়ের যোগে আমাদিগকে লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আমরা বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ রূপে উল্লেখ করিতে পারিব।

বালিরা ও সতগাও			
(তরপের খারিজা)			
রেয়াজদ্দিন	১	২	১২৬৩৭
মুরউল্লাপুর, হুসনসাহি			
ও এলেনতাল	৩	২৭	১০৪০৬৬
কাসিমপুব, মুসিন,			
বাসিন ও আজিমপুর	১	২	১২৪৫৫
তালিপাবাদ			
জয়া প্রভৃতি	২	১	১০৭৩৫
নজুপুর (পং কাসিমনগর)			
সমসেলউদ্দিন	১	২	৩৭৩১১
সুলতানাবাদ			
হুসনআলী	১	১	১৭১৬৮
হাবেলী সেলিমাবাদ			
হিং ।৶ আনী	১	১	১১০৯৬
আজিমপুব প্রভৃতি	১	১	১০১৭১
তুনকাবাদ			
(পং সিংহেরগাও)	১	১	২৫১০৪
রণ ভাওয়াল			
(পং আলাপসিংহ)	১	১	১৪১৭৩
হাজ্রাদি			
আলাউদ্দিন	১	১	২৩৫৩৩
কুলসি (পংসুলতান প্রতাপ)			
সেনরাম প্রভৃতি	৫	১	১৪৬৪৪
তাল্লুক গোলাম মইধর			
(পরগণে জেলালপুর)	১	১	১৭০৩১
তাং চাঁদসিংহ	১	১	১০৬৬৪
তাং মহম্মদ আব্বাল	১	১	৮২০১
তাং সরন্দল	১	১	৮৯৪৭
	১২৬	২০০	২৪৬১৩১৫

কড়ইবাড়ি ও অন্যান্য			
সায়েবিমহল	৫	৮	৪৪৫৬১২
	১৩১	২০৮	২৯০৬৯২৭
নেজামত সেরেস্তা			
(সৈনিক বিভাগের অধীন)			
বলদা খাল			
মহম্মদ ইব্রাহেম	১	৩	১৩৬২২২
সরাইল সতরখণ্ডল			
মহম্মদহদ্দি	১	১	৪০৩২৪
ভাওয়াল			
ইন্দ্রনারায়ণ	৩	১	৩২০০৩
বিক্রমপুর প্রভৃতি			
রাজারাম	১	১	২৪৫৩৫
চাঁদপ্রতাপ			
হিং রামমোহন	১	১	৯৬৯০
তাং হরিনায়ণ			
(পং জেলালপুর)	১	১	১৭২৬৩
সায়েরি মহাল			
তামাকু, গাঁজা প্রভৃতি		১৪	১২৬০৯৭
	১৩৯	২৪০	৩২৯৩০৯১
উভয় সেরেস্তার অন্তর্গত			
মাস্কুরী তাল্লুক	২৭৯	১৭৫	৪৩৩৪৯৩
	৪১৮	৪১৫	৩৭২৬৫৮৪

১১৭০ সালের ঢাকা নেয়াবতের মোট জমা ৩৭৩৬৫৮৪ টাকা, তৎপর নিম্নলিখিত রূপ বৃদ্ধি হইয়া ১১৭২ সালে ৩৮৭২৯২১ টাকা অবধারিত হয়।

সাবেক জমা হুজুর সেরেস্তা	৩১৪৯২৯৭,
মহাল নাম	বৃদ্ধি জমা
রাজনগর	১৭০৮

চন্দ্রদ্বীপ	৪৯৯৬
সেলিমাবাদ	১৮৩২২
রতনদিকালীকাপুর	৯৭৬
রছুলপুর	৫৭৪৫
বৈকুণ্ঠপুর	১২১৩
দক্ষিণ সাহবাজপুর	১৩০৫
উত্তর সাহবাজপুর	১৭২২
গুণানন্দী	১৭১০
টুরা	৬৩৯৯
মেহার	৩৮৩৯
হুল্লাই	৪৯৫০
কাদবা	১২৪৩
গোপালপুর	২৫৩৪
সেরপুর দশকাহনীয়া	৫২৩৯
ময়মনসিংহ	১১৬৪
আলাপসিংহ	৪২০৭
নুরউল্লাপুর	২৮৩৬৮
সুলতানাবাদ	২৬৮৮
মুজরদি	২০৭৩
হাজ্রাদি	৪৪৫৫
সিরান্দল	৯৭৯
	৩২৫৫১৫২

নেজামত সেরেস্তা

সাবেকজমা		৫৭৭২৮৭
বলদা খাল	বৃদ্ধিজমা	৩৪৮৬৪
সরাইল		৫৬১৮
		৬১৭৭৬৯

১১৭২ সালের মোটজমা ৩৮৭২৯২১

মহাল ও পরগণার নামে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইবার সম্ভব আছে। কারণ মূল গ্রন্থে প্রায় সমস্ত মহালের নামই মুদ্রাকরের প্রেতগণের কৃপায় অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে সকল পরগণা ও মহালের নাম জ্ঞাত আছি কেবল তাহাই সংশোধন করিতে পারিয়াছি। কোনও পাঠক কোনও মহালের নাম সংশোধন করিয়া দিলে আমরা অনুগৃহীত হইব। *

* ঢাকা নেয়াবতের রাজস্বের ইতিহাস কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে লিখিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সাময়িক ও সংবাদ পত্রে একটি জমকালো বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলাম, তাহাতে ৭৲ টাকা মূল্যের 'ঢাকার ইতিহাস' বাহির হইবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা সেই ইতিহাস প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে লেখনী সঞ্চারণে বিরত রহিলাম। প্রয়োজন বোধ হইলে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করা যাইবে। নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

শ্রী——সিংহ।

হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম। এক্ষণে পুনরায় সেই বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

হিন্দুধর্ম্মের বিশালতা ইহার দ্বিতীয় উৎকর্ষ। হিন্দুধর্ম্ম সমুদ্র হইতেও গভীর, আকাশ হইতেও অনন্ত। ক্ষুদ্র ফ্রান্স, ক্ষুদ্র গ্রীস, ক্ষুদ্র রোম, ক্ষুদ্র ইংলণ্ড প্রভৃতির প্রত্যেকটির সহিত সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনা হয় না। ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের তুলনা কথঞ্চিৎ সম্ভব। প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে একখানি ধর্ম্মপুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। আজিও সেই ধর্ম্ম পুস্তকটিই ইউরোপীয় ধর্ম্মমালার প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম্মমালার ও ধর্ম্মপুস্তকের গণনা করা যায় না। চতুর্ব্বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, আগম, নিগম, তন্ত্র, ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি কতশত ধর্ম্মপুস্তক ভারতবর্ষে পঠিত, সমাদৃত ও পূজিত হয় তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? ইউরোপীয় ধর্ম্মপুস্তকের উন্নতি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রত্যেক শতাব্দীতে ধর্ম্মপুস্তকের উন্নতি, বিস্তৃতি, ও সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পাদিত হইয়াছে। অনেকে ভারতবর্ষের এই ধর্ম্মবাহুল্য দেখিয়া ভারতবর্ষকে নিন্দা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছেন। প্রাকৃত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মবাহুল্যই ধর্ম্মের সজীবতার লক্ষণ। যখন ধর্ম্ম কেবল রবিবাসরীয় পরিচ্ছদ মাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও মতভেদ থাকে না। কিন্তু যদি ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সারবস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের মূর্ত্তি দিন দিন নব নব ভাবে, নব নব সৌন্দর্য্যের সহিত প্রকটিত হয়। ইউরোপে বিজ্ঞান সম্বন্ধে, দর্শন সম্বন্ধে, নীতি সম্বন্ধে, যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে সহস্র সহস্র মতবিভেদ হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, ইউরোপে ঐ সকল শাস্ত্র এখনও সজীব। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইউরোপে মতভেদ বড় অল্প। কারণ ইউরোপে ধর্ম্মভাব নির্জীব। মুমূর্ষুর শ্বাস-বায়ুর ন্যায় ইহা দুই একবার চঞ্চল ভাব ধারণ করে সত্য। কিন্তু সাধাণতঃ ইহা স্পন্দহীন, নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল।

সকল মনুষ্যের মন এক উপাদানে সংগঠিত হয় নাই। সুতরাং একই রূপ ধর্ম্ম সকল মনুষ্যের মনে সমান আধিপত্য লাভ করিতে পারে না। কেহ বা ঈশ্বর-মাহাত্ম্য

চিন্তা করিতে ভালবাসেন। কেহ বা ঈশ্বর করুণার পক্ষপাতী। কেহ বা ঈশ্বরের ক্ষমতার বিষয় আলোচনা করিতে ভালবাসেন। কেহ বা ঈশ্বরকে দুষ্ট দলন ভাবে দেখিতে চাহেন। কেহ বা ঈশ্বরকে পতিতপাবন বলিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসেন। আবার কেহ বা হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত করিতে চাহেন। আবার কেহ বা হৃদয়ে ভক্তির উৎস বহাইতে চাহেন। আবার কেহ প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হইতে চাহেন। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি প্রবল বেগে কার্য্য করে। একরূপ ধর্ম্ম ইহাদের সকলের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম সকলের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যাহার পক্ষে যে ধর্ম্ম উপযোগী তাহাকে সেই ধর্ম্ম প্রদান করেন। গুরুগণ ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যের কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র প্রদান করেন। ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, গুরু তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে যেরূপ ধর্ম্মের প্রয়োজন বোধ করেন, তাঁহাকে সেইরূপ ধর্ম্ম প্রদান করেন। যে প্রেমভিখারী, যে অন্যকে নিজের প্রাণের সহিত গূঢ়তর বন্ধনে নিবদ্ধ করিতে চাহে, বন্ধু হইতে দূরে অবস্থান করিলে যাহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, যাহার কোমল হৃদয় প্রিয়জনের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য লালায়িত হয়, গুরু সেই কোমলচিত্ত, প্রেমিককে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। গুরু প্রেমিক শিষ্যকে শিক্ষা দেন যে "ঈশ্বরকে দূরাদপি দূরতর বলিয়া ভাবিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর তোমার সখা। যে শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতিকে সখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সে তোমাকেও সখা বলিয়া গ্রহণ করিবে। তুমি তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ না করিতে করিতে সে তোমাকে গাঢ়ালিঙ্গনে আলিঙ্গিত করিবে। তুমি তাহার চরণে মস্তক না রাখিতে রাখিতে সে তোমাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইবে। তুমি ক্রোধ করিলে সেই ঈশ্বর, তোমার পায়ে ধরিয়া তোমার ক্রোধ ভঞ্জন করিবেন। আজি অবধি ঈশ্বর তোমার অস্থির অস্থি, মজ্জার মজ্জা, প্রাণের প্রাণ।" যাহার হৃদয় প্রেম-প্রবণ, সে কি এই ঈশ্বর ভুলিতে বা ছাড়িতে পারে? সে একবার এই ঈশ্বরের উপলব্ধি করিলে আর তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। সে সহস্র যুক্তি উপেক্ষা করিয়া নিজ ইষ্ট দেবতাকে হৃদয় সিংহাসনে চির সংস্থাপিত করিয়া রাখিবে। গুরু প্রেমিককে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়া শক্তির উপাসককে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করান। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বল, বীর্য্য শৌর্য্য প্রভৃতির পক্ষপাতী। নেপোলিয়ন, ক্রমওয়েল, হ্যানিবাল, হারকিউলিস, আকবর, আলেক্‌জান্দার, শিবজী, তাঁহাদের পরম আদরের ধন। বীরগণের সিংহনাদ, জয়োল্লম্ফ, তাঁহাদের হৃদয়কে বড় আকৃষ্ট করে। ঐ দেখ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সেনা সকল রণভূমিতে প্রবেশ করিল। তাহাদের অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল ধূমাবৃত হইল। ঐ দেখ শত্রুমুণ্ড পদদলিত হইতেছে। এই সকল বর্ণনায় তাঁহাদের হৃদয় নাচিয়া উঠে।

এইরূপ ব্যক্তিগণ প্রেমের অর্থ কি বুঝিবে? তাহাদের চঞ্চল, বীর্য্যবান্ রক্ত প্রেমিকের শান্তিময় গভীর প্রেমের বিরোধী। তাহাদের নিকট প্রেমের উপদেশ দিলে উহা শূকরের নিকট মুক্তাহারের সমান হইবে। তবে কি ইহাদের জন্য ধর্ম্ম নাই? তোমার খ্রীষ্ট পাদ্রী বলিবেন 'না'। যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই। কিন্তু হিন্দুগুরু বলিবেন—'আইস বৎস! আমি তোমাকে তোমার চরিত্রোপযোগী ধর্ম্ম দিতেছি। ঐ দেখ ভবানীর মূর্ত্তি, তোমার সম্মুখে কিরূপে বিরাজ করিতেছে। ঐ দেখ মাতা কিরূপে দশদিকে দশহস্ত বিস্তার করিয়া শত্রুনাশ করিতেছেন। ঐ দেখ মাতা কিরূপে সিংহ পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া অসুর দলন করিতেছেন। ঐ দেখ মাতা দশ প্রহরণে কেমন সজ্জিত হইতেছেন। উনি শিষ্ট পালনার্থ দুষ্টদমন করিতেছেন। উনিই তোমার দেবতা। উহাঁকে মনে রাখিয়া ঐ রূপে দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করিবে।' ভক্ত অবনত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিবে—'গুরুদেব! আপনি আমাকে প্রকৃত-পথ দেখাইয়াছেন। আজি যাহা দেখিলাম ইহ জন্মে আর তাহা ভুলিব না। আর হে দেবী জগন্মাতঃ! আমার হস্তে তোমার বলকণা প্রদান কর। আমার বক্ষে তোমার সাহস-কণা প্রদান কর। আমি তোমার ন্যায় দুষ্টদমন ও শিষ্ট পালন করিব।' আমার এই সকল তর্ক যে কাল্পনিক নহে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি রাজপুত দিগকে ও মহারাষ্ট্র দিগকে পাঠকদিগের সম্মুখে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি। শিবজী, মানসিংহ, ভীমসিংহ প্রভৃতির দেবতা কে? ভবানী। তাঁহাদের স্তুতি এইরূপ—

কৌষিকি কালিকে, চণ্ডিকে অম্বিকে,
প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ড বিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি,
শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনি॥
শঙ্করি সিংহবাহিনি।
মহিষ মর্দ্দিনি, দুর্গবিঘাতিনি,
রক্তবীজনিকৃন্তিনি॥

সিংহের খাদ্য স্বতন্ত্র, স্বভাব স্বতন্ত্র, বল বীর্য্য স্বতন্ত্র, সুতরাং সিংহের ধর্ম্মও সিংহ স্বভাবোপযোগী হওয়া প্রয়োজনীয়। আর দুর্ব্বল ভীরু মেষশাবকের ধর্ম্ম মেষশাবকের স্বভাবানুযায়ী হইয়া থাকে। যদি সিংহের ধর্ম্মে মেষশাবককে দীক্ষিত কর, অথবা মেষশাবকের ধর্ম্মে সিংহকে দীক্ষিত কর; তাহা হইলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।

পৃথিবীতে পূর্ব্বোক্ত দুই রূপ সম্প্রদায় ভিন্ন আরও অনেক সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। একদল লোক আছেন, যাঁহারা স্বভাবতই আত্মনিন্দুক। 'আমি অতি অভাজন,' 'আমি অতি পাপী,' 'আমি অতি অকিঞ্চন' প্রভৃতি আত্মগ্লানিকর চিন্তা প্রতিনিয়তই তাঁহাদের মনে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাঁরা ঈশ্বরের সহিত সখ্য বা প্রেম সংস্থাপন করিতে সাহসী হন না। ঈশ্বরের দাসানুদাস হইয়া থাকিতে পারিলেই ইঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়। কৃষ্ণ বা

ভবানী ইহাঁদের ইষ্টদেবতা হইতে পারেন না। কারণ মনে সাহস না থাকিলে প্রেমিক হওয়া যায় না। যে সর্ব্বদা আপনাকে আপনি ধিক্কার করে, সে প্রেমিক হইতে পারে না। আর মনে শক্তি না থাকিলে শক্তির উপাসক হওয়া বিড়ম্বনা। অতএব ইহাঁদের জন্য কোন পতিত-পাবন দীনোদ্ধারণ দেবতার প্রয়োজন। গুরু ইহাঁদের মানসিক প্রকৃতি দেখিয়া ইহাঁদিগকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করাইবেন। রামের চরিত্রে প্রেম নাই কিন্তু কারুণ্য আছে। রাম পাপীকে আলিঙ্গন করেন না। কিন্তু রাম পাপীর মস্তকে পদার্পণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। অহল্যা পাষাণী রামের পদস্পর্শে পাপমুক্ত হইল। যে ঈশ্বরের সহিত আলিঙ্গন-প্রয়াসী গুরু তাঁহাকে কৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত করাইয়া দেন। আর, যে চরণাশ্রয়ভিখারী গুরু তাহাকে রামের নিকট সমুপস্থিত করান। রামের গুণ-কথন কালে কবি কৃত্তিবাস গাহিয়াছিলেন।

সাধুজনে তরাইতে সর্ব্বজনে পারে।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে॥
অহল্যা পাষাণী হইয়াছিল দৈবদোষে।
মুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তরিবারে দুইটি পদ করেছ তরণি॥
তুমি যদি ছাড় দয়া, আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব॥

যাঁহার নূপুর হইবার ইচ্ছা আছে, যিনি আপনাকে অসাধু বলিয়া জানেন, যিনি প্রভুর প্রেমালিঙ্গন চাহেন না, যিনি প্রভুর পদে নিজ মস্তক স্থাপিত করিতে চাহেন, তিনি রামনামের ভজনা করুন।

এইরূপে যাঁহার চিত্তে যে ভাব প্রবল, গুরু, ঈশ্বরকে তাঁহার নিকট সেই ভাবে সমানীত করেন। যাঁহারা ভাগ্যদোষে সংসার-বিদ্বেষী, যাঁহাদের ক্রোড় হইতে মৃত্যু চন্দ্রানন তনয় কাড়িয়া লইয়াছে, যাঁহাদের বক্ষ হইতে প্রেমময়ী ভার্য্যা অন্তর্হিত হইয়াছে, যাঁহাদের চক্ষে সংসার শূন্যময়, বিষময়, গুরু তাঁহাদিকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করান। সংসারে সকলই অসার। যিনি দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁহার পদরজঃ লাভ করিয়া ইন্দ্র অমরাবতীর সুখ ভোগ করেন সেই মহাদেব 'বৃষভবাহন'' 'ভুজঙ্গ ভূষণ'' পিশাচ-পরিবৃত,"বিভূতি-ভূষিত-কলেবর''। সংসারের এই অসারতা উপলব্ধি করিয়া, নিজের মর্ম্মব্রণ বিস্মৃত হও। এবং সেই দেবাদিদেবকে হৃদয়ে বসাইয়া তাঁহার গুণগানে জীবন কাটাও।

যাঁহারা অর্ব্বাচীন, যাঁহারা কোন বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন না, তাঁহারা ব্যাসদেবের ন্যায় হিন্দুদিগের এই সমস্ত দেবতায় ভেদাভেদ করেন। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সক্ষম, তাঁহারা জানেন যে—

"হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে, সেই ভক্ত ধীর॥"

হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা বলিয়া হিন্দুকে অনেকে উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি বাস্তবিকই হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা থাকিত, তাহা হইলে আমি হিন্দুর

নিন্দা না করিয়া বরং তাহার কল্পনাশক্তি, ঈশ্বরানুরাগ, কবিত্ব প্রভৃতির প্রশংসা করিতাম। কারণ যে ঈশ্বর সম্বন্ধে খ্রীষ্টানেরা ও ব্রাহ্মেরা ৭। ৮টি মাত্র বিশেষণ প্রয়োগ করিতে পারেন,* যদি হিন্দু সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে তেত্রিশ কোটী বিশেষণ প্রয়োগ করিতে পারিত, তাহা হইলে কেনা হিন্দুকে প্রতিভাশালী কল্পনাশালী কবিত্বশালী জাতি বলিয়া স্বীকার করিত? কিন্তু বাস্তবিক হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা নাই। তবে হিন্দু এক কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, যে ঈশ্বরকে এক ভাবে, এক মূর্ত্তিতে, বা এক প্রকারে আরাধনা করা বিড়ম্বনা। ঈশ্বরের গুণ অসংখ্য, ভাব অসংখ্য, মূর্ত্তি অসংখ্য। যাহার মনে যে ভাব, যে মূর্ত্তি বা যে অবস্থা উদিত হয়, ঈশ্বরকে সে সেই ভাবে, সেই মূর্ত্তিতে, সেই অবস্থাতে আরাধনা করিতে পারে। এইরূপে যদি ঈশ্বরের মূর্ত্তির বা ভাবের বা অবস্থার সংখ্যা তেত্রিশ কোটী বা তেত্রিশ পরার্দ্ধ হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। হিন্দু সকল প্রকার ঈশ্বর-মূর্ত্তি, ঈশ্বর-ভাব ও ঈশ্বর অবস্থাকে, পুষ্প বিল্বপত্রাদি দিয়া পূজা করিতে প্রস্তুত আছে।

পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের বিশালতার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইল। এতৎসম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিতেছি।

উপাসনা, আরাধনা, স্তব স্তুতি প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু নীতিশিক্ষা, নীতিপ্রচার, জ্ঞানশিক্ষা, হিতোপদেশ প্রভৃতিকে ধর্ম্মের গৌণ অংশ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। নীতিশিক্ষার উৎকর্ষ আছে বলিয়া বর্ত্তমান হিন্দু খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মকে ভক্তি করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অপেক্ষাও সহস্রগুণে উত্তম উত্তম নীতিশিক্ষা হিন্দুশাস্ত্রমালার কত স্থানে অলক্ষিতভাবে ছড়ান রহিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে যে দশটি নীতিমালা আছে তাহা হিন্দুশাস্ত্রে কেন, চাণক্য শ্লোক, নীতিসার প্রভৃতি শিশুপাঠ সমস্তেও পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টানদিগের দশটি নীতিমালা এইরূপ।

১। আমি ভিন্ন তোমাদের কেহ ঈশ্বর থাকিবে না।

২। কোন মূর্ত্তির আরাধনা করিবে না।

৩। বিনা কারণে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে না।

৪। ছয় দিন পরিশ্রম করিয়া একদিন বিশ্রাম করিবে।

৫। পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে।

৬। হত্যা করিবে না।

৭। পরদার করিবে না।

৮। চুরি করিবে না।

৯। তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিবে না।

১০। তোমার প্রতিবেশীর গৃহ দেখিয়া লোভ করিবে না। তাহার স্ত্রী দেখিয়া লোভ করিবে না। তাহার চাকর চাকরাণী, গোরু বলদ প্রভৃতি দেখিয়া লোভ করিবে না।

---

* খ্রীষ্টানেরা omniscient, omnipotent প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহার করেন। ব্রাহ্মেরা শুদ্ধং জ্ঞানং অনন্তং প্রভৃতি কয়েকটির উল্লেখ করেন।

এই কয়টি নীতিপুষ্পের মধ্যে প্রথম চারিটির সহিত নীতির কোন সংস্রব নাই। * অবশিষ্ট ছয়টি চাণক্য শ্লোকের দুই একটি কবিতা হইতেই সংগৃহীত হইতেপারে। যথা—

মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥১॥

কিম্বা

পরদারং পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরোঃ স্থানে চাপলঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২॥

এবং

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥৩॥

পরদার করিবে না,শুদ্ধ তাহা নহে, পর স্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবে। শুদ্ধ যে পর দ্রব্য লইবে না তাহা নহে, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিবে। এই রূপে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে যে কএকটি হিতোপদেশ আছে, তাহার ন্যায়, বরং তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হিতোপদেশ হিন্দুশাস্ত্রের সামান্য সামান্য পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবং প্রয়োজন পড়িলে বোধ হয় প্রমাণও করিতে পারি যে,অন্য সমস্ত প্রাচীন জাতির হিতোপদেশ মালা একত্র সংগৃহীত করিলেও হিন্দুশাস্ত্রনিহিত হিতোপদেশ মালার তুল্য হইবে না।

হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিম্নে আরও দুই একটি কথা বলিতেছি।

ক। একদা খ্রীষ্ট শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ধর্ম্ম কথা কহিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার মাতা ও ভাই বন্ধুগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কথায় উন্মত্ত, তাঁহার মাতা ও ভাই বন্ধুদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িল না। শিষ্যগণ বলিল—'হে খ্রীষ্ট! ঐ দেখ তোমার মাতা ও ভাই বন্ধুগণ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন'। খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—'এই শিষ্যগণই আমার মাতা, আমার ভ্রাতা ও আমার ভগিনী। আমার অন্য মাতা বা অন্য ভ্রাতা বা অন্য বন্ধু নাই। যে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করে,সেই আমার মাতা,সেই আমার ভ্রাতা, সেই আমার বন্ধু।' যে খ্রীষ্টের ন্যায় গর্ভধারিণীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে কাতর,সে সহস্র ধার্ম্মিক হইলেও হিন্দুর ভক্তিভাজন হইতে পারে না। হিন্দুর কৃষ্ণ নন্দের বাধা মস্তকে বহন করিতেন। হিন্দুর কৃষ্ণ জননীর কারামুক্তির জন্য কংসবধের আয়োজন করিলেন। হিন্দুর রাম পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুর চৈতন্য মাতৃভক্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাব প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। চৈতন্যও খ্রীষ্টের ন্যায় ধর্ম্মোন্মত্ত ও ধর্ম্মপ্রচারক। খ্রীষ্ট অপেক্ষাও তাঁহার শিষ্যসংখ্যা অনেক অধিক ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার মাতৃভক্তি কিরূপ, তাহা বিবেচনা করুন। চৈতন্য বলিতেছেন

"এই বস্ত্র মাতাকে দিহ,এই সব প্রসাদ। *

* খ্রীষ্ট নিজেই এই চারিটি নীতি বাদ দিয়াছিলেন।

* জগন্নাথের মহাপ্রসাদ।

দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ কর্ম্ম নাশ ॥
তাঁর প্রেম-বশ আমি তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাঁরে ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এই জানি মাতা মোরে না করিহ রোষ ॥"

চৈতন্য তাঁহার শিষ্যদিগকেও ঐ রূপ শিক্ষা দিতেন। একদা এক শিষ্য পিতার অনভিমতে বৈরাগ্য অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চৈতন্য তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন,

'স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা ক'র বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥'

খ। আর একদিন খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বল দেখি আমি কে?' সাইমন পিটার নামে তাঁহার এক শিষ্য বলিল—'আপনি মুক্তিদাতা, ঈশ্বরপুত্র'। খ্রীষ্ট বলিলেন—'শিষ্য! তুমি বড় পুণ্যাত্মা। কারণ তুমি নিজে একথা বলিতেছ না। ঈশ্বর তোমাকে একথা বলাইতেছেন।' খ্রীষ্ট চরিতের এই অংশের সহিত চৈতন্য-চরিতের ঐ রূপ এক অংশের তুলনা করুন। একজন ভক্ত চৈতন্যকে বলিতেছেন—

'বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥'

চৈতন্য ইহা শুনিয়া উত্তর দিতেছেন—

'প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিহ।
জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিহ ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ কিরণ কণ সম। *
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যসম ॥
জীবে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥'

(গ) খৃষ্ট যখন দেশীয় পণ্ডিত দিগের সহিত তর্ক করিতেন তখন এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন—

'অরে ভণ্ডগণ! তোরা আকাশের পরিবর্ত্ত বুঝিতে পারিস, কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্ত বুঝিতে পারিস না'। কিন্তু চৈতন্য ঐ অবস্থায় কি করিতেন শ্রবণ করুন।

'তত্ত্ববাদী আচার্য্য সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥'

এই রূপে আরও শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত হওয়া যাইতেছে। যাহা দেখান গেল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে,চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে চৈতন্য খ্রীষ্ট অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। বরং অনেক বিষয়ে চৈতন্য খ্রীষ্ট অপেক্ষা অধিকতর বি-

---

* অর্থাৎ চৈতন্য নিজে সেই চিন্ময় পুরুষের এক কণামাত্র। সেই কিরণ ময় পুরুষের এক কণামাত্র।

নয়ী, অধিকতর নিরহঙ্কার, ও অধিকতর ঈশ্বর-প্রেমী।

মত সম্বন্ধেও হিন্দুধর্ম্মে খ্রীষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক সুন্দর সুন্দর তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। অনেকে হিন্দুধর্ম্মকে বৈরাগীর ধর্ম্ম বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করেন। হিন্দুধর্ম্ম যে বৈরাগ্যবহুল তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই, যে খ্রীষ্টধর্ম্মও বৈরাগ্য-বহুল। শুনুন খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে কিরূপ উপদেশ দিতেছেন।

"মনে করিওনা যে, আমি মনুষ্যের মধ্যে সখ্যসংস্থাপন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি মনুষ্যের মধ্যে সখ্যসংস্থাপন না করিয়া তাহাদের মধ্যে অকুশল, কলহ প্রভৃতি সংস্থাপন করিব।*

"আমার প্রভাবে পুত্র পিতার সহিত কলহ করিবে, কন্যা মাতার সহিত কলহ করিবে, পুত্রবধূ শ্বশ্রূর সহিত কলহ করিবে।

"এবং মনুষ্যের নিজ পরিবারই তাহার প্রধান শত্রু হইবে।

"যে পিতা মাতাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে সে আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যে পুত্র কন্যাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে সেও আমাকে প্রাপ্ত হয় না।" চৈতন্যের মতে খ্রীষ্টীয় বৈরাগ্য মর্কট-বৈরাগ্য বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

খ্রীষ্টের পার্ব্বতীয় উপদেশ মালার মধ্যে অনেক গুলি অতীব উৎকৃষ্ট। যথা,—

'তোমরা শুনিয়াছ, প্রাচীন মহাপুরুষেরা বলিতেন যে, পরদার করিও না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে নারীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করে, সেও মনে ব্যভিচার দোষে দোষী হইয়াছে।

"এবং যদি তোমার দক্ষিণ চক্ষু তোমাকে পাপান্বিত করে, তাহা হইলে ঐ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তোমা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করিবে। কারণ যদি তোমার সর্ব্বশরীর নষ্ট না হইয়া, কেবল শরীরের এক অঙ্গ মাত্র নষ্ট হয়, তাহাও তোমার পক্ষে শ্রেয়।" —কিন্তু সংস্কৃতে এইরূপ ভাব বিরল নহে।

'যাঁহার আত্মা জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয়, এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর, ও কাঞ্চনে যিনি তুল্যজ্ঞান করেন সেই যোগীই যুক্ত অর্থাৎ যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মহেন্দ্র নাথ ঘোষালের অনুবাদ।)

'সুহৃদ্, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বন্ধু, সাধু, অসাধু, এই সকলে যাঁহার সমান জ্ঞান, তিনিই বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।' ঐ

'চঞ্চল নদী, অচঞ্চল স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার (সমুদ্রের) কলেবর বৃদ্ধি করে। সেই রূপে যাঁহার অন্তঃকরণে ভোগাভিলাষ প্রবিষ্ট হইয়া উহার (অন্তঃকরণের) বলবৃদ্ধি করে, সেই ব্যক্তিই সাধু। যিনি ভোগাভিলাষী (কামকামী) তিনি সাধু নহেন।' (আমার নিজের অনুবাদ)

'যেমন ধুম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পন ও জরায়ুদ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, ত-

* "Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace but a sword." Mattew X (34—37)

রূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।'

বাইবেলের ভাষা অপেক্ষা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষা কত কোমল, মধুর, ও ভাবপূর্ণ তাহা সকলেই উদ্ধৃত কএকটি গাথা হইতে বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ যৎকালে বাইবেল্ রচিত হয়, তখন মনুষ্য অসভ্য ছিল। অসভ্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে কোমল মধুর জ্ঞানগর্ভ পদাবলী দ্বারা আকৃষ্ট করা যায় না। অসভ্য জাতির ধর্ম্ম প্রায়ই অসভ্য ভাষায় রচিত হইয়া থাকে। সে ভাষা কঠোর, কর্কশ ও ভয়াবহ। কিন্তু সভ্যজাতির জন্য সভ্য ভাষার প্রয়োজন। যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রচিত হয় তখন হিন্দুরা সভ্যতাসোপানে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এই জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষা বাইবেলের ভাষা অপেক্ষা এত উৎকৃষ্ট।

সাধারণ সর্ব্ববিদিত সংস্কৃত শ্লোক হইতেও পূর্ব্বোক্ত খ্রীষ্টীয় ভাবগুলির সদৃশ ভাব উদ্ধৃত করিতে পরিতাম। 'অর্দ্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ।' ও 'অঙ্গুলীবোরগক্ষতা' র বিষয় হিন্দুরা অনেকেই অবগত আছেন।

আমরা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মোক্ত দুইটি ভাবের বিষয় উল্লেখ করিব। আমাদের বিশ্বাস যে, এই দুইটি ভাবের তুল্য মধুর ও উচ্চ ধর্ম্মভাব পৃথিবীস্থ অন্য কোন ধর্ম্মে পাওয়া দুষ্কর হইবে।

১ম। সকল ধর্ম্মেরই প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তি। মৃত্যুর পরে অসহ্য সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া অশেষ সুখধামে বাস করিব, ইহা সকল ধার্ম্মিকেই আশা করেন। যাহার মনে যেরূপ সুখের বাসনা প্রবল, তিনি স্বর্গে সেইরূপ সুখভোগের আশা করিয়া থাকেন। এবিষয়ে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু সকলেই সমান। খ্রীষ্টানের আশা এই যে, তিনি স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দিবানিশি ঈশ্বরস্তুতি গান গাইবেন। মুসলমানের আশা যে,কৃষ্ণনয়না অপ্সরীগণ স্বর্গধামে তাঁহার পদ সেবা করিবে। হিন্দুর আশা যে, অমরাবতীর নন্দন কানন ও স্বর্গ বিদ্যাধরীগণ তাঁহার সুখবিধান করিবেন। যে সুখ এ পৃথিবীতে ভোগ করিতে পাইলাম না, তাহা স্বর্গে গিয়া ভোগ করিব এই আশা ধার্ম্মিকের মনে জাগরূক থাকা বিচিত্রও নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এক অংশে মনুষ্য এই স্বার্থপর আশাকে পরাজিত করিয়াছিল। মনুষ্য বলিতে শিখিয়াছিল যে, হে ঈশ্বর! আমি মুক্তি চাহি না,আমি স্বর্গসুখ চাহি না; আমি চাহি যে,—আমার হৃদয়ে ভক্তি প্রবলা হউক। আমি বারংবার দুস্তর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বারংবার এই দুঃখ বারিধি সংসার তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে প্রস্তুত আছি। কেবল আমি এই মাত্র ভিক্ষা চাই যে, আমার হৃদয় ভক্তিমান্ হউক। এই উদার, উচ্চ, পবিত্র ধর্ম্মভাব শ্রীচৈতন্য অতি সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে:—

ভট্টাচার্য্য কহে, ভক্তিসম নহে মুক্তিফল

* * * *

'' সাযুজ্য (এক প্রকার মুক্তি) শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।

নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
*　　*　　*　　*
মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে দুই কাঁহা দুঁহার গতি।
স্থাবর দেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥"

এই মত সংস্কৃতেও লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা—

'সালোক্য,সার্ষ্টি,সামীপ্য,সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনংজনাঃ ॥'

অর্থাৎ 'ঈশ্বরের সহিত একত্রাবস্থান, ঈশ্বরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যভোগ; ঈশ্বরের সমীপে বাস, ঈশ্বরের সমান রূপপ্রাপ্তি ও ঈশ্বরের সহিত অভেদত্ব নামক যে পাঁচ প্রকার মুক্তি আছে, ভক্ত তাহা পাইলেও গ্রহণ করে না। কারণ ঐ পাঁচ প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণ সেবার ব্যাঘাত হইতে পারে।'

ভক্তি মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা সাধারণ হিন্দুতেও বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। আমাদের পাঠকেরাও অনেক বার ঐ ভাবেব সঙ্গীত বৈরাগীদের মধ্যে শুনিয়া থাকিবেন। আমরাও একবার একজনকে নিম্নলিখিত গীতটি গান করিতে শুনিয়াছিলাম।

'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই
আমি ভক্তি দিতে কাতর হই নারদ রে।'
ইত্যাদি।

আর একটি গীতেও ঐ ভাব লক্ষিত হয় যথাঃ—

নয়নের তারা হয়ে থাক মা তারা।
তোমার চারুচরণ,　　আমার সর্ব্বস্ব ধন,
নয়নের আভরণ, হই না যেন হারা ॥
মুক্তি গতি নাহি চাই, তবে যেন আসি যাই,
ইন্দ্রত্ব পদ নাহি চাই, স্বর্গেবাস করা ॥

আমরা পুনরায় বলিতেছি যে, আমাদের বিশ্বাস মতে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতিই ভক্তির মাহাত্ম্য এত উচ্চ, পবিত্র ও গম্ভীর ভাবে পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। যদি কেহ অন্য জাতির মধ্যে এই ভাব দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

২য়। আমরা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মোক্ত দ্বিতীয় বিশিষ্ট মতটির উল্লেখ করিতেছি।

এই মতটিও চৈতন্য হইতেই লোক সমাজে এত সুন্দর রূপে প্রচারিত হইয়াছে। মতটি প্রথমতঃ প্রাচীন পণ্ডিতগণানুসারে ব্যাখ্যা করিতেছি।

ঈশ্বরপ্রেম পাঁচ ভাবে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তে যে কয়টি গুণ আছে, দাস্যে তাহার অধিক আছে। দাস্যের গুণসংখ্যা অপেক্ষা সখ্যের গুণসংখ্যা অধিক। এই রূপে মধুরের গুণসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু শুদ্ধ তাহা নহে। শান্তের গুণ গুলি সমস্ত দাস্যে উপলক্ষিত হইবে। শান্ত ও দাস্যের সমস্ত গুণ সখ্যে উপলক্ষিত হইবে। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই সমস্ত ভাবের গুণসমষ্টি মধুরে উপলক্ষিত হইবে। পর পৃষ্ঠে এই সমস্ত রস ও ইহাদের গুণ নিচয়ের তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

রসের নাম	গুণের নাম
(১) শান্ত	কৃষ্ণনিষ্ঠা + বিষয় ত্যাগ + ঈশ্বর স্বরূপজ্ঞান।
(২) দাস্য	(শান্ত) + ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্য জ্ঞান + সেবা।
(৩) সখ্য	(শান্ত + দাস্য) + বিশ্বাস + সম্ভ্রমরাহিত্য + মমতা।
(৪) বাৎসল্য	(শান্ত + দাস্য + সখ্য) + লালন + অধিকতর মমতা।
(৫) মধুর	(শান্ত + দাস্য + সখ্য + বাৎসল্য) + কান্তভাব। *

কোম্‌টের classification of sciences এই প্রণালীতে বিভক্ত হইয়াছে। (Lewes' History of philosophy Vol II.)

যখন মনুষ্যের মন প্রথম ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, তখন যেন এক প্রকার স্তম্ভিতের ভাব মনুষ্যের মনে অধিকার প্রাপ্ত হয়। তখন আর বিষয় স্পৃহা থাকে না, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ দমিত থাকে এবং হৃদয়ে একরূপ শান্তভাব বিরাজিত হয়। পরে যখন ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, ক্ষমতা প্রভৃতির কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইল তখন মনুষ্য তাঁহার দাস হইয়া পড়ে। সংসারের প্রতি বিরাগ বরং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। তাহার পরে যখন ঈশ্বরের অপার করুণার কথা উপলব্ধি করা যায় তখন ঈশ্বরের সহিত সখ্য সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বরের নিকট সম্ভ্রম, বিনয় প্রভৃতি অন্তর্হিত হয়। তাহার পরে যখন ঈশ্বরের মাধুর্য্য প্রভৃতির উপলব্ধি করা যায় তখন তাঁহার সহিত আরও ঘনিষ্ট সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। তখন সেই ঈশ্বরের সহিত যে প্রেম সংস্থাপিত, তাহা পুত্রস্নেহের ন্যায় প্রবল। তাহার পরে যখন ঈশ্বরের মাধুর্য্য আরও প্রকৃষ্ট রূপে উপলব্ধি করা যায়, তখন ঈশ্বরের সহিত কান্তভাব সংস্থাপিত হয়। অর্থাৎ তখন ঈশ্বরের সহিত যে প্রেম সংস্থাপিত হয় তাহার সহিত কেবল দাম্পত্য প্রেমের তুলনা হইতে পারে। যাহার হৃদয়ে এই রূপ ঈশ্বর-প্রেম বলবান্ সেই ভক্তই ভাগ্যবান। তাহার জীবন সার্থক। অনেকে এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ভক্তপ্রধান তাঁহারা এই অতুল সুধারস ভোগ করিয়া জীবন সার্থক করেন।

এই ভাবটি যে অতীব গভীর ও অতীব মধুর ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আর যাঁহারা বর্ত্তমান ব্রাহ্মগুরু বঙ্গকুলতিলক বাবু কেশব চন্দ্রের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহার কতক পরিমাণে কেশব বাবুর জীবনেও এই ভাবটির যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

হে হিন্দুযুবা! তুমি কৃতবিদ্য হইয়াও আর কতকাল তোমার পৈতৃক রত্নরাশির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে? তোমার গৃহ ধর্ম্মসম্বন্ধে রত্ন-ভাণ্ডার। আ-

মার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিও ঐ গৃহে প্রবেশ করিলে রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। কিন্তু ঐ অতুল্য ধর্ম্ম ভাণ্ডার সত্ত্বেও তুমি ধর্ম্মের জন্য যাহার তাহার দ্বারস্থ হইতেছ! যাহা তোমার গৃহে অগণ্য, তাহার কণামাত্র পাইবার জন্য খৃষ্টীয় পাদ্রীর পদলেহন করিতেছ! ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? নয়ন উন্মীলন কর। গৃহে যাহা নাই তাহা অন্য দেশ হইতে সঞ্চয় কর, কিন্তু গৃহে কি আছে তাহা একবার অনুসন্ধান কর। খৃষ্টীয় পাদ্রীর কথায় ভুলিয়া গিয়া গৃহের প্রতি অনাস্থা ও অনাদর প্রকাশ করিও না। ভিন্নপত্নীর ন্যায় গজমুক্তাকে বদরীজ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিও না।

আর হে খৃষ্টান পাদ্রীগণ! তোমরা গভীর ভ্রমপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছ! আমাদের দশভুজা, শালগ্রাম প্রভৃতি দেখিয়া আমাদিগকে আমেরিকার আদিম অধিবাসীর ন্যায় ধর্ম্ম দরিদ্র বলিয়া মনে করিয়াছ! কিন্তু দেখিতেছ না, তোমাদের খৃষ্টান মোক্ষমূলরও আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানের কিরূপ আদর করিতেছেন? দেখিতেছ না জর্ম্মনির পণ্ডিতগণ কিরূপ সপ্রেমনয়নে আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। যে জাতি ধর্ম্মের জন্য বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, জয়, কীর্ত্তি সুখ সকল পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে, তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা আর কি শিখাইবে? তোমাদের বাইবেলের ন্যায় শত সহস্র ধর্ম্মপুস্তক এদেশে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব আর হিন্দুধর্ম্ম বা দেব দেবীর প্রতি উপহাস বা কটুকাটব্য প্রয়োগ করিও না। তোমাদের উপহাসে ও কটুকাটব্যে এই লাভ হইয়াছে যে, ধর্ম্মপ্রবণ হিন্দুজাতির মন হইতে ধর্ম্ম প্রায় বিদায় লইয়াছে। যাহা তোমরা ভাঙ্গিয়াছ তাহা তোমরা গড়িতে পারিতেছ না। অতএব আর ভাঙ্গিও না। যদি ধর্ম্ম তোমাদের আদরের সামগ্রী হয়, তবে আর ধর্ম্ম লইয়া উপহাস করিও না। ধর্ম্ম শিরীষপুষ্প অপেক্ষাও কোমল। নিশ্বাসের বায়ু লাগিলেও ইহা বৃন্তচ্যুত হয়। অতএব ইহার উপরে তোমাদের গোলা, গুলি, কামান, বেয়নেট প্রয়োগ করিও না। যদি লোককে ধার্ম্মিক করিতে চাও, তবে অন্য উপায় অবলম্বন কর। তোমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ * তাহাতে তোমাদের কিছুমাত্র লাভ হইবে না, কিন্তু আমাদের সমূহ অনিষ্ট হইবে।

(ক্রমশঃ)

* See Mr Hastie's letters in the Statesman.

আয়ুর্ব্বেদ।

(৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

(৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

শিশু পরিচর্য্যাবিধি।

শিশুকে সাবধান পূর্ব্বক (অর্থাৎ কোন রূপে অঙ্গাভিঘাত না হয় এইরূপ ভাবে) ক্রোড়ে রাখিবে। কোন বিষয়ে তর্জ্জন করিবে না। শিশু নিদ্রাগত হইলে হঠাৎ জাগরিত করিবে না। তাহাতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া পীড়িত হইতে পারে। উপবেশনের অযোগ্যাবস্থায় উপবেশন করাইবার চেষ্টা করিবে না। কারণ তাহাতে শিশু কুব্জ হইতে পারে। সহসা আকর্ষণ করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে গ্রহণ অথবা ত্বরা পূর্ব্বক শয়নে নিক্ষেপ করিবে না। কারণ তাহাতে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া নানা পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। বিশেষ আবশ্যক কার্য্য (দুগ্ধপান, ঔষধসেবন, তৈলাভ্যঙ্গ, গাত্রমার্জ্জন প্রভৃতি) ভিন্ন শিশুকে অনর্থক রোদন করাইবে না এবং কৌতুক পূর্ব্বক শিশুকে শূন্যে নিক্ষেপ করিবে না। শিশু যে প্রকারে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকিবে এবং বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টি, বিদ্যুদালোক, বৃক্ষ, লতা, শূন্য গৃহ, গৃহচ্ছায়া, নিম্নোচ্চস্থান, ধূলি, ধূম ও জল অগ্নি প্রভৃতি হইতে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। ১

অন্নাশন কাল।

ষষ্ঠমাসে শিশুকে বিধিপূর্ব্বক স্বল্পমিত লঘুপাক অন্ন ভোজন করাইতে আরম্ভ করাইবে। তৎপরে ক্রমশঃ উহার মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ২ (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্তঃ।

---

১ বালমঙ্কে সুখংদধ্যান্নচৈনং তর্জ্জয়েৎ কচিৎ। সহসা বোধয়েন্নৈব নাযোগ্যমুপবেশয়েৎ। নাকৃষ্যস্থাপয়েৎ ক্রোড়ে নক্ষিপ্রংশয়নেক্ষিপেৎ। রোদয়েন্নকচিৎকার্য্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা। তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেততং সদৈবানুমোদয়েৎ। নিম্নোচ্চস্থানতশ্চাপি রক্ষেৎ বালংপ্রযত্নতঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)** বাতাতপবিদ্যুৎপ্রভাপাদপলতাশূন্যাগার নিম্নোচ্চস্থানগৃহচ্ছায়াদিভ্যোদুর্গ্রহেভ্যশ্চ বালং রক্ষেৎ॥ (সুশ্রুত)

২ ষণ্মাসঞ্চৈনমন্নং প্রাশয়েল্লঘুহিতঞ্চ। (সুশ্রুত)

মহত্ত্ব ও মিতব্যয়।

এই দুইয়ের স্বরূপ ও সম্বন্ধ।

" What would life be without arithmatic, but a scene of horrors ? "

যাহারা বয়সে বালক না হইলেও বুদ্ধি-চাঁপল্যে বালক, অথবা যাহারা স্বভাবতঃ অবোধ না হইয়াও সংসারের গতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এই প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিবে। হয় ত তাহারা এইরূপও বা বলিয়া উঠিবে যে, কোথায় নন্দনজাত কল্পপাদপের উচ্চতম উচ্চতা, আর কোথায় তিমিরাবৃত গিরিগহ্বরের নিম্নতম নীচতা! কোথায় কাব্যের কমনীয় বিলাস, আর কোথায় কড়া ও ক্রান্তির কদর্য্য গণনা! কোথায় মহত্ত্বের চিরস্পৃহনীয় মাধুরী, আর কোথায় মিতব্যয়ের চিরবিতৃষ্ণাজনক ক্ষুদ্রচিন্তা! এই দুইয়ে কি কখনও কোনরূপ ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ সম্ভবপর হইতে পারে?

আমাদের বিশ্বাস এমন নহে এবং এই জন্যই আমরা এই অতিলঘু প্রশ্নের নিকট গুরুভারাক্রান্ত চিত্তে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি। আমরা ইহা জানি যে, এজগতে যদি কিছু উপাস্য পদার্থ থাকে, সেই অতুল ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ মহত্ত্ব, এবং যিনি যে পরিমাণে মহত্ত্বের উচ্চ আদর্শকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা করিয়া পরিপোষণ করিতে পারেন, তিনিই সেই পরিমাণে মনুষ্যজাতির পূজনীয় এবং মনুষ্যত্বের বিশ্রামস্থল। আমরা ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি যে, এই সুবিস্তীর্ণ সংসারমরুতে যদি কিছু আদরের বস্তু থাকে, সেই বস্তু মহত্ত্ব, এবং যিনি যতটুকু মাত্রায় মহত্ত্বের আদর করিতে জানেন, তিনিই ততটুকু মাত্রায় মনুষ্যমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন সুহৃৎ। আমরা ইহাও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে, মহত্ত্ব কাব্যের প্রাণ, কল্পনার মূল প্রস্রবণ, ধর্ম্মের ধারণভিত্তি এবং শুধু মহত্ত্বই সৌন্দর্য্যের সার।

কবিতা স্বভাবতঃই মনুষ্যের হৃদয়গ্রাহিণী হয় কেন? এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর হইতে পারে। সংসারে যাহা পাই না, কবিতায় তাহা পাই, এইজন্য কবিতা হৃদয়গ্রাহিণী। সর্ব্বত্র যাহা শুনি না, কবিতার অস্ফুট আলাপে সময়ে সময়ে তাহা শুনিয়া থাকি, এই জন্য কবিতা হৃদয়গ্রাহিণী। কিন্তু এই সমস্ত উত্তরের উপর সর্ব্বপ্রধান উত্তর এই যে, মাটির মানুষ, প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং স্বার্থ ও প্রয়োজনের শাসনে মহত্ত্বের যে উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, কবিতার মানুষ সেই দুর্নিরীক্ষ ও দুরারোহ উচ্চতায় অবলীলাক্রমে উত্থিত হইয়া, মনুষ্যের কলুষপঙ্কিল কল্পনাকে অলৌকিক পদার্থের ন্যায় ক্রমশঃই সেই ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ কিংবা আহ্বান করে,—মনুষ্যকে ক্ষণকালের জন্য হইলেও ক্ষুদ্রতা ও নীচতার

নিম্নভূমি হইতে সবলে তুলিয়া লইয়া, মহত্ত্বের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আলেখ্য দেখাইয়া মোহিত করিয়া রাখে, এই জন্যই কবিতা মনুষ্যের হৃদয়গ্রাহিণী। পৃথিবীতে যে কয়খানি কাব্য আছে, মহত্ত্বই তাহার মূলমন্ত্র। যে কাব্য এই মন্ত্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, অধঃপাতের আপাতমধুর সংগীত শুনাইয়া মনুষ্যের মন ভুলাইতে যত্ন পাইয়াছে,তাদৃশ বিকটবস্তুকে কাব্য বলা শব্দশাস্ত্রের বিড়ম্বনা।

ধর্ম্ম মনুষ্যের মন এবং মনুষ্যসমাজের উপর স্বভাবতঃই আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয় কেন? সম্রাট্ তাঁহার সিংহাসনের উপরে বসিয়া যাহাদিগকে চালনা করিতে সক্ষম হন না, এক জন সামান্য ব্যক্তি শুধু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে বিনা মূল্যে কিনিয়া লইতে অধিকারী হয় কিসে? এই প্রশ্নেরও অনেক উত্তর আছে। কিন্তু বোধ হয় যিনিই এই বিশ্বজনীন প্রশ্নের উত্তর করিতে চেষ্টা করিয়া চিন্তার নিভৃতনিবাসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আপনার অন্তরের অন্তরতম স্থান হইতে এই উত্তর পাইয়াছেন যে,—কাব্যের ন্যায় ধর্ম্মেরও প্রধান লক্ষ্য মহত্ত্ব এবং এই জনাই ধর্ম্ম মনুষ্যজগতের প্রভু ও মনুষ্য ধর্ম্মের অধীন। এই বিশ্বসমুদ্রের বিবর্ত্তনে *জীবের পর জীবের বিকাশ হইয়াছে, নিকৃষ্টের পর উৎকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্টপরম্পরায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং সেই জীবজগতের জীবন-প্রবাহে মহত্ত্বের আদর্শরূপ মানসকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া আজি মনুষ্যকে প্রবৃত্তিজন্য মোহের নিগড় ভাঙ্গিতে শিক্ষা দিতেছে। এমন যে আরাধনার ধন, মনুষ্যত্ববিশিষ্ট কোন্ ব্যক্তি ইহাতে উপেক্ষা করিতে পারে? এই পৃথিবী যে দিন ইহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও ভজনালয় হইতে মহত্ত্বের সকল প্রকার কল্পিতমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সমুদ্রজলে ভাসাইয়া দিবে এবং সেই সকল শূন্যদেবালয় ও শূন্যভজনালয়ে নিকৃষ্টসম্পদের নানাবিধ বিকটবিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজার আয়োজনে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিবে, পৃথ্বীবাসের সহিত সেই দিন পশুনিবাসের কোন পার্থক্য থাকিবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ। কেন না, মনুষ্য আপনার মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হইয়া, প্রয়োজনের অনুরোধে কিংবা পাশবশক্তির পীড়নভয়ে, পিশাচের নিকটেও মাথা নো-

(১) আমরা Evolution এই অর্থে বিবর্ত্ত শব্দের ব্যবহার করিলাম। Evolution ও বিবর্ত্ত এই দুই শব্দে ধাত্বর্থে অভিন্নতা দৃষ্ট হয়; এবং ইংরেজীতে যাহাকে ইদানীং Theory of Evolution বলে, পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে তাদৃশ কোন রূপ দার্শনিক মতকেই যে বিবর্ত্তবাদ বলিত, ইহারও আভাষ পাওয়া যায়। “ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ” এই নামটিও এই কথারই নিদর্শন বলিয়া সুবিজ্ঞ শাব্দিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াথাকে। বিকাশ বলিলে যে, অধিকতর সরল ও সুখগ্রাহ্য হয়,তাহার সন্দেহ নাই,এবং Evolution বলিলে যাহা বুঝায়, বিকাশ বলিলেও তাহা কিয়ৎপরিমাণে না বুঝায় এমন নহে। কিন্তু Evolution ও বিকাশ এই দুইয়ের ধাত্বর্থে বড় বৈষম্য।

য়াইতে পারে। ইহা মানবজাতির পুরাতন কলঙ্ক, এবং এ কলঙ্ক শীঘ্র যে পুঁছিয়া যাইবে এমন আশা অতি দুর্ব্বল। কিন্তু যদি প্রীতি ও ভক্তির অনুরোধে মাথা নোয়াইতে হয়, তাদৃশ স্থান মহত্ত্বের পাদপীঠ। সুতরাং মহত্ত্বের উপাসনা যদি পৃথিবী হইতে একবারে প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রীতি অথবা ভক্তির আর অবলম্ব থাকে কোথায়? এবং যেখানে প্রীতি নাই ও ভক্তি নাই, অথবা প্রীতি ও ভক্তি যেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, কে সেই প্রত্যক্ষ নিরয়ে সাধ করিয়া বাঁচিয়া রহে?

এই সকল কথা ভাবিয়াই বলিয়াছি যে, মনুষ্যজগতে মহত্ত্বের তুলনা নাই। মহত্ত্ব যদি পর্ণকুটীরে লতাপাতার আচ্ছাদনে পড়িয়া থাকে, সেই পর্ণকুটীরও স্বর্গপ্রাসাদ হইতে সুন্দর দেখায়। মহত্ত্ব যদি অসংখ্য-গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণাম্বরে পরিহিত রহে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও সেখানে লজ্জায় নিষ্প্রভ হয়। বাহিরের শোভা ও বাহিরের সুচিক্কণ কারুকার্য্য ক্ষুদ্রতারই উপযুক্ত আবরণ। মহত্ত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে কোনরূপ কৃত্রিম সহায়তার অপেক্ষা করে না। উহা যদি বাহিরের সকল প্রকার কান্তি ও কমনীয়তাতে বঞ্চিত হইয়া আপাততঃ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ন্যায়ও প্রতীয়মান হয়, তথাপি উহার গৌরব ও সৌরভ কালসহকারে দিগন্ত ছড়াইয়া পড়ে, এবং যাহার চক্ষু আছে সেই যেমন প্রাতঃসূর্য্যের প্রফুল্লজ্যোতিঃ দেখিয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকে, সেইরূপ যাহার চিত্ত আছে, সেই মহত্ত্বের প্রদীপ্ত অথচ প্রসন্ন প্রতিভা দর্শনে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া রহে।

কিন্তু সে মহত্ত্ব কি?—পরার্থ আত্মশাসন, পরার্থ আত্মসুখ-বিসর্জ্জন। উচ্চাভিলাষ, উচ্চস্পর্দ্ধা, মান ও মনস্বিতা, সাহস ও শৌর্য্য এ সকল ভাবও মহত্ত্বের উপাদান বলিয়া সদ্‌যুক্তিসহকারেই গৃহীত হইয়া থাকে। যখন দেখিতে পাই যে, যিনি ভয়ে যমের নিকটও দৃষ্টিসংকোচন করেন না, স্নেহে তিনি শিশুর নিকটও গলিয়া পড়েন, ন্যায়ের শাসনে শত্রুকেও তিনি সম্মান করেন এবং সত্য ও সাধুতার অনুরোধে অনুগত জনের আনুগত্য অবলম্বনেও তিনি অভ্রূভঙ্গ রহেন, আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র এবং তিনি মহান্। কারণ, যে মহত্ত্বের উপাসনা করে না, সে কখনও শক্তিসত্ত্বে শক্তিসংযম করিতে ইচ্ছুক হয় না এবং বৈভবের সহিত বিনয়ের মিশ্রণ কিরূপ মধুর ও মনোহর তাহা বুঝিয়া উঠে না। যখন দেখিতে পাই যে, শাকান্নমাত্র যাঁহার সম্বল, তিনি আত্মাবমাননা ও আত্মবিক্রয়ের মূল্য স্বরূপ সাম্রাজ্যসম্পদকেও পাদতলে দলন করিতে সাহস পাইতেছেন,—তৌলদণ্ডের একদিকে পৃথিবীর ভোগসুখ এবং আর এক দিকে আপনার সম্মানরূপ তুলসীপত্রকে তুলিত করিয়া সেই তুলসীটিকেই তিনি অধিকতর ভারবিশিষ্ট মনে করিতেছেন; অথবা অবস্থার অজেয় অত্যাচারে পরাজিত হইয়াও অন্তরে তিনি অপরাজিত রহিতেছেন এবং অদৃ-

ষ্টচক্রের অন্তস্তলে নিপতিত হইয়াও আত্মার বল, আত্মার বীর্য্য, উচ্চাভিলাষ ও উচ্চতর অধ্যাত্মসামর্থ্যে আপনাকে আপনি মনুষ্যত্বের উন্নত ভূমিতে ধ্রুবনক্ষত্রবৎ স্থির রাখিতে সক্ষম হইতেছেন, আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র ও তিনি মহান্। কারণ, যে মহত্ত্বের উপাসনা করিতে জানে না, সে সুখ ও সম্মানের তুলনায় কখনও সম্মানের মূল্য অবধারণ করিতে পারে না এবং মনুষ্য যে শারীর-বল ও সম্পদ-বলের উপরে অধ্যাত্মবলেও বলীয়ান্ হইতে পারে, ইহা কোন ক্রমেই তাহার ভোগবিমূঢ় জড়বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় না। যখন দেখি যে, বিঘ্নবিপত্তির ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্ত যাঁহাকে এক পদ হেলাইতে পারে নাই, সুখসঞ্জাত স্নিগ্ধ সমীরণের মৃদুল দোলনেই তিনি ঢুলিয়া পড়িয়াছেন,—আপদের পর্ব্বতভারেও যিনি নুইয়া পড়েন নাই, প্রীতি অথবা শ্রদ্ধার পুষ্পভারেই তিনি নত হইয়াছেন, বিদ্বেষের বিষাক্ত বাক্যও যাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই, ভক্তির অস্ফুটমধুর সম্ভাষণমাত্রেই তিনি অন্তরে স্পৃষ্ট হইতেছেন, আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, তিনি মহান্ এবং মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মূলগ্রন্থি। কারণ, যেখানে সূর্য্যের আলোক আভাত হয় না, সেখানে যেমন ফুল ফোটে না, ফল ফলে না, সেইরূপ যেখানে মহত্ত্বের জ্যোতি বিকীর্ণ হয় না, সেখানেও এই সমস্ত লোকোত্তর গুণরাশি বিকশিত হইবার স্থান পায় না। কিন্তু উচ্চতার যেমন উচ্চতর উচ্চতা আছে, গভীরতার সম্পর্কেও যেমন গভীরতর গভীরতা সম্ভবপর হয়, মহত্ত্বেরও সেইরূপ মহত্তর উৎকর্ষ আছে। সেই উচ্চতম মহত্ত্ব পরার্থা প্রীতি, পরার্থ আত্মশাসন, আত্মসুখবিসর্জ্জন,—আত্মোৎসর্জ্জন।

মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বসুখনিরত। সে আপনার বিনা আর কিছু জানে না, আপনার বিনা আর কিছু বোঝে না, আপনার বই আর কিছুরই খবর লইতে অবসর পায় না। এইরূপ আত্মচিন্তা প্রাণিমাত্রেরই অপরিহার্য্য গতি। ইহা যেমন মনুষ্যে আছে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদিতেও তেমনই বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা যাহার জীবনশক্তির প্রণোদনী এবং শীতবাত যাহার স্বাভাবিক শত্রু, সে ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ছাড়িয়া আগে আপনার ভাবনা না ভাবিয়াই পারে না। আপনার ভাবনা ভুলিয়া গেলে, তাহার জীবনশক্তিই নিরবলম্ব হইয়া ম্রিয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃত মহত্ত্ব সেই আপনার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে পরের ভাবনাকেও আপনার করিয়া লয় এবং সময়ে সময়ে আপনারই উচ্ছ্বাসে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া,—আপনারই প্রভাবের স্রোতোবেগে আপনি প্রবাহিত হইয়া, পরার্থ আপনাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে এবং কুত্রচিৎ কখনও সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দেয়।

তুমি সকলের ভাগ বলে বা ছলে আপনার মুখারবিন্দে তুলিয়া দেও। ইহা তোমার মহত্ত্ব নহে। ইহা তোমার বাহুবলের

নিদর্শন মাত্র। বনের বাঘও এইরূপ অথবা ইতোধিক প্রবলতর ক্ষুৎপিপাশার পাশবশক্তি নিত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তুমি আপনার মুখের গ্রাস অধিকতর ক্ষুধিত অন্য কাহারও মুখে তুলিয়া দিয়া আপনি একটু ক্লেশ স্বীকার কর, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি পূজাস্পদ। তুমি বর্ণবিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া আপনি আপনার শোভা নিরীক্ষণ কর, ইহা তোমার মহত্ত্ব নহে। ইহা শুধু তোমার অর্থশালিতারই প্রমাণ। কবিতা শিশুকণ্ঠ-সাহায্যেও এই নীতি শিখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, মনুষ্য বেশভূষার বৈচিত্র্যবিষয়ে ময়ূর ও মক্ষিকার নিকটও আসন পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু তুমি যখন আপনার বেশ ও আপনার ভূষার কথা বিস্মৃত হইয়া আপনা হইতে দুঃস্থ অন্য কাহারও অঙ্গে একখানি বস্ত্র তুলিয়া দেও, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি মনুষ্যের শিক্ষাস্থল। তুমি শুদ্ধ আপনার সুখ ও আপনার দুঃখের সঙ্কীর্ণচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনারই বিলাপ ও প্রলাপ লইয়া জীবন যাপন কর,—আপনাকেই জগতের কেন্দ্রস্থানীয় মনে করিয়া আপনারই আমোদে আপনি ভাসমান রহ, আপনারই বেদনায় আপনি কাঁদিতে থাক, ইহা তোমার মহত্ত্বের পরিচয় নহে। ইহাতে এই মাত্র বুঝায় যে, এ জগতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও লক্ষ লক্ষ জীব যেমন এক আপনারই সুখের অন্বেষণে দেহপাত করিয়া বিস্মৃতির সমাধিমন্দিরে শয়ান হইয়াছে, তুমিও তাহাদিগেরই একজন। কিন্তু তুমি যখন পরকীয় ন্যায্য সুখের জন্য আপনার অন্যায্য সুখকে পরিত্যাগ কর,—পরের তীব্রতর দুঃখে আপনার সামান্য দুঃখ ভুলিয়া যাও, পরের জন্য কাঁদ,—অথবা নির্ভয়ে, নিস্পৃহহৃদয়ে, এবং অভিমানের উপর উচ্চতর অভিমানে, আপনার মানকে পরকীয় মানের নিকট বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হও, আপনার সমুজ্জ্বল মনস্বিতাকে আঁধারে রাখিয়া পরের মন যোগাইতে আনন্দ অনুভব কর, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি গুরুস্থানীয়।

প্রকৃত মিতব্যয়েরও পরিণামফল, চরমলক্ষ্য ও মূলসূত্র পরপোষণ ও পরার্থ আত্মোৎসর্জ্জন। কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নহে। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম। কার্পণ্য অভ্যাসগত লোভের অভ্যাসজাত সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা উদ্দেশ্যবিশেষের উচ্চতর অনুরোধে ইচ্ছাকৃত সংগ্রহ। কার্পণ্যের আদি চিন্তা আত্মসুখ, মিতব্যয়িতার আদি চিন্তা পরের সুখ। কার্পণ্যের যত কিছু উৎকণ্ঠা তাহা আপনার নিমিত্ত, মিতব্যয়িতার যত কিছু উৎকণ্ঠা তাহা পরের নিমিত্ত। এমন স্থলে এই দুইকে এক জ্ঞান করিতে যাইব কেন? যে কৃপণ, তাহাকে ঘৃণা কর, তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যে শক্তিসত্ত্বেও ক্ষুধাতুরকে এক মুষ্টি অন্ন এবং তৃষাতুরকে এক ফোঁটা জল না দিয়া গভীর রাত্রিতে কুশীদগণনার কষ্টচিন্তায় ডুবিয়া রহে, সহৃদয় আর্য্যসন্তানেরা যে প্রাতঃসময়ে তাহাদিগের নাম গ্রহণেও কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হন, ইহা সর্ব্বথা

যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ দীনচিত্ত ও ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিদিগের এইরূপ সামাজিক নিগ্রহ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যে ব্যক্তি মুষলধারার বৃষ্টির মধ্যে দ্বারস্থ অতিথিকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়া আপনি মনের আনন্দে পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকে, তাহার নামোচ্চারণে অন্নব্যঞ্জন নষ্ট না হউক, চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও হর্ষ অবধারিতই বিনষ্ট হয়। এইরূপ পিত্তদগ্ধ ব্যক্তিরা বৃথা এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, বৃথা এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। কবি এইরূপ স্বর্ণভারনিপীড়িত সমৃদ্ধ-দরিদ্রদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"তুমি ধনী হইলেও দরিদ্র। গর্দ্দভ যেমন উহার নিপীড়িতপৃষ্ঠে পিণ্ডীভূত স্বর্ণরাশির ভার বহন করে, তুমিও সেইরূপ ধনের ভারমাত্র বহন করিয়া পথে একটুকু অগ্রসর হইতেছ, এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তোমার সেই ভার হইতে বিমুক্ত করিতেছে।" *

কিন্তু যাঁহারা পরের ভাবনা ভাবিয়া আপনারা মিতব্যয়ী হন, পরকে এক মুষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনি এক মুষ্টি কম খান, পরকে সুখসম্ভোগে একটুকু অধিকারী করার অভিলাষে আপনার সুখসম্ভোগের চক্র একটুকু সংকোচন করেন, তাদৃশ মিতাচার-পরায়ণ মহাত্মাদিগকে কৃপণ বলিলে পাতক হইবে। তাহারাই প্রকৃত পুণ্যশ্লোক। তাঁহাদিগের মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত কর।

সুতরাং এইক্ষণ প্রত্যক্ষ দেখ, মহত্ত্বের সহিত মিতব্যয়ের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং ইহারা সমান পরিধির ক্ষেত্র না হইলেও সমকেন্দ্রবদ্ধ। মহত্ত্বের অর্থ মিতব্যয় এবং মিতব্যয়ের অর্থ মহত্ত্ব, এমন কথা আমরা বলি নাই। কিন্তু মহত্ত্বের গতি যেই দিকে মিতব্যয়ের পরিণতিও যে সেই দিকে, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে মহত্ত্বের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার কর কি? তাহা হইলে মিতব্যয়ী হও। যে মিতব্যয়ী হওয়া কষ্টজ্ঞান করে সে কখনও আপনার সমস্ত কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে না। জনকজননী ও স্ত্রীপুত্রপরিজনের ভরণ পোষণ এবং ন্যায়তঃপাল্য আশ্রিতপালন মনুষ্যমাত্রেরই অনুল্লঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। মনু কর্ত্তব্য বুদ্ধির কঠোরমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া মনের তদানীন্তন আবেগে এইরূপও ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, "যদি শত অপকার্য্য করিতে হয়, তাহাও বরং করিবে, তথাপি পরিজনদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনে ক্লেশ দিবে না। যাহারা ইহাদিগের ভরণপোষণে উদাসীন রহিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সমস্ত পুণ্যই পয়োমুখবিষকুম্ভের সমান।* কিন্তু যা-

* "If thou art rich, thou art poor;
For like an ass, whose back with ingots bows,
Thou bearest thy heavy riches but a journey,
And Death unloads thee."
Shakespeare.

*বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ সাধ্বীভার্য্যা সুতঃশিশুঃ
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ।
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্‌ যত্নেন তং ভরেৎ:
মনুসংহিতা।

হারা স্বসুখ-লালসা ও ভোগ পিপাসার প্রমত্ততায় অমিতব্যয়ী হয়, তাহাদিগের পরিজনেরা প্রথমে কিরূপ উপেক্ষিত এবং পরিশেষে কিরূপ অপারদুঃখসমুদ্রে নিপতিত হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখ। যে সকল সুকোমল-প্রকৃতি শিশু এক সময়ে আদরের পুতুল ছিল, পিতার অমিতব্যয়িতায় আজি তাহারা অনাথনিবাসের অতিথি, অথবা অন্নের জন্য লালায়িত। যাঁহারা একসময়ে অন্তঃপুরের কমনীয় উদ্যানে কুসুমের মত বিকশিত ছিলেন, পতি কি পরিবারস্থ অভিভাবকের অমিতব্যয়িতায় আজি তাঁহারা তীর্থাশ্রমের কাঙ্গালিনী। যদি ইহার পরও অমিতব্যয়িতাকে সামাজিক মনুষ্যমাত্রেই ঘোরতর পাতক বলিয়া ঘৃণা করিতে না শিখে, এবং মিতব্যয়িতার সহিত কর্ত্তব্যের কঠোরধর্ম্ম এবং সুতরাং মহত্ত্বের পূজার্হ ধর্ম্মভাবের কিরূপ নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, সকলে তাহা না বুঝে; তাহা হইলে বলিব যে, মনুষ্যের চক্ষু কিছুতেই ফুটিবার নহে।

তুমি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা এবং লোকসমাজের উপকার চেষ্টাকে মহত্ত্বের অঙ্গ বলিয়া মানিতে সম্মত হইবে কি? তাহা হইলে মিতব্যয়ী হও। যে জীবনের প্রথম হইতেই মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয় তাহার নিকট স্বদেশ, স্বজাতি অথবা সমাজ ইহাদের কাহারও কোন প্রত্যাশা নাই। যাঁহারা পূর্ব্বসঞ্চিত কিংবা উপার্জ্জিত অর্থরাশি দ্বারা জগতের উপকার করিয়াছেন,—স্থানে স্থানে শিক্ষার মঠস্থাপন করিয়া অনাথ ও অসহায় শিশুদিগের পিতৃস্থানীয় হইয়াছেন, এবং এইরূপে অথবা অন্য প্রকারে মনুষ্যত্বের বিকাশ-কার্য্যে প্রকৃতির সাহায্য করিয়া সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র হইতেও শ্রেষ্ঠতর প্রাকৃতশক্তি বলিয়া গণনার মধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যাঁহারা স্থানে স্থানে ঔষধের আশ্রম সংস্থাপন দ্বারা দীন দুঃখীর রোগজীর্ণ অঙ্গে ঔষধের প্রলেপবৎ অনুভূত হইয়াছেন, পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া আশ্রয়হীন পথিকদিগকে প্রণয়িজনের অপ্রত্যক্ষ প্রিয়সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, অপ্রত্যক্ষ কোমলস্পর্শে শীতল করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যাঁহারা পতিত জাতির পুনরুদ্ধরণ-বাসনায় যন্ত্রগঠনে প্রভূত অর্থবলের চালনা করিয়া যন্ত্রী বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন,—আগুণের জিহ্বায় হাত দিয়াছেন, সাপের ফণা ছিঁড়িয়া আনিয়াছেন, বাঘের দাঁত উপাড়িয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারাও স্বজীবনে মিতব্যয়ী ছিলেন। যদি এই সকল পুরুষার্থসাধক প্রধান মনুষ্যেরা অর্থকে এক হাতে উপার্জ্জন করিয়া চৈত্রবায়ু-তাড়িতশক্তুর ন্যায় আর এক হাতে উড়াইয়া ফেলিতেন, অথবা উচ্ছৃঙ্খলার অবতারের ন্যায় পুরুষপরম্পরাগত সম্পত্তিকে সুসেব্য ও অসেব্য নানাবিধ ভোগে ও সুখে ভাসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে হয়ত মধুলুব্ধ মক্ষিকার মত অনেক মাক্ষিকপ্রকৃতির মনুষ্য তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, উড়িয়া উড়িয়া মধুর স্বরে গুণ্ গুণ্ করিত। কিন্তু কালাতিপাতে কে তাঁহাদিগের নাম শুনিত? কে

তাঁহাদিগের নাম লইত ? কে তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিয়া মহত্বের গুণানুবাদে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত ?

ইহাও দৃষ্ট না হয় এমত নহে যে,এই পৃথিবীর অনেক সরলমতি ও সুকুমারপ্রকৃতি ব্যক্তি ব্যয়সম্বন্ধীয় উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রকৃতই উদারতার লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং মিতব্যয়ের বুদ্ধিকে মহত্বের সমকেন্দ্রবদ্ধ নীতিরেখা বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক,অপব্যয়ীরনিশ্চিন্ত ও নির্ভয় ভাবকেই মহত্ব, অভিমান ও শক্তিমত্তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা হৃদয়াংশে নিকৃষ্ট নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই বিচিত্র জ্ঞানাংশে তাঁহারা নিঃসন্দেহ ভ্রান্ত। সংসারে যেমন অনেকেই ভাল ভাবিয়া ভ্রমে পড়িয়া থাকে, ইহাঁরাও বস্তুতঃ ভাল ভাবিয়াই ভ্রমে পড়িয়া আছেন। নাম নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেলি ও সেরিডেন এবং গোল্‌ডস্মিথ প্রভৃতি অতিবড় ভাল এবং অতিবড় উচ্চাশয় কতকগুলি পুরুষকে এই শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। ইহাঁদিগের প্রত্যেকেরই জীবনচরিত উদারতা ও অমিতব্যয়িতার মিশ্রন জন্য দগ্ধহলাহলে মনুষ্যের স্মৃতিপটে দগ্ধাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহাঁরা যদি বুঝিতে পাইতেন যে, আত্মাবলম্বন ও আত্মনির্ভর প্রভৃতি মহত্বের যেসকল ভাব সম্পূর্ণরূপে অভিমানে আবৃত ও আত্মগত, মিতব্যয়রূপ পরিণামমধুর কঠোরব্রতের সঙ্গে সে গুলিরও অতি দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা হইলে অভিমানের নামেই তাঁহারা মিতব্যয়ী হইতেন। ইহাঁরা যদি বুঝিতে পাইতেন যে, আপনাকে অন্যের গলগ্রহ করিয়া রাখা অথবা আপনার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার ভার অন্যের উপর ফেলাইয়া দেওয়া যারপরনাই অনুদারতার কার্য্য, তাহা হইলে উদারতার নামেই ইহাঁরা মিতব্যয়ের আশ্রয় লইতেন। ইহাঁরা যদি বুঝিতে পাইতেন যে, যিনি সকল শক্তির আদিশক্তি এবং অনন্ত শক্তিতে শক্তিময়ী, সেই প্রাণময়ী প্রকৃতির অতিসামান্য একটি শক্তিও অপব্যয়ে যায় না, কিংবা অমিতবলে ব্যবহৃত হয় না,—যদি ইহাঁরা বিজ্ঞানের বিমলচক্ষু লইয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন যে, প্রকৃতির এই বিশ্বভাণ্ডারে একটি ধূলিকণা কিংবা পুষ্পরেণুরও অপব্যয় ঘটে না, তাহা হইলে ইহাঁরা শক্তিমত্তার নামেই মিতব্যয়কে মহত্বের অভিন্ন অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করিতেন, এবং অমিতচারিতা যে একমাত্র দুর্ব্বলতারই পরিণাম-ফল, ইহা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইতেন। অযুতকোটি সৌরজগৎ যাঁহার সম্পদ, অনন্ত হইতে অনন্ত যাঁহার সঞ্চয়, একটি গলিতপত্র, স্খলিত ফুল, এক ফোটা দূষিত জল, অথবা রেণুপ্রমাণ একটু মৃত্তিকার ব্যবহার-বিষয়েও যখন তিনি মিতব্যয়ের অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন মনুষ্য মিতব্যয়ের ধর্ম্মকে কোন্ সাহসে এবং কি অভিমানে মহত্বের ও শক্তিমত্তার বিরোধিভাব বলিবে, বুদ্ধি তাহা পরিগ্রহ করিতে পারে না।

জীর্ণোদ্ধার।

সূর্য্যমণ্ডল।

গগনমণ্ডলে দেদীপ্যমান ঐ আধারপরিহীন বৃহজ্জ্যোতিটি কি? জানিবার বড় ইচ্ছা। উহা জানিবার জন্য এক দিন অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন, কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না সন্দেহ। জানিবার জন্য ঐ বৃহজ্জ্যোতির অভিমুখে চক্ষুঃ প্রসারিত হইল, কিন্তু দেখা গেল না, কিছুই বুঝা গেল না, কেবল লাভ হতে চক্ষু দুইটি ঋলসিয়া গেল। চক্ষু উহাকে দেখিল না, চাক্ষুব তেজ উহার নিকট পরাভূত হইল—নিকট গমনে অসমর্থ হইল,—দেখিয়া যাঁহারা যোগী—যাঁহাদের মনোমধ্যে এক প্রকার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আশ্চর্য্য চক্ষু আছে—তাঁহারা দৃশ্যচক্ষু মুদ্রিত করিলেন, মনশ্চক্ষু আতত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। যাঁহাদের সেই যোগজ চক্ষু নাই—তাঁহারা করেন কি—অগত্যা কতকগুলা কাচের আশ্রয় লইলেন। সূর্য্যতত্ত্ব জানিবার জন্য যাঁহারা কালের পূর্ব্ব প্রান্তে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে উপবিষ্ট হইয়া সূর্য্যমহিমা গান করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিমত সূর্য্যতত্ত্ব কিরূপ? তন্মাত্র বিদিত করাই "সূর্য্যমণ্ডল" নামক প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যাঁহারা দূরবীক্ষণধারী—তাঁহাদের অভিমত সূর্য্যতত্ত্ব আজ কাল কাহাকে বলিতে হয় না, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই দূরবীণধারীদিগের সৌরবিজ্ঞানের সহিত পূর্ব্বযোগীদিগের ধ্যানলব্ধ সৌরবিজ্ঞানের কি প্রভেদ আছে।

ধ্যানযোগীরা বলেন যে, গগনান্তরালস্থিত ঐ বৃহজ্জ্যোতির নাম সূর্য্য, উনি সমুদয় গ্রহ উপগ্রহের অধিপতি। সেই জন্য উহাকে গ্রহরাজ বলা যায়। গ্রহরাজ সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়া পরমশিল্পী ঈশ্বর যে স্বীয় অনির্ব্বচনীয় নৈপুণ্য ও জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিতেছেন—মানব তাহা * অত্যল্প চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারে। সূর্য্যই তাঁহার পরভাবী বিশ্বকার্য্যের প্রধান উপকরণ, সূর্য্যই বিশ্বের মূলাধার। ঐ প্রকাশশীল আদিত্য না থাকিলে বিশ্বসংসার অগাধ অন্ধকারকূপে নিমগ্ন হইত—কি জড় কি অজড় কোন বস্তুরই স্পন্দন থাকিত না। সূর্য্য আছেন বলিয়াই বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, হরিদোষধিবৃক্ষলতা প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সকল জীবভাব ধারণ করিতেছে। উহাঁরই গতিপ্রভাবে পৃথিবীতে সময়ে সময়ে শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু প্রাদুর্ভূত হইতেছে। ক্ষুদ্রতর কীটাণুর স্পা-

* প্রাচীন আর্য্যজাতির জ্ঞান অনুসন্ধান করাই 'জীর্ণোদ্ধার' নামের উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রাচীন সৌরবিজ্ঞানঘটিত প্রবন্ধও জীর্ণোদ্ধারের অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বে এই নামে আমরা অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহা দেখিয়া লইবেন।

ন্দনক্রিয়া হইতে বৃহত্তর গিরিশিখরের বিলয় পর্য্যন্ত যাবন্ত ক্রিয়া সমস্তই সূর্য্যের অধীন বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া, সূর্য্যোপাসক ঋষিরা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন যে,—"সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" সূর্য্যই স্থাবর জঙ্গম উভয়বিধ জীবের আত্মা। এবং "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" জগৎস্রষ্টা অগ্রে সূর্য্যকে পরে চন্দ্রকে সৃষ্ট করিয়া পরভাবী ভৌতিক সৃষ্টির সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সকলের আদি বলিয়া ইনি আদিত্য, গ্রহগণের অধিপতি বলিয়া গ্রহপতি। গ্রহরাজ সূর্য্য অনন্ত আকাশের মধ্যস্থলে বাস করেন, গ্রহ উপগ্রহ সকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করেন। গ্রহগণ যে আমাদের নিকট জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া পরিচিত—তাহা কেবল গ্রহরাজ সূর্য্যের প্রসাদাৎ। চন্দ্র যে জ্যোৎস্নাময়রূপে দৃষ্ট হন—তাহাও সূর্য্যের অনুগ্রহ। সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়াই চন্দ্র ভূলোকবাসীর নিকট জ্যোৎস্নাময়রূপে প্রকাশিত হন, নচেৎ তাঁহার নিজের কোন প্রকাশশক্তি নাই। এই গূঢ় রহস্যটি আমরা সেই পুরাকালের ধ্যান-যোগীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। যথা—

"চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।"

[ঋ, ১ম, ১উ অনু, ১২ সূত্র।

জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান * সূর্য্যরশ্মিযুক্ত (সূর্য্যরশ্মিরঞ্জিত) চন্দ্র দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন।

"এষা সূর্য্যস্য ধিষ্ণেন সোমস্যাপ্যায়িতা তনুঃ পৌর্ণমাস্যাং স দৃশ্যেত সম্পূর্ণো দিবসক্রমাৎ।"

[কূর্ম্মপুরাণ ৪০ অ।

চন্দ্রকায়া সূর্য্যের ধিষ্ণ্য অর্থাৎ তেজো দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তশিরোমণিকার ভাস্করাচার্য্য এই বেদ ও পুরাণ বাক্যকে বিশদ করিয়া বলিলেন,—

"তরণিকিরণসঙ্গাদেষপীযূষপিণ্ডো-
দিনকরদিশিচন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রী
র্ঘট ইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়েবাতপস্থঃ।"

ঐ অমৃতপিণ্ড চন্দ্রের যে ভাগ যখন সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, সেই ভাগ তখন চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্নাময়রূপে প্রকাশ পায়। অন্য ভাগ তখন তাঁহার আপন ছায়ায় আচ্ছাদিত থাকায় অস্মদাদির নিকট অপ্রকাশ থাকে। রৌদ্রমধ্যে ঘট রাখিলে তাহার সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত ভাগ যেমন প্রকাশ পায়—আর ছায়াবৃত ভাগ যেমন যুবতীকেশ-কলাপের ন্যায় শ্যামল থাকে—সেইরূপ।

যোগীরা আরও দেখিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল অনন্তকিরণাবৃত এবং তাঁহার কায়া হইতে যে সহস্র সহস্র রশ্মি-ধারা বিক্ষিপ্ত হয়—তাহার কতক লম্বভাবে, কতক তির্য্যক্‌ভাবে কতক উর্দ্ধভাবে, কতক চক্রবাড় বা পরিবেশরূপে। সুতরাং তাহার যে রশ্মিমণ্ডল চক্রের ছটামুকুটরূপে শোভমান হয়—বুধের

* 'জলময় মণ্ডল' বলিয়া বর্ণনা করার তাৎপর্য্য 'চন্দ্রমণ্ডল' নামক প্রস্তাবে ব্যক্ত হইবে।

সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক ঘটে না, এবং যে কিরণাবরণের সহিত বুধের নিকটতর সম্পর্ক—বৃহস্পতি সে কিরণের দ্বারা কোন উপকার পান না। এই সকল দেখিয়া, তাঁহারা পুনঃ পর্য্যালোচনা দ্বারা যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"অংস্য যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সর্ব্বলোকপ্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়োগ্রহয়োনয়ঃ॥
সুষুম্নোহরিকেশশ্চ বিশ্বকর্ম্মা তথৈবচ॥
বিশ্বব্যচাঃ পুনশ্চান্যঃ সম্পদ্বসুরতঃপুরঃ॥
অর্ব্বাক্‌বসুরিতিখ্যাতঃ স্বরাড়ন্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিস্তু পুষ্ণাতি শিশিরদ্যুতিম্॥
তীর্য্যগূর্দ্ধ প্রচারোঽসৌ সুষুম্নঃ পরিগীয়তে।
হরিকেশস্তু যঃ প্রোক্তো রশ্মির্নক্ষত্রপোষকঃ॥
বিশ্বকর্ম্মাতথারশ্মির্বুধং পুষ্ণাতি সর্ব্বদা।
বিশ্বব্যচাস্তু যোরশ্মিঃ শুক্রং পুষ্ণাতিনিত্যদা।
সম্পদ্বসুরিতিখ্যাতং স পুষ্ণাতি চ লোহিতম্।
বৃহস্পতিং প্রপুষ্ণাতি রশ্মিরর্ব্বাক্‌বসুঃ প্রভোঃ
শনৈশ্চরং প্রপুষ্ণাতি সপ্তমশ্চ স্বরাট্ তথা।
এবং সূর্য্যপ্রভাবেন সর্ব্বা নক্ষত্রতারকাঃ॥
বর্দ্ধন্তে বর্দ্ধিতা নিত্যং নিত্যমাপ্যায়য়ন্তিচ॥"
(কূর্ম্মপুরাণ ৪০ অ।

হে ব্রাহ্মণগণ! এই সূর্য্যের যে সকল রশ্মি লোক সকল প্রকাশ কবিতেছে—তন্মধ্যে সাত প্রকার রশ্মিই প্রধান ও গ্রহগণের পিতাস্বরূপ। সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বব্যচা, সম্পদ্বসু, অর্ব্বাগ্বসু ও স্বরাট্। এই সপ্ত রশ্মিই সপ্তগ্রহের প্রকাশক। যাহাকে সুষুম্ন নামে উল্লেখ করিলাম, তাহার গতি তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধদিকে। এই সুষুম্ন রশ্মিই চন্দ্রমণ্ডলকে পুষ্ট করে। যাহার "হরিকেশ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—তাহা নক্ষত্রগণের পোষক। এইরূপ বিশ্বকর্ম্মারশ্মি বুধকে, বিশ্বব্যচারশ্মি শুক্রকে, সম্পদ্বসুরশ্মি মঙ্গলকে, অর্ব্বাক্‌বসুরশ্মি বৃহস্পতিকে এবং স্বরাট্ নামক রশ্মি শনিগ্রহকে আপ্যায়িত করে। *

সূর্য্য এইরূপে তেজোহীন গ্রহ উপগ্রহদিগকে তেজোবস্তু বোধ করাইয়া গ্রহগণের উপর আধিপত্য করিতেছেন। গ্রহগণ সূর্য্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরে অবস্থিত থাকিয়াও সূর্য্যতেজে জাজ্বল্যমান ও সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তিপ্রভাবে নিরন্তর ঘূর্ণমান হইতেছে। সূর্য্যে আকর্ষণশক্তির মূল কারণ রজোগুণের আধিক্য থাকায় তিনি স্বয়ং আপন নাভিকে বেষ্টন করিয়া কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন দূরে অবস্থিত গ্রহগণকেও ঘুরাইতেছেন। যেমন কোন মনুষ্য কোন এক বস্তু আকর্ষণ অর্থাৎ ধৃত করিয়া ঘুরিলে তৎসঙ্গে সেই আকৃষ্ট বস্তুও ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সূর্য্যকর্ত্তৃক আকৃষ্ট গ্রহগণও সূর্য্যের সহিত স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে বিঘূর্ণিত হইতেছে। যথা—

"অহস্তুচরতে নাভিং সূর্য্যোবৈ মণ্ডলক্রমাৎ।
কুলালচক্রপর্য্যন্তং যথা রবিঃ শশী তথা।"
(কূর্ম্মপুরাণ; ১০১)

সূর্য্য দেবপরিমাণের এক দিবসে মণ্ডল

* এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, এরূপ রূপক বর্ণনা কেবল সূর্য্যের আলোক মণ্ডলের গতি বৈষম্য বুঝান ভিন্ন অন্য কিছুর জন্য নহে।

ক্রমে কুলালচক্রের ন্যায় আপন নাভিকে প-রিবেষ্টন করিয়া থাকেন। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রও আপন নাভিকে বেষ্টন পূর্ব্বক ভ্রমণ করেন।

"চন্দ্রমাঃ সোমপুত্রশ্চ শুক্রশ্চৈব বৃহস্পতিঃ।
ভৌমোভানুস্তথারাহুঃ কেতুগানপি চাষ্টমঃ॥
সর্ব্বে ধ্রুবে নিরুদ্ধাস্তৈর্গ্রহাস্তে বাতরশ্মিভিঃ
ভ্রাম্যমাণা যথাযোগং ভ্রমন্তানুদিবাকরম্॥" ঐ

চন্দ্র, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রাহু, কেতু,—এতদ্ভিন্ন যে যে গ্রহ বাতরশ্মির দ্বারা (বাতরশ্মি=আকর্ষক কিরণ নাড়ী) ধ্রুবে আবদ্ধ আছে—তাহারা সকলেই সেই বাত-রশ্মির দ্বারা ভ্রাম্যমাণ হইয়া দিবাকরের প-শ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেছেন।

এতাদৃশ সৌরবিজ্ঞান সম্বন্ধে ঋগ্বেদে যে একটি শ্লোক আছে তাহা এস্থলে ব্যা-খ্যার সহিত উদ্ধৃত করিলাম। তদ্দৃষ্টে পা-ঠকগণ অনায়াসেই উপরোক্ত ঋষিবাক্যগু-লির মূলভাব বোধগম্য করিতে পারিবেন।

'আকৃষ্টেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতম্। মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।'

আ পূর্ব্ব কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ। রজো-গুণও পরিচালক। অতএব সূর্য্যের আকর্ষণা-ত্মকপরিচালক রজোগুণ থাকায় সূর্য্য স্বয়ং আবৃত্তি করতঃ দেবতা ও মনুষ্যদিকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ পূর্ব্বক ভুবন সকল দে-খিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময় রথের সহিত অস্ত গমন করেন।

যোগীগণের এই ধ্যান-লব্ধ সৌরবিজ্ঞান-টির সহিত আধুনিক দূরবীণধারীদিগের সৌরবিজ্ঞানের প্রায় সৌসাদৃশ্য আছে।

সূর্য্যের আকার প্রকার, বহিঃপ্রদেশ ও অভ্যন্তর প্রদেশ সম্বন্ধে মহর্ষিগণের জ্ঞান কিরূপ? এক্ষণে সেই অনুসন্ধিত হইতেছে। মার্কণ্ডেয় নামক এক ঋষি বলিয়াছেন—

'কদম্বপুষ্পবৎ ভাস্বান্ অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ রশ্মিভিঃ।
বৃত্তোঽগ্নি পিণ্ড সদৃশোদগ্রে নাতিস্ফুটংবপুঃ॥'

জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডল দৃশ্যতঃ কদম্বপুষ্পের ন্যায় অধ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্-প্রসারী রশ্মিমা-লায় পরিবৃত, যেন একটি মণ্ডলাকৃতি বৃহৎ অগ্নিপিণ্ড। ইহাঁর বপু অর্থাৎ কায়া সু-ব্যক্ত নহে।

সামবেদীয়-সূর্য্যোপাসকেরা বলেন যে, আমাদের সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ময় বুদ্বুদ বিশেষ। সেই জন্যই আমরা সূর্য্যের আকার প্রকার ও সংস্থান হৃদ্গত করাই-বার শিষ্যদিগকে উপদেশ করি 'সূর্য্যে মধুপ-পূপ দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা।' সূর্য্যমণ্ডলে মধুচক্র জ্ঞান আরোপিত করিবেক। মধুচক্রের দৃশ্য আকারের সহিত বুদ্বুদের গঠন-প্রণালীর অ-নেক সৌসাদৃশ্য আছে এবং মধুচক্রের আ-কার বা গঠন-ভঙ্গীর সহিত সূর্য্য-কায়ারও সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং সূর্য্যকে মধুচ-ক্রভাবনা নিষ্প্রতিবন্ধকে সম্পন্ন হইবেক।

সূর্য্যের অভ্যন্তর প্রদেশ বা মর্ম্মস্থান এক প্রকার, তাহার শরীর অন্য প্রকার, আবার তাহার শরীরাবরণ আর এক প্র-কার। অভ্যন্তর প্রদেশটি শোলীভূত বা তরলিত জ্যোতিঃ পদার্থে পরিপূর্ণ, কিরণ-ময়। অভিনবোৎপন্ন হংসডিম্ব ভাঙ্গিলে তন্মধ্যে যে তারল্য দৃষ্ট হয়—সূর্য্যাভ্যন্তরের তারল্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য কল্পনা ক-

স্নিয়া ঋষিরা তাঁহার প্রথমাবস্থাবোধক নাম অর্থাৎ মার্ত্তণ্ড নাম কল্পনা করিয়াছেন। (মৃত+অণ্ড=চূর্ণীকৃত বা বিদলিত ডিম্ব) * এই মার্ত্তণ্ড দেবের কায়াভাগের নাম রবি † সেই রবিই লোক সকল আলোকিত করিতেছেন। এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত রবি আর নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আলোকমণ্ডল অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। এই রবি নামক মার্ত্তণ্ডশরীরটি সূর্য্যাত্মার বা সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর প্রদেশের একটি আবরণ, এবং ইহা মার্ত্তণ্ডকায়াবিনিস্থতরশ্মির ধাবার স্তরমাত্র। সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ কঠিনও নহে। এই রশ্মিমণ্ডল আর জলন্ত বাষ্প প্রায় একই কথা। নিম্নলিখিত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলেই ইহা প্রতীত হইবেক। যথা—

"অসৌ বা আদিত্যোদেবমধু। অস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ অন্তরীক্ষমপূপঃ মরীচয়ঃ পুত্রাঃ। তস্য যে প্রাঞ্চোরশ্ময় স্তাএবাহস্য প্রাঞ্চো মধ্যনাড্যঃ। তৎ ব্যক্ষরৎ। আদিত্যমভিতোহশ্রয়ৎ। তদেতৎ আদিত্যস্য লোহিতং রূপম্।" [ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণম্।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এইরূপ—

ঐ আদিত্য দেবতাদিগের মধু। অর্থাৎ মধুতুল্য তৃপ্তিকর। ঐ মধুচক্রটি দ্যুবংশে সংলগ্ন আছে। মধুচক্রে গাত্রস্থিত ছিদ্রসমূহে যেমন পুত্র অর্থাৎ ভ্রমরবীজ থাকে, সেইরূপ উহারও গাত্রচ্ছিদ্রে রশ্মি নামক পুত্র বা ভ্রমরবীজ বর্ত্তমান আছে। উহার প্রাক্‌গত রশ্মিনাড়ী সকল ঐ সূর্য্যরূপ মধুচক্রের পূর্ব্বমধুনাড়ী। তাহা ক্ষরিত হইতেছে। যাহা ক্ষরিত হইতেছে—তাহা আদিত্যের সর্ব্বদিকে আশ্রয় করিয়া স্থিত হইতেছে (সুতরাং স্তরীভূত আবরণ)। তাহাই আদিত্যের লোহিতরূপ অর্থাৎ উহা জলন্ত আলোকময় কায়া। এই জলন্ত আলোকে কায়ার যে সকল রশ্মি বিচরণকরে "তা বা এতা আপঃ যন্মরীচয়ঃ," সে সকল রশ্মি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাসঙ্কুল। মেঘে যেমন সূক্ষ্ম জলকণা ভাসমান—এই আলোকমণ্ডলেও সেইরূপ কণামণ্ডল সকল ভাসিতেছে।

নববৈজ্ঞানিকেরা দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যকায়ায় ধান্যাকৃতি বিন্দুরাশি ও দলবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কনিচয় দেখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের যোগীরা দেখিয়াছেন কি? না ভ্রমরবীজচিত্রিত মধুচক্র তুল্য সূর্য্যকায়ায় কতকগুলি অক্ষরশ্রেণী সন্নিবিষ্ট আছে। সে অক্ষরশ্রেণী কি? তাহা ব্রহ্মাক্ষর অর্থাৎ প্রণব ও গায়ত্রী। "তদেতদৃষিযাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মাক্ষরাণি।" যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এই সকল ব্রহ্মাক্ষর আদিত্যমণ্ডলে প্র-

* 'মারিতঞ্চ যতঃ প্রোক্ত-মেতদণ্ডং ত্বয়া দিতিম্।' ইত্যাদি মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং 'শোলীভূতানি তেজাংসি ভাসয়ন্তি জগত্রয়ম্।' ইত্যাদি বরাহ পুরাণ দেখ। সামবেদীয় সূর্য্যোপাসক ঋষিরাও সূর্য্যাভ্যন্তরে চলবৎ পদার্থ দৃষ্ট করিয়াছিলেন। যথা—'যদেতদাদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভত ইব দৃশ্যতে তৎ রসানাং রসতমম।' ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ দেখ।

† 'শোলীভূতস্য তস্যাস্ত তেজসোহভূৎ শরীরকম্। পৃথক্‌কৃত্তেন, রবিঃ সোহথ কীর্ত্ত্যতে বেদবাদিভিঃ।' ইত্যাদি বিষ্ণু পুরাণ দেখ।

ত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পাংশুবর্ণ আদিত্যের অনন্ত রবি-কায়ায় তরলকৃষ্ণ ক্ষুদ্র দাগ ও ঘনকৃষ্ণ বৃহৎদাগ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, "অথ যে প্রত্যঞ্চোরশ্ময়ঃ তাএবাস্য প্রতীচ্যোমধুনাড্যঃ। তৎ বাক্ষরৎ। আদিত্যমভিতোহশ্রয়ৎ। তদ্বা এতৎ যৎ আদিত্যস্য কৃষ্ণংরূপম্।" মার্ত্তণ্ড-কায়াগত প্রত্যক্রশ্মি সকল যাহা সূর্য্যরূপ মধুচক্রের প্রতীচ মধুনাড়ী—তাহা ক্ষরিত হইয়া আদিত্যমণ্ডলের সর্ব্বদিকে স্থিতিলাভ করিতেছে। তাহাই আদিত্য কায়ায় ক্ষুদ্র ও তরল কৃষ্ণরূপ। "অথ যে উদঞ্চোরশ্ময়ঃ তাএবাস্য উদীচ্যো মধুনাড্য। তদ্বাক্ষরৎ। আদিত্যমভিতোহশ্রয়ৎ। তদেতৎ আদিত্যস্য পরংকৃষ্ণংরূপম্।" আর যাহা উদক্রশ্মি—তাহা উহার উদীচ্যমধুনাড়ী। তাহা ক্ষরিত বা উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনর্ব্বার আদিত্যের সর্ব্বদিক্ আশ্রয় করিতেছে। তাহাই আদিত্য কায়ায় ঘনকৃষ্ণরূপ অর্থাৎ কলঙ্কাকার বৃহৎ দাগ। ইহাই বোধ হয় দূরবীণধারীদিগের সৌরকলঙ্ক। এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে উহার প্রথমাবিষ্কার কাল ১৬১১ খৃষ্টাব্দ নহে—অন্যূন ৪০০০ চারি সহস্র বৎসর। ব্যাসশিষ্য যোগীবর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উহা প্রত্যক্ষ করিয়া উক্তরূপ সূর্য্যতত্ত্ব গান করিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির এই সৌররহস্য আলোচনা করিতে আমাদের বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয়। দূরবীণ ছিল না—অথচ তাঁহারা যে এই সূক্ষ্ম রহস্য জানিতে পারিয়াছিলেন—ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আদিত্যরূপ মধুচক্রের উদীচ্যমধুনাড়ী সকল ক্ষরিত হইয়া অর্থাৎ তদ্বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি মধুবিপ্রুষ সকল সূর্য্যকায়ায় পুনরায় পতিত হইয়া উক্ত প্রকার কৃষ্ণ চিহ্ন উৎপাদন করে, সৌরকলঙ্কের এই মূলতথ্য যে তাহারা ধ্যানবলে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহাও সামান্য সাধ্য নহে। নব বৈজ্ঞানিকেরা প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়া থাকেন, এতদপেক্ষা কোন অভিনব সূক্ষ্ম কথা তাঁহাদের মুখ দিয়া অদ্যাপি নির্গত হইতে শুনা যায় নাই। তাঁহারা বলেন যে, "প্রচুরতর উত্তাপ প্রভাবে সূর্য্যাভ্যন্তর হইতে নানাবিধ ধাতব বাষ্পরাশি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়—তাহাই আবার শীতল হইয়া সূর্য্যের আলোকমণ্ডলে পুনরায় পতিত হয়। সেই শীতল বাষ্পরাশি সূর্য্যকায়ার যে যে স্থানে পতিত হয়—সেই সেই স্থানের আলোক রাশি অন্তরিত বা অদৃশ্য হইয়া কলঙ্কোৎপন্ন করে।'

সৌরকলঙ্কের সহিত পৃথিবীর দুর্ভিক্ষের বা শস্যোৎপত্তির কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কি না এবং মুনিগণ তৎসম্বন্ধে কোন নিরূপিত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। তবে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে সেই তমোময় সূর্য্যরশ্মির (নির্ব্বাপিত বাষ্প রাশির) সহিত হিমের হ্রাস বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। যথা—

'তস্য রশ্মি সহস্রন্তু শীতবর্ষোষ্ম নিঃস্বনম্।
তাসাং চতুঃশতং নাড্যো বর্ষন্তে চিত্র মূর্ত্তয়ঃ ॥
হিমোদ্বহাশ্চ তামস্যো রশ্ময় স্ত্রিশতং পুনঃ।
শুক্লাশ্চ কুকুভাশ্চৈব গাবো বিশ্বভৃত স্তথা।

শুক্লাস্তা নামতঃ সর্ব্বা স্ত্রিবিধা ঘর্ম্মসর্জ্জনাঃ॥'

[কূর্ম্মপুরাণ দেখ।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, সূর্য্যের সহস্র প্রকার রশ্মিনাড়ী—তাহারা শীত, বৃষ্টি, গ্রীষ্ম ও বজ্র উৎপত্তির কারণ। তন্মধ্যে বিচিত্রকায় চারিশত রশ্মিনাড়ী বৃষ্টির কারণ, তমোময় অর্থাৎ কলঙ্কাকার কৃষ্ণবর্ণ তিন শত রশ্মিনাড়ী হিমের অর্থাৎ শিশিরাধিক্যের কারণ, এবং শুক্লাভ রশ্মিনাড়ী সকল গ্রীষ্মের হেতু। মহাভারতেও এইরূপ ভাবের একটি বচন দৃষ্ট হয়। যথা—

'তপন্ত্যন্যে দহন্ত্যন্যে গর্জ্জন্ত্যন্যে তথা ঘনাঃ।

বিদ্যোতন্তে প্রবর্ষন্তি তব প্রাবৃষি রশ্ময়ঃ॥

যেচ তেঽনুচরাঃ সর্ব্বে পাদোপান্তং সমাশ্রিতাঃ।

মাঠরারুণদণ্ডাদ্যা স্তাংস্তান্ বন্দেঽশনিক্ষুতান্।"

যুধিষ্ঠির সূর্য্যদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে গোপতে! তোমা হইতে স্বতন্ত্র তোমার এক রশ্মিমণ্ডল তাপ বিকীর্ণ করে ও দাহ জন্মায়। অন্য এক রশ্মিজাল বিদ্যুতাগ্নি বর্দ্ধিত করে, অন্য এক রশ্মিরাজি মেঘরূপ ধারণ করিয়া গর্জ্জন করে, এবং জল বর্ষণ করে। মাঠর, অরুণ ও দণ্ড প্রভৃতি রশ্মিজাল—যাহারা তোমার পদতলবর্ত্তী অনুচর—আমি তাহাদিগের সকলকে এবং অশনিক্ষুভদিগকে নমস্কার করি।

উল্লিখিত মাঠর, অরুণ, দণ্ড ও অশনিক্ষুভ এক্ষণে যে কি নাম ধারণ করিয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। অশনিক্ষুভ শব্দের ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টি করিলে বৈদ্যুতিক আলোকের বৃদ্ধি করে, কিংবা আলোকমণ্ডলের সংক্ষোভ অর্থাৎ উৎক্ষিপ্ত রশ্মির প্রবলপ্রবাহ অর্থ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ উপস্থিত হয়না। ঋষি যদি উক্ত তাৎপর্য্যে উক্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের সূর্য্যকায়াগত ঘূর্ণ ঝটিকার বর্ণনা তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন বলিতে পারি।

সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ ও দূরত্বসম্বন্ধীয় আর্য্যবিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলেও আমরা আশ্চর্য্য হই। যদিও তাহা নব্যবৈজ্ঞানিক মতের নিকট ভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হয়—তথাপি অবক্তব্য নহে। মহর্ষি বাল্মীকি সূর্য্যমণ্ডলের বৃহত্ব, দূরবর্ত্তিত্ব ও দূরত্বনিবন্ধন ক্ষুদ্র দৃশ্যত্বের বিষয় সম্পাতিপক্ষীর দ্বারা যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"সম্পাতি বলিলেন, বানরগণ! আমি আর জটায়ু একদা সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করিবার উদ্দেশে উড্ডীন হইয়াছিলাম। শস্যভোজী পক্ষীরা আকাশের যতদূর উঠিতে পারে, ফলভোজী পক্ষীরা তাহার দ্বিগুণ উচ্চে উঠিতে পারে। গৃধ্রেরা তাহার পাঁচ গুণ, কখন কখন ছয় গুণ উচ্চে উত্থিত হয়। কিন্তু গরুড়বংশীয় পক্ষীরা তাহার অনেক গুণ উচ্চে গতিবিধি করিতে সমর্থ। আমরা যখন সমস্ত পক্ষীমার্গ অতিক্রম করিলাম, তখন নিম্নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম,

"উপলৈরিব সংছন্না দৃশ্যতে ভূঃ শিলোচ্চয়ৈঃ

আপগাভিশ্চ সংবীতা সূত্রৈরিব বসুন্ধরা॥

হিমাবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চ সুমহাগিরিঃ।
ভূতলে সম্প্রকাশন্তে নাগাইব জলাশয়ে॥"

পর্ব্বতমালাপরিব্যাপ্ত পৃথিবীমণ্ডল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে আচ্ছন্ন আছেন। পৃথিবীতে যে সকল ভয়দর্শন বিপুল নদ নদী আছে—তাহারা যেন এক এক গাছ সূত্র। হিমালয় বিন্ধ্য ও মেরু প্রভৃতি বিপুলায়ত মহাগিরি সকলকে দেখিলাম যেন জলাশয়ে কতকগুলি সর্প শয়ন করিয়া আছে। এই সময় সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখি যে,—

"তুল্যঃ পৃথ্বাপ্রমাণেন ভাস্করঃ প্রতিভাতি নঃ।"

ভাস্করদেব পৃথিবীতুল্য প্রমাণে প্রকাশ পাইতেছেন।

সম্প্রতি পক্ষিমার্গ অতিক্রম করিয়াই ভাস্করকে পৃথিবী তুল্য প্রমাণ দেখিলেন। এই কথায় একটু বিচার্য্য বস্তু আছে। পৃথিবী প্রমাণ শুনিয়া মনোমধ্যে যে দ্বৈপায়নজাতিসম্মত পরিমাণের উদয় হইয়াছে—তাহা দূর করিতে হইবেক। পুরাণোক্ত পৃথিবী আর দ্বৈপায়নজাতিপরিজ্ঞাত পৃথিবী পরস্পর বিভিন্ন অর্থের বোধ জন্মায়। শেষোক্ত মতের পৃথিবী আর পুরাণমতের জম্বুদ্বীপ সমান। পুরাণোক্ত পৃথিবীতে পর পর দ্বিগুণ আয়তনের আর ছয়টি দ্বীপ আছে। তাহার শেষ দ্বীপটি উক্ত নিয়মানুসারে জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা ৬৪ গুণ বড়। তাহাতে আর ছয় দ্বীপের আয়তন যোগ করিলে একত্রিত সম্পাতির পৃথিবী জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা ১৯১ গুণ বড়। সুতরাং সম্পাতির পৃথিবী আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা ১৯১ গুণ বড়। এখন মনে করুন, সম্পাতি পক্ষিমার্গ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকে জম্বুদ্বীপ অথবা আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা ১৯১ গুণ বড় দেখিয়াছিল কি না। সম্পাতি যদি অন্যান্য ঘোর জীবের বিচরণ মার্গে উঠিত—তাহা হইলে আরও বড় দেখিতে পাইত। কিন্তু সে তাহা পারে নাই, সেই স্থানে গমন করিয়াই তাহার পক্ষপুট সূর্য্যতেজে দগ্ধ হওয়ায় সে মৃতপ্রায় দেহে বিন্ধ্য পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল। সেই জন্যই আমরা সম্পাতির মুখে সূর্য্যমণ্ডলের প্রকৃত বৃহত্ত্ব ও দূরত্বের বিষয় জানিতে পারিলাম না। অন্যান্য ঋষিবর্গ এ সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা আমরা সূর্য্যমণ্ডলের প্রকৃত পরিমাণ ও দূরত্বের ইয়ত্তা অবধারণ করিতে পারিব কি না তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিবেচনা করা যাইবে। নীরস প্রস্তাবের আকার ছোট হওয়াই ভাল, দীর্ঘ হইলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা, অথচ এখনও অনেক রহস্য কথা আছে। এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিতে সঙ্কল্প ধারণ করিলাম, এ প্রস্তাব সম্পাতির পতনেই সমাপিত করিলাম।

শ্রীকালীবর শর্ম্মা।

* সম্পাতির পক্ষ দগ্ধ হওয়াতে আমরা অন্য এক সিদ্ধান্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারি। পৃথিবীতে আমরা যে পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ পাই, অন্তরীক্ষ লোকে তাহার অনেক সহস্র গুণ অধিক সূর্য্যোত্তাপ বিকীর্ণ হয়। অন্তরীক্ষ-বিক্ষিপ্ত উত্তাপে লক্ষ লক্ষ ভাগের এক ভাগ উত্তাপও আমরা প্রাপ্ত হই না।

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বাদশ অধ্যায়।

আমরু ইবিন্ আল্ আসের বিজয় এখন বর্ণনার বিষয়, খলিফা তাঁহার প্রতি মিশররাজ্য-বশীকরণভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরু প্রথমেই সেইদেশে যান নাই, কিছুদিন সৈন্য সহ পালস্তিনেই অবস্থান করেন, ঐ প্রদেশে তখনও কোন কোন স্থান সম্রাটের অধীন ছিল। আরবীয়গণ আবার সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল, আবার শাস্তি পাইয়া সেই আপাতমধুর বিষ ছাড়িয়া দিল।

অনন্তর আমরু ক্রিসেরিয়ায় উপস্থিত হইলেন, সেস্থানে সম্রাট-তনয় কনষ্টাণ্টাইন বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। গুপ্তচরগণ দিন দিন মুসলমানের সংবাদ লইয়া সম্রাট-শিবিরে প্রদান করিতে লাগিল। একদা একজন চর ধৃত ও নিহত হইল।

সম্রাট-তনয় ভীতিবিহ্বল হইয়া আমরুর নিকট সন্ধি প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিলেন। বিলাল ইবিন রেবা নামক ইথিওপিয়াবাসী একজন নিগ্রো দূত স্বরূপ খৃষ্টিয়ান শিবিরে প্রেরিত হইতে প্রার্থনা করিল। সেনাপতি অনিচ্ছার সহিত সম্মতি দিলেন। কিন্তু সম্রাটের দূত অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ 'দাস' কে শিবিরে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিল। তখন সেনাপতি স্বয়ই খৃষ্টিয়ান শিবিরে গমন করিলেন।

সম্রাট-তনয় সিংহাসনে আসীন, আমরুকে উপবেশন জন্য উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করা হইল, তিনি তাহা রাখিয়া মৃত্তিকায় বীরাসনে বসিয়া পড়িলেন।

সম্রাট তনয় বলিলেন, রোমীয়, গ্রীক এবং আরবগণ ভ্রাতা, তাহারা সকলেই নোয়ার সন্তান; যদিও একথা সত্য যে আরবীয়গণ ইশমেলের ঔরসে এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তথাপি তাহারা ভ্রাতা, এক ভ্রাতার কর্ত্তব্য নয় যে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

আমরু বলিলেন আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য; আরবগণ ইশমেল্‌কে পূর্ব্বপুরুষ স্বীকার করিতে গৌরবই মনে করে, গ্রীকগণের পূর্ব্বপুরুষ ইস যে পেটের জন্য পৈত্রিস্বত্ব বিক্রয় করিয়া একমুষ্টি খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার জন্য ঈর্ষা ও দুঃখ প্রকাশ করে না। ধর্ম্মে বৈষম্য আছে, সুতরাং ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধে পাপ নাই।

আমরু আরও বলিলেন যে, " নোয়া জলপ্লাবনের পর পৃথিবী তিনভাগে বিভক্ত করেন। তাহা তাঁহার তিন পুত্র শেম, হাম এবং জাফেত প্রাপ্ত হন। শেম যাহা প্রাপ্ত হন, সিরিয়া তাহার অন্তর্গত ছিল, তাহা তাঁহার বংশধরগণ কাথান, তেস, জোদেই হইতে আমলেক (আরবীয় এক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষ) পর্য্যন্ত ভোগ করিলে পর আরবীয়গণকে প্রস্তর এবং অরণ্য মধ্যে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, উর্ব্বরা সিরিয়া রাজ্য তাহাদের হস্তে আর নাই।

" এক্ষণে আমরা আমাদের প্রাচীনস্বত্ব পুনরুদ্ধার করিয়া পূর্ব্ববিভাগানুসারে সম্পত্তি লইতে আসিয়াছি। আপনারা আমাদের কণ্টক ও প্রস্তর এবং মরুভূমি লইয়া আমাদের মনোহর সিরিয়া রাজ্য, সুরম্য উপবন, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, সুশোভন নগর সকল এবং কলবাহিনী স্রোতস্বতী প্রদান করুন।"

কনষ্টাণ্টাইন বলিলেন, বিভাগ পূর্ব্বেই হইয়াছে; বহুকাল চলিয়া গিয়াছে আমরা ভোগ করিতেছি; আমরাই উদ্যান প্রস্তুত এবং নগর নির্ম্মাণ করিয়াছি, যাহার অদৃষ্টে যাহা পড়িয়াছে তাহার তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

আমরু বলিলেন, " দুইটি নিয়মে মাত্র বর্ত্তমান অধিবাসিগণ এ রাজ্য রাখিতে পারিবে। তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করুক, নতুবা অন্যান্য বিধর্ম্মীর ন্যায় খলিফাকে কর প্রদান করুক।"

কনষ্টাণ্টাইন বলিলেন, 'তাহা নহে। যে যে ভূমিতে বাস করিতেছে, তাহা তাহারই থাকুক, তাহার পরিশ্রম-লব্ধ ফল সে ভোগ করুক, এবং যাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে সে তাহা অনুসরণ করুক।'

আমরু তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন 'এক পথ মাত্র অবশিষ্ট রহিবে। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ ইস যেমন মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আপনারাও যখন সেইরূপ আমার প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিলেন, এখন ঈশ্বর এবং তরবারি আমাদের বিবাদ-মীমাংসক।'

যাইবার সময় তিনি আবার বলিলেন, 'যে পর্য্যন্ত আপনারা বিধর্ম্মী থাকেন আপনাদের সহিত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিব না। তোমরা ইসার সন্তান, আমরা ইশমেলের সন্তান, ইশমেল হইতেই পিতা হইতে পুত্রে, আদম হইতে সন্তান পরম্পরায় মহম্মদ-হস্তে ভবিষ্যদ্বাণী-প্রকাশ-শক্তি এবং মহর আসিয়াছে। ইশমেল তাঁহার পিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্তান ছিলেন, তিনি কেনানা সম্প্রদায়কে আরবের সর্ব্বোত্তম সম্প্রদায় করিয়াছিলেন; আবার কোরীশ পরিবার কেনানার মধ্যে অত্যুচ্চ পরিবার, তাহার মধ্যে হাসেমের সন্তানগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আবু মোতালেবের তেরটি পুত্রের মধ্যে আবদল্লা সর্ব্বকনিষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তিনিই মহম্মদের পিতা (তাঁহার শান্তি হউক!) আবার মহম্মদই তাঁহার পিতার সর্ব্বোত্তম সন্তান। স্বর্গীয় দূত গেব্রিল স্বর্গ হইতে আসিয়া আল্লার প্রদত্ত দৈবশক্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়া যান।'

এই রূপে সন্ধির প্রস্তাব ফুৎকারে পর্য্যবসিত হইলে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের সমক্ষে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিল, যুদ্ধার্থ কেহই অগ্রসর হইল না। অনন্তর একদিবস একজন খৃষ্টিয়ান উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত হইয়া আসিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুসলমানগণকে আহ্বান করিল। আমরু সকলের আগ্রহ সংযত করিলেন। পরিশেষে এক বীরশিশু অগ্রসর হইল। তাহার মাতা ও ভগ্নি তাহাকে গৃহে রাখিতে নানা মত যত্ন করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে বিরত রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না, ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য উৎসুক বীরশিশু অগ্রসর হইল।

বালক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু যে স্বর্গের জন্য সে এত লালায়িত ছিল তাহা লাভ করিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না। ক্রমে আর দুইজন শমন সদনে গমন করার পর সার্জ্জাবিল ইবিল হাসানা নামক একব্যক্তি বাহির হইলেন। ইনি অনবরতঃ রণক্ষেত্রের ক্লেশে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়াছিলেন, অতি অল্প ক্ষণে বিপক্ষ তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে উপবেশন করিলে, গ্রীকবেশধারী একব্যক্তি আসিয়া খৃষ্টিয়ান বীরের বাহু খণ্ড করিয়া ফেলিল। সার্জ্জাবিল পরিশেষে জানিতে পাইলেন তাহার নাম, তুলিয়া ইবিন কোয়েলডু। সে পূর্ব্বে মোশীলমার সহচর ছিল। কিন্তু হৃদয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মাবলম্বনের সুযোগ প্রতীক্ষায় ছিল, আজ সেই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাহা অবলম্বন করিয়াছে।

সার্জ্জাবিল তুলিয়াকে মুসলমান শিবিরে লইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু সে উগ্রতেজা খালেদের ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না, মোশীলমার ন্যায় নিহত হইবে এই তাহার ভয় ছিল। সার্জ্জাবিল, খালেদ মুসলমান শিবিরে নাই বলিয়া, তাহার ভয় দূর করিয়া আমরুর নিকট লইয়া গেলেন। আমরু যথোচিত সদয় ব্যবহার করিয়া পরিশেষে অনুরোধ পত্রসহ খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। উত্তর কালে তুলিয়া পারস্য বিজয়ে খলিফা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল।

শীত এবং ঝটিকার উৎপীড়নে, এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও তাড়িত হওয়াতে খৃষ্টিয়ানগণ ভগ্নহৃদয়ে দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। কনষ্টাণ্টাইন এই রূপে অল্প সঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া বিজয়ী বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে সাহস পাইলেন না। একদা এক ঝটিকাচ্ছন্ন তামসী নিশিতে তিনি সৈন্যসহ পলায়ন পূর্ব্বক ক্রিসেরিয়ার দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন, বিপক্ষগণ শিবির লুণ্ঠনের সুযোগ পাইল। আমরু অনুগমন করিলেন এবং অবরোধ করিয়া বসিলেন, কিন্তু সেই দৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু ধূর্ত্ত যোকেনার চক্রান্তে তাঁহার শেষ আশা বিফল করিল। আণ্টিয়ক গৃহীত হইলে সে পূর্ব্ববৎ খৃষ্টিয়ানের সপক্ষ বলিয়া ভাণ করিয়া ট্রিপলিতে প্রবেশ করিল।

রজনীর অন্ধকার সহায় করিয়া নগরমধ্যে আবুওবীদাকে প্রবেশ পূর্ব্বক অধিকার করিতে সুযোগ দিয়া সে অভিনব বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সুযোগ পাইল। এই সময়ে সাইপ্রস্ এবং ক্রিট্ দ্বীপ হইতে কনষ্টাণ্টাইনের জন্য কয়েক খানি জাহাজে খাদ্য এবং অস্ত্রাদি প্রেরিত হইয়াছিল, খৃষ্টিয়ানবেশধারী যোকেনা সে সমস্ত হস্তগত করিয়া সেই জাহাজে আরোহণ করিল। অনন্তর টায়ার নগরে উপস্থিত হইয়া সে সম্রাটের সাহায্যার্থ যাইতেছে বলিয়া প্রচার করিল। সে সাদরে গৃহীত হইল। তাহার বাসনা ছিল যে রজনীতে দুর্গ মুসলমান হস্তে প্রদান করিবে। কিন্তু তাহার অধীনস্থ একজন লোক তাহার চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া দিলে নগরবাসীরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীয়গণকে কারাগারে আবদ্ধ করিল।

এদিকে ইজেদ ইবিন আবুসোফিয়ান যে দুই সহস্র সৈন্যসহ ক্রিসেরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরুকে ঐ স্থান অধিকার করিতে রাখিয়া স্বয়ং টায়ারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে যোকেনা এতক্ষণ ঐ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা অল্প সংখ্যক বিপক্ষ দেখিয়া অধিকাংশ সৈন্যসহ বাহির হইয়া পড়িলেন, নাগরিকগণ সশস্ত্র প্রাচীরারোহণ করিল।

ধূর্ত্তের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অতি আশ্চর্য্য, এবারও যোকেনার বিপদ সম্পদের কারণ হইল। সে বাসিল নামক একজন খৃষ্টিয়ান ভদ্রলোককে হস্তগত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল। ঐ ব্যক্তিই বন্দীগণের প্রহরী ছিল। যোকেনা যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছে তাহা গুপ্তচর দ্বারা ইজেদকে এবং জাহাজস্থ স্বপক্ষগণকে জ্ঞাপন করিল। অতি অল্প সময় মধ্যে এই সমস্ত সম্পাদিত হইল, ওদিকে দুইপক্ষ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই যোকেনা তাহার নয় শত সৈন্যসহ অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চারিদিক দিয়া দলে দলে বাহির হইল। কেহ দ্বারোদ্ঘাটন করিল, কেহ বিপক্ষের পথ রোধ করিল; জাহাজ হইতে যোকেনার লোক, বাহির হইতে মুসলমান দলে দলে খৃষ্টিয়ান হত্যা করিতে লাগিল। নগর অধিকার করিতে বিলম্ব হইল না। অধিবাসিগণ মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান হইল, অবশিষ্টগণ বিলুণ্ঠিত এবং দাস হইল।

কনষ্টাণ্টাইন শুনিলেন ট্রিপলি এবং টায়ার শত্রুহস্তে পতিত, জাহাজ ও যুদ্ধসম্বল বিপক্ষের হস্তগত, আর ভরসা নাই। ভয়ের নিকট মন্ত্রণা গ্রহণ করিলেন, সে পিতৃপথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিল। সম্রাটতনয় প্রচুর সম্পত্তি ও পরিবার সহ রাত্রিযোগে সমুদ্র পথে কনষ্টাণ্টিনোপলে পলায়ণ করিলেন।

নগরবাসিগণ যখন দেখিল সম্রাট-পুত্র রজনীর অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, তখন তাহারা সম্রাটের অবশিষ্ট সমগ্র সম্পত্তি এবং দুই লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা প্র-

দান করিয়া নগর মুক্ত করিতে প্রস্তাব করিল। আমরু মিশরে যাইতে ব্যস্তছিলেন, সে প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন।

অন্যান্য স্থান অনতি বিলম্বে বশীভূত হইল। এইরূপে ছয়বৎসর যুদ্ধ হইবার পর খলিফা ওমারের রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে, সম্রাট হিরাক্লিয়সের রাজত্বের উনত্রিংশ বর্ষে, হিজিরা ১৭ সনে, খৃষ্টিয় ৬৩৯ সনে মুসলমান কর্ত্তৃক সিরিয়া বিজয় সমাপন হইল। অনন্তর যথারীতি সিরিয়ায় মহামারী উপস্থিত হইল, তাহাতে বহুসংখ্যক সিরীয় লোক এবং পঁচিশ সহস্র আরবীয় শমন সদনে গমন করিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি আবুওবীদা, যুদ্ধকুশল ইজেদ ইবিন্ আবুসোফিয়ান, সার্জ্জাবিল এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সেনানীগণও চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। এইরূপে হিজিরা ১৮ সন মহামারীর বৎসর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

সিরিয়ার জয় সমাপন হইল, মুসলমান রাজশ্রীর শীর্মুকুটে আর একটি অমূল্যরত্ন সংযুক্ত হইল, কিন্তু যে রত্নের বিনিময়ে সিরিয়া ক্রীত হইল, মুসলমান আর তাহার শোক কখন বিস্মৃত হইবে না, সৃষ্টি পুনরায় নূতন কলেবর ধারণ করিলেও মুসলমান তাহা ফিরিয়া পাইবে না, এত বহুমূল্য রাজ্য বিজয়ের সঙ্গে সে দুঃখ মনে হইলে মনের তুলাযন্ত্রে দুঃখ ভারী হইবে। বীরকুলচূড়ামণি খালেদ—যিনি ইয়োরোপে জন্মগ্রহণ করিলে আলেকজেন্দর, সীজর, নেপোলিয়নের ন্যায় যশস্বী হইতে পারিতেন, যাঁহার বিপক্ষ আলেকজেন্দরের বিপক্ষ হইতে বীর্য্যশালী, সীজরের বিপক্ষ হইতে সভ্য ও শিক্ষিত, এবং নেপোলিয়নের বিপক্ষের ন্যায় অসংখ্য,—যিনি বিজ্ঞানবিকাশের পূর্ব্বে প্রাচীন প্রণালীর যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন,—ভগ্নহৃদয়ে নিরাশমনে, উপর্য্যুপরি অপমানে কিরূপে জীবলীলা সংবরণ করেন তাহাই এস্থলে লিখিবার বিষয়। খলিফা ওমার তাঁহাকে ভাল বাসিতেন না; কোন মনোবাদের গুপ্ত কারণ ছিল না সত্য, কিন্তু খালেদ নিতান্ত দুঃসাহসী, অভিমানী, অভিজ্ঞতাশূন্য, ক্ষমতা প্রিয়, বীরত্ব দেখাইতে সর্ব্বদাই অগ্রবর্ত্তী এবং লুপ্তদ্রব্য আত্মসাৎ করিতে নিতান্ত লোলুপ বলিয়া ওমারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ইরান এবং সিরিয়া বিজয়ে তাদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া,—অন্যে যাহা করিতেন না, নেপোলিয়ন যেরূপ প্রস্তাব পদদলিত করিত, তাদৃশ অবনতি স্বীকার পূর্ব্বক আপনাপেক্ষা শতাংশে ন্যূন ক্ষমতাশালী আবুওবীদার অধীনে সামান্য সৈন্যের ন্যায় থাকিয়া অথচ প্রাণপণে কিছুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় হৃদয়ে হৃদয় গোপন করিয়া যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, খলিফার মন হইতে তাহাতেও অন্ধধারণা অপনীত হইল না। পৃথিবীতে কেহ কখনও তেমন হৃদয়, তেমন বীরত্ব, তেমন ধর্ম্মানুরাগ ও প্রধানের নিকট তেমন শক্তিশালী হইয়াও তাদৃশ নীত ও আজ্ঞাধীনতা একত্রে দেখায় নাই, দেখাইবে না।

ইমেসা বিজয় শেষ হইলে খালেদকে সেই বিজয়ের কারণ বলিয়া সকলেই অভিনন্দন করিল, বাস্তবিক তিনিই সে বিজয়ের মূল ছিলেন। ইস্কেয়স্ নামক আরবকবি খালেদের গৌরবপূর্ণ কীর্ত্তিকলাপ উৎকৃষ্ট কবিতায় গান করেন এবং সমস্ত সিরিয়া রাজ্য তাঁহারই বীরত্বোপার্জ্জিত বলিয়া বর্ণনা করেন। মুক্তহস্ত খালেদ তাঁহাকে তাঁহার পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ ত্রিশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করেন। এই সমস্ত ঘটনা যখন ওমারের কর্ণগোচর হইল তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ঘৃণা তৎক্ষণাৎ বিদ্বেষে পরিণত হইল। খালেদ আপনাকে সিরিয়া বিজয়ের নায়ক মনে করে বলিয়া তিনি ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং কবিকে এত অধিক পুরস্কার দেওয়া যে কেবল তাঁহার অভিমান-জনিত তাহাই বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি খালেদ আপন তহবিল হইতেও ঐ টাকা" (টাকা খালেদের আপনার কিনা তদ্বিষয়ে ও খলিফার অমূলক সন্দেহ ছিল; বিদ্বেষের ফল এইরূপই বটে।) "প্রদান করিয়া থাকে, তথাপি সে অপব্যয়ী, এরূপ অপব্যয় লজ্জাজনক, ঈশ্বর অপব্যয়ীকে ভাল বাসেন না কোরাণে এরূপ লিখিত আছে।"

অনন্তর,—কাহার মন্ত্রণামতে, প্রকাশ পায় না,—খালেদের বিরুদ্ধে রাজকীয় অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ হইল। খলিফা বিনা বিচারে বিশ্বাস করিলেন, আপনার অকলঙ্ক নামে কলঙ্কের কালিমা পড়িল, ন্যায়ের অপমান ন্যায়পরের হস্তে হইল!—এবং আদেশ করিলেন যে সমবেত সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকে সেনাপতির পদ হইতে অবনত করা হয়। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার পাগড়ী খুলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে বাঁধিয়া রাখা হয়।

খলিফার আদেশানুসারে কার্য্য সমাপন হইল। প্রথমতঃ শাস্তি প্রদান তৎপর বিচার, খালেদের বিচারে এই অদ্ভুত নিয়ম দেখা গেল। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিচারে খালেদ নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলেন। খলিফা তথাপি খালেদকে গুরুতর অর্থদণ্ড করিলেন। এইরূপ দণ্ডাজ্ঞায় সৈন্যগণ যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইল। তখন খলিফা সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন; "আমি খালেদকে কোনরূপ প্রবঞ্চনা অথবা মিথ্যা ব্যবহারের জন্য শাস্তি দেই নাই, কিন্তু তাহার অহঙ্কার এবং অপরিমিতব্যয়িতার জন্য,—কেবল সে একক এই পবিত্র যুদ্ধে জয়ী হইবার কারণ কবি তাহাকে অনুচিত প্রশংসা করাতে আমি তাহাকে দণ্ডবিধান করিলাম। সম্পদ বিপদ সমস্তই ঈশ্বর হইতে আইসে, খালেদ হইতে নহে।"

উপর্য্যুপরি এইরূপ অবমানিত হইয়া বীরহৃদয় ব্যথিত ও বিদীর্ণ হইল। যে হৃদয় শতপ্রহরণ সহ্য করিয়াছে, আজ তাহা খলিফার কার্য্যে ভাঙ্গিয়া গেল। এতকাল রণক্ষেত্রের ক্লেশে এবং বিপক্ষের প্রহারে প্রহারে শরীর অনেক অবসন্ন হইয়াছিল, তাহার উপর অবমাননার ভীষণ দণ্ড সহিল না, খালেদ ধীরে ধীরে রুগ্নশয্যায় শয়ন ক-

রিলেন। তাঁহার শেষ আক্ষেপ এই, রণভূমিতে পতন হইল না। ধীরে ধীরে তাঁহার আত্মা সেই মূল্যবান দেহ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে সুবিচার আছে, বীরের পুরস্কার আছে, সেই স্বর্গে চলিয়া গেল। সৈন্যগণের এবং সহৃদয়ের হৃদয়মন্দিরে তাঁহার প্রকৃত সমাধি গঠিত রহিল। তাঁহার নাম সৈন্যগণ,—যাহারা তাঁহার বীরত্ব জানিত, শত শত যুদ্ধে তাঁহার প্রসাদাৎ জয়ী হইয়াছে,—ভক্তির সহিত পূজা ও শ্রদ্ধা করিত। যেখানে তাঁহার পার্থিবদেহ নিহিত হইল সমস্ত ললনাগণ সেস্থানে মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেশসমূহ প্রদান করিল,—তীর্থবৎ সম্মান দেখাইল, আপন আপন হৃদয়নিহিত শোক প্রকাশ করিল। খালেদের মানবলীলা সমাপন হইলে অনুসন্ধানে যখন দেখা গেল যে, যুদ্ধে আপনাকে তিনি সঙ্গতিসম্পন্ন করেন নাই, বরং যুদ্ধের অশ্ব এবং অস্ত্র ও একমাত্র দাস তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি, তখন মাত্র ওমার বুঝিতে পারিলেন, কি ভয়ানক অবিচারে খালেদকে হারাইলেন! খলিফা সেই বিশ্বাসী সেনাপতির সমাধিস্থলে অশ্রুপাত করিয়া অন্যায়জনিত অনুতাপ ধৌত করিলেন।

শারীর-ক্রিয়া-তত্ত্ব।

(১৩১ পৃষ্ঠার পর)

পাঠকের এক্ষণে এই প্রশ্ন মনে উদয় হইতে পারেযে,যে প্রকোষ্ঠ হইতে রক্ত আইসে, সঙ্কোচন কালে কেন উহা সেই প্রকোষ্ঠে ফিরিয়া না গিয়া একই ঠিকানার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, হৃৎকোষ ও হৃদুদরের এবং হৃদুদর ও বৃহৎ ধমনীদিগের মধ্যবর্ত্তী যে পর্দ্দা গুলি আছে, তৎসংলগ্ন কএকটী কপাট আছে। এ গুলি তানক্ষম (টন্‌ক,) নমণীয়, ত্বক্‌বিরচিত। ইহারা কেবল একই দিকে উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে,এবং শোণিতের প্রতিপ্রবাহ মাত্রকেই ইহারা রোধকরিয়া থাকে। ফলতঃ, এই কপাটের ভিতর দিকে রক্ত যাওয়ার পর, প্রকোষ্ঠের সংকোচন যত প্রবল হইবে, ততই এই কপাটের কিনারা গুলি জোরে আঁটিয়া যাইবে। আবার তাহারা যাহাতে ঠেল্‌ খাইয়া হৃৎকোষের ভিতর ঢুকিয়া না যায়, এবং উল্টা মুখে না খুলিয়া যায়, সে জন্য আপন আপন রুজু হৃদুদরের প্রাচীরের সঙ্গে সূক্ষ্ম তন্ত্রীবৎ সূত্রের দ্বারা সংলগ্ন আছে। এই সূত্র গুলি তাহাদিগকে অধিক হঠিতে দেয় না। হৃদয়ের প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে এই কপাট গুলি খুলে ও বন্ধ হয়, তাহাতে একই দিকে অবাধে ও সহজে গতি হইতে পারে, কিন্তু প্রতিপ্রবাহ মাত্রেই আটক হইয়া যায়। অতএব রক্ত

কখনও পশ্চাতে গতি করিতে পারে না, কিন্তু পর পর নির্দিষ্ট প্রণালী দ্বারা গমন করিতে থাকে।

অন্যান্য দেহ করণের ন্যায় হৃদয়েরও ছাদক (Membrane) অর্থাৎ আবরক ত্বক্ আছে। উহাকে বেষ্টিয়া একটী সৌত্রিক মাস্তক ত্বক্ আছে; ইহাকে পরিহৃৎক (Pericardium) অর্থাৎ হৃদয়াবরক ত্বক্ কহে। ইহা অন্তরাবৃতি (Diaphragm অর্থাৎ বক্ষঃস্থলীয় ও উদরীয় গহ্বর দ্বয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া যে ত্বক্ উভয় গহ্বরকে পৃথক্ করিয়া রাখে) নামক ত্বকের সহিত সংলগ্ন। ইহা যেমন হৃদয়কে আবরণ করিয়া রক্ষা করে, তেমনি মাস্তক দ্রব বিশেষ নিস্রুত করিয়া উহার গতির সৌকর্য্য সাধন এবং ঘর্ষণ-প্রতিরোধের লাঘব করিয়া থাকে। আবার হৃদয়ের আন্তর স্বরূপ ভিতরে আর একটী মাস্তক ছাদক আছে, তাহাকে অন্তর্হৃৎক (Endocardium) অথবা হৃদয়ান্তর্বেষ্টক বলা যায়। ইহারই ভাঁজ ভাঁজ হইয়া কপাট গুলির গঠন সমাধা হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড অনৈচ্ছিক পেশী—অর্থাৎ উহার আঘাতের উপর আমাদের কোন আয়ত্তি নাই। আমরা অঙ্গ গুলির গতিকে নিয়মন করিতে পারি, এবং শ্বাস প্রশ্বাস ও কিয়ৎপরিমাণে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু ইচ্ছানুসারে আমরা হৃদয়ের গতিকে ত্বরিত বা বিলম্বিত করিতে সক্ষম নহি। তথাচ, ইহা অতি অল্পেতেই ত্বরিত অথবা বিলম্বিত হইয়া থাকে। প্রগাঢ় চিন্তাবেগ দ্বারা ইহা অতি সত্বরে আকুলিত হয়। হর্ষ বা শোক, ক্রোধ বা নৈরাশ্য, অপ্রিয় দর্শন বা অপ্রিয় শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা হৃদয়াঘাতের চঞ্চলতার বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে। ইহা সময়ে সময়ে এতদূর বেশি হইয়া পড়ে যে সংমুর্চ্ছা (Syncope) অথবা হৃল্লাস (Palpitation) উৎপন্ন করে, কিম্বা দীর্ঘকালস্থায়ী ক্রিয়া বিকারজ ব্যাধির সূত্রপাত করিতে পারে; কিন্তু প্রায়ই বিশৃঙ্খলার কারণ অপনীত হইলে, হৃদয় তাহার নৈসর্গিক নিয়মিত ভাব পুনরবলম্বন করিয়া থাকে।

ইহার নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাব অনেক সময়ে কেবল বোধ শক্তির দ্বারাই অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দ শ্রবণ ও স্পর্শ দ্বারা ধমন (Pulsation) অনুভব করিয়াও উহার নিয়মিতত্ব বা অনিয়মিতত্বও স্থির করা যাইতে পারে। বক্ষঃস্থলের উপরে হয় একা, এক কাণ দিয়া, অথবা উরোবীক্ষণ (Stethoscope) যন্ত্রের সাহায্যে দুটী স্বতন্ত্র সমমাত্র (Rhythmic) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; (১) একটী অনুচ্চ দীর্ঘীভূত শব্দ; সম্ভবতঃ ইহা হৃদয়ের পৈশিক বস্তুর সঙ্কোচন দ্বারা, এবং প্রাচীর বৃন্দের ও শোণিতের অন্বাবর্ত্তন (Vibration) দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; (২) একটী তীব্রতর, হ্রস্বতর শব্দ; হৃদুদর দ্বয়ের নির্গমদ্বারস্থ কপাটের হঠাৎ সংরোধ দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। এই শব্দ দ্বয়ের পর যে বিরাম হয়, তাহার স্থায়িত্ব কাল প্রায় ঐ দুটী শব্দে যে সময় লাগে তাহার সমান। শিক্ষিত কর্ণ এই শব্দ ও বিরাম, এবং সমাস্থান ও ব্যাস্থানের প্রকৃতি হইতে হৃৎপিণ্ডের

অবস্থা ও তাহার ক্রিয়ার স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

এই কেন্দ্র স্থানীয় করণ যেরূপে গঠিত ও ইহা যেরূপ ক্রিয়া সমূহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, অপিচ ইহার গতি ক্রিয়া যেরূপ অবিশ্রান্ত তাহাতে উপলব্ধ হইবে যে, ইহা সর্ব্বদাই, মারাত্মক না হউক গুরুতর ফলোৎপাদক ব্যাধি সমূহের বশীভূত হইতে পারে। এই সকল ব্যাধি বহুতর কারণজাত হইতে পারে, যথা, তরুণ বয়সে আমবাতাশ্রিত (Rheumatic)জ্বর; প্রৌঢ় বয়সে অতিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও বিশ্রামের অত্যল্পতা; এবং বৃদ্ধ বয়সে বৃক্ক বা মূত্রপিণ্ড (Kidney) স্থিত রোগ ও মেদাপকর্ষ (Fatty Degeneration)। পরন্তু ইহাও জ্ঞাতব্য যে সমস্ত ব্যাধিই বৈধানিক বা বিধান-বিকারজ নহে, ও সুতরাং অসাধ্যও নহে; ইহারা কেবল ক্রিয়া বিকারাত্মক ও হইতে পারে, কোন আগন্তুক কারণ জন্য উৎপন্ন, সুতরাং সম্ভবতঃ অচিরস্থায়ী। বিবেচনা পূর্ব্বক সাম্যবাদিক (Homœpathic) প্রণালীতে চিকিৎসা করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অনেক স্থলে উপশম ও শেষোক্ত প্রকারের অনেক স্থলে আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ঠিক ঠিক অবস্থা নিরূপণ করিতে সুনিপুণ পরীক্ষক ভিন্ন পারেন না, সুতরাং কেবল তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারাই উহার উচিত চিকিৎসা চলিতে পারে। অব্যবসায়ী লোকে কখনই রহস্যভেদ করিয়া বুঝিতে পারিবেন না কোন্ বিধানে প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে—হৃদ্বস্তুতে, কি উহার মাস্তক ছাদকে—কি হইয়াছে, হৃদ্দোষ (carditis), পরিহৃদ্দোষ (Pericarditis), কি অন্তর্হৃদ্দোষ (Endocarditis)। কেহই স্থির করিতে পারিবেন না, অপবর্দ্ধন (Hypertruphy) জন্মিয়াছে কি না—প্রাচীরচয় পুরু হইয়াছে কি না—তাহার সঙ্গে বিবরগুলির বিস্তার আছে কিম্বা সংকোচ আছে। কেহই বুঝিতে পারিবেন না কপাটগুলি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইতেছে, না কি কমজোর জন্য শোণিতের ঈষৎ প্রতিপ্রবাহ হইতে দিতেছে। কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না হৃল্লাসটি কোন্ হেতুমূলক, বিধান বিকৃতিজাত কিম্বা ক্রিয়াবিকৃতিজাত। এই শেষোক্ত উপদ্রব যাহারা ভোগ করে তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টজনক। ইহা সন্তাড্য শোণিতের পরিমাণের সহিত হৃদয়ের সন্তাড়ন শক্তির অসমতার নিদর্শন। এই শক্তিহীনতা ব্যাধি-নিবন্ধন হইতে পারে; অথবা আত্যন্তিক আবেগ, অন্নাশয়ের পীড়া, তাম্রকূটধূমপান, কিম্বা আত্যন্তিক চা-ব্যবহার জন্যও হইতে পারে। পরন্তু ইহা সন্তোষের বিষয় যে অধিকাংশ স্থলেই হৃল্লাস ক্রিয়াবিকারজ পীড়া হইতেই জন্মিয়া থাকে, ও সুতরাং সদ্বিচারবিহিত চিকিৎসা দ্বারা সাধ্য হয়।

হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়াই শোণিত সর্ব্বাগ্রে ধমনী নামক আশয়শ্রেণী দিয়া গমন করে। ধমনীসমূহের মূল কাণ্ডটিকে আবাহ (aorta) কহে। সেটি বাম হৃদুদরের উপরিভাগ হইতে বাহির হইয়া, প্রায় দুই বুরুল পর্য্যন্ত উর্দ্ধগামী হওত বামপার্শ্বে খিলানাকারে নত হইয়াছে; তৎপরে মেরু-

দণ্ডীয় স্তম্ভের সহিত সমান্তরালভাবে নিম্নগামী হইয়াছে, এবং গমন করিতে করিতে উহা হইতে শাখাসকল বাহির হইয়াছে; অবশেষে গিয়া দুটি প্রধান ধমনীতে বিভক্ত হইয়াছে। ইহারা দুই অধঃশাখার পোষণে নিযুক্ত আছে। ধমনী সকল কঙ্কালের প্রধান প্রধান অস্থিগুলির অনুসরণ করিয়া গিয়াছে,এবং তাহাদের পাশে পাশে আশ্রয় লইয়া আছে বলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। এইরূপে শরীরের তাবৎ ভিন্ন ভিন্ন অংশ আবাহ হইতে নির্গত শাখাসমূহের দ্বারা সম্পন্ন—শাখা,প্রশাখা, অনুশাখা বিস্তৃত হইয়া শোণিত প্রবাহের গমনাগমনের জন্য পরস্পর সম্বদ্ধ প্রণালী-পরম্পরার সৃজন করিয়া রাখিয়াছে। ধমনীগুলির প্রাচীর তিনটি আবরণময়; মধ্যম আবরণ সঙ্কোচ্য, স্থিতিস্থাপক পৈশিকসূত্র, পীতবর্ণ স্থিতিস্থাপকসূত্র, এবং সংযোজক তন্তু দ্বারা গঠিত। যে সকল লক্ষণে শিরা হইতে ধমনীর প্রভেদ হয়, এই আবরণের অধিকতর পুরুত্ব থাকা তন্মধ্যে একটি। পুরুত্ব জন্য দৃঢ়তা থাকাতে এই ফল হয় যে যদি কোন ধমনী কর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে (যদি খালিও হয় তবু) উহার ফাঁপা চোংবৎ আকারের প্রায়ই রূপান্তর হয় না, কিন্তু শিরাব দুই গাত্র নামিয়া পড়ে। উহার এইরূপে গঠন হওয়াতেই উহার স্থিতিস্থাপকত্ব উৎপন্ন হয়, স্থিতিস্থাপকত্ব থাকাতে রক্তগমনাগমনের বিস্তর সুবিধা হয়। মধ্যম আবরণের সঙ্কোচ্যতার গুণে অনেক সময়ে অভিঘাতাদির অনিষ্টকর ফল হইতে অনেকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। কারণ যদি কোন বৃহৎ ধমনী ছিঁড়িয়া যায় তথাপি অধিক রক্তক্ষয় না হইতে পারে; কেন না যদি উহার স্থিতিস্থাপক তন্তু ছিন্ন (কর্ত্তিত নয়) হয়, তাহা হইলে উহা কুঁকড়াইয়া যায়, সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, ভিতর দিকে মুড়িয়া যায় এবং ধমনীর অভ্যন্তরভাগ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়া আর অধিক রক্ত বাহির হইয়া যাইতে দেয় না। শিরাসমূহের পৈশিক আবরণে এই সঙ্কোচ্যতা গুণ নাই। অনেক অনেক শল্যক্রিয়া (Surgical Operation) সম্পাদনের সময় ইহার দরুণ সহায়তা পাওয়া গিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণা

বা

কলিকাতা শতাব্দীপূর্ব্বে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে কৃষ্ণার মাতা চন্দ্রশেখরের বিলম্ব, তাঁহার অবস্থার ক্রমশঃ হীনতা, কৃষ্ণার নিরাশ্রয়তা, সহসা পতি-বিয়োগ প্রভৃতির চিন্তা অহর্নিশি তাঁহার চিন্তা প্রবল চিত্তে উদয় হইয়া, তাঁহাকে অতি অল্পদিনের মধ্যে বিষম ব্যাধি-শয্যায় শায়িত করিলে, কৃষ্ণা নিয়ত তাঁহার প্রাণ রক্ষা হেতু ব্যাকুলহৃদয়ে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। একদা নিশীথ সময়ে তিনি তাঁহার পার্শ্বে শয়নাবস্থায় জাগ্রত রহিয়াছেন এমন সময়ে ক্লান্তিহেতু নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত; তাঁহার মাতা রোদন করিতেছেন, এবং তিনিও শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছেন। পল্লীস্থ ভদ্র মহিলাগণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন;—সহসা যেন সেই মুমূর্ষু দেহ হইতে তাঁহার পিতৃ আত্মা শরীরী হইয়া তাঁহার শিরোদেশে আসিয়া আপন মৃত দেহের প্রতি দেখাইয়া সস্নেহে কহিতেছেন, “মাতঃ কৃষ্ণে! দেখ এই দুর্ভার দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি; ইতিপূর্ব্বে আমি নিদারুণ ব্যাধিযন্ত্রণায় অভিভূত ছিলাম, সহসা সে যন্ত্রণার অবসান হইল;—বোধ হইল যেন নবদেহ নবীন মন ও নবীন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলাম, অথচ মাতঃ, আমি যেন পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছি;—অন্তরীক্ষ, বহুযোজন বিস্তৃত লোকাকীর্ণ মহাদেশ, দূরে, নিকটে, সম্মুখে, পশ্চাতে উর্দ্ধে অলক্ষ অস্পষ্ট আমার ন্যায় বহুজন দেখিতেছি, কেহই আমার নিকট আসিতেছেন না, আমারও তাঁহাদের নিকট যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না; অথচ,পূর্ব্বের ন্যায় তোমাদিগের রোদনে আমার মমতা হইতেছে না।’

* * * *

“মাতঃ, নবদেহের নবশক্তি প্রভাবে পৃথিবী সমস্ত পর্য্যটন করিলাম; পরমাত্মার অনন্ত রচনা ও অপার বুদ্ধিকৌশল এবং তাঁহার ধীময়ী শক্তি প্রভাব দর্শন করিয়া ও বহুকাল বিশ্লিষ্ট অনেক আত্মীয় জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরমসুখী হইয়া সাধুজন সঙ্গে ভিন্নলোকে যাইবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, জানিনা, বিধাতার কি সূক্ষ্ম মঙ্গল-ময় নিয়ম, এ দেহও দুর্ভার বলিয়া বোধ হইতেছে, পুনঃ যে মৃত্যু বা পরিবর্ত্তন নিকটবর্ত্তী এরূপ অনুমিত হইতেছে বলিয়া

তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

* * *

“মাতঃ, তোমার মাতার লোকান্তর নিকটবর্ত্তী, তাঁহাকে কিছু বলিয়া যাইতেছি, সে কথা তোমার শুনিবার আবশ্যকতা নাই, তবে তুমি এইমাত্র জানিও যে সতীত্ব গুরুজনভক্তি, সদা সদভিলাষ, সরলতা, প্রিয়ম্বাদিতা, অন্যায় ও নিষ্ঠুর কার্য্যে সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা, এজীবনের ও লোকান্তরের একমাত্র সম্বল। সুখ ও দুঃখ বিধাতার সুশাসনের নিয়ম; অদূরদর্শী ছাত্রের পক্ষে তাড়না আশু অপ্রীতিকর হইলেও উহার ভবিষ্যতের প্রতি গুরুজনের লক্ষ্য রহিবে। পুরস্কারে পরিমিততা, তাড়নে কোপশূন্যতা শ্রেষ্ঠ গুরুর লক্ষণ হইলে, পরমগুরু ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ নহে। যে শিক্ষার্থী পুরস্কার লাভে আপনাকে সর্ব্ববিজয়ী জ্ঞান করে, পক্ষান্তরে যে গুরু-তাড়নার অবমানন করে, তাহারা উভয়েই নিজ নিজ ভবিষ্যৎমঙ্গল-কুসুম-কলিকাকে এজীবনে স্বাভাবিক নিয়মে প্রস্ফুটিত হইতে না দিয়া পুনরপি লোকান্তরে শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে।”

* * *

মাতঃ কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র নিরাশ্রয় হইলেও তোমার শুভকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তোমার হৃদয়াকাঙ্ক্ষী চন্দ্রশেখর স্বধর্ম্মে ও সুস্থশরীরে আছেন।”

চন্দ্রশেখরের নামোল্লেখ মাত্রে কৃষ্ণার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিয়া মুদিতনয়নে স্বপ্নের কথা সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন;—মাতার লোকান্তর নিকটবর্ত্তী—তাঁহাকে এ জন্মের মত হারাইতে হইবে—তিনি শীঘ্র অনাথিনী ও নিরাশ্রয়া হইবেন। এই সকল কথা মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, উঠিয়া বসিলেন, মা—মা—বলিয়া স্নেহভরে, কাতরে ডাকিতে লাগিলেন; সে করুণশব্দে বৃদ্ধা একবারমাত্র চাহিয়া নয়ন মুদিলেন; সে দৃষ্টি কেবল স্বভাবের অভ্যাসের কার্য্য মাত্র। উহাতে স্নেহ বা জ্ঞানের কোন লক্ষণ ছিল না। কৃষ্ণা নিতান্তই জানিলেন যে, স্বপ্ন সত্য ও তাঁহার আসন্নকাল অধিক দূর নহে। রাত্রিকাল, সহায়হীন অবস্থা; যদি তাঁহার গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হয় তিনি একাকী কি করিবেন? বালিকা, তিনি চিকিৎসার কি জানেন? তথাপি মাতার হস্ত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, দেখিলেন নাড়ী বহিতেছে, ভাবিলেন তবে কেন মৃত্যু হইবে? রোগের উপশম হইতে পারে, দেখি কল্য সকালে বৈদ্য মহাশয় কি বলেন। ক্রমশঃ দুর্ভার নিশার অবসান হইল, আলোক ও কোলাহলে পৃথিবী পূর্ণ হইল, দুই একজন প্রতিবেশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে কহিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে মাতাকে শীঘ্র হারাইবেন। তাঁহারা সাধ্যমত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। দিবা এক প্রহর অতীত হইল, বৈদ্য আসিলেন, তিনি নাড়ী পরীক্ষা ও লক্ষণাদি দেখিয়া কহিলেন, এরোগের আর উপশম নাই; দুই তিনদিনের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে।

তখন কৃষ্ণার যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল তাহা এককালে গেল, তিনি স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে তাঁহার মাতাকে নদীতীরে লইয়া যাইবেন, সে স্থানে রাত্রিকালে একাকী কিরূপে থাকিবেন, কেইবা সহায়তা করিবে। চিন্তার বিষয় সমস্ত কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিবেশীদিগের নিকট কহিলেন, কেহ কেহ সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন, কেহ কেহ বলিল, এরূপ অবস্থায় হরমোহন বাবুর নিকট জানাইলে সকল সুবিধা হইতে পারে। কৃষ্ণা দীনবেশে, বিগলিত নয়নে হরমোহন বাবুর বাটীতে যাইয়া তাহার স্ত্রীকে সমস্ত কহিলেন, ক্রমে কৃষ্ণার আবেদন কর্ত্তা বাবু শুনিলেন। সহৃদয় কর্ত্তাবাবু শুনিবামাত্র সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন, এমন কি, স্বয়ং কৃষ্ণার বাটিতে যাইয়া অর্থ ও লোক বলে বিধিমত কার্য্য সমস্তের সুসার করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণা মাতৃবিয়োগের পর নিতান্ত শোকে বিহ্বল ও সহায়হীন হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রশেখর যদি এ সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শোকাবেগ এতাদৃশ প্রবল হইত না ও তাঁহাকে এতাদৃশ অভিভূত করিতে পারিত না। সত্য, হরমোহন বাবু তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি সহায়তা করিতেছেন, সতত সুমিষ্ট আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে তাঁহার অভাব সমস্ত অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন, তথাচ এরূপ অবস্থায়ও হৃদয়ের যে অভাব স্নেহ, তাহাই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

শ্রাদ্ধাদি অতীত হইল, তথাচ দয়াময় হরমোহন বাবু প্রতিদিন দুই তিন বার আসিয়া কৃষ্ণার তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। কৃষ্ণা নিতান্ত একাকিনী নহেন, একজন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতেছেন।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে কৃষ্ণার অবস্থা পর-মুখ সাপেক্ষ। এখনও সেইরূপ, কিন্তু পূর্ব্বে হৃদয় যে স্নেহসুধাবিনিময়ে আপন স্বত্ব অধিকার করিত, এক্ষণে আর সেরূপ নহে, কর্ত্তাবাবুর সাহায্যে তিনি দিন দিন কুণ্ঠিত-হৃদয়া হইতেছেন। তিনি ভাবিলেন এরূপ দশায় আর কত দিন যাইতে পারে? যাইলেও এরূপ অবস্থায় থাকা কি কোন মতে উচিত? তবে তিনি কোথায় আশ্রয় লইবেন? কাহার শরণাপন্ন হইবেন? তিনি বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে কয়েক দিন চন্দ্রশেখর পাটনা হইতে না আইসেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার পিতৃভবনে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন; এইরূপ স্থিরসংকল্প হইয়া তিনি এক দিবস প্রভাতে ভট্টাচার্য্যের বাটিতে আসিয়া আপনার উপস্থিত অবস্থা সমস্ত কহিলেন। অর্থ-পিশাচ ভাবিলেন যে যদি এ সময়ে তিনি তাঁহাকে আপন বাটিতে স্থান দান করেন, এবং যদি চন্দ্রশেখর পাটনা হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে তাঁহার এতাবৎকালের সুখময় আশানির্ম্মিত সুবর্ণ অট্টালিকা এককালে ভূমিসাৎ হইবে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া অতি নিষ্ঠুর

ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুরবচনে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বাটি ফিরিয়া না আসিয়া হরমোহন বাবুর স্ত্রীর নিকটে যাইয়া আপন অবস্থা অকপটে প্রকাশ করিয়া কহিলেন যতদিন চন্দ্রশেখর না আইসেন, ততদিন তাঁহার বাটিতে পাচকী হইয়া রহিবেন। কর্ত্রী মহোদয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া হউক বা অন্য কোন কারণবশতঃ হউক, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে আপন বাটিতে রাখিতে সম্মতা হইলেন। কৃষ্ণা বাটিতে আসিয়া প্রভাতের ঘটনা সমস্ত প্রতিবেশিনীর নিকট কহিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাবুর নিমকের খানসামা, রূপচাঁদ, প্রতি দিন যেরূপ কৃষ্ণার জন্যে খাদ্য সামগ্রী আনে, আজও সেইরূপে আনিয়া, প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল " মাঠাকুরাণ, এই মাত্র কি আপনি বাবুর বাড়ীতে গেয়েছিলেন ?"

কৃষ্ণা। (হেঁটমুখে) হাঁ।

রূপচাঁদ। কেনে মাঠাক্রুণ জিনিসপত্র কি কিছু কম হচ্চে ?

কৃষ্ণা। (পূর্ব্ববৎ) না।

রূপচাঁদ। তবে কেনে মাঠাক্রুণ ?

কৃষ্ণা। আমি এখানে আর থাক্‌চি না।

রূপচাঁদ। (দুঃখিতস্বরে) সে কি মাঠাক্রুণ, আপনি কি দেশে যাবেন ?

কৃষ্ণা। না

রূপচাঁদ। তবে—

কৃষ্ণা। আমি এ রকম রোজ ভিক্ষা নিতে পারি না। আমি খেটে খাব মনে কর্‌চি।

রূপচাঁদ। সেকি মাঠাক্রুণ—আহা মাঠাক্রুণ—এই কি খেটে খাবার দিন মাঠাক্রুণ। আমাদের কর্ত্তা বাবু, মাঠাক্রুণ, বড্‌ড ভাল মানুষ। এই দেখুন কোম বেশ বিশটি সিধে রোজ বামুনবাড়ী না দিয়ে আপনি একটু জল খান না, তাতে লজ্জা কি মাঠাক্রুণ, আর সব ঠাকুর মশায়রা ত লজ্জা করেন না।

কৃষ্ণা। আমি তোমাদেরই বাটি যাচ্ছি কিছু দিনের জন্য রান্নাবান্না করে একমুট খাব, তাই বল্‌তে গিয়েছিলুম।

রূপচাঁদ। মাঠাক্রুণ তাও কি হয়ে থাকে। আপনি কি রাঁদ্‌তে পার্‌বেন, আর কর্ত্তাবাবু শুনলে মাঠাক্রুণ কপালে যে ঘা মারবেন।

কৃষ্ণা। কেন ?

রূপচাঁদ। মাঠাক্রুণ আপনি তজবিজ করে দেখুন দেখি আপনি ক্লেশ করে রাঁদ্‌লে পরে কর্ত্তাবাবু না কেঁদে কি ভাত খেতে পারবেন ? সে যে দারুণ চুলো মাঠাক্রুণ আপনি কি তার তরাশে যেতে পারবেন ? মাঠাক্রুণ আমি নিত্তি সিধে নিয়ে আসচি, কর্ত্তাবাবু আপনাকে কত স্নেহ করেন, আপনি যদি তাঁকে কোন কথা না বলতে পারেন, আমি গিয়ে সব বলবো। প্রণাম হই মাঠাক্রুণ—আমি গিয়ে বল্‌চি, আর না হয় নিত্তি সিধে আন্‌বো না। "

রূপচাঁদ কৃষ্ণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কর্ত্তাবাবুর নিকটে আসিয়া আনুপূর্ব্বিক

সমস্ত কহিলে, গুণনিধি সহসা যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হইলেন;—ভাবিলেন কৃষ্ণা যদি তাঁহার বাটিতে আসিয়া অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি যে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই, পক্ষান্তরে তিনি যদি অর্থ-সাধ্য না হয়েন, তাহা হইলে কর্ত্রী মহোদয়া সত্বে তিনি যে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই অথবা "রমণ্যা বিচিত্রা গতিঃ"। যাহাহউক স্রোতঃ যে দিকে বহিবে তরণি সেই দিকে চালাইতে হইবে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া রূপচাঁদকে কহিলেন "রূপচাঁদ দেখাযাউক কি হয়"। রূপচাঁদের মনোগত ইচ্ছা নহে যে কৃষ্ণা বাবুর বাটিতে আসিয়া অবস্থিতি করেন; কর্ত্তাবাবু যদি রূপচাঁদের পরামর্শ চাহিতেন, তাহা হইলে সে আপন যুক্তি দিতে পারিত, তিনি কোন যুক্তি চাহিলেন না, রূপচাঁদও বাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া বুঝিতে পারিল না, স্রোতঃ কোনদিকে বহিবে, সুতরাং নিস্তব্ধে চলিয়া গেল। রূপচাঁদ চলিয়া গেলে কর্ত্তাবাবু পুনর্ব্বার গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন কিরূপ কার্য্যের ভার তিনি কৃষ্ণার উপর অর্পণ করিতে পারেন; যাহাতে তাহার বিশেষ অবকাশ রহিতে পারে এবং তিনি অল্প পরিশ্রম করিয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পাবেন। বহুচিন্তার পর স্থির হইল তাহাকে দেব সেবায় নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 'বশীকরণ মন্ত্র, যাগ' প্রভৃতির কথা যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, এখন সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "কৃষ্ণা কৃষ্ণা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

রাজা কংশনারায়ণ ও রাজা গণেশ।

বাঙ্গলার সমগ্র মুসলমান-রাজত্বে একজন মাত্র স্বাধীন হিন্দু নৃপতির নাম অবলক্ষিত হয়। যিনি তদানীন্তন যবন-রাজের হস্ত হইতে বঙ্গ-সিংহাসন গ্রহণকরেন, তিনি যে বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যথার্থ ও পর্য্যাপ্ত বিবরণ প্রাপ্তহওয়া যায় না। বান্ধব ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪১ পৃষ্ঠায় "রাজা কংশনারায়ণ ওরফে রাজা গণেশ" শীর্ষকযুক্ত একটি প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। লেখক দুইখানি পারস্যগ্রন্থ (তবকতে আকবরী ও রিয়াজউস্‌সলেতিন) হইতে কংশ সম্বন্ধীয় কতকগুলি সত্য মিথ্যা মিশ্রিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকায় কংশসম্বন্ধে বোধ হয় এই প্রথম আলোচনা। ক্রমিক গবেষনায় কংশ সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য ঘটনা বহু কালের ভস্মাচ্ছাদন হইতে অধিকতর উজ্জ-

লিত হইবে এরূপ আশাকরা অসঙ্গত নহে।

জেলা রাজসাহীর মধ্যে তাহেরপুর রাজবংশের কুর্শীনামায় কংশনারায়ণ ও গণেশ নামধেয় দুইজন নরপতির নাম উল্লিখিত আছে। রাজসাহী জেলার মধ্যে এই বংশ অত্যন্ত প্রাচীন। ঐতিহাসিক কংশনারায়ণ ওরফে গণেশের সহিত ইহাদিগের উভয়ের অনেক ঘটনার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাদিগের বিষয় আলোচিত হইবে। রাজবংশের কুর্শীনামা, চিরাগত জনপ্রবাদ বিশেষতঃ রাজবংশের পুরুষ পরম্পরাগত কিম্বদন্তী ও কাগজাদি বিলোড়নে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ হইল।

বিজয়লস্কর নামক এক ব্যক্তি ইদানীন্তন গৌড়ের অধিপতির অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিতেন। একদা সম্রাট কোন বিশেষ কারণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে কয়েকটি পরগণার জমিদারী ও রায়রাঞা উপাধি প্রদান করেন। সম্রাটের নিকট হইতে কোন্ কোন্ পরগণা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বিশেষরূপে জানা যায় না। তবে তাহেরপুর ও লস্করপুর পরগণা যে প্রাপ্ত হয়েন তাহা অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিজয়লস্করের স্বীয় নামানুসারে লস্করপুর পরগণার নামকরণ হয়।

বিজয়লস্করের পুত্র হৃদয়নারায়ণ রায়। ইনি পিতার ন্যায় কার্য্যক্ষম ছিলেন। জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী জন্য সম্রাট এক সরকারের কার্য্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার সরকার বিশটি পরগণার দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল। আবার অনেকে ইহার ন্যূন ও উর্দ্ধসংখ্যা অনুমান করেন। তদীয় পুত্র জীবনারায়ণ রায় স্বীয় মূর্খতা জন্য সমুদয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। জীবনারায়ণের রাজ্যচ্যুত হওন সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব কাহিনী আছে। তাঁহার সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে একজন হীনবংশীয় ব্যক্তি অধিরূঢ় হয়েন। তাঁহাকে রাজটীকা প্রদান জন্য নিরূপিত দিবসে, বঙ্গের প্রধান ভৌমিকসকল রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন। অভিনব সম্রাটকে রাজটীকা প্রদান করিতে সকলেই কৃতসঙ্কল্প কিন্তু জীবনারায়ণ নিতান্ত গর্ব্বিত ছিলেন। তিনি হিতাহিত পরিশূন্য হইয়া, বহু রাজন্যপরিবেষ্টিত সভামণ্ডপে সদর্পে বলিয়াছিলেন "যে হস্তে পবিত্র কুলজাত সম্রাটদিগকে রাজটীকা প্রদান করিয়াছি, সেই হস্তের দ্বারা তোমার ন্যায় একজন হীনবংশীয় ব্যক্তির নিকটে ললাট অবনত করা—পবিত্র হস্তের অবমাননা করা, জীবনারায়ণের প্রাণ থাকিতে সম্ভবপর নহে।" বলা বাহুল্য যে এরূপ অপরিণামদর্শিতার ফলভোগ অবশিষ্ট ছিল।—ইনি কারাগারে নীত হইয়াছিলেন।—সম্পত্তিসকল অপহৃত হইয়াছিল। রাজা কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। অভিনব সম্রাটের নিকট ইহার রাণী কর্ত্তৃক এক খণ্ড আবেদন প্রেরিত হয়। তাহাতে রাজার অপরিণামদর্শীতা ও স্বীয় অন্নক্লেশের কথা লিখিত হইয়াছিল। সম্রাটও তাহেরপুর পরগণা "রাণীয়ান স্বরূপে" (কেবল রা-

ণীদিগের সত্ব) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত পরগণা ইহাদিগের অধীনে আছে।

জীবনারায়ণের পুত্র হরিনারায়ণ রায়। হরিনারায়ণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। তৎপুত্র কংশনারায়ণ বংশকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

কংশ স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা সম্বন্ধে অনেক গুলি কাহিনী আছে। কংশ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া, সামান্য বিষয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ বোধ করা অসম্ভব মনে করেন। তিনি বিস্তর বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন পূর্ব্বক তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাটের অধীনে কোন উচ্চপদ প্রত্যাশায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্যশ্রী অবলোকনে, সৈন্যবিভাগের কোন উপযুক্ত পদ প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। কংশ স্বভাবতঃ যেমন তেজস্বী ছিলেন, তাহাতে সৈন্যবিভাগ তাঁহার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। তিনি প্রথমে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য ও কিছু দিন পরে পঞ্চসহস্র সৈন্যের অধিপতি হয়েন।

কংশ কয়েক দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া, বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের সহিত দেশে প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট তাঁহাকে তাহেরপুর ব্যতীত আরও কয়েকটি অতিরিক্ত পরগণার জমিদারী প্রদান করেন।

কংশের দিল্লী অবস্থানকালে কতকগুলি মোগলসৈন্য তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হইয়াছিল। এদিকে আবার বাঙ্গলার অধিকাংশ জমিদার, কংশের অসামান্য বীরদর্প ও সম্মানের জন্য অত্যন্ত অসূয়াপরবশ হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত কতকগুলি সুশিক্ষিত ও অনুগত মোগলসৈন্যকে নিকটে রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি দুইশত মোগলসৈন্যকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং রাজধানীর সন্নিকটে বরাহী নদীতীরে সংস্থাপন করেন। তদবধি উক্ত স্থানের নাম মোগলপাড়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত স্থানটি বিদ্যমান আছে। কিন্তু সাধারণে মোগলপাড়া মঙ্গলপাড়া নামে পরিচিত। বস্তুতঃ "মঙ্গল" শব্দ যে "মোগল" শব্দের অপভ্রংশ তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাঙ্গলার তদানীন্তন জমিদারগণ কংশের প্রতি নিতান্ত অসূয়াপরবশ হয়েন। কংশ স্বীয় অসাধারণ বীরত্ব ও উল্লিখিত মোগলসৈন্যদিগের সাহায্যে, তাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার অসমসাহসিকতা সন্দর্শনে বাঙ্গলার তদানীন্তন সুবেদার তাঁহার প্রতি কোনরূপ অসম্মান জনক ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেন না। দিল্লীর সম্রাট প্রদত্ত পরগণা ব্যতীত কংশনারায়ণ স্বীয় দুর্ব্বিনীত ক্ষমতায় আরও কয়েকটি পরগণা আত্মসাৎ করেন। তাঁহার রাজ্য মালদহ, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

কংশনারায়ণ বারেন্দ্রব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। তিনি সেই সমাজের মধ্যে যেরূপ প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। তিনি নন্দনবাণী নাম্নী শ্রোত্রিয়। তদীয় পূর্ব্বতন কোন ব্যক্তি উক্ত সমাজের সমাজপতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ কংশ যে অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রভূত সম্পত্তির অধিপতি ছিলেন, তাহার অন্যতম প্রমাণ বারেন্দ্রবিপ্রসমাজে তদীয় অলৌকিক আধিপত্য। যত দিন বঙ্গদেশে বারেন্দ্রবিপ্রসমাজ থাকিবে, তত দিন কংশের নাম সাদরে কীর্ত্তিত হইবে।

অবিসংবাদিত রূপে সমাজপতি হওয়া বিশেষ প্রাধান্য-সাপেক্ষ, আমরা নিম্নে একটী ঘটনার দ্বারা তাহা প্রমাণ কবিব। কংশ তদানীন্তন অনেক জমিদারের সম্পত্তি ও সম্মানের দিকে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সুসঙ্গের মহারাজার সহিত কোন রূপ অবৈধ ব্যবহার করেন নাই। যেহেতু কংশের পূর্ব্ব হইতেই সুসঙ্গের মহারাজা সমাজপতি ছিলেন। কংশ নিজে সমাজপতি হইয়া যাহাতে সুসঙ্গের গৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। কংশের সময় হইতে সুসঙ্গ "উদয়াচল" ও তাহারপুর অস্তাচল নামে অভিহিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সমাজপতিত্ব সুসঙ্গে আরব্ধ ও তাহেরপুরে শেষ হয়।

নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী দৌহিত্র আশায় বঞ্চিত হইয়া দত্তক গ্রহণে অভিলাষ করেন। যে কারণেই হউক, সাধারণে এইরূপ সংস্কার ছিল যে দত্তকপুত্র কুলবিহীন। রাণী ভবানী প্রাগুক্ত সংস্কার মূল উচ্ছেদ জন্য বারেন্দ্র বিপ্রসমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন কুলজ্ঞ ও পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন। অর্থের প্রলোভনেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, সকলে রাণীর মতের (দত্তক পুত্রের কুল আছে) পোষকতা করেন। তাহেরপুরের অন্যতম ভূম্যধিকারী রাজা বিনোদরাম রায় শ্রেষ্ঠ কুলীন উদয়নাচার্য্যের বংশ-সম্ভূত। তিনি স্বীয় গৌরবে রাণীর মতে সম্মতি প্রদান করেন না। এবং নিজে একটি স্বতন্ত্রদল সৃষ্টি করেন। কিন্তু কংশের সময়ে সমাজপতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সুসঙ্গ ব্যতীত আর কোন স্থানের নাম শ্রুতিগোচর হয় না। ইহাও কি কংশের অসামান্য প্রাধান্যের পরিচয় প্রদান করে না?

রাজা কংশনারায়ণ কোন্ সময়ের লোক তদবধারণ কর্ত্তব্য। রাজা কংশের অধস্তন দশম স্থানীয় রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় এখনও জীবিত আছেন। ন্যূনাধিক দুইশত বৎসরের মধ্যে দশ পুরুষ অবশ্য জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ গণনায় প্রতীয়মান হয় যে রাজা কংশনারায়ণ ষোড়শ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ষোড়শ খৃষ্টাব্দের লোক হইলে, ঐতিহাসিক কংশনারায়ণ ওরফে গণেশের সহিত সময় সম্বন্ধে কোন সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। কেননা ঐতিহাসিকেরা বলেন যে তাঁহাদিগের কংশনারায়ণ ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগের অথবা চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের নিতান্ত প্রথম সময়ের লোক, সুতরাং গণনারদ্বারা স্থিরীকৃত হয়না

যে ইনিই ঐতিহাসিক কংশ। কিন্তু আমাদিগের কংশ যেমন প্রাধান্য-সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ কিম্বদন্তীদ্বারায় প্রমাণীকৃত হইতেছে যে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তাগণ যথানিয়মে রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই।

তাহেরপুরের বর্ত্তমান রাজবাটি নিরীক্ষণ করিলে, প্রবলপরাক্রান্ত কংশের বাটি বলিয়া অনুমিত হয় না। রাজ পরিবারস্থ ও অনেক বৃদ্ধের নিকট শুনা গিয়াছে যে ইহাদিগের প্রাচীন বাটি মোগলপাড়ার সন্নিকটে ছিল। বাস্তবিক তথায় একটি বৃহৎ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে, ইষ্টকাদি অনেক স্থানান্তরে নীত হইয়াছে। একশত বৎসরের পূর্ব্বে তথায় ভয়ানক জঙ্গল ছিল। কয়েক বৎসর হইল জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইয়াছে। উল্লেখ-যোগ্য একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। জলাশয়টি কোন সময়ের তাহা কেহ অবধারণ করিতে পারে না। সাধারণতঃ জলাশয়টি 'রাণী গৌরীর' দিঘীনামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে রাজা গণেশের সহধর্ম্মিণী রাণী গৌরীই জলাশয়টি খনন করেন। কিন্তু এসম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

রাজবংশের আদিপুরুষ দিবাকর জগৎগুরুর দুইটি সন্তান। একের নাম পুরুষোত্তম বেদান্তবাগীশ, অপরের নাম কুল্লূকভট্ট। রাজা কংশনারায়ণ পুরুষোত্তম বেদান্তবাগীশের অধঃস্তন একাদশ স্থানীয়। রাজগণেশ কুল্লূক ভট্টের অধঃস্তন পঞ্চম স্থানীয়।

রাজা কংশ সম্বন্ধে যেমন কতকগুলি অলৌকিক কাহিনী আছে, গণেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। গণেশের পিতা ভট্ট উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। গণেশ বংশানুক্রমিক ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া গৌড়ের অধিপতির অধীনে কোন উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা করেন। তদীয় পিতা তাঁহাকে পারস্য শিক্ষায় একান্ত উৎসুক দেখিয়া, মানসিক-গতি পরিবর্ত্তনের জন্য বিস্তর যত্ন করেন। পরিশেষে কিছুতেই তাঁহার সংকল্প বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে "তুই যেমন আমার আদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ম্লেচ্ছভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলি, কালে তোর বংশ মুসলমান হইবে।" কিন্তু গণেশের স্থিরপ্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। তিনি রীতিমত পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া গৌড়ের তদানীন্তন সম্রাটের অধীনে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ও রায় উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। সম্রাট, গণেশের অসাধারণ কার্য্যদক্ষতায় বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। এবং গণেশও সম্রাটের বড়ই বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। গণেশ এই সময়ে সম্রাটের সাহায্যে তাহেরপুর, ভাতরিয়া, প্রতাপপুর প্রভৃতি কয়েকটি পরগণা হস্তগত করেন। এরূপ কথিত আছে যে, ভাতরিয়া পরগণা উদয়নাচার্য্যের বংশসম্ভূত কোন ব্যক্তির জমিদারী ছিল। তাহার উপাধি ভাদুড়ি জন্য, পরগণার ভাদুড়িয়া নামকরণ হয়। ভাদুড়িয়ার অনেক

সীমা চতুষ্পার্শ্বস্থ পরগণা সকলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সম্রাটের মৃত্যুর পর গণেশ স্বাধীনভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপুত্র জ্যোতিরায় মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং পিতৃঅভিশাপে গণেশের বংশের বিলোপ সাধন হয়। জ্যোতিরায় সম্বন্ধে আর কোন কাহিনী শুনা যায় নাই।

গণেশরায় কোন্ সময়ের লোক, তদবধারণ কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, রাজা গণেশ কুল্লূকভট্টের অধঃস্তন পঞ্চম স্থানীয়। কুল্লূকভট্ট কোন্ সময়ের লোক তাহা অবধারণ করিতে পারিলে, গণেশের সময় অবধারিত হইবে। কুল্লূকভট্ট যে তাহেরপুরের রাজগোষ্ঠীসম্ভূত, তাহা তদীয় একটি শ্লোকে * প্রমাণিত হইতেছে। কুল্লূকভট্ট ও পুরুষোত্তম বেদান্তবাগীশ সহোদর ভ্রাতা। পূর্ব্বোক্ত রাজা কংশনারায়ণ বেদান্তবাগীশের অধঃস্তন দশম স্থানীয়। কংশগণনার দ্বারা ষোড়শ খৃষ্টাব্দের লোক হইলে সুতরাং পুরুষোত্তম ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগের অথবা চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের লোক হইয়া পড়েন। আবার গণেশও এই হিসাবে অনূ্যন আরও এক শতাব্দীর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কিন্তু কুল্লূকভট্টকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক অনুমান করিলে, গণেশকে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগের লোক মনে করা অসঙ্গত নহে। প্রত্নকত্রদিগের গণনার নিয়ম সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ত্তে না। কোন কোন স্থলে ব্যভিচারও পরিলক্ষিত হয়। আমরা প্রামাণিক ঘটনার দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, কংশের অধঃস্তন ৬ষ্ঠ স্থানীয় রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায় হিজরী ১২২৬ সালে ও তাঁহার পুত্র ১১৪৫ সালে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং ও তাঁহার অধঃস্তন অপর চারি জন প্রায় ১৬০ বৎসরের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রত্নকত্রদিগের নিয়মানুসারে এস্থলে আরও অনূ্যন ২।৩ পুরুষ জন্মিতে পারিত।†

* গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাংকুলে
শ্রীমৎভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবেৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহি জহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী॥

† মহেন্দ্রের ভ্রাতা রূপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রণেন্দ্রনারায়ণ রায় দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জেলা রাজসাহীর অধীন চুণাপাড়া নামক স্থানে উক্ত মন্দিরটি এখনও বর্ত্তমান আছে। উক্ত চুণাপাড়া হাটগোদাগাড়ির উত্তরভাগে অবস্থিত। মন্দিরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে।—

"মহীন বর্ত্তুক্ষিতি সখ্য শাকে
দুর্গেশ্বরায়া দদতচ্চ সৌধং।
ধরামরেন্দ্রোধরণীপতি শ্রী
রণেশ্বরায়ায়ন ইস চেতস্বাঁ॥"

অনুবাদ।—ঈশ্বরনিষ্ঠ ধরণীপতি রণেন্দ্র-

প্রামাণিক ঘটনার দ্বারা জানা যায় পুঁটিয়ার রাজা প্রেমনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ, তাহেরপুরের রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ এবং নাটোর রাজবংশের ভিত্তিসংস্থাপক রাজা রঘুনন্দন ইহারা একই সময়ের লোক। রঘুনন্দন ১০৯৩ সালে (হিজরী) পুঁটিয়ার দর্পনারায়ণের প্রতিনিধি স্বরূপে মুরশিদাবাদের নবাবদরবারে ওকালতী করিতেন, তাহা সাধারণে অবগত আছেন। নিম্নে পুঁটিয়ার প্রেমনারায়ণ (দর্পনারায়ণ প্রেমনারায়ণের কনিষ্ঠ) ও তাহেরপুরের মহেন্দ্রনারায়ণের বংশের তালিকা প্রদত্ত হইল।

রাজা প্রেমনারায়ণ রায়
|
রাজা অনুপনারায়ণ রায়
|
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়
|
রাজা গুণেন্দ্রনারায়ণ রায়
|
রাজা জগৎনারায়ণ রায়
রাণী ভুবনময়ী দেবী
|
রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রায়
রাণী দুর্গাসুন্দরী
|
রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়
|
মহারাণী শরৎসুন্দরী (জীবিত)
|
কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ রায়
(বর্ত্তমান আছেন)

নারায়ণ রায় ১৬৯১ শকে মহাদেবের উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়
|
রাজা রমেন্দ্রনারায়ণ রায়
|
রাজা আনন্দনারায়ণ রায়
|
রাজা শিবপ্রসাদ রায়
|
রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়
(ইনি জীবিত আছেন)

নির্দ্দিষ্ট গণনার নিয়মানুসারে প্রেমনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ যে একই সময়ের লোক একপসিদ্ধান্ত হয় না। কিন্তু প্রামাণিক ঘটনার দ্বারা স্পষ্টতঃ উক্ত নিয়মের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইতেছে।

অধ্যাপক কাওয়েল সাহেব (Cowell,s preface to the Kusumanjali স্থির করিয়াছেন যে উদয়নাচার্য্য খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। যদি কাওয়েলের কথা স্বীকার করা যায় তবে প্রতীত হইবে যে কুল্লূক ভট্ট ও উদয়ন সমসাময়িক লোক। যেহেতু উদয়ন হইতে তদীয় অধঃস্তন তাহেরপুরের রাজা শশীশেখরেশ্বর পর্য্যন্ত ২২ পর্য্যায়। আবার বেদান্তবাগীশের অধঃস্তন দেবেন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত ২২ পর্য্যায়। উদয়নের বংশে কোন কোন স্থলে ২৬ পর্য্যায় হইয়াছে। সুতরাং কুল্লূক ও উদয়নকে সমসাময়িক লোক মনে করা অসঙ্গত নহে।

কুল্লূকভট্ট দ্বাদশ খৃঃ লোক হইলে গণেশ রায় ত্রয়োদশ খৃঃ শেষভাগের লোক হওয়া নিতান্ত সম্ভবপর। নিম্নে কুল্লূকভট্ট হইতে গণেশের পুত্র পর্য্যন্ত একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

কন্দুক ভট্ট
|
সদ্রূপ ভট্ট
|
জয়ন্তক ভট্ট
|
নারায়ণ ভট্ট
|
মহেশ ভট্ট
|
রাজা গণেশ রায়
|
জ্যোতি রায়

আর একটি কথা উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত। কিছু প্রাচীনকালের ভট্ট ব্রাহ্মণ (শাস্ত্রাদি-ব্যুৎপন্ন বিপ্র) দিগেব বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা কর্ত্তব্য। গবেষণার দ্বারা জানাযায় যে এই সকল মহাত্মারা ত্রিংশৎ অথবা পঞ্চবিংশতি বর্ষের ন্যূন বয়সে প্রায়শঃই দার পরিগ্রহ করিতে না। আবার কন্যার বয়সও অষ্টম অথবা দশমবর্ষের উর্দ্ধ হইত না। সুতরাং এসকল স্থলে পঁয়ত্রিংশ অথবা ন্যূন কল্পে ত্রিংশৎবর্ষের ন্যূনে সন্তান উৎপাদন করিতে অক্ষম। স্থানে স্থানে এবম্বিধ মৌলিকত্বদ্বারায় গবেষণা করা একান্ত আবশ্যক। এবং অনেক সময়ে প্রামাণিক ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক রহস্যের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

এই বংশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে গণেশভট্ট প্রথমতঃ রায় ও তৎপরে রাজা উপাধি ধারণ করেন। অন্য শাখায় গণেশের প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পরে বিজয় লস্কর রায় রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা কংশ ও গণেশ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিলাম, তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাসে যিনি রাজা কংশনারায়ণ ওরফে গণেশ নামে পরিচিত, তিনিই যে আমাদিগের গণেশ তাহা অবিশ্বাসযোগ্য হয় না।

কংশ ও গণেশ সম্বন্ধীয় অলৌকিক কাহিনীসকল এতদুর সমভাবাপন্ন যে তদ্দ্বারা উভয়কে এক ব্যক্তি কল্পনা করা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ প্রাগুক্ত ঘটনাসমূহ দ্বারা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে। এক দিকে গণেশের পুত্র মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেন অপর দিগে কংশের ভাগিনেয় উদয়নের বংশসম্ভূত সুবুদ্ধি খাঁ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দুইজনই একবংশসম্ভূত। উভয়েই প্রায় সমাননামবিশিষ্ট পরগণার অধিপতি। উভয়েই প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন। অধিকন্তু গণেশরায় কংশের পূর্ব্ববর্ত্তী বিধায়, কংশের পরবর্ত্তী লোক সকলের মনে, তদীয় কীর্ত্তিকলাপ জাগরুক ছিল। সুতরাং দূরস্মৃতির কংশ সম্বন্ধীয় কীর্ত্তিকলাপ একই বিধানে সামঞ্জস্য হইয়াছে।

আমাদিগের বক্তব্য রাজা কংশ ও গণেশ যে দুই ও বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা প্রতিপন্ন হইল। কংশ ও গণেশ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কাহিনী শুনা গিয়াছে। সে গুলি কেবল ক্ষমতার পরিচায়ক মাত্র। আমরা এতাবতা যে পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম, তদ্দ্বারা সাহস সহকারে বলিতে পারি যে আমাদিগের রাজা গণেশই বাস্তবিক ঐতিহাসিক কংশনারায়ণ ওরফে গণেশ। আশা করি, ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তাগণ এই রহস্যের বিশদ উন্মেষণ করিবেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথম খণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভূগোল বিবরণ।

প্রাচীন আর্য্যগণ পূর্ব্বভারত পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পৌণ্ড্র। মহাভারত ও বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে—চন্দ্রবংশীয় সম্রাট যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর বংশে বালী নামে এক রাজা ছিলেন। সেই বালী রাজপত্নী মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরষে পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। বালীর ক্ষেত্রজ পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পৌণ্ড্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাহারাই পূর্ব্ব ভারত পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া সেই সেই প্রদেশের রাজদণ্ড ধারণ করেন। উত্তরকালে তাহাদের অধিকৃত রাজ্য সেই সেই নামে পরিচিত হইয়াছিল।

অঙ্গ—আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি * যে রামায়ণে অঙ্গ নামকরণের ইতিহাস এইরূপ লিখিত হইয়াছে—এই প্রদেশে অনঙ্গ ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে অঙ্গদেশ আখ্যা দান করা হয়। রামায়ণ পাঠে অনুমিত হয় যে, গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমস্থল অঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্ণীত ছিল, সুতরাং বাল্মীকির সময়ে মগধ অঙ্গের অন্তর্গত ছিল। † শক্তি সঙ্গমতন্ত্র পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে এই রাজ্য অন্যদিকে বৈদ্যনাথ হইতে ভুবনেশ্বর অর্থাৎ উৎকলের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ‡ তদনুসারে অনুমিত হয় বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ রাঢ়দেশ প্রাচীন অঙ্গের অংশমাত্র। রাঢ় নামটি নিতান্ত অভিনব নহে। সিংহল দেশীয় ইতিহাসগ্রন্থে সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও রাঢ় নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পালিগ্রন্থাদিতে ইহাকে "লাঢ়" বা "লাট" লেখা হইয়াছে। পালিভাষায় লিখিত প্রস্তর লিপি সমূহ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সেই ভাষায় "র" এর পরিবর্ত্তে "ল" ব্যবহার হইত। স্তম্ভ লিপিতে মহারাজ অশোক-"রাজা"র পরিবর্ত্তে "লাজা" লিখিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় পালিভাষায় লিখিত "লাঢ়" বা "লাট"ই যে আমাদের রাঢ় তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

* হিয়োনসাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ দেখ। (ভারতী, চতুর্থখণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।)

† রামায়ণ বালকাণ্ড ত্রয়োবিংশ সর্গ দেখ।

‡ বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশ যাত্রায়াং নহিদুষ্যতি॥
শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

বঙ্গ—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানায় যে ভূখণ্ড সাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহাই বঙ্গ-ইহার পশ্চিম দিকে শাখা গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে মেঘনাদ নদ প্রবাহিত। যে কয়েকটি প্রদেশ লইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা গঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে বঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব। কোন বৈদিকগ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ নাই। রামায়ণের এক স্থানে বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই স্থানটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।*

*অযোধ্যাকাণ্ডের, দশমসর্গে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে তোষামোদ করিয়া বলিতেছেন;—

প্রিয়ে। "যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতীমে বসুন্ধরা।
দ্রাবিড়া সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধা কাশিকোশলাঃ।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার রাজ্য এতদূর অবধি বিস্তৃত। এই সকল জনপদে ছাগ, মেষ, ধন, ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আমার কিছুই অভাব নাই, সেসমস্ত তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর।"

এবম্প্রকার একটি কদর্য্য স্থান ব্যতীত রামায়ণের অন্য কোন স্থানেই বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রামায়ণের এই অংশে বঙ্গকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু বাল্মিকীর সময়ে যে বঙ্গ একটি অনার্য্য নিবাস ও অনুন্নত জনপদ ছিল তৎপক্ষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, আমাদের বিবেচনায় বাল্মীকির সময় বঙ্গ আর্য্যগণ নিকট বিশেষরূপে পরিচিত ছিল না।

পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র—"হিয়োনসাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ" প্রবন্ধে এই রাজ্যের সীমা নির্ণীত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই রাজ্য ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মহানন্দা দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু উইলসন সাহেবের মতে পৌণ্ড্রদেশ ব্রহ্মপুত্রের তীর হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুযোগ্য উইলসন সাহেব নিতান্ত অভিনব গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাহার মতানুসরণ করিতে পারিতেছি না। †

বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন।

† উইলসন সাহেব বলেন—

Pundras—The western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following districts—Rajshahi, Dinajpure and Rangpure; Nadia, Beerbhoom, Burdwan, part of Midnapure and the Jungle Mehals; Ramghur, Pachati, Palamow, and part of Chunar.

Wilson's Vishnu Purana. page 160
Hall's Ed. Vol II. pp. 170, 171.

উইলসন সাহেব ভবিষ্যপুরাণ অবলম্বন করিয়া Oriental Magazine নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পৌণ্ড্রদেশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে

বাঙ্গালার মধ্যে পৌণ্ড্র প্রদেশ সর্ব্ব-প্রাচীন। বৈদিক আর্য্যগণ ইহার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মনুর মতে পুণ্ড্র একটি পতিত আর্য্যজাতি, বোধ হয় এই জাতির বাসস্থান পৌণ্ড্র প্রদেশ।

সুহ্ম—কামরূপের দক্ষিণ সীমা হইতে নিগ্রহ অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রাচীন কালে সুহ্মনামে পরিচিত ছিল। ইহার অন্য নাম কিরাত দেশ। কিরাত রাজ ত্রীপুর স্বীয় নামানুসারে অধিকৃত প্রদেশকে "ত্রীপুরা রাজ্য" বলিয়া পরিচিত করেন। হ্রস্ব স্বরযুক্ত ত্রিপুরা চেদিরাজ্যের নামান্তর মাত্র। বৃহন্নারদীয় পুরাণের মতে মহাদেব হ্রস্বস্বর যুক্ত ত্রিপুরাপতিকে জয় করিয়া ত্রিপুরারি আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘস্বর যুক্ত ত্রীপুর তাহার শত্রু ছিল না। এই দীর্ঘস্বর যুক্ত ত্রীপুর কিরাতের রাজ্যই সুহ্ম অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু চেদির "ত্রিপুরা" নাম লোপ হওয়ায় সাধারণতঃ ত্রীপুরাই "ত্রিপুরা" নামে পরিচিত হইয়াছে। অদ্যাপি একটি নদী ও পরিত্যক্তপল্লি সুহ্মা (অপভ্রংশ সুর্মা) আখ্যাদ্বারা আখ্যাত হইয়া থাকে।

সেই পত্রিকার কয়েকখণ্ড রক্ষিত হইয়াছে। আমরা পৌণ্ড্র দেশের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রথমতঃ সেই পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করি; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া অবশেষ মূল ভবিষ্যপুরাণ অনুসন্ধান করি, সৌভাগ্য বশতঃ কলিকাতায় দুইটি প্রধান পুস্তকালয়ে দুইখণ্ড হস্তলিখিত ভবিষ্যপুরাণ প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা একবারে বিস্মিত হইয়াছি। যে গ্রন্থে মুর্শিদাবাদের (মোরসিদাবাদ) উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাকে অবশ্যই ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তি বলিতে হইবে। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে ঐ অব্দে মুরসিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে বাঙ্গালার রাজপাঠ মুকসুদ বা মুকসুস্তাবাদ নামক স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক নূতন রাজধানীকে স্বীয় নামানুসারে মুরশিদ বা মুর্শিদাবাদ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা পামহেইবা বা করিকরিম নওয়াজ (ইংরেজি গরিব নওয়াজ) ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মিতাইলেইপাকের রাজদণ্ড ধারণ করেন, তাহার শাসনকালে মিতাইগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের রাজ্যকে মণিপুর আখ্যা দান করে, ভবিষ্যপুরাণে সেই (জাল) মনিপুরেরও বর্ণনা আছে, অতএব বোধ হইতেছে এই গ্রন্থ মুসলমান রাজত্বের অবসানে কিম্বা ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। আমাদের বোধহয় কর্ণেল উইলফোর্ড যৎকালে ভারতের ভৌগলিক তত্ত্ব বিষয়ী প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তৎকালে কোনও পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করিয়া "প্রাচীন" বলিয়া তাহাকে উপহার অর্পণ করেন। শক্তি সঙ্গমতন্ত্র ভবিষ্যপুরাণ হইতে অনেক প্রাচীন সুতরাং উক্ত তন্ত্রের মতে বাঙ্গালার যে অংশ অঙ্গের অধীন হইয়াছে, ভবিষ্যপুরাণের ন্যায় একখানি অভিনবগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা সেই বঙ্গাংশকে পৌণ্ড্রের অন্তর্গত বলিতে পারি না।

কলিঙ্গ—বাঙ্গালার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত হইতে কৃষ্ণা নদীর তীরপর্য্যন্ত কলিঙ্গ দেশ। তদনুসারে বর্ত্তমান উড়িষ্যা ইহার অন্তর্গত।* বাঙ্গালার সহিত কলিঙ্গের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। কারণ দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, সুহ্ম ও অঙ্গের কিয়দংশ লইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা গঠিত হইয়াছে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সময়ে আর্য্যগণ ভারতের দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ভারতের ভৌগলিকতত্ত্ব মহাভারতে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভারত সভাপর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম †। উদ্ধৃত অংশ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বিজয়ী ভীম মোদাগিরীহইতে পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেবের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। তৎপর কৌশিকীকচ্ছ-পতি বঙ্গেশ্বর সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বট ও সুহ্মাধিপতি এবং সাগরতীরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়া নানাবিধ ধন রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমরা তিনখানা মহাভারতে এইরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় যে মহাভারত অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে এই অংশ দৃষ্ট হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রায়• রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় যে মহাভারত অবলম্বন করিয়া 'রাজসূয়' প্রবন্ধ লিখিয়াছেন * সেই মহাভারতে এইরূপ বর্ণনা নাই, থাকিলে তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। সুতরাং মহাভারতের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। 'বাসুদেব' 'সমুদ্রসেন' ও 'চন্দ্রসেন' প্রভৃতি নামগুলি নিতান্তই কল্পনা-প্রসূত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে

* এস্থলে আমরা শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের সহিত অনৈক্য হইতেছি। উড়িষ্যার ইতিহাস দেখ। (ভারতী পঞ্চমখণ্ড।)

† অথ মোদাগিরী চৈব রাজনং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজধান মহামৃধে॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহীজসম্॥
উভৌ বলবৃতৌ বীরাবুভৌতীব্র পরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানাং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্‌ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥
এবং বহুবিধান্‌ দেশান্‌ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসুতেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্বলী॥
স সর্ব্বান্‌ ম্লেচ্ছনৃপতীন্‌ সাগরানুপবাসিনঃ।
করমাহরয়ামাস রত্নানি বিবিধানিচ।
চন্দনাগুরুবস্ত্রাণি মণিমৌক্তিক কম্বলম্।
কাঞ্চনং রজতঞ্চৈব বিদ্রুমঞ্চ মহাধনম্॥

এডুকেশন কমিটীর মুদ্রিত।
মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৯ অঃ ৩৪৮ পৃষ্ঠা, বর্দ্ধমানাধিপতির মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩১ অঃ ৪৪, ৪৫ পৃষ্ঠা, কেদারনাথ রায়ের মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩১ অঃ ১৪৭ ও ১৪৮ পৃষ্ঠা।

* "Imperial Assemblage held at Dilli three thousand years ago." (J. A. S. B.)

বঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম ব্যতীত আরও কয়েকটি রাজ্যের নাম প্রাপ্ত হইতেছি যথা 'কৌশিকীকচ্ছ' 'তাম্রলিপ্ত' 'ও' কর্ব্বট'। তন্মধ্যে তাম্রলিপ্ত বর্ত্তমান তামলুক নির্ণীত হইয়াছে। কৌশিকীকচ্ছ পৌণ্ড্রের পূর্ব্বদিকে অনুমিত হইতেছে। এই নামে অধুনা বাঙ্গালার কোন অংশেই কোনও নগর কিম্বা প্রদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে প্রাচীন নাম গুলি প্রায়ই বিকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে কালীকচ্ছ নামে একখানি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম আছে। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র ও বড়চক্র কালীকচ্ছের পদতলে সম্মিলিত হইয়া মেঘনাদ আখ্যা ধারণ করিয়াছিল, অধুনা মেঘনাদ কালীকচ্ছ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কালীকচ্ছের প্রাচীন উন্নতির চিহ্ন ভূগর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে, অতএব বোধ হয় প্রাচীন কৌশিকীকচ্ছই অধুনা কালীকচ্ছ নামে পরিচিত হইয়াছে। কর্ব্বটের স্থিতি স্থান নির্ণয় করা কঠিন বোধ হইতেছে। যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় তাম্রলিপ্ত, কৌশিকীকচ্ছ ও কর্ব্বট মহাভারতের পরবর্ত্তি, 'সমুদ্রসেন' ও 'চন্দ্রসেন' এই দুটি নাম দর্শন করিয়া বোধ হয়, সেন রাজগণের তীবোধানান্তে উদ্ধৃত অংশ মহাভারতে সংযুক্ত হইয়াছে।*

বুদ্ধদেব শাক্য সিংহের সময়ে পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এই তিন প্রদেশেরই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রাঢ়দেশ সে সময়ে অনুন্নত বনভূমি।

রঘুকাব্য-প্রণেতা কালিদাসকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন স্বীকার করিয়া থাকি, সে সময়ে বাঙ্গালা জলপ্লাবিত, বঙ্গবাসীগণ তখন অনুন্নত নহেন।

আমাদের মতে মহারাজ অধিরাজ সমুদ্র গুপ্ত শকাব্দের প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার প্রস্তব লিপিতে বঙ্গদেশস্থ সমতট ও ত্রিপুরার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৫০৯ শকাব্দে বরাহ মিহির জীবলীলা সম্বরণ করেন।† সুতরাং শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে বৃহৎ সংহিতা রচিত হইয়াছিল। উক্ত সংহিতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বরাহ মিহির ভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত ভূগোল বিবরণ লিখিয়াছেন। কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে, বরাহ মিহির গার্গি সংহিতা হইতে এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহাহউক বরাহ মিহির ভারতবর্ষ নয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—মধ্য, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, বায়ু, নৈঋত। বরাহ মিহিরের দেশবিভাগ যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তথাপি তিনি পূর্ব‡ও অগ্নিকোণস্থিত দেশ গুলির যে তা-

* বোধ হইতেছে বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণগণ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়াছে। প্রথম সংস্করণ আমাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য।

† হিয়োনসাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ দেখ। (ভারতী, চতুর্থখণ্ড ১২২ ও ১২৩ পৃষ্ঠা।)

‡ মৎসপুরাণে প্রাচ্যদেশের এইরূপ তালিকা দেওয়া হইয়াছে যথা—"অঙ্গ বঙ্গ মদগুরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরী, ততঃ প্রবঙ্গ-

লিকা দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।* ইহাতে বঙ্গদেশস্থ সুহ্ম, কর্ব্বট, খস, সমতট, গৌড়, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, বর্দ্ধমান, বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রদেশ ও কতকগুলি নগর। সুহ্ম, কর্বট, খস, পৌণ্ড্র, বঙ্গ প্রদেশ। সমতট বঙ্গের রাজধানী, গৌর বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান নগরী। রাজস্থানের ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড বলেন, গৌর জাতীয় মানবগণ এই নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং তাহার মতে গৌরগণ একটি পরাক্রান্ত রাজপুত্র জাতি। আমরা পাল নরেন্দ্রদিগের শাসনপত্রে গৌড়জাতির উল্লেখ দর্শন করিতেছি, শাসনপত্রপাঠে ইহাদিগকে নিতান্ত নীচজাতী বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালার গোপগণই গৌড় বংশজাত। † গৌড়জাতীয় মানবগণ কর্ত্তৃক গৌরনগরীর ভিত্তিমূল সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু উত্তরকালে এই নগরে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান রাজপাট স্থাপন করা হইয়াছিল। কোনও কোনও লেখকের মতে গৌড়নগরী তিনসহস্র বৎস-

মাতঙ্গা মলয়া মলবর্ত্তকা। সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়াভার্গবাঙ্গেয়মালবাঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকা। শাল্বা মাগধগোনর্দ্দা প্রাচ্যাজনপদাস্মৃতা।”

* অথ পূর্ব্বস্যামঞ্জন
বৃষভধ্বজ পদ্মমাল্যবদ্গিরয়ঃ।
ব্যাঘ্রমুখ সুহ্মকর্ব্বট
চন্দ্রপুরাঃ শূর্পকর্ণাশ্চ ॥ ৫
খশ মগধ শিবিরগিরি-
মিথিলসমতটোড্রাশ্চবদনদন্তুরকাঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষলৌহিত্য--
ক্ষীরোদসমুদ্রপুরুষাদাঃ ॥ ৬
উদয়গিরিভদ্রগৌড়ক--
পৌণ্ড্রোৎকল কাশিমেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদতাম্রলিপ্তিক--
কোশলকাবর্দ্ধমানশ্চ ॥ ৭
আগ্নেয্যাং দিশিকোশল
কলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গ--জঠরাঙ্গাঃ।
শৌলিক বিদর্ভবৎসান্ধ্র
চেদিকাশ্চোর্দ্ধ্বকণ্ঠাশ্চ ॥ ৮
বৃষনালিকেরচর্ম্মদ্বীপা
বিন্ধ্যান্তবাসিনস্ত্রিপুরী।
শ্মশ্রুধরহেমকূটা—
ব্যালগ্রীবা মহাগ্রীবাঃ ॥ ৯
কিষ্কিন্ধকণ্ঠকস্থল--
নিষাদরাষ্ট্রাণি পুরিকদশার্ণাঃ।
সহনগ্নপর্ণশবরৈ
রাশ্লেষাদ্যে ত্রিকেদেশাঃ ॥ ১০
বৃহৎসংহিতা, ১৪ অধ্যায়।

রাজাবলী লেখক ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পূর্ব্ব ও অগ্নি কোণে যে সকল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

‘পূর্ব্বভাগে মগধ, শোণ, বারেন্দ্র, গৌড়, রাঢ়, বর্দ্ধমান, মনোলিপ্ত, প্রাগজ্যোতিষ, উদয়াদ্রি ইত্যাদি দেশ। অগ্নি কোণে অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, ত্রৈপুর, কোশল, কলিঙ্গ, উৎকল, অন্ধ্র, বিদর্ভ, শবর ইত্যাদি দেশ।

† উড়িষ্যার ইতিহাস দেখ। (ভারতী; ৫ম খণ্ড ৪২৭ পৃষ্ঠা।)

রের প্রাচীন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই উক্তি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। বরাহ মিহিরের গ্রন্থে গৌড় নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর ৪৩ বৎসরের অন্তে জনৈক বৈদেশিক পরিব্রাজক সমগ্র বাঙ্গালা ভ্রমণ করিয়া যে বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে গৌড়নগরীর কোন উল্লেখ নাই।* সুতরাং গৌড় বরাহ মিহিরের পরবর্ত্তি হওয়াবই সম্ভব। ফলতঃ ববাহ মিহিরের গ্রন্থে গৌড় ও বর্দ্ধমানের উল্লেখ কিঞ্চিৎ সন্দেহ জনক।

এক সময় সমগ্র বাঙ্গালা, রাজধানীব নামানুসারে গৌড় দেশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। বোধ হয় বর্ত্তমান 'বাঙ্গালা' শব্দটি সম্পূর্ণভাবে গৌড়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।†

কোন্ প্রদেশকে যে উপবঙ্গ বলা হইত, তাহার কোন নিদর্শন নাই। আমাদের বোধ হয় বঙ্গের পশ্চিমাংশ (অর্থাৎ বাগড়ি) কেই এই সংজ্ঞা দান করা হইয়াছিল।

সমতট ও বঙ্গের স্বতন্ত্র উল্লেখ দর্শন করিয়া কোন পাঠক ইহাকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বিবেচনা করিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে; সমতট যে বঙ্গের রাজধানী ইহা আমরা বিশেষরূপে "হিয়োনসাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ" প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। ‡

দেবীপুরাণোক্ত "দুর্গাপূজা বিধির" "নানা দেশস্থ দেবী পূজা" পরিচ্ছেদে, বারেন্দ্র, সমতট, বর্দ্ধমান, রাঢ়, একচক্র শ্রীহট্ট, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসিনী দেবীগণের স্বতন্ত্র উল্লেখ হইয়াছে, সুতরাং এস্থলেও পূজাবিধিলেখক বরাহমিহিরের ন্যায় "দুবারা" দোষে পতিত হইয়াছেন। ¶

---

* হিয়োনসাঙ বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে Ko-chu-Wen-ti-Lo. বা Ko-cheu-ko-Lo নামে একটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কনিংহাম সাহেব ইহাকেই কচ্ছগৌড় পাঠ করিয়া প্রাচীন গৌড় স্থির করিয়াছেন। কিন্তু গঙ্গার দক্ষিণ তীরে যে কিরূপে গৌড়ের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা স্থির করিতে অক্ষম।

† "গৌড়-বঙ্গ-বিবেচনা" প্রবন্ধে, লেখক বিক্রমপুরকে গৌড়ের অন্তর্গত স্থির করিযা বঙ্গকে গৌড় হইতে পৃথক করিয়াছেন, চমৎকার সিদ্ধান্ত! বিক্রমপুর যে বঙ্গের রাজধানী। সমতট নগরী উত্তরকালে বিক্রমপুর-আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন।

‡ অন্যান্য দেশেরও এরূপ দুই নামে স্বতন্ত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা উড্র ও উৎকল। চেদি ও ত্রিপুরা; বর্দ্ধমান, রাঢ় প্রদেশের অন্তর্গত কিন্তু এস্থলে স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠকগণকে এস্থলে আমরা একটি কথা স্মরণ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি, বরাহমিহিরের মতে বাঙ্গালার নিকটেই পূর্ব্বে ভারতে "অম্বষ্ঠ" নামে এক প্রদেশ ছিল। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে, (২।৩) কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের লেখা দ্বারা এই দেশ কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় হয় না।

¶ "বারেন্দ্রে চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ, সমতটে

তৎপর আমরা শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপনীত হইতেছি, এই সময়ের ভৌগলিকতত্ব সম্বন্ধে হিয়োনসাঙের গ্রন্থ আমাদের প্রধান অবলম্বন। আমরা "হিয়োনসাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। সেই প্রবন্ধে হিয়োনসাঙের সময়ের বঙ্গভূগোল ও ইতিহাস বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে সুতরাং এস্থলে আমরা সংক্ষেপে সেই সকলের পুনরুল্লেখ করিব।

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ ৫৬০ শকাব্দে মুদ্গগিরি দর্শন করিয়া অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা নগরে উপনীত হন। চম্পা হইতে কিঞ্চিদধিক ৬৭মাইল পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া "কচ্ছবেনতিলো" বা "কচ্ছকোল" নগরী প্রাপ্ত হন। এই স্থানটি আধুনিক কহঁলগাওঁ বা রাজমহলের নিকটবর্ত্তী। পরিব্রাজক এই রাজ্যের পরিধি ৩৩৩ মাইল লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান সাওঁতাল পরগণা ও রাঢ়ের কিয়দংশ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেই স্থানে গঙ্গা পার হইয়া পরিব্রাজক পূর্ব্বদিকে ১০০ মাইল গমন করিয়া "পোন্নাফাটানা" অর্থাৎ পৌণ্ড্রের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাপ্ত হন। আমরা ইতিপূর্ব্বে গোবিন্দগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বর্দ্ধনকোটকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নির্ণয় করিয়াছি। যশস্বী পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর, ও বিজ্ঞবর ওয়েষ্ট মেকৃট সাহেব আমাদের মত সমর্থন করিয়াছেন। * পরি-

অজিতায়ৈ নমঃ * * রাঢ়ায়াং কালিকায়ৈঃ নমঃ, একচক্রে চক্রবর্ত্ত্যৈ নমঃ, শ্রীহট্টে বরবাসিন্যৈ নমঃ * * বঙ্গে বঙ্গবাসিন্যৈ নমঃ * * পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে কোটেশ্চর্য্যৈ নমঃ।"

* See J. A. S. B. Vol. XLVII. part I pp 395. 396 and Vol. XLIV. pp 7.8, 188.

এস্থলে আমরা সুবিজ্ঞ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একটুকু তর্ক না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। বাঙ্গলায় এরূপ কতকগুলি লেখক আছে যে তাঁহাদের কোন দোষ দেখাইয়া দিলে তাঁহারা প্রতিবাদকারীর ঊর্দ্ধে ও অধে চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রতি নানা প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে বিরত হন না। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমাদের এতদূর ভক্তি ও বিশ্বাস আছে যে,তাহার কোন ভ্রম দেখাইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

বঙ্কিম বাবু বলেন "খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্থসাঙ নামক চীনপরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুণ্ড্রদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কনিংহাম সাহেব ঐ চীনপরিব্রাজকের লিখিত দিক ও দূরতা লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায় ছিল তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বলিলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত।"

(বাঙ্গালার উৎপত্তি)

ব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কামরূপে গমন করেন। কামরূপ হইতে ১১০০—১২০০ লি (২০০—২৬০ মাইল) দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী বঙ্গের রাজধানী সমতটে উপনীত হন। সেনরাজগণ সমতটকে বিক্রমপুর আখ্যা দান করেন। সেনবংশের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইলে বিক্রমপুর "রাজপুর" নামে খ্যাত হইয়াছিল। অধুনা সেনরাজগণের শ্মশানক্ষেত্র "রামপাল" নামে পরিচিত। হিয়োনসাঙের সময়ে মেঘনাদ নদ রামপালের নিকটেই বোধ হয় সাগরের দর্শন পাইয়াছিলেন। সে সময় বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যসাগরশাখা বি-

---

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংস্থান সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু ১২৮০ বঙ্গাব্দে এরূপই লিখিয়াছিলেন, আমরা "হিয়োনসাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ" সম্বন্ধে সেই বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে বঙ্কিম বাবুর পূর্ব্বলিখিত বাক্য ও আমাদের প্রতিবাদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

—বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকারাভিধান প্রবন্ধলেখক বলেন "এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায় তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে অংশ মধ্যে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাঁহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইলসনকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ত্ব বিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। * * চীনপরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র দেশে আসিয়াছিলেন। * * জেনেরল কনিংহাম বলেন, যে আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বোধ হয় মালদহের অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ডুয়া যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে।"

* * উক্ত প্রবন্ধলেখকের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমরা বলিতেছি, তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজমহল, কহলগাও কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ৬০০ লি (১০০—১২০ মাইল) গমন করিলে কি পাণ্ডুয়ায় উপস্থিত হইতে হয়? কখনই নহে। রাজমহলের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীর হইতে ১০০ কিম্বা ১২০ মাইল গমন করিলে দিনাজপুর, রঙ্গপুরের দক্ষিণ ও বগুড়ার উত্তর প্রান্তে উপনীত হইতে হয়।

From Kankjol the pilgrim crossed the Ganges and travelling for 600 li or 100 miles he reached the Kingdom of Puvnafatanna.

(Cunningham's Ancient Geography of India. page 480)

After crossing the river, the Chinaman went 600 li or from 100 to 120 miles eastward and found himself in the kingdom of Pundra Vardhan.

(Westmacott's note on Tarpon Dighee copper plate.)

স্তৃত ছিল। হিয়োনসাঙের অন্যূন এক শতাব্দী পরে যখন শ্রীহর্ষ, আদিশূরের রাজবাটিতে উপস্থিত হন তখনও তিনি রাজধানীর নিকটেই সমুদ্রসন্দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই "অর্ণববর্ণনা" লিখিতেন না।

হিয়োনসাঙ সমতট অর্থাৎ বঙ্গরাজ্যের পরিধি ৩০০০ লি (৫০০—৬০০ মাইল) লিখিয়াছেন। আমাদের মতে আধুনিক নদীয়া, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, সুন্দরবন, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ঢাকার কিয়দংশ লইয়া সমতট রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

সমতটের পূর্ব্বদিকে হিয়োনসাং "শিলিচটলো" ও "কমলাঙ্ক" রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শিলিচটলোকে শ্রীহট্ট কিম্বা কাছাড়ের রাজধানী শিলাচল নির্ণয় করিতে হইবে। কমলাঙ্ক যে সুহ্ম বা ত্রিপুরার রাজধানী তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

সমতট হইতে ১৫০ মাইল (৯০০ লি) গমন করিয়া পরিব্রাজক তাম্রলিপ্ত উপনীত হন। হিয়োনসাং এই রাজ্যের পরিধি ২৫০—৩০০ মাইল বলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত হইতে (৭০০ লি) ১১৭—১৪০ মাইল গমন করিয়া কিরণসুবর্ণ নগরী প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত রাজ্যের পরিধি পরিব্রাজক ৮০০—৯০০ মাইল (৪০০০—৪৫০০ লি) লিখিয়াছেন। বোধ হয় রাঢ় প্রদেশের মধ্যভাগ ও চুটিয়া নাগপুর প্রদেশ লইয়া কিরণসুবর্ণ রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। হিয়োনসাঙের সময়ে রাঢ়ের উত্তরাংশ "কচ্ছকোল" মধ্যাংশ কিরণসুবর্ণ ও দক্ষিণাংশ তাম্রলিপ্তের অধীন ছিল। সুতরাং আমরা বলিতে পারি হিয়োনসাঙ লিখিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, শিলিচটল, কমলাঙ্ক, সমতট, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি রাজ্যগুলির সমুদয় ও কচ্ছকোল ও কিরণসুবর্ণের কিয়দংশ লইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গলা গঠিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী—সিংহ।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবি-সম্প্রদায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গোপাল দাস। গোপাল দাস অনেক সংস্কৃত কবিতার বাঙ্গলা পদ্যে অর্থ করিয়াছেন; বিশেষতঃ "রসমঞ্জরী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক সকল এক একটি পদ্যে অনুবাদ করেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত কতকগুলি পদাবলীও দেখিতে পাওয়া যায়; সে গুলি নিতান্ত মন্দ নহে; মধ্যে মধ্যে দুই একটি পদ অতীব রমণীয়; আমরা এই স্থলে তাঁহার রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

চিকুর ফুলিতে, বসন খসিছে,
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার॥
সজনি মাধব মিলব তোয়।
সব সুলক্ষণ, পায়ল অখিল,
স্বরূপ কহলমু তোয়॥
দেখিনু স্বপনে, চারু চন্দন,
গিরির উপরে বসি।
মালতীর মালা, দধির জালি,
মাধব মিলব আসি॥
প্রভাত সময়ে, কাক কলকলি,
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধুয়া আসিব, নাম সুধাইতে,
উড়িয়া বৈঠনি চায়॥
হাতের বসন, খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথের ফুল।
গোপাল দাস কহে, সব সুলক্ষণ,
বিধি ভেল অনুকূল॥

বংশীদাস। বংশীদাস "দীপান্বিতা" প্রভৃতি অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু তৎসকলের রচনা বেশ প্রীতিকর নহে; তবে নিতান্ত মন্দও বলিতে পারিনা; বংশীদাসের প্রধান দোষ তিনি অন্যান্য কবি অপেক্ষা অধিক অশ্লীলতাপ্রিয়; তাহার অধিকাংশ কবিতাই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট; যাহা হউক আমরা তাঁহার দীপান্বিতা হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম;—

কি মধুর মুরতি মদন মনোলোভা।
দুঁহু বেড়ি চৌদিকে রতন দীপ শোভা॥
অনল আলয়ে অঙ্গ করে ঝলমল।
পীত অরুণ বাস তাহে ঢল ঢল॥
বেশের উপরে বেশ ভূষণে ভূষণ।
জলদ চান্দরু চাঁন্দে কাঁদয়ে মদন॥
বিবিধ বরণে মালা সাজে নানা ফুল।
ত্রিভুবনে নাহি হেন আনি দিব তুল॥
আজু দুঁহুক নিশি শশী কোথা আর।
উদয় অনন্ত বিধু বদনে দুঁহার॥

চন্দ্রিক রঞ্জিত বন বিচিত্র বিলাস।
দেখিয়া আনন্দে বংশীদাসের বিলাস ॥

লোচন দাস। আমরা লোচন দাস কৃত কতক গুলি পদ পাইয়াছি; এবং লোচন দাস কৃত "চৈতন্য মঙ্গল" ও প্রসিদ্ধ। পদকর্ত্তা লোচন ও মঙ্গলরচয়িতা লোচন অভিন্ন ব্যক্তি কি না তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি নাই; যাহা হউক এই স্থলে লোচন দাস প্রণীত একটি পদ প্রদান করিলাম;—

আজুকার স্বপনে, ননদীর সনে,
শুতিয়া আছিনু সই।
কি ছিল করমে, বন্ধুর ভবনে,
জানিনা কিছুই সই ॥
শয়ন আবেশে, রতির ধাঁদসে,
আবেশে করিনু কোরে।
তখনি উঠিয়া, বলিছে রুধিয়া,
বঁধুয়া পাইলি কারে ॥
এত ধূর্ত্তপনা, করে কোন জনা,
বুঝিনু তোমার রীতি।
কুলবতি হয়ে, পরপতি লয়ে,
এমতি করহ নিতি ॥
লোকের বদনে, যে গুলি শ্রবণে,
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা আসুক ঘরে, গোচর করিব,
খনিক ধীরহ রাই ॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণে,
মরিয়া আছিনু লাজে।
ফিরায়ে আঁখি, গরবা থাকি,
সঘনে আমারে ত্যজে ॥
এক হাতে সখি, কচালিয়া আঁখি,
সপনে দেখিনু আর।
লোচন বলয়ে, কানুর পিরীতি,
কিসের অভাব তার ॥

নয়নানন্দ দাস। নয়নানন্দ-ভণিতা যুক্ত কতক গুলি গীতি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তৎসকলগুলিই প্রায় গৌরাঙ্গের লীলা বিষয়ক; ইনি চৈতন্য দেবের অনেক পরবর্ত্তী কবি ছিলেন; আমরা এই স্থলে তাঁহার রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

জয় জয় গোরা, শ্রী শচিনন্দন,
কীর্ত্তন নটন সুঠান।
কীর্ত্তন আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে,
মুকুন্দ বাসু গুণ গাণ ॥
কেহ দেই গোরা অঙ্গে, অগৌর চন্দন,
সুগন্ধি করবীর মাল।
মৃদঙ্গ করতাল, ঘণ্টা রবতাল,
রাজত পদতলে তাল ॥
কেহ বলে গোরা, জানকীর বল্লভ,
রাধার প্রিয় পঞ্চবান।
নয়নানন্দের মনে, আন নাহিক জানে,
আমার গদাধরের প্রাণ ॥

বাসুদেব দাস। বাসুদেব ঘোষ ও বাসুদেব দাস এক ব্যক্তি কি না তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; আমরা কতকগুলি গীতে বাসুদেব ঘোষ ও অপর কতকগুলিতে বাসুদেব দাস এইরূপ ভণিতা দেখিয়াছি। এই উভয়েই গৌরাঙ্গ অবতারের লীলা বর্ণন করিয়াছেন এবং রচনা প্রায় উভয় ভণিতাযুক্ত কবিতায় এক প্রকার; সুতরাং এই সমুদয় পদ একজনের রচনা হওয়াও অসম্ভব নহে। বাসুদেব

ঘোষ কায়স্থ ছিলেন ; বাসুদেব দাস কায়স্থ ও বৈষ্ণব উভয়েরই নাম হইতে পারে। দাস শব্দটি যেরূপ বৈষ্ণবগণের, কায়স্থগণেরও সেইরূপ উপাধি। কাশীরাম দেব মহাভারতের সকল স্থানেই 'কাশীরাম দাস' বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন ; কিন্তু তিনি কায়স্থছিলেন। যাহাহউক এই দুইজন যদি পৃথক ব্যক্তি হন সেইজন্য আমরা এস্থলে 'বাসুদেব দাস' ভণিতাযুক্ত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম ;

আজিকার স্বপনের কথা,
শুনগো মালিনী সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়ায়ে,
গৃহপানে চেয়ে চেয়ে,
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥
ঘরেতে শুতিয়াছিলাম,
অচেতনে বাহির হলাম,
নিমাইর গলার সাড়া পেয়ে।
আমার চরণ ধূলি,
নিল নিমাই শিরে তুলি,
পুনঃ কাঁদে গলায় ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বশে,
ফিরি আমি দেশে দেশে,
রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে,
আইনু নদীয়া পুরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি,
হিয়ার মাঝারে তুলি,
হেনকালে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে,
পরাণ কেমন করে,
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হ'তে প্রাণ কাঁদে,
হিয়া থির নাহি বাঁধে,
কি করিব কহনা উপায়।
বাসুদেব দাসে কয়,
গৌরাঙ্গ তোমারই হয়,
নহিলে কি সদা দেখ তায়॥

প্রেমদাস। প্রেমদাস আর একজন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কবি ; কিন্তু ইনি অন্যান্য কবিগণের ন্যায় অপরিচিত নহেন। অনেকেই প্রেমদাসের নাম অবগত আছেন ও তাঁহার প্রণীত পদও অনেকের পরিচিত। ইনি অধিকাংশ গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন ; আমরা এইস্থলে তাঁহার রচিত একটি পদ প্রদান করিলাম ;—

ভাবে গদগদ বুক,   গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ,
ভাবিতে শুইলা শচি মায়।
কনক কষিত জনু,   গৌর সুন্দর তনু,
আচম্বিতে দরশন পায়॥
মায়েরে দেখিয়ে গোরা, অরুণ নয়নে ধারা
চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠে মায়, ধেয়ে কোলে করে তায়
ঝর ঝর নয়নের নীরে॥
দুঁহু প্রেমে দুঁহু কাঁদে, দুঁহু থির নাহি বাঁধে,
কহে মাতা গদ গদ ভাষে॥
আকুল করিয়া মোরে, ছাড়ি গেলা দেশান্তরে,
প্রাণ হীন তোমার হুতাশে॥
যে হউ যে হউ বাছা, আর না যাইও কোথা
ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন।

শ্রীবাসাদি সহচর, পরম বৈষ্ণব বর,
কি ধরম সন্ন্যাস করণ ॥
এতেক কহিতে কথা, জাগিলেন শচিমাতা,
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কাঁদিয়া উঠে, ধারাবহে দুঁহু দিঠে,
প্রেমদাস মরিয়া না যায় ॥

বলরাম দাস। বলরাম দাস নিতান্ত সামান্য কবি ছিলেন না; তাঁহার রচিত অনেক সুমধুর পদাবলী দেখিতে পওয়া যায়। বলরামের রচনা অন্যান্য অনেক বৈষ্ণবগণের ন্যায় অশ্লীলতা দুষ্ট হইলেও তাহাতে ইন্দ্রিয় লালসার কোন কথা নাই; তাঁহার কবিতা নিচয় যেন একজন যথার্থ ভাবুক কবির অন্তঃস্থল হইতে অনর্গল নিঃসৃত হইয়াছে। যাহাহউক আমরা এই স্থানে বলরাম দাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

শুনইতে আনলি, আনহি শুনত,
বুঝাইতে বুঝাই আন।
পুছইতে গদ গদ, উতর নাহিক মোই,
কহইতে সজল নয়ান ॥
সখিহে কি ভেল এ বর নারী।
কবহুঁ কপোল, থকিত বহুঁ ঝামরি,
জনুধন হারি জুয়ারী ॥ ধ্রু ॥
বিছুরল হাস, রভস রস চাতুরী;
বাউরি জন ভেল গোরি।
ক্ষণে ক্ষণে দীঘ, নিশসিত তনু,
মোড়াই সঘন রভস ভোরি ॥
কাতর কাতর, নয়নে নেহারই,
কাতর কাতর বাণী।
না জানি সে কোন, দুঃখ দারুণ বেদন,
ঝর ঝর এ দুই নয়ানী ॥
ঘন ঘন নয়ানে, নীর ভরি আওত,
ঘন ঘন অধর হি কাঁপ।
বলরাম দাস কহে, জানলু জগমাহ,
প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥

যদুনন্দন দাস। ইনি নিতান্ত অপরিচিত কবি নহেন; অনেকে ইহার নাম অবগত আছেন ও তাঁহার রচিত অন্তত দুই একটি পদ পাঠ করিয়াছেন। যদুনন্দনের রচনা নিতান্ত মন্দ নহে। তবে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, বা জ্ঞানদাসের তুলনায় তাঁহার রচনা সামান্যতঃ নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। যাহাহউক ইহার রচনা বেশ প্রীতিপদ; আমরা এই স্থলে যদুনন্দন প্রণীত একটি পদ প্রদান করিলাম;—

কি দেখিনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তাঁর আঁখির ঠারে ॥
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখিনাই
কি খেনে দেখিনু আজ তারে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশাইল কুলবতী,
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে ॥
কামের কামান জিনি, ভুরুর ভঙ্গিমা গো,
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়া নয়ান বাণ, মরমে হানিল গো,
কালাময় আমি সব দেখি ॥
চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গারিয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া ॥

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈ—

ওলাউঠা কি কি কারণে হয় ?

যে যে পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাদের নাম।

1. Registrar General's Report on Cholera in England 1848 - 9.
2. "Cholera in its Home" by Dr. John Macpherson.
3. "Influence of Tropical climates in producing the Acute Endemic Diseases of Europeans" by Sir Ranald Martin.
4. "On the Theory and Practice of Midwifery" by Dr. Fleetwood Churchill.

5. "Cholera, its Causes, Prevention, Non-contagiousness, and Treatment" by M. J. Maccormack. M. B.

6. "De la Foudre, de ses formes, et de ses effets sur l'homme, les animaux, les vegetaux, et les corps bruts, des moyens de s'en preserver, et des paratonnerres" Par le Docteur F. Sestier.

7. Reynold's System of Medicine.

8. "The Organic Impurities of Water" by W. Proctor, M. D.

9. "Remarks on the Nature and Treatment of Cholera" by R. B. Painter, M. D.

10. Aitken's Science & Practice of Medicine.

11. "Lectures on the Theory and Practice of Physic" by Dr. Bell & Stokes. Philadelphia.

12. "A Treatise on the Practice of Medicine" by George B. Wood M. D.

13. "Remarks on the Pathology of Cholera" by G. H. Barlow, M. D.

14. Watson's Lectures on the Principles & Practice of Physic.

15. "Researches into the Pathology and Treatment of Asiatic or Algide cholera." by Professor Parkes, M. D.

Etc Etc

ওলাউঠার কারণ বহুতর, এবং তাহাদের কার্য্য অনেক সময়ে যুগপৎ ও মিশ্রভাবে হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণকে তিনটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, তদ্যথা ;—

প্রথম। ব্যাপক (Epidemic) কারণ, যথা, সৌরউত্তাপ ; শীতোষ্ণতার অতিমাত্র বিভিন্নতা ; বায়ুমণ্ডলস্থিত তাড়িত ; ওজোন (Ozone) বা ঘ্রাণকের অভাব ; বিষবায়ু (Malaria)

দ্বিতীয়। ভৌম (Telluric) কারণ, যথা, অনূপদেশ বা নিম্নভূমি।

তৃতীয়। দৈশিক (Endemic) কারণ, যথা, তীর্থাদি উপলক্ষে দূর যাত্রা ; দু-

র্গন্ধ উদ্বাষ্প (Effluvia); অপরিষ্কার জল; অপকৃষ্ট খাদ্য ও অতিভোজন; দন্তোদ্গম জন্য উপদাহ; বিরেচক ঔষধ; সুরা; স্নায়বোত্তেজক অর্থাৎ বায়ুবৃদ্ধিকারক; মানসিক আবেগ; রাত্রিগত কাল-প্রভাব বিশেষ; এক ব্যক্তির এবং এক জাতির বারম্বার আক্রান্ত হইবার প্রবণতা।

সৌর উত্তাপ। ওলাউঠার উৎপাদন সম্বন্ধে সূর্য্যোত্তাপের যে বিশিষ্টরূপ প্রভাব আছে ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। সমশীতোষ্ণ দেশে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই ছয় মাসেই ওলাউঠা বেশি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে, বৎসরের সকল সময়েই ওলাউঠা হইতে দেখা যায়। যে সময়ে সূর্য্যোত্তাপ খুব বেশি হয়, তাহার প্রায় কয়েক সপ্তাহ পরে বায়ুমণ্ডলে ঐ উত্তাপাধিক্যের প্রভাব ফলবান হইয়া থাকে, যে সকল ব্যাধির শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে অতিরিক্ত উষ্ণতা আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহারা প্রায় উত্তাপাধিক্য হওয়ার কিছুকাল পরে প্রভাব প্রকাশ করে।

শীতোষ্ণতার অতিমাত্র বিভিন্নতা। যদিচ ওলাউঠার উৎপাদন পক্ষে উষ্ণতাধিক্যের প্রয়োজন হয়, পরন্তু এই উত্তাপ বাহুল্যের সহিত যখন প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উষ্ণতার চূড়ান্ত পরিমাণ ও শৈত্যের চূড়ান্ত পরিমাণ এই দুএর মধ্যে অত্যন্ত বেশি তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময়েই এই রোগের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ডাক্তার জন মেক্‌ফার্সন তাঁহার প্রণীত পুস্তকে * একটি লতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতা সহরে ২৬ বৎসরে ওলাউঠায় যত রোগী মরিয়াছে, এবং ২৯ বৎসরে বসন্তে যত রোগী মরিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা দিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেটি দিলাম। তাহাতে প্রতীতি হইবে উত্তাপাধিক্যের সহিত শীতোষ্ণতার অতিমাত্র বিভিন্নতা সংযুক্ত হইলে ওলাউঠার কেমন প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া থাকে।

* Cholera in its home.

	ওলাউঠা	বসন্ত	বৃষ্টিপাত ইঞ্চি—	উষ্ণতা ডিগ্রি—	শীতোষ্ণতান্তর ডিগ্রি—	বায়ুপ্রবাহ
জানুয়ারি	৭১৫০	১৪২৫	০.২১	৬৩.৫.	১৭.৯.	উ, উ পূ, উ. প।
ফেব্রুয়ারি	৯৩৪৬	২৮১৫	০.৪২	৭৪.২	১৭.৩	উ, উ, পূ, উ প।
মার্চ্চ	১৪৭১০	৪৯৭৪	১.১৩	৮২.৯	১৬.৩	প, দ. প, দ।
এপ্রিল	১৯৩৮২	৪২৪৯	২.৪	৮৬.৬	১৪.৭	দ, প দ. প।
মে	১৩৭৩৫	২২৬১	৪.২৯	৮৯	১০.১	দ, দ. প।
জুন	৬৩২৫	১০৫৪	১০.১	৮৬.২	৯	দ, দ. প।
জুলাই	৩৯৭৯	৫৫৫	১৩.৯	৮৪.১	৬.৪	দ, দ. পূ, দ প।
আগষ্ট	৩৪৪০	২২৩	১৪.৪	৮২.৬	৫.২	দ, দ. পূ, দ. প।
সেপ্টেম্বর	৩৯৩৫	১৮৮	১০.৪	৮৩.৮	৬.৪	দ, দ প, প, উ প
অক্টোবর	৬২১১	১৪৭	৪.৭২	৮১.১	৮.৮	প, পূ, দ, উ প।
নবেম্বর	৮৩২৩	১৩২	.৯০	৭৫.৪	১৪.২	উ, উ পূ, উ প।
ডিসেম্বর	৮১৫৯	৫৭৬	.১৩	৬৬.৯	১৬.৪	উ, উ. পূ, উ প।

বায়ুমণ্ডলের শুষ্ক ও স্বচ্ছভাব ওলাউঠার বিকাশের অনুকূল। কিন্তু ইহাও অতিশয় শীতোষ্ণতান্তরের সহবর্ত্তী অবস্থা মাত্র। মেঘাচ্ছন্ন দিনে দিবাভাগ ঠাণ্ডা থাকে, এবং রাত্রিভাগ অপেক্ষাকৃত গরম থাকে। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া আমাদের এই বঙ্গ দেশে বর্ষা কএক মাসে, উত্তাপমান যদিচ গড়ে ৮৩ অংশ থাকে, তথাপি ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা কম হইয়া থাকে। উপরের লতায় দৃষ্ট হইবে যদিও মার্চ্চ, এপ্রিল ও মে মাসে ওলাউঠার মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি হইয়াছে, তথাপি উষ্ণতার পরিমাণের কেবল ৩° মাত্র বৃদ্ধি দেখা যায়। আরও দৃষ্ট হইবে ঃ

শুষ্ক সময়ের সাতমাসে···৮০৪০৫·মৃত্যুসংখ্যা
বর্ষা সময়ের পাঁচমাসে···২৩৮৯০ "

অপিচ,—

		মৃত্যু	গড় উষ্ণতা ডিগ্রি	শীতোষ্ণতান্তর ডিগ্রী	বৃষ্টিপাত ইঞ্চি
গ্রীষ্ম—মার্চ্চ, এপ্রিল, মে		৪৭৯২৯	৮৬.১৬	১৪.৭	২.৬৮
বর্ষা—জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর		১১৩৫৪	৮৩.৫	৬.০৬	১২.৯
শীত—নবেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী		২৩৬৩২	৬৮.৬৩	১৬.১	.৪১৩
পরিবর্ত্তনকাল—ফিব্রুয়ারী, জুন, অক্টোবর		২১৮৮২	৮০.৫	১৬.৭	৫.০৮
পরিবর্ত্তন মাসের প্রত্যেকের ফল।	ফিব্রুয়ারি	৯৩৪৬	৭৪.২	১৭.৩	.৪২
	জুন	৬৩২৫	৮৬.২	৯.	১০.১
	অক্টোবর	৬২১১	৮১.১	৮.৮	৪.৭১

গ্রীষ্ম ও শুষ্ক তিন মাসে ··· ৪৭৪২৭ মৃত্যু।
শীত ও গ্রীষ্ম তিন মাসে··· ২৩৬৩২ ''
গ্রীষ্ম ও বর্ষা তিন মাসে··· ১১৩৫৪ ''
পরিবর্ত্তকাল তিন মাসে ··· ২১৮৮২ ''

এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, "শুষ্কবায়ু, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও শীতোষ্ণতার অতিমাত্র অন্তর, ওলাউঠার উৎপাদন পক্ষে অনুকূল অবস্থা ; আর আর্দ্র বায়ু, প্রচণ্ড উত্তাপ, শীতোষ্ণতার অল্পমাত্র অন্তর, তৎপক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল।'' কিন্তু শীতোষ্ণতার অন্তরের সহিত যত, বায়ুর শুষ্কতা বা আর্দ্রতার সহিত ওলাউঠার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ তত নয়। ১৮৬১ সালের কলেরা কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ আছে যে, "উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যদিও মধ্যে মধ্যে শুষ্ক গ্রীষ্ম সময়ে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ মারক বর্ষার সময়েই হইয়াছে। শীতোষ্ণতার অতিমাত্র তফাতের দ্বারা যে উদর-পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তাহার প্রমাণ স্থলে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। সমতল হইতে দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিলে অনেক সময়ে উদরাময় হইতে দেখা যায়। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কখন কখন অত্যন্ত শীতাধিক্যের সময়েও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮৬৬ সালে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গে প্রচণ্ড শীতের সময়ে একবার মারক উপস্থিত হইয়া-

ছিল। কিন্তু তাহাতে মৃত্যু সংখ্যা বেশি হয় নাই। ১১ হাজারেরও অধিক লোকে আক্রান্ত হয়, ২৭০০ আন্দাজ মরে।

বায়ুমণ্ডলস্থিত তাড়িত। স্নায়বী দ্রব যে বিশ্বব্যাপী তাড়িতের রূপান্তর মাত্র, ইহা প্রায় দেহতত্ত্ববিৎ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ওলাউঠাকে যদি স্নায়ুমণ্ডলের ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাড়িতের পরিবর্ত্তন বিশেষের দ্বারা যে উহার উৎপত্তির আনুকূল্য হইবে তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। অপিচ উত্তাপের সহিত যে তাড়িতের সম্বন্ধ আছে, তাহার নিদর্শন দেখ, গ্রীষ্মকালে যে দিন বড় গরম হয়, সে দিন প্রায়ই দিবা শেষে মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রপাত হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডলীর ব্যাধির সহিত যে বায়ুমণ্ডলস্থিত তাড়িতের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব, তৎপ্রতিপাদনার্থ ডাক্তার চর্চহিল্ তৎপ্রণীত ধাত্রী বিদ্যা বিষয়ক পুস্তকে প্রসবান্তিক আক্ষেপ রোগ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার মর্ম্মোল্লেখ করিতেছি। তিনি অনেক বার গ্রীষ্মের সময়ে এবং যৎকালে মেঘ সকল বৈদ্যুতিক দ্রবে পূর্ণ আছে, আকাশের ভাব দেখিলে বৃষ্টি বজ্রাঘাত হইবে কি এই কতক্ষণ হইয়া গিয়াছে, বলিয়া বোধ হইয়াছে, এই রকম সময়ে এই রোগ অনেকগুলি হইতে দেখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অনেক চিকিৎসকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে যখন হয় তখন একবারে কতকগুলি প্রসবান্তিক আক্ষেপের কেস (case) হইয়া থাকে, যেন কোন বিশেষ বহুব্যাপি কারণের উপর তাহার উৎপত্তি নির্ভর করে।

ফরাসি বিদ্রোহের পর যৎকালে পারিস্ নগরের সমস্ত হাঁসপাতাল আহত ব্যক্তিতে ভরা ছিল, সেই সময়ে এক দিন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত হয়। সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সকল হাঁসপাতালেই মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্বের ও পরের সকল দিন অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়াছিল।

অপিচ, বিদ্যুদাহত ব্যক্তিদিগেতে ওলাউঠার প্রায় প্রত্যেক লক্ষণই উপস্থিত হইয়া থাকে। ভ্রমি, মূর্চ্ছা, কর্ণনাদ, বধিরতা, খল্লা, আক্ষেপ—স্থায়ী ও পৌনঃপুনিক, উভয়বিধ—এসমস্তই দৃষ্ট হয়। শ্বাসকৃচ্ছ, হৃদপ্রদেশের নিষ্পীড়ন, উদ্ধোদরে নিষ্পীড়ক ব্যথা, এগুলিও নিতান্ত বিরল নহে। স্বর ক্ষীণ বা লুপ্ত হয় এবং গিলন কৃচ্ছ্র হয়—ওলাউঠায় শেষোক্ত লক্ষণও কখন কখন উপস্থিত হইয়া থাকে। বমন সচরাচরই হইয়া থাকে, এবং বান্ত বস্তুর সহ আম থাকে। উদরাধ্মান, অন্ত্রসমূহের কৃমিবৎ সঞ্চরণ, ও আক্ষেপিক সঙ্কোচনের ন্যায় সঞ্চরণ, এগুলি হামেসাই দৃষ্টিপথে পড়ে। তদ্ভিন্ন বায়বীয় তাড়িতে যতগুলি লক্ষণ উৎপন্ন করে, তন্মধ্যে অতিসারই অধিক স্থলে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কারম্যান কতকগুলি পক্ষিশরীরে তাড়িত প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহারা সর্ব্বাগ্রেই মলত্যাগ করে, এবং অধিকক্ষণ বিদ্যুৎ প্রয়োগ করিতে থাকিলে বাহ্যে, প্রথমতঃ যদিচ সাধারণ মলের ন্যায় হইয়াছিল, ক্রমে সেই উত্তরোত্তর তরল হইয়া পরিশেষে

জলবৎ হয়। মূত্রাঘাত সচরাচরই হইয়া থাকে।

"আঘাত মাত্রে বিদ্যুদাহত ব্যক্তির সম্পূর্ণ হিমাঙ্গাবস্থা উৎপন্ন হয়, এবং এই অবস্থা বহুক্ষণ যাবৎ স্থায়ী হইতে পারে; নাড়ী কখন ক্ষীণা, কখনও অননুভাব্যা; ক্বচিৎ কোমলা ও সহজে দমনীয়া; কখনো বা এই সকল লক্ষণযুক্ত থাকে এবং দ্রুতা হয়; পরন্তু অধিকাংশ স্থলে বিলক্ষণ মন্দাই দৃষ্ট হয়। কখন কখন স্বল্পা মধ্যালোপিনী, এবং বিক্ষিপ্ত (Convulsive) তৎসঙ্গে শরীর শীতল—তুষারবৎ—বিশেষতঃ হস্তপাদ; এবং ঘর্ম্ম থাকিলে উহা শীতল ও পিচ্ছিল।

"কতকটা সময়—প্রায়ই কএক ঘণ্টা পরে এই অবসাদনাবস্থা গিয়া প্রতিক্রিয়াবস্থা উপস্থিত হয়। এই প্রতিক্রিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রবলা ও স্থায়ী হইয়া থাকে। তখন নাড়ী দ্রুতগতি, সম্পূর্ণা ও কঠিনা হয়; কায়োত্তাপ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে অবশেষে অগ্নিবৎ হয়; এবং কখনও কখনও রোগী প্রচুর স্বেদে স্নাত হইয়া উঠে। এই জ্বর সত্বরই উপশমিত হইয়া নিদ্রাবেশ হয়। কিন্তু স্থল বিশেষে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রবল হইয়াও উঠে ও তৎসঙ্গে উপসর্গান্তরের যোজনা হয়।"

ডাক্তর ম্যাকফার্সন তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "১৮৬৬ সালে যৎকালে সেণ্ট পিটর্সবর্গে ওলাউঠা মারক উপস্থিত হইয়াছিল তখন কম্পাসের কাঁটা নৈসর্গিক আকর্ষণের অনুগামী হইত না, এবং যে চুম্বকে প্রত্যেক বর্ষ ইঞ্চে পঁচাত্তর পৌণ্ড ভার ধারণ করার কথা, তাহার শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে শেষ রোগের যখন বড় প্রাদুর্ভাব তখন উহার পনর পৌণ্ড মাত্র ধারণের শক্তি ছিল। আবার রোগ যেমন কমিতে লাগিল, উহার শক্তিও তেমন বাড়িতে লাগিল, অবশেষে উহার পূর্ব্ব শক্তি পুনরায় প্রত্যাগত হইল। ১৮৪৯ সালে আয়র্লণ্ডে যে মারক হয় তাহাতেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। অপিচ অনেক সময়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত হইয়া গেলে তারি পরে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে, ইহা অনেকেই বোধ করি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষে এরূপ ঘটনা হামেসাই হয়, এবং এমন সময়েও হয় যখন ওলাউঠা ব্যাপকাকারে বিস্তৃত নহে।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ল্যান্সেট পত্রে ডাক্তর জে, সি, এটকিনসন একবার লিখিয়াছিলেন যে, ওলাউঠা রোগীর হিমাঙ্গাবস্থায় অধিকক্ষণ যাবৎ কম্বল জড়াইয়া রাখিয়া, তাহার পরে অন্ধকারে তাহার শরীর স্পর্শ করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক রশ্মি অঙ্গুলির অগ্রভাগের সহিত চট্‌চট করিয়া বহির্গত হয়। আমরা এরূপ কখনও হইতে দেখি নাই, এবং আর কেহ দেখিয়াছেন এমনও শুনি নাই।

ঘ্রাণকের * ন্যূনতা। যখন যে প্রদেশে ওলাউঠা প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সেখানে ঘ্রা-

* ইংরাজিতে ঘ্রাণককে ওজোন (ozone) কহে। ইহা অম্লজান গ্যাসের ক্রিয়াশীল রূপান্তর। বায়ুতে ইহার অস্তিত্ব গন্ধ বিশেষদ্বারা অবগত হওয়া যায় বলিয়া ইহার

ণকের অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং বায়ুমণ্ডলে ঘ্রাণকের আধিক্য হইলে প্রায়ই প্রতিশ্যায় ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়।

বিষ বায়ু। বন্যার পর যখন জল কমিতে আরম্ভ হয়, তখনই মেলেরিয়া বা বিষবায়ুর উদ্ভব হয়, ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। যে গ্রামে বন্যার জল উঠে, সেখানে হয় জ্বর, নয় ওলাউঠা, হয় তো দুটিই এক সঙ্গে, কিম্বা একটি আগে একটি পরে হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত জানা কথা। ডাং ওয়াইজ পূর্ব্ববাঙ্গলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যৎকালে জ্বর ও আমাতিসার জঙ্গল প্রদেশে খুব প্রবল, তখন প্রত্যাবর্ত্তনশীল মেঘনার চর সমস্তে ওলাউঠা সর্ব্বনাশ করিতেছিল। তাদৃশ স্থলে জ্বরকে যদি কোন স্থানের আমদানি না বলি তো ওলাউঠাকে তাহা বলিবার কোনই কারণ নাই। নিম্নবঙ্গে ভাদ্রমাসে বন্যা সুরু হয়, এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে শুকাইতে থাকে। ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা যে ঐ সময় বরাবর বেশি হয়, ইহাও তাহার একটি কারণের মধ্যে ধর্ত্তব্য।

বিষ বায়ু জনিত জ্বর প্রায়শঃ কম্পজ্বরাকারে প্রকাশ পায়। অনেকে কম্পজ্বর ও ওলাউঠার তুলনা করিয়া থাকেন। কখন কখন এক প্রকার জ্বর কোন কোন স্থানে হইতে দেখা যায়, তাহাতে সর্ব্বাগ্রে শীত হইয়া, পরে পীত বা হরিৎবর্ণ পিত্তময় বমন ও রেচন হইতে থাকে এবং উদরে ব্যথা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখশ্রী বিশীর্ণ হয়, চক্ষুদ্বয় বসিয়া যায় ও তাহাদের চারিপার্শ্বে গর্ত্ত হইয়া যায়, স্বর বসিয়া যায়, অধঃশাখাদ্বয় হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ শীতল হইয়া যায়। জিহ্বা স্থূল ও সরস, কিন্তু তুষার শীতল হয়, এবং তৎসঙ্গে আভ্যন্তরিক দাহ ও দারুণ পিপাসা উপস্থিত হয়; নাড়ী সূক্ষ্ম, সূত্রবৎ, এক একবার মাত্র পাওয়া যায়, কিছুকাল পরে একেবারেই থাকে না। মূত্রস্রাব নিরুদ্ধ হয়, পায়ের ডিমে ও কোমরে যন্ত্রণাজনক খিল ধরিতে থাকে এবং রোগী ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে থাকে। রোগীকে হৃৎশূলে ধরে, তাহার দম আটকাইয়া আইসে, বক্ষস্থলের নিম্নাংশে কসিয়া ধরে, শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। উৎকণ্ঠাকুল হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে; তাহার উপরে আবার সর্ব্বক্ষণ বমন ও ভেদ। শ্বাসক্রিয়া উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। হৃদ্দৌর্ব্বল্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং হৃদয়ের আঘাত আর টের পাওয়া যায় না, শীতল ঘর্ম্মে রোগীকে ভাসাইয়া দেয় এবং সে দম আট্‌কাইয়া পঞ্চত্ব লাভ করে, কিন্তু এই তুফানের মধ্যেও তাহার জ্ঞান প্রায় অক্ষুণ্ণই থাকে। আর যদি রোগী না মরে, তবে হঠাৎ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় নাড়ী অল্পে অল্পে দেখা দিতে থাকে, চর্ম্ম নরম হইতে ও সহজ বর্ণে ফিরিতে থাকে। হৃদয়ের মন্দ মন্দ নিয়মিত গতি শ্রবণগোচর হয়। শ্বাস সহজ ও ক্রমে দীর্ঘ হইতে থাকে। মুখের শবাকৃতিত্ব

নাম ' ঘ্রাণক '। ইংরাজী ' ওজোন ' শব্দও ঘ্রাণার্থবাচক।

ঘুচিয়া যায়, বমি আর হয় না, এবং বাহ্যে একবারে থামিয়া যায়। যদি প্রতিক্রিয়া বেসি হইয়া পড়ে তাহা হইলে অনেক সময়ে বিকার লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জ্বরের ওলাউঠার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু প্রভেদও আছে। ইহাতে যে দ্রব্যের আস্রাব হয় তাহা পীত,হরিত বা পিত্তমিশ্রিত; ওলাউঠার আস্রাব তণ্ডুলোদকবৎ। ওলাউঠায় মুখের চেহারা যত বিকৃত হইয়া যায় এজ্বরে ততটা হয় না। কলিকাতায় একবার এইরূপ ওলাউঠা ধর্ম্মা জ্বর হইয়াছিল। হিজিলী অঞ্চলে অনেক সময়ে ঠিক ওলাউঠার লক্ষণ লইয়া জ্বরের আবেশ হয়, এমন কি প্রভেদ করা কঠিন হইয়া উঠে।

অনূপ বা নিম্নভূমি। লণ্ডন নগরে একবার ওলাউঠার মারক হইলে ডাক্তর ফার অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সহরের যে ভাগ যত বেশি উচ্চ সেই ভাগে মৃত্যু সংখ্যা তত কম হইয়াছিল; তিনি যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহা নিম্নে দিলাম।

টেম্স নদীর জোয়ার কালীন জলসীমা হইতে স্থানের উচ্চতা	১০০০ হাজার করা ওলাউঠায় যতলোক মরিয়াছিল।
ফুট	সংখ্যা
২০	১০২
২০ হইতে ৪০	৬৫
৪০ হইতে ৬০	৩৪
৬০ হইতে ৮০	২৭
৮০ হইতে ১০০	২২
১০০ হইতে ১২০	১৭
৩৪০ হইতে ৩৬০	৭

সমুদ্র সীমা হইতে যে সকল স্থান অনুচ্চ, নদীতীরস্থিত স্থান সকল, এবং নদীমুখসন্নিকিট স্থানসমূহ,ওলাউঠার প্রিয় বিহারস্থান। নিম্নভূমি অপেক্ষা পার্ব্বত্য স্থানে ওলাউঠা কম হইয়া থাকে; তথাপি দার্জিলিং, সিমলা, মশূরি প্রভৃতি শৈলনগরীও সময়ে সময়ে ইহার উৎপাত বিলক্ষণ সহ্য করিয়া থাকে।

তীর্থাদি উপলক্ষে দূরযাত্রা। ভূয়োদর্শন দ্বারা ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা অবগত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে গোরা ও সিপাহী উভয় জাতীয় সৈনিকদিগের মধ্যে শিবিরে অবস্থান কালের অপেক্ষা অভিযেণন কালে ওলাউঠায় মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। জগন্নাথ যাত্রীদিগের মধ্যে বৎসর বৎসর অনেকেই যে ওলাউঠার করালকবলে কবলিত হন ইহা সকলেরই জানা আছে। যেখানেই তীর্থস্থানোপলক্ষে অধিক লোক সমাগম সেই খানেই প্রায় ওলাউঠা দর্শন দেয়। সেদিনও মক্কানগরে ওলাউঠার ভারি ধুম লাগিয়াছিল।

দুর্গন্ধ উদ্বাষ্প। ইহা যে ওলাউঠা উৎপাদনের অন্যতর প্রবল কারণ, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সত্য বটে ইহার অস্তিত্ব সত্ত্বেও অনেক স্থান এই রোগ হইতে অব্যাহত থাকে; কিন্তু পাইখানা, গাড়া, নরদমা, পচনশীল জান্তব ও ঔদ্ভিদ আবর্জনা, অথবা মানবদেহোৎপন্ন পদার্থ নিচয়ের একত্র অতিসমাবেশ যে যে স্থানে থাকে সেই সেই স্থানে যে ওলাউঠা সমধিক

মারাত্মক ও সমধিক ব্যাপ্তিশীল হয় তাহা অনেকবার দেখা গিয়াছে।

অবিশুদ্ধ জল। ইহা যে ওলাউঠার একটি কারণ তাহা ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে। ওলাউঠা রোগীর আন্ত্রিক আস্রাব হইতে ওলাউঠা বিষ কোন না কোন প্রকারে সংস্পৃষ্ট হইয়া যে জল দূষিত হয় সেই জল সেবনে ওলাউঠা পুনরুৎপন্ন হয়, এই যে মত, যাহা ডাক্তর স্নো প্রকাশ করিয়াছেন তাহা, অনর্থক কষ্ট কল্পনা মাত্র। অবিশুদ্ধ পানীয়োদক যে স্বয়ংই ওলাউঠা উৎপাদনে সুদক্ষ, তাহা ডাক্তর গুডিভ্ একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিলাতে ল্যাম্বেথ কোম্পানী এবং সাউথ ওয়ার্ক ও বক্সাল কোম্পানী এই দুই জলের কলের কোম্পানী ছিল। ল্যাম্বেথ কোম্পানীর জল অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু সাউথ ওয়ার্ক ও বক্শাল কোম্পানীর জল নিতান্ত কদর্য্য ছিল। এই দুই কোম্পানী একই প্রদেশে জলের সরবরাহ করিতেন, অনেক রাস্তায় তাঁহাদের উভয়েরই পাইপ পাশাপাশি ছিল। উভয়েই প্রায় সমান সংখ্যক বাড়ীর জল সরবরাহ করিতেন। ল্যাম্বেথ কোম্পানীর জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজারকরা ৩৭ জন মাত্র মরে, আর সাউথ ওয়ার্ক ও বক্শাল কোম্পানীর জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজারকরা ১৩০ জন মরিয়াছে। এই ঢাকা সহরে নবাবপুর অঞ্চলে লোকে অবিশুদ্ধ কূপোদক ব্যবহার করে, ইসলামপুর, বাবুরবাজার, বাঙ্গলাবাজার প্রভৃতি স্থানে লোকে পাইপের জল ব্যবহার করে। এই বারকার মারকে নবাবপুর অঞ্চলে ওলাউঠায় যত লোক মরিয়াছে, অন্য অঞ্চলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

জল দেখিতে স্বচ্ছ ও সুস্বাদ হইলেই যে বিশুদ্ধ হয় এটি নিতান্ত ভ্রমাত্মক সংস্কার। জলে যে সকল অবিশুদ্ধি জনক দূষিত পদার্থ আছে, তাহা দ্রব বা অদ্রবাবস্থায় থাকিতে পারে। অদ্রব অবস্থায় থাকিলে খালি চক্ষুর দ্বারা না হয় তো অনুবীক্ষণ দ্বারা সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উক্ত দূষিত পদার্থ জীবন্ত বা মৃত জান্তব বা ঔদ্ভিদ পদার্থময় হইয়া থাকে। কিন্তু দ্রবাবস্থায় থাকিলে এরূপ কোন উপায় দ্বারা ধরা পড়ে না, অধিকন্তু তৎসহ আঙ্গারিকাম্ল ও ক্ষারধর্ম্মি যবক্ষারজের সত্ত্বা নিবন্ধন জল কাচবৎ উজ্জ্বল স্বচ্ছ ও শীতলাস্বাদ হইয়া থাকে, তাহাতে অজ্ঞ লোকের উহাকে সুবিশুদ্ধ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

বদ্ধ জল অপেক্ষা স্রোতের জল বিশুদ্ধ থাকে। উত্তাপাধিক্য হইলে প্রাণিজ পদার্থ অধিক পরিমাণে জলের সহিত মিলিত হয়; এই জনাই দেখা যায় যে, যে জলাশয়ের জল সমস্ত বৎসর ব্যবহার করা হয়, শীতকালে তাহার জলে কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু গ্রীষ্মকালে সেই জলই রোগের ঘর হইয়া বসে। (ক্রমশঃ)

সুখের বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা।

মনুষ্য সুখ সুখ করিয়া পাগল, কিন্তু কিসে যে এই সুখ হইবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। মৃগ যেরূপ কস্তুরীর ঘ্রাণে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, মনুষ্যও সেইরূপ সুখের আশায় কার্য্যে কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার অন্তরে অনন্ত অভাব রহিয়াছে, ইহার সমস্তগুলি পূরণ করা একরূপ দুঃসাধ্য। তবে কোন্‌গুলিকে পূরণ করিলে অধিক সুখী হওয়া যায়, তাহা সে ঠিক পায় না। অভাবগুলি অঙ্কুশের ন্যায় চারিদিক হইতে তাহাকে আঘাত করিতে থাকে; সে যদি একটি অভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হয় এবং আর কোন দিকে না ফিরে, তবে হয় ত সে সেই অভাবটি নিরাকরণ করিয়া অন্য আর একটির পশ্চাৎ ধাবিত হইতে পারে, অথবা হয় ত সেই একটিকে নিরাকৃত করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহু অভাব মোচন হইয়া যায়। কিন্তু তাহা সে করে না। সে, প্রথম যেটিতে আঘাত করিল, সেইটির দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু সেটি নিরাকরণ না করিতে করিতেই, যেই অন্য দিক হইতে আর একটিতে আঘাত করিল, অমনি সেইটির দিকে ধাবিত হইল, আবার সেইটির শেষ করিতে না করিতেই তৃতীয় আর একটির দিকে ধাবমান হইল। এই প্রকার চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সে কেবল ঘুরিতে থাকে, কিন্তু কোন সুখই আস্বাদন করিতে পারে না। সুতরাং সে আপনাকে দুঃখী মনে করে।

তাহার দুঃখের অশেষ কারণের মধ্যে আর এক প্রধান কারণ এই যে, সে জানে না, সুখ কাহাকে বলে, এবং কি উপাদানে উহা নির্ম্মিত। কেহ মনে করে যে ধনে সুখ, অর্থাৎ এক ধন থাকিলে, যাবতীয় অভাব মোচন করা যাইতে পারে। এইরূপ কেহ মনে করে যে, প্রভুত্বে সুখ এবং কেহ মনে করে যে, বিলাসিতায় সুখ; আবার ধনীর, বিলাসীর এবং প্রভুপদস্থ ব্যক্তির বিলাপ শুনিয়া, অবশেষে নিরাশার সহিত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় যে পৃথিবীর কোথায়ও সুখ নাই;—যে অবস্থায় আছি, তাহাই যথেষ্ট। "আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক" বৈরাগ্যের এই উপদেশ মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। কিন্তু এই উপদেশে কাহারও তৃপ্তি জন্মে কি, এবং ইহা পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলজনক কি?

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, ধন, প্রভুত্ব এবং বিলাসীতা না হইলেও, এমন একটি সামগ্রী আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে, অথবা এমন একটি কার্য্য আছে, যাহা করিতে পারিলে, "প্রকৃত সুখ" লাভ করা

যায়। এই প্রকৃত সুখের অর্থ এই যে, এই সুখকে লাভ করিলে, আর কোন প্রকার সুখের প্রয়োজন থাকে না।

প্রকৃত সুখ কি, অনেকে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া মস্তিষ্ক ঘুরাইয়াছেন। স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়া ধনকুবের হওয়ার চেষ্টাও যেপ্রকার, এই 'প্রকৃত সুখ' পাইবার চেষ্টাও সেই প্রকার। অনেকেরই বিশ্বাস যে, এমন একটি পদার্থ আছে, যাহা একবার ঠিক করিতে পারিলেই সুখের প্রস্রবণ ঠিক হইল; এবং আর সমস্ত অবহেলা করিয়া সেই মুখ্যবস্তু লাভ করিতে পারিলেই সুখের ভাণ্ডার হস্তগত হইল। এই একমাত্র কাল্পনিক বস্তুতে সুখের অন্বেষণ করিতে যাইয়া ইহাঁরা মার্গভ্রষ্ট হইয়াছেন; কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে পারেন নাই।

সুতরাং আমরাও সেই সুখের পরম পদার্থের অন্বেষণে বহির্গত হইব না। লোকের অন্তঃকরণে যে যে কারণে ক্ষণিক সুখের উদয় হয়, আমরা প্রথমতঃ সেই সমস্ত কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিব। এবং উহাদের প্রকৃতিগত কি কি পার্থক্য আছে তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিব। উহার সকলগুলি কারণ এক আধারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে কি না, ইহা পশ্চাতে দেখিব। যদি না পারে, তবে কোন্‌গুলি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌গুলির অভাব কোন্‌গুলির দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক মোচন হইতে পারে, ইহা অনুসন্ধান করিব। এই প্রকার করিলে আমরা অবশেষে এইরূপ একটি মনুষ্য কল্পনা করিতে পারিব, যে সম্পূর্ণ সুখী হইবে না বটে, কিন্তু যাহার সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।

তবে দেখা যাউক, সুখ কি? সাধারণ কথায় বলে 'অভাবের পূরণেই সুখ জন্মে।' কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অভাবের পূরণের সঙ্গে সঙ্গে সুখের শেষ হয়। মিষ্ট ভোজনে সুখ আছে, কিন্তু মিষ্ট গলাধঃকরণ করিয়া আচমন করিলে আর সুখবোধ থাকে না। এই কারণে উল্লিখিত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সুখের আর এক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সমূহের যথোচিত অর্থাৎ অনতি এবং অনল্প পরিচালনাই প্রকৃত সুখ"। আমাদের যখন যে বৃত্তি অথবা প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, যদি তখন তাহার নিয়মিত পরিচালনা করিতে পারি, তাহা হইলেই মনে সুখ বোধ হয়। বৃত্তির অতি চালনায় কষ্ট হয়, আবার অল্প চালনায়ও অভাব থাকিয়া যায়। কোন কোন বৃত্তির অল্প চালনায়ই ক্লান্তি বোধহয়; কোন কোন বৃত্তি অধিকক্ষণ চালনা করিতে পারা যায়।

সুখের মূল্য দুই প্রকারে,—ঘনত্বে (intensity) ও ব্যাপ্তিতে (Estension)। কোন কোন সুখের একসাময়িক পরিমাণ অথবা ঘনত্ব বেশী, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; অনেক স্থলে এই প্রকার সুখের পরিণাম অবসাদ। কোন কোন সুখের ঘনত্ব কম, কিন্তু ব্যাপ্তি অধিক। তারতম্য করিতে হইলে সেই সুখ সর্ব্বোৎকৃষ্ট

(ক) যে সুখের ব্যাপ্তি বেশী, ঘনত্ব বেশী, এবং পরিণামে অবসাদ নাই,
তৎপরে (খ) যে সুখের ব্যাপ্তি বেশী, ঘনত্ব কম, এবং পরিণামে অবসাদ নাই,
তৎপরে (গ) যে সুখের ব্যাপ্তি কম, ঘনত্ব বেশী, এবং পরিণামে অবসাদ নাই,
তৎপরে (ঘ) যে সুখের ব্যাপ্তি কম, ঘনত্ব কম, এবং পরিণামে অবসাদ নাই,
তৎপরে (ঙ) যে সুখের ব্যাপ্তি বেশী, ঘনত্ব বেশী, এবং পরিণামে অবসাদ আছে,
তৎপরে (চ) যে সুখের ব্যাপ্তি বেশী, ঘনত্ব কম, এবং পরিণামে অবসাদ আছে,
তৎপরে (ছ) যে সুখের ব্যাপ্তি কম, ঘনত্ব বেশী, এবং পরিণামে অবসাদ আছে,
তৎপরে (জ) যে সুখের ব্যাপ্তি কম, ঘনত্ব কম, এবং পরিণামে অবসাদ আছে।

ঘ হইতে ক কে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ এই যে, অল্প সুখও ভাল, কিন্তু অধিক সুখের পর অধিক দুঃখ ভাল নহে। নির্ব্বোধেরা ইহা না বুঝিতে পারে; কিন্তু বুদ্ধিমান কদাচ একথা অস্বীকার করে না। তণ্ডুলকণার প্রলোভনে কপোতের পাশবদ্ধ হওয়ার ন্যায় নির্ব্বোধেরা আশু সুখের প্রলোভনে পরিণামে দুঃখ ভোগ করে।

আমরা ভবিষ্যতে উল্লিখিত নিয়মানুসারে সুখের তারতম্য করিব। ঙ হইতে জ শ্রেণীস্থ সুখ কোন রূপেই প্রার্থনীয় নহে। গ এর অভাবে ঘ বাঞ্ছনীয়। ঘ কোন কোন সময়ে অপরিহার্য্য। যদি গ শ্রেণীস্থ সুখ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়, তবে ক এর অভাব মোচন হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এইরূপ পাওয়ার চেষ্টাতে সুখের পরিবর্ত্তে পীড়া উপস্থিত হয়। গ বাঞ্ছনীয় এবং আবশ্যক, যদি উহাতে ক কিম্বা খ এর বিঘ্ন না জন্মায়।

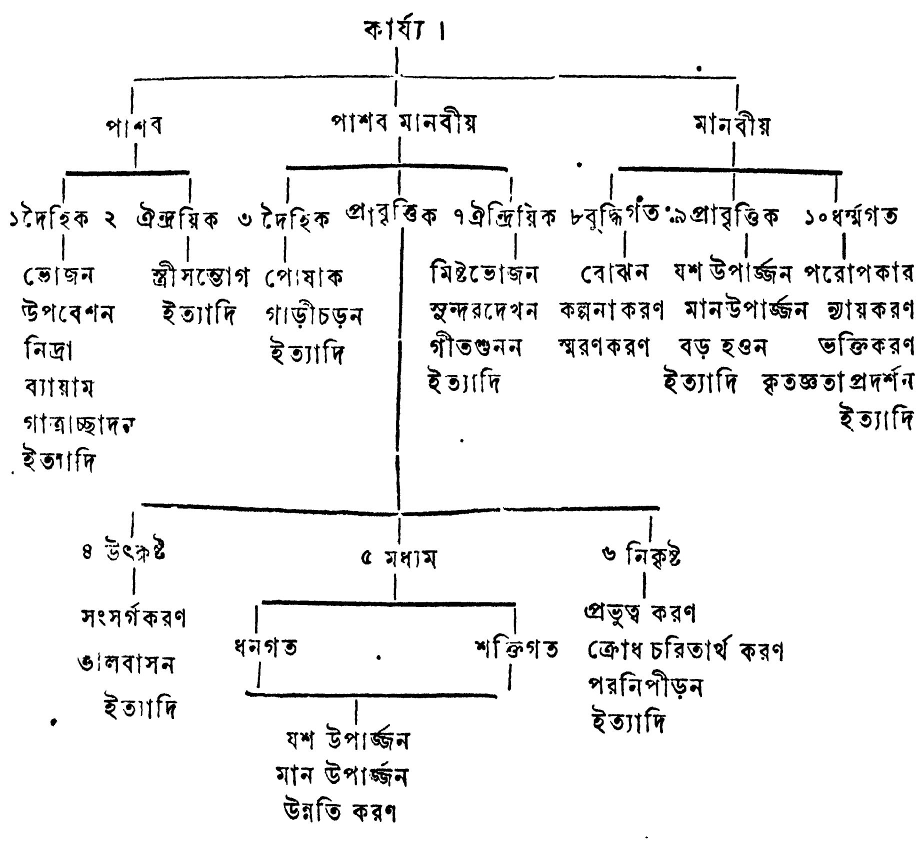
আবার কতকগুলি সুখ অপরিহার্য্য, কতকগুলি পরিহার-সম্ভব, এবং কতকগুলি পরিহর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে ঙ হইতে জ শ্রেণীস্থ সুখ সমুদয়ই পরিহর্ত্তব্য। কতকগুলিকে পরিহার করিতে পারা যায়; এবং যদি উচ্চতর সুখের বাধা দেয়, তবে পরিহার করা উচিত, নহিলে উচিত নহে;—এইগুলিকে পরিহারসম্ভব বলিলাম।

পুনশ্চ, কোন কোন সুখ আপেক্ষিক এবং সীমাবদ্ধ; কোন কোন সুখ অনপেক্ষ এবং সীমাবদ্ধ নহে। অর্থাৎ কোন কোন কার্য্য অবস্থাবিশেষে সুখ উৎপাদন করে,—অনুকূল অবস্থা না হইলে, সে কার্য্যে সুখ হয় না। তাহাদিগকে আপেক্ষিক সুখ বলিলাম। আবার কোন কোন কার্য্য ইচ্ছা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ করা যায় না; সুতরাং তদুৎপন্ন সুখ সীমাবদ্ধ।

অতএব আমরা প্রত্যেক কার্য্যোৎপন্ন সুখ সম্পর্কেই নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় আলোচনা করিব; যথা ব্যাপ্তি, ঘনত্ব, পরিণাম, আপেক্ষিকত্ব ও সীমা-নিবদ্ধতা (অর্থাৎ কিরূপ সীমায় থাকিলে সুখ হয়, আর লঙ্ঘন করিলে দুঃখ হয়।)

বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সমূহের উত্তেজনায় আমরা কি কি কার্য্য করি, শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বক সংক্ষেপে তাহার এক তালিকা দি-

তেছি। এই তালিকাতে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা না থাকিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রয়োজনের জন্য ইহাই যথেষ্ট হইবে। যে শ্রেণীর মধ্যে যে কার্য্যকে রাখা হইয়াছে, তাহা প্রয়োজন বিশেষে অন্য শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে; এবং তাহা অধিকতর বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া অপর অমিশ্র কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খতা এস্থলে অনাবশ্যক। সাধারণ ভাবে কার্য্য গুলি বুঝিয়া তাহা হইতে কিরূপ প্রকৃতির সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য।



উল্লিখিত তালিকাতেই মানব জীবনের সমস্ত কার্য্য শেষ হইল, এরূপ নহে। তালিকাটি যে অসম্পূর্ণ, দেখিলেই তাহা বোঝা যাইবে। কিন্তু যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, তাহা তদবস্থায় অথবা বিশ্লেষণ দ্বারা উল্লিখিত ১০ শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। যথা অধ্যয়নে সুখ আছে, কিন্তু উক্ত তালিকায়

তাহার উল্লেখ করা যায় নাই। তথাপি অধ্যয়নকে ৮ম শ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অধ্যয়নজনিত সুখের কারণ এই যে, উহা দ্বারা অনেক নূতন বিষয় বুঝিতে পারা যায়। অনেক নূতন কল্পনা উদিত হয় সুতরাং বিশ্লেষ দ্বারা উহাকে ৮ম শ্রেণীভুক্ত কার্য্যে পরিণত করা যায়। আবার পোষাককে ৩য় সংখ্যক শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পোষাকের সুখ, দুই স্বতন্ত্র সুখের মিশ্রণ, এক গাত্রাচ্ছাদনের সুখ, অপর অন্যের নিকট বড় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার সুখ। যাহা হউক বর্ত্তমান প্রয়োজনে এরূপ বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। যে সকল মিশ্র সুখের প্রকৃতি অবগত হইতে বিশ্লেষণ আবশ্যক করে না, তাহাদিগকে মিশ্রই রাখিয়াছি; আবার বিশ্লেষণ ভিন্ন যাহাদের প্রকৃতি বোঝা কঠিন, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়াছি। যথা, ধনে একরূপ সুখ আছে; কিন্তু সে সুখ বহু সুখের মিশ্রণ মাত্র। ধনে আমাদের বহু বৃত্তির ও প্রবৃত্তির পরিচালনার সহায়তা করে বলিয়া আমরা ধনকে সুখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সুতরাং ধনগত সুখের প্রকৃতি অবগত হইতে উহার বিশ্লেষণ আবশ্যক।

এক্ষণে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি (fundamentum) কি তাহা বলিতেছি। কার্য্য তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে; পাশব, পাশব-মানবীয় ও মানবীয়। উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুসমূহের মধ্যে যে কার্য্য সাধারণ, তাহাকে পাশব কার্য্য বলা হইয়াছে। এই পাশব কার্য্য আবার দুই ভাগে বিভক্ত, দৈহিক ও ঐন্দ্রিয়িক। ভোজন, উপবেশন, প্রভৃতি দৈহিক কার্য্য। সকল জন্তুর পক্ষে এই কার্য্যগুলি অপরিহার্য্য, এবং ইহাদের অভাবে কষ্ট হয়। এই সকল কার্য্য হইতে উৎপন্ন সুখকে অভাবজাত সুখ (negative happiness) বলা যায়; কষ্টের অভাব জনিত সুখকেই অভাবজাত সুখ বলে। ভোজনে ক্ষুধার কষ্ট দূর হয়, এই জন্য সুখবোধ জন্মে; না হইলে জন্মে না; সুতরাং ভোজনে অভাবজাত সুখ অনুভূত হয়। এইরূপ উপবেশনে দণ্ডায়মান, অথবা শয়নজনিত অঙ্গাদির ক্লান্তির বিরাম হয় বলিয়া সুখজন্মে, ইত্যাদি। দৈহিক সুখসমূহের প্রকৃতি এই যে, ইহাদের ঘনত্ব কম, এবং ইহারা ক্ষণস্থায়ী; তদ্ব্যতীত উক্ত দৈহিক কার্য্যসমূহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের আবশ্যক করে, এবং অধিক করিলে সুখের পরিবর্ত্তে পীড়া উপস্থিত হয়। ক্ষুধার প্রভাবে যে পরিমাণ কষ্ট উপস্থিত হয় ভোজনে ঠিক্ সেই পরিমাণ সুখ অনুভূত হয় না; আবার ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে সুখের প্রধানাংশ টুকু পর্য্যবসিত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুনরায় ক্ষুধা বোধ না হয়, ততক্ষণ শান্তিজনিত সুখের আভা মাত্র বিদ্যমান থাকে। অনেকে এই শেষোক্ত অবস্থাকে সুখ বলিয়াই গণ্য করে না। কিন্তু যখন এই শেষোক্ত অবস্থার অভাবে আমাদের বৃত্তিসমূহের যথোপযোগী পরিচালনা চলে না, তখন ইহাকে সুখ না বলিলেও সুখের সহায় বলিতে হইবে। আমরা এই বিষয়টি স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। ভোজনের আর

এক প্রকৃতি এই যে, সকল সময় ভোজন করিতে পারা যায় না; উহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। এই সময় লঙ্ঘন করিলে পীড়া জন্মে; নির্দ্দিষ্ট বারের অতিরিক্ত বার ভোজনেও অসুখ হয়। উপবেশন প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট বার না থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, যখন দণ্ডায়মান কিংবা গমন জনিত শ্রান্তি হইবে, তখনই উপবেশনে সুখ বোধ হইবে; নতুবা অসুখ। সুতরাং দেখা যায় যে, ১ম সংখ্যক অর্থাৎ পাশবান্তর্গত দৈহিক কার্য্য দ্বারা দিবসের অতি অল্প সময়েই মাত্র সুখ পাইতে পারা যায়। এ সুখের প্রয়োজন অপরিহার্য্য; কিন্তু ইহার ব্যাপ্তি ও ঘনত্ব উভয়ই কম, এবং পরিণামে অবসাদ নাই। সুতরাং ১ সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই —

অপরিহার্য্য,

ঘ শ্রেণীস্থ,

আপেক্ষিক এবং সীমা-নিবদ্ধ (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভোগ্য)।

দ্বিতীয় ভাগ ঐন্দ্রিয়িক। ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যের মধ্যে স্ত্রীসম্ভোগই পশুদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সুখদায়ক। এবং ইহাতে একই সময়ে অত্যধিক পরিমাণে সুখ জন্মিতে পারে। কিন্তু সে সুখের ব্যাপ্তি কম এবং পুনঃ পুনঃ অভোগ্য, নিয়মাধিক কার্য্যে সুখের পরিবর্ত্তে পীড়া উপস্থিত হয়। এ সুখ অপরিহার্য্য নহে। অনেকে আজীবন ইহা পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু উচ্চতর সুখের ব্যাঘাত না জন্মিলে ইহা পরিহার করার আবশ্যকতা নাই। সাধারণ অবস্থায় এই শ্রেণীস্থ কার্য্যের অভাবে কষ্ট হইতে পারে; কিন্তু শিক্ষা ও চেষ্টা দ্বারা ইহাদের অভাব সম্পূর্ণ দুরীভূত করা যায়। এই শ্রেণীস্থ কার্য্যের জন্য কঠিন সমাজশাসন রহিয়াছে। ঐ শাসন লঙ্ঘন করিলে পশ্চাতে অপমান-জনিত কষ্ট ভুগিতে হয়, এবং তখন উক্ত কার্য্যজনিত সুখ ছ শ্রেণীস্থ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সমাজানুমোদিত, সে পর্য্যন্ত ওরূপ ভয় নাই। অতএব ২য় সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই—

পরিহার-সম্ভব,

(গ) শ্রেণীস্থ,

আপেক্ষিক এবং সীমা-নিবদ্ধ।

কার্য্যের দ্বিতীয় বিভাগ পাশব মানবীয়। এই বিভাগের কতকগুলি কার্য্য আংশিক পাশব, আংশিক মানবীয়; অর্থাৎ এক ভাগ জন্তু-সাধারণ, অপর ভাগ শুদ্ধ মানব নিবদ্ধ: কতকগুলি কার্য্য পাশব, কিন্তু তজ্জনিত সুখ মানবীয়। দৃষ্টান্ত যথা, পোষাকে পশুর রোমের কার্য্য সাধন করে, অর্থাৎ আচ্ছাদন দেয়; কিন্তু সামান্য বস্ত্র দ্বারাও এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। তবে বহুমূল্য পোষাকের প্রয়োজন কেন? মনুষ্যের আর একটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে বলিয়া; সে প্রবৃত্তির নাম, লোকের নিকট বড় বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া। এই প্রকৃতি পশুর নাই; একমাত্র মানুষের আছে। এই নিমিত্ত পোষাক কার্য্যকে পাশব-মানবীয় বলিয়াছি। তদ্রূপ মিষ্টভোজন, গীতশ্রবণ ইত্যাদি। আবার ক্রোধ করা পশু ও মনুষ্য উভয়ের মধ্যেই

সাধারণ; কিন্তু ক্রোধের চরিতার্থতাজনিত আভ্যন্তরিক কার্য্য অর্থাৎ মানসিক অবস্থা মনুষ্যের যে প্রকার, পশুর সে প্রকার নহে। ক্রোধকরণ উভয়ের মধ্যেই সাধারণ, কিন্তু চরিতার্থতা-জনিত সুখ মনুষ্যের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই জন্য ক্রোধ করাকেও পাশব-মানবীয় কার্য্য বলিয়াছি।

পাশব-মানবীয় কার্য্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।—দৈহিক, প্রাবৃত্তিক ও ঐন্দ্রিয়িক। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই তিন ভাগের লক্ষণ বোধগম্য হইবে। দৈহিক সুখ যথা, পোষাক করণ, গাড়ীচড়ন ইত্যাদি। মনুষ্য রাত্রি দিবা বস্ত্র পরিয়া লোকের নিকট বড় বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না,—হইবার চেষ্টা করিলে লোক-নিন্দাভাজন হইতে হয়। সুতরাং পোষাক পরিয়া সুখবোধ পুনঃ পুনঃ চলে না। এই সুখের ঘনত্ব তত বেশী নহে,—অনেক সময়ে নিতান্ত কম,—ব্যাপ্তি ততোধিক কম। কিন্তু উপযুক্ত সীমায় নিবদ্ধ থাকিলে পরিণামে অবসাদ নাই। এসুখ অপরিহার্য্য নহে, ইচ্ছা করিলেই ত্যাগ করা যায়। পরিহার করিলে নিজের কিংবা সমাজের কাহারও অনিষ্ট নাই তবে বিনা কারণে ত্যাগ করার আবশ্যকতা নাই। অতএব ৩ সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই—

পরিহার-সম্ভব,

(ঘ) শ্রেণীস্থ,

আপেক্ষিক এবং সীমা নিবদ্ধ।

প্রাবৃত্তিক অর্থাৎ প্রবৃত্তিজাত কার্য্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। উৎকৃষ্ট, মধ্যম, নিকৃষ্ট। যেগুলি সমাজের উপকারক, সেই গুলি উৎকৃষ্ট; যে গুলি উপকারকও নহে, অপকারকও নহে, সেই গুলি মধ্যম; আর যে গুলি অপকারক, সেই গুলি নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট যথা, ভালবাসন, সংসর্গ করণ ইত্যাদি। এই কার্য্য হইতে উৎপন্ন সুখের ব্যাপ্তি বেশী, ঘনত্ব কম। কেহ এক সময়ে ভাল বাসিয়া ভালবাসারূপ কার্য্যের শেষ করে না, ভাল বাসার প্রবৃত্তি অনেক সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। সংসর্গের সুখও সর্ব্বদা এক সময়েই শেষ হয় না; বন্ধুর সহিত দেখা হইলে মনে যে আনন্দ হয়, দেখার পরেও সে আনন্দ সহজে দূরীভূত হয় না। দেখার পরে যে কল্পনার উদয় হয়, তাহাতে সুখকে অধিকক্ষণ স্থায়ি রাখে। কিন্তু কখন কখন এই শ্রেণীর কার্য্যের সুখ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় পায়। যখন দেখার পরে কল্পনার উদয় হইবার কারণ না থাকে, তখনই সুখ ক্ষণস্থায়ী। কোন সময়ে এই শ্রেণীস্থ কার্য্যে এককালীন বেশী সুখবোধ হয়, কিন্তু পরক্ষণে থাকে না; যথা, বহুদিনের পরে গৃহে আসন, এবং পিতা মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করণ। এই শ্রেণীস্থ কার্য্যের পরিণামে অবসাদ নাই, তবে বুদ্ধির সহিত কার্য্য না করিলে আছে, কিন্তু সেই অবসাদ কার্য্যোৎপন্ন বলা যায় না; উহা বুদ্ধির অভাবজনিত। এই প্রকার কার্য্য পরিহার করা কষ্টকর, কিন্তু পরিহার করা যাইতে পারে। ইহাতে উচ্চতর সুখের সহসা বাধা দেয় না। অনেকে জ্ঞানলাভে অনন্যমনা হইয়া, এসুখের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু সাধা-

রণ লোকের পক্ষে ইহা আবশ্যক। এ সুখ সীমানিবদ্ধ। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ভাল বাসা যায় না, এবং যখন ইচ্ছা তখনই সংসর্গজনিত সুখ উপভোগ করিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কার্য্য বহু অবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই ৪র্থ সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই

পরিহার সম্ভব,

খ ও গ শ্রেণীস্থ,

আপেক্ষিক এবং সীমানিবদ্ধ।

মধ্যম ভাগস্থ কার্য্য দুই প্রকার; ধনগত এবং শক্তিগত। যশ উপার্জ্জন, মান উপার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য ইহার অন্তর্গত। এপ্রকার কার্য্যে স্বভাবতঃ কোন সুখ নাই; কিন্তু যশ ও মান লাভ হয় বলিয়া সুখ জন্মে। ঘোড়দৌড়ে জয়ী হইলে যশ লাভ হয়, সুতরাং ইহাতে সুখ। বহুলোক ভোজনে লোকে ভাল বলে, এজন্য ইহাতে সুখ। প্রথমটি শক্তিগত, দ্বিতীয়টি ধনগত। একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এসুখের ব্যাপ্তি কম, ঘনত্ব কম অথবা বেশী, পরিণামে অবসাদ নাই, পরিহার সম্ভব, এবং সীমানিবদ্ধ;—পুনঃ পুনঃ এই শ্রেণীস্থ কার্য্য করা সম্ভব নহে,—করিতে পারিলেও, শেষে সুখ বোধ হয় না। অতএব ৫ম সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই—

পরিহারসম্ভব,

গ ও ঘ শ্রেণীস্থ,

আপেক্ষিক ও সীমানিবদ্ধ।

নিকৃষ্ট ভাগস্থ কার্য্য যথা, ক্রোধ করণ, পর নিপীড়ন করণ। স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, এতজ্জনিত সুখের ব্যাপ্তি কম, পরিমাণ কম অথবা বেশী, পরিণামে প্রায়ই অবসাদ আছে,কখনওবা নাই; সীমানিবদ্ধ এবং পরিহর্ত্তব্য। সুতরাং ৬ষ্ঠ সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই—

পরিহর্ত্তব্য,

ঘ হইতে ঙ শ্রেণীস্থ কচিৎ গশ্রেণীস্থ,

আপেক্ষিক এবং সীমানিবদ্ধ।

পাশব মানবীয়ের অবশিষ্ট ভাগ ঐন্দ্রিয়িক যথা, মিষ্ট ভোজন, সুন্দর দেখন ইত্যাদি। ইহাদিগকে কেন পাশব-মানবীয় বলা হইয়াছে,তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত আছে। এতজ্জনিত সুখের ব্যাপ্তি কম, ঘনত্ব বেশী বা কম, সীমা বহির্ভূত না হইলে পরিণামে অবসাদ নাই; পুনঃ পুনঃ অভোগ্য এবং পরিহারসম্ভব। সুতরাং এই ৭ম সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই—

পরিহার-সম্ভব,

গ ও ঘ শ্রেণীস্থ,

আপেক্ষিক এবং সীমানিবদ্ধ।

কার্য্যের তৃতীয়ভাগ মানবীয়। এই শ্রেণীস্থ কার্য্য শুদ্ধ মানবনিবদ্ধ,কোন পাশব সংশ্রব নাই। মানবীয় কার্য্য তিন ভাগে বিভক্ত, বুদ্ধিগত, প্রবৃত্তিগত এবং ধর্ম্মগত (moral)।

বুদ্ধিগত যথা, বোঝন, কল্পনাকরণ, স্মরণ করণ ইত্যাদি। কোন একটি পদার্থ দেখিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, বড়ই আনন্দ উপস্থিত হয়; শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি সম্যক বিকশিত হইলে তজ্জনিত সুখ, অন্তরে চিরবিরাজমান থাকে। বোঝন, কল্পন প্রভৃতি কার্য্য চিন্তারূপ সাধারণ কার্য্য হইতে

উৎপন্ন। কোন বস্তু দেখিলাম কি শুনিলাম, কিন্তু চিন্তা ব্যতিরেকে তাহা বোঝা অসম্ভব; এবং শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি বিকশিত হইলে এই চিন্তা হইতে মনুষ্য বোঝন, কল্পন, স্মরণ প্রভৃতি কার্য্যগত সুখ নিয়ত উপভোগ করিতে পারে; এই তিন কার্য্যের নাম পৃথক হইলেও ইহারা প্রকৃত এক। মনুষ্য যখন ইচ্ছা, তখনই এসুখ ভোগ করিতে পারে। পরিণামে কোন প্রকার অসুখ নাই। ভোজন প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় এ শ্রেণীস্থ কার্য্য একরূপ অপরিহার্য্য, সুতরাং এতজ্জনিত সুখও অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ আত্মোন্নতি এবং সমাজোন্নতির জন্য ইহারা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সুতরাং এতজ্জনিত সুখকে অপরিহার্য্যও বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ ইহাদিগকে পরিহার করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। অতএব ৮ম শ্রেণীস্থ কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই—

অপরিহার্য্য এবং অপরিহর্ত্তব্য,
ক হইতে ঘ শ্রেণীস্থ,
অনপেক্ষ, সীমানিবদ্ধ নহে।

প্রাকৃতিক যথা, যশ উপার্জ্জন, মান উপার্জ্জন। মনুষ্য ধন এবং শক্তি দ্বারা যেমন যশ লাভ করিতে পারে, জ্ঞান দ্বারাও সেইরূপ পারে। কিন্তু জ্ঞানদ্বারা যশোলাভে পাশব সংস্রব নাই, ইহাকে মানবীয় শ্রেণীভুক্ত করা গিয়াছে। মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া যশ পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ অনেক সময়ই উহা আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। (জেদ করিয়া অযশ লাভের কথা এস্থলে হইতেছে না; উহা অমানুষিক)। কিন্তু সে যশোলাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারে। জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া এবং ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া এই শ্রেণীস্থ যশ পাওয়া যায়। এই প্রকারের কোন কোন কার্য্যে দুই রূপ সুখ আছে। এক মূল কার্য্য হইতে, অপর কার্য্যজনিত যশোলাভ হইতে। শেষোক্ত সুখের বাসনা অনেকে পরিহার করিতে পারে। ইহার ব্যাপ্তি কম, ঘনত্ব কম অথবা বেশী, কিন্তু পরিণামে অবসাদ নাই। এ সুখ যখন ইচ্ছা তখনই ভোগ করা যায় না;—যশ ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায় না; উহার জন্য অনুকূল অবস্থা চাই। কিন্তু উহা সীমাবদ্ধ নহে, অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য হইতে এই প্রকারের সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সমস্ত কার্য্যের এমন কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, যাহা উল্লঙ্ঘন করিলে সুখের পরিবর্ত্তে পীড়া উপস্থিত হয়। যদি অবস্থা প্রতিকূল না হয়, তবে মনুষ্য পুনঃ পুনঃ বহুপ্রকারের কার্য্য দ্বারা মান এবং যশোলাভ জনিত সুখ উপভোগ করিতে পারে। সুতরাং ৯ম সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই—

পরিহারসম্ভব,
গ ও ঘ শ্রেণীস্থ,
আপেক্ষিক কিন্তু সীমাবদ্ধ নহে।

সর্ব্বশেষে ধর্ম্মগত কার্য্য; যথা পরোপকার, ন্যায়করণ, ভক্তিকরণ ইত্যাদি। এতজ্জনিত সুখের ব্যাপ্তি বেশী, কার্য্যের পরেও অধিকক্ষণ সুখ বিদ্যমান থাকে। কদাচিৎ কম, ঘনত্ব বেশী বা কম। পরিণামে অবসাদ নাই। ইচ্ছা করিয়া এসুখ পরিহার

করা যায় বটে, কিন্তু পবিহার করা নিতান্ত অন্যায়; সামাজিক উন্নতির জন্য ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সুতরাং পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে; এই জন্য ইহাকে অপরিহর্ত্তব্য বলা যাইতে পারে। এ সুখও পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে সীমানিবদ্ধ নহে; এবং ইহা অনপেক্ষ; আমরা ইচ্ছা করিলেই এ সুখ উপার্জ্জন করিতে পারি; সামাজিক অবস্থা নিয়তই এতৎপক্ষে অনুকূল। সমস্ত জীবন এই শ্রেণীস্থ কার্য্য করিলেও তাহাতে অপ্রবৃত্তি জন্মে না, কিংবা কার্য্যের শেষ হয় না। ইহাতে চিরসুখ, চিরশান্তি। ভোজনের সুখ আপেক্ষিক, কারণ উহা ক্ষুধার উপর নির্ভর করে। কিন্তু পরোপকারের সুখ আপেক্ষিক নহে, কারণ এসংসারে দুঃখের অন্ত নাই। সুতরাং ১০ম সংখ্যক কার্য্যোৎপন্ন সুখের প্রকৃতি এই—

পরিহারসম্ভব কিন্তু অপরিহর্ত্তব্য,
ক ও খ শ্রেণীস্থ,
অনপেক্ষ এবং সীমানিবদ্ধ নহে।

আমরা এক্ষণে সকল প্রকার কার্য্য ও তজ্জনিত সুখের প্রকৃতি আলোচনা করিয়াছি। যে ব্যক্তি একের দ্বারা অপরের বিঘ্ন না জন্মাইয়া এই দশ শ্রেণীস্থ কার্য্য সমভাবে সম্পন্ন করিতে পারে; সেই প্রকৃত সুখী। সে যোগী কিংবা ঋষী বলিয়া গণনীয় না হইতে পারে; কিন্তু তাহার সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জগতে এরূপ লোক নাই, বর্ত্তমান অবস্থায় হইতেও পারে না। উল্লিখিত কার্য্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোধ হইবে যে, অনেক প্রকারের সুখ অপরের উপর নির্ভর করে, অনেক সুখ প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সমাজের অবস্থা এবং নৈসর্গিক প্রকৃতি অনুকূল না হইলে সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ করা যাইতে পারে না।

যদি সম্পূর্ণ সুখী হওয়া অসম্ভব হইল, এক্ষণে দেখা উচিত, কি কি কার্য্যে সর্ব্বাধিক সুখ পাওয়া যায়। এই বিষয়টি আমরা অপর এক প্রবন্ধে আলোচনা করিব। তাহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিব, ঐ সমস্ত কার্য্যের কোন্ কোন্ গুলি দ্বারা কোন্ কোন্ গুলির অভাব মোচন করা যাইতে পারে, এবং যতদূর সম্ভব সুখী হওয়ার জন্য, কোন্ কোন্ কার্য্য একান্ত আবশ্যক। আপাততঃ দেখিতে গেলে বোধ হয় যে, ১ম এবং ৮ম সংখ্যক কার্য্য দ্বারাই মনুষ্য অন্য সকল প্রকার সুখের অভাব মোচন করিতে পারে। আমরা ভবিষ্যতে অনুসন্ধান করিব ইহা ঠিক কি না, এবং ঠিক হইলে, ইহা দ্বারাই যতদূর সম্ভব সুখ পাওয়া যায় কি না।

উল্লিখিত কার্য্যসমূহের যে প্রকৃতি বর্ণনা করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা পাঠক নিজে নিজেই তাহাদের গুণের তারতম্য করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে আমরা এবিষয়টি আংশিক সমালোচনা করিব।

সম্প্রতি উক্ত দশ শ্রেণীস্থ কার্য্য করিতে কি কি উপকরণ আবশ্যক, তাহা দেখা যাউক। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় চারিটি প্রধান উপকরণ আবশ্যক; ১ম স্বাস্থ্য, ২য় স্বাধীনতা, ৩য় ধন, ৪র্থ জ্ঞান।

স্বাস্থ্য অভাবে উক্ত দশবিধ কার্য্যের

কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। উদাহরণ অনাবশ্যক। সুতরাং সুখের স্বাস্থ্যই প্রধান উপকরণ। স্বাস্থ্য সুখের প্রধান উপকরণ বলিয়া, ইহাকেও এক প্রকার মিশ্র সুখ বলা যায়। যেমন নির্ধন ব্যক্তি ধনী মাত্রকেই সুখী মনে করে; তদ্রূপ চিররোগী ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তিমাত্রকেই সুখী মনে করে। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

সুখের দ্বিতীয় উপকরণ স্বাধীনতা। স্বাধীন না হইলে মনুষ্য এক ৮ম শ্রেণীস্থ কার্য্যোৎপন্ন সুখ ভিন্ন আর কোন সুখই আস্বাদন করিতে পারে না। স্বাধীনতার মাত্রা আছে। কোন কোন বিষয়ে স্বাধীনতার অভাবে কোন কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু অন্য কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার উদাহরণ প্রত্যেকেই আপনা হইতে দিতে পারেন; সুতরাং এস্থলে তাহা বলা অনাবশ্যক।

সুখের তৃতীয় উপকরণ ধন। ধনের সম্পূর্ণ অভাবে ৪র্থ, ৭ম, ৮ম ও ১০ম শ্রেণীস্থ কোন কোন কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য করা যায় না। সামান্য পরিমাণে ধন থাকিলে আরও বহু কার্য্য করা যায়।

সুখের চতুর্থ উপকরণ জ্ঞান। স্বাধীনতা ও ধন না থাকিলেও স্বাস্থ্য ও জ্ঞান দ্বারা অনেক কার্য্য করিতে পারা যায়।

স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, সুখ ও জ্ঞান এই উপকরণ চতুষ্টয় বর্ত্তমান থাকিলে, সকল প্রকার সুখই সম্ভোগ করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সুখ কেবল নিজের উপরই নির্ভর করে না বলিয়া, ইহাতেও কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। ভালবাসা প্রবৃত্তিকে ইহার কোন্ উপকরণ দ্বারা শান্ত করা যায়?

ধন ও জ্ঞান এতদুভয়ের কোন্‌টি অধিকতর বাঞ্ছনীয়, তাহাও আমরা পর প্রবন্ধে আলোচনা করিব। সুখসমূহের তারতম্য করিবার পূর্ব্বে, তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই।

বিবাহ ও ব্যাকরণ-রহস্য।

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র এক অতলস্পর্শ, অপার জলধি। উহা শুধু ব্যাকরণ কিংবা ভাষাবিজ্ঞান নহে। উহার অভ্যন্তরে স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, ভোগশাস্ত্র এবং ইতিহাসাদি আরও বহুশাস্ত্রের নিগূঢ়-রহস্য নিহিত রহিয়াছে, এবং অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, আধুনিক সমাজতন্ত্রের অনেক আবশ্যকীয় কথাও উহার অন্তস্তলে উপলখণ্ডের ন্যায় লুক্কায়িত আছে।

দুহিতা শব্দের ব্যুৎপত্তিতে এই কথার নিদর্শন দেখ। ব্যাকরণে যাঁহার সামান্য দৃষ্টি আছে, তিনিই জানেন যে, দুহিতা এই শব্দটি দুহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এবং দুহ ধাতুর অর্থ দোহন। ইয়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ শাব্দিকেরা এই দুহ ধাতুর উপর দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যখন

প্রাচীন আর্য্যসন্তানেরা কৃষি কার্য্যের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন, তখন তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই গোস্বামী অর্থাৎ বহু সংখ্য গোরুর অধিপতি ছিলেন। গৃহস্থ সমস্ত দিন ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিতেন, কন্যা গৃহে থাকিয়া গোদোহনে ব্যাপৃত রহিতেন। এই নিমিত্তই গৃহস্থের নাম ক্ষেত্রপাল, এবং এই নিমিত্তই কন্যার নাম দুহিতা। জ্ঞানানন্দ সরস্বতীও দুহ ধাতুকেই দুহিতা শব্দের মূল বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি অন্যরূপে ধাত্বর্থের ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার মতে পিতৃকুলরূপ কামধেনুকে দোহন করাই দুহিতার প্রধান কার্য্য এবং যিনি পিতৃকুলকে যে পরিমাণে অধিক দোহন করিতে পারেন,তিনিই সেই পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দুহিতা*। ইহার কোন্ অর্থ অধিকতর সঙ্গত, তাহা লইয়া এইক্ষণ বিচার কি বিতণ্ডা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ইহার যে অর্থই স্বীকার কর, তোমাকে অবশ্যই ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, ব্যাকরণশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবেই সমাজবিজ্ঞানের ধ্রুবাপ্রদীপ।

বিবাহ সম্বন্ধেও ব্যাকরণে এইরূপ অনেক মৌলিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। বিবাহ কি? বিবাহ কেন? বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে? এই সকল কথা লইয়া সকলেই ইতিহাসাদি অন্ধশাস্ত্রের আলোড়ন করিয়া থাকেন, এবং ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কেহই ব্যাকরণের উজ্জ্বল আলোকে এই জটিল বিষয়ের মূলতত্ত্ব পাঠ করিতে যত্নপর হন না। কিন্তু আমার এইরূপ বোধ হয় যে, ব্যাকরণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে উল্লিখিত সমস্যাত্রয়ের মীমাংসা করিতে মুহূর্ত্তেরও বিলম্ব হয় না।

ব্যাকরণের মতে বিবাহ কি?—না, প্রবাহ। বিবাহে জীবপ্রবাহ, বিবাহে সংসারপ্রবাহ এবং বিবাহেই সাংসারিক সুখ দুঃখের চিরপ্রবাহ। বিবাহ না থাকিলে এই সৃষ্টিপ্রবাহ প্রস্রবণেই শুকাইয়া যাইত, জীব ও জীবনের প্রবাহ নিরুদ্ধ রহিত, এবং বিশ্বজগতের পরমাণুপুঞ্জ উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত্তে অনন্তকাল নৃত্য করিত। সুতরাং বিবাহই জীবপ্রবাহ। বিবাহ না থাকিলে, এই সংসারে লতা থাকিত না, পাতা থাকিত না, ফুল থাকিত না, ফল থাকিত না, বন থাকিত না, উদ্যান থাকিত না, বনে বৃক্ষ থাকিত না, উদ্যানে অঙ্কুরের উদ্গম থাকিত না, জলে মাছ থাকিত না, আকাশে পাখী উড়িত না, সুতরাং বিবাহই এই সংসার* এবং সাংসারিক সম্পদ ও সৌন্দ-

* যাঁহারা পতিকুলরূপ কামধেনুকেও পিতৃকুলবৎ দুহিতার ভাবে দোহন করেন, তাঁহাদিগকে কি বলা যায় এই কথাপ্রসঙ্গে কাতন্ত্রপঞ্জীর পঞ্চম প্রকরণে নানারূপ কূটপ্রশ্ন দৃষ্ট হয়।

* আপনার কয় বিবাহ এইরূপ প্রশ্ন না করিয়া আপনার কয় সংসার, এইরূপ প্রশ্ন করাই প্রাচীনরীতিসঙ্গত ছিল। কিন্তু সংসার শব্দ যে এস্থলে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য।

র্য্যের আদি প্রবাহ; * বিবাহ না থাকিলে প্রেমিকের প্রেম থাকিত না, বিরহীর বিরহ থাকিত না; † পৃথিবীতে পরিবার-বন্ধন এবং পারিবারিক সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ কিছুই থাকিত না, সুতরাং বিবাহই সুখ দুঃখের চিরপ্রবাহ। উহা কাহারও ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপ্রবাহ, এবং অনেকের ভাগ্যে সুখদুঃখের মিশ্রিতপ্রবাহ। কিন্তু উহা যে সর্ব্বাংশেই একটি তরতরবাহি অথবা মন্থরগামী প্রবাহ, জ্যোৎস্নার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত অথবা অন্ধকারের অবসাদে আবৃত সজীব প্রবাহ, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং বিবাহই সাংসারিক সুখদুঃখের চিরপ্রবাহ।

বিবাহ কেন? অর্থাৎ বিবাহের মূল উদ্দেশ্য কি?—না, নির্ব্বাহ। বিনা বিবাহে মনুষ্যের জীবন-নির্ব্বাহের কিছুই সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখ। যাহাকে সাধারণ লোকে সাধারণতঃ জীবনযাত্রা বলে, আমি শুধু তাহারই কথা বলিতেছি না। কিন্তু পৃথিবীর অসাধারণ লোকেরা অসাধারণভাবে ‡ যাহাকে জীবনের চরমলক্ষ্য ও পরমগতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারও নির্ব্বাহ বিষয়ে বিবাহই প্রধানতম সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, বিবাহেই মনুষ্যের নির্ব্বাহ,—আশার নির্ব্বাহ, আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাহ, জীবনযাত্রার নির্ব্বাহ, জীবনের উন্নতি ও গতি এবং নিত্য নূতন বিকাশ ও বিবর্ত্তের নির্ব্বাহ।

বহুবিবাহ যাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্যবসায় অর্থাৎ যাঁহারা দালালি ও ঘটকালি কিংবা ওমেদারি ও চাটুকারি প্রভৃতি কোনরূপ সম্ভ্রান্ত বিষয়কার্য্য অথবা সভ্যমহলে কথার, নব্যমহলে মদের ও অভব্য ছেলেমহলে সুদের বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুই না করিয়া বিবাহের প্রসাদাৎই পঞ্চব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং যাঁহারা নিজ নিজ পত্নীদিগকে পত্তনীতালুক মনে করিয়া খাতায় তাঁহাদিগের নাম ধাম ও আয় ব্যয়ের তালিকা রাখেন, তাঁহারা হয় ত সাধারণ মতেরই পোষকতা করিয়া বলিবেন যে, বিবাহই যে নির্ব্বাহ এই স্বতঃসিদ্ধ ও চিরপ্রসিদ্ধ কথার প্রামাণিক-

---

* পাঠকের ইচ্ছা হইলে ব্যাকরণের এই সমস্ত কথার সহিত বিজ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত নূতন দর্শনাদি শাস্ত্রের ব্যবস্থা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

† এখানে প্রেম ও বিরহের অনুরোধে বিবাহ শব্দের অর্থ একটুকু সম্প্রসারিত হইয়াছে। কেন না, ব্রজলীলায় বিবাহের নামগন্ধও ছিল না, কিন্তু প্রেম ও বিরহের অত্যধিক প্রাচুর্য্য ছিল।

‡ পূর্ব্বতন দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটো, অধ্যাত্মবাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে সুইডেনবর্গ এবং আধুনিক মনস্বিসমাজের অগ্রগণ্য চালক কোম্‌ট ও মিলের লেখা এবং এই শেষোক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের জীবনচরিতের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার মর্ম্মার্থ স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

তার জন্য এত পুঁথি পত্র এবং এত লেখক ও ভাবুকের নাম করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নটি আপাততঃ নিতান্ত সহজ বোধ না হইতে পারে। কিন্তু আমি প্রথমেই ইঙ্গিতে ইহার উত্তর করিয়াছি এবং এইক্ষণ স্পষ্টতার অনুরোধে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, নির্ব্বাহ বলিলে তাঁহারা যাহা বুঝেন, জ্ঞানভ্রান্ত অসাধারণেরা তাহা বুঝেন না। প্রাচীন শাস্ত্রভ্রান্তেরা ভার্য্যাকে শরীরার্দ্ধ * মনে করিয়া জীবননির্ব্বাহের যেরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, আমিও এস্থলে প্রেমভ্রান্তিতে নির্ব্বাহ শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। যদি তাহা না করিয়া শাল বনাত, খাট পালঙ, গাড়ি ঘোড়া, বাড়ি ঘর, অথবা দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণালাভকেই নির্ব্বাহ বলিয়া স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে আমি বিবাহের পরিবর্ত্তে অন্য কোন অক্লেশসাধ্য ব্যবসায়ের জন্যও ব্যবস্থা দিতে পারিতাম।

ইহার পর আর এক প্রশ্ন রহিয়াছে, বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে? ব্যাকরণের উত্তর,—সংবাহে। সংবাহ শব্দের প্রচলিত অর্থ পাদমর্দ্দন। ব্যাকরণের এই ব্যবস্থাটি পাঠকবর্গের বড়ই অপ্রীতিকর জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ, তাঁহারা সরলহৃদয়ে স্বীকার করিবেন যে, পৃথিবীতে যেরূপ বিবাহ এইক্ষণ প্রচলিত রহিয়াছে, পাদমর্দ্দনে অথবা পাদবন্দনেই তাহার পরিণাম। বিবাহে পত্নী পতির দাসী, অথবা পতি পত্নীর দাস। কেন না, বিবাহ বিষয়ে জগতে সর্ব্বাঙ্গীন সাম্যবিধির এখনও প্রচলন হয় নাই। যেখানে পত্নী পতির সেবাদাসী, সেখানে পাদসেবাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম এবং আহার ও বিহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রহার অথবা সংহারই † তাঁহার শেষ দক্ষিণা। আর, জামাইবারিকের চিড়িয়াখানা প্রভৃতি যে যে স্থলে পতিটি পত্নীর ক্রীতদাস, সেখানেও পাদলেহন, পাদসেবন ও পাদমর্দ্দনই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য, এবং মধ্যে মধ্যে প্রণয়জলধির প্রলয়োচ্ছ্বাস স্বরূপ পদাঘাতই তাঁহার প্রধান দক্ষিণা। যেখানে প্রীতির সম্যক্ বিকাশ এবং প্রণয়জনিত সাম্যাবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়, সেখানেও কি পাদসংবাহ-রূপ কুৎসিত অথবা কমনীয় নীতির সম্যক্ উন্মূলন হইয়া থাকে? শাস্ত্রে এমন লিখে না।

* "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।"

† এখানে অনুপ্রাসরূপ উপসর্গের অনুরোধে প্রহারের সঙ্গে সংহার আসিয়া পড়িয়াছে। যথা,—

উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে
প্রহারাহার সংহার-বিহার-পরিহারবৎ।

কিন্তু যেখানে চারিত্রগত উপসর্গ একটু বেশি প্রবল, সেখানেও যে আহারবিহারের সঙ্গে প্রহার এবং প্রহারের সঙ্গে সংহার কি পরিহার আসিয়া উপস্থিত না হয়, এমন কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি না। যাঁহারা ইংরেজী বিনা বুঝেন না, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, পরিহার মানে Divorce.

জয়দেবের গীতিগোবিন্দে আছে,—

"মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

ভবভূতি রামচন্দ্রের প্রণয়বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন, "দেবি! দেবি! অয়ং পশ্চিমস্তে রামশিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ।" *

সুতরাং ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কি ভাল অর্থে, কি মন্দ অর্থে, কি বিবাহ বন্ধনের উৎকর্ষে কি উহার অপকর্ষে, কি প্রীতির পূর্ণবিকাশে কি প্রীতির অপূর্ণ আভাসে, সকল স্থলে এবং সকল অবস্থাতেই বিবাহের শেষ পরিণতি সংবাহ। যদি তুমি একটা বড়ই কিছু হও, তাহা হইলে তিনি তোমার পদসংবাহ করিতেছেন, এবং যদি তিনি একটা বড়ই কিছু হন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার পদসংবাহ করিতেছ। অথবা, যেখানে উভয়ে উভয়ের সমান, সেখানে উভয়েই উভয়ের সংবাহসুখে বিবাহের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নবান্ আছ।

ব্যাকরণে আরও এই এক গুরুতর কথা জানা যাইতেছে যে, প্রবাহ—নির্ব্বাহ—সংবাহ এই যে বিবাহবন্ধনের তিন ভাব অথবা তিন অবস্থা ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে, এই তিনেরই মূল ধাতু বহ অর্থাৎ বহন। সুতরাং ইহা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে যে, যখন বিনা বাহনে বহন হয় না, তখন যেই তুমি বিবাহ করিলে, অমনি তুমি বাহন হইলে। আগে বিযুক্ত এবং অতএবই উন্মুক্ত মনুষ্য ছিলে, বিবাহের পরক্ষণ হইতেই নিযুক্ত এবং অতএবই ভারযুক্ত বাহন বনিলে। আগে পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতে, জলের মত হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যাইতে, বিবাহের পরমুহূর্ত্ত হইতেই কিবা জীবনের প্রবাহে, কিবা জীবনযাত্রার নির্ব্বাহে সকল ভাবেই পরের ভার হৃদয়ে লইলে,—আপনার সুখ দুঃখ এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্ব্বহ ভারের সঙ্গে সঙ্গে পরের সুখ দুঃখ এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকতর দুর্ব্বহ, দুর্ব্বিষহ আর এক নূতন ভার মাথায় লইয়া সংসারের কাঁটাবনে পাদচারণা করিতে আরম্ভ করিলে।

এই অবস্থা নিতান্তই বাঞ্ছনীয় কি? বাঞ্ছনীয় না হইলে সকলেই ঐ প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া জীবননির্ব্বাহের উপায় দেখিতেছে কেন? এবং যেখানে প্রীতির প্রবাহ কিংবা জীবনযাত্রার সাধারণ কি অসাধারণ নির্ব্বাহ, এই দুইয়ের একও সম্ভবপর নহে, সেখানে পরকীয় পদসংবাহসুখে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মাবমাননা করিতেছে কি জন্য? কিন্তু তথাপি কেন জানি না, এই প্রবাহ অথবা নির্ব্বাহ ইহার কিছুতেই আমার চিত্তের স্ফূর্ত্তি হয় না। আমি এক দিন প্রলাপে বলিয়াছি যে, আমি কখনই বিবাহ করিব না। আজি ব্যাকরণের বিজ্ঞানসূত্র সম্মুখে লইয়া সেই কথাই পুনরায় বলিতেছি,—আমি বিবাহ করিব না। আমার মুখ্য ভয় ঐ সংবাহে।

---

* এই টুকু পড়িলেই বোধ হয় যে, 'রামশিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ' রূপ ব্যাপারটা সেই সীতাগতপ্রাণ পুরুষপ্রবরের জীবনসূত্রের সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। নতুবা কবি পশ্চিম শব্দের প্রয়োগ করিতেন না।

আমি কোনও মতেই কাহারও বাহন হইতে রাজি নহি। অনেকে আপনি কাহারও বাহন না হইয়া অন্যকে আপনার বাহন বানাইতে পারিলে বড়ই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু এ-নীতির নাম কণিক নীতি। ইহা গরলময়ী। আমার অমৃতপিপাসু প্রাণ এইরূপ বিষাক্ত বিধির পক্ষপাতি নহে। আমি আপনি অন্যের বাহন হইতেও যেমত অসম্মত, অন্যকে আমার জীবনপ্রবাহের বাহন বানাইতেও তেমনই বিরক্ত। সুতরাং বিবাহ ও বিবাহের ব্যাকরণ আমার জন্য নহে। আমি পরকীয় ব্যাকরণের টীকাকার। আমি আজিও যেমন একা আছি, চিরদিনই এমনি একা রহিব,—এবং একা থাকিয়া এই ভাবে, এইরূপে, ব্যাকরণাদি বিবিধশাস্ত্রের টীকা লিখিব।

ভারতীয় ধর্ম্মনীতি।

পরিবর্ত্তনই এই বিপুল বিশ্বের নিয়ম; এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরমাণু হইতে, বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর হিমাদ্রিমালা পর্য্যন্ত সমুদায়ই প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর আণবিক জগৎ, কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর হইতে বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর জড়জগৎ, কি নিয়মিত-জ্ঞান সমন্বিত ইতরপ্রাণিজগৎ, কি বিবেক-বুদ্ধির আধার উৎকৃষ্ট মানবজগৎ সমুদায়ই এই মূল নিয়মের অধীন। পরিবর্ত্তন ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিই মানবীয় জগতের মূলমন্ত্র; পৃথিবী যতই বয়োধিকা হইতেছেন মনুষ্যজগৎও ততই নানাবিধ অলৌকিক জ্ঞানে বিভূষিত হইয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতি সংসাধন করিতেছেন। মনুষ্যজগৎ এক সময়ে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া তাহার সম্মুখে নতশির হইতেন —কোন কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের কৃপাকণালাভের নিমিত্ত লালায়িত হইতেন, এক্ষণে সেই সকল প্রাকৃতিক পদার্থের উপরেই তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। সে সকল আর মনুষ্যশক্তির নিকট আপনাদের পূর্ব্বপ্রভাব রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সূর্য্য চন্দ্র, বায়ু ইন্দ্র, চপলা হুতাশন প্রভৃতি সকলেই এক্ষণে মনুষ্যের দাসদাসীরূপে তাঁহাদের সেবা করিতেছে। মনুষ্যের ইচ্ছা উন্নতির দিকে—চেষ্টা উন্নতির দিকে—কার্য্য উন্নতির দিকে, সুতরাং তাঁহারা যে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাহাতেই মানবজগতের যে দিকেই দেখি তাহাতেই উন্নতি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না।

মনুষ্য সাধারণতঃ আপনার ইষ্টপ্রার্থী; যাহাতে তাঁহার মন শান্তিসুখলাভ করে তাহাই তাঁহার আন্তরিক প্রবৃত্তি; সুখলিপ্সা

মনুষ্যের হৃদয় হইতে তিলার্দ্ধ সময়ের জন্য অপসৃত হয় না; মনুষ্য সতত সুখ চায় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি চায়। এই উন্নতি কামনারূপ বীজ সকল মনুষ্য-অন্তরেই নিহিত আছে; কিন্তু সকল সময়ে তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। যেরূপ শস্যবীজ ভূমির রীতিমত আবাদ না হইলে অঙ্কুরোৎপাদন করে না, মনুষ্যের অন্তর্নিহিত উন্নতিবীজ সেইরূপ উচিতমত সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে অঙ্কুরিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না, কোন রূপে মনুষ্যসমাজের প্রপীড়নই এই বীজের আবাদ। এই প্রপীড়ন জনিত পরস্পর সংঘর্ষণেই এই বীজ কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্যহৃদয় সততই প্রলোভন-প্রবণ; আপাতমধুর পাপকার্য্যে মন যত শীঘ্র ছুটিয়া যাইতে চায়, আপাত-ক্লেশকর পরিণামসুধাময় কার্য্যে মন তত আকৃষ্ট হয় না। এই জন্যই মনুষ্যকুল সময়ে সময়ে অবনতির অধোভাগে যাইয়া পড়িয়াছেন, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু মানবহৃদয় মন্দির-স্থিত পুণ্যের প্রভা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লুক্কায়িত থাকিলেও ক্রমিক সংঘর্ষণে তাহা আপনার পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয় ও মানবকুলকে আপনার সুবর্ণসোপান দিয়া আনিতে সচেষ্ট হয় তাহাই সর্ব্বজনীন মূল নিয়ম। ইতিহাস ইহার প্রধান সাক্ষী; সেই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রথমে কেবল সীমানাতঃ ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সেই ধর্ম্মসম্প্রদায় কোন প্রকারে রাজা কিংবা অপরের নিকট হইতে কোন প্রকার অত্যাচার প্রাপ্ত হইলে নানাবিধ সংঘর্ষণে ভয়ানক বলপ্রাপ্ত হয়; এবং এইরূপে বলপ্রাপ্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিশেষে অতীব দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেও সমর্থ হয়। ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই পিউরিটানগণ প্রাদুর্ভূত হন, কিন্তু তাঁহারা প্রথমে ধর্ম্ম সম্প্রদায় মাত্র ছিলেন; ক্রমে রাজার অত্যাচার তাঁহাদের উপর নিপতিত হইল—সেই অত্যাচারে তাঁহাদের ধর্ম্মে বলাধান হইতে লাগিল; সেই বলপ্রাপ্ত সমাজের ফল প্রথম চার্লসের অপমৃত্যু ও সাধারণতন্ত্রের (Commonwealth) সৃষ্টি সাধন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও ঠিক্ সেইরূপই ঘটিয়াছে। আমরা অদ্য রাজনীতিসংক্রান্ত কোন বিষয়েরই উল্লেখ না করিয়া একবার ভারতীয় ধর্ম্মনীতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিব; দেখিব ভারতীয়গণ আপনাদের ধর্ম্মরাজ্যে কিরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈদিকধর্ম্মই ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম ধর্ম্ম; বৈদিকধর্ম্ম কেবল ভারতীয় আর্য্যগণের কেন, পৃথিবীর আর্য্যবংশসমুদ্ভূত যাবতীয় জাতিরই মূলধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম মানব সমাজের আদিম অবস্থার ধর্ম্ম। পৃথিবীর মনুষ্যগণ যে সকল দেবতার অর্চ্চনা করিতেন বেদে তাহারই বর্ণনা আছে; আদিম সমাজের সরল-প্রকৃতিক মনুষ্যহৃদয়ের সরলধর্ম্ম বেদের সর্ব্বস্ব; বৈদিক সময়ে মনুষ্যসমাজে কলুষিত বৃত্তিনিচয় স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং ইহার সকল স্থলেই অমায়িকতা সকল স্থলেই সরলতা ভিন্ন আর কিছুই

দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সুবর্ণ-সময়ে মনুষ্যগণ আপনাদের উপকারী সমুদায় পদার্থেই দেবতার আরোপ ও তাঁহাদের যথারীতি পূজার্চ্চনা করিতেন এবং অপকারী পদার্থ মাত্রকেই তাঁহারা শত্রুজ্ঞান ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বৈদিক ঋষিগণ স্বহস্তে মৃত্তিকাকর্ষণ ও পশুপালন দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন; কৃষিকার্য্য করিতে হইলে বৃষ্টিজলের প্রয়োজন; বিশেষতঃ তাঁহারা যে স্থানে আসিয়া প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তাহা নদীমাতৃক দেশ নহে—দেবমাতৃক দেশ; সুতরাং কৃষিকার্য্য করিতে হইলে বৃষ্টিজলের প্রয়োজন হইত; তাই বৃষ্টিজলের আবশ্যকতা হইলে তাঁহারা বৃষ্টি-দেবতার অর্চ্চনা করিতেন; এই দেবতার তাঁহারা ইন্দ্র নামকরণ করেন। এই রূপে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, উষা, সোম প্রভৃতি সকলকেই দেবতা জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিতেন। কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল ও দৃঢ় সমাজের ফল; বৈদিক ঋষিগণ এইরূপ সুশৃঙ্খল ও দৃঢ়বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় মৃগয়ালব্ধ বন্যপশু হনন দ্বারা কালাতিবাহিত করিতেন; সমাজ কতকটা শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া আসিলে তাঁহারা পশুপালন আরম্ভ করেন; মৃগয়া দ্বারা বন্য পশু ধরিতে হইলে যে প্রতিদিনই কোন না কোন পশু পাওয়া যাইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; হয় ত কোন দিন কোন প্রকার পশু মিলিতে না পারে; কিন্তু পশুপালন করিলে আর সেরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই বৈদিক ঋষিগণ পশুপালনে প্রবৃত্ত হন এবং সেই পোষিত পশুমাংসেই উদর পূরণ করিতেন; সুতরাং সে সময়ে পশুবধ কোন প্রকার পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। যৎকালে পশুমাংস ভিন্ন প্রাণধারণের অন্য কোন উপায়ই ছিলনা তখন সেই পশুবধ কোন প্রকারে অবৈধ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; তাই বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিকার্য্য পশুরক্তে রঞ্জিত—বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি গ্রন্থই পশুরক্তে আলিখিত। সমাজ যখন পশুমাংসে প্রতিপালিত, বৈদিকধর্ম্ম সেই সমাজের ধর্ম্ম। তখন জাতিভেদ ছিল না; ব্রাহ্মণ শূদ্র, মহৎ ক্ষুদ্র সকলেই সমান; ধর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার ছিল। তখন জাতিগত প্রাধান্য ছিল না; কার্য্যগত—চরিত্রগত—বিদ্যাগত প্রাধান্য ছিল; সেই অনিন্দিত সমাজ কি সুখাবহ কি মনোহর ছিল। ক্রমে বৈদিকধর্ম্মে নানা অবান্তর প্রবেশপথ পাইল; ক্রমে সমাজের জ্ঞানিগণ আপনাদিগকে অন্য সকল হইতে পৃথক্ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; বলবান্, দুর্ব্বল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। এই রূপে সেই অনিন্দিত সমাজে পৃথক্ সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ লাভ করিল; এই পৃথক পৃথক সম্প্রদায় শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে আর তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইল না; জ্ঞানীর সন্তান নিজে জ্ঞানী না হইলেও জ্ঞানীর মান পাইতে লাগিলেন; বলবানের পুত্র দুর্ব্বল হইলেও বলবানেরই মান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন; এইরূপে ক্রমে সমাজে নানা জাতিপ্রথা স্থানলাভ করিল—এই

রূপে ভারতীয় আর্য্যসমাজে সকল অনর্থের মুল জাতিভেদপ্রথা বদ্ধমুল হইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ সকলের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইলেন—অন্যান্য সকল জাতিই তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ রটনা করিতে লাগিলেন; সেই অনিন্দিত ধর্ম্ম তখন আর বৈদিকধর্ম্ম রহিল না—তাহা তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণগণ যাহাই লিখিবেন তাহাই শাস্ত্র, যাহা বলিবেন তাহাই বেদবৎ পূজনীয়; তখন স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা ধর্ম্মবিরুদ্ধ—বলিলে সে ব্যক্তি পাষণ্ড, নরাধম ও মহাপাপী। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ এই স্বার্থপর ধর্ম্মের ভিতর পড়িয়া পাদদলিত হইলেন—সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্যান্য সকলেই নির্বীর্য্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন—সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণ এইরূপে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহামুনি শাক্যসিংহ জ্ঞানাস্ত্র লইয়া এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন; তিনি হিমালয়ের ঊর্দ্ধতন প্রদেশ হইতে ভীম "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে ভারতীয়গণকে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন; স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণ তাহার সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে স্তম্ভিত-মূর্চ্ছিত ও জীবন্মৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্য কোন আশাই রহিল না; হিমালয় হইতে কুমারিকা, ব্রহ্ম হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত সকলেই একবার মস্তকোত্তোলন করিলেন—সকলেই একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন। দেখিলেন আর ঘোরান্ধকার নাই; হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি প্রজ্বলিত শিখা দেখা যাইতেছে। ভারতীয়গণ আর একবার উঠিয়া বসিতে পাইলেন; স্বার্থপর ব্রাহ্মণের স্বার্থসাধনোদ্দেশে যেসকল জাতি এতদিন শয্যাগত ছিল, তাহারা আর একবার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া চারিদিকে নূতন প্রভা—নূতন কিরণ—নূতন দেশ—নূতন রাজ, সকলই নূতন দেখিতে পাইলেন। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম কিছুদিনের জন্য ভারত-গগন ছাড়িয়া পলায়ন করিলে, ভারতীয়গণ আর একবার সকলকে 'ভাই ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পাইলেন; যে ভ্রাতৃস্নেহ ভ্রাতৃভাব বহুকাল পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে, পুনরায় সেই ভ্রাতৃভাব সমুপস্থিত হইল। আর একবার সকলে মিলিয়া প্রাণপণে জাতীয় উন্নতির দিকে ছুটিল, সমাজবন্ধন দৃঢ়ীকৃত হইল। কিন্তু চিরকৌশলী ব্রাহ্মণ শাক্য সিংহের উদয় অবধি তাহার নূতন প্রভাব নিকট তিষ্ঠিতে না পারিয়া অন্তরে অন্তরে তাহার প্রভাব কমাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, আপনাদের নানাবিধ পুরাণে তাঁহার আসিবার কথা উল্লেখ করিতেছিলেন, তাঁহারা শেষে বুদ্ধদেবকে আপনাদের অবতার বলিয়া গণ্য করিয়া লইলেন, তাঁহারা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে মায়ামোহ বলিয়া উক্ত করিলেন; এবং বিষ্ণুপুরাণে লিখিলেন, অসুরগণকে ধর্ম্মবিচ্যুত করিয়া দেবগণের অনায়াস-বধ্য করিবার জন্যই নারায়ণ বুদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্যায়

ধর্ম্মের বিধান করিয়াছিলেন ; চিরকৌশলী ব্রাহ্মণের এবংবিধ কৌশল-জালই পরিশেষে জয়লাভ করিল। বুদ্ধদেব ভারত-গগন ছাড়িয়া দূরদেশে গমন করিলেন। আবার ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন—আবার ভারতময় সেই জড়ভাব ছড়াইয়া পড়িল—আবার ভারতীয় গণ নিস্তেজপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এবার যদিও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জয়লাভ করিল বটে, তত্রাপি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল নীতি লোকের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে সে গুলি আর কিছুতেই অন্তর্হিত হইল না। এবং বুদ্ধদেব সমাজে যে প্রভা বিকীর্ণ করিয়া গেলেন তাহাতেই পরবর্ত্তী উন্নতমনা সংস্কারকগণের ধর্ম্মসংস্কারের পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের পরও ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু বুদ্ধদেব প্রায় সকলেরই চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন ; তিনি যদিও শেষে ভস্মে পরিণত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভস্ম হইতে শত শত বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিবার সূত্রপাত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া সুদূর সিংহল, ব্রহ্ম, চীন, তিব্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল ; আর একটিও বৌদ্ধ যতি ভারতভূমির শোভা সম্বর্দ্ধন করিল না। যৎকালে শঙ্করাচার্য্য ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন, তৎকালে তিনি দুই চারিটি মনস্বী ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী লোক দেখিতে পান নাই ; তখন প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষই পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধীন হইয়াছে ;—তখন বুদ্ধদেব সম্পূর্ণরূপে ভারতগগন ছাড়িয়া দূরতর দেশে গমন করিয়াছেন ; তথায় আপনার প্রভা বিকীর্ণ করিতেছেন—সেই সকল দেশ উন্নতির দিকে ছুটিতেছে, আর যে স্থানে ইহার জন্ম সেই স্থান ক্রমে অন্ধকারময় হইয়া আসিতে লাগিল। তত্রাপি তদানীন্তন হিন্দুধর্ম্মে ত্রিংশৎ ত্রিকোটি-দেবদেবী প্রবেশ লাভ করেন নাই। ব্রাহ্মণগণই তদানীন্তন ধর্ম্মোপদেষ্টা ; তাঁহারা যাহা বলিতেন, তাঁহারা যাহা করিতেন, তাহাই ধর্ম্ম ; তাঁহাদের উপর অন্য কাহারও কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা নাই ; অন্য দেবদেবীর পূজার্চ্চনার প্রয়োজন নাই—ব্রাহ্মণ সেবা করিতে পারিলেই ধর্ম্মকর্ম্মের চূড়ান্ত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম অবসানের পর এই প্রকার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মরূপ সূর্য্য অনেক দিন ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মরূপ প্রবল মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল—মেঘ সহজে অন্তর্হিত হইতেছিল না—সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অনেক দিন ধরিয়া অন্তরে অন্তরে ফুলিতেছিল—অন্তরে অন্তরে মেঘান্তরিত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিল—মেঘান্তরিত হইলে কিরূপে সমাজকে ওষ্ঠেপৃষ্ঠে বন্ধন করিতে হইবে তাহারই কল্পনা করিতেছিল ; এক্ষণে সেই প্রবল মেঘ অন্তর্হিত হইয়াছে—ভারতগগনে আর বাষ্পবিন্দুর লেশ মাত্র অবশিষ্ট নাই ; তাই মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম একেবারে রৌদ্রমূর্ত্তিতে ভারতাকাশে সমুদিত হইল—হইয়া

সকলের নয়ন ঝলসিয়া দিতে লাগিল—সকলেই ইহার এই পরিবর্দ্ধিত তেজের নিকট অবনত-মস্তক হইল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ব্বে যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয় নাই অনেক দিন ধরিয়া উপায় কল্পনার পর এক্ষণে তাহাতেও কৃতকার্য্য হইল; কিন্তু এতাদৃশ উন্নতিই ইহার অধঃপতনের কারণ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনরায় ভয়ানক তেজে যেমন সমুদিত হইল অমনি তাহার মূল কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল; যে ধর্ম্ম সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অটল-অচলভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহার মূলদেশ কিঞ্চিৎ বিকম্পিত হইল; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এই প্রবলরূপে উত্থানই তাহার পতনের—তাহার সর্ব্বনাশের মূল হইল; এই অভ্যুত্থানই সঙ্গে সঙ্গে ইহার পতনবীজ আনয়ন করিল। কেন না ভারতীয়গণ আর ব্রাহ্মণোপাসনায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না; নানা বিদেশীয়—নানা বিধর্ম্মী লোকের সহিত সংস্রবে এবং বিজাতীয়গণের উপাসনা-প্রণালী সন্দর্শনে সাধারণ লোকে আর কেবল ব্রাহ্মণের সেবায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; মনুষ্যগণ আপনাপন প্রবৃত্তিমত পূজা করিবার জন্য সমুৎসুক হইল; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় একমাত্র লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল; কিন্তু কেবল মাত্র লিঙ্গপূজায় লোকের মন আর তত প্রফুল্ল হইতে পারিল না; সকলেই স্ব স্ব সন্তোষ-বিধায়ক দেবদেবীর উপাসনার জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে নির্জ্জনে একাকী উপাসনাদি করিতেন—বৌদ্ধযতিগণ সাধারণ স্থানে সমবেত হইয়া—নানাজন,সমবেত হইয়া দেবার্চ্চনা করিতেন; ব্রাহ্মণঋষি সকল লোক হইতেই নির্লিপ্ত থাকিতেন—বৌদ্ধসন্ন্যাসী বহুবিধ লোকে সম্পৃক্ত হইতেন; ব্রাহ্মণঋষি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে যথারীতি গার্হস্থধর্ম্ম প্রতিপালন ককরিতেন—বৌদ্ধযতি সমুদায় সাংসারিক সুখকে অবজ্ঞা করিতেন; এই সকল পরস্পরবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনে লোকের মন পূর্ব্ব হইতেই দোলায়মান হইয়াছিল; সমাজের এই দোলায়মানচিত্ত সংযম করিতে ব্রাহ্মণগণ কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহার উপর লোকে এক্ষণে কেবল মাত্র নিরাকাব বা স্তম্ভাকৃতি সামান্য আকারবিশিষ্ট লিঙ্গের পূজায় উল্লসিত থাকিল না; আপনাপন ইচ্ছানুযায়ী দেবদেবীর পূজা জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; সুতরাং এই সময়ের ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্করাচার্য্য নিরাকার পূজাপদ্ধতির পোষকতা করিতে পারিলেন না। তিনি বাধ্য হইয়া গুণ ও শক্তি পূজার প্রশ্রয় দিলেন। শঙ্করাচার্য্য কোন নির্জ্জন স্থানে একাকী উপাসনা করিবার পরিবর্ত্তে সাধারণ চত্বরে নানাজন-সমবেত হইয়া পূজার পদ্ধতি প্রচলন করিয়া দিলেন এবং দণ্ডীর ন্যায় ঐক স্থানে বিরাজ করিবার পরিবর্ত্তে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণক্ষম সন্ন্যাসীর সূত্রপাত করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূলে সামান্যত কুঠারাঘাত হইল। শঙ্করাচার্য্যই প্রথমে পৌত্তলিকতার সহিত হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন করিতে অগ্রসর হন; তিনিই প্রথম পৌত্তলিক; তিনি আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকের

প্রধূমিত ইচ্ছার উপর অধিকতর ঘৃত প্রদান করিলেন। তিনিই

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং নভোক্তা-
শ্চিদানন্দরূপং শিবোঽহং শিবোঽহং॥
ন মৃত্যুর্নশঙ্কা নামে জাতিভেদাঃ
ন পিতা নৈব মাতা মে ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুনৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপং শিবোঽহং শিবোঽহং॥

ইত্যাদি উক্তি দ্বারা আপনার শিবমত প্রচার করিয়া লোকের প্রধূমিত ইচ্ছায় অধিকতর বল প্রদান করিলেন। সকলেই এই প্রকার পূজা পদ্ধতির অন্বেষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাতে শঙ্করাচার্য্যকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলে দলে দলে পঙ্গপালবৎ শিবপূজায় যোগদান করিবার জন্য ধাবিত হইল; নিরাকার ঈশ্বরের এইবার নানা মূর্ত্তিকল্পনার সূত্রপাত হইল; অকলঙ্ক হিন্দুধর্ম্মে কলঙ্ক স্পর্শ করিল; হিন্দুধর্ম্ম নানা রূপ শাখা প্রশাখায় নানারূপ কুসংস্কারের বশীভূত হইবার সূত্রপাত হইল; ধর্ম্মসম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মিবার সৃষ্টিপত্তন হইল; একই ধর্ম্মাবলম্বিগণ নানাবিধ উপভাগে বিভক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হইবার উপায় হইল। অদ্য শঙ্করাচার্য্য শিবের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গেলেন; তৎপর দিন তদীয় আত্মীয় ও শিষ্য রামানুজ শিবে তত মহত্ত্ব দেখিতে পাইলেন না—শিব ততদূর পূজ্য বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল না; তিনি বিষ্ণুর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইলেন, এবং তাঁহারই পূজাখ্যাপন করিবার জন্য সচেষ্টিত হইলেন। রামানুজ ঈশ্বরের সর্ব্বস্ব ক্ষমতা অস্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ব হইতেই পূজ্য ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রাবল্যের সময়ও বৌদ্ধযতিগণ এই পৃথিবীতেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল সুতরাং সেই বিশ্বাস সেইরূপ অক্ষুন্নই রহিল; শঙ্করাচার্য্যও গুরুর উপর অধিক আস্থা প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন; সুতরাং কোন কোন গুণসম্পন্ন ব্যক্তির উপরই লোকের ভক্তি অধিকতর আকর্ষিত হইয়া পড়িল; এবং তিনিই গুরুপদবাচ্য হইলেন। তাঁহার প্রতি লোকের দেহ-মন-ঐশ্বর্য্য সমর্পিত হইল এবং তাঁহার জন্য সকলে সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হইল। এই গুরু যাহা বলিবেন তাহাই পরমার্থ স্বরূপ—তাহা লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ, ইহাই লোকের স্থিরবিশ্বাস হইল। কিন্তু অদ্য শিব—কল্য বিষ্ণু ইত্যাদি নানারূপ আন্দোলনে লোকের চিত্ত অস্থির হইয়া গেল—কোনটিতেই মন প্রশান্ত হইতে পারিল না। মনুষ্যগণ একবার এদিক্ অন্যবার অন্যদিক্ দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিল না। যাহা দেখে—যত দেখে ততই নানাবিধ বিষয়ে তাহাদের মন তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল, কিছুতেই অধিক আস্থা প্রকাশ করিতে পারিল না। সকলেই সন্দেহ আসিয়া যুটিল; যেদিকে দেখে—যাহার বিষয় ভাবে—সকলই সন্দেহময়—সকলই ভ্রমময় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে

লাগিল। দর্শনশাস্ত্র সকল ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক উত্থাপিত করিল;—আবার বিদ্যাবত্তা—নানা বিজাতীয় লোকের সহিত সংস্রব ও তাহাদের আচার-ব্যবহার পরিদর্শন লোকের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উত্তেজিত করিয়া দিল; দর্শনশাস্ত্র সকল নানারূপ ভ্রমময় তর্কে প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিল—এবং সকল পদার্থের বাস্তবত্ব ও চিরস্থায়িত্ব এবং দেহ ও মনের একতা ও তাহার সহিত ঈশ্বরের সমতা শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল। এই রূপে তদানীন্তন সমাজে মহা হুলস্থুল বাঁধিল—সমাজ এই সকল গুরুতর বিষয়ে মহা আলোড়িত হইল। এই ভয়ানক সামাজিক আবর্ত্তনের ফল সমাজস্থ কতকগুলি লোকের নাস্তিকতায়—কতকগুলির কোন এক দেবতার প্রতি আস্থায় এবং অপরসাধারণ লোকের জগতের অনিত্যতা বা মায়ার বিষয় শিক্ষায় পর্য্যবসিত হইল। এই অনিত্য জ্ঞানই পরিশেষে অধিকতর বলসম্পন্ন হইল এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারকগণের পথ প্রদর্শন করিয়া দিল। কিন্তু এই অনিত্য জ্ঞানই ভারতের অধঃপতনের মূল; এই মায়াজ্ঞানেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি; সেই বৈরাগ্যবশতঃই ভারতবর্ষ অধঃপাতিত হইয়াছে। এই জন্যই লোকে সাংসারিক সমুদয় সুখকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পারলৌকিক সুখের জন্য লালায়িত—এই জন্যই লোকে স্বদেশের হিত চিন্তায় দেহমন সমর্পণ না করিয়া পরলোক চিন্তায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। সংসারের প্রতি এইরূপ তাচ্ছিল্য-জ্ঞানই ভারতবর্ষের অবনতির এক প্রধান কারণ; ভারতবর্ষে কখন রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতি মিশিতে পারে নাই তাহাতেই ভারতের অবনতি। রাজনীতির সহিত প্রীতির মিশ্রণেই জগতীয় উন্নতি; তাই ভারতবর্ষ আর অধিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

মুসলমানগণের ভারতপ্রবেশের পূর্ব্বে সামাজিক অবস্থা যে প্রকার ছিল এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইতেছে। এই সময়ে পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য অবলম্বন করিতেছেন; কিন্তু গার্হস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রাধান্য এবং নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই একতা ধ্বংস হইয়াছে। শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীগণ পরস্পর বিরোধী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণও পরস্পর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছিলেন। এইরূপে এই সময়ের সমাজ নানা প্রকার সাম্প্রদায়িকতার আবাসস্থল হইয়া পড়িয়াছে।

যৎকালে ভারতবর্ষের ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এই প্রকার, সেই সময় মহম্মদশিষ্যগণ ভারতবর্ষ আগমন করিবার জন্য সচেষ্টিত হইলেন। মুসলমানগণ তাঁহাদের দিগ্বিজয়ের প্রথমাবস্থায় কেবল কৃপাণের সহিত কোরাণের মর্ম্ম লোককে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে আর তাঁহাদের সে ভাব নাই; এক্ষণে তাঁ·

হারা ধর্ম্মবিস্তারের সহিত রাজ্য-বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সুতরাং তাঁহারা মনে ধর্ম্মবিস্তার, কার্য্যতঃ রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন; একে একে ভারতবর্ষীয় জনপদ সকল তাহাদের হস্তগত হইল; খিলিজী, টোগলক, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানাবংশীয় নরপতিগণ ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে রাজত্ব করিলেন। তন্মধ্যে খিলিজী প্রভৃতি বংশীয় প্রাথমিক নৃপতিগণই অত্যন্ত ধর্ম্মান্ধ ছিলেন; তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে মসজীদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; ক্রমে মুসলমানগণ ভারতের মাটিতে থাকিয়া কতকটা ভারতীয় ধরণে দাঁড়াইলেন—তাঁহাদের প্রকৃতি কিয়দংশে ভারতবর্ষীয়গণের মত হইয়া পড়িল—তাই মোগল-কুলতিলক আকবর সাহ সকলকেই একধর্ম্মাক্রান্ত এক জাতীয় করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ চেষ্টা ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের নিকট অত্যন্ত দোষাশ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু আকবর সাহ হিন্দুধর্ম্মের মান্য করিতেন—ব্রাহ্মণগণকে উৎসাহিত করিতেন; গোঁড়া মুসলমানগণের তাহা ভাল লাগিবে কেন? তাই ধর্ম্মান্ধ মহম্মদশিষ্যগণ আরঙ্গেবের নিকট সুশাসনের অনুযোগ করিল; আরঙ্গেব তাঁহাদের ধাতুতেই নির্ম্মিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের পরামর্শ মত হিন্দুগণের উপর অযথা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—সুতরাং এই সময়ে সকলেই অন্তরে তাঁহার ধ্বংস কামনা করিতে লাগিল। আরঙ্গেবের এই অতিধর্ম্মান্ধতাই ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যপতনের কারণ; আরঙ্গেবের সময়েই মুসলমান রাজত্বের চূড়ান্ত ও তাঁহার সময়েই ইহার পতনারম্ভ।

যাহা হউক মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে ভিন্নধর্ম্মীয়; তাঁহাদের ইচ্ছা স্বতন্ত্র—কার্য্য স্বতন্ত্র—ধর্ম্ম স্বতন্ত্র—ঈশ্বর স্বতন্ত্র; তাঁহাদের সমুদায়ই হিন্দু হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃণা করিতেন—হিন্দু দেবদেবী ঘৃণা করিতেন—ইহাঁদের সকল কার্য্যেই ঘৃণা প্রকাশ করিতেন—ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বিদেশীয় লোকের এই সকল বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ ভারতীয় সাধারণ লোকের মনে কার্য্য করিতে লাগিল। হিন্দুগণ ব্রাহ্মণপরিশূন্য জাতি দেখিলেন—ব্রাহ্মণ না থাকিলেও আপনার উপাসনাদি আপনিই করিতে পারা যায় তাহার দৃষ্টান্ত দেখিলেন; এই সকলে সাধারণ লোকের মন অধিকতর বিপর্য্যস্ত হইল। এদিকে সেখ—সৈয়দগণ সাধারণ লোকের উপর ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ আধিপত্য সন্দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারাও সেইরূপ পার্থক্য, প্রাধান্য ও পবিত্রতা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন—ব্রাহ্মণের ন্যায় সকলের উপরেই কর্ত্তৃত্ব করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইলেন; তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফল পীর ও সহিদ; মোল্লা ও দরবেশ। মহম্মদশিষ্যগণ প্রথমে একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু ভারতে পদার্পণ করিয়া ও ভারতের প্রকৃতি পাইয়া তাঁহারা আর সেরূপ রহিলেন

না; নানা ঈশ্বরে বা প্যাগম্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন;—কোরাণের সহিত বেদের যোগ দিলেন—সাধারণ লোক এইরূপ দৃষ্টান্তে ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হইল; এক্ষণে আর তাহাদের শান্তির স্থল রহিল না, বেদ কি কোরাণ,—ব্রাহ্মণ কি মোল্লা,—মহাদেব কি মহম্মদ কেহই আর শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইল না। লোকের চিত্ত ভয়ানকরূপে দোলায়মান হইল; কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে পারা যাইবে তাহার আর নিশ্চয়তা করিতে পারিল না।

এইরূপ ভয়ানক সামাজিক নির্য্যাতনের ফল রামানন্দ। রামানন্দ, রামানুজের মন্ত্রে দীক্ষিত; শ্রীরামচন্দ্র এই গঙ্গাতীরবাসী নূতন সম্প্রদায়ের আরাধ্যদেব হইলেন—ইহারা রামোপাসক হইলেন। মুসলমানগণের পীড়নে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য অনেকটা স্খলিত হইয়াছিল—তাহাদের আগমনাবধিই ব্রাহ্মণের উপর লোকের আন্তরিক ভক্তির অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল; তাঁহাদের দৃষ্টান্তে লোকে বুঝিয়াছিল যে সকলেই সমান—জন্মগুণে কোন পবিত্রতা-পবিত্রতা হইতে পারে না। রামানন্দ সেই নীতিরই পোষণ করিলেন—তিনি ঈশ্বরের সমক্ষে ব্রাহ্মণ শূদ্র, মহৎ ক্ষুদ্র সকলেই সমান, এই মত খ্যাপন করিলেন এবং আরও বলিলেন ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই ঈশ্বরোপাসনায় সমান অধিকারী—রামোপাসনায় জাতি বিচার নাই—যাঁহার ইচ্ছা তিনিই তাঁহার শিষ্য হইতে পারিবেন। তাঁহার এবংবিধ উপদেশ লোকের মনে অনেক কার্য্য করিল—লোকে আপনাদের সামান্য পথ দেখিতে পাইল। ঠিক্ এই সময়েই পঞ্জাবে গোরক্ষনাথ যোগ লইয়া সমুদিত হইলেন; তিনি, লোকে যতই কেন নীচ বংশ হইতে সমুদ্ভূত হউক না, ঈশ্বরে আপনার মন সংযত করিতে পারিলেই তিনি পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিবেন ও মৃত্যুর পর তদীয় আত্মা ঈশ্বরে সংশ্লিষ্ট হইবে, এই মত খ্যাপন করিলেন। গোরক্ষনাথ শিবকে উপাস্য দেবরূপে গ্রহণ করিলেন; কেন না সকল জাতীয় সকল লোকেই সমানভাবে শিব-পূজা করিতে সমর্থ। ইনি আপনার ধর্ম্মসম্প্রদায়কে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত আপনার শিষ্যগণের কর্ণবেধ করিতেন—এই জন্য তদীয় শিষ্যগণ সাধারণতঃ কাণফুটা যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরই কবির সমাজে অবতীর্ণ হইলেন। কবির রামানন্দের শিষ্য, কিন্তু ঈশ্বরের সাকারত্ব ও সদ্গুণত্ব স্বীকার করিতেন। ইনি নানাবিধ দেবদেবী পূজার সাতিশয় বিদ্বেষী; নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন। যাহা হউক তাঁহার মত অন্যান্য সংস্কারকগণের মত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। বেদ ও কোরাণ, ব্রাহ্মণ ও মোল্লা তাঁহার নিকট সমান হইয়া দাঁড়াইল—তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান ভেদ রহিল না। তিনি সমানভাবে উভয়কেই ধর্ম্মার্থ আহ্বান করিলেন। প্রতিপন্ন হইল, তিনি লোককে

আভ্যন্তরিক পবিত্রতার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন এই পৃথিবী মায়াময়; ইহা মায়া—মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ রমণীর ন্যায়; সেই দুর্ব্বিনীতা রমণী মনুষ্যকুলকে সর্ব্বদা প্রলোভিত করিতেছে; দুর্ব্বল মনুষ্য তাহার অসামান্য রূপমাধুরী সন্দর্শনে তাহারই বশীভূত হইয়া ক্রমিক ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং কবির সমুদায় সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সাধুবৃত্তি অবলম্বনই মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং সমুদায় ঐহিক সুখে নির্লিপ্ত শান্তিপ্রিয়-সাধুগণই ঈশ্বরের অনুরূপ ইহাই খ্যাপন করিলেন। কবিরের মতে ঈশ্বর সাকার ও সগুণ; কিন্তু ব্রহ্মাদি হিন্দু দেবদেবীগণ প্রায় সকলেই মায়ার বশীভূত সুতরাং ইহাদের পূজা তাঁহার মতে অতিশয় নিষিদ্ধ। তিনি রাম ও বিষ্ণুকে উপাস্য দেবতারূপে গ্রহণ করিলেন; সুতরাং তাঁহাকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কবিরই প্রথমে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন—তিনিই প্রথম হিন্দুমুসলমানগণের পার্থক্য অস্বীকার করেন। তিনি নিজে কিরূপ ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা বেশ প্রতীয়মান হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণ তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বিবাদ করেন;—হিন্দুগণ শব দাহ করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত, মুসলমানগণ সমাধি করিবার জন্য ব্যগ্র। অবশেষে তাঁহার মৃতদেহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধাংশ মুসলমানগণ গ্রহণ করিয়া স্বস্ব অভিপ্রায় সংসাধন করেন। কবির পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব রামানন্দের ধ্বজা তুলিলেন। চৈতন্যের ভক্তিই সর্ব্বস্ব; তিনি লোককে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন; হিন্দু মুসলমান সকলই তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল; তিনিই প্রথম যবন হরিদাসকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আপনার মহান্ উপদেশের মর্ম্ম সকল লোককে বুঝাইয়া দিলেন। চৈতন্য সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়কেই সমানভাবে দর্শন করিলেন; সন্ন্যাসী সাধু হইলেই যে তিনি ঈশ্বর-প্রাপণোপযোগী তাহা নহে, সংসারাশ্রমে থাকিয়া পুণ্যোপার্জ্জন করিতে পারিলেও লোকে মোক্ষের অধিকারী, তিনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। বল্লভস্বামী তাঁহার এই মতের প্রধান পোষক; তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মোপার্জ্জন বৃত্তান্ত দক্ষিণাঞ্চলে প্রচার করেন এবং ইনিই গৃহস্থগণ ধর্ম্মকর্ম্মের পক্ষে অধিকতর উপযোগী এই মত খ্যাপন করেন। এই বল্লভস্বামীর উপদেশে দেশময় গোস্বামিগণ বিরাজ করিতে লাগিলেন—গোস্বামীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কিন্তু ইহাঁরা বালগোপালের বাল্যলীলা সকল লোকের নিকট উপদেশ দিতে লাগিলেন। বালগোপালই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের এইরূপ উপদেশে বঙ্গদেশ অনন্তকালের জন্য রমণীর বিভ্রম বিলাস-ভঙ্গীতে মত্ত থাকিবার

হেতু হইল—বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার পথ অবরুদ্ধ হইল।

যাহা হউক রামানন্দ, কবির ও চৈতন্যের উপদেশে দেশ কতকটা শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করিল; হিন্দুগণ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ অস্থিরচিত্ত ও তরঙ্গায়িত ছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে আর সেরূপ নাই—হিন্দুগণের পূর্ব্বকার সে ধর্ম্মান্ধতা আর নাই; মহম্মদশিষ্যগণের সহিত তাঁহাদের কিয়দংশ সহানুভূতি জন্মিয়াছে। রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ ধর্ম্ম বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের সমতা খ্যাপন করিয়াছেন—কবির ও চৈতন্য জাতিভেদ প্রথার মূলে বিষম কুঠারাঘাত করিলেন—কবির নানা দেবমূর্ত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন—বল্লভস্বামী সাংসারিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থা দিলেন; ক্রমান্বয়ে এই সকল সংস্কারকগণের চেষ্টায় ভারতবর্ষ ধর্ম্মসম্বন্ধে কতকটা বলীয়ান্ হইল—কিয়ংদংশে শক্তিলাভ করিল। পূর্ব্বে যাহা লইয়া শরীর ও মনের বিবাদ চলিতেছিল তাহা কিয়ৎপরিমাণে শিথিল; সুতরাং এই ষোড়শ শতাব্দীর মনুষ্য দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই সকল সংস্কারকেরই মূলে একটি দোষ ছিল—সেটি কেহই লক্ষ্য করেন নাই। ইহারা সকলেই ইহজগতের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন—সকলেই প্রায় ইহজন্মে সুখ আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া লোককে পারলৌকিক সুখের জন্য সচেষ্টিত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহাতে লোকের মনে জাতীয়ভাব উজ্জীবিত হইতে পারে—জগতের উন্নতি—জাতীয় উন্নতির জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারে এমন উপদেশ কেহই প্রদান করেন নাই—প্রীতির সহিত রাজনীতির মিশ্রণ করিতে কেহই সাহসী হন নাই;—ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি একসূত্রে গাঁথিয়া জাতীয় উন্নতিকল্পে কেহই মস্তিষ্ক বিলোড়ন করেন নাই; সুতরাং এই সকল সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবন পূর্ব্বেও যেমন ছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে প্রায় সেইরূপই রহিল, কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। ধর্ম্মসংস্কারকগণের যে যে গুণের প্রয়োজন চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাজনগণ সেই সেই গুণ সমন্বিত হইলেও তাঁহাদের যে দর্শনটির অভাব ছিল, শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নানক তাহা পূরণ করিলেন। যদিও নানক তাহা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারেন নাই, তত্রাপি তিনি যে ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই উপর গুরুগোবিন্দ সিংহ সেই অভাবটুকু যথারীতি পূরণ করিলেন। গুরুগোবিন্দের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও মহাপ্রাণতা তদীয় শিষ্যগণের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল;—তিনিই আপনার শিষ্যগণকে জাতীয় জীবন প্রদান করিলেন—ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতি অতি সুন্দররূপে মিশাইয়া দিলেন এবং তিনিই মহৎ ও ক্ষুদ্র নির্ব্বিশেষে জাতি ধর্ম্ম ক্ষমতা ও স্বত্বসকলের সাধারণত্ব ও সমানত্ব শিক্ষা প্রদান করিলেন। নানক এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা; তাঁহার সময়ে ইহা সামান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় মাত্র ছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী মুসলমান সম্রাটগণের ক্রমিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পরস্পর সংঘর্ষণে ইহা

পরে ধর্ম্ম ও সৈনিক সম্প্রদায় হইয়া পড়ে। গোবিন্দসিংহের সময় ইহার অত্যাচারের চরম, সুতরাং এই সময়েই শিখগণ সৈনিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মুসলমানগণের অতি নিপীড়নই শিখগণের প্রবল হইবার কারণ ; ক্রমে ইহারা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অমিতপরাক্রমশালী ব্রিটিশসিংহও তাঁহাদের প্রতাপের নিকট চিলিয়ানওয়ালায় তিষ্ঠিতে পারেন নাই।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

নৈশ-চিন্তা

১

নিশা শেষে শশধর, ঢলিয়া পড়েছে ওই
পশ্চিম গগণে ;
মলিন কৌমুদী ভাতি, মিশায়ে গিয়াছে ক্ষীণ
আঁধারের সনে।
চাঁদে হেরে তারা কাঁদে, যামিনী মলিনী কাঁদে
নিশার শিশিরে ;
সুকতারা দিশেহারা, ঝাঁপে ওই অভিমানে
জলদ-তিমিরে।
পাদপে নির্জ্জনে পেয়ে, কহিছে ব্রততী সতী
সোহাগের ভরে,—
'দেখ হে, আশ্রয় দাতা, চাঁদের কারণে
তারা-দুনয়ন ঝরে !'
শুনিয়া লতার কথা, পাদপ অরবে তারে
সোহাগ করিল ;
সোহাগে গলিয়া লতা, ভুজপাশে বৃক্ষে আরো
সজোরে বেড়িল !
উদ্যানে কুসুম হেরি, লতায় পাদপে করে
প্রেম আলাপন,
লুকায়ে পাতার আড়ে, অমনি সলাজে নিজ
মুদিল নয়ন !

২

নিশার সুশীত শান্তি, ঢালিয়াছে গাঢ় নিদ্রা
নয়নে সবার ;
নরনারী অচেতন, কুহকিনী নিদ্রা কোলে
সবে শবাকার !
ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ, ক্ষণ পূর্ব্বে ছিল যেই—
যন্ত্রণা অধীর
নিদ্রার পরশে এবে, পাশরিয়ে সব জ্বালা
সুষুপ্ত সুস্থির !
মরি কি নিদ্রার মায়া ! ওই দেখ নিদ্রা কোলে
লাবণ্য পুতলী
হারাণ পতির সনে, কহিয়া প্রেমের কথা,
হাসিয়া আকুলি !
মৃণালনিন্দিত ভুজ, ছড়াইয়ে, হৃদে পতি
ধরিবারে যায় ;—
কভু কাঁদি বলে 'নাথ, পাইয়াছি আজ তোমা
যাইবে কোথায়।'
কখন করিয়ে মান, ফোলাইছে ওষ্ঠাধর
নিদ্রার আবেশে,
আবার সোহাগে বলে যত মনোগত ব্যথা
পাশরিয়া ক্লেশে।

৩

প্রভাতে মরেছে পুত্র,--দুঃখিনী মাতার এক-
(ই) স্নেহের বন্ধন ;—
পুত্রের বিবাহোৎসব দেখিয়া স্বপনে সুখ-
সাগরে মগন !
শষ্প শয্যা'পরে শুয়ে, রাখাল, হয়েছে রাজা,
দরিদ্র ধনেশ !
জননীর কোলে শিশু, শুনিয়ে ত্রিদিব বাদ্য
হাসে—নিদ্রাবেশ !
নর-শক্র, লৌহপ্রাণ,--মমতা, হৃদয়ে যার
নাহি পায় স্থান
বিভীষিকাময় সেই হৃদয়ে, করেছে নিদ্রা
শান্তির বিধান !
নরের জ্বলন্ত আশা, তৃষ্ণা, ক্ষোভ, বৃত্তিচয়
সকলি অচল,
নির্ব্বাপিত-বহ্নিশেষ- অঙ্গার-ভস্মের মত
হয়েছে শীতল !
নৈরাশ্য-প্রচণ্ড বাত্যা করিছে না কারো হৃদে
দারুণ আঘাত,
নিদ্রার কোমল অঙ্কে পিয়িছে সকলে নৈশ-
শান্তির প্রপাত !

৪

পিয় পিয় পিয় ওরে, দুঃখি মানব সন্তান
পিয় ক্ষণ কাল ;—
কর পান প্রাণভরে ; দিবা দরশনে পুনঃ
ঘটিবে জঞ্জাল।
ঘুমাও ব্যথিত প্রাণ ! এ সুখের নিদ্রা যেন
নাহি ভাঙে আর,
কি হবে জাগিয়ে পুনঃ জাগরণে, ব্যথা হৃদে
জাগিবে আবার !
প্রবল ঝটিকামুখে যথা প্রকৃতির বেশ
শান্ত অচঞ্চল,
জীব-কোলাহল-পূর্ণ দিবসের মূলে তেমি
নিশা সুশীতল।
পোহাবে শর্ব্বরী ;—নর, প্রভাত তপন সহ
খুলিয়ে নয়ন
ছুটিবে আপন পথে পূরাতে মনের সাধ
যথা যার মন।
পাপ, স্পৃহা শূন্য এবে, নিদ্রায় মোহিত দেখ
ওই যে হৃদয়,
কি দেখিবে কালি ইথে?—দেখিবে উহাতে
দুষ্ট স্বার্থের আশ্রয় !
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ভাঙি তটিণীর তীর
যথা কদাকার
আশার উন্মত্ত স্রোত আঘাতে ধরিবে হৃদ
বিকট আকার।
সকলি সুন্দর বিশ্বে, প্রকৃতি মমতাময়ী
কোমলতাময়
কঠোর মানব মনে হায় রে কেবলি একা
কঠোরতা বয় !

শ্রীপ্রাঃ——

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। "শকুন্তলাতত্ত্ব। অর্থাৎ অভিজ্ঞানশকুন্তলের সমালোচনা। শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম্, এ প্রণীত।"—অভিজ্ঞানশকুন্তলের নানাবিধ রসপ্রসঙ্গ সমালোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার যে তাঁহার এই পুস্তকখানিকে শকুন্তলাতত্ত্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহাতে পাঠকের মনে কৌতূহলের উদ্দীপক বিবিধ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। আমরা সেই সকল সম্ভাবিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রথমেই ইহা প্রীতি ও আহ্লাদসহকারে নির্দ্দেশ করিতেছি যে, এ গ্রন্থ সর্ব্বাংশেই তত্ত্বনামের যোগ্য। যিনি নীতিতত্ত্বের নিগূঢ়রহস্যে অনুরাগী নহেন, এ গ্রন্থপাঠে তিনি কোনরূপ সুখানুভব করিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। যিনি নরনারীর প্রকৃতিগত রহস্য ও আদর্শ দর্শনে উৎসুক নহেন, এগ্রন্থ পাঠে তাঁহারও কোন রূপ আনন্দ জন্মিবে বলিয়া আমরা আশা করি না। কিন্তু যিনি কাব্যে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা তত্ত্ববিদ্যার সারসিদ্ধান্ত লইয়া পৃথিবীর একজন প্রধানতম কবির একখানি প্রধানতম কাব্য অনুবীক্ষণের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অভিলাষী হন, এই গ্রন্থপাঠে তিনি আপনার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিবেন। বাবু চন্দ্রনাথ এখন পর্য্যন্ত এই এক খানিমাত্র গ্রন্থ 'প্রকাশ' করিয়াছেন, কিন্তু এই একখানি গ্রন্থ দ্বারাই তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যসমাজে অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি তিনি বর্ষে বর্ষে এইরূপ মোহন মণিমুক্তা উপহার দিয়া বঙ্গভারতীর ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করিবেন। এই গ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা করা অনেকদিন হইতে আমাদিগের অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণে আমাদিগের সে আশা আজও সফল হয় নাই। আমরা সে আকাঙ্ক্ষা এখনও পরিত্যাগ করি নাই; কারণ বাবু চন্দ্রনাথ দুষ্মন্তশকুন্তলার চরিত্রতত্ত্ব বিশ্লেষ করিতে যাইয়া যে সকল অভিনব কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু অদ্য সংক্ষেপতঃ একথা বলিতে পারি যে, যিনি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, শকুন্তলাতত্ত্ব বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে একবার পড়িয়া দেখা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার হৃদয়ে কাব্যের সরসলহরী বসন্তবায়ুসঞ্চালিত মৃদুলহরীর ন্যায় আপনি খেলে, এবং যিনি বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া দর্শনশাস্ত্রের অতি কঠোরকথারও অনুচ্ছেদ করিতে পারেন, তাদৃশ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে এরূপ পুস্তক লিখিতে পারে না, এবং বাঙ্গালি যদি এইরূপ জ্ঞানগর্ভ ও গাঢ়রসপূর্ণ কাব্যসমালোচনেরও সমুচিত সমাদর না করে, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্মান রক্ষা পায় না।

২। "মেঘদূত, শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল্ কর্তৃক বাঙ্গালাপদ্যে অনুবা-

দিত।”—ইতঃপূর্ব্বে মেঘদূতের আরও দুই খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বাবু রাজকৃষ্ণের অনুবাদ শব্দে শব্দে ও প্রায় সকল স্থলেই অক্ষরে অক্ষরে মূলের অনুগত, অথচ অনুবাদের নীরসতাবর্জ্জিত। আমরা এই হেতু মেঘদূতের এই মধুরাক্ষরগ্রথিত নূতন অনুবাদ দর্শনে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি। শুধু বাঙ্গালাটুকু পড়িলে একবারও তাহা অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না, অথচ মূলের সহিত মিলাইলে অনুবাদের কোথাও কোন দোষ চক্ষে পড়ে না। ইহা অপেক্ষা অনুবাদকের আর অধিকতর প্রশংসা কি? যাঁহারা সংস্কৃতমেঘদূত পড়িয়াছেন, কবিবর রাজকৃষ্ণের অনুবাদনৈপুণ্য দর্শনে অবশ্যই তাঁহারা উৎসুক হইবেন, এবং যাঁহারা সংস্কৃতে অপ্রবিষ্ট, তাঁহারা রাজকৃষ্ণ বাবুর এই মেঘদূত পাঠ করিয়াই মেঘদূতপাঠের অনির্ব্বচনীয় সুখ বহুলপরিমাণে লাভ করিবেন। যদি স্থান থাকিত, তাহা হইলে আমরা মেঘদূতের কএকটি কবিতা এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর সেই সেই কবিতার অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতাম। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় যে, বাঙ্গালাপুস্তক ক্রয় করা যাঁহারা ব্রহ্মহত্যার ন্যায় মহাপাতক মনে করেন না, এবং বাঙ্গালাগ্রন্থে অনুরাগ দেখাইতে যাঁহারা লজ্জায় একেবারে জড়সড় হন না, এই সমালোচনের বহুপূর্ব্বেই তাঁহারা মেঘদূতের এই পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া থাকিবেন। রাজকৃষ্ণ বাবু উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া কবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, ইতিহাস শাস্ত্রের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞাতপূর্ব্ব কথার আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকসমাজে আদর পাইয়াছেন, এবং তিনি মৌলিক রচনায় যেমন মাননীয় লেখক, অনুবাদেও যে তেমনি অকুতোভীত, এইবার সেই ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

৩। “বিধবা শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত।” ব্রজনাথ বাবু তাঁহার পূর্ব্বপ্রণীত নবপ্রবন্ধ নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারাই একজন সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই লব্ধ প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে, এবং ইহাতে প্রকৃতই গুণ ও গৌরবের পরিচয় আছে। ইহার রচনা সর্ব্বত্র সমানরূপে সরল না হইলেও সুন্দর, প্রগাঢ় না হইলেও প্রীতিপ্রদ এবং ইহার স্থানে স্থানে যেরূপ সুচিন্তা ও সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা প্রশংসাযোগ্য। ব্রজনাথ বাবুর অলঙ্কারপারিপাট্যও নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কোন কোন স্থান অলঙ্কার বাহুল্যে বিভূষিত না হইয়া অর্থকে একটুকু আবরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু পাতা ঢাকা ফুলের মত সে সকল স্থানও প্রিয়দর্শন। তাঁহার এই পুস্তকের শ্মশান, মিলন ও পরিণয়ান্তর প্রভৃতি প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও পরিশ্রম সফল হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তাঁহার কল্পনা যে স্বভাবতঃই ক্রীড়াশীলা এবং তাঁহার লেখা যে তাদৃশ উচ্চ কল্পনার উপযুক্ত চিত্র, এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তাহার নিদর্শন আছে।

কিন্তু এই গ্রন্থ ভাষা ও ইতস্ততঃপ্রক্ষিপ্ত ভাবসমূহের পুষ্পিত সৌন্দর্য্যে যেরূপ প্রশং

সার্ হইয়াছে, গাঁথনির নৈপুণ্য ও গ্রন্থগত উদ্দেশ্যের সাফল্যে সেরূপ হয় নাই। বিধবার ম্রিয়মাণ মূর্ত্তি এই জগতের এক শোচনীয় দৃশ্য; বিধবার মধ্যে বঙ্গ-বিধবা দুঃখেরই সজীব প্রতিকৃতি। এই অনন্ত দুঃখের প্রতিমাখানিকে বর্ণতুলিকায় অঙ্কিত করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য, এবং ব্রজনাথ বাবুর যে সেই ক্ষমতা আছে, এই গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। কিন্তু তিনি বিধবাকে যে ভাবে অঙ্কিত করিয়া বিধবার মুখে যে সকল গভীর কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে পাঠক তাঁহার চিন্তাশীলতার প্রশংসা করিতে পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইলেও, দুঃখে তাঁহার সহিত একপ্রাণ হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই জন্যই বলিয়াছি যে, গ্রন্থের উদ্দেশ্য রক্ষা বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

যে ব্যক্তি নিজে নিজ দুঃখে অধীর এবং নিজদুঃখের কাহিনী কহিয়া চিত্তভার লঘু করাই যাহার উদ্দেশ্য, সে বিজ্ঞানের ভাষায় অপরকে উপদেশ দিতে অথবা দর্শনশাস্ত্রের কূটতর্কে জীবনতত্ত্বের কোন কূটকথার মীমাংসা করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ;—যদি করে, তবে তাহা বুদ্ধিকে স্পর্শ করিলেও মনুষ্যের হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। যথা;—যদি কেহ পুত্রশোকে এইরূপ কাঁদিতে থাকে যে, আমি কাঁদিতেছি কেন, না আমার ভবিষ্যতের আশা বিনষ্ট হইয়াছে; ভবিষ্যতের আশা পাঁচ প্রকার,—ধনের আশা, জনের আশা, যশ ও মানের আশা ইত্যাদি; পুত্রের মৃত্যুতে ইহার চারি প্রকারের আশা বিনষ্ট হইয়াছে। অথবা যদি ঐরূপ শোকাকুল ব্যক্তি বিলাপ করিতে যাইয়া বিলাপের পোষকতায় মিল ও স্পেন্সার প্রভৃতি লেখকদিগের কথা প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করে এবং বিলাপ ও ধৈর্য্যের অবসরে মধ্যে মধ্যে নানা শাস্ত্রের সমালোচনা করিতে রহে, তাহা হইলে কাঁদিয়া যে সুখ তাহা কখনও তাহার ঘটিবে না, এবং সে নিজে কাঁদিলেও অন্যকে কখনও কাঁদাইতে পারিবে না।

ব্রজনাথ বাবুর গ্রন্থে ঠিক্ এই সকল কথাই খাটিতেছে এমন নহে; কিন্তু উহাতে উল্লিখিত প্রকারের দোষ স্থানে স্থানে আপনা হইতেই যে চক্ষে পড়ে, পাঠক কিংবা সমালোচকের চক্ষু লইয়া দেখিলে সহৃদয় গ্রন্থকার স্বয়ংই তাহা অনুভব করিবেন।

উদ্দেশ্য ও পরিণতির সামঞ্জস্য বিষয়ে এই গ্রন্থে আর একটি অভাব লক্ষিত হয়। বিধবা সম্পর্কে গ্রন্থ লিখিতে গেলে, দুই প্রকারের উদ্দেশ্য সম্ভব হইতে পারে। এক বিধবাবিবাহের পক্ষসমর্থন; আর বিধবার স্মৃতিগত প্রীতি অথবা প্রীতির সেই দগ্ধস্মৃতিই যে এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্রসুখের প্রস্রবণ, ইহা প্রদর্শন। ব্রজনাথ বাবু বিধবাবিবাহের আবশ্যকতাপ্রমাণের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখেন নাই। এজন্য অন্য যাহার ইচ্ছা সে তাঁহার সহিত বিবাদ করুক, আমরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিব না। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই বোধ হয় যে, বিধবার স্মৃতিগত প্রীতির পূর্ণতা ও পরিতৃপ্ত বিষণ্ণতা আঁকিয়া দেখানই তাঁ-

হার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য পরিস্ফুট নহে। সহজে তাহা বোধগম্য হয় না এবং বিধবার বিলাপ সকল স্থলে তাহা বুঝিতে দেয় না। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি উপন্যাসের আকারে বিন্যস্ত হইলে, সেই উদ্দেশ্য যেরূপ সফল হইত, বর্ত্তমান আকারে তাহা হওয়া স্বভাবতঃই অসম্ভব। যাহা হউক, এই সকল ত্রুটি এবং সমালোচনার এই সকল কথা সত্ত্বেও "বিধবা" একখানি শ্রদ্ধা ও আদরের গ্রন্থ হইয়াছে এবং এই গ্রন্থ পাঠে আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ব্রজনাথ বাবুর নিকট উত্তরোত্তর আরও অনেক উপাদেয় বস্তু লাভের আশা করিবার কারণ আছে। যে সকল নব্য যুবা বাঙ্গালা শিখিতে ইচ্ছা করেন, ব্রজনাথ বাবুর লেখা তাঁহাদিগের অবশ্যপাঠ্য।

৪। "চিরযাত্রী, উদাসীন প্রণীত।" সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের এক কংস বণিক্যের পুত্র উচ্চতর শিক্ষার অভাবসত্ত্বেও ধর্ম্মোৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতকে এক অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় শিক্ষিতসমাজ তদানীন্তন ভীষণ হুলস্থূলের মধ্যে সেই সম্পত্তির তখন কোন আদর করিল না। কিন্তু দরিদ্রকুটীরে স্বর্গচ্যুত ফলের ন্যায় অচিরেই সকলে তাহা হৃদয়ে ধারণ করিল। নিম্নতর সমাজ যেন প্রাণের পরমপদার্থ লাভ করিয়া আগ্রহের সহিত সেই ফল আস্বাদন করিতে লাগিল, এবং আবালবৃদ্ধ সকলেই তাহার অপার্থিব সুরস গ্রহণে যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল। সেই সঞ্জীবনী সুধা যখন অন্তর্ব্বাহ রূপে নিম্নতর সমাজে এইরূপ পরিবর্ত্ত সংঘটন করিতেছিল, তখন শিক্ষিতসমাজ তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং শত মুখে উহার গুণগান করিয়া সাধারণে উহার পরিচয় দিলেন। তদবধি ছোট বড়, ধনী, নির্ধন, সকলেরই গৃহে সেই পীযুষপূর্ণফল শোভা পাইতেছে এবং আজি এই সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পরেও সুকুমারমতি শিশুগণ তাহার স্নিগ্ধরস পান করিয়া ভবিষ্যৎচরিত্রগঠনের সূত্রপাত করিতেছে। সেই সুপ্রসিদ্ধ ফলের নাম Pilgrim's Progress এবং তাহার অমর্ত্ত্য স্রষ্টার নাম Bunyan। যাঁহারা ইংরেজীতে সাধারণ রূপেও অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট বানিয়ান কিংবা তাঁহার "যাত্রীর গতি" ইহার কাহারও নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। এই গ্রন্থখানা বাইবেলের ন্যায় ইংলণ্ডীয় বালকবালিকাদিগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাকে এবং ইহার সরল ও নীতিপূর্ণ ভাষা পিতামহের প্রমোদ গল্পের ন্যায় তাহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। গ্রন্থখানির এক বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, ইহার আলঙ্কারিক চিত্রগুলিও প্রকৃত সামাজিক মনুষ্যের চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে, এবং সেই গুণবাচক প্রতিকৃতিগুলিতে এরূপ সুন্দরভাবে মানবত্ব আরোপিত হইয়াছে, যে পাঠ করিবার সময় সকলেই সেগুলির গুণবাচকত্ব ভুলিয়া যাইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত মানব বলিয়া অনুভব করিতেছে। যখন আশা ও মোহ আসিয়া সশরীরে কথা কহে, তখন আমরা তাহাদিগকে সামাজিক মানুষ বলিয়াই ভ্রম করি; যখন

সাধু (Christian) পৃষ্ঠে এক বোঝা লইয়া বাটী হইতে পলায়ন করে, তখন তাহা পাপের বোঝা মনে না করিয়া কাষ্ঠ অথবা বস্ত্রের বোঝাই মনে করি। আবার, যখন সে নিরাশার পঙ্কিলহ্রদে পতিত হয় এবং যখন আশার সহিত সে মাৎসর্য্যের বাজারে (Vanity fair) বন্দী হয়, তখন বাটীর নিকটস্থ পঙ্ককূপ এবং পল্লিমধ্যস্থ বাজারের কথাই আমাদের মনে জাগরুক হয়। এইরূপ গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত গুণবাচকত্ব সত্বেও আমরা ইহাতে শুধু মানবত্বই দেখিতে পাই। বিশ্বাসপ্রবণ শিশুহৃদয় ঐ সমস্ত গুণকে প্রকৃত মানবজ্ঞানে উহাতে শ্রদ্ধাবান্ হয়। পৌত্তলিকতা অশিক্ষিত হৃদয়কে যে কারণে সহজে অধিকার করে, বানিয়ানের এই গ্রন্থও সেই কারণে শিশুচিত্তকে সহজেই ভুলাইয়া লয়। আশা, আকাঙ্ক্ষা, মায়া, স্নেহ প্রভৃতির সূক্ষ্মতত্ব বিজ্ঞানের আলোকে বুঝাইতে গেলে বিংশতিবর্ষীয় শিক্ষিত যুবকের নিকটও অরণ্যে রোদন করা হয়, কিন্তু পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকও বানিয়ানের গ্রন্থ পাঠ করিয়া উহাদের বিশেষ প্রকৃতি এবং প্রকৃতিগত পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে, শিশুদের চরিত্রগঠনের জন্য বানিয়ানের গ্রন্থ এক আশ্চর্য্য উপকরণ। সমস্ত ইংরেজী ভাষায় এ শ্রেণীর আর একখানি গ্রন্থ নাই।

নীতিদরিদ্র বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে এই শ্রেণীস্থ গ্রন্থের অনুকরণ যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলা অনাবশ্যক। বহু দেশীয় আচার পদ্ধতির তরঙ্গাভিঘাতে এদেশের সমাজবন্ধন যে প্রকার শিথিল হইয়া গিয়াছে, এবং কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল দিকেই যেরূপ ঘোরতর নৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে শিশুদিগের চরিত্রগঠনকার্য্য যে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার এবং সেই ব্যাপার সংসাধনে যে বিশেষ শক্তির আবশ্যক, একটুকু চিন্তা করিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পাইবেন। এই জন্যই নৈতিক বিষয়ে কোন গ্রন্থ কিংবা কোন প্রকারের চেষ্টা দেখিলেই আমরা আহ্লাদের সহিত তাহার প্রশংসা করি এবং এই জন্যই বিলাসভাবাত্মক কোন গ্রন্থ, অন্যরূপে প্রশংসার্হ হইলেও বর্ত্তমান সমাজের জন্য অনুপযোগী বলিয়া তাহার উপযুক্ত সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হই। এই নৈতিক অবনতির গভীর কূপ হইতে যাঁহারা বঙ্গসমাজকে উত্তোলন করিতেছেন, বঙ্গসমাজ চিরদিনই তাঁহাদের নিকট ঋণী রহিবে।

পণ্ডিতবর উদাসীন বহুপ্রকারে আমাদিগকে এই ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাঁহার চিরযাত্রীও এ বিষয়ে আমাদিগকে এক নূতন ঋণে ঋণী করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে যে পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেসের নাম করিয়াছি, চিরযাত্রী তাহারই অনুকরণে লিখিত হইয়াছে; যদি বাঙ্গালায় এই উৎকৃষ্ট ইংরেজী গ্রন্থখানা সম্যক্ রূপে মূলের ন্যায় সরল ও হৃদয়োদ্দীপক ভাষায় অনুবাদিত হইত, তবে বঙ্গভাষায় উহা এক মহার্ঘরত্ন বলিয়া গৃহীত হইত; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা

না হইবে, সে পর্য্যন্ত উদাসীন মহাশয়ের চিরযাত্রী উহার অভাব অনেকাংশে মোচন করিবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ চিরযাত্রী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছি, এবং আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা ইহার এক একখণ্ড নিজ নিজ সন্তানের হস্তে প্রদান করিয়া ইহার সুনীতিপূর্ণ উপদেশগুলি তাহাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু আমাদের কথা কেহ শুনিবে কি? পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস্ বিলাতে যেরূপ ঘরে ঘরে পঠিত হয়, যেরূপ ক্রীড়াপুতুলের ন্যায় প্রত্যেক বালক বালিকারই অঙ্কে অঙ্কে শোভা পায়, এই কুরুচিপ্রিয় বঙ্গ সমাজে তাহার শতাংশের একাংশও হইবে কি? পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস এক শতাব্দীতে যে আশ্চর্য্য ফল ফলাইয়াছে,এদেশে চিরযাত্রী দ্বারা কিছু মাত্রও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে কি?

চিরযাত্রী যে সর্ব্বত্র পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেসের উপযুক্ত অনুকরণ হইয়াছে, আমরা এমন একথা বলি না। গ্রন্থকার সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে সরলতা নষ্ট করিয়াছেন; তাঁহার বর্ণনায় তেজ ও সজীবতা অতি অল্প; বানিয়ান যেমন দুই তিনটি কথায় এক এক স্থানের জাজ্বল্যমান চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি তাহা পারেন নাই। বানিয়ানের গ্রন্থ পড়িতে অণুমাত্রও আয়াস লাগে না; উদাসীন মহাশয়ের গ্রন্থ আয়াস সহকারে পাঠ করিতে হয়;—ধীরে ধীরে না পড়িলে তাঁহার কথাগুলি হৃদয়কে স্পর্শ করেনা। বয়স্ক ও শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ইহাতে বড় আসে যায় না, কিন্তু বালক বালিকার পক্ষে এইরূপ দুরূহতা বিশেষ বিঘ্নকর। তথাপি এই সমস্ত সামান্য সামান্য দোষ সত্ত্বেও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি যে, তাঁহার এই অভিনব উদ্যম দ্বারা তিনি বঙ্গ সমাজের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; এবং যদি বাঙ্গালি সুনীতির পক্ষপাতী বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করে, তবে আমরা ভরসা করি তাহারা তাঁহার এই উদ্যমের যথেষ্ট পুরস্কার করিবে।

৫। "কর্ম্মনাশা—বিবিধসংস্কৃতচ্ছন্দঃপ্রকাশিকাপুস্তিকা—কেনচিদীশ্বরানুরাগিণা জনেন বিরচিতা।"

এই প্রবন্ধ সুচারুরূপে মুদ্রিত ও উৎকৃষ্টবস্ত্রবন্ধনে গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কোন প্রকার সংস্কৃতগ্রন্থ প্রচারিত হইলে সমালোচকের তীক্ষ্ণ লেখনীও কোমলভাব ধারণ করে। নারীজনপ্রণীত গ্রন্থের ন্যায় উহা অতি সদয়ভাবে সমালোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃতভাষার সূতিকাগারস্বরূপ এই ভারতবর্ষে নবপ্রণীত সংস্কৃতগ্রন্থের এই প্রকার সমালোচনা আমাদের বিবেচনায় দেশের, গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের কোন প্রকারেই গৌরবকর নহে।

সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থপ্রচারের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়।—১ম নিজের যোগ্যতা প্রকাশ, দ্বিতীয়তঃ লোকশিক্ষার উপযোগি প্রাচীন গ্রন্থের সার সঙ্কলন ও বিশদীকরণ, ৩য় অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন। সমস্ত বা ব্যস্তভাবে এই সকল উদ্দেশ্যে প্রণোদিত

হইয়াই গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ প্রচার করিয়া থাকেন।

আমাদিগের এই নূতন গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই কেন হউক না;—তাঁহার সংস্কৃত লিখিবার শক্তি আছে। কিন্তু সে শক্তি এখনও পরিপক্ক হয় নাই। তাঁহার রচনা স্থানে স্থানে সুন্দর অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও স্থানে স্থানে অলঙ্কার, ব্যাকরণ এবং লিঙ্গানুশাসনের শাসনভঙ্গ-দোষে দূষিত। ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পাইয়াছি যে, তাঁহার শক্তি আছে, কিন্তু সে শক্তি অপরিপক্ক।

আমরা ইহার দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিব—

"জ্ঞানিনাং জ্ঞানগর্ব্বংচ গুণিনাং গুণগৌরবং
যত্রাসীৎকথিতং লোকে স্বাভাবিক মনাহতম্।"

এই শ্লোকে—"জ্ঞানগর্ব্বং" এই ক্লীবলিঙ্গ নির্দ্দেশ উচিত হয় নাই।

"সম্প্রতি ভারতংদেবি সর্ব্বগর্ব্ববিবর্জ্জিতম্।"

"সাম্প্রতং ভারতং" লিখিলে ভাল হইত।

"ভারতরাজ্যমথার্পিতমাশু যদীয়করে—
রক্ষিতমক্ষতভীমবলেন চেদবলা!
সা সুখদা শুভদা ফলদা বরদা নবরা
রাজতি লণ্ডননাম্নি সুধাম্নি নৃপেশসুতা।"

এই শ্লোকে 'চেৎ' এই আপেক্ষিক অব্যয় প্রয়োগ বড় উপহসনীয় হইয়াছে।

"সমস্তবৈভবং সমর্পণং করোতি কামদা
গবী যথা বলিষ্ঠপালিতাগতাতিথিং প্রতি।

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ, বিদ্যাসুন্দরীয় সংস্কৃত, যেমন "অনুগ্রহং মাংকুরু সম্প্রতিত্বম্।" শেষার্দ্ধ, শ্বেতমাণ্ডব্যীয় ছন্দে লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ যতির নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই। এইরূপ আরও অনেক ত্রুটি লক্ষিত হয়; তথাপি ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃতছন্দোলক্ষণ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ এতৎপাঠে অনায়াসে ছন্দোলক্ষণ বিষয়ক অনেক কথা অবগত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের বিশেষ গুণ এই যে, অন্যান্য ছন্দোগ্রন্থের ন্যায় ইহাতে কোন অশ্লীল উদাহরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইহার গ্রন্থকার যে কলুষিত প্রবৃত্তির লোক নহেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, সংস্কৃতছন্দঃশাস্ত্র বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহার ছন্দঃসকল, অক্ষর, লঘু, গুরু, মাত্রা ও যতির নিয়মে নিয়মিত হওয়ায় অতি মনোহররূপ ধারণ করিয়াছে। এইক্ষণ ছন্দোগ্রন্থ লিখিতে হইলে কোন্ ছন্দঃ কোন্ রসের অনুকূল ও প্রতিকূল, কিরূপ বর্ণনায় কোন্ ছন্দ উপযোগি বা অনুপযোগি এই সকল বিষয় বিশদরূপে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। কিন্তু কর্ম্মনাশা-রচয়িতা তাহার কিছুই করেন নাই; প্রত্যুত প্রাচীন গ্রন্থে যে যতির নিয়ম ছিল, তিনি তাহাও নিজ গ্রন্থে নিবেশিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এতৎপাঠে যে ছন্দোজ্ঞান জন্মিবে, তাহা অসম্পূর্ণ হইবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

জীর্ণোদ্ধার।

চন্দ্রমণ্ডল।

এই প্রবন্ধে চন্দ্রমণ্ডল সংক্রান্ত আর্য্য-বিজ্ঞান অনুশীলিত হইবে বটে, কিন্তু যাহা সর্ব্বজন বিদিত, তাহা পরিত্যক্ত থাকিবেক। যে সকল রহস্য নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কৃত বলিয়া প্রকাশ, সেই সকল রহস্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুমোদিত কি না, এই চন্দ্রমণ্ডল শীর্ষক প্রস্তাবে কেবল তাহারই অনুসন্ধান করা হইবে।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলিয়া গিয়াছেন যে, চন্দ্র এক; কিন্তু নব্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, চন্দ্র অনেক। এই দুই মতের কোন্ মত সত্য কোন্ মত ভ্রান্ত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কোনমতই ভ্রান্ত নহে। কেননা, নব্য জ্যোতির্ব্বেত্তারা দেখিয়াছেন যে, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদিগের নিকটে অপর কএকটি চন্দ্র আছে। তাহারা এ পৃথিবীর চন্দ্র নহে, সেই সেই গ্রহবাসীদিগেরই চন্দ্র। আর আর্য্যেরা বলেন, যে বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদিগের নিকটে চন্দ্রতুল্য জ্যোতির্গণ আছে। সেই সকল জ্যোতির্গণ বিমান বা দেবযান নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং উভয় বাদীর বাক্যফল প্রায় একরূপ বলিয়াই অনুমিত হয়।

পৃথিবী যেমন মনুষ্যের বাসস্থান, চন্দ্রমণ্ডলও সেইরূপ পিতৃলোকের বাসস্থান। সেই জন্যই চন্দ্রমণ্ডলের অন্য নাম চন্দ্রলোক ও চন্দ্রভুবন। সেই জন্যই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "চন্দ্রলোকে মহীয়তে, চন্দ্রলোকং স গচ্ছতি।" চন্দ্র যে আমাদের পৃথিবীকে নিজ কিরণে আলোকিত করেন বলিয়া পুলকিত হই, সেই কিরণ তাঁহার নিজের নহে। চন্দ্র নিজে জ্যোতির্ম্ময় নহেন, সূর্য্য-কিরণ-সংযোগ প্রভাবেই উহাঁকে আমরা জ্যোতির্ম্ময় মনে করি। বস্তুতঃ বসুধা যেমন সূর্য্যালোক দ্বারা প্রকাশিতা প্রাপ্ত হন, চন্দ্রও সেইরূপ সূর্য্যকিরণব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চন্দ্রের যে অংশ যখন সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখে থাকে, সেই অংশেই তখন আলোকময় এবং অন্য অংশ অন্ধকারময় হয়। যথা—

"তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশি চন্দ্র শ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রী-
র্ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ॥"

(ভাস্করাচার্য্য।)

অর্থাৎ ঐ পীযূষপিণ্ড চন্দ্রের যে ভাগ যখন সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, সেই ভাগ তখন চন্দ্রিকা দ্বারা প্রকাশমান হয়। সূর্য্যাতপস্থ ঘটের নিরাতপ ভাগ (নিম্ন) যে-

মন আপন ছায়ার দ্বারা আবৃত থাকে, সেই রূপ চন্দ্রমণ্ডলেরও অন্যভাগ আপন ছায়ার দ্বারা আবৃত হয়। সুতরাং তাহা নবযুবতীর কেশ কলাপের ন্যায় শ্যামবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয়।

অমাবাস্যা দিবসে চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের ঠিক্ নিম্নে অবস্থিতি করেন *। তাঁহার যে ভাগ আমরা অন্য সময়ে দেখিতে পাই, সে ভাগ তখন আমাদিগের অদৃশ্য থাকে। ইহার কারণ এই যে, ঐ সময়ে তাঁহার যে ভাগ পৃথিবীর অভিমুখে থাকে, তাহা তাঁহার আপন ছায়ার দ্বারা আবৃত হয়। সুতরাং আমরা তাহা দেখিতে পাই না। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের নিয়ম এই যে, প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর অবয়ব প্রকাশক জ্যোতিঃ আর অস্মদাদির চাক্ষুষ জ্যোতিঃ সরল রেখা ক্রমে ঠিক্ সংযোগ রূপে মিলিত হইলে সেই বস্তু আমাদের জ্ঞান গোচর হয়। ব্যতিক্রম হইলে হয় না। মনেকর, আলোকময় গৃহে থাকিয়াও আমরা অন্ধকারময় গৃহান্তরস্থ বস্তু দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহা বিফল হয়; কিন্তু অন্ধকার গৃহে থাকিয়া আলোকময় গৃহের বস্তু আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কেন পারি? না তৎকালে সেই আলোকিত গৃহস্থ বস্তুর অবয়বে যে জ্যোতিঃ পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহার সহিত অস্মদাদির চক্ষুর জ্যোতিঃ মিলিত হয় বলিয়াই পারি। এই ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্তের সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রধান উপদেষ্টা ভাস্করাচার্য্যের মতের ঐক্য আছে। যথা—

" সূর্য্যাদধস্থস্য বিধোরধস্থ মর্দ্ধং
নৃদৃশ্য মনাৎসকলং শিতং স্যাৎ।
দর্শেঽথ ভার্দ্ধান্তরিতস্য ভানো
স্তৎপৌর্ণমাস্যাং পরিবর্ত্তনেন ॥ "

চন্দ্রের যে অর্দ্ধভাগ মনুষ্যগণের দৃশ্য, অমাবস্যাদিনে সূর্য্যের অধস্থ হইলে চন্দ্রের সেই অর্দ্ধভাগ আপন ছায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে শ্যামতা ধারণ করে। আর রাশি পরিবর্ত্তন ক্রমে সূর্য্যমণ্ডল যখন চন্দ্র হইতে ছয়রাশি অন্তরে স্থিত হয়, তখন তাহা পৌর্ণমাসী বলিয়া গণ্য ও মনুষ্যগণের দৃশ্য হয়।

সকল গ্রহই রাশিচক্রে স্থিত এবং সকল গ্রহই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে নিজ নিজ গতি অনুসারে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছে। রাশিচক্রটি ৩৬০ অংশে বিভক্ত, সুতরাং প্রত্যেক রাশি ৩০। ৩০ অংশে বিভক্ত। সূর্য্য নিজের গতি বা পৃথিবীর গতির দ্বারা ৩০ ত্রিশ দিনে এক রাশির ত্রিংশ অংশ ভোগ করিয়া থাকেন। সূর্য্যের এক রাশি ভোগকালের মধ্যে, চন্দ্রের দ্বাদশ রাশির ভোগ সমাপ্ত হয়। সুতরাং সূর্য্যের এক রাশির একাংশ ভোগ সমাপ্ত হইতে হইতে চন্দ্র এক রাশির দ্বাদশাংশ ভোগ করিতে বাধিত হন। অমাবস্যার শেষক্ষণে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই এক রাশির এক অংশেই অবস্থান করেন, ক্রমে তাঁহাদের গতির তারতম্য অনুসারে অবস্থানেরও তারতম্য ঘটিতে থাকে। প্রতিপদের শেষে চন্দ্র যখন সূর্য্য হইতে দ্বাদশাংশ দূরে গমন

* " সূর্য চন্দ্রমসোর্যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সামাবস্যা। (গোভিল।

করেন, তখন তাঁহার অপ্রকাশিত অর্দ্ধভাগের এক কলা অর্থাৎ ষোড়শাংশের একাংশে সূর্য্যের কিরণ আশ্লিষ্ট হয়। পরন্তু রাশিচক্রের মধ্যান্তরে, পৃথিবীর দ্রুতগতিক্রমে সূর্য্যের অনতিদূরস্থিত চন্দ্রমণ্ডল তৎসহ অস্তগত হওয়ায় চন্দ্রের সেই অপ্রকাশিত অংশ তৎকালে আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

চন্দ্র অমাবাস্যার শেষ ভাগে সূর্য্যের সহিত এক রাশিতে সমসূত্রপাতন্যায়ে সমান অংশে অবস্থান করেন। মন্দ-গতি প্রযুক্ত সূর্য্যের সেই সহাবস্থানীয় অংশের ভোগ সমাপ্ত না হইতে হইতে চন্দ্র সেই রাশির দ্বাদশাংশ ভোগ করেন। এই দ্বাদশাংশ ভোগ করিতে চন্দ্রের যত সময় আবশ্যক হয়, বা ভুক্ত হয়, সেই সময়টির নাম তিথি ও চান্দ্র দিন। এই তিথি রহস্যটি এদেশে বহু প্রাচীন এবং সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ; এজন্য এতদ্বোধক কোন সংস্কৃত প্রমাণ আনয়নের অপেক্ষা নাই।

রাহু ও কেতু ভিন্ন * সকল গ্রহই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সতত গমন করিয়া থাকেন। গ্রহগণ অপেক্ষা রাশিচক্রের অতি প্রবলতর বেগশালিতা প্রযুক্ত তাহা নিজ গতি অনুসারে পশ্চিমাভিমুখী আবৃত্তি নিষ্পন্না হয়। সেই জন্যই আমরা গ্রহগণকে পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্ত হইতে দেখি। এতৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ নিদর্শন এই যে, তোমরা চন্দ্রকে শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার সায়ংকালে যে কোন স্থির নক্ষত্রের নিম্ন ভাগে উদিত হইতে দেখিবে, পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর সায়ংসময়ে চক্ষুঃ প্রসারণ করিলে দেখিতে পাইবে তিনি আর সে স্থানে নাই, সেই স্থির নক্ষত্রের উপরিভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়াছেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে যে,

* রাহু ও কেতু কিরূপ গ্রহ? জানিতে হইলে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। পুরাণ শাস্ত্রের দ্বারা উহার যথার্থ মর্ম্মগ্রহ হয় না বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে একবাক্যতা বা সমন্বয় করিয়া পুরাণের বর্ণনার তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিলে কোন আপত্তিই থাকে না। এই দুই গ্রহ প্রত্যক্ষগোচর হয় না বলিয়াই নব্যবৈজ্ঞানিকেরা উহার গ্রহত্ব লোপ, কেহ বা একবারে উহার অস্তিত্ব লোপপক্ষে যত্নবান্। এই দুই গ্রহ বুধ শুক্রাদির ন্যায় সাকার গ্রহ নহে, সেই কারণে উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা জানিয়া শুনিয়াও এদেশের জ্যোতির্বেত্তারা যে কি জন্য উহার সত্তা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। ফলিত জ্যোতিষে উহাদের বিলক্ষণ কার্য্যকারিত্ব বর্ণনা আছে। এই দুই গ্রহ প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও উহা কল্পনার অধীনে থাকিয়া ফলিত-জ্যোতিষের উপর বিলক্ষণ প্রভুত্ব করিতে দেখা যায়। যাহাই হউক, এই দুই গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, সে সকল যথা ক্রমে ব্যক্ত হইবেক। টীকা মধ্যে সকল কথা বলিতে গেলে টীকার অবয়ব বিপুল হইবেক: কাযে কাযেই "চন্দ্রমণ্ডল" রাহুকেতুর বিচার প্রস্তাবের মধ্যাঙ্গে বিন্যস্ত করিতে হইল।

উক্তরূপ পূর্ব্বগতি কিন্নিবন্ধন? জীর্ণতম আর্য্যভট্ট বলেন যে, পৃথিবীর দৈনিক গতির দ্বারা গ্রহগণকে পূর্ব্বে উদিত ও পশ্চিমে অস্ত হইতে দেখাযায়। দ্বৈপায়ন জাতিরাও এই মতের পক্ষপাতী। আমাদের দেশেও এই মত অভ্যস্ত হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আমাদের যে দুরপনেয় কুসংস্কার বা সুসংস্কার আছে, তাহা বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উক্ত মন্তের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিতেছিনা। সূর্য্যকেন্দ্রক পৃথিবীভ্রমণ সম্বন্ধে ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জোতির্ব্বিদ্‌গণ অনেক আপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষ আপত্তি এই যে, প্রত্যক্ষ গোচর অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র সমূহ রাশি চক্রের ত্রয়োদশ অংশ বিংশতি কলা অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিন শত ষষ্টি অংশে বিভক্ত রাশিচক্রের মধ্যস্থিত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র তদীয় অংশ বিভাগ ক্রমে উক্ত ত্রয়োদশ অংশ বিংশতি কলাত্মক স্থান আবৃত করিয়া স্থিত আছে। সকল গ্রহকেই সময়ে সময়ে উক্ত নক্ষত্র সমূহ ভোগ করিতে দেখা যায়। অতএব যদি পৃথিবীর আবৃত্তির দ্বারা দিবারাত্র ও অয়নাদি নিষ্পত্তি হওয়া যথার্থ হইত, তাহা হইলে ঐ নক্ষত্র সমূহ এবং যে সকল গ্রহ উক্ত নক্ষত্রপথে রাশিচক্রে ভ্রমণ করেন, সেই সকল গ্রহ অয়নভেদে ব্যতিক্রমে দৃষ্ট হইত। অর্থাৎ দক্ষিণায়নে যে নক্ষত্র সমূহকে পৃথিবীর উত্তর ভাগে দেখিতে পাইতেছি, উত্তরায়ণে সেই সকল নক্ষত্রকে পৃথিবীর দক্ষিণভাগে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চয় করা হইয়াছে যে, ঐ সকল নক্ষত্রশ্রেণী নিয়তই পৃথিবীর একই ভাগে অবস্থান করে, কোন কালেই উহাদের স্থিতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। অপিচ, সতত নক্ষত্রচারী গ্রহগণ কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন সকল সময়েই অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রে* অর্থাৎ মেষ রাশিতে থাকিলেও পৃথিবীর উত্তরাংশেই দৃষ্ট হয়। চন্দ্রের মেষরাশিতে স্থিতিকালে তিনি উত্তরায়ণে পৃথিবীর যে ভাগে উদিত হন, দক্ষিণায়নেও তাঁহাকে তাহার সেই ভাগেই উদিত হইতে দেখা যায়। যদি কেহ এমত বলেন যে, চন্দ্র পৃথিবীর সহিত সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করেন, তাহাতেই তাঁহার অয়নভেদে গতিভেদ ঘটনা হয় না, তাহা হইলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, চন্দ্রের ন্যায় অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রচক্র সকলেই কি পৃথিবীর সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে? অয়নভেদে অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্র চক্রের গতির অবৈষম্য স্থির রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে তোমাদিগকে উক্ত কথা অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য দাঁড়ায়। কিন্তু কৈ? আর্য্যভট্ট কি দ্বৈপায়ন জাতীয় নব্য বৈজ্ঞানিকেরা ত উক্তরূপ কথা বলেন না, অন্যে বলিলেও উহা স্বীকার করেন না? যদিও তাঁহারা স্বমত রক্ষার গত্যন্তর না দেখিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলেও অন্যান্য অনেক বিধ আপত্তি উপ-

---

* এক এক রাশিতে সপাদ দুই নক্ষত্রের স্থিতি আছে। এইজন্য জ্যোতির্গণনায় অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার এক পাদ মেষ রাশি বলিয়া গৃহীত হয়।

স্থিত হয়। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই বোধহয় আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার ঐ অসিদ্ধান্তিত মতের অনুগামী হন নাই এবং পৃথিবীর গতির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাশি-চক্রেরই গতি আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর ভ্রমণ সম্বন্ধে অপরাপর অনেক আপত্তি আছে। তাহা এ প্রবন্ধের যোগ্য বিষয় নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। "পৃথিবীই ঘুরিতেছে" এই মতটির সত্যতা বুঝিবার জন্য সহজ উদাহরণ এই যে, যদি পৃথিবীর আবর্ত্তনই সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই রাশি চক্রের আবর্ত্তনটি মিথ্যা হইবেক। যাহার মূল মিথ্যা, তাহার ফলও মিথ্যা। সুতরাং রাশিচক্রের গতি-বাদিগণের গণিত ফল মিথ্যা হওয়াই উচিত। কিন্তু কৈ? তাহাত হয় না? চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণাদির প্রত্যক্ষ গণিত ফলের কোন অংশই ত কখন মিথ্যা হইতে দেখা যায় না? একবার এই সকল চিন্তা করিয়া বল দেখি, কোন্ মতটি সত্য? অবশ্যই তোমার অন্যতর মতের স্থির সত্যতা পক্ষে সংশয় হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে আর এত ধৃষ্টতা কেন? তোমরাই সত্যাবিষ্কারক, আর ঋষিরাই নির্ব্বোধ এরূপ ধারণাকে মনোমধ্যে স্থান দেওয়াই অকর্ত্তব্য। যাহাই হউক, প্রসঙ্গাগত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃতানুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

পৌর্ণমাসীর শেষে চন্দ্র যখন সূর্য্য হইতে সপ্তম রাশিতে অবস্থান করেন, তখন সূর্য্যাস্তের পরেই তিনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হন। দিবারাত্রের মধ্যে দ্বাদশ রাশির উদয় হওয়ার প্রণালী পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদনুসারে দিবসে ছয় রাশি এবং রাত্রে ছয় রাশি অতিবর্ত্তিত হয়। এতৎক্রমে, সূর্য্য প্রাতঃকালে যে রাশিতে উদিত হয়েন, তাহার সপ্তম রাশিতে তাঁহার অস্ত ঘটনা হয়। সেই জন্যই আমরা পূর্ণিমা দিনে সূর্য্যাস্তের অন্ত্যক্ষণেই চন্দ্র দর্শন করিয়া থাকি। এই সময়ে পৃথিবীর একপার্শ্বে সূর্য্য এবং অন্য পার্শ্বে চন্দ্র অবস্থিত থাকায় তাহার বিপরীত দিকে পৃথিবীর সূর্য্যাকার এক ছায়া জন্মে। সময় বিশেষে পূর্ণিমা কালে চন্দ্র যখন সেই ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন আর আমরা তাঁহার সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত শুভ্রালোক দেখিতে পাই না; সুতরাং আমরা বলি যে চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তটি সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতির্গ্রন্থে অতি বিশ্বাস্য বাক্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশেদস্য ভবেদসৌ॥"

অর্থাৎ অমাবাস্যার শেষে চন্দ্র আদিত্যের নিম্নে থাকিয়া তাঁহার আচ্ছাদক হন। যদিও সূর্য্য-মণ্ডলাপেক্ষা চন্দ্র-মণ্ডল অল্পায়ত; তথাপি, সূর্য্যের অধঃস্থিত ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ বা মেঘখণ্ড যেমন অস্মদাদির নয়ন পথ আবৃত করিয়া সূর্য্যের আচ্ছাদক রূপে স্বীকৃত হয়, সেইরূপ, চন্দ্রও তাঁহার আচ্ছাদক রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। আর পূর্ণিমাশেষে চন্দ্র যখন পূর্ব্বমুখ হইয়া পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার গ্রহণ হয়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবধারিত থাকায় প্রতি পৌর্ণমাসীর শেষে চন্দ্র গ্রহণ ও প্রতি অমাবাস্যার শেষে সূর্য্য গ্রহণ হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু তাহা হয় না। সেরূপ না হইবার কারণ এই যে, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরা নিজ নিজ গতি ক্রমে যে নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবিত হন, সেই দুই পথ পরস্পর যে দুই স্থানে গিয়া মিলিত হয়, তাহার নাম "চন্দ্রপাত"। চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরা নিয়তই পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করেন, সুতরাং তদুভয়ের ভ্রমণ পথের সন্ধি পশ্চিম দিক্ ভিন্ন অন্যত্র স্থিত হইতে পারে না। অপিচ, ঐ চন্দ্রপাত সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে না, প্রায় অষ্টাদশ মাস অন্তরে অন্তরে পশ্চিমমুখে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গত হয়। যখন যে রাশির যে অংশে ঐ চন্দ্র পাত অবস্থিতি করে, পূর্ণিমা কি অমাবাস্যার শেষে চন্দ্র কিংবা সূর্য্য যদি ঠিক্ সেই রাশির সেই অংশে স্থিত হন, তবেই তখন চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ আমাদের দর্শনযোগ্য হয়, নতুবা অন্য সময়ে তাহা আমাদের দর্শনযোগ্য হয় না। পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, গ্রহণ কালে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থকার সেই পৌরাণিক মতের সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের ঐক্য বা সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত 'চন্দ্রপাত' কেই রাহু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। যথা—

"কুমুদিনীপতিপাত মাহু রাহু মিতি কেহপিতমেব।" (সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

"দক্ষিণোত্তরতোহপ্যেবং
পাতোরাহুঃ স্বরংহসা।"
(সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

"অতস্তৎতম এবাহত্র রাহু রাবণং কিল।
চন্দ্রার্ক গ্রহণে যশ্চ শ্রুতি স্মৃত্যাদিষূদিতঃ॥"
(সিদ্ধান্ত তত্ত্ব বিবেক।

ভাস্করাচার্য্য রাহুর স্বরূপ নির্ণয় করিয়া অবশেষে বলিলেন যে, কোন কোন পণ্ডিত চন্দ্রপাতকেই রাহু বলেন, কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্রপাতও রাহু নহে। চন্দ্রপাত রাহুর বাস স্থান। যাহাই হউক, রাহু ও কেতু যে বৃত্তসম্পাত দ্বয়ের প্রাচীন নাম, ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে অনুমান করা যাইতে পারে। দেবীপুরাণোক্ত রচনাবলির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত অনুমানের সকল সংশয় অপনীত হইতে পারে। ঋষিরা যে চন্দ্রপাত বা ছায়াপথসন্ধিকেই রাহুকেতু বলিয়া উচ্চারণ করিতেন, তাহা দেবীপুরাণ দেখিলেই জানাযায়। দেবীপুরাণের বচন নিচয় ও অন্যান্য রহস্য সকল ক্রমে লিখিত হইবেক।

(ক্রমপ্রকাশ্য।)

শ্রীকালীবর শর্ম্মা—

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক।

৫ম ভৌমিক-পঃ চাঁদ প্রতাপের চাঁদ গাজী।

ঢাকার জিলায় বিক্রমপুর ও চাঁদ প্রতাপ এই দুটি প্রসিদ্ধ পরগণা আছে। প্রবল প্রতাপ চাঁদ গাজি এই চাঁদপ্রতাপ পরগণার অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান মাণিকগঞ্জ মহকুমার সমগ্র, ও নবাবগঞ্জের অধিকাংশ এই পরগণার অন্তর্গত। সুতরাং চাঁদ গাজীর জমিদারি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। চাঁদ গাজী বা তদীয় বংশের প্রামাণিক কোনও বৃত্তান্তই আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তবে বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি. চাঁদ গাজীর এক জন বংশধর (পৌত্র কি প্রপৌত্র হইবে) হাজি বাগল নামে এক ব্যক্তি লক্ষীকোলের নিকট আসিয়া বসতি করেন। উহাঁর গৃহটি এত বৃহৎ ছিল যে, লক্ষীকোল হইতে আরম্ভ করিয়া নয়াবাড়ীর অধিকাংশ লইয়া উহা বিস্তৃত ছিল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নয়াবাড়ীর দক্ষিণে পদ্মা ও উত্তরে বলমন্ত নামে দুটি বেগবতী স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল। বলমন্ত নদে হাজি বাগলের বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া নেয়। পরিশেষে হাজিবাগল একটি প্রকাণ্ড মস্‌জিদে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেছেন, এমন সময় তৎসহ মস্‌জিদটি নদের কুক্ষিগত হয়। মস্‌জিদটি বলমন্ত নদের পশ্চিম মোহনার ধারে ছিল, সুতরাং মস্‌জিদটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মোহনাতে চড়া পড়িয়া যায়, সেই অবধি বলমন্ত একটি বিলের আকার ধারণ করিয়াছে। অধুনা ঐ বিলের নাম চাড়াখালীর বিল। সৈদনগর, এব্রাহিমপুর, বাহের ডাঙ্গী প্রভৃতি গ্রামগুলি নদীগর্ভে স্থাপিত হইয়াছে। আর কিছু দিন পর চাড়াখালীর বিল ধান্যের ভূমি রূপে পরিণত হইবে। নয়াবাড়ীর অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম চাঁদপুর, এবং উহার অব্যবহিত দূরস্থিত একটি শুষ্ক খালের নাম চাঁদ খালি। এই দুটি নামের সহিত চাঁদ গাজীর নামের কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানা যায় না।

৬ষ্ঠ ভৌমিক—ভুষণার মুকুন্দরাম রায়।

জাফর খাঁ সরকার মাহামুদাবাদকে দুই অংশে বিভক্ত করেন। উহার এক অংশ যশোহরের অন্তর্গত পরগণে ভূষণার সহিত সংযোজিত হয়। এই ভূষণার জমিদারেরা জাফর খাঁর অনেক পূর্ব্ব হইতে প্রবল পরাক্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুকুন্দরাম রায় এই বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। মুকুন্দ রায় ফতেবাদ ও ভূষণা দুটি পরগণার অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান দক্ষিণ সাগাবাজপুর, শণদ্বীপ প্রভৃতি স্থান এই ফতেবাদ

পরগণার অন্তর্ভূত ছিল। পাদশা নামায় এই মুকুন্দ রায়ের নাম "ভূষণার মুকুন্দ"। আবুল ফজল বলেন মুরাদ খাঁ বাকলা জয়ের পর মুকুন্দ রায়কে আক্রমণ করেন। মুরাদের সহিত ভাক্ত সন্ধি করিয়া, মুকুন্দ রায় তাঁহাকে সপুত্রক একটি প্রীতিভোজে আমন্ত্রণ করেন, এবং কৌশল পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করেন। মুকুন্দ রায়ের নামানুসারে ফরিদপুরের বিপরীত দিক স্থিত পদ্মাতীরস্থ একটি চরের নাম হইয়াছে। চরমুকন্দিয়া নামে তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শত্রুজিৎ নামে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া মুকুন্দ রায় পরলোক গমন করেন। শত্রুজিৎ ভৌমিক পদে অভিষিক্ত হইয়া ঢাকার নবাবকে নজর পাঠান না; এবং কিছু দিনের মধ্যে রাজস্ব প্রদানও বন্ধ করেন। কুচবিহার ও কোচহাজার রাজাদিগের সহিত, তাঁহার বিলক্ষণ বন্ধুতা জন্মে। এবং কথিত আছে উক্ত নৃপতি দ্বয়ের প্ররোচনাতেই শত্রুজিৎ বঙ্গেশ্বরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন জাহাঙ্গীর সাহ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। শত্রুজিতের বীরত্ব ও দুর্দ্ধর্ষতার সংবাদ ক্রমে দিল্লীশ্বরের কর্ণে পঁহুছিল; তিনি ইহাঁকে দমন করিতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই মহাবীর শত্রুজিৎকে দমন করিতে পারেন না। শত্রুজিৎ বাস্তবিকই শত্রুজিৎ ছিলেন। কিন্তু জয়লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া হউক, অথবা বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য বলিয়াই হউক, ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সাজাহান বাদসাহের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার ভূষণ স্বরূপ ভূষণার অধিপতি নবাব প্রেরিত সৈন্যের নিকট পরাস্ত ও বন্দীকৃত হন; তাঁহাকে ঢাকা লইয়া যাইয়া নিষ্ঠুর নবাব ঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করে। শত্রুজিৎ আজ প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতাব্দী হইল মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালা হইতে তাঁহার নাম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। শত্রুজিৎপুর বা ছত্রজিৎপুর নামে অদ্যাপি দুইটি বৃহৎ গ্রাম তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম আমাদের স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিতেছে। ইহার একটি গ্রাম যশোহর জিলার অন্তর্গত মাগুরা সবডিবিসনের মধ্যে নবগঙ্গা নদীর ধারে অবস্থিত; অপরটি ঢাকার জিলার অন্তর্গত লেছড়াগঞ্জের থানার অধীন। উহা অধুনা চাঁদ প্রতাপ পরগণার অন্তর্ভূত। ইহাতে বোধ হয়, ভূষণার জমিদারি চাঁদ প্রতাপ পরগণার প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বংশের আর কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন সুবিখ্যাত সীতারাম রায় মুকুন্দ রায়েরই বংশধর ছিলেন।

৭ম ভৌমিক—ভাওয়ালের ফজলগাজী।

ভাওয়াল পরগণা ঢাকার উত্তরাংশ লইয়া আরম্ভ করিয়া গারো পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভাওয়াল পরগণার উত্তরাংশের নাম রণভাওয়াল, উহা পূর্ব্বে কামরূপের অধীন ছিল। ভাওয়ালের মৃত্তিকা লাল। 'রণভাওয়াল' এই নাম, ও মৃত্তিকার লো-

হিত বর্ণ, এই দুইটি বিষয় হইতে একটি প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবাদটি এই যে, মহামায়া এই স্থানেই মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং তাহাকে হত করেন। এই দেবীযুদ্ধ বশতঃই ইহার নাম রণভাওয়াল হইয়াছে, এবং অসুর শোণিতে রঞ্জিত বলিয়াই ইহার মৃত্তিকা লাল।

কথিত আছে প্রায় ছয়শত বৎসর গত হইল, পলোহান বংশধর গাজী বংশীয়েরা ভাওয়াল ও তন্নিকটবর্ত্তী পরগণা সমূহের অধিপতি ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেবের তান বাজিয়া উঠে; যখন মিথিলায় 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' শিব সিংহের সভায় মহাকবি বিদ্যাপতি অর্দ্ধহিন্দী অর্দ্ধবাঙ্গালা ভাষায় নূতন ছন্দে নূতন রাগে বিরহ গীতি কীর্ত্তন করেন; এবং যখন বীরভূমজিলার অন্তর্গত নান্নূর গ্রামে স্বভাব কবি 'দ্বিজচণ্ডীদাস' বিদ্যাপতির সহিত সুর মিশাইয়া খাস বাঙ্গালা ভাষায় ব্রজলীলার 'প্রেম বৈচিত্র্য' কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন; সেই সময় ভাওয়াল পরগণায় পলোহান সাহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পলোহান সাহার পুত্র কারফরমা সাহা একজন বিখ্যাত ফকির ছিলেন। তদীয় অলোকসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে তিনি যখন দিল্লীতে বাস করেন, তখন কোনও কারণে দিল্লীশ্বরের একটি বৃহৎ প্রাসাদের ছাদ দ্বিধা হইয়া যায়। প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয় করিয়া এই গৃহটি নির্ম্মাণ করা হইয়া ছিল, কিন্তু এই ছাদ ফাটিয়া যাওয়াতে গৃহটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ে। সম্রাট্ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। বিখ্যাত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও প্রসিদ্ধ কারুগণ কোনও ক্রমে ছাদটি সংযুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না। পরিশেষে গৃহটি ভগ্ন করাই স্থির হয়। কারফমা সাহা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অট্টালিকাটি দেখিতে যান, এবং অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনটি করতালি দেন। তিন করতালিতেই ছাদ স্বয়ং আসিয়া সংযুক্ত হয়। উহা এরূপে মিলিয়া গেল যে, কখনও ফাটিয়াছিল বলিয়া কাহার বুঝিবার উপায় রহিল না। বাদসাহ লোক পরম্পরায় ফকিরের এই অলৌকিক কাণ্ড শ্রবণ করতঃ কারফরমা সাকে স্বীয় সমীপে ডাকাইলেন। এবং অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ভাওয়াল পরগণা প্রদান করেন। কারফরমা তখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু সম্রাট্ সমীপে কহিলেন, আমি ফকির আমার জমিদারিতে প্রয়োজন নাই, তবে যদি পুরস্কার প্রদান করা দিল্লীশ্বরের একান্ত ইচ্ছাই হইয়া থাকে, তবে এক কার্য্য করুন। আমার অনেক গুলি পুত্রকন্যা হইবে, তাহাদের ভরণপোষণার্থ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বড়গাজীর নামে উক্ত জমিদারির সনন্দ লিখা হউক। সম্রাট্ তাহাই করিলেন; ফকির নিঃসন্তান ও অবিবাহিত বলিয়া অমাত্যেরা কেহ কেহ দানপত্রের উক্ত রূপ লিপিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু ফকিরের যে বহু সন্তান সন্ততি হইবে,

দিল্লীশ্বরের সে বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কারফরমার প্রার্থনানুসারে তদীয় ভাবী জ্যেষ্ঠপুত্র বড়গাজীর নামে দান পত্র লিখিয়া দিলেন। কারফরমা ভাবী পুত্রের উছি স্বরূপ ভাওয়াল পরগণার অধিকারী হইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। এবং শীতল লক্ষা নদীর তীরে চৌরানামক স্থানে বাস করিলেন *। বড়গাজীর পর ছয় পুরুষের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। সপ্তম পুরুষ বাহাদুর সাহা নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা জীবিতা ছিল; ঐ কন্যার স্বামীর নাম মহাতাব গাজী। বাহাদুরের মৃত্যুর পর জামাতা মহাতাব গাজী শ্বশুরের বিত্তের অধিকারী হয়েন। আকবরের সৈন্য যখন বাঙ্গালা অধিকার করিতে আইসে, তখন মহাতাব বা তদীয় পুত্র ফজলগাজী ভাওয়ালে 'ভৌমিক' ছিলেন। রুস সাহেবের মতে, তদানীন্তন ভাওয়ালের ভৌমিকের নাম জোনাগাজী। গাজী পরিবারের নিকট এখনও প্রাচীন কোন কোন কাগজ পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাসুজার লিখিত এক খানি সনন্দে লিখিত আছে, ইছলাম গাজীর পরলোক প্রাপ্তির পর দৌলত গাজী তদীয় স্থলাভিষিক্ত হইবেন। আর এক খানি কাগজে চাঁদপ্রতাপের চাঁদ গাজী ও তলিপাবাদের তোনাগাজীকে ভাওয়ালের বড়গাজীর সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর এক খানি কাগজে ভাওয়ালের বার্ষিক রাজস্ব ৪৮৩০০ ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

বাঙ্গালার তদানীন্তন একশত বৎসরের ইতিহাস মধ্যে গাজী পরিবারের কএক ব্যক্তির নাম মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। আওরঙ্গজীব বাদসাহের মৃত্যুর পর গাজী পরিবার অত্যন্ত বিলাসী হইয়া উঠেন। তাঁহারা একবারে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের হস্তে সমস্ত ন্যস্ত করেন। এবং এই সকল নীতিশূন্য কর্ম্মচারীর অত্যাচারদোষে অচিরেই উক্ত পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ইহাঁদিগের অধিকাংশ বিত্তই নিলামে বিক্রীত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান ভূম্যধিকারিদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভাওয়ালের জমিদার হন। কিরূপে গাজীপরিবারের বিত্ত রায়-পরিবারের হস্তগত হইল, ভরসা করি সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়, এই প্রবন্ধের ফুটনোটে তাহা বিবৃত করিয়া ঐতিহাসিক সত্য পিপাসু পাঠকবর্গের পিপাসার শান্তি করিবেন †।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে গাজী পরিবারস্থ সুলেতান গাজী বিত্ত পুনঃপ্রাপ্তির জন্য লর্ডকর্ণওয়ালিশের নিকট এক আবেদন করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় না। ওয়াইজ সাহেব বলেন চৌরা নামক স্থানে অদ্যাপি গাজী পরিবারস্থ লোকেরা অতি দীনভাবে

* ডাক্তর ওয়াইজের প্রবন্ধ হইতে আমরা এই প্রবাদটি গ্রহণ করিলাম। তিনি এই স্থানের কোনও বিশেষ বিবরণ দেন নাই।

† সে এক সুদীর্ঘকাহিনী। ফুটনোটে অত কথা লেখা পোষাইবে কি? সঃ

জীবন যাপন করিতেছে। সংপ্রতি কয়েক বিঘা লাখেরাজ জমি মাত্র ইহাঁদিগের জীবনোপায়ের এক মাত্র সম্বল। চৌরাতে এখনও পলোহান সা ও কারফরমান সার সমাধিমন্দির বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত একটি অতিপুরাতন বৃহৎ মস্‌জিদ এবং বহুদূর বিস্তৃত প্রকাণ্ড একটি দীর্ঘিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত মস্‌জিদ প্রভৃতির অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিম ভাগে বয়াজিদ গাজীর সমাধিমন্দির রহিয়াছে। বহুবর্ষ গত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত মন্দিরটির কোন স্থান ভগ্ন কি বিকৃত হয় নাই। ঐ মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রাকার পরিবেষ্টিত। উহার অনতি দূরে একটি দুর্গের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দুর্গের কিঞ্চিৎ দূরে 'কোষখালি' নামে একটি শুষ্ক খাল বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে গাজী পরিবারের রণতরী থাকিত। লক্ষার ধারে আধুনিক বালিগ্রামের নিকট মহাতাবের পিতা বাহাদুর সার নির্ম্মিত একটি বৃহদায়তন মস্‌জিদ ছিল। উহার ভগ্নাবশেষ এখন পড়িয়া রহিয়াছে, এবং উহার গাত্রে প্রস্তর ফলকে আরব্য ভাষায় একটি উৎসর্গ পত্র পাওয়া গিয়াছে। গাজী পরিবারের অধীনে অনেকগুলি তালুকদার ছিলেন, ইহাঁরা যখন সদর খাজানা দিতে রাজধানীতে আসিতেন, তখন প্রত্যেকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট গৃহে বাসা করিয়া থাকিতেন। এই 'বাসাবাটী' গুলি এখন আর নাই, কিন্তু উহাদের চিহ্ন রহিয়াছে। প্রাগুক্ত তালুকদার বংশীয় অনেকে ভাওয়ালের অভিনব ভূম্যধিকারীকে রাজস্ব প্রদান করেন।

শ্রী.জ—

আয়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ, বয়ঃকালকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—বাল্যকাল, মধ্যকাল ও বৃদ্ধকাল। তন্মধ্যে ঊনষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যকাল। এই বাল্যকালও ত্রিবিধ, প্রথম এক বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধাশন কাল, তদূর্দ্ধ এক বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধ ও অন্নমিশ্রিত অশন কাল; তদূর্দ্ধ কেবল অন্নাশন কাল।

ষোড়শবর্ষ অবধি সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত মধ্যকাল। ইহা চতুর্ব্বিধ। যথা—বৃদ্ধি, যৌবন, সম্পূর্ণতা, হানি। বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধিকাল, তৎপরে দ্বাত্রিংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন কাল, তৎপরে চত্বারিংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা কাল। এই সময়ে শারীর ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য প্রভৃতি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৎপরে সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত হানিকাল।

সপ্ততি বৎসরের পরবর্ত্তী কালকেই বৃদ্ধ-

কাল বলা যায়। এই সময়ে শারীর ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য প্রভৃতি দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে; এবং বলি, পলিত, কাস, শ্বাস প্রভৃতি জরাজন্য রোগ সমূহ উপস্থিত হইয়া শরীরকে সমস্ত কার্য্যে অসমর্থ করে।

স্বভাবতঃ বাল্যকালে শ্লেষ্মা, মধ্যকালে পিত্ত এবং বৃদ্ধকালে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। *

স্বাস্থ্যপালন বিধি।

সুস্থলক্ষণ।

যাহার শরীরস্থ দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) অগ্নি, ধাতু (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র), মল, মূত্র, কার্য্যোৎসাহ প্রভৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রসন্ন থাকে, তাহাকেই সুস্থ বলা যায় †।

দিনচর্য্যা।

স্বাস্থ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে) শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বাসস্থানের কিঞ্চিৎদূরে নির্জ্জন স্থানে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্তিকা ও জলদ্বারা হস্ত পদাদি ও মল-মার্গ প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে কষায়, মধুর, কটু ও তিক্ত রস যুক্ত বৃক্ষের কোমল শাখাগ্রদ্বারা দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলিবৎ স্থূল, সরল, গ্রন্থিশূন্য ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা (দন্তমূলস্থ মাংস আহত না হয়, এরূপ ভাবে) দন্ত মার্জ্জন করিবে।

নিজ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ, রস ও বীর্য্য প্রভৃতির ন্যূনাধিক্য ও শীত বসন্তাদি ঋতুকালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কটু-কষায়াদি রসযুক্ত বৃক্ষশাখা দন্ত মার্জনার্থ নির্ব্বাচন করিবে। তন্মধ্যে তিক্ত রসে নিম্ব, কষায় রসে খদির, মধুররসে যষ্টিমধু এবং কটুরসে করঞ্জ বৃক্ষই শ্রেষ্ঠ ‡।

---

* বয়স্তুত্রিবিধং বালং মধ্যং বৃদ্ধমিতি। তত্রোনষোড়শবর্ষাবালা স্তেপি ত্রিবিধাঃ ক্ষীরপাঃ ক্ষীরান্নাদাঃ অন্নাদা ইতি, তেষু সম্বৎসরপরাঃ ক্ষীরপাঃ দ্বিসংবৎসরপরাঃ ক্ষীরান্নাদাঃ পরতোঽন্নাদা ইতি। ষোড়শসপ্তত্যোরন্তরে মধ্যংবয়ঃ তস্য বিকল্পঃ বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা হানিরিতি। তত্রাবিংশতের্বৃদ্ধি রাত্রিংশতো যৌবন মাচত্বারিংশতঃ সর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্য সম্পূর্ণতা অত উর্দ্ধমীষৎ পরিহানির্যাবৎ সপ্ততিরিতি। সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীয়মাণধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্যোৎসাহমহন্যহনি বলিপলিত খালিত্য জুষ্টং কাসশ্বাস প্রভৃতিভিরুপদ্রবৈরভিভূয় সর্ব্বক্রিয়াস্বসমর্থং জীর্ণাগারমিবাভিবৃষ্টমবসীদন্তং বৃদ্ধমাচক্ষতে। বালে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা মধ্যমে পিত্তমেবতু, ভূয়িষ্টং বর্দ্ধতেবায়ুর্বৃদ্ধে তদ্বীক্ষ্য যোজয়েৎ। (সুশ্রুতঃ)

† সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ। প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে। (সুশ্রুতঃ)

‡ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ সুস্থোরক্ষার্থমায়ুষঃ। শারীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্। (বাভটঃ)। তত্রাদৌ দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তং। কনিষ্টিকাপরীণাহ মৃ-

গুবাক, তাল, হিন্তাল, কেতকী, বৃহৎবর, (তাড়ী) খর্জূর ও নারিকেল এই সপ্ত বৃক্ষের শাখাদ্বারা কখনও দন্ত মার্জন করিবে না *।

গল,তালু,ওষ্ঠ,জিহ্বা ও দন্ত রোগী,মুখক্ষত, কাস,শ্বাস, হিক্কা,বমী,অজীর্ণ মূর্চ্ছা, মত্ততা, শিরঃশূল, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি অর্দ্দিত, কর্ণশূল, শোথ, নেত্ররোগ, হৃদ্রোগ নবজ্বর যুক্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তির দন্ত মার্জন অকর্ত্তব্য †।

দন্তমার্জনদ্বারা মুখের দৌর্গন্ধ্য, লিপ্ততা ও কফ বিনষ্ট হয়, এবং মুখ পরিষ্কৃত, অন্নে রুচি, ও মনঃ প্রফুল্ল হয় ‡।

দন্ত মার্জনান্তে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি নির্ম্মিত, অতীক্ষ্ণ (মৃদু ও মসৃণ) ও বক্র জিহ্বা-নির্লেখন (জিভ্‌ছোলা) দ্বারা জিহ্বামূলগত মলাদি অপহরণ করিবে ¶।

জিহ্বা পরিষ্কৃত করিলে বিরসতা, দৌর্গন্ধ্য, শোথ ও জড়তা প্রভৃতি বিদূরিত হয় §।

মুখে তৈল ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ বস্তুদ্বারা অথবা ক্ষীরীবৃক্ষ (বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি) প্রভৃতির কষায় দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয় এবং রুচিজন্মে **।

শীতলজলদ্বারা মুখ ও নেত্র শিঞ্চন করিলে মুখব্যঙ্গ, নীলিকা, পীড়কা, মুখশোষ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশান্ত হয়। এবং দৃষ্টিশক্তির উৎকর্ষতা জন্মে ††।

প্রতিদিন নেত্রে সৌরীরাঞ্জন (সুরমা) ব্যবহার করিলে নেত্রের দাহ, কণ্ডূ, ক্লেদ,

---

দ্ব্যগ্রস্থিত মব্রণং। অযুগ্মগ্রন্থি যচ্চাপি প্রত্যগ্রং শস্তভূমিজং। অবেক্ষ্যর্ত্তুঞ্চ দোষঞ্চ রসংবীর্য্যঞ্চ যোজয়েৎ। কষায়ং মধুরং তিক্তং কটুকংপ্রাতরুত্থিতঃ। নিম্বশ্চ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা। মধুকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা। (সুশ্রুতঃ)

* গুবাকতালহিন্তালং কেতকশ্চ বৃহদ্বরঃ। খর্জূরং নারিকেলঞ্চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ। তৃণরাজসমুৎপন্নং যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। নরশ্চ গুালগোনিঃস্যাৎযাবৎগঙ্গাংনপশ্যতি। (ভাব প্রকাশঃ)

† নখাদেৎগলতাল্বোষ্ঠ জিহ্বাদন্তগদেষুচ। মুখস্য পাকে শোথে চ কাসশ্বাস বমীষুচ। দুর্ব্বলোঽজীর্ণভুক্তশ্চ হিক্কামূর্চ্ছামদান্বিতঃ। শিরোরুজার্ত্তস্তৃষিতঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ। অর্দ্দিতঃ কর্ণশূলীচ নেত্ররোগী নবজ্বরী। বর্জয়েদ্দন্তকাষ্ঠঞ্চ হৃদাময়যুতোঽপিচ। (ভাবপ্রকাশঃ)

‡ তদ্দৌর্গন্ধ্যোপদেহৌচ শ্লেষ্মাণঞ্চাপকর্ষতি। বৈশদ্যমন্নাভিরুচিং সৌমনস্যং করোতি চ। (সুশ্রুতঃ)

¶ সুবর্ণরূপ্যতাম্রাণি ত্রপুরীতিময়ানিচ। জিহ্বানির্লেখনানি স্যুরতীক্ষ্ণান্যনৃদূনিচ। (চরকঃ)

§ মুখবৈরস্য দৌর্গন্ধ্য শোফজাড্যহৃরংপরং। (সুশ্রুতঃ)

** দন্তদার্ঢ্যকরংরুচ্যংস্নেহগণ্ডূষধারণং। ক্ষীরবৃক্ষকষায়ৈর্ব্বাক্ষীরেণ চ বিনিশ্রিতৈঃ। (সুশ্রুতঃ)

†† প্রক্ষালয়েন্মুখং নেত্রে স্বস্থঃ শীতোদকেন বা। নীলিকাংমুখশোষঞ্চ পীড়কাংব্যঙ্গমেবচ। রক্তপিত্তকৃতান্ রোগান্ সদ্য এববিনাশয়েৎ। (সুশ্রুতঃ)

মল ও বেদনা নিবৃত্ত হয়। এবং চক্ষুঃ তেজস্বি ও বাতাতপসহিষ্ণু হয় এবং নেত্ররোগের আশঙ্কা থাকে না *।

পরিশ্রান্ত, রাত্রিজাগরিত, শিরঃস্নাত, জ্বরযুক্ত ও ভুক্ত ব্যক্তির নেত্রে অঞ্জন ব্যবহার নিষিদ্ধ †।

প্রতিদিন সর্ষপ তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে শিরঃশূল, বলি, পলিত, ও মুখব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগের আশঙ্কা বিদূরিত হয় ‡।

ব্যায়ামবিধি।

বলবান্ ও স্নিগ্ধদ্রব্যভোজী ব্যক্তির প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম (শরীরের আয়াসজনক কর্ম্ম অর্থাৎ কুস্তি) অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শরীরের উপচয়, কান্তি, নীরোগিতা, দৃঢ়মাংসতা, সৌন্দর্য্য, অনালস্য, স্থিরতা, লঘুতা, নির্ম্মলতা ও অগ্নিদীপ্তি প্রভৃতি সংসাধিত হয়। এবং শরীর পরিশ্রম, পিপাসা ও শীতোষ্ণাদি ক্লেশসহিষ্ণু হয়। নিত্যব্যায়ামশীল ব্যক্তির অতিস্থূলতা ও শত্রুকর্ত্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা বিদূরিত হয়, এবং বিরুদ্ধ, গুরুপাক ও অহিত ভোজন করিলেও তাহা অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়।

ব্যায়ামকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যখন হৃদয়স্থ বায়ু মুখদ্বারা ঘন ঘন নির্গত হয়, অথবা ললাট, নাসিকা, কক্ষা ও অঙ্গ-সন্ধিস্থানে ঘর্ম্ম নির্গম হয়, তখনই ব্যায়াম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ ইহার অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে ক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, বমী, ভ্রম, ক্লম, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে।

শীত ও বসন্তকালে উক্তরূপ সম্পূর্ণ ব্যায়াম করিবে, তদ্ভিন্ন ঋতুকালে তদপেক্ষায় অল্প ব্যায়াম করিবে। অন্যথা শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে।

কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, শোষ, ক্ষত, ভ্রান্তিরোগযুক্ত, কৃশ, দুর্ব্বল ও ভুক্ত ব্যক্তির ব্যায়াম কার্য্য নিষিদ্ধ।

ব্যায়ামান্তে হস্তদ্বারা শরীর ঈষৎ মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রান্তিদূর হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিবে ¶।

* মতংস্রোতোঽঞ্জনং শ্রেষ্ঠং বিশুদ্ধং সিন্ধুসম্ভবং। দাহকণ্ডূমলঘ্নঞ্চ দৃষ্টিক্লেদরুজাপহং। অক্ষোরূপাবহঞ্চৈব সহতে মারুতাতপৌ। ননেত্ররোগা জায়ন্তে তস্মাদঞ্জনমাচরেৎ। (সুশ্রুতঃ)

† ভুক্তবান্ শিরসা স্নাতঃ শ্রান্তশ্ছর্দনবাহনৈঃ। রাত্রৌজাগরিতশ্চাপি নাঞ্জ্যাজ্জ্বরিত এবচ। (সুশ্রুতঃ)

‡ কটুতৈলাদি নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন যোজয়েৎ। প্রাতঃশ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ং সমীরণে। সুগন্ধবদনাঃ স্নিগ্ধনিস্বনাঃ বিমলেন্দ্রিয়াঃ। নির্বলিপলিতব্যঙ্গা ভবেয়ুর্নস্যশীলিনঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

¶ শরীরায়াসজননং কর্ম্মব্যায়ামউচ্যতে। তৎকৃত্বাসুসুখংদেহংবিমৃদ্নীয়াৎসমন্ততঃ। শরীরোপচয়ঃ কান্তির্গাত্রাণাং সুবিভক্ততা। দীপ্তাগ্নিত্বমনালস্যং স্থিরত্বংলাঘবং মৃজা। শ্রমক্লমপিপাসোষ্ণশীতাদীনাং সহিষ্ণুতা। আরোগ্যং চাপিপরমংব্যায়ামাদুপজায়তে। নচাস্তিসদৃশংতেন কিঞ্চিৎস্থৌল্যাপকর্ষণং। নচব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যমর্দ্দয়ন্ত্য-

তৈলমর্দ্দনবিধি।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে। ইহা অকালজাত বলি, বলিত, বাতরোগ ও শ্রান্তি দূর করে। এবং নেত্রের সুদীপ্তি, পুষ্টি, আয়ুঃ, সুনিদ্রা, ত্বকের সৌকুমার্য্য ও দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

মস্তক, কর্ণ ও পাদদেশে বিশিষ্টরূপে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। মস্তকে অধিক তৈলাভ্যঙ্গ করিলে কেশের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা জন্মে। এবং ঊর্দ্ধস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে হনু, মন্যা, মস্তক ও কর্ণগত শূল বিনষ্ট হয়। পাদযুগলে অধিক তৈলাভ্যঙ্গ করিলে উহার দৃঢ়তা, সুনিদ্রা ও দর্শন শক্তির আধিক্য জন্মে। এবং পাদগতরোগসমূহ বিনষ্ট হয় *।

নবজ্বর ও অজীর্ণরোগী এবং বমন, বিরেচন বা নিরুহণ (পিচ্‌কারি দ্বারা জোলাপ) ক্রিয়াকারী ব্যক্তির তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। কারণ, নবজ্বর ও অজীর্ণ অবস্থায় তৈলাভ্যঙ্গ করিলে উক্ত রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া পড়ে। বমিত, বিরিক্ত ও নিরুহিত ব্যক্তি তৈলাভ্যঙ্গ করিলে অগ্নিমান্দ্য হয় †।

স্নানবিধি।

পরিজ্ঞাত জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক

রয়োভয়াৎ। নচৈনং সহসাক্রম্যজরা সমধিরূঢ়তি। স্থিরীভবতিমাংসঞ্চ ব্যায়ামাভিরতস্যচ। ব্যায়ামক্ষুণ্ণগাত্রস্য পদভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্যচ। ব্যাধয়োনোপসর্পন্তিসিংহংক্ষুদ্রমৃগাইব। বয়োরূপগুণৈর্হীনমপিকুর্য্যাৎসুদর্শনং। ব্যায়ামংকুর্ব্বতোনিত্যং বিরুদ্ধমপিভোজনং। বিদগ্ধমবিদগ্ধংবা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে। ব্যায়ামোহিসদাপথ্যোবলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং। সচশীতে বসন্তেচ তেষাং পথ্যতমঃস্মৃতঃ। সর্ব্বেষ্বৃতুষহরহঃপুংভিরাত্মহিতৈষিভিঃ। বলস্যার্দ্ধেনকর্ত্তব্যো ব্যায়ামোহন্ত্যতোহন্যথা। হৃদিস্থানস্থিতোবায়ুর্যদাবক্ত্রংপ্রপদ্যতে ব্যায়ামং কুর্ব্বতোজন্তোস্তৎবলার্দ্ধস্যলক্ষণং। বয়োবলশরীরাণি দেশকালাশনানিচ। সমীক্ষ্য কুর্য্যাৎব্যায়ামমন্যথারোগমাপ্নুয়াৎ। ক্ষয়তৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দিরক্তপিত্তভ্রমক্লমাঃ। কাসশোষজ্বরশ্বাসা অতিব্যায়ামসম্ভবাঃ। রক্তপিত্তীকৃশঃশোষীশ্বাসকাসক্ষতাতুরঃ। ভুক্তবান্ স্ত্রীষুচ ক্ষীণোভ্রমার্ত্তশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। (সুশ্রুতঃ)

শীতকালে বসন্তেচ মন্দমেবততোহন্যদা। ললাটদেশে নাসায়াং গাত্রসন্ধিষুকক্ষয়োঃ। স্বেদঃ সংজায়তে তেন বলার্দ্ধঃতং বিনির্দ্দিশেৎ। (বাভটঃ)

* অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং সজরাশ্রমবাতহা। দৃষ্টিপ্রসাদপুষ্ট্যায়ুঃ স্বপ্নসুত্বকত্বদার্ঢ্যকৃৎ। * * শিরঃশ্রবণপাদেষু তংবিশেষেণ শীলয়েৎ। সুকেশ্যঃশীলিতোমূর্দ্ধ্নিঃকপালেন্দ্রিয়তর্পণঃ। হনুমন্যা শিরঃকর্ণশূলঘ্নং কর্ণপূরণং। পাদাভ্যঙ্গোপিতৎস্থৈর্য্যনিদ্রাদৃষ্টিপ্রসাদকৃৎ। পাদসুপ্তিশ্রমস্তম্ভসঙ্কোচস্ফুটনপ্রণুৎ॥ (বাভটঃ)

† তরুণজ্বর্য্যজীর্ণীচ নাভ্যক্তব্যো কথঞ্চন। তথাবিরিক্তোবান্তশ্চনিরূঢ়োযশ্চ মানবঃ। পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতাব্যাধেরসাধ্যত্বমথাপিবা। শেষাণাংতদহঃ প্রোক্তা অগ্নিমান্দ্যাদয়োগদাঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

প্রথমতঃ গাত্র মার্জ্জনী দ্বারা সমস্ত শরীর উত্তমরূপে পরিমার্জ্জন করিবে। ইহাতে বায়ু, কফ, ও মেদঃ দোষ নিবৃত্তি করে, অঙ্গের দৃঢ়তা, নেত্রের নির্ম্মলতা, লোমকূপগত শিরা সমূহের মুখ-পরিষ্কৃতি, ও চর্ম্মস্থ অগ্নির প্রদীপ্ততা সম্পাদন করে *।

অনন্তর যথাভ্যস্ত মস্তকনিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিবে। প্রতিদিন নিয়মিত রূপে স্নান করিলে অগ্নি, শুক্র, ওজঃ, আয়ুঃ ও বল বৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের কণ্ডু (চুলকানী,) মল, ঘর্ম্ম, শ্রান্তি, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পাপ বিদূরিত হয় †।

উষ্ণ জলদ্বারা অধঃকায়ে (গলদেশ হইতে অধোভাগে) পরিষেক করিলে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মস্তকে উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে কেশ ও চক্ষুর বলহানি হয় ‡।

অর্দ্দিত, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণশূল, অতীসার, আধ্মান (পেটফাপা), পীনস (সর্দ্দি) অজীর্ণরোগযুক্ত ও ভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ ¶।

স্নানান্তে জল হইতে উত্থিত হইয়া শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা সমস্ত শরীর পরিমার্জ্জন করিবে, তদনন্তর আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তম পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। নির্ম্মলবস্ত্র পরিধান করিলে শরীরের শোভা, স্বাস্থ্য ও আনন্দ জন্মে। কদাচও অপরিষ্কৃত মলিনবস্ত্র পরিধান করিবে না। কারণ তাহাতে কণ্ডু, ক্রিমি (উকুন), গ্লানি ও অশোভা বৃদ্ধি পায় §।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্তঃ।

---

* উদ্বর্ত্তনং বাতহরং কফমেদোবিলাপনং। স্থিরীকরণমঙ্গনোংত্বক্‌প্রসাদকরং পরং। শিরামুখবিবিক্তত্বত্বংত্বক্‌স্থস্যাগ্নেশ্চ-তেজনং। (সুশ্রুতঃ)

† দীপনংবৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমোজোবলপ্রদং। কণ্ডুমল শ্রমস্বেদতন্দ্রাতৃট্‌দাহপাপ্মনুৎ। (বাভটঃ)

‡ উষ্ণাম্বুনাধঃ কায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ। তেনৈবতূত্তমাঙ্গস্যবলহৃৎ কেশ-চক্ষুষোঃ। (বাভটঃ)

¶ স্নানমর্দ্দিতনেত্রাস্য-কর্ণরোগাতীসারিষু। আধ্মানপীনসাজীর্ণ ভুক্তবৎস্বচ গর্হিতং। (বাভটঃ)

§ স্নানস্যানন্তরং সম্যগ্‌বস্ত্রেণাঙ্গস্য মার্জনং। কান্তিপ্রদংশরীরস্য কণ্ডুত্বক্‌দোষনাশনং। × × যশস্যং কাম্যমায়ুষ্যং শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনং। ত্বচ্যং বশীকরংরুচ্যং নবনির্ম্মলমম্বরং। + + কদাপি ন জনৈঃ সদ্ভির্ধার্য্যং মলিন মম্বরং। তত্তু কণ্ডুক্রিমিকরং গ্লান্যলক্ষ্মীকরং পরং। (ভাবপ্রকাশঃ)

রাজপুতানার ইতিহাস।

(১৬৫ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৬৫৩ সম্বৎসরে (খ্রীঃ ১৫৯৭) প্রতাপের সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ মিবার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে পিতৃদেবের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অমরসিংহ প্রতাপের নিত্য সহচর রূপে বিপদ হইতে বিপদান্তরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সমধিক সাহস-সম্পন্ন ও বীর্য্যবান হইয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিলেন যে, মিবার-সিংহাসন সুখের স্থান নহে; বিবিধ বিপদরূপ কণ্টকে আকীর্ণ। কিন্তু তিনি প্রতাপের অনুপযুক্ত পুত্র ছিলেন না, বিপদকে বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যেমন বিপদই হউক না কেন, তাহার সম্মুখীন হইতে সঙ্কুচিত হইবার লোক ছিলেন না। প্রতাপের মুমূর্ষু দশায় বিশ্বস্ত সামন্তবর্গ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অমর সময়ে সময়ে তাহা বিস্মৃত হইতেন, ইহাই তাঁহার লঘুচিত্তের একমাত্র পরিচয়; কিন্তু সে বিস্মৃতি সমধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

মিবারেব চিরশত্রু আকবর, প্রতাপের পরলোক প্রাপ্তির পর আটবৎসর জীবিত ছিলেন। এই আটবৎসর তিনি মিবারের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। অমরসিংহ এই কয়বৎসর যারপর নাই শান্তিসুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীকাল দিল্লির সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া মোগল কুলতিলক আকবর ভারতের যে সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহারই সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি এই আট বৎসর ব্যাপৃত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে ইউরোপের কতিপয় বর্দ্ধনশীল ভূখণ্ডে ন্যায়পরায়ণ নীতিকুশল নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন; ফরাসী রাজ্যে মহদাশয় চতুর্থ হেনরি এবং ইংলণ্ডে রমণী কুলশিরোমণি এলিজেবেথ। রাজা ভাল হইলে অনেক সময়ে প্রায় মন্ত্রীও ভাল হইয়া থাকে। আকবরের প্রথমাবস্থায় বাইরম খাঁ ও শেষাবস্থায় আবুল ফজল মন্ত্রী ছিলেন। চতুর্থ হেনরীর মন্ত্রী সলি রণপাণ্ডিত্য সদাশয়তা ও রাজনীতি কুশলতা সম্বন্ধে যারপরনাই খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ছিলেন, বাইরম খাঁ কোন অংশেই তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। এলিজেবেথের মন্ত্রী বর্লে বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা বিষয়ে

আবুল ফজলের সমকক্ষ থাকিয়াও তাঁহার ন্যায় দয়াবান, দীনপালক ও ধার্ম্মিক ছিলেন না। সুতরাং হেনরি ও এলিজেবেথ অপেক্ষাও আকবর এবিষয়ে সমধিক ভাগ্যবান ছিলেন বলিতে হইবে। মিবারের দুর্ভাগ্য বশতঃই আকবর বিবিধ বলে বলীয়ান হইয়াছিলেন। রাজপুত কবিগণ স্বদেশের গৌরবাত্মক কবিতামধ্যে প্রতাপের সমসূত্রে আকবরকে স্থাপন করিয়াছে, ইহা তাঁহার পক্ষে সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে। তাহারা প্রথমে রাজপুত-প্রধান প্রতাপের বল বীর্য্যাদি বর্ণন করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে যে, আকবর প্রতাপের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। মোগল ইতিহাস-লেখকেরা কহিয়া থাকেন যে, "যদিও কখন কখন আকবর কোন কোন বিষয়ে উন্নত রাজপদের অনুপযুক্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু কখনই তিনি সজ্জনের অনুপযোগি কার্য্য করেন নাই।" এই বাক্যে তাঁহার যতদূর মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, আমরা ততদূর বিশ্বাস করিতে পারি না। আকবর যে কুটিল কার্য্যদ্বারা আপনি আপনার মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার মহত্ত্বে কোন মতে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। বুঁদী রায়ের রাজকুল পত্রে আকবরের মৃত্যু বিবরণ অতি বিশদ রূপে বর্ণিত আছে। কোন কোন মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখক উক্ত রাজকুল-পত্র বিশ্বাস করেন না, কিন্তু বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, সমসাময়িক বুঁদীরাজ স্বয়ং মোগল সভায় থাকিয়া সেই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত দৈনিক বিবৃতি মধ্যে আকবরের যে মৃত্যু বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বোধ হয়, রাজকুল-তিলক আকবরের মহান চরিত্রে কলঙ্ক লেখা পতিত হয় বলিয়া মোগল ইতিহাসবেত্তারা সে কথার উল্লেখ করেন না। বুঁদীর রাজকুলপত্রে আকবরের মৃত্যু বিবরণ যেরূপ লিখিত আছে নিম্নে তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে ;—

সম্রাট সভায় মানসিংহের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোক আর কেহই ছিলেন না। তিনি আকবরের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। ভারতবর্ষমধ্যে আকবর যে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মানসিংহের বলবীর্য্য ও সাহসিকতাই তাহার প্রধান সহায়। এই সকল কারণেই তিনি আকবরের নিকট একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, সম্রাটও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। আকবর সেলিমকে (জাহাঙ্গীর) স্বীয় উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া রাখেন, কিন্তু মানসিংহ স্বীয় ভাগিনেয় খস্রুকে ভাবি সম্রাট করিবার অভিপ্রায় স্থির করেন। আকবর ইহা জানিতে পারিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া একটী তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইবে ; মানসিংহ যেরূপ পরাক্রমশালী, তাহাতে তাঁহারি পক্ষেই জয়লাভের সম্ভা-

বনা; এমন কি, সেই গোলযোগে সিংহাসন বিপর্য্যস্ত হইলেও হইতে পারে। এই সকল দুর্নিমিত্ত ঘটনার মুলোচ্ছেদ করিবার বাসনায় অসীমসাহসসম্পন্ন মহামনা আকবর নিতান্ত ভীরু লঘুচিত্ত কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতা বশতঃ আপনার চক্রে আপনি পতিত হইয়া লোকলীলা সম্বরণ করিলেন। আকবর মনে মনে স্থির করিলেন, মানসিংহকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিতে পারিলেই ভাবি দুর্নিমিত্তের নিরাকরণ হইতে পারে। স্বহস্তে মাজন * প্রস্তুত করিয়া তাহার কিয়দংশে বিষ মিশ্রণ করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে মানসিংহকে অবিকৃত মাজন প্রদান করিয়া স্বয়ং সেই গরলাধার বটিকা আহার করত ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা বিধেয়। অমরসিংহ মিবারের অনেক উন্নতি সাধন করিলেন; আবার নূতন করিয়া ভূমির পরিমাণ করা হইল, এবং কার্য্যানুসারে সামন্তবর্গকে বিবিধ ভূমি ও উপাধি প্রদত্ত হইতে লাগিল। প্রাচীন পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হইল, নূতন নূতন বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। রাণারা সভাধিবেশন সময়ে যে উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন, তাহাও পরিবর্ত্তিত হইল। †

এই দীর্ঘবিশ্রামে প্রতাপের ভবিষ্যৎবাণী সফলা হইয়াছিল। যে যে বিষয় প্রতাপ নিবারণ করিয়া গিয়াছেন, অমরসিংহ তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেই পেশোলা সরোবর তীরে, (যথায় প্রতাপের জীবনাবসান সময়ে কতিপয় পর্ণকুটীর মাত্র ছিল) অমর সিংহ স্বনামবিখ্যাত একটি অনতিবৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। ‡ যদিও পরে অমরের উত্তরাধিকারীগণ কর্ত্তৃক তথায় সুরম্য হর্ম্ম্য ও মনোহর প্রাসাদসমূহ নির্ম্মিত হইয়া মিবারের ধনশালিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তথাপি কারুকার্য্যখচিত গঠনচাতুর্য্যে অমরের সেই অনতিবৃহৎ প্রাসাদ অদ্যাপি সর্ব্বসাধারণের নয়নমন হরণ করিয়া থাকে। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সিংহাসনারোহণ করিয়া চারি বৎসরের মধ্যে সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিলেন। এক্ষণে তাঁহার এই মাত্র প্রতিজ্ঞা হইল যে, মিবারপতিকে বশীভূত করিতে হইবে। মিবারেশ্বর আকবরের নিকট নত হয়েন নাই, অতএব তাঁহাকে করতলগত করিয়া আপনার রাজত্বকাল স্মরণীয় করিবার বাসনায় সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করতঃ মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অমরসিংহ আলস্যের ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিয়া যেন কিয়ৎপরিমাণে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমে তিনি যেরূপ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা যেন কোথায় পলায়ন করিল। তিনি এক্ষণে কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

* সিদ্ধির সহিত গব্য ও বিবিধ মিষ্টসামগ্রী মিশ্রণ দ্বারা এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার নাম মাজন।

† অমরসাহী পাগড়ি, অদ্যাপি উহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

‡ অমরমহল।

যে অলক্ষ্মীর মন্ত্রবশে অন্যান্য রাজপুতরা-জেরা মোগলপদাবনত হইয়াছে, সেই উপ-দেবী যেন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মোগলের নিকট বশ্যতা স্বীকার করাই তিনি এক প্রকার স্থির করিয়া বসি-লেন। নিত্যসহচর বিশ্বাসী সামন্তবর্গ তাঁ-হার ঈদৃশ মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁ-হাকে উপদেশ দিবার জন্য রাজনিকেতনে আগমন করিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে উপস্থিত বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। কিন্তু সালুম্ব্রার সাহসী চন্দোৎ সামন্ত, মুমূর্ষু প্রতাপের শেষ বাক্য সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহা পরিপূরণের জন্য অনুরোধ করিলেন। সক-লেই প্রতাপের অনুকরণে বদ্ধপরিকর হ-ইলেন।

চন্দোত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দে-খিলেন, বিবিধবিলাসদ্রব্যে ভিত্তি সমুদয় সুশোভিত রহিয়াছে। তিনি রাজসমীপে উপনীত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না দে-খিয়া নিতান্ত বিরক্তচিত্তে 'শয্যাভার'* গুলি লইয়া চতুর্দ্দিকস্থ বিলাসদ্রব্যসমূহের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কেহই তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে পারে নাই। পরিশেষে তিনি অমরকে বাহুধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন হইতে উঠাইয়া সামন্তব-র্গকে কহিলেন, "শীঘ্র অশ্ব প্রস্তুত করিয়া প্রতাপপুত্রকে দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে রক্ষা কর।" অমরসিংহ ক্রোধপরবশ হইয়া চ-ন্দোৎসামন্তকে বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন বলিয়া গালি দিলেন। তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুরোধে তিনি রাজার দুর্ব্বাক্য সহ্য করিয়াছিলেন। তখন সামন্তবর্গ তাঁহার অভিসন্ধি অবগত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলে পার্ব্বত্যভূমি হইতে নিম্ন-তলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতক্ষণে অমরের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুপ্রবাহ বহিতে লাগিল। তিনি আপনার লঘুচিত্তের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া মুমূর্ষু পিতার শেষবাক্য স্মরণ করিলেন। সমতলক্ষেত্রে (যথায় এ-খন জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে) অবতরণ পূর্ব্বক অমর সিংহ সামন্তবর্গকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন—"চলুন আ-পনারা যেখানে লইয়া যাইবেন; আমি সেই খানেই যাইব; আপনাদের পরামর্শ ভিন্ন এক পদও চলিব না;—আমার ব্যবহারে আপনাদের আর অনুতাপান্বিত হইতে হ-ইবে না। আমি প্রতাপের অনুপযুক্ত পুত্র নহি জানিয়া আপনারা সন্তুষ্ট হইবেন।" রাজবাক্যে চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। সৈন্যসামন্ত সজ্জিত হইয়া শত্রুগ-

* বায়ুবেগে অথবা পদঘর্ষণে শয্যা বি-পর্য্যস্ত না হয় এই জন্য শয্যার চারিদিকে কাচ, প্রস্তর, লৌহ বা অন্য কোন ধাতু নির্ম্মিত পিণ্ড রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা-কেই শয্যাভার বলা হইয়াছে। "The slane of the carpet,—a small brass ornament placed at the corners of the carpet to keep steady."

পের সম্মুখীন হইল। খানাখাশনের ভ্রাতা মোগলসেনানায়ক ছিলেন। রাজপুতসেনা দেওবার-সঙ্কটে উপনীত হইলে উভয় দলের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ ঘোরতর সমরের পর সম্রাটসেনা পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ১৬৬৪ সম্বৎসরে (খৃঃ অঃ ১৬০৮) এই সমরব্যাপার সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাণার পিতৃব্য কণদেব যার পর নাই বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পর ইহা অপেক্ষাও একটি ভয়ানক মারাত্মক যুদ্ধ ঘটে। ১৬৬৬ সম্বতের বসন্তকালে রণপুরের পবিত্রক্ষেত্রে যে সমরানল প্রজ্জলিত হয়, তাহাতে নির্ভীক বীর আবদুল্লা সম্রাটসেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাহাতেও মোগলপক্ষের পরাজয় হইয়াছিল, এমন কি, সেনাসংখ্যা এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। * রাণা জয়লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার অনেক বীর্য্যবান সামন্তপ্রধান ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিল। † যাহা হউক এই ব্যাপারে অনেক লুপ্তাধিকার করতলস্থ হয়, এবং বহুকাল পরে মিবারের রক্তপতাকা আবার গড়বর প্রদেশে উড্ডীন হইয়াছিল।

উপর্য্যুপরি পরাজয়ে ভীত হইয়া জাহাঙ্গীর একটি নূতন কৌশলের অবতারণা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, মিবারের প্রাচীন রাজধানী ধ্বংসাবশিষ্ট চিতোরে যদি একজন অপর ব্যক্তিকে রাণানামে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা হইলে কোন কোন সামন্ত অমরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া নবীন রাণার পক্ষাবলম্বন করিলেও করিতে পারে; এরূপ হইলে অমর সিংহ ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহাকে অল্প আয়াসেই বশীভূত করা যাইতে পারিবে। সগর সিংহ স্বীয় ভ্রাতা প্রতাপকে পরিত্যাগ করিয়া আকবরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই এক্ষণে রাণাপদে মনোনীত হইয়া একদল মোগলসেনা সমভিব্যাহারে চিতোরে গমন করিলেন। জাহাঙ্গীর স্বয়ং তাঁহাকে রাজবেশে শোভিত করিয়া কটিবন্ধে তরবারি বাঁধিয়া দিলেন। সম্রাট যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না;—রাজপুত কৃতঘ্ন নহে, অমরসামন্তের কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না।

সগর সাত বৎসরকাল মরুসদৃশ চিতোরের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রাজপুতই তাঁহাকে রাণা বলিয়া সম্মান প্র-

* মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা এই সকল পরাজয় সততই গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায়ই পরাজয়স্থলে কথিত হইয়াছে যে "সেনাপতি সম্রাট হইতে প্রতিনিবৃত্তির আদেশ পাইয়া সেনাসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।"

† হুদো সঙ্গোৎ, নারায়ণ দাস, সূর্য্যমল ঐশকর্ণ, ইহাঁরা শিশদীয় সামন্তপ্রধান; সুজক্কোৎ, সামন্তভানের পুত্র পূরণমল; হরিদাস রাঠোর, সাদ্রীর ভূপৎ ঝালা; কাহির দাস কচবহ; কেসুদাস চোহান, মুকুন্দদাস রাঠোর ইত্যাদি।

দান করে নাই। সগর স্বীয় ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি নিতান্ত পাষাণহৃদয় হইয়াও পূর্ব্বস্মৃতির নির্ব্বাক্ তিরস্কার হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে সকল বীরপুরুষ স্বদেশ রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সমাধিভূমি দর্শনে তিনি পদে পদে চকিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। চিতোর-জয়স্তম্ভগুলি যেন তাঁহার কলঙ্কিত কার্য্যের প্রতি বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। প্রতিপদে তিনি আপনাকে নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া জানিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপারে ক্রমে তাঁহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, তখন তিনি অমরকে আহ্বান করতঃ তাঁহার করে চিতোর সমর্পণ পূর্ব্বক কন্ধর * প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে সাগরজি জাহাঙ্গীরের নিকট উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করেন, তাহাতে সাগর তৎক্ষণাৎ তরবারি নিষ্কোষিত করত স্বীয় বক্ষে আঘাত করিয়া ভবলীলা সমাপ্ত করিলেন। †

অমর পূর্ব্বপুরুষদিগের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু চিতোর নিরাপদ করিবার কোন সহজ উপায়ই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। নিতান্ত ধ্বংসাবস্থা হইতে তাহাকে পুনঃ সংস্কৃত করা সহজ ব্যাপার নহে। তথাপি পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে সমতলস্থ শত্রুসেনা সহজে বিপর্য্যস্ত করা যাইতে পারে এই ভাবিয়া তিনি পিতৃপুরুষদিগের সিংহাসনস্থ হইয়াই যেন নবীন বীর্য্যে ও অসম সাহসে ভূষিত হইলেন। চিতোর লাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাণা মিবারের অশীতি সংখ্যক নগর ও দুর্গ স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিবারের ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তের সহিত সুক্তৌৎদিগের সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ আছে বলিয়া নিম্নে সুক্ত বংশীয়দিগের অভ্যুদয় বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

উদয় সিংহের চতুর্বিংশতি পুত্রের মধ্যে সুক্ত দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার শৈশবকালের নির্ভীকতা দর্শনে সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে সুক্ত একজন অসীম সাহসী বীরপুরুষ হইবেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন এক দিন অস্ত্রাধ্যক্ষ একখানি তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র অসি রাণার নিকট আনয়ন করিল। রাণা ও সভাসদ্‌বর্গ কার্পাসসূত্র কর্ত্তন করিয়া অসির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। "ইহা কি অস্থি মাংস ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই" এই কথা বলিয়া তৎক্ষ-

* কন্ধর একটি মরুপ্রদেশ; ইহার এক দিকে পার্ব্বতী ও চর্ম্মোণ্বতী নদীর মিলন স্থল, অপরদিকে বিখ্যাত রিন্থম্বর ক্ষেত্র।

† সাগরজির এক পুত্র স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভারত ইতিহাসে যে বিখ্যাত বীরপুরুষ মহাবেৎ খাঁর পরিচয় পাওয়া যায়, জাহাঙ্গীরের সামন্তবর্গ মধ্যে বীরপ্রধান বলিয়া বিখ্যাত মহাবেৎ সাগরের পুত্র। জাহাঙ্গীরতনয় সাজেহানের শীরায় রাজপুতশোণিত প্রবাহিত ছিল বলিয়া মহাবেতের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য হয়।

ণাৎ সেই অসি গ্রহণ পূর্ব্বক সুক্ত স্বীয় হস্তে আঘাত করিলেন। দর দর ধারায় রুধির প্রবাহ বহিতে লাগিল। দর্শকগণ সকলেই চমৎকৃত হইল। সুক্তের মুখে ক্লেশচিহ্ন মাত্রও উপলব্ধি হইল না। সুক্তের জন্মপত্রিকা পরীক্ষা করিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা কহিলেন "এই পুত্র মিবারের কলঙ্কস্বরূপ হইবে।" এই কারণেই হউক, অথবা আপনার কাপুরুষতা ও পুত্রের অসীম সাহসিকতায় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াই হউক, রাণা সুক্তের প্রাণবিনাশের আদেশ করিলেন। সুক্ত নগরপ্রান্তে বধ্যভূমিতে নীত হইলে সালুম্ব্রাসামন্ত রাণার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তিনি যুগ্মকরে বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, "আমি অপুত্রক, সুক্তকে আমি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া ভবিষ্যতে আমার উত্তরাধিকারী করিব; অতএব সুক্তকে আমার করে সমর্পণ করুন। সালুম্ব্রাসামন্ত রাণার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার প্রার্থনায় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার হস্তে সুক্তকে সমর্পণ করিলেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে সালুম্ব্রাসামন্ত একটি পুত্রসন্তান প্রাপ্ত হইয়া আপনার বিষয়াধিকার ঔরষপুত্র ও সুক্তকে অংশাংশী করিয়া দিবার মনস্থ করেন। এমন সময়ে প্রতাপ সিংহ ভ্রাতা সুক্তকে আহ্বান করিলেন। কিছু কাল উভয় ভ্রাতায় সাতিশয় সুখ সন্তোষে একত্রে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু বহুকাল সে ভাব স্থায়ী হয় নাই। ক্রমে ক্রমে উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। একদা মৃগয়া করিতে গিয়া প্রতাপ দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা হউক, আমাদের উভয়ের মধ্যে বল্লমচালনায় কে সমধিক ক্ষিপ্রহস্ত ও নিপুণ।" সুক্ত তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া প্রতাপের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়েই পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বল্লম পরিত্যাগের উপক্রম করিয়াছেন এমন সময়ে কুলপুরোহিত আসিয়া উভয়কে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কেহই সে অনুরোধ রক্ষায় যত্নবান নহেন দেখিয়া পুরোহিত তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে দাড়াইয়া বংশধ্বংসোন্মুখ বীরযুগলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলমনোরথ না হইয়া নিজ বক্ষে খড়্গাঘাত করিলেন। পুরোহিতের রুধিরাক্ত মৃতদেহ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইলে উভয়ের চৈতন্যোদয় হইল। পুরোহিতের বধভাগী হইলাম বলিয়া উদ্যতায়ুধ বীরযুগল দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রতাপ করসঞ্চালন দ্বারা সুক্তকে মিবার পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলে সুক্ত অবনত মস্তকে বিদায় গ্রহণ করিয়া আকবরের আশ্রয়ে গমন করিলেন। এক দিনের জন্যও তিনি এই অপমান বিস্মৃত হন নাই। তিনি সেই ঈর্ষ্যাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের শান্তিসংস্থাপনের জন্য আকবরকে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়াছিলেন। পুরোহিতের প্রেতকার্য্যোদ্দেশে প্রতাপ অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। পু-

রোহিত যে রাজপুরীর যথার্থ হিতসাধক ছিলেন, কার্য্যদ্বারা তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পুরোহিত শব্দের অন্বর্থ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপে প্রতাপ পুরোহিতপুত্রকে সালৈরা প্রদেশ সমর্পণ করেন; তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি তাহা ভোগ করিয়া আসিতেছে। যে স্থানে এই অতুলনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তথায় একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া অদ্যাপি সেই অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই স্মরণীয় দিন হইতে হল্‌দিঘাটের স্মরণীয় সমর দিন পর্য্যন্ত,এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রতাপ ও সুক্ত পরস্পরের সন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন।

সুক্তের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে ভিনস্রোরের উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভান্‌জী ব্যতীত আর ষোড়শ জনই উপস্থিত ছিলেন। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানান্তে সুক্তপুত্রগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল, ভান্‌জী পুরদ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা পুর প্রবেশের চেষ্টা করিলে ভান্‌জী কহিলেন, “এখানে এত অধিক লোকের ভরণপোষণ হইতে পারে না, তোমরা স্থানান্তরে গমন করিয়া নিজ নিজ অদৃষ্টফল ভোগ কর।” তাহারা তখন কেবল মাত্র আপনাদিগের অশ্ব ও অস্ত্র প্রার্থনা করিল। পরে তাহাদের মধ্যে অচল নামক জনৈক ব্যক্তিকে আপনাদিগের অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়া ইদর নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে সময়ে ইদরে মাড়োয়ারের রাঠোরদিগের কনিষ্ঠ শাখা অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই বিদেশ-যাত্রা সময়ে অচলের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। পথিমধ্যে পালোদ নগরে অচলপত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। যাত্রীগণ পালোদের শনিগরুরা সামন্ত নিকটে আপনাদিগের অবস্থা (বিশেষতঃ অচলপত্নীর প্রসবকাল উপস্থিত) জ্ঞাপন পূর্ব্বক আশ্রয় প্রার্থনা করিলে নিষ্ঠুর সামন্ত তাহাতে কর্ণপাতও করিল না, অধিকন্তু তাহাদিগকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। তখন তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া একটি জরাজীর্ণ ভগ্নমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঐ মন্দির রাজস্থানে জনবীমাতার * মন্দির বলিয়া বিখ্যাত। তাহারই এক পার্শ্বে ‘ভাবীবংশজনয়িত্রী’ অচলপত্নী অতি সাবধানে রক্ষিতা হইলেন। ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল, প্রবলবেগে ঝটিকা উত্থিত হইল, পরিশেষে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ভগ্নমন্দির প্রতিকূলদৈবের উৎপাত সহনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া আপনার জীর্ণকলেবর এককালে শিথিল করিয়া দিল। অকস্মাৎ গভীর নিনাদে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার পেষণে অচলপত্নীর চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিত না, কিন্তু বল্ল নামক রাজপুতবীর সেই পতনোন্মুখ ছাদ আপনার মস্তক দ্বারা রক্ষা করিল। তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃগণ নিকটবর্ত্তী বালক বৃক্ষ কাটিয়া তাহার দ্বারা ছাদের পতন নিবারণ করিল। এই সঙ্কটসমাকীর্ণ ভগ্নমন্দিরে অচলপত্নী এ-

---

* জনবীমাতা—Mother of births—*Juno Lurina.*

কটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন, সেই পুত্রের নাম আশা। * ইহারই সন্তানপরম্পরা অচলেশ স্থক্তোৎ নামে পরিচিত।

এই ঘটনার পরই তাহারা উদ্দেশ্যস্থানে যাত্রা করিল। ইদরের সামন্ত তাহাদিগকে অতি সমাদরে আশ্রয় প্রদান করিলেন। এই সময়ে তাহাদিগের উদয়পুরে আসিবার একটি সুন্দর সুবিধা হইল। রাণার প্রধান মন্ত্রী তীর্থদর্শন উপলক্ষে শক্রুঞ্জয় † পর্ব্বতে গমন করেন, প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ইদরে শিবিরসন্নিবেশ করিলে অত্যন্ত ঝটিকা উপস্থিত হইল, যে পটমণ্ডপে তাঁহার পরিবারবর্গ অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা ঝটিকাবেগে বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইলে পুরবাসীগণ যার পর নাই বিপদে পতিত হইলেন। অচল সহচরেরা তাঁহাদিগকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করায় মন্ত্রী সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। যখন পরিচয়ে অবগত হইলেন যে, তাঁহার বিপদের বন্ধুগণ রাণার অতি নিকট সম্পর্কীয়, তখন তিনি নিতান্ত কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদিগকে উদয়পুরে লইয়া যাইবার জন্য যত্নবান হইলেন। এবং ইহাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহাদিগের মনোনীত সামন্ত অচলসিংহ নিজ সম্প্রদায়ের নেতা থাকিবেন। তাহাতে তাহারা এই উত্তর করিল যে, তাহাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু রাণার আহ্বান ভিন্ন তাহারা উদয়পুরে গমন করিতে পারে না। তাহার সুবিধা হইতেও সমধিক বিলম্ব লাগিল না। অমর সিংহ তখন আপনার সম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধন জন্য অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মন্ত্রীর অনুরোধ মাত্রেই পরম পুলকিত হইয়া আপনার পিতৃব্যপুত্রদিগকে উদয়পুরে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া অমরের বলবৃদ্ধি করিল। অমর তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য যথেষ্ট জায়গীর দান করিলেন। ক্রমে স্থক্তোৎ সম্প্রদায়ে দশসহস্র অস্ত্রধারী সমবেত হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর অমরের নিকট বার বার পরাজিত হইয়া এককালে বহুসংখ্যক সেনা সজ্জিত করিলেন। যে রূপেই হউক মিবারের রাণাকে পদানত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর হইলেন। সম্রাট প্রিয়পুত্র পরবেজকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া মিবারাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন; বিশিষ্ট রূপে বলিয়া দিলেন, যদি রাণা অথবা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র করণ সিংহ তাঁহার নিকট সমাগত হয়েন তবে যেন তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। প্রতাপপুত্র সহজে নত হইবার লোক নহেন; অমর জয়োল্লাসে প্রোৎসাহিত হইয়া খামনর নামক গিরিসঙ্কটে সম্রাটসেনার সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল—মুসলমানেরা রাজপুত বল সহ্য করিতে না পারিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়ন

* ভবিষ্যতে পুত্রের দ্বারা বিবিধ মঙ্গলের সম্ভাবনা ভাবিয়াই আশা নাম প্রদত্ত হইল বোধ হয়।

† রাণার প্রধান মন্ত্রী জৈনধর্ম্মাবলম্বী। জৈনদিগের যে পাঁচটি প্রধান তীর্থ স্থান আছে, শক্রুঞ্জয় তাহার মধ্যে একটি।

করিল। রাজপুত পক্ষে বিজয়-ভেরী নিনাদিত হইল। মোগল-ইতিহাস-লেখক স্পষ্টাভিধানে স্বীকার করিয়াছেন, 'অদ্য মিবারের অতি গৌরবাত্মক দিন।' তাঁহার বিবৃতি পাঠে সুস্পষ্ট অবগতি হয় যে, এই যুদ্ধে পরবেজ্ যার পর নাই বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃপুণ্যে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষীয় অধিকাংশ সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় মোগল দল নিতান্ত হীনবল হইয়াছিল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এই মহাসমর সঙ্ঘটিত হয়। জাহাঙ্গীর স্বীয় দৈনিক বিবৃতি মধ্যে এই ব্যাপারকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়া এইমাত্র বলিয়া গিয়াছেন যে 'আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি পরবেজ্‌কে লাহোরে আসিতে লিখিয়া ইহাই মাত্র আদেশ করিয়াছিলাম যে, তাহার পুত্র যেন কতিপয় সামন্ত সমভিব্যাহারে রাণার গতি লক্ষ্য করিয়া তথায় উপস্থিত থাকে।' সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য অনেক সময়ে মূল ঘটনা এইরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ইহার পরই পরবেজ্‌পুত্র সমরাঙ্গণে উপনীত হইয়া রাজপুত-হস্তে বিগত-জীবিত হন। অমরসিংহ বার বার জয়লাভ করিয়াও ক্রমে ক্রমে হীনবল হইতে লাগিলেন। প্রতাপের মৃত্যুর পর অমর সপ্তদশ যুদ্ধে মোগলদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আপন পক্ষের গণনীয় বীরগণকে হারাইয়াছিলেন। এবার জাহাঙ্গীর স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র খুরমকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। এই পুত্রই ভাবিকালে সাহজেহান নামে বিখ্যাত হয়েন।

খুরম বহুসেনার অধিনায়ক হইয়া মিবারাভিমুখে যাত্রা করেন—তাঁহার সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত রাণা ও তদীয় পুত্র করণ সিংহ সাধ্যমত সেনা সংগ্রহে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু জয়লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মোগলের অঙ্কশায়িনী হইলেন। যে রক্ত পতাকা ক্রমাগত আটশত বৎসর কাল গুহলোট-শিরের শোভা সম্পাদন করিয়া পবন হিল্লোলে স্বাধীনতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহা জাহাঙ্গীর-তনয় দ্বারা গর্ব্বচ্যুত হইল। জাহাঙ্গীরের স্বহস্ত-লিখিত দৈনিক বিবৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

"আমার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (খৃঃ ১৬১৩) রাণার বিপক্ষে সমর যাত্রা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ভাগ্যবান পুত্র খুরমকে অগ্রে প্রেরণ করিলাম। পুত্রকে মূল্যবান খেলাত ও সেই সঙ্গে একটি হস্তী, অশ্ব, অসি, চর্ম্ম উপঢৌকন দিয়া শুভক্ষণে যাত্রা করিতে কহিলাম। পুত্রের সঙ্গে যে নির্দ্দিষ্টসেনা নিযুক্ত ছিল, আজিমখাঁর নেতৃত্বনিয়ামক দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে দিয়া তাহার বলবৃদ্ধি করত সেনানায়কদিগের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য বিবিধ পুরস্কার প্রদান করিলাম।

"রাজত্বের নবম বর্ষের (১৬১৪) প্রারম্ভে একদা আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে দেখিলাম, রাণার অষ্টাদশ সংখ্যক হস্তী হস্তাতে করিয়া পুত্র আমার

নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রধান হস্তীর নাম আলম গোমান্ *। পরদিন আমি এই হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করত ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া উপস্থিত শুভসূচক ব্যাপার উপলক্ষে বহুধনরত্ন বিতরণ করিলাম।

"ইতি মধ্যে এরূপ আনন্দসূচক সমাচার প্রাপ্ত হইলাম যে, রাণা আমার বশীভূত হইবার মনস্থ করিয়াছেন। ভাগ্যবান পুত্র খুরম আমার আদেশ মতে রাণার অধিকারের চতুঃপার্শ্বে দুর্গবদ্ধ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের অবস্থিতি এক প্রকার শঙ্কা ও বিপদশূন্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাণার রাজ্য যে প্রকার মরুময়, ও তথাকার জলবায়ু যেরূপ অস্বাস্থ্যকর, তাহাতে তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি পূর্ব্বক সমস্ত ভূভাগ করতলস্থ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ধন্য আমার সেনাগণ! তাহারা বাতাতপ অগ্রাহ্য করিয়া নিতান্ত অগম্য স্থান পর্য্যন্ত গমন করত দেশলুণ্ঠন করিয়াছে, কত কত পদস্থ ও মাননীয় ব্যক্তি পরিজনবর্গকে অবরুদ্ধ করিয়াছে,—দেখিয়া শুনিয়া রাণা নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন, আর কিছু দিন সমরস্রোত প্রবাহিত থাকিলে দেশ এককালে উৎসন্ন যাইবে—তখন হয় দেশত্যাগী হইয়া পলায়ন করিতে হইবে, না হয় বন্দী হইয়া নানাবিধ অপমান সহ্য করিতে হইবে। এইরূপ ভাবনায় রাণা অবসন্ন হইয়া বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইলেন। সুপকর্ণ ও হরিদাস ঝালা নামক দুইজন সামন্তকে খুরম সন্নিধানে দূত স্বরূপে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি রাণাকে ক্ষমা করিয়া সদয় ভাবে গ্রহণ করেন, তবে তিনি অন্যান্য হিন্দু রাজাদিগের ন্যায় নিজ পুত্র করণ সিংহকে সম্রাট সেবায় প্রেরণ করেন। অধিক বয়ঃক্রম বলিয়া তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবেন না, এই নিমিত্ত বার বার ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইলেন। খুরম এই সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া শফুরউল্লা আফ্‌জল খানিকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন।

"আমার রাজত্ব সময়ে এই শুভ ব্যাপার সংঘটিত হইল বলিয়া আমি সাতিশয় আনন্দলাভ করতঃ আদেশ করিলাম, মিবারের এই প্রাচীন অধিকারীগণকে দেশবহিষ্কৃত করা কোন মতেই উচিত নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান রাণা ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ অত্যন্ত বলদর্পিত ছিলেন, তাঁহাদের পার্ব্বত্য প্রদেশ নিতান্ত দুর্ভেদ্য বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা কাহাকেও ভারতবর্ষের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এবং কখনও কাহার নিকট বশ্যতা করেন নাই। যাহাতে এই সুযোগ হস্তবহির্ভূত না হয়, আমি সেই জন্য ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাণাকে প্রার্থনামত ক্ষমা করিলাম, যাহাতে তিনি নিশ্চিন্তভাবে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন সেইরূপ বন্ধুত্বসূচক ফর্ম্মান ও তাহাতে আনুগত্যজ্ঞাপক পঞ্জাঙ্গুলি চিহ্ন † সংযুক্ত করিয়া পাঠাইলাম।

* The arrogant of the earth.

† ইহাকে পঞ্জা কহে। চন্দনে হাতের পাতা সংলিপ্ত করিয়া তাহাই ফর্ম্মান প্রভৃ-

পুত্রকে বিশেষ করিয়া আরও লিখিয়া দিলাম, যেন এই সম্মানার্হ ব্যক্তির স্বেচ্ছার বিপরীত ব্যবহার না হয়।

"আমার পুত্র শূর্পকর্ণ ও হরিদাসের দ্বারা ঐ ফর্ম্মান ও পত্র রাণার নিকট পাঠাইলেন; এবং নিজ সহচর শকুরউল্লা ও সুন্দর দাস দ্বারা এই কথা বলিয়া দিলেন, যেন রাণা সম্রাটের সততা ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া পঞ্চাঙ্গুলিচিহ্নসমন্বিত ফর্ম্মান সাদরে গ্রহণ করেন। এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, বর্ত্তমান মাসের ষড়বিংশ দিবসে রাণা আসিয়া আমার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

"আজমীরের বাহিরে মৃগয়ায় নির্গত হইয়াছি, এমন সময়ে খুরমের বিশ্বস্ত ভৃত্য মামুদবেগ আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিয়া কহিল, সুলতান ও রাণার পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই সংবাদে পুলকিত হইয়া ভৃত্য মামুদবেগকে একটি হস্তী, অশ্ব ও অসি পুরস্কার এবং "জলঙ্কিকর খাঁ।" এই উপাধি প্রদান করিলাম।

"নির্দ্দিষ্ট ষড়বিংশ দিবসে রবিবারে, রাণা, আপন পদমর্য্যাদার উপযোগীভাবে সুলতান খুরমের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ পুরুষপরম্পরাগচ্ছিত একটি বহুমূল্য রত্ন এবং সুবর্ণখচিত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র উপঢৌকন প্রদান করিলেন। সেই সঙ্গে সাতটি বহুমূল্য হস্তী ও করস্বরূপ নয়টি অশ্ব দিলেন। পুত্র তাঁহাকে রাজযোগ্য সমাদরে গ্রহণ করিলেন। রাণা সুলতানের জানুতে করস্পর্শ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। সুলতান রাণার হাতে ধরিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইতে কহিয়া তাঁহার উপযোগি খেলাৎ, একটি হস্তী, কতিপয় অশ্ব এবং এক খানি অসি সমর্পণ করিলেন। যদিও খেলাৎ পাইবার উপযুক্ত একশত ব্যক্তিও রাণার সহিত উপস্থিত ছিল না, তথাপি একশত বিংশতি সংখ্যক খেলাৎ, পঞ্চশত সুসজ্জিত ঘোটক এবং দ্বাদশটি মণিমুক্তাখচিত শিয়াপঁচ প্রদত্ত হইল।

"রাজপুতরাজেরা পিতাপুত্রে একত্রে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। * সুতরাং রাণার উত্তরাধিকারী করণসিংহ পিতার সহিত আগমন করেন নাই। অমর বিদায় গ্রহণ করিলে করণসিংহ আসিয়া সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকেও বহুবিধ খেলাৎ, অশ্ব, হস্তী, অসি প্রভৃতি প্রদত্ত হইল। সেই দিন সুলতান খুরম করণসিংহকে সঙ্গে লইয়া আজমীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন।

তির উপর লাগাইয়া দেয়। বহুকাল হইতে এই পঞ্জার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ চিহ্নে চিহ্নিত কাগজ পত্রাদি বিশিষ্টরূপে বিশ্বসনীয়। শুনা যায়, মহম্মদ স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ ছিলেন, তিনি মসিতে হাত ডুবাইয়া তাহারই ছাপ দিয়া দিতেন; তদবধি এই ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

* বিশ্বাসঘাতকতার ভয়েই এইরূপ রীতি প্রচলিত হইয়াছে। টড সাহেব বলেন, তিনি সর্ব্বদাই পিতাপুত্রের সহিত একত্রে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

"সুলতান খুরম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া করণসিংহের আগমন সমাচার জ্ঞাপন করিলে আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। করণ আসিয়া আমার নিকট অবনতশির হইলে আমি তাহাকে যথাযোগ্য সমাদরে সম্ভাষণ করিলাম। পুত্রের অনুরোধ ক্রমে আমার দক্ষিণ হস্তসমীপে করণের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি করণকে যথাযোগ্য খেলাতে ভূষিত করিলাম। এরূপ দরবারে সতত যাতায়াত না থাকায় করণ নিতান্ত লজ্জাশীল ছিলেন—আমি তাঁহার সেই সন্দিগ্ধহৃদয়ে সাহসসংস্থাপনের জন্য দিন দিন নূতন অনুগ্রহচিহ্ন দেখাইতে লাগিলাম। দ্বিতীয় দিবসে একখানি মণিমুক্তাখচিত অসি এবং তৃতীয় দিবসে ইরাক দেশীয় একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘোটক দান করিলাম। সেই দিনই আমি তাঁহাকে নুরজাহানের প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলাম। মহিষী নুরজাহান অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য খেলাৎ, সুসজ্জিত হস্তী ও ঘোটক এবং অসি প্রভৃতি প্রদান করিলেন। সেই দিন আমিও তাঁহাকে মূল্যবান এক ছড়া মুক্তার মালা ও পরদিন একটি হস্তী দিলাম। আমার বাসনা, সর্ব্বদাই তাঁহাকে এইরূপে পুরস্কৃত করি। এক দিন কতিপয় শিকারী পক্ষী, রত্নখচিত বর্ম্ম, মণিশোভিত অস্ত্র এবং বহুমূল্য অঙ্গুরিযুগল দান করিলাম। মাসের শেষ দিবসে উৎকৃষ্ট গালিচা, রাজযোগ্য শয্যা, বিবিধ সুগন্ধী দ্রব্য, স্বর্ণপাত্র এবং দুইটি গুজরাটী বলীবর্দ্দ পুরস্কার দিলাম।

"আমার রাজত্বের দশম বৎসর।—এই সময়ে করণকে নিজ জায়গীরে * যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়া হস্তী, অশ্ব ও পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের এক ছড়া রত্নকণ্ঠী পুরস্কার দিলাম। যে কয় দিন তিনি আমার দরবারে ছিলেন, সেই কয় দিনের উপহার একত্রিত করিলে তাহার মূল্য দশলক্ষ মুদ্রারও অধিক হইবে। ইহা ব্যতীত আরও একশত দশ অশ্ব, পাঁচ হস্তী ও খুরম প্রদত্ত বিবিধ উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। আমি দোবারিক খাঁকে তাঁহার সহিত যাইতে অনুমতি করিলাম।

"সেই বর্ষের অষ্টম সঙ্করে করণ পঞ্চহাজারী মনসবদার † হইলেন; এই উপলক্ষে তাঁহাকে আমি এক ছড়া মুক্তার কণ্ঠী প্রদান করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে এক খানি বহুমূল্য রত্ন ছিল।

"সেই বৎসরের চতুর্ব্বিংশ মহরমে (খৃঃ ১৬১৫) করণপুত্র দ্বাদশবর্ষীয় কুমার জগৎ

* মিবারের স্বাধীন রাজগণ এক্ষণে "জায়গীরদার" এই অবনত পদবী ধারণ করিলেন। তাঁহাদের আপনার রাজ্য এখন জায়গীর স্বরূপ হইল। এত দিনে প্রতাপের শেষ বাক্য কার্য্যে পরিণত হইল। ধন্য প্রতাপ! তুমি আজীবন স্বদেশের মান রক্ষা করিয়া গিয়াছ।

† এই উপাধি প্রাপ্তির সঙ্গেই রাণা অনেকগুলি হৃতপ্রদেশ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, যথা;—খৈরার, ফুলিয়া, বেড়নোর, মণ্ডলগড়, জীরণ, নীমচ, ভীলস্রোর। অধিকন্তু দেওলা ও দুংগরপুরের সামন্তের উপরও প্রাধান্য লাভ করিলেন।

সিংহ আমার নিকট আসিয়া সসম্ভ্রমে পিতা ও পিতামহের নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার মহদ্বংশজ্ঞাপক সুন্দর আকৃতি দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ অনুগ্রহ চিহ্ন ও নানা উপহার দ্বারা তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলাম। *

"দশম সাবনে জগৎসিংহকে মিবার যাত্রায় অনুমতি প্রদান করিয়া বিংশতি সহস্র মুদ্রা, অশ্ব, হস্তী ও বহুমূল্য খেলাৎ প্রদান করিলাম। করণের শিক্ষক হরিদাস ঝালা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকেও পঞ্চসহস্র মুদ্রা, একটি অশ্ব এবং খেলাৎ দিলাম। রাণার জন্য ছয়টি সুবর্ণপুত্তলিকা প্রেরণ ক- করিলাম।

"রাজত্বের একাদশবর্ষে অষ্টাবিংশ ববি-উল অ.কবরে আদেশ করিলাম, রাণা ও তৎপুত্র করণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকারের দিন তা; হাতে খোদিত করতঃ আগ্রার উদ্যানে রক্ষিত হইবে।

"ঐ বর্ষে ইতিমাদ খাঁর পত্রে অবগতি হইল, সুলতান খুরম রাণার অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাণা ও তাঁহার পুত্র বহুসমাদরে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সপ্তহস্তী, সপ্তবিংশ সুসজ্জিত অশ্ব, রত্নমালা ও সুবর্ণালঙ্কার করস্বরূপে সুলতানের সম্মুখে আনীত হয়, তিনি তন্মধ্যে তিনটি মাত্র অশ্ব লইয়া সমস্তই প্রত্যর্পণ করিয়া আদেশ করেন যে, কুমার করণসিংহ পঞ্চদশশত রাজপুত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সমর সময়ে তাঁহার সহচারিত্ব করিবেন।

"রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষে দক্ষিণাপথে জয়লাভ ও অধিকার বিস্তার হইলে করণ আমার নিকট আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করতঃ একশত স্বর্ণমুদ্রা, একসহস্র রজতমুদ্রা, অন্যান্য নজরাণা, একবিংশতি সহস্র মুদ্রার স্বর্ণরত্ন এবং হস্তী ও অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করিলেন। আমি হস্তী ও অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া অবশিষ্টগুলি রক্ষা করিলাম, এবং পরদিবস কুমারকে সম্মানার্হ পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলাম। ফতেপুর পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে হস্তী, অশ্ব ও অসি দিয়া বিদায় করিলাম এবং তাঁহার পিতার জন্য একটি ভাল অশ্ব দিলাম।

"রাজত্বের চতুর্দ্দশবর্ষে ১৭ই রবিউল আউল দিবসে আমি রাণার মৃত্যু সংবাদ

* কুমার জগৎসিংহের বিষয়ে ইংলণ্ডীয় রাজদূত সার টমাস রো সাহেব লিখিয়াছেন ;—"মোগল দরবারের এই রাজকুমার গত বর্ষে অধিকারচ্যুত হইয়াছেন, যথার্থ বলিতে কি—ইহাঁরা কৌশলে পরাভূত হইয়াছেন। বহুকাল হইতে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াও মোগলেরা এই রাজবংশকে পদানত করিতে পারে নাই। উৎকোচ দ্বারা ইহাদের দুর্ব্বলতা সাধন পূর্ব্বক কৌশলে অধিকারচ্যুত করা হইয়াছে।" এই রাজদূত ঐ সময়ে মোগলসভায় উপস্থিত ছিলেন। আকবরের সময়ে মহারাণী এলিজাবেথ দূত প্রেরণে কৃতসংকল্প হন, কিন্তু তখন ঘটিয়া উঠে নাই। মহারাজ জেম্‌সের সময়ে ঐ দূত ভারতে আগমন করেন; তখন জাহাঙ্গীর ভারতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রাপ্ত হইলাম। রাণার পৌত্র জগৎসিংহ এবং অন্যতর পুত্র ভীমসিংহ সে সময়ে আমার নিকট ছিলেন, তাঁহাদিগকে খেলাৎ দিয়া স্বদেশযাত্রার অনুমতি করিলাম। রাজা কিশোর দাসের দ্বারা করণসিংহের খেলাৎ, ফর্ম্মান, রাজপরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রেরিত হয়। * সেই সঙ্গে রাণার মৃত্যুজনিত শোকসূচক পত্র পাঠাইয়া দিলাম। সপ্তম সুবলে বিহারীদাস ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বতন্ত্র এক খানি ফর্ম্মান পাঠাইবার আদেশ করিলাম, যেন রাণার পুত্র স্বীয় সহচারী সেনা সমভিব্যাহারে আমার নিকট অবস্থিতি করেন।”

উপরি উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে জাহাঙ্গীরের মহত্ব অনেকাংশে অনুভূত হয়। রাণা যখন বশ্যতা স্বীকার করিলেন, তখন তিনি তাঁহার প্রতি স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি রাণারই ইচ্ছামত ব্যবহার দ্বারা নিজের মহত্ব দেখাইয়াছেন, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। জাহাঙ্গীর পুত্রকে প্রতি পত্রে এইরূপ সাবধান হইতে লিখিয়াছেন যে, রাণা বশ্যতা স্বীকার করিলে যেন আর কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করা না হয়। রাণা যখন প্রস্তাব করিলেন, তিনি বৃদ্ধবয়সে সম্রাট সন্নিধানে অবস্থান করিতে অসমর্থ, জাহাঙ্গীর সে প্রস্তাব অনায়াসেই অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া মানীর মান সম্যক্‌রূপে বজায় রাখিয়াছেন। যাঁহার নিকট তিনি বার বার পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাকে বশীভূত করিয়া তিনি শান্তমূর্ত্তিতে সমস্ত সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অক্ষয় গৌরব লাভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নিজ দক্ষিণ হস্তে মিবার রাজের স্থান সমাবেশ, সমস্ত রাজপুত রাজগণের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তিনি বিজেতার মন হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে যাহাই হউক—রাণার পদবিপর্য্যয় দেখিয়া কাহার অন্তঃকরণে না ক্লেশের উদয় হয়! করণের বীরকীর্ত্তি ও সম্রাটসহ বন্ধুত্ব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি গঠিত হইল, তিনি সম্রাটের দক্ষিণে বসিবার স্থান পাইলেন, পঞ্চহাজারী মনসবদার হইয়া কতকগুলি পূর্ব্বহৃত প্রদেশ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, এত হইয়াও তিনি এখন পরের আজ্ঞাকারী ; সকল কার্য্যেই এখন তাঁহার পরের অনুগ্রহের অপেক্ষা থাকিল। রাণার ইহা অপেক্ষা অবনতি ও দশাবিপর্য্যয় আর কি হইতে পারে! তাঁহার স্বাধীন রাজ্য এখন জায়গীর নাম প্রাপ্ত হইল, তিনি এখন একজন জায়গীরদার হইলেন। যে ছত্রপতাকার বিরুদ্ধে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ ক্রমাগত অস্ত্রধারণ করিয়া নিজ নিজ শোণিতপাত দ্বারা অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, করণসিংহ এখন সেই ছত্রপতাকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পঞ্চদশশত অশ্বারোহী লইয়া ভ্রমণ করিবেন! উঃ কালের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন!

* সামান্য ব্যক্তি দ্বারা খেলাৎ ও ফর্ম্মান না পাঠাইয়া রাজা কিশোরদাস দ্বারা প্রেরিত হওয়ায় রাণার গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মোগলের নিকট বশ্যতা স্বীকারের পরই অমরসিংহ মিবারের সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সামন্তবর্গকে একত্রিত করতঃ করণের কপালফলকে রাজটীকা প্রদান পূর্ব্বক রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নচৌকী নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। আর তিনি রাজধানী প্রবেশ করেন নাই। অমরের অনেকগুলি মহৎ গুণ ছিল, সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। তিনি প্রতাপের অনুপযুক্ত পুত্র ছিলেন না, তিনি যথার্থ বীরপুরুষ ছিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধে হীনবল হইয়া পড়ায় বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

১৬৭৭ সম্বতে (খৃঃ ১৬২১) কর্ণসিংহ সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। ইনি আর এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন; এখন হইতে মিবাররাজেরা গ্রহ-পারিপার্শ্বিক স্বরূপে মোগলসম্রাটের সামন্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ সাহসী ও বীর্য্যবান ছিলেন, তিনি রাণাপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনতিকালবিলম্বে শত্রুসম্বেষ্টিত সৌরাষ্ট্র প্রদেশ অধিকার করিয়া বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী আনয়ন করিয়াছিলেন। লুণ্ঠিত সম্পত্তি দ্বারা মিবারের বিলুপ্তশোভা অনেক অংশে পুনর্জীবিত হইয়াছিল। কর্ণ অশেষ গুণের আধার ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতাবিহীন হওয়ায় যেন তাঁহার সে সমস্ত গুণ স্ফুরিত হইল না। জাহাঙ্গীর ও তদীয় পুত্র খুরম তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই সন্তোষের প্রধান ফল এই যে, সম্রাট সভায় রাণার স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে হইত না, জনৈক উত্তরাধিকারী দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিত; রাণার মৃত্যুর পর যিনি সিংহাসনারোহণ করিবেন তিনি আবার নূতন সনন্দ পাইবেন, এবং সেই সনন্দ তিনি রাজধানীর বহির্দ্দেশে আসিয়া গ্রহণ করিবেন। মিবারেশ্বর চিরদিন সম্রাটের দক্ষিণহস্ত সন্নিধানে আসন প্রাপ্ত হইতেন।

কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীমসিংহ, রাণার প্রতিনিধি স্বরূপে সম্রাটসভায় অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসিকতা নিবন্ধন তিনি ক্রমে সুলতান খুরমের প্রধান পরামর্শদাতা ও আত্মীয় হইয়া পড়িলেন। প্রিয় পুত্রের অনুরোধক্রমে সম্রাট ভীমকে রাজোপাধি প্রদান পূর্ব্বক বনাস নদীতীরে একটি অনতিবিস্তৃত প্রদেশ জায়গীর রূপে দান করিলেন। স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিলাষে ভীমসিংহ তথায় একটি নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার নাম রাজমহল রাখিলেন। তদীয় বংশধরেরা তথায় চত্বারিংশবর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। রাজমহলের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলে ভীমসিংহের শিল্পনিপুণতা এবং রুচিপারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে, অনধিক কাল মধ্যে রাজমহলের ধ্বংস হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি হয় যে, তাঁহার বংশধরেরা রাজপুতের উপযোগি বলবীর্য্যসাহস-সম্পন্ন ছিল না। চুয়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ভীমের

উত্তরাধিকারী দৈনিক ১।০ এক টাকা চারি আনা বেতনে সাহাপুরের সামন্তের সেবায় নিযুক্ত আছে। কখন্ কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে কিছুই বলা যায় না!

ভীমের প্রতি জাহাঙ্গীর যথোচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াও তদ্বিনিময়ে তাঁহার প্রীতিলাভে সমর্থ হন নাই। সুলতান খুরমের সহিত ভীমের অকৃত্রিম আনুগত্য সন্দর্শনে সম্রাট মনে মনে নানাবিধ সন্দেহ করিতেন। ভীমের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা দিন দিন বলবতী হইতেছে দেখিয়া তাহাকে খুরমের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার বাসনায় জাহাঙ্গীর ভীমকে গুর্জ্জরের শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিলে, ভীম তুচ্ছজ্ঞানে উক্ত পদে আপনার অনভিমতি প্রকাশ করিলেন। সুলতান খুরমের মনোগত অভিপ্রায় যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরবেজকে বঞ্চনা করিয়া তিনি স্বয়ং রাজমুকুট প্রাপ্ত হন। পরবেজ প্রথমে মিবার আক্রমণ করিয়া সাতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ভীমের যার পর নাই বিদ্বেষ ছিল। ভীম স্পষ্টাভিধানে খুরমকে পরামর্শ দিলেন যে, যদি রাজমুকুট লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিবার প্রয়োজন নাই। পরবেজ নিহত হইলেন; খুরম সসম্প্রদায়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। রাজপুতেরা গোপনে তাঁহার পৃষ্ঠবল হইল। মাড়োয়ারপতি গজসিংহ তাঁহার মাতামহ, সুতরাং তিনি রাজপুতপক্ষ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে লাগিলেন। খুরমের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ভীম সিংহ সগণসহিত সমরশায়ী হইলেন। বিদ্রোহীদল বিপর্য্যস্ত হইল; খুরম ও মহাবেৎ খাঁ উদয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। খুরম তথায় নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহারের জন্য একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় তাঁহার কিছুরই অভাব রহিল না। সেই হিন্দুরাজপ্রাসাদ মধ্যে মুসলমানদিগের উপাসনার জন্য একটি অল্পায়তন মস্‌জিদ প্রস্তুত হইল। তথায় নিরাপদে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া পিতার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে খুরম পারস্যদেশে গমন করিলেন। রাজপুতের কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সুলতান খুরম রাণা কর্ণসিংহের কৃতজ্ঞ আতিথ্যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন। খুরম-প্রদত্ত শিরস্ত্রাণ ও তরবারী এখন পর্য্যন্ত অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। অদ্যাপি সেই মসজিতে প্রতিদিন প্রদীপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। *

---

* ইহা অপেক্ষা প্রকৃত কৃতজ্ঞতার আর কি নিদর্শন হইতে পারে? মুসলমানকর্ত্তৃক হিন্দু অশেষ প্রকারে নির্জ্জিত, অপমানিত, অত্যাচারিত, তাহা সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন। কিন্তু রাজপুত একবার যাহার নিকট মধুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার জন্য প্রাণদানেও কাতর নহে। হিন্দুগৃহে মুসলমানের মস্‌জিদ ইহা অপেক্ষা আর সুস্পষ্ট নিদর্শন কিছুই হইতে পারে না। আমরা শুনিয়াছি, অদ্যাপি সেই মসজিদে নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনাদি হইয়া থাকে,

কর্ণসিংহ নির্ব্বিবাদে ও নিরুদ্বেগে আট বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক যাত্রা করেন। খুরমকে আশ্রয় দেওয়ায় তিনি জাহাঙ্গীরের বিদ্বেষভাজন হন নাই, কারণ ভীমকৃত অবৈধ কার্য্য-পরম্পরা কর্ণের অনুমোদিত বলিয়া তাঁহার একবারও বিশ্বাস হয় নাই। ১৬৮৪ সংবতে (খৃঃ ১৬২৮) কর্ণের জেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই জাহাঙ্গীর লোকলীলা সম্বরণ করেন, তখন খুরম পারস্যদেশে লুক্কায়িত ভাবে ছিলেন। ত্বরায় জগৎসিংহ খুরমকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। খুরম সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; তাঁহার প্রত্যুদ্গমন জন্য জগৎসিংহ নিজ ভ্রাতাকে সৌরাষ্ট্রে প্রেরণ করিলেন। খুরম উদয়পুরে উপনীত হইলে তত্রত্য বাদলমহলে তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইল। তিনি সাজেহান নাম গ্রহণ করিলেন; বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিবার সময়ে রাণাকে পাঁচটি প্রদেশ এবং একটি বহুমূল্য রত্ন উপঢৌকন দিলেন এবং চিতোরের ভগ্নদুর্গগুলি সংস্করণের জন্য আদেশ করিলেন।

জগৎসিংহ ষড়বিংশতি বৎসর শান্তিসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকিলে রাজপুত কবিগণ এক প্রকার উপবাস করেন বলিয়াই বোধ হয়; কারণ তাঁহারা শান্তিরসের পক্ষপাতী নহেন। যুদ্ধ বিগ্রহ ভিন্ন তাঁহাদের ওজস্বিনী লেখনী সুন্দর সঞ্চালিত হয় না। সুতরাং জগতের সময়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্রাম উপলব্ধি হয়। এই সুদীর্ঘ শান্তি-নিবন্ধন উদয়পুরের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। জগৎসিংহ সরোবর তীরে জগ্‌নিবাস নামে এক দীর্ঘায়তন রাজপ্রাসাদ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী উপদ্বীপে জগ্‌মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই সকল রাজপ্রাসাদ জগৎসিংহ নানাবিধ সুন্দর শিল্পকার্য্যে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন; এমন কি, সম্রাট-সভাস্থিত ইংরেজদূত তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারাই মিবারের বিলুপ্ত শোভা পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল। মাতোয়ার মহিষীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র হয়; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ

এবং তাহার পরিপোষণ ব্যয় সমস্ত রাণা সানন্দে বহন করিয়া থাকেন। মহাত্মা টড্ কহিয়াছেন ;—"আমরা কি ঈদৃশ কৃতজ্ঞ জাতির প্রতি উপেক্ষা করিতে পারি! যে জাতি বহুকাল পরম্পরা নিষ্ঠুরদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াও ব্যক্তিবিশেষের গুণ স্মরণ করিয়া জাতীয় মান অখুন্ন রাখিয়াছে তাহারা কি উপেক্ষার উপযুক্ত! সাজেহানের রক্তাভপীত শিরস্ত্রাণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমার নিকট উহা আনীত হইলে আমি বার বার উহাকে পূতচিত্তে অভিবাদন করিয়াছি। তীর্থযাত্রিগণ উদ্দেশ্য স্থানে উপনীত হইয়া যাদৃশ ভক্তিযোগ সহকারে নত হইয়া থাকে, আমার মনেও তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল!" এখনকার সাহেবেরা দেখুন।

রাজসিংহ ১৭১০ সম্বতে (খৃঃ ১৬৫৪) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সময়ে দিল্লিতে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। সম্রাট সাজেহান বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইলে তদীয় পুত্রগণ সিংহাসন লোলুপ হইয়া সকলেই অস্ত্রধারণ করিলেন। সাজেহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা প্রকৃত উত্তরাধিকারী, রাণা রাজসিংহ তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজপুত মাত্রেরই প্রায় সেই দিকে নির্ভর হইয়াছিল। কিন্তু আরঙ্গজীব সমস্ত বাধা বিপত্তি দুর করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। ভ্রাতৃগণ নিহত ও বৃদ্ধ পিতা বন্দী হইলেন। সেই জন্যই তিনি রাজপুতগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও সাজেহানের শিরায় রাজপুত-শোণিত প্রবাহিত থাকায় রাজপুতের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল, আরঙ্গজীবের তথাবিধ হইবার কোন কারণ ছিল না বলিয়াই বোধ হয় তিনি রাজপুত-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। তিনি রাজপুত রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি উক্ত জাতির পক্ষপাতী হন নাই।

আরঙ্গজীবের সময়ে রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বলবীর্য্যসম্পন্ন বিখ্যাত রাজগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অম্বরে জয়সিংহ যিনি মির্জা রাজা নামে বিখ্যাত ছিলেন, মাড়োয়ারে যশোমন্তসিংহ, মিবারে রাজসিংহ, বুঁদী ও কোটায় হরবংশীয় বীর, বিকানীরে রাঠোর বীর, উর্চা ও দতিয়ায় বুন্দেলাবীর, ইহাঁদের কেহই মোগল সম্রাট অপেক্ষা বলবীর্য্য সাহসে ন্যূন ছিলেন না। ওদিকে আবার মহারাষ্ট্র প্রদেশে শিবজী যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবৃত্ত হইবার উপায় ছিল না। আরঙ্গজীব অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত. ছিলেন; তিনি অন্যায় ব্যবহারে রাজমুকুট অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বদাই এই সন্দেহ করিতেন যে, হয় তো তাঁহার প্রতিও সেই রূপ অন্যায়াচরণ প্রবর্ত্তিত হইবে। এই জন্য তিনি রাজপুত বীরদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। মুখে তাঁহাদিগের প্রতি সরল ব্যবহার করিতেন, মনে মনে তাহাদিগের অনিষ্ট কল্পনা করিতেন। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, এজন্য হিন্দুদিগের প্রতি অশেষবিধ দৌরাত্ম্য করিয়া তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে শ্লাঘা মনে করিতেন। তিনি তরবারী ব্যবহার দ্বারা এই ধর্ম্ম সম্পাদনে কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ তিনি যার পর নাই হিন্দুদ্বেষী ছিলেন। তিনি হিন্দু মাত্রের উপর জেজিয়াকর * সংস্থাপন করিয়া সেই বিদ্বেষিতার সম্যকপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল কারণেই আবার হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। আরঙ্গজীব ও রাজসিংহ এতদুভয়ের শাত্রবতা ঘটিবার আরও একটী বিশিষ্ট হেতু উপস্থিত হইয়াছিল; নিম্নে তদ্বিবরণ প্রকটিত করা যাইতেছে।

* কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, মানব মাত্রেরই এই কর দিতে হয়। Capitation tax.

মাড়োয়ারের কনিষ্ঠ শাখা রূপনাগড়ের সিংহাসন শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। এই বংশের একটি পরম সুন্দরী রাজ কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য আরঙ্গজীব প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং তাহার সম্মতি অপেক্ষা না করিয়াই ঐ রমণীকে দিল্লিতে আনিবার জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্রী ইহাতে সম্মতি দান করেন নাই ? অধিকন্তু তিনি রাণা রাজসিংহের গুণ-পক্ষপাতিনী হইয়া তাঁহাকে এই ভাবে পত্র লিখিলেন ;—"রাজহংসী কি সারসের সহচারিণী হইবে ? পবিত্র শোণিত রাজপুত্রী কি মর্কটাকার অসভ্যের উপভোগ্যা হইবে! আপনি যদি ইহার উপায় না করেন, তবে আমি আত্মঘাতিনী হইয়া উপস্থিত অবমাননা হইতে আপনার পরিত্রাণ পাইব।"রাজপুত্রীর কাতর বচন বিন্যস্ত এই পত্রিকা পাঠে রাজসিংহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। কতিপয় বিশ্বস্ত সাহসী অনুচর সমভিব্যাহারে রাজসিংহ আরাবলীর পাদদেশে রূপনাগড়ের সম্মুখে উপনীত হইয়া সম্রাট পক্ষীয় লোকদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করত রাজপুত্রী সহ নিজ রাজধানীতে আগমন করিলেন। সাহসিক ব্যাপারে রাজপুত মাত্রেই প্রোৎসাহিত হইয়া তাহার পক্ষবল হইতে লাগিল।

দুর্ব্বৃত্ত নিষ্ঠুর আরঙ্গজীব গোপনে বিষপ্রয়োগ দ্বারা মাড়োয়ারপতি যশোবন্ত সিংহ এবং মিবারেশ্বর মির্জা রাজা জয়সিংহের প্রাণ সংহার করেন। ইহারা উভয়েই সম্রাটের বিশ্বস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কাবুলের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে যশোবন্ত এবং দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নিবারণ জন্যে জয়সিংহ ব্যাপৃত ছিলেন। উভয়েই রাজনীতি সম্পন্ন বীর-প্রধান বলিয়া বিখ্যাত। উভয়ের প্রতিই আরঙ্গজীবের ঘোরতর সন্দেহ ছিল ; উভয়কে দূর করিতে পারিলেই কণ্টক যায় ভাবিয়া এই দুষ্কর্ম্মে কলঙ্কিত হইলেন। জেজিয়া কর সম্বন্ধে উপরি উক্ত বীরদ্বয়ই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উভয়কে জীবন পথ হইতে অপসারিত করিয়াই দুর্ব্বৃত্ত সম্রাট জেজিয়া কর সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত ঘটিল। সমস্ত রাজপুতের মনে প্রতিহিংসা বলবতী হইয়া উঠিল। মাড়োয়ার প্রদেশ কৌশলে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে আরঙ্গজীব যশোবন্তের শিশু পুত্রকে আপনার তত্ত্বাবধানে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিশুপুত্র অজিতের জননী সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাণা আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া কৈলবা নগরে অজিতের বাসস্থান নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বীর-পুঙ্গব দুর্গাদাসের প্রতি আশ্রিতের তত্ত্বাবধান ভার সমর্পণ করিলেন। রাজস্থানের সমস্ত সামন্ত সমবেত হইয়া রাণা রাজসিংহের পৃষ্ঠবল হইলেন।

হিন্দু জাতির প্রতি আরঙ্গজীবের এতাদৃশ দৌরাত্ম্য নিবন্ধন আপামর সাধারণ সকলেই প্রপীড়িত হইলে রাণা রাজসিংহ সমগ্র হিন্দু জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সম্রাটকে এক খানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন।

এই পত্রে যথোচিত সম্মান, বিনয়, প্রার্থনা অনুরোধ, উপদেশ প্রভৃতি সাতিশয় পারদর্শিতার সহিত বিন্যস্ত হওয়ায় রাণার অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং রাজনীতিজ্ঞতার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ইতিহাসে বিখ্যাত পত্রের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত করা গেল।—

"সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের মহিমা ধন্য! সূর্য্য চন্দ্র সম দেদীপ্যমান ভবদীয় মহত্ত্ব যার পর নাই প্রশংসনীয়। আমি আপনার শুভানুধ্যায়ী, যদিও আমি আপনি ভবদীয় সম্মানার্হ সমীপস্থান পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি আমি আপনার আদেশ পরিপালন দ্বারা রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে ক্ষণ মাত্রও তাচ্ছিল্য বোধ করিনা। ভূস্বামী, সামন্ত, মির্জা, রাজা রায় প্রভৃতির অভ্যুদয় কামনা; ইরাণ, তুরাণ, রুম, শান ইত্যাদি প্রদেশীয় সামন্তবর্গের মঙ্গলেচ্ছা, সমস্ত প্রকৃতিপুঞ্জের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন-বাসনা সর্ব্বদা আমার মনে জাগরুক রহিয়াছে। এ বিষয়ে যেন আপনার কণামাত্র সন্দেহ না থাকে, ইহাই আমার অভিলাষ। যাহাতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত মঙ্গল ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তাদৃশ কোন বিষয়ের অবতারণা করাই উপস্থিত পত্রের উদ্দেশ্য; আমার গত পূর্ব্ব কার্য্য পরম্পরা স্মরণ করিয়া, এবং আপনার মহত্ত্বের মান রাখিয়া অবহিত চিত্তে পত্র পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব।"

"যে আমি আপনার নিতান্ত অনুগত ও শুভানুধ্যায়ী, তাহারই বিপক্ষতা করিতে আপনার ভাণ্ডার শূন্য প্রায় হইয়াছে, শুনিতেছি সেই শূন্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিবার মানসে আপনি একটী অবৈধ কর সংস্থাপন করিয়াছেন।"

"আপনার প্রপিতামহ মহম্মদ জলাল উল দিন আকবর, যিনি এখন সুখে স্বর্গসিংহাসন সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহার গুণের কথা বর্ণন দ্বারা শেষ করা যায় না। তিনি দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষকাল নিরপেক্ষ ভাবে সাম্রাজ্য করিয়া গিয়াছেন; সকলকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, নাস্তিক, সকলেই তাঁহার সমান অনুগ্রহ পাত্র ছিল। তিনি কখন জাতি বিশেষ বা ধর্ম্ম বিশেষের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহার অসীম গুণ পরম্পরার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাগণ তাঁহাকে 'জগৎ গুরু' বলিয়া সম্বোধন করিত।"

"আপনার পিতামহ মহম্মদ নুর উল দিন জাহাঙ্গীর, যিনি এখন সুখে স্বর্গবাস করিতেছেন, তিনি দ্বাবিংশ বর্ষ প্রজাগণকে সুখ স্বচ্ছন্দতা বিতরণ পূর্ব্বক সাম্রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। সামন্ত ও মিত্র রাজগণের প্রতি বিশ্বাস চির দিন তাঁহার অটল ছিল।"

"আপনার খ্যাতনামা পিতা সাহ জেহান দ্বাত্রিংশ বর্ষ ব্যাপী রাজত্বে সদ্বিচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা চির সম্মান লাভ করিয়াছেন।

"আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণ ধর্ম্মানুগত আচার ব্যবহার দ্বারা এইরূপ কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এবংবিধ স-

বিচার-সঙ্গত হইয়া যখন যে দিকে গমন করিয়াছেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদের পুরোভাগে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। কত কত দেশ, প্রদেশ ও দুর্গ তাঁহাদের পদানত হইয়াছে। সকলে সানন্দে তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়াছে। কিন্তু আপনার সময়ে সমস্তই বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিতেছি; কত কত প্রদেশ আপনার হস্ত বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে—ক্রমে আরও এইরূপ ঘটিবে, কারণ চারি দিকেই প্রজার হাহাকার রব উঠিয়াছে; আপনার দৌরাত্ম্যে প্রকৃতিপুঞ্জ অস্থির হইয়াছে। তাহারা পদ দলিত হইতেছে, কৃষীবল অভাবে দেশ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, কোন কোন প্রদেশ এককালে জনশূন্য হইয়া যাইতেছে। সৈন্যগণ সততই বিরক্তচিত্ত, ব্যবসায়ীগণ অসন্তোষে পরিপূর্ণ, মুসলমানেরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট, হিন্দুরা হতাশ, আর নিম্নশ্রেণীস্থ সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণ অর্দ্ধাশনে বিকলচিত্ত হইয়া অনবরত বক্ষে করাঘাত করত ক্রন্দন করিতেছে।"

"দরিদ্র প্রজার শোণিত শুষ্ক করত করসংগ্রহকারী রাজার সম্মান কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? অপর সাধারণ সকলেই স্পষ্টাভিধানে কহিতেছে যে, হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী হইয়া ভারতবর্ষের সম্রাট, ব্রাহ্মণ, যোগী, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেছেন। নির্ব্বিরোধী নির্জ্জনবাসীদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করায় তৈমুর বংশের অত্যুন্নত মর্য্যাদা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। ধর্ম্মপুস্তকের প্রতি আপনার যদি কিছু মাত্র বিশ্বাস থাকে, খুলিয়া দেখুন, তাহাতে এই নিগূঢ় উপদেশ পাইবেন যে, সেই পরম পরাৎপর পরমেশ্বর কেবল মাত্র মুসলমানের ঈশ্বর নহেন, তিনি সমস্ত মানব জাতির ঈশ্বর। তাঁহার সমক্ষে হিন্দু মুসলমান সকলই সমান; বর্ণানুযায়ী ভিন্ন ভাব তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা। আপনাদিগের ভজনাগারে তাঁহারই নাম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রার্থনা হইতেছে, আবার আমাদের ঘণ্টা নিনাদিত দেব মন্দিরে তাঁহারই পূজা হইতেছে। অপরের ধর্ম্মে নিন্দা বা ঘৃণা প্রকাশ করিলে পরমেশ্বর অসন্তুষ্ট হন। কোন আলেখ্য বিনষ্ট করিলে চিত্রকর তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, অতএব জগতের সেই অদ্বিতীয় কারুকর্ত্তার কার্য্যের কোন অঙ্গহানি করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য সন্দেহ নাই।"

"কেবল মাত্র হিন্দুর নিকট হইতে এই কর গ্রহণ করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। ইহা বিশুদ্ধ রাজনীতির বিরোধী, ইহাতে দেশ ত্বরায় নির্ধন হইয়া পড়িবে। এতদ্দ্বারা আপনি ভারতের চিরাচরিত বিধির মস্তক চূর্ণ করিতেছেন। যদি আপনি নিজ ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই ন্যায়বিরুদ্ধ কর সংস্থাপনে কৃতসংকল্প ও বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, তবে প্রথমে হিন্দুদলপতি রামসিংহ ও তৎপরে এই অধম—আপনার শুভানুধ্যায়ীর প্রতি ঐ অবিহিত করধার্য্য করা উচিত ছিল; পিপীলিকা ও মক্ষিকার প্রতি পীড়ন করা আপনার ন্যায় উন্নতপদবী বীর পুরুষের কোন

মতেই কর্ত্তব্য হয় নাই। চমৎকৃত হইলাম যে আপনার মন্ত্রীগণ আপনাকে ন্যায় পথে বিচরণের উপদেশ দিতে অবহেলা করিয়াছেন।"

অজিতকে আশ্রয় দান এবং ভাবী পত্নীকে অপহরণ এই দুই কারণে রাণার উপর আরঙ্গজীব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর আবার এই পত্র পাইয়া একবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। মিবার আক্রমণের জন্য যার পর নাই আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়পুত্র মৌজিম দাক্ষিণাত্যে, অন্যতর পুত্র আজিম কাবুলে ও আকবর বঙ্গদেশে শত্রুদমন ও রাজ্যশাসন ব্যপদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া একত্রিত হইতে আহূত হইলেন। বিপুল সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সম্রাট মিবার প্রদেশে প্রবেশ করিয়া নিম্নতল ভূমি অধিকার করিলেন। তত্রত্য অধিবাসীগণ পলায়ন পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। চিতোর, মণ্ডলগড়, মণ্ডিসোর, জীবন প্রভৃতি কতকগুলি দুর্গ অনতি আয়াসে তাহার করকবলিত হইল! রাণা রাজসিংহ অসংখ্য রাজপুত বীর সমভিব্যাহারে আরাবলীর প্রত্যন্ত প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি এরূপ কৌশলে সৈন্য সাজাইলেন যে, ইঙ্গিত মাত্রে তাহারা একটি বৃহৎ প্রদেশ বেষ্টন করিতে সমর্থ হয়। সম্মুখে রাণা পশ্চিমে কুমার ভীমসিংহ, এবং আরাবলী শিখরে জ্যেষ্ঠ কুমার জয়সিংহ ব্যগ্রচিত্তে বিপক্ষের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আরঙ্গজীব আকবরকে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য সহকারে উদয় পুরাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া উদয় সাগর সন্নিহিত স্থানে স্বয়ং শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

আকবর রাজধানী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে গমন করিলেন, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কোন জীবিত প্রাণী তাঁহার নেত্রগোচর হইল না। তিনি শিবির-সন্নিবেশ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিত আছেন এমন সময়ে জয়সিংহ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। আকবর জয়সিংহের অপ্রতিহত বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সেনা নিহত হইল। তিনি পলায়ন করিতে করিতে পথি মধ্যে আরও ঘোর বিপদাপন্ন হইলেন। এক গিরি সঙ্কটে ভিল সৈন্য দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কতিপয় দিবস অনাহারে কোন মতে প্রাণ রক্ষা করিলেন। জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়সিংহের করে আত্ম সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। মনে করিলে জয়সিংহ তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিতেন, কিন্তু স্থানান্তরে জয়সিংহের মনঃ সমাবেশ হওয়ায় আকবর পলাইয়া কোন মতে প্রাণরক্ষা করিলেন। তাঁহার যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী রাজপুতদিগের হস্তগত হইল।

বিখ্যাত দেলাইর খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে আর এক সম্প্রদায় সম্রাটসেনা দাম্বুরি নামক অন্য একটি গিরিসংকটে প্রবেশ করিয়া ঘোর বিপদাপন্ন হয়। বিক্রম শোলাঙ্কী ও গোপীনাথ রাঠোর মিবারের সামন্ত যুগল সেই সঙ্কট পথের রক্ষক ছিলেন। দে-

লাইর নির্বিবাদে গিরিসঙ্কটের অধিকাংশ অতিক্রম করিয়া সামন্ত যুগলের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। জন প্রাণীও প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। ইহাতেও সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী রাজপুতগণের হস্তগত হয়।

এই পার্ব্বত্য সংগ্রামে রাণার সম্যক্ কৃতার্থতা দর্শনে আরঙ্গজীব মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি আপনার শরীর নিরাপদ নহে ভাবিয়া নিতান্ত চকিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি পুত্র আজিমের সহিত একত্রিত হইয়া আকবর ও দেলাইর খাঁর ভাগ্য লক্ষ করতঃ অপেক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে বীরাগ্রণী দুর্গাদাস রাঠোর আপন ভুজবলে সম্রাটকে আক্রমণ করিলেন। সম্রাট রাঠোরের ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলেন। ইউরোপীয় কর্ত্তৃক তাঁহার কামান চালিত হইত, কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার দর্শিল না। রাজপুতেরা তাহাদের ধর্ম্মের শত্রুকে প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছে রক্ষা নাই। আরঙ্গজীব পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাঁহার সম্প্রদায় ভুক্ত অধিকাংশ লোক নিহত এবং অনেক অস্ত্র শস্ত্রাদি রাজপুত হস্তে পতিত হইল। ১৭৩৭ সম্বৎ ফাল্গুন মাসে রাণা এই গৌরবাত্মক বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌজিম এখন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য হইতে পৌছেন নাই। আরঙ্গজীব ভগ্নসেনা সহকারে চিতোর প্রাচীরের সন্নিধানে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক মৌজিমকে শীঘ্র আসিতে লিখিলেন। ভাবিলেন, দাক্ষিণাত্যে শিবজীর স্বাধীনতা হরণ ও দৌরাত্ম্য নিবারণ অপেক্ষা উপস্থিত বিপদ গুরুতর। ইতিমধ্যে সুবিখ্যাত জয়মলের বংশধর শাবল দাস চিতোর ও আজমীরের মধ্যস্থিত অবসর সমূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আরঙ্গজীব তাহাতে যার পর নাই ভীত হইলেন। এই যে ভয়ানক যুদ্ধ, যাহাতে তাঁহার সিংহাসন যাইতে পারে,—অধিক কি বলিব, যাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইতে পারে, সেই যুদ্ধ তাঁহার পুত্র আজিম ও আকবরের উপর ফেলিয়া দিয়া তিনি আজমীরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। সেখান হইতে তিনি সাবলদাসের বিপক্ষে খাঁ রোহিলাকে পাঠাইলেন। তাঁহার সহিত অনেক সৈন্য সামন্ত আসিয়া আজিম ও আকবরের পৃষ্ঠবল হইল। এদিকে মাড়োয়ার সৈন্য আসিয়া সাবল দাসের সহিত মিলিত হইল। পুরমণ্ডল নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল, সম্রাট পক্ষের দুর্দ্দশার কথা কি কহিব, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করত আজমীরে আশ্রয় লইল।

যখন রাণা, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সামন্তবর্গ উপর্য্যুপরি জয়লাভে আনন্দ সাগরে ভাসমান রহিয়াছেন, তখন কুমার ভীমসিংহ যে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গুজ্জর দেশ আক্রমণ করত ইদর হস্তগত করিয়া হাসন ও তদনুচরদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন; তৎপরে বীরনগরের পথে গমন পূর্ব্বক অলক্ষিত ভাবে পত্তনে উপনীত হইয়া বিপক্ষের শিবির লুণ্ঠন করিলেন।

শিদপুর, মৌরাসো প্রভৃতি নগর তাঁহার হস্তে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। এই সকল স্থানের প্রজাগণ আসিয়া আপনাদের দুঃখ বিপত্তি জ্ঞাপন করিলে রাণা করুণ হৃদয় হইয়া পুত্রকে নিকট আসিতে দূত প্রেরণ করিলেন। এরূপ মহানুভাবতা আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? শত্রুপদাবনত জীবের কষ্টে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল।

আরঙ্গজীব উৎপীড়ক না হইলে কখনও এ সমরানল প্রজ্জলিত হইত না। রাজপুতেরা তাঁহার অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছিল,—নিঃশব্দে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন আপনাদিগের স্বত্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণে উত্তেজিত হইয়াছিল। এই সময়ে দয়াল সাহ নামে এক সাহসী বীর রাণার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কতকগুলি সাহসী সহচর সমভিব্যাহারে মালব প্রদেশে প্রবেশ করত নর্ম্মদা হইতে বেটোয়া পর্য্যন্ত হস্তগত করিলেন। সারঙ্গপুর, দেওয়াস, সারঞ্জ, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী এবং চণ্ডেরী প্রভৃতি জনস্থান লুণ্ঠিত এবং অনেক দুর্গ বিধ্বংসিত হইল। আপন আপন প্রাণ লইয়া সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল, স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থ স্থানান্তরে আশ্রয় লইল, যে সকল দ্রব্যজাত সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায় না, অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক যে গুলি ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। কাজীরা শ্মশ্রু ক্ষৌরী করিয়া ও কূপ মধ্যে কোরাণ ফেলিয়া দিয়া আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে লাগিল। মন্ত্রী মালব প্রদেশকে জনশূন্য প্রায় করিলেন। তাঁহার লুণ্ঠিত অর্থে রাণার যথেষ্ট উপকার দেখিতে লাগিল। কৃতার্থতা লাভে যার পর নাই প্রোৎসাহিত হইয়া মন্ত্রীবর জয়সিংহের সহিত মিলিত হইলেন, এবং চিতোরের নিকট আজিমের সহিত এক যুদ্ধ করিলেন। রাঠোর ও খিচি সেনা আসিয়া মিবার সেনার সহিত মিলিত হইল। মোগল রাজকুমার এই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, সম্প্রদায়ের অনেক সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হইল, রাজপুতেরা আজিমের পশ্চাৎ ধাবিত হইলে তিনি নিরুপায় দেখিয়া রিন্থম্বোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে মোকিম ও গঙ্গা শুক্তোৎ, সালুম্বার রতন চন্দোৎ; সাদ্রীর চন্দ্রসেন ঝালা, বৈদলার সুবলসিংহ চোহান, বিজোলীর বরিশাল পুয়ার এই কয় সামন্ত বিশেষ কার্য্যদক্ষতা ও বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা সময়ে সামন্ত চতুষ্টয় এরূপ ওজস্বী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে তাহাতে সমস্ত রাজপুত সেনা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিবার হইতে সমস্ত মোগল সেনা তাড়িত হইল, এখন রাণা মাড়োয়ারের অপ্রাপ্ত-ব্যবহার অজিতের স্বত্ব রক্ষায় উদ্যুক্ত হইয়া গতবর প্রদেশের প্রধান নগর গানোরার অভিমুখে সেনা চালনা করিলেন। ইতিমধ্যে অজিতের বীর জননী অনেক শত্রুকে পদানত করিয়া আপনার অধিকার যত দূর সাধ্য রক্ষা করিতে যত্নবতী ছিলেন। ভীমসিংহ শিশদীয় সে-

নার নেতা হইয়া আকবর ও টাইবর খাঁর চালিত সেনার সহিত যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে একটী চমৎকারজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তদ্বিবরণ এই ;—জনৈক রাজপুত সামন্ত মোগল সেনার মধ্য হইতে পাঁচ শত উষ্ট্র অপহরণ পূর্ব্বক তাহাদের শৃঙ্গে মশাল বাঁধিয়া দিয়া মোগল দল মধ্যে ছাড়িয়া দেন ; ইহাতে একটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় চারি দিকে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল ; এই অবকাশে রাজপুতেরা ব্যূহভেদ করিয়া মোগল শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। মোগলেরা নিতান্ত হতবল হইয়া পলায়ন করিল। উপর্য্যুপরি জয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া রাণা মিত্রগণের সহিত পরামর্শ করত স্থির করিলেন যে দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজীবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আকবরকে সম্রাট করিবেন। যে বিসদৃশ উপায়ে আরঙ্গজীব পিতৃসিংহাসন হরণ করিয়াছিলেন, তাহা আকবরের স্মৃতিতে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। রাজপুতদিগের প্রস্তাবে সহজেই আকবর স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তিনি আরঙ্গজীব অপেক্ষা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ সকল বিষয়ে আরঙ্গজীবের অদ্ভুত চতুরতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একটী মাত্র কৌশলে তিনি সমস্ত চক্রান্ত ভাঙ্গিয়া দিলেন। আকবরের সহিত রাজপুত সেনা মিলিত হইল, জ্যোতির্ব্বিদ্ যাত্রার শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়া দিল, এমন সময় আরঙ্গজীব এই চক্রান্ত বিবরণ অবগত হইলেন। চতুর চূড়ামণি সম্রাট কতিপয় বিশ্বস্ত সহচরে পরিবেষ্টিত হইয়া আজমীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, একটী চাতুরীর অবতারণা করিলেন। আকবর এক দিনের পথ দূরে, মোজিম ও আজিম তদপেক্ষা আরও দূরে আছেন। সম্রাট আর সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না ; আকবরকে এক খানি পত্র লিখিলেন, এবং কৌশলে সেই পত্র খানি রাজপুত সেনানায়ক দুর্গাদাসের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। পত্রের ভাবার্থ এই যে হে প্রিয় পুত্র ! যখন রাজপুতেরা আমার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবে, তুমি সেই সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। তোমার মৌখিক আনুগত্যে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে থাকিতে কার্য্য সমাধা করিবে। কৌশল বিলক্ষণ খাটিয়া গেল, রাজপুতেরা আকবরের পক্ষ ত্যাগ করিল। হতাশ হইয়া আকবরসহচর টাইবার খাঁ সম্রাটকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হইয়া আপনি হত হইল। এদিকে মৌজিম ও আজিম আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আরঙ্গজীবও বাঁচিয়া গেলেন। রাজপুতেরা আবার আকবরকে আশ্রয় দিলেন, কিন্তু তথায় বাস করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত নিরাপদ নহে বিবেচনায় দুর্গাদাস চালিত পাঁচশত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথে গমন পূর্ব্বক মহারাষ্ট্র-সামন্ত শম্ভুজীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরেই একখানি ইংলণ্ডীয় অর্ণবযান-যোগে পারস্য দেশে নীত হইলেন।

আকবর শম্ভুজীর আশ্রয় গ্রহণ করাতে সম্রাট অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তখন

রাজপুতদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত হইল। বিকানীরের রাজা শ্যামসিংহ সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি কৌশলে সন্ধি করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। স্বদেশ গমন ব্যপদেশে শ্যামসিংহ রাণার নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রাণা বিগতযুদ্ধ সম্বন্ধে সম্রাটের অবিবেচনা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলে শ্যামসিংহ সন্ধির কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, যদি অভিমত হয় তবে আমি মধ্যস্থ হইয়া সন্ধি করিয়া দিতে পারি। যে সকল প্রসঙ্গ লইয়া এই সন্ধি হয়, তাহাতে জেজিয়া করের কোন উল্লেখ নাই বলিয়া আমরা এই সন্ধির কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। ফলতঃ এই সময়ে রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হওয়ায় সন্ধির সমস্ত প্রসঙ্গ তাঁহার মনোগত না হইতেও পারে। যাহা হউক, ১৭৩৭ সম্বতে (খৃঃ ১৬৮১) রাণার মৃত্যু হইল। কথিত আছে, বিগত সমরে তাঁহার শরীরে কতিপয় আঘাত নিপতিত হওয়ায় তাহারই ক্ষত নিবন্ধন তাঁহার মৃত্যু হয়।

পাঠক! একবার রাজসিংহের সহিত আরঙ্গজীবের তুলনায় সমালোচন করুন। সম্রাটের পাপকার্য্যের সংখ্যা নাই, এমন কি, আসিয়া মহাদেশস্থ কোন নরপতিই পাতক দ্বারা আরঙ্গজীবের সমকক্ষ হইতে পারেন না। ভুলিয়াও তিনি সৎকার্য্য করেন নাই,—শরণাগত ব্যক্তির প্রতি কিরূপ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন তাহা তিনি জানিতেন না; চাতুরী সম্বন্ধে তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন, সরলতার সহিত কখন তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই। এদিকে রাজসিংহের মহানুভাবকতা মনে হইলে হৃদয় আনন্দসাগরে ভাসমান হয়। বিপক্ষ পক্ষের ক্রন্দনে করুণার্দ্র হইয়া তিনি পুত্রকে জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। স্বদেশ রক্ষায় তিনি সাহসী ও রণপণ্ডিত। অবলারমণীর জাতিমান বজায় রাখিতে প্রাণ দিতেও কাতর নহেন। তিনি কাপুরুষ সম্রাট আরঙ্গজীবকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই তাহার অসীম গুণের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিল্পসাহিত্যে তাঁহার অপার অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়েই রাজবিলাস নামক গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তিনি রাজসমুদ্র নামে এক সরোবর খনিত করেন; নিম্নে আমরা রাণার এই কীর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া এই গৌরবসূচক আখ্যান সমাপ্ত করিতে পারি না।

উদয়পুরের ত্রয়োদশ ক্রোশ দূরে, আরাবলী পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে ক্রোশান্তরে এই সরোবর খাদিত হয়। গুস্টী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আরাবলী হইতে বাহির হইয়া আইসে, একটি বাঁধ প্রস্তুত করিয়া তাহারই প্রবাহ রোধ করা হয়। সেই জল একত্রিত হইয়া যে সরোবর হয় তাহারই নাম রাজসমুদ্র। ইহা দেখিতে প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, ইহার পরিধি প্রায় দ্বাদশ মাইল; স্থানে স্থানে জল অত্যন্ত গভীর; চারিদিক বারিতল পর্য্যন্ত শ্বেতপ্রস্তরে বাঁ-

ধান; উপর হইতে পুলিন দেশ পর্য্যন্ত সোপানাবলী সুশোভিত। প্রস্তরপ্রাচীর-ক্রোড়ে যে স্থান পতিত রহিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণী আরোপিত করিবার উপযোগী সমস্ত আয়োজনই হইয়াছিল, রাজসিংহ জীবিত থাকিলে বোধ হয় তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। সরোবরের দক্ষিণদিকে একটি নগর ও দুর্গ প্রস্তুত হয় তাহার নাম রাজনগর। বাঁধের উপরে এক সুন্দর মন্দির প্রস্তুত হইয়া তাহাতে কৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানে স্থানে প্রস্তরের খোদিত মূর্ত্তি সুশোভিত, এবং প্রাচীরগাত্রে রাণার কুলপরিচয় লিখিত হইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতে ছেয়ানব্বই লক্ষমুদ্রা ব্যয়িত হয়। এই বিপুল অর্থের অধিকাংশ রাণা, অবশিষ্টাংশ সামন্ত ও ধনশালী প্রজায় প্রদান করেন। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে প্রস্তর সংগৃহীত হয়। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইতে বিপুল সম্পত্তি ব্যয়িত হয় বলিয়া অনেকে কহিতে পারেন যে, এই অর্থে ইহা অপেক্ষা বহু উপকারজনক কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিত; কিন্তু যে কারণে রাজসমুদ্র ও রাজনগর প্রস্তুত হয় তাহা শুনিলে আর কেহই সে কথা বলিবেন না, অধিকন্তু রাণাকে সকলে ধন্যবাদ করিবেন। নিম্নে তদ্বিবরণ লিখিত হইল।

১৭১৭ সম্বতে (১৬৬১) মিবারে দুর্ভিক্ষ ও মারিভয় উপস্থিত হয়। আষাঢ় মাস অতীত হইল, বিন্দুমাত্রও বৃষ্টিপাত হইল না; শ্রাবণ ভাদ্রও সেইরূপে অতিবাহিত হইল। জলাভাবে সমস্ত শস্য পুড়িয়া গেল, অনাহারে চারিদিকে হাহাকার রব উঠিল; নিতান্ত অখাদ্য দ্রব্যও লোকে আহার করিতে লাগিল; স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামী এবং স্বামীত্যাগ করিয়া স্ত্রী পলায়ন করিতে লাগিল; অনাহার জনিত ক্লেশে পিতা মাতায় সন্তান বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল; দিন দিন লোকের যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কীট পতঙ্গাদি প্রাণীও মরিয়া গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। যদি কেহ কোন উপায়ে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিল, একবারের আহার দুইবারে খাইতে লাগিল। প্রবল পাশ্চাত্য বায়ু প্রবাহিত হইয়া চারিদিকে মহামারী বিস্তৃত করিতে লাগিল। আকাশে বিন্দু মাত্র মেঘ নাই বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন অজ্ঞাত পদার্থের ন্যায় হইল। নদী সরোবর প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া গেল। যাজকে ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিল, ব্রাহ্মণ শূদ্রে ভেদ রহিল না; শক্তি, জ্ঞান, বর্ণ, জাতি, সকলেই সব ভুলিয়া গেল; খাদ্য মাত্রই সকলের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল, ফল, ফুল, পত্র ও বৃক্ষবল্কল পর্য্যন্ত আহারে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, এমন কি শেষে মানুষে মানুষ খাইতে আরম্ভ করিল, জলাশয় মৎস্যশূন্য ও নগর জনশূন্য হইতে লাগিল। সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িল।

উপস্থিত বিষাদ নিরাকরণের জন্য রাণা অনেক দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন প্রতিকার না হওয়ায় মনে মনে এমন একটি কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত

হইবার কল্পনা করিলেন, যাহাতে দরিদ্র নিরুপায় ব্যক্তিগণ পরিশ্রম করিয়া তদ্বিনিময়ে উপযুক্ত খাদ্য বা অর্থলাভ করত: আপনাদের জীবন রক্ষায় সমর্থ হইতে পারে। প্রকৃতিপুঞ্জের অসহনীয় যাতনা নিরাকরণের জন্য ঐ রাজসমুদ্র ও রাজনগরের অনুষ্ঠান হয়। রাজসিংহের রাজত্বের সপ্তমবর্ষে উক্ত কার্য্য আরম্ভ হইয়া সাত-বৎসরে শেষ হয়। ১৭১৭ সংবৎ পৌষ মাসের অষ্টম দিবসে বুধবাসরে হস্তানক্ষত্র-যুক্ত শুভলগ্নে এই শুভকার্য্যের সূত্রপাত হয়। ইহার আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি সময়ে নানাবিধ মাঙ্গলিক ও দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সকল গুণে রাজসিংহ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণা।

বা

কলিকাতা শতাব্দীপূর্ব্বে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এক সপ্তাহ অতীত হইল কর্ত্তাবাবুর বাটিতে কৃষ্ণা দেবসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ধনাগমে যেরূপ পরজন-অনুরাগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কৃষ্ণার আগমনে কর্ত্তাবাবুর দেব-ভক্তি সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষ্ণা প্রভাতে স্নানান্তে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, আলুলায়িত কেশে বসিয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েন, কর্ত্তাবাবুও প্রাতঃস্নান করিয়া, রাধাশ্যাম বলিতে বলিতে আসিয়া ইষ্টদেব পূজায় নিযুক্ত হয়েন। কর্ত্তাবাবু আসিলে, বা কর্ত্তাবাবুর আসিবার পদ শব্দে কৃষ্ণা অবগুণ্ঠিতা হয়েন, সুতরাং তাঁহার মধুর মুখ-কান্তি কোন দিন বা একবার মাত্র নয়নগোচর হয়; কোন দিন বা হয় না। তথাচ, সহৃদয় কর্ত্তাবাবুর হৃদয়াকাশে সেই সুমিষ্ট মুখশশী সতত উদীয়মান। কৃষ্ণা চন্দন ঘষিতেছেন, রৌপ্যময় পাত্রে উহা রাখিতেছেন; কৃষ্ণা একটি পাত্র হইতে জলসিক্ত ফুলগুলি লইয়া অপর পাত্রে রাখিতেছেন; কৃষ্ণা কখন উঠিতেছেন, কখন বসিতেছেন; তাঁহার আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি অবাধ্য হইয়া কখন এদিকে কখন ওদিকে পড়িতেছে, —কখন চম্পকবর্ণ সুন্দর বাহুলতা প্রসারিত করিয়া দেব সামগ্রীতে স্পৃষ্ট না হয় এই ভয়ে, কৃষ্ণা উহা সরাইয়া দিতেছেন। কর্ত্তাবাবু পূজোপলক্ষে বসিয়া যতই দেখিতেছেন, ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি ততই প্রগাঢ় হইতেছে, ও পূজার সময় ততই বৃদ্ধি

পাইতেছে। কর্ত্তাবাবুর নয়নে কৃষ্ণা, হৃদয়ে কৃষ্ণা, অঙ্গুলী-পর্ব্বে কৃষ্ণা, বিল্লপত্রে কৃষ্ণা, ধ্যানে কৃষ্ণা;—হায়! এরূপ ভক্ত এসময়ে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়!!

দেবগুরু ভক্ত কর্ত্তাবাবু আহ্নিকান্তে প্রত্যহ বাহির বাটিতে আইসেন। এখনও সেইরূপ আসিতেছেন, তাঁহার ভক্তির আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন প্রাণ সততই দেবালয়ের প্রতি রাখিতেছেন। অন্দরের সমস্তভার কর্ত্রী-মহোদয়ার উপর নির্ভর, বাহিরের কার্য্য দাওয়ানজী তত্ত্বাবধারণ করেন, সুতরাং মন প্রাণ দেবালয়ের প্রতি রাখিতে কেনইবা বঞ্চিত হইবেন? কর্ত্তাবাবু বাহিরে বৈঠকখানায় আসিয়া মসলন্দে বসিলে, পল্লীস্থ জনগণের বা নিকট সম্পর্কীয় বা সমকক্ষ ব্যক্তিগণের দোষ গুণ সকল প্রতিদিন বিচার হইয়া মীমাংসিত হইত, সে সময়ে কর্ত্তাবাবুর শ্রীমুখ হইতে যাহা নির্গত হইত, কতশত ব্যক্তি প্রত্যহ উহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। যে জন দণ্ডনীয়, কর্ত্তাবাবু তাহার দণ্ডবিধান করিতেন, যাহাদিগের সহিত আচার ব্যবহার রহিত হইবে, তাহারা তাঁহার অশনিবৎ আজ্ঞা শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সজল নয়নে চলিয়া যাইত। এস্থলে আমাদিগের টীকা করা আবশ্যক—কর্ত্তা মহোদয় অবলাজনের দোষ শুনিলে সহজে গ্রাহ্য করিতেন না, সর্ব্বদা বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্বীকার করিতেন না। কথন কথন সরেজমিনে তদারক করিতে যাইতেন। এতদ্ভিন্ন, নবাগত কাব্যশাস্ত্রাধ্যাপকগণের নব নব কবিতা শুনিয়া তাঁহাদিগের পুরস্কার ও বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট করিতেন। কেহবা নূতন গল্প, নূতন কথা কহিলে বা নূতন সমাচার আনিলে কর্ত্তাবাবু প্রীতিসুখানুসারে তাহাদিগের পুরস্কার দিতেন, ও সর্ব্বদা তাহাদিগকে আপন সভায় রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। এই সকল নিয়মিত দৈনিক কার্য্য সমাধা করিতে করিতে যখন মার্ত্তণ্ড গগণরাজ্যের মধ্যসীমা অতিক্রম করিতেন, তখন কর্ত্তাবাবু আহারাদি করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিতেন; কেননা লক্ষ্মীজনার্দ্দনের ভোগ না হইলে তিনি আহার করিতেন না, এবং তাঁহার আহার না হইলে কর্ত্রী মহোদয়া আহার করিতে পারিতেন না। এইরূপ নিয়মে কর্ত্তাবাবুর প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইত। কর্ত্তাবাবু আহারান্তে দুই চারিদণ্ড বিশ্রাম করিতেন। পূর্ব্বের প্রথানুসারে কর্ত্রী মহোদয়া বিশ্রামের সময় উপস্থিত থাকিয়া স্বামীর সেবা করিতেন, এবং এই উপলক্ষে সাংসারিক বিষয় সমস্তের আলোচনা করিতেন। এই সময় গৃহের অনুচর ও অনুচরীদিগের পক্ষে বিশেষ সুখ বা দুঃখের সময়; কেননা যে সকল অনুচর বা অনুচরী কর্ত্রী মহোদয়ার বিশেষ প্রীতিসম্পাদন করিত, তাহারা আপনাপন কর্ম্মফলানুসারে পুরস্কারের আশা করিত। যাহারা কর্ত্রী মহোদয়ার অপ্রীতির কারণ হইত, তাহারা সশঙ্কিত-চিত্তে এই সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। অপরাহ্নে শয়নমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে তাহারা

আপনাপন কর্ম্মোপযুক্ত পুরস্কার বা দণ্ড পাইত। শুভাশুভ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা সকলের সাধ্য নহে, সুতরাং কেহ কেহ বহির্দ্বারে থাকিয়া দম্পতীর যে যে কথা হইত তাহা গোপনে থাকিয়া শুনিত। এই উপলক্ষে তাহারা অনেক সময় স্বার্থলাভ করিতে পারিত।

অদ্য কর্ত্তাবাবু অপরাহ্নে বিশ্রামের পর বাহিরে বৈঠকখানায় আসিয়া মশ্‌নদের উপর বসিয়াছেন। বৈঠকখানা কিরূপ সুসজ্জিত তাহা এই উপলক্ষে কীর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে লিখিতেছি; বৈঠকখানা চব্বিশহাত লম্বা ও আটহাত প্রশস্ত। ঘরে চারিটী মূল্যবান ঝাড় ও ষোলটী দেওয়ালগিরী। দুইদিকে দুই খানি বৃহৎ আয়না, এবং প্রতি দেওয়ালগিরীর নীচে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। প্রথমতঃ কালীতারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, কৃষ্ণ আয়ানঘোষ আসিতেছে শুনিয়া কালী হইয়া দাড়াইয়াছেন, যশোদা কৃষ্ণকে নবনী খাওয়াইতেছেন, কৃষ্ণ গোপিনীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া গুপ্তভাবে সুখে বৃক্ষশাখায় বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, ইত্যাদি। নীচে "ফরাস বিছানা"। বিছানার উপর বাবুর মস্‌নদ, মসন্‌দের দুইধারে দুইটী মৃদঙ্গ সেজ, উহাদিগের পার্শ্বে দুইটী বাঁধান হুকা। বৈঠকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলার পাত রহিয়াছে, এক পার্শ্বে গঙ্গাজলপূর্ণ একটী রূপার ডাবর আছে, ব্রাহ্মণেরা আসিলে কর্ত্তাবাবু বৈঠক হইতে কলার পাত লইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক জিহ্বাগ্রে ঠেকাইয়া মস্তক তুলিয়া ডাবরের জলে ফেলিয়া দেন।

কর্ত্তা বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন, কেহই উপস্থিত নাই, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ একাকী বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ আর বৈঠকখানায় থাকিতে পারিলেন না। দেবালয়ে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের আরতি দেখিতে যাইতে হইবে। কৃষ্ণাব আলুলায়িত কেশরাশি যাহা প্রভাতে অবাধ্য হইয়া তাঁহাকে অতিশয় ব্যস্ত করিয়াছিল এক্ষণে সেই সুকেশরাশি কিরূপে তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়াছে তাহা দেখিতে কর্ত্তাবাবু নিতান্ত পিপাসু হইয়া চলিলেন। পুনরায় অন্তঃপুব অতিক্রম করিয়া দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন আরতির উদ্যোগ হইতেছে, বৈষ্ণবগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। কর্ত্তাবাবু উপস্থিত হইলে পুরোহিত "ব্যস্ত সমস্ত" হইয়া আরতি আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণা একাকিনী এক পার্শ্বে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দণ্ডায়মানা আছেন। পুরোহিতের হস্তে দীপাধার যতই উঠিতেছে ও নামিতেছে, কৃষ্ণার সুন্দর দেহছটা ততই সমধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। ভক্তজনাগ্রগণ্য শ্রীমান্ হরমোহন বাবুর নয়নদুটী অনিমেষভাবে সেই দিকেই স্থির রহিয়াছে। দীপআরতির শেষ হইলে কর্ত্তাবাবু ক্ষুণ্নহৃদয়ে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে দুই জন ভদ্রলোক তথায় আসিযা কর্ত্তাবাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তাঁহার আগমনে তাঁহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, কর্ত্তাবাবু বিধিমত "প্রাতঃপ্রণাম" করিয়া মস্‌নদে যাইয়া বসিলেন, রূপচাঁদ একবারে চারিটি ছিলিম তামাক লইয়া প্রবেশ করিল।

বাবু মস্‌নদাসীন হইয়া মৃদু মৃদু হাস্যবদনে কহিলেন "চৌধুরী মহাশয় এটি কে?" এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সম্বোধিত ব্যক্তির নাম রামেশ্বর চৌধুরী (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাবুর একজন অতি প্রিয় সহচর। ইনি কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার পরিচ্ছদ সময়োচিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ পরিহিত সম্পূর্ণ আড়াই হাত বহরের একখানি ধুতি অতি পরিপাটী করিয়া কোচান; গায়ে একটি বেনিয়ান,বেনিয়ানের হাতা দুটি সুন্দররূপে গিলে করা; মস্তকে একখানি সাতহাতি অতিমিহি চাদর বাঁধা আছে, আবশ্যক হইলে খুলিয়া গায়ে দিতে পারেন; পায়ে মখমলের উপর জরির কাজ করা লপেটা জুতা। চৌধুরী মহাশয়ের দাঁতগুলি তদানীন্তন রমণীকুল-প্রিয় শিশির কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত, প্রথমাঙ্গুলিতে তর্পণের জন্য একটি তাম্র অঙ্গুরী উহার উপর কিঞ্চিৎ সুবর্ণ, কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একটি সুবর্ণ অঙ্গুরী ও বাম হস্তের কনিষ্ঠায় একটি " জাপ"। চৌধুরী মহাশয়ের চুলগুলি বাবরিকাটা, কার্ত্তিকের চুলের মত। কর্ত্তাবাবুর সম্বোধনে চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন "এটি একটি রত্ন, এঁর বয়স কম, কিন্তু রত্ন ক্ষুদ্রই * হ'য়ে থাকে; রত্ন বড় লোকেরই আদরের হয় ব'লে এঁকে আপনার নিকট এনেছি, এখন পরক্‌ করে নিন্‌ সাঁচ্চা কি ঝুট"। বাবু উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "চৌধুরী মহাশয় আপনার মতন জহরী যাকে রত্ন ব'লে এনেছেন, সে কি খেলা জিনিস হ'তে পারে?" কর্ত্তাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা কিরূপ ব্যাখ্যা করুন"। সুচতুর চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন, "কি জানেন মহাশয় সব জিনিসই নজরের উপর, নজরে না লাগ্‌লে কোন জিনিসেরই দর নেই"। কর্ত্তাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা কিরূপ রত্ন বাহির করুন দেখি।" চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "দেখুন দেখি বাঁধুনির গাঁথনি কেমন";— তিনি এই দোকানদারি ক'রে রত্ন কর্ত্তাবাবুর সমীপে পেষ করিলেন, নবকবি গাহিলেন;—

"রাজাধিরাজ মহারাজা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, শ্রীকৃষ্ণ ভূস্বামী আমায় পরাৎপর। যিনি রাজরাজেশ্বর, এই প্রেম রাজ্য তাঁর॥ যারে রাখাল বল্‌তো রাখালরাজা, প্রজা গোপীসকল। এই গকুল বসন্তকালে, তুলসীর পত্র হাতে, কর দিলাম শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে। আমার কালাচাঁদ আসিবে বলে, হার গেঁথে বনফুলে রেখেছি; বাসি ফুল রাশীকৃত রয়েছে। আমি রাজকর দিব করে, ব্রজধাম মধুপুরে, বলগো কিসে

* এসময়ের কথাবার্ত্তা সর্ব্বদা পাঠকের ভাল না লাগিতে পারে, যেহেতু তৎকালে কথোপকথনে বাগাড়ম্বর ও কথার ছটার প্রতি যত লক্ষ্য থাকিত, ভাব বা বিষয়ের প্রতি তত লক্ষ্য থাকিত না।

প্রাণ বাঁচে। আমায় দুঃখিনী প্রজা দেখে, বিচ্ছেদ বাণ হানে বুকে, অকূলে ফেলে রেখে বসন্তে; প্রাণসই রসরাজ কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে। যখন কৃষ্ণ বিরাজিতেন, ব্রজে এরাজ্যে ছিল সুশাসন; রাজা নাই এখন, কৃষ্ণ নাই এখন। ঋতুরাজ বিনা দোষে নারীবধ করে, এসে অরাজক হয়েছে শ্রীবৃন্দাবন। লয়ে কুসুম দণ্ড হাতে, দাঁড়াইয়ে ব্রজের পথে, রয়েছে এ ভয়ে, অভয় দিতে কে আছে।"

পূর্ব্বোক্ত গীত যখন গাওয়া হইতেছিল, তখন গুণাকর স্বয়ং 'বেশ বেশ খাসা, বহুত আচ্ছা' প্রভৃতি প্রশংসা বাক্যে কবির মনস্তুষ্ট করিতেছিলেন, গীত সমাপন হইলে চৌধুরী মহাশয় কবিকে কহিলেন 'আর একটি'। নব কবি পুনর্ব্বার গাহিলেন:—

'আছে খত নিয়ে পথে রমণী কে? বাঁকা শ্যাম কি ধার কিছু তার। এমন ধারা প্রমাধার করে ছিলে কাব? খতে এই লেখা আছে ওহে শ্রীহরি, খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী। আমার দেখে হয় আতঙ্ক, ওহে শ্যাম ত্রিভঙ্গ, ঢেরা সহি বল দেখি আছে কার?'

গীত গাহিবার সময় গুণাকরের হৃদয়ে (শ্রীমন্ বঙ্গদর্শনের উক্ত) 'ঘাত প্রতিঘাত' পুনঃ পুনঃ হইতেছিল; গীত শেষ হইলে, তিনি স্বয়ং উঠিয়া কোলাকুলি বা প্রেমালিঙ্গন করিয়া, তাঁহার নাম-ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন! কর্ত্তাবাবু স্বয়ং উঠিয়া কোলাকুলি করিলেন, ইহা অপেক্ষা নব কবির পক্ষে তৎকালে আর অধিক কি সম্মান হইতে পারে?

যৎকালে কবির সম্মান হইতে ছিল, সেই সময়ে 'তা—না—না—না—তা—নারে ইত্যাকার গাহিতে গাহিতে কথকঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথকঠাকুর সংপ্রতি গুণাকরের বিশেষ আত্মীয় সুহৃদ। ইহাঁর হস্তে একখানি পুঁথী। পুঁথীখানি রাখিয়া উপস্থিত সঙ্গীত শাস্ত্রের আলাপনে নিযুক্ত হইলেন।

মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ।

(২১১ পৃষ্ঠার পর।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এই সময়ে মুসলমানগণ ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ছিল, ধর্ম্ম এবং অদৃষ্টের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের পরিসীমা ছিল না। এই তাহাদের বিজয়ের মূলমন্ত্র, এই তাহাদের অসম সাহসিকতার কার্য্য হইতে রক্ষা পাইবার ইষ্টকবচ। মুসলমানগণ সেই মূলমন্ত্রে নির্ভর করিয়া, সেই ইষ্টকবচ ধারণ করিয়া মাত্র পাঁচ সহস্র সৈন্য সহ অভিমানী প্রাচীন

ফেরেওদিগের রাজ্যে, অসীমভাব-শালিনী জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য মিশরদেশে প্রবেশ করিল। খলিফা যদিও এই আক্রমণ প্রস্তাব করেন, তাঁহার নিজের বিশেষ সন্দেহ থাকুক আর না থাকুক, প্রধান উপদেষ্টা ও-সমানের প্রদর্শিত ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পত্রের পর পত্র লিখিতে লাগিলেন 'যদি মিশরের সীমাস্থবর্ত্তী হওয়ার পূর্ব্বে এই পত্র পাও ফিরিয়া আসিও, যদি ঐ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পত্র প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে ঈশ্বরের নাম লইয়া অগ্রসর হইও, নিশ্চয় জানিও আমি আবশ্যকীয় সাহায্য প্রেরণে বিরত রহিব না।' আমরুর নিকট এইরূপ পত্র লিখিতে লাগিলেন।

প্রথম পত্রবাহক সীরিয়া মধ্যেই আমরুকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কোনরূপ তত্ত্ব পাইয়াই হউক, অথবা বুদ্ধির প্রখরতাজন্য অনুমান করিয়াই হউক, দূতের নিকট কোন কথা না শুনিয়া অথবা তাহাকে সমক্ষে আসিতে সুযোগ না দিয়া মিশরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। আরিশ নামক মিশরান্তর্গত এক গ্রামে শিবির সংস্থাপন করিয়া পত্রবাহককে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং সৈনিকগণ সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে পত্র পাঠ করিলেন। পত্র পাঠ সমাপন হইলে পার্শ্বস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সীরিয়া,না মিশর। প্রত্যুত্তরে জানিলেন 'মিশর'। তখন আমরু বলিলেন,'তবে আমরা ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে খলিফার আদেশ প্রতিপালন জন্য অগ্রসর হইব।'

প্রথমতঃ তিনি ফারোয়াক্ বা পিলিযুসিয়ম্ অবরোধ করিলেন। এই স্থান ভূমধ্যস্থ সাগর তীরে উক্ত সাগর এবং আরব্যোপসাগরের বিযোজক এবং আরব ও সীরিয়ার সহিত মিশরের সংযোজক যোজকোপরি অবস্থিত। একমাস অবরোধের পর আমরু ঐ স্থান হস্তগত করিলেন। তখন অভিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় চতুষ্পার্শ্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লোহিত সাগর আরব্যোপসাগরের সহিত সংযোগ করিতে একটি খাল কর্ত্তন কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। কিন্তু খৃষ্টিয়ানগণ সমুদ্র পথে আরব আক্রমণে সুবিধা পাইবে বলিয়া খলিফা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

অনন্তর আমরু মিশরাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এই স্থানের প্রাচীন নাম মেম্ফিস্, প্রাচীন মৈশর রাজগণের রাজধানী। এই সময়ে আলেকজেন্দ্রিয়ার পর এই স্থানের দুর্গের ন্যায় দৃঢ় দুর্গ মিশরে আর ছিল না; প্রাচীন ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য এখনও অনেক বর্ত্তমান ছিল। ঐ স্থান নীলনদের পশ্চিম তীরে পিরামিডের সমীপস্থ ছিল। যুদ্ধসজ্জা বিস্তর ছিল, দুর্গের চারিদিকে গভীর পরিখা ছিল। তাহার মধ্যে বিপক্ষের গতি রোধজন্য প্রেক এবং লৌহ শলাকা সকল রক্ষিত হইয়াছিল। আরবীয় গণের সঙ্গে কোনরূপ যন্ত্র ছিল না, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল অবরোধ পূর্ব্বক বসিয়া থাকিতে হইত। আহারাভাবে যখন অবরুদ্ধগণ অবসন্ন হইয়া পড়িত তাহার পূর্ব্বে হস্তগত হইত না। মিশরা বা মেম্ফিস্ও সাতমাস

অবরোধ করিয়া থাকিতে হইল। অনন্তর যখন আমরুর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিল, উপর্য্যুপরি প্রার্থনায় খলিফা মাত্র চারি সহস্র সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। ইহা দ্বারা কোন ফল লাভ হইত না, কিন্তু গবর্ণর মোকৌকাস্—স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক সাহায্য করিল, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধ হইল।

এই ব্যক্তি মিশরবাসী ছিল, কপ্ট্ সম্প্রদায়ের উচ্চকুলে ইহার জন্ম। এ নিতান্ত কপট ও অভিমানী ছিল। অধিকাংশ কপ্টের ন্যায় এব্যক্তি ভিন্নরূপ খৃষ্টয়ান ছিল। কিন্তু তাহা গোপন পূর্ব্বক রাজভক্তি দেখাইত এবং সম্রাট হিরাক্লিয়সের প্রিয় পাত্রছিল। কিন্তু সে এবং মেম্ফিসের অধিকাংশ কপ্ট রোমান কাথলিক গ্রীকগণকে যার পর নাই ঘৃণা করিত।

মোকৌকাস্ সাধারণ ধনাগারে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, এক্ষণে সম্রাটের অবনতি দেখিয়া স্বার্থ সাধনে লোলুপ হইল। সে মুসলমান শিবিরে এই মর্ম্মে পত্র লিখিল যে, যদি তাহাকে ঐ সমস্ত সমর্পণ করা হয় তাহা হইলে সে নগর মুসলমানদিগের অধিকারস্থ করিয়া দিবে। সেনাপতি সম্মত হইলেন। তদনুসারে সে এক নির্দ্ধারিত সময়ে অধিকাংশ যুদ্ধ সজ্জা দুর্গ হইতে নীলনদের মধ্যস্থ একটি দ্বীপে লইয়া গেল। মুসলমানগণ আক্রমণ করিল, কপ্টগণ বাধা দিল না। মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্র দুর্গোপরি শোভা পাইল। তখন গ্রীকসৈন্যগণ শাসনকর্ত্তার বিশ্বাসঘাতকতা দেখিতে পাইল, এবং নিরাশ হৃদয়ে নৌকাযোগে পলায়ন করিল। তখন গবর্ণর—মুসলমান হস্তে নগর সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, এবং ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক ব্যতীত আর সকলের প্রতি প্রত্যেকে দুই ডুকাট্ (একরূপ মুদ্রা) কর নির্দ্ধারিত হইল। আরও নিয়ম করা হইল যে, মুসলমান সৈন্যগণকে যে আহার্য্যবস্তু প্রদান করা হইবে তাহারা তাহার মূল্য দিবে; নগরবাসীগণ অতি সত্বর ঐ স্থান হইতে আলেকজেন্দ্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। এবং মুসলমান সৈন্যগণ যে যে থানে উপস্থিত হইবে তাহাকে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত অতিথির ন্যায় আহার দিতে হইবে।

বিশ্বাসঘাতক মোকৌকাস্ অসদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ প্রাপ্ত হইল। সে যে কপ্ট সম্প্রদায়-ভুক্ত তাহা বিশেষ করিয়া বলিল এবং জীবনান্তে আলেকজেন্দ্রিয়ায় সেণ্ট-জনের উপাসনা-মন্দির পার্শ্বে সমাহিত হইতে প্রার্থনা করিল।

আমরু যেমন সাহসী তেমনই কার্য্যকুশল ছিলেন। গ্রীক ও কপ্টে বৈষম্য দেখিয়া কপ্টদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহারা বাধ্য হইল। কপ্ট্দিগের নায়ক তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য মরুভূমি হইতে বাহির হইল। তাহাতে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমরু পরে বলিয়াছিলেন, 'আমি এরূপ নিরীহ স্বভাব ও উদারাকৃতি খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মপ্রচারক আর দেখি নাই।' ইহাতে যার পর নাই উপকার হইল। কপ্টগণ প্র-

তিজ্ঞা করিল তাহারা খলিফার বশী-ভূত।

অনন্তর আমরু আলেকজেন্দ্রিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ঐ স্থান একশত পঁচিশ মাইল ব্যবধান। তদনুসারে দেশীয় জনগণ রাস্তা সকল মেরামত এবং সেতু প্রস্তুত করিয়াছিল। গ্রীকগণ চারিদিক হইতে আসিয়া ডেল্টার মধ্যস্থ একটি দ্বীপে একত্র হইল, এবং প্রাণপণে বিপক্ষের গতি রোধ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইল। কিরাম আল-সোরেক নামক স্থানে মেম্ফিসের দুর্গবাসীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিরোধ জন্মাইয়াছিল। তিন দিন পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ ক-করিয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে আলেকজেন্দ্রিয়ায় অগ্রসর হইল। মুসলমানগণ সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও দ্বাবিংশদিবস যুদ্ধ না করিয়া ঐ স্থানের সমীপস্থ হইতে পারিল না।

আলেকজেন্দ্রিয়া, মিশরের রাজধানী, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র ভূমি, সুদৃঢ় সুসম্বল নগরী, এক্ষণে মুসলমানগণ দেখিতে পাইল। গ্রীকগণ চারিদিক হইতে আসিয়া রাজ্য রক্ষার শেষ উদ্যম করিতে প্রবৃত্ত হইল। সমুদ্র পথে যুদ্ধায়োজন আসিতে লাগিল। সুতরাং মুসলমান-সেনাপতি নিতান্ত উন্মত্ত না হইলে যে ঐ নগর আক্রমণ করিতে সাহসী হইত ইহা কাহারও বিবেচনা ছিল না। তথাপি মুসলমান-সেনাপতি যথানিয়মে নগর সমর্পণ জন্য নাগরিকগণকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিলে তিনি প্রাণপণে অবরোধ করিতে প্রয়াস পাইলেন। দুর্গস্থ সৈন্যগণ আক্রান্ত হইতে অপেক্ষা করিল না, পুনঃ পুনঃ বাহির হইয়া প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। মেম্ফিস্ হইতে আগত সৈন্যগণই অধিক উপদ্রব করিতে লাগিল। যে স্থান হইতে অধিক আক্রমণ হইয়াছিল, আমরু সেই দিকেই ধাবমান হইয়া একবার জয়লাভ করিলেন। কিন্তু সকল সৈন্য আসিয়া যুটিলে মুসলমানগণ পশ্চাৎপাদ হইল, আমরু, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ওয়ার্দ্দান এবং মোসলেমা ইবিন আল্‌মোকালেদ্ নামক একজন সেনাপতি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া আহত, বেষ্টিত, অবসন্ন এবং পরিশেষে বন্দী হইলেন।

গ্রীকগণ বন্দীগণের পদ-গৌরব জানিত না, তাহারা তাঁহাদিগকে গবর্ণরের নিকট লইয়া গেল। তিনি উগ্রভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবী এইরূপে জয়োন্মাদে ভ্রমণ করা এবং প্রতিবেশী বর্গের শান্তি ভঙ্গকরার কারণ কি? আমরু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য আসিয়াছেন। এবং তাঁহারা তরবারি রাখিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে মিশর রাজ্য মুসলমান বা করদ করিতে বাসনা করেন এইরূপ সাহসিকতা এবং সাভিমান মুখশ্রী দেখিয়া গবর্ণরের সন্দেহ হইল। তিনি আমরুকে একজন প্রধান যোদ্ধা মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য ওয়ার্দ্দান গ্রীক ভাষা বুঝিত। সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভুর গলদেশের বস্ত্র ধরিয়া গণ্ডে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিল, ' নির্ব্বোধ কুক্কুর, চুপ কর, তোর অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ সকলকে কথা বলিতে দে।' মোস্‌লেমা তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া অগ্রসর হইল, এবং গবর্ণরের নিকট যাহা সম্ভবপর তাহাই বলিল। সে বলিল, আমরু খলিফার পত্র পাইয়াছেন, তাঁহার বাসনা যে অবরোধ পরিত্যাগ করেন, খলিফা সন্ধির জন্য দূত পাঠাইবেন, যদি তাহারা মুক্তি পায় তাহারা যাইয়া তাঁহার স্বপক্ষে আমরুকে বলিবে। গবর্ণর তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু অবরুদ্ধগণ মধ্যে সেনাপতি উপস্থিত হইলে যখন উল্লাসের জয়ধ্বনি আরম্ভ হইল, গবর্ণর তখন বুঝিলেন কিরূপে প্রতারিত হইয়াছেন!

বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। চৌদ্দমাস পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ রহিল, সৈন্যের পর সৈন্য আসিতে লাগিল। পরিশেষে মুসলমানগণ অধ্যবসায়ের ফল লাভ করিল। ত্রয়োবিংশ সহস্র সৈন্য বিনাশ হইলে মুসলমানগণ নগরে প্রবেশ ও গ্রীকগণ পলায়ন করিল। মিশর রাজ্য মুসলমানদিগের পদানত হইল।

আমরু নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নগর শূন্য প্রায়। তিনি সৈন্যগণকে লুণ্ঠন করিতে নিষেধ করিয়া সমস্ত সৈন্যসহ পলায়িত গণের অনুসরণে বাহির হইলেন, নগরে অল্পমাত্র সৈন্য রহিল। যে সকল গ্রীক জাহাজে পলায়ন করিতে ছিল, তাহারা প্রত্যাগত হইয়া নগরস্থ মুসলমান সৈন্যগণ হত করিল এবং নগর পুনরায় অধিকার করিয়া বসিল। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমরু ফিরিয়া আসিলেন; অসতর্কতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নগর পুনরায় অবরোধ করিতে হইল। কিন্তু এ অবরোধ অধিকস্থায়ী হইল না। অতি অল্পদিনে পুনরায় অধিকার করিলেন। তখন মুসলমানগণ নগরে প্রবেশ করিলে গ্রীকগণ ভগ্ন হৃদয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে হত হইল। হিজিরা উনবিংশ শকে ৬৪০ খৃঃ আলেক্‌জেন্দ্রিয়াসহ মিশর রাজ্য মুসলমানের হস্তগত হইল।

দ্বিতীয়বার নগর অবরুদ্ধ এবং অস্ত্র বল অধিকৃত হইলে সৈন্যগণ লুণ্ঠনের অনুমতি পাইবার জন্য গোলযোগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরুর এমনই শাসন ছিল যে, তিনি খলিফার পত্র নাপাওয়া পর্য্যন্ত কাহাকে তৃণও স্পর্শ করিতে দিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সৈন্যগণ নীরবে আজ্ঞা পালন করিল। আমরু খলিফাকে যে পত্র লিখিলেন ঐ পত্রে দেখা যায়, নগরে চারি সহস্র প্রাসাদ ছিল, পাঁচ সহস্র ঘাট, চারিশত নাট্যশালা, বার সহস্র বাগান, চল্লিশ সহস্র করদ ইহুদি ছিল। তিনি বলেন নগরের জাঁক জমক বর্ণন করা অসাধ্য।

পূর্ব্বদেশের ভাণ্ডার স্বরূপ নগরী লুণ্ঠন করিতে সৈন্যগণ লোলুপ হইয়াছে ইহা উল্লেখ করাতে খলিফা আমরুকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য প্রশংসাও করিলেন। নগরস্থ সমস্ত সম্পত্তি ও করদগণের নিকট সংগৃহীত কর আলেকজেন্দ্রিয়া নগরীতে ধর্ম্ম যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ সঞ্চয় করিতে আদেশ করিলেন। আমরু মেম্ফিসের ন্যায় প্র-

ত্যেক পুরুষের উপর দুই ডুকাট মুদ্রা কর-ধার্য্য করিলেন এবং ভূমির পরিমাণ অনুসারেও কর ধার্য্য হইল। তাহাতে খলিফার এককোটি বিশ লক্ষ ডুকাট (মুদ্রা) বার্ষিক আয় হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরু কবি ছিলেন। তিনি সকল সময়ে সেরূপ বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও অনুসন্ধান-ক্ষমতা দেখাইয়াছেন পূর্ব্বকালে কোন মুসলমান সেনাপতি তেমন দেখান নাই। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু শিক্ষিত লোকের সহিত আলাপ করিতে অতিশয় সুখ বোধ করিতেন। বৈয়াকরণিক জন, যাহাকে সাধারণতঃ ফিলপোনস্ বা শিক্ষাপ্রিয় বলিত এবং যিনি মূষা ও এরিস্ততলের টীকা করিয়া ও বিজ্ঞানবিৎ বলিয়া আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, আমরু তাঁহার সহিত প্রণয় সংস্থাপন করিলেন। যখন সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হইল, নিতান্ত অশুভক্ষণে বৈজ্ঞানিক জন আমরুকে আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় দেখাইলেন, এবং তাহা পাইবার জন্য আমরুর নিকট প্রার্থনা করিলেন। আমরু খলিফাকে পত্র লিখিলে খলিফা সংক্ষেপে এই সর্ব্বনাশক উত্তর দিলেন। "হয়ত পুস্তকে যাহা লিখিত আছে তাহা কোরাণের অনুরূপ, না হয় তদ্বিরুদ্ধ। যদি অনুরূপ হয়, তাহা না থাকিলে এক কোরাণই প্রচুর; যদি অনুরূপ নাহয় তবে তাহা পাপ ও অনিষ্টজনক। সুতরাং তাহা বিনাশ কর।"

কথিত আছে আমরু যথানিয়মে ঐ আদেশ পালন করেন। নগরের পাঁচ সহস্র ঘাটে পুস্তক সকল রক্ষিত হইল। কিন্তু পুস্তক ও হস্তলিখিত গ্রন্থের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে নিঃশেষ হইতে ছয়মাস লাগে। এই অসভ্যজনোচিত কার্য্য আবুল ফারেজিয়স্ কৃত ইতিহাসে বর্ণিত আছে, কিন্তু গিবন্ ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসজনক মনে করেন না। কারণ প্রাচীন দুইজন ঐতিহাসিক এল্‌মানসি এবং ইউটিরিয়স্ তাঁহাদের ইতিহাসে এবিষয় উল্লেখ করেন না। এই শেষোক্ত ব্যক্তি আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার একটি প্রাচীন লোক, ইনি ঐ নগরের অবরোধ এবং বিজয় সম্যক বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পুস্তকালয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। আমরুর ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং কবির পক্ষে তাদৃশ কার্য্য সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর নয়। এরূপও কথিত হইতেছে যে ঐ পুস্তকের অনেক এখনও কনষ্টাণ্টিনোপলে বর্ত্তমান আছে। হয়ত পলায়িত গ্রীকগণ যে যেখানে পাইয়াছে পুস্তকগুলি অন্যান্য সম্পত্তির সহিত লইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। অথবা এরূপও হইতে পারে যে আমরু খলিফার আদেশ বিশ্বস্ত ভৃত্যবৎ প্রতিপালন করিতে বাধ্য ছিলেন, করিয়াছেন, কিন্তু এই কার্য্য করিতে তাঁহার অণুমাত্রও ইচ্ছাছিল না। সকল দেশের ঐতিহাসিকগণ পুস্তকালয় ভস্মীভূত হওয়া বিশ্বাস করিয়া যারপর নাই দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং ঘটনাটি সত্য কি না নির্ণয় করা তেমন সহজ নয়। *

* আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয় টলেমি

আলেকজেন্দ্রিয়ায় অধঃপতনে কেবল মিশরের অধঃপতন হইল এরূপ নহে, সম্রাট হিরাক্লিয়সের অদৃষ্টও মীমাংসিত হইল। তিনি পূর্ব্বেই পীড়িত ছিলেন, এক্ষণে এই কুসংবাদ প্রাপ্ত হইবার পর সাত সপ্তাহ মধ্যে সম্রাট পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র কনষ্টাণ্টাইন তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

এই সময়ে আবার অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। খলিফা মিশর হইতে সাহায্য পাঠাইতে লিখিলেন। আমরু এত উষ্ট্র খাদ্য পূর্ণ করিয়া পাঠাইলেন যে, উষ্ট্র শ্রেণীর প্রথমটি মদিনায় পঁহুছিল, শেষটি মিশরেই রহিল। ইহাতে বিলম্ব হয় দেখিয়া নীল নদ হইতে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল কাটান হইল, তাহার দৈর্ঘ আশী মাইল। ঐ খাল কর্ত্তন রোম সম্রাট ট্রাজান আরম্ভ করেন, আমরু তাহা সমাপণ করিলেন।

আমরু খলিফার আজ্ঞাধীন থাকিয়া এরূপ বুদ্ধি ও কৌশলের সহিত নববিজিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন যে, মুশলমান সেনাপতিগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন।

সোটার কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। যে অট্টালিকায় পুস্তক রক্ষিত হইত তাহার নাম ব্রুকিয়ন্। ঐ অট্টালিকায় ক্রমে চারি লক্ষ পুস্তক এবং সমীপস্থ সিবাপিয়ন্ নামক অট্টালিকায় আর তিন লক্ষ ছিল। ব্রুকিয়নস্থ পুস্তক সীজরের যুদ্ধে বিনষ্ট হয়, কিন্তু তখন সিরাপিয়ণ্ ভস্ম হয় নাই। ক্লিওপেট্রা পার্গামসের পুস্তকালয় এণ্টনির প্রদত্ত দুই লক্ষ পুস্তক সংযোগ করেন। তৎপর নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া প্রতিবর্ষে বহু সংখ্যক পুস্তক সংযোগ হইতেছিল। মুশলমানদিগের বিজয় সময়ে ঐ পুস্তকালয় একটি অদ্বিতীয় পুস্তক ভাণ্ডার ছিল।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার ইতিহাস

প্রথমখণ্ড।

(২৪০ পৃষ্ঠার পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

অনুমিত হইয়াছে যে হিন্দু রাজত্বের প্রায় অবসান কালে গৌড়েশ্বরগণ তাহাদের অধিকৃত প্রদেশ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা—বারেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ় ও মিথিলা। কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কিম্বা শাসনপত্রে অমরা এই বিভাগের উল্লেখ প্রাপ্ত হই না। কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের শ্রেণীবিভাগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন

যে, বল্লাল সেন দেবের শাসন কালে নিশ্চয়ই বাঙ্গালা এইরূপ পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল। তাহাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য হইলে আমরা অবশ্যই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে 'বাগড়ি' নামে একটি শ্রেণী দেখিতে পাইতাম। কিন্তু এই 'বাগড়ী' শব্দটী যে কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ইতি পূর্ব্বে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থহইতে ভৌগোলিক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে তাহার এক খানিতেও বাগড়ির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হেমিল্টন সাহেব সর্ব্ব প্রথম এই বিভাগের বিষয় ইতিহাস পাঠকদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।* মাসম্যান তাহার চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াছেন। যাহাহউক এক্ষণ আমরা হেমিল্টন লিখিত বিভাগ সমূহের সীমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিব।

বারেন্দ্র—পশ্চিম দিকে মহানন্দা, পূর্ব্ব দিকে করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গা (বা পদ্মা), উত্তর দিকে অন্যান্য রাজ্য। আমরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের যে সীমা নির্ণয় করিয়াছি, হেমিল্টন বারেন্দ্র প্রদেশের সেই সীমাই লিখিয়াছেন। কেবল পূর্ব্ব দিকে তিনি ব্রহ্মপুত্রের পরিবর্ত্তে করতোয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বঙ্গ—হেমিল্টন সাহেব করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডকে বঙ্গ

---

* During the Adisur dynasty, the following are said to have been the ancient geographical divisions of Bengal. Gour was the capital, forming the centre division, and surrounded by five great provinces.

1. Barendra, bounded by the Mahananda on the west; by the Padma, or great branch of Ganges, on the south; by the Kortoya on the east; and by adjacent governments on the north.

2. Benga, or the territory east from the Kortoya towards the *Burhmaputra*. The capital of Bengal, both before and afterwards, having long been near Dacca in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

3. Bagri, or the Delta called also Dwipa, or the island, bounded on the one side by the Padma, or the great branch of the Ganges; on another by the sea; and other third by the Hugli river or Bhagirathi.

4. Rarhi, bounded by the Hugli and Padma on the north and east and by adjacent kingdoms on the west and south.

5. Maithila, bounded by the Mahananda and Gour on the east; the Hugli or Bhagirathi on the south on the west.

Hamilton's Hindustan. I p. 114.

আখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই, বঙ্গের সীমা বিশদ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি। * শক্তিসঙ্গমতন্ত্র আমাদের মত সমর্থন করিতেছে। † হেমিল্টন যাহাকে বঙ্গ বলিতেছেন, তাহাকে পৌরাণিক উপবঙ্গ বলিলে বলা যাইতে পারে আমরা বঙ্গের পশ্চিমাংশকে উপবঙ্গ বিবেচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এই অংশকে উপবঙ্গ বলা অধিক সঙ্গত বোধ হইতেছে।

বাগড়ি—আমরা বঙ্গের পশ্চিমাংশকে বাগড়ি বিবেচনা করি, কিন্তু হেমিল্টন সমগ্র বঙ্গকে বাগড়ি লিখিয়াছেন।

রাঢ়—বর্ত্তমান বাঙ্গালার পশ্চিমাংশকে আমরা রাঢ় নির্ণয় করিয়াছি। হেমিল্টনও আমাদের সহিত অনৈক্য নহেন।

মিথিলা—অতি প্রাচীন দেশ। বৈদিক কালের অন্তর্ভ.গেই আর্য্যগণ মিথিলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ণেল টডের মতে ইক্ষাকুর পৌত্র ও নিমির পুত্র মিথি স্বনাম-খ্যাত মিথিলা রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা ‡ তাঁহার পুত্র জনক হইতে তদ্বংশীয় রাজগণ সকলেই 'জনক' উপনাম গ্রহণ করিতেন। পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ্ মিথিলা প্রদেশকে "সান ফ ছি" (San-fa-chi লিখিয়াছেন। কনিংহাম 'সান ফ ছি' কে ব্রিজিপাট করিয়াছেন §। কিন্তু সানফছি যে কিরূপে ব্রিজি হইল আমরা তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদের বিবেচনায় বিদেহ শব্দটি সংস্কৃত হইতে চীন, ও চীন হইতে ফরাসী ভাষায় এইরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই সময়ে বিদেহ তিনভাবে বিভক্ত ছিল। যথা;—বিদেহ, বিশালা ও তিরভুক্তী। সুবিখ্যাত তারানাথ সমগ্র মিথিলাকে তিরভুক্তী নামেই পরিচিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান ত্রিহুত তিরভুক্তীর অপভ্রংশ মাত্র। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে চম্পারণ্য ও গণ্ডকী নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশকে বিদেহ ও তিরভুক্তী উভয় নামেই পরিচয় করা হইয়াছে। পাল ও সেন রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মিথিলা বোধ হয় কখনও বাঙ্গালার রাজদণ্ডের অধীন হয় নাই।

পাল-নরেন্দ্রদিগের শাসনকালে. বিহার প্রদেশের অধিকাংশ গৌড়ের অধীন ছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পাল,রাজগণের প্রধান ও মুদ্গগিরি উপরাজধানী ছিল।

---

* বান্ধবের ২৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

† রত্নাকর-সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশ ময়া প্রোক্ত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শক॥

‡ Tod's Rajastan. (Mokorjees Ed Vol. I. page 29.)

§ The Chinese syllables represent faithfully the Sanskrit Vriji, বৃজি, which is the well known name of a country, generally supposed to be in the neighbourhood of Mathura. (বিচমেল্লাই গলদ, ব্রজ্ হইল বৃজি।) The Vriji of Hwam Thsang must however be the modern Tirhut.

Cunningham's Itinerary of the Hwan-Thsang.

সেনরাজগণের শাসনকালে 'বিক্রম-পুর'.নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু দেশপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুর প্রদেশে উপনীত হইয়া কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি সেই প্রদেশকে বিক্রমপুর আখ্যা দান করেন। এই প্রবাদটি আমাদের সমক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণ ও যুক্তিহীন বলিয়া বোধ হইতেছে। সেনরাজগণের শাসন-পত্রে আমরা সর্ব্বপ্রথম বিক্রমপুরের উল্লেখ দর্শন করিতেছি, তৎপাঠে অনুমিত হয় যে, সেই নরপতিগণ তাঁহাদের উপরাজধানীকে বিক্রমপুর আখ্যা দান করেন। তদনুসারে সেই রাজধানী-বিভাগ বিক্রমপুর নামে পরিচিত হইয়াছিল। অদ্যাপি একটি পরগণাই বিক্রমপুর নামে পরিচিত। মহারাজাধিরাজ নারায়ণ পালের শাসন-পত্রেও আমরা সমতটের উল্লেখ দর্শন করিয়াছি। হতভাগ্য অশোক চন্দ্রদেব নবদ্বীপ-নগরী শত্রুপদে সমর্পণ করিয়া সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদের বিবেচনায় সমতট ও বিক্রমপুর অভিন্ন নগরী। * মুসলমানদিগের শাসনকালে বিক্রমপুর, রাজপুর নামে পরিচিত হয়, ইহার বর্ত্তমান নাম রামপাল।

বঙ্গ ও সুহ্মের মধ্যবর্ত্তী সুবর্ণগ্রাম প্রাচীন স্থান। পাশ্চাত্য লেখকগণ ইহার প্রাচীনত্বের প্রধান সাক্ষী। কিন্তু কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কিংবা তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে সুবর্ণ গ্রামের উল্লেখ আছে, সেই সকল গ্রন্থের বয়ঃক্রম ২।৩ শতাব্দীর অধিক নহে। কিন্তু সুবর্ণ গ্রামের প্রাচীনত্বের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে এগুলিকে নিতান্ত শিশু বলিয়া বোধ হয়। সুবর্ণগ্রামের বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসর হইতেও অধিক। ত্রিপুরার আদি রাজধানী ত্রিবেগ নামক স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই ত্রিবেগ বা তিনটি নদীর সঙ্গম-স্থল আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান সুবর্ণ গ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং আমাদের মতে সুবর্ণগ্রাম প্রাচীন সুহ্ম বা ত্রিপুরার অধীন ছিল। কালক্রমে ইহা বঙ্গের অধীন হইয়া যায়।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মতে বঙ্গ ও কামরূপের মধ্যবর্ত্তী দেশ কেকয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণ-বর্ণিত কেকয় পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে। রামায়ণোক্ত উক্ত ধর্ম্মারণ্য কামরূপের নিকটবর্ত্তী, কিন্তু সেই ধর্ম্মারণ্য যে অধুনা কি আখ্যাদ্বারা আখ্যাত তাহা লিপিবদ্ধ করা অসাধ্য। কোন কোন লেখক বর্ত্তমান ভূস্থান বা ভূটানকে মদ্রদেশ বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এই বাক্য-পোষণোপযোগি কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। দেশ-প্রচলিত প্রবাদ বা গল্প-অনুসারে দিনাজপুর, রঙ্গপুর অঞ্চল প্রাচীন মৎস দেশ। অদ্যাপি বিরাট ও কিচকের বাসভবনের চিহ্ন ও ভগ্নাবশেষ প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু আমরা ইহাকে গাঁজাখোরের প্রলাপ ব্যতীত অন্য

* হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ দেখ। (ভারতী, চতুর্থ খণ্ড, ১২৩ ও ১২৪ পৃষ্ঠা)।

কিছুই অনুমান করিতে পারি না। এই সকল ভগ্নাবশেষের সহিত যদি কোন হিন্দু-সন্তানের সম্পর্ক থাকিয়া থাকে, তবে তিনি পাল নরেশ্বর বৈ অন্য কেহই নহেন। মেদিনীপুর নিবাসিগণও মহাভারতের দুই একটি স্থান লইয়া টানাটানি করিয়া থাকেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যমধ্যেও একটি বিরাটভবন প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু মহাভারতে উক্ত মৎস গুজরাটের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, মতান্তরে জয়পুর রাজ্যকেও মৎস দেশ বলা হইয়া থাকে।

মুসলমান গণের বাঙ্গালায় প্রবেশকালে মলদহ প্রদেশ লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত ছিল। নবদ্বীপ নগরে বাঙ্গালার রাজপাট সংস্থাপিত ছিল। এই দুইটি নামই পাঠকগণের নিকট নূতন উপস্থিত হইল। কোনও কোনও লেখক বলেন বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন দেব গৌড়ের নাম পরিবর্ত্তন করত লক্ষ্মণাবতী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে সেই প্রদেশ লক্ষ্মণাবতী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। নবদ্বীপ নামকরণের ইতিহাস আমরা ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতে বর্ণন করিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় সেন-রাজ শ্রেণীর শেষ গৌড়েশ্বর নবদ্বীপ নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। *

বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের শাসনকালে বাঙ্গালার সীমা সমধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার তিরোধানান্তে রাজ্যসীমা ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। উড়িষ্যার পুরাতত্ত্বালোচনায় অনুমিত হইয়াছে যে, সেই সময়ে রাঢ়ের অধিকাংশ গজপতিনরেশ্বরদিগের অধীন হইয়াছিল। তৎকালের রাজ্যসীমা ত্রিবেণীর ঘাট পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। রাঢ় প্রদেশের উত্তর ও পশ্চিমাংশ বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট রাজ-দণ্ডের অধীন ছিল। পূর্ব্বদিকে ত্রিপুরার মহারাজ দৃঢ় ভাবে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। তাহার উত্তরদিকে কাছাড় ও জয়ন্তীয়া পতিগণ সেই সেই পার্ব্বত্য প্রদেশ স্বাধীন ভাবে শাসন করিতেছিলেন। পর্ব্বত নিকটবর্ত্তী উত্তর বঙ্গ তখন আর সেন-রাজ-বংশের দণ্ডাধীন ছিল না। বাঙ্গালার যখন এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত ভাগ, ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজন্যবর্গের অধীন ছিল, কেবলমাত্র লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম প্রদেশ ত্রয় সেন-রাজগণের স্বীয় অধিকারে ছিল। তন্মধ্যবর্ত্তী কোন কোন স্থান আবার সামন্ত নরপতিগণ শাসন করিতেন, তাঁহারা নামমাত্র গৌড়েশ্বরের অধীন ছিলেন। সেই সময়ে খিলজী-দেশজাত বখ্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ (প্রকাশ্য মহম্মদ বখ্তিয়ার খিলজী) বৃহৎ একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তৎকালে একমাত্র লক্ষ্মণাবতী প্রদেশে নির্ব্বিবাদে মুসলমান-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল! মহম্মদ বখ্তিয়ার ও তাহার অনুচরগণ তাহাদের অধিকৃত প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। গঙ্গার পূর্ব্বদিকস্থিত অংশ "লক্ষ্মণাবতী দেবকোট" এবং পশ্চিমাংশ "লক্ষ্মণাবতী লক্ষণোর" আখ্যা প্রাপ্ত হই-

* ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত। (ভারতী, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।)

য়াছিল। দিনাজপুরের মধ্যগত গঙ্গারামপুরের অধীন দমদমা প্রাচীনকালে দেবকোট নামে পরিচিত ছিল। * এই দেবকোট পূর্ব্বভাগের রাজধানী, তদনুসারে সেই ভূমিখণ্ড "লক্ষ্মণাবতী দেবকোট" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পশ্চিমভাগের পশ্চিম সীমান্তে লক্ষণৌর নামক স্থান ছিল। তাহার সহিত লক্ষ্মণাবতী শব্দ যোগ করিয়া সেই বিভাগ "লক্ষ্মণাবতীলক্ষণৌর" নামে পরিচিত হয়।

প্রায় এক শতাব্দী কলহের পর সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম মুসলমানগণ অধিকার করেন। শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রকৃতপক্ষে পাঠানগণ বাঙ্গালার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ব্রুকের মানচিত্রে চট্টগ্রামের নিকট 'বাঙ্গালা' নামে একটি নগরী চিত্রিত রহিয়াছে। পোরচাস এই বাঙ্গালা নগরীর সম্বন্ধে উল্লেখ করিরাছেন। তদনুসারে কোনও কোনও লেখক অনুমান করেন যে, এই "বাঙ্গালা" নগরী হইতে আমাদের জন্মভূমি 'বাঙ্গালা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রুকে ও পোরচাসের লেখা যে সম্পূর্ণ প্রত্যয়োপযোগী নহে তাহা আমরা চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্বে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছি। † আবোল ফাজেল বলেন,—বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ পথ 'আইল' বা 'আল' শব্দের সহিত বঙ্গ যোগ হইয়া এই দেশ বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় বুকমান সাহেবের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঙ্গত। তিনি বলেন সম্মিলিত প্রদেশত্রয় বাঙ্গালা অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ‡ এই প্রদেশত্রয়ের সম্মিলন কালে মালদহের উত্তরদিকস্থ ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়া বাঙ্গালার প্রধান রাজধানী ছিল। ¶ (ক্রমশঃ।)

শ্রী—সিংহ।

* হেমিল্টন সাহেব বলেন দেবকোট received its present appellation from its having been a military station during the early Mahammadan government.

† ভারতী, চতুর্থখণ্ড, ৩৮৬ ও ৩৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ The term 'Bangalah' being now applied to the united provinces of Lakhnauti, Satgaon, and Sunnarygaon. Blochman's Geography and History of Bengal.

¶ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মুসলমানী সহর "হজরত পাণ্ডুয়া" বা 'ফিরোজাবাদ' কেই প্রাচীন হিন্দুরাজধানী 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' নির্ণয় করিয়াছেন।

সাম্যবাদ বা হোমিওপেথি*।

(প্রাপ্ত পত্র।)

আপনার গত সংখ্যক বান্ধবে "বিলাতের পত্র" শীর্ষক প্রস্তাবে হোমিওপেথি সম্বন্ধে অনুকূল মতপ্রকাশ সন্দর্শনে সাহসী হইয়া আমি এই নূতন চিকিৎসা প্রণালীর যুক্তিবাদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া পাঠাইতেছি যদি প্রকাশ-যোগ্য বিবেচনা করেন তাহা হইলে বান্ধবে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেরই সাময়িক পত্র লেখকেরা হোমিওপেথির অনুকূলতা করিয়া থাকেন ; আপনিও তাহার অন্যথাচরণ করেন নাই দেখিয়া প্রীত হইলাম। হোমিওপেথির পক্ষ সমর্থনকারী কোন সাময়িক পত্র বঙ্গভাষায় না থাকাতেই আপনাকে এই "উদোর পিণ্ডি" বহন করিতে অনুরোধ করিলাম।

প্রয়োজনানুরোধেই হউক, অথবা অন্য হেতু বশতঃই হউক, প্রথম হইতেই প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর (অর্থাৎ এলোপেথির) সহিত হোমিওপেথির বৈরভাব চলিয়া আসাতে, এই নব প্রণালী যে সমস্ত যুক্তিগর্ভ মূল নিয়মের উপরে গঠিত, সাধারণ চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার সমুচিত সমালোচনা হয় নাই। সেই নিয়মচয় নিম্ন প্রকটিত কএকটি সূত্রের দ্বারা বিবৃত করা যাইতে পারে।

যে মূলতত্ত্বটি সাম্যবাদের ভিত্তি স্বরূপ, তাহা এইঃ—একবারেই রোগের মূলকারণের উপর কার্য্য করিতে পারে, ঈদৃশ শক্তিবিশিষ্ট পদার্থ আরোগ্য-সাধনের উত্তম উপায়। কিন্তু এই মূলকারণ অধিকাংশ স্থলেই আমাদের জানিবার যো নাই ; যে দৈহিক যন্ত্রের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ, তাহারই কোন না কোন রূপ বিকৃত ভাবের দ্বারা উহা আমাদিগের গোচর হয় মাত্র। সুতরাং এই মূলকারণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, অজ্ঞাত ও জ্ঞাত ; অথবা গৌণ ও মুখ্য। গৌণ বা অজ্ঞাত কারণ শরীরের কোন অংশ বিশেষের ক্রিয়া বা বিধান সম্বন্ধে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, আর যে পরিবর্ত্তন গুলিই কেবল আমাদিগের উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেই গুলিকেই মুখ্য, জ্ঞাত, বা দ্বৈতীয়িক কারণস্থানীয় জানিবে। এই দ্বিবিধ কারণের মধ্যে একের উপর অন্যের যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

* আমাদের ১২৮৮ সালের ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশের পর আমরা এই পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন ভ্রমবশতঃ ইহা এত দিন মুদ্রিত হয় নাই, তজ্জন্য পত্রপ্রেরক আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। (বাঃ সঃ)

চলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সুতরাং কার্য্যকালে এই দ্বৈতীয়িক কারণকেই রোগের উৎপাদক বলিয়া গ্রহণ করাতে ইষ্টসিদ্ধির সুবিধাই হইয়া থাকে।

সুস্থাবস্থায় যে দেহযন্ত্রের যেরূপ ক্রিয়াভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহার কোন প্রকার অন্যথা ভাব দর্শন করিলে আমরা উক্ত অংশে ব্যাধি বিকাশ হওয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি *।

যদি কোন স্থলে আমরা কোন পদার্থের প্রয়োগ দ্বারা কোন দৈহিক ক্রিয়ার তাদৃশ বিকার উপস্থিত করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদের এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, উক্ত পদার্থের শক্তি আর রোগোৎপাদিকা শক্তি একই তত্বানুসারে কার্য্যকরী হয়। অর্থাৎ যে দৈহিক যন্ত্রের সহিত উক্ত পদার্থের নৈসর্গিক সম্বন্ধ আছে, তাহার উত্তেজনা দ্বারা উহা অজ্ঞাত বা গৌণ কারণকে বিচলিত করে। "টার্টার এমেটিক" নামক প্রসিদ্ধ বমনকারক বস্তু দ্বারা বমনোৎপাদন ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। উক্ত ভৈষজ্য পদার্থ আমাশয়কে বিচলিত করিয়া অজ্ঞাত বা গৌণ কারণকে ক্রিয়াশীল করিয়া দেয়, তাহাতে বমনোৎপত্তি হয়। ইহার বিলোম কার্য্যও উৎপন্ন করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ত্বকের নিম্নে এই পদার্থের প্রক্ষেপণ দ্বারাও বমন উৎপাদন করা যায়; এ স্থলে গৌণ-কারণ হইতে উক্ত দৈহিক যন্ত্রে উত্তেজনা নীত হইয়া, বিপরীত ক্রমে সেই একই ফলের উৎপত্তি করিয়া থাকে।

যে হেতু গৌণ কারণের স্বরূপ আমাদিগের অজ্ঞাত, অপিচ যে হেতু ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে মুখ্য অথবা দ্বৈতীয়িক কারণের চালনা দ্বারা গৌণ কারণকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, অতএব কার্য্য নির্ব্বাহের অভিপ্রায়ে আমরা দ্বৈতীয়িক কারণকেই ব্যাধি বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি; কিন্তু প্রাথমিক কারণ যতদূর জানা যাইতে পারে তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা চাই। অতএব যখন কোন ভৈষজ্য পদার্থের দ্বারা কোন দৈহিক যন্ত্রে কোন ব্যাধিলক্ষণ সমষ্টি উপনীত হয়, তখন আমরা যথাসম্ভব এরূপ অনুমান করিতে পারি যে, উক্ত লক্ষণ গুলি যে গৌণকারণ বশাৎ স্বতঃ প্রকাশমান হয়, ঔষধ কর্তৃকও সেই গৌণকারণেরই চালনা দ্বারা উহারা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

মানব-শরীরের উপর কোন ভৈষজ্য দ্রব্যের প্রভাব বিনিশ্চয় করিতে হইলে, মানবশরীরকেই তাদৃশ পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা আবশ্যক; কারণ ব্যাধি মাত্রেই জীবন্ত দেহবিধানের উপর কার্য্যশীল কারণবিশেষ, সুতরাং ব্যাধি-জন্য লক্ষণের অনুরূপ লক্ষণ পরম্পরা উৎপন্ন করিতে হইলে,

* ব্যাধি সমূহ প্রধানতঃ দুই মূল শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; ক্রিয়া-বিকারাত্মক ও বিধান-বিকারাত্মক। বিধান অর্থে এখানে নির্ম্মাণ-বস্তু বুঝিবে। মূলে ব্যাধি বিকাশ জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ক্রিয়া বিকারাত্মক ব্যাধি সমূহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

যে আধারাশ্রয়ে ব্যাধির প্রভাব প্রকাশিত হয়, যত দূর সম্ভব তাহার সমধর্ম্মাক্রান্ত জীবন্ত দেহবিধানরূপ আধার লইয়া পরীক্ষা করাই কর্ত্তব্য। অপিচ যে হেতু লিঙ্গ-জাতিত্বভেদে দৈহিক ক্রিয়ার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, অতএব এই পরীক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিতে হইলে, পুরুষের, নারীর এবং সতর্কতার সহিত ইতর জন্তু দিগের শরীরে উহা করা আবশ্যক। কিন্তু এই পরীক্ষাস্থল দেহে ব্যাধি বর্ত্তমান থাকিলে পরীক্ষায় বিঘ্নাচরণ করিতে পারে, তজ্জন্য এই পরীক্ষা সুস্থদেহের উপরেই নির্ব্বাহ করা প্রয়োজনীয়।

যে হেতু দেখা যায় যে, যে শক্তি ব্যাধিতাংশের উপর কার্য্যক্ষম তাহার দ্বারাই আরোগ্য ক্রিয়া প্রকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে; অপিচ উপরে দর্শিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত পদার্থ জীবনীশক্তিকে বিচলিত করিতে সক্ষম তাহাদের কার্য্যনির্ণয় করণের পক্ষে সুস্থশরীরই শ্রেষ্ঠ সাধন; অতএব আমরা আর এক পদ অগ্রসর হইয়া এরূপ বলিতে পারি যে, ব্যাধিশক্তির প্রতিকূলে যদি কোন ভৈষজ্য শক্তিকে নিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ভৈষজ্য শক্তি ব্যাধিশক্তির যত অনুরূপ হইবে—অর্থাৎ আমরা যাহাকে রোগ বলি তজ্জন্য যে ক্রিয়া বিকাশ তাহা ভৈষজ্য-কৃত ক্রিয়া-বিকাশের সহিত যত সমধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, ততই সেই ভৈষজ্যশক্তি রোগশক্তির প্রতিরোধক্ষম হইবে। ইহাকেই সাম্যবাদিক ভিষকেরা Similia Similibus Curantur সমঃ সমংশময়তি, এই বচন দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যে কোন দৈহিক যন্ত্র পীড়িত দশায় অল্প হউক বা অধিক হউক, উত্তেজনীয় অবস্থায় থাকে, সে কারণ তাদৃশ পীড়িত অংশের উপর কার্য্য করণার্থ যে কোন শক্তিকে প্রযুক্ত করা যায়, তাহার পরিমাণ এরূপ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক যে, ব্যাধিতাংশে রোগজন্য যে অনুরূপ উত্তেজনীয়তা থাকে, আরোগ্য সাধনার্থ যতদূর আবশ্যক তাহার অধিক সেই উত্তেজনীয়তার বৃদ্ধি না করে।

সেই শক্তির মাত্রা কেবল পরীক্ষার দ্বারাই স্থির হইতে পারে; কিন্তু সুস্থশরীরে ঐ সকল রোগলক্ষণ উৎপাদন করিবার জন্য যে মাত্রা ব্যবহার করা হইয়াছে, এ মাত্রা তাহা অপেক্ষা সুতরাংই কম হওয়া আবশ্যক; কারণ সে স্থলে উহার বিষক্রিয়ার প্রতিরোধার্থ নিযুক্ত জীবনীশক্তিকে নিরস্ত করিয়া ঐরূপ লক্ষণ গুলিকে উৎপন্ন করিতে হইয়াছিল। আর এই প্রতিরোধক শক্তির অস্তিত্ব হেতুকই ভৈষজ্যদ্রব্যকে এরূপে তনূকরণ, অর্থাৎ বিভাজন দ্বারা সূক্ষ্মকরণ পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক যে সাধ্যানুসারে যেন শরীরের সেই শক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া ভৈষজ্যদ্রব্যের নিয়মিত ক্রিয়াকে সঙ্কীর্ণ বা নিরুদ্ধ না করিতে পারে। অতএব, সচরাচর যে মাত্রায় ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা বিস্তর কম করা আবশ্যক; কিন্তু কত কম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শন ভিন্ন তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

এইরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে

হোমিওপেথি বা সাম্যবাদ প্রণালী যে যুক্তিমূলক তাহা উপপন্ন হইবে, এবং বুঝা যাইবে যে ইহা প্রয়োগ মূলক (Empirical) নহে, প্রাকৃতিক অখণ্ডনীয় নিয়মের উপর ইহার নির্ভর—সে নিয়ম বিজ্ঞান রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকে—সে নিয়ম এই;—কোন অহিতের নিরাকরণ করিতে হইলে সেই অহিতের উৎপাদক কারণকে নিরাকৃত করিতে হয়।

ওলাউঠা কি কি কারণে হয়?

২৫২ পৃষ্ঠার পর।

অপকৃষ্ট খাদ্য ও অতি ভোজন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিসূচিকার নিদান বর্ণনা স্থলে লেখা আছে,

"ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥

অর্থাৎ, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পরিমিতাহারী ব্যক্তিদিগের এই রোগ হয় না, যাহারা আত্ম সংযমে অসমর্থ এরূপ অশনলোলুপ (পেটুক) ব্যক্তিদিগেরই এই রোগ হইয়া থাকে। ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার ওলাউঠার চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "এমন স্থল অতি অল্পই দেখিয়াছি যেখানে রোগোৎপত্তির এরূপ কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যাহা রোগী চেষ্টা করিলে এড়াইতে না পারিত; আর অধিকাংশ স্থলেই আক্রমণের পূর্ব্বে কোন না কোন রকমে ভোজন সম্বন্ধে অহিতাচার হওয়া প্রায়ই টের পাইয়াছি।" লেখকের ধারণাও ঠিক্ এইরূপই। ফলতঃ অপকৃষ্ট খাদ্যের তো কথাই নাই, উৎকৃষ্ট খাদ্যও অতিরিক্ত পরিমাণ হইলে, অথবা পাকাশয় মধ্যে অজীর্ণাবস্থায় অতিরিক্ত কাল থাকিলে, কিংবা ভুক্তবহা প্রণালীর মধ্যে অন্য কোনরূপ উপদাহ জননক্ষম বস্তুর সমাবেশ হইলে, অথবা নিয়মিত কাল অতিক্রম করিয়া বহুক্ষণ পরে আহার করিলে, তদ্দ্বারা ওলাউঠাকে আনয়ন করিতে পারে। অনেক সময়েই দেখা যায়, পচা মাছ, বাসি তরকারি, বেশি ঘৃত বা তৈলাক্ত খাদ্য, ভর্জ্জিত দ্রব্য প্রভৃতি অহিত ভোজ্য ভক্ষণের পরেই ওলাউঠা হয়। লেখক দেখিয়াছেন, এক নির্ব্বোধ গোপ অতিরিক্ত পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধ পান করায়, তাহার ওলাউঠা হইয়াছিল। মুসলমানদিগের মধ্যে রোজার উপবাস ফুরাইয়া গেলে, তাহার পরেই মনের ক্ষোভ মিটাইয়া গণ্ডে পিণ্ডে খায়, আর ওলাবিবি আসিয়া অনেককেই আলিঙ্গন করে। অস্মদ্দেশে নূতন চা'লও একটি রোগ প্রবর্ত্তক কারণ—বিশেষতঃ দুঃখিলোকদিগের মধ্যে। ফলতঃ, ওলাউঠা-বাহুল্যের

সময়ে অপক্ব বা অম্লরস যুক্ত ফল, গলিতাবস্থা প্রাপ্ত পক্ব ফল, অসুসিদ্ধ শাকাদি, পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রব্যচয়, অথবা পাকাশয়ের উপদাহ জননক্ষম অন্য যে কোন গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, তাহাতেই রোগের প্রকাশ করিয়া দিতে পারে। অতিশয় আতপক্লান্ত, কিংবা ভয় অথবা অন্য অবসাদক চিত্তোদ্বেগ পীড়িত, কিংবা পরিশ্রান্ত অবস্থায়, অথবা অতিশয় তাড়াতাড়ি আহার করিলেও সে আহারের সুচারুরূপে পরিপাক হয় না। অপিচ, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় হঠাৎ আহার্য্য দ্রব্যের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন করিবে না। যদি পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে, অল্পে অল্পে করিবে।

দন্তোদ্গম জন্য উপদাহ। শিশুদিগের দন্তোদ্গম সহজ ভাবে না হইলে দার্শনিক স্নায়ু সমূহের অত্যন্ত উপদাহ (Irritation) উৎপন্ন হয়। ঐ সকল স্নায়ু 'দীর্ঘীভূত মজ্জা' (Medulla Oblongata) নামক মস্তিষ্কের অংশ বিশেষে সম্মিলিত হইয়াছে। সুতরাং স্নায়বিক উত্তেজনা হেতুক ঐ মজ্জাতে অতিরক্ততা (Hyperœmia) উপস্থিত হয়। তৎফল-স্বরূপ, অন্যান্য লক্ষণের সহিত, অন্য সময়ে উদরাময়, কিন্তু ওলাউঠার সময়ে ওলাউঠা হইয়া থাকে।

বিরেচক ঔষধ। বিরেচক কর্ত্তৃক যে ওলাউঠা উপনীত হইতে পারে, ইহা অনেকানেক সুযোগ্য লেখক নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সার রেনাল্ড মার্টিন লিখিয়াছেন, তিনি অনেক স্থলে দেখিয়াছেন, জোলাপ লইয়া প্রচুর জলবৎ ভেদ হইতে হইতে পরে সাংঘাতিক ওলাউঠায় পরিণত হইয়াছে। ইং ১৮৭৪ সালে এক প্রকার ব্যাপকজ্বর কলিকাতায় দেখা দিয়াছিল। তাহাকে ডাক্তরেরা " কলেরা ফিভার " বা 'ওলাউঠা জ্বর' নাম দিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, "এই জ্বর অতি সামান্য হইলেও ইহার চিকিৎসা করা বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। জোলাপ দিলেই সাংঘাতিক ওলাউঠায় গিয়া দাঁড়াইত। প্রথমতঃ জ্বরের রকম বড় বুঝা যাইত না। অনেক রোগী জোলাপ লইয়া মারা গিয়াছে।" ফলতঃ যাঁহারা জোলাপ না দিয়া জ্বরের চিকিৎসা করিতে জানেন না, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সময়ে তাঁহারা সাবধানে না চলিলে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সার মার্টিন, ম্যাক্ ফার্শন, লেকক, ম্যাকিণ্টস, টোয়াইনিং, গুডিভ্, পেণ্টার, ডর্হাম, বার্লো, মোরহেড্, ইহাঁরা সকলেই বহুদর্শী চিকিৎসক, এবং সকলেই এক বাক্যে জোলাপের অনিষ্টকারিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ফরাসিস্ অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগেরও এই মত। ফলতঃ যৎকালে ওলাউঠা হইতে থাকে তখন জোলাপ কোন ক্রমেই লইবে না। যে প্রকারেই উৎপন্ন হউক না কেন, ওলাউঠার সময় পেট নরম হইলেই ঐ রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা হয়। সুতরাং তৎকালে যে কোন প্রকারের হউক, উদরাময় হইলেই তাহাকে যত সত্বর পারা যায় দমন করা উচিত।

সুরাপান। ডাক্তর ফার একবারকার মারকের সংখ্যা বিচারদ্বারা দেখাইয়াছেন, ইংলণ্ডে শনি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারের মৃত্যু সংখ্যা সমগ্র সপ্তাহের গড় সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হইয়াছিল, এবং বৃহস্পতি, শুক্র, ও রবিবারের সংখ্যা গড় সংখ্যার অপেক্ষা কম। সমস্ত ইংলণ্ডে মঙ্গলবারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, এবং শুক্রবারে সর্ব্বাপেক্ষা কম মৃত্যু হইয়াছিল। লণ্ডনের মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে বারভেদে বিস্তর ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয়; সোমবারে ২১৯৪, মঙ্গলবারে ২১৩৬ কিন্তু বৃহস্পতিবারে ১৯২৭, আর শুক্রবারে ১৮২৪ জন মাত্র। নিম্নে প্রদত্ত লতায় সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের মৃত্যু সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। লণ্ডনে সাপ্তাহিক হিসাবে বেতন দেওয়া হয়। শনিবারেই প্রায় তলব বাটা হয়। সোমবারে অনেকে মদ্যপানে রত থাকে। শুক্রবারে সুরার ধ্বংস অপেক্ষাকৃত কম হয়। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মৃত্যু যেবারে হইয়াছিল সেই বারটি লতায় ধরা গিয়াছে, কিন্তু অর্দ্ধেক সংখ্যক মৃত্যু আক্রমণের চব্বিশ ঘণ্টা পরে হইয়াছে।

মঙ্গলবারে যে মৃত্যুসংখ্যা এত বেশি তাহার কারণ সোমবারে অনেকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া মদ্যপানে রত থাকে। কি নিত্য কি নৈমিত্তিক উভয়বিধ সুরাপায়ীরাই যে ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়, তাহা সকল লেখকেই বলিয়া গিয়াছেন, এবং এমরাও অনেকবার তাহা দেখিয়াছি।

	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রবি	গড়সংখ্যা
সমস্ত ইংলণ্ডে…	৭৬৯৩	৭৮২৬	৭৬১১	৭৬০৭	৭১৬৭	৭৭৬৯	৭৬১০	৭৬১৪
লণ্ডনে…… …	২১৯৪	২১৩৬	১৯৭৮	১৯২৭	১৮২৪	২০৬৭	২০১১	২০২২
সমস্ত ইংলণ্ডে …	+৭৯	+২১২	+৭	—৭	—৪৪৭	+১৫৫	—৪	
লণ্ডনে ……	+১৭৪	+১৩৬	—৪২	—৯১	—১৯৬	+৪৭	—৯	*

* (—) ঋণচিহ্ন দ্বারা গড় সংখ্যা অপেক্ষা কম, এবং (+) ধনচিহ্ন দ্বারা গড় সংখ্যা অপেক্ষা বেশি বুঝিতে হইবে।

প্রসিদ্ধ স্নায়বোত্তেজক বর্গ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যে কোন কারণে স্নায়ব বিধানের ক্রিয়াশীলতার বৃদ্ধি করে, তদ্দ্বারাই দেহ মধ্যে ক্রিয়া বিকারজ ব্যাধির উৎপত্তি করিতে পারে। সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যকে এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। কাফি ও চাও ইহার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। অতিরিক্ত রতিসেবা, জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনা, রাত্রিজাগরণ প্রভৃ-

তিও এই শ্রেণীর মধ্যে ধর্ত্তব্য। কাম বৃত্তির অযথা উদ্দীপনাদ্বারা অপস্মার প্রভৃতি গুরুতর স্নায়ব রোগ যে উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা চিকিৎসক মাত্রেরই সুবিদিত আছে।

মানসিক আবেগ। ভয়, হর্ষ, শোক ইত্যাদি দ্বারা যে কখনো কখনো উদরাময় উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা চিকিৎসকেরা অবগত আছেন। বিশেষতঃ, ভয় বশতঃ অনেকে ওলাউঠার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, ইহা সচরাচর প্রসিদ্ধই আছে। একটি গল্প আছে :—এক সহরের বাহিরে এক ফকীর বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে মড়কের দেবতা সহরের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া ফকীর জিজ্ঞাসিলেন, "কি ভাই! সহরে কি করিতে যাও?" মড়ক দেব উত্তর করিলেন, "আমার উপর এই সহরের ৩০০০ লোক মারিবার হুকুম আছে, তাই যাইতেছি।" কিছুদিন পরে মড়কদেব যখন ফিরিয়া আইসেন, সেই ফকীরের সহিত পুনরায় সেই স্থানে দেখা হইল। ফকীর কহিলেন, "কিভাই! ৩০০০ বলিয়া গেলে কিন্তু ৩০,০০০ মারিলে, তুমি কেমন সত্যবাদী?" মড়কদেব কহিলেন, "ফকীর সাহেব! আমি মিথ্যা বলি নাই, আমি ৩,০০০ লোকই মারিয়াছি, কিন্তু ভয়দেব বাকী গুলিকে নিকাশ করিয়াছেন!!" ওলাউঠার মারক যাঁহারা অবধান পূর্ব্বক সমীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই গল্পের অর্থবত্তা উপলব্ধি করিবেন। যে যত বেশি ভয় পায়, আগে যেন তাহাকেই আসিয়া ধরে। মনের খাতিরজমা ভাব ওলাউঠা এড়াইবার ও তাহার সঙ্গে যুঝিবার পক্ষে বড়ই দরকারি। কথিত আছে, ১৮৩২ সালের মারকের সময় বিলাতে একটি লোককে টাকার প্রলোভন দেখাইয়া কোন একটি বিছানাতে কয়েক দিবস শুইবার জন্য লওয়ান হয়, এবং তাহাকে বলা হয় যে সেই বিছানায় একটি ওলাউঠা রোগী মরিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ কোন ঘটনা হয় নাই; কেবল ভয়েতেই সেই লোকটি অল্প সময়ের মধ্যে ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ ওলাউঠার সময়ে যে ব্যক্তি মরিবার ভয় যত কম করে, সেই ব্যক্তিরই বাঁচিয়া যাইবার তত বেশি সম্ভাবনা।

রাত্রি জন্য কাল প্রভাব বিশেষ।—অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, ওলাউঠা প্রায় রাত্রিতেই, বিশেষতঃ রাত্রিশেষে ২টা হইতে ৪টার মধ্যে আরম্ভ হইয়া থাকে। ঢাকার গত মারকে, বিশেষতঃ উহার শেষ ভাগে যতগুলি খারাপ কেস হইয়াছিল, সকল গুলিই প্রায় এইরূপে হইয়াছিল।—রোগী সর্ব্ববিষয়ে সুস্থ শরীরে শুইয়াছে; শেষরাত্রে ২।৩ টার সময়ে পেটে ভারবোধ ও ব্যথা হইয়া বাহ্যের চেষ্টা হওয়াতে উঠিয়াছে। বাহ্যে হইয়া বেস আরাম বোধ হইয়াছে, আবার গিয়া শুইয়াছে। ক্ষণেক পরে আবার বাহ্যে—এবারে অধিক জলীয়; তাহার পরেই কাতর ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াছি, অধিকাংশ আক্র

মণই দ্বিপ্রহর রাত্রের পর এবং ৪টার পূর্ব্বে আরেম্ভ হইয়াছে। আর ইহাও দেখিয়াছি যে, ঐ সময়ই প্রায়শঃ রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সময়টি ওলাউঠা রোগীর পক্ষে বড় সঙ্কট সময়। দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই সময়ে উষ্ণতার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে; তাপমানের পারদ ৩। ৪ ডিগ্রি নামিয়া পড়ে। অপিচ প্রাণবায়ু অর্থাৎ নিশ্বসিত বায়ুর আঙ্গারিকাম্লের পরিমাণ রাত্রি সাড়ে আটটার সময়ে ন্যূনতম হইয়া রাত্রি সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত ন্যূনভাবেই থাকে; সুতরাং উক্ত সময়ে শারীরিক তাপের অনুরূপ অল্পতা হয়। তাপাল্পতা নিবন্ধন দেহের রক্ত সঞ্চালনের মন্দীভাব হয়; অপিচ নিদ্রাবস্থায় শ্বাসক্রিয়া, রক্ত-বিশুদ্ধি-ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া প্রভৃতি দৈহিক সমস্ত ক্রিয়াই মন্দভাবে চলিতে থাকে; অধিকন্তু উক্তাবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয়। এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঐ সময়েই যে অধিকাংশ লোক আক্রান্ত হয়, তাহার কতকটা হেতু বুঝিতে পারা যাইবে। অপস্মারের আবেশও অনেক স্থলে রাত্রিকালে হইয়া থাকে।

ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইবার প্রবণতা। একবার ওলাউঠা হইলে যে ভবিষ্যতের জন্য উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় এমন নহে। একই ব্যক্তির বারংবার ওলাউঠা হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কয়েক দিবস হইল আমার একটি রোগী প্রাতে আমার বাসায় আসিয়া কহিল, তাহার রাত্রি হইতে কয়েক বার পাতলা দাস্ত হইয়াছে। আমি তাহাকে আপন বাসায় গিয়া "স্প্রিট কেম্ফার" অর্থাৎ কর্পূরারিষ্ট সেবন করিয়া শুইয়া থাকিতে পরামর্শ দিলাম। সে বলিল তাহার দুইবার ওলাউঠা হইয়া গিয়াছে, সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, এবারে তাহার ওলাউঠা হইবে না। কিন্তু এই কথাতেই আমি আরো সন্দিহান হইয়া তাহাকে সাবধান থাকিতে বলিয়া দিলাম। দশটা বেলার পর গিয়া দেখিলাম তাহার পতনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর দিবস প্রথম রাত্রিতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

ফলতঃ, বিষবায়ু বা মেলেরিয়া যাহার শরীরে একবার প্রবেশ করে, চির কালই তাহার যেমন জ্বর প্রবণতা থাকিয়া যায়, সামান্য কারণেও জ্বর ফুটিয়া পড়ে; অপস্মার যেমন একবার হইলে পরবর্ত্তি বয়সে তাহার পুনঃ প্রকাশ হয়, বাল্যকালে শৈশব বিক্ষেপ রূপে প্রকাশ হইলেও পূর্ণ বয়সে নিজমূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়; ওলাউঠাও তেমনি যাহার একবার হইয়াছে তাহার পুনরায় হওয়ার যত সম্ভাবনা, যাহার কখনও হয় নাই তাহার তত নহে। আবার অপস্মার প্রবণতা যেমন বংশানুক্রমিক হয়, তেমনি ওলাউঠাক্রান্ত ব্যক্তির সন্তান বর্গেরও ঐ ব্যাধি হইবার অনেকটা সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকারে ওলাউঠা ক্রমশই অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ক্রমশই ঘন ঘন মারক রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং এই

ভারতবর্ষে ইহাতো দৈশিকরূপী হইয়া "কায়মি আড্ডা" গাড়িয়া বসিয়াছে, তদ্ভিন্ন যে সব দেশে এখনও সেরূপ করিতে পারে নাই, সেখানেও প্রায় প্রতি বৎসরই গ্রীষ্ম সময়ে এক একবার পায়ের ধুলা দিতে ক্রুটী করে না।

বঙ্গীয়-বৈষ্ণব-কবি-সম্প্রদায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নরোত্তম দাস। নরোত্তম দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী ও চৈতন্য দেবের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কবি। গোবিন্দ দাস যে রূপে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেবের বন্দনা করিয়াছেন, নরোত্তম ঠাকুরেরও সেইরূপ বন্দনা করিয়াছেন। নরোত্তম বহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; যথাস্থানে তাহাদের বিষয় উল্লেখ করা যাইবে; এক্ষণে তাঁহার রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

যথারাগ।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এভব সংসার ত্যজি, পরমানন্দেতে মজি,
কবে আর ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
প্রেমে গদ গদ হয়ে, রাধাকৃষ্ণ নাম লয়ে,
কাঁদিয়া বেড়াব উভরায়॥
নিভৃত নিকুঞ্জ যেয়ে, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়ে,
ডাকিব হা নাথ হা নাথ বলি।
যাইয়া যমুনা তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে খাব করপুটে তুলি॥
হেন দশা কবে হব, শ্রীরাম মণ্ডলে যাব,
সে ধুলি মাখিব কবে গায়।
বংশীবট ছায়া পায়ে, পরম আনন্দ হয়ে,
পড়িয়া রহিব কবে তায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
রাধাকৃষ্ণে করিব প্রণাম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, এ দেহ পতন হবে,
এই আশা করে নরোত্তম॥

রসরাজ খান। রসরাজ খান কায়স্থ। খানউপাধিধারী বসুবংশীয় পুরন্দর খান দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গণের একযায়ী করেন; বোধ হয় রসরাজ খান সেই বংশীয় ছিলেন। যাহা হউক আমরা রসরাজ প্রণীত দুই একটি গীত হস্ত লিখিত পুঁথিতে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজাঙ্গনা গণের অবস্থা কবি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

শুনি বেণু অপূর্ব্ব ধ্বনি।
ছুটল কুঞ্জর গতি বরজ রমণী॥
কেহ পদে হার, কেহ করেতে নূপুর।
কেহ আধ সীমন্তে লেয়ই সিন্দুর॥

যথারাগ।

এক পয়োধরে, চন্দন লেপতি,

আর সহজে গৌরী।

হেমধরাধর, কনয় ভূধর,
কোরে মিলল জোরি॥
মাধব তুয়া দর্শন কাজে।
আধ বেশ হেন, করিয়া সুন্দরী,
বাহির দেয়লি মাঝে॥
ডাহিন ঈক্ষণে, কাজরে রঞ্জিত,
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল, কমল দুয়ে,
চাঁদ পূজল কাম॥
শ্রীযুত ধন, জগত ভূষণ,
সোই হরষ জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর,
ভনে রসরাজ খান॥

পীতাম্বর দাস। ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন কবি; কিন্তু ইহাঁর রচিত কোন পদ আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। পীতাম্বর দাস অনেক ভক্তিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, সে অনুবাদ নিতান্ত মন্দ হয় নাই। আমরা এই স্থানে তাহার রচিত যে পদটি প্রদান করিলাম তাহা এইরূপ অনুবাদ;—

ছটফটি কুসুম শয়নে।
হরি হরি করে সোমরণে॥
কাহে করু অধরণ বেশ।
দরশন ভেল সন্দেশ॥
বিহি মোরে দুরমতি দেল।
মনমথে হানল শেল॥
লোরে লোচন ঘন পূরে।
পীতাম্বর তহি স্ফুরে॥

গিরিধর দাস। আমরা গিরিধর দাস প্রণীত অধিক পদাবলী হস্তলিখিত গ্রন্থে প্রাপ্ত হই নাই; যাহা পাইয়াছি তাহা বেশ প্রীতিকর। এই স্থানে তাহার একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

রাধা বদন চাঁদ, হেরি সহচরি,
অন্তরে জর জর হোয়।
বিরহ কি আগি, জাগি রহু অন্তরে,
ঝর ঝর লোচনে রোয়॥
সহচরি ত্বরিত গমনে চলি যাই।
লোচনক লোরে, তিতল কলেবর,
মিলন মাধব ঠাঁই॥ ধ্রু॥
নাগর করে ধরি, কহ তঁহি সহচরি,
শুন বর নাগর কান।
তুয়া বিরহানলে, জ্বল তহিঁ সুন্দরী,
তুরি তহিঁ করত পয়ান॥
সহচরি বচন, শুনল যব মাধব,
কুঞ্জে করল অভিসার।
গিরিধর দাস, হৃদয়ে সুখ বাড়ল,
বাড়ল প্রেম পাথার॥

কাশুদাস। কাশুদাস একজন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কবি; ইনি অধিকাংশ গৌরাঙ্গ লীলা বর্ণন করিয়াছেন, এই স্থানে আমরা তাঁহার রচিত একটি পদ প্রদান করিলাম;—

কল্যাণ।

আয়ল নিত্যানন্দ অদ্ভুত চান্দ।
সহজ গমন, নটন গতি সুন্দর,
ত্রিভুবন জন মোহন ফাঁদ॥
বয়ন নয়ন, সুবিমল সুন্দর অম্বুজ,
মধুলিহ ভুজযুগ ভাতি।
অরুণাধর দ্যুতি, অরুণিহ শোভে অতি;
দশন মোতি ফল পাঁতি॥

ভব তাপিত জন, সিঞ্চহ সকরুণ,
বচন পীযূষ রস ধারে।
হরেকৃষ্ণ নাম, কিরণে নাশই সব,
দুর্ব্বাসনা আঁধিয়ারে ॥
চৌদিকে সঙ্গী, রঙ্গি উড়ু মণ্ডল,
নিশি দিশি চান্দ পরকাশে।
শ্রীজাহ্নবী বল্লভ, শ্রীপাদ পল্লব,
আশে শ্রীকাশুদাস ভাষে॥

বৃন্দাবন দাস। ইনি অধিকাংশ গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই বৃন্দাবন দাস প্রসিদ্ধ "চৈতন্যভাগবত" প্রণেতা কিনা তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। ভাগবত রচয়িতা ও পদকর্ত্তা বৃন্দাবন দাস অভিন্ন ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন; যাহা হউক এই স্থলে তাঁহার রচিত একটি পদ প্রদান করিলাম;—

ধানশি।

চলে নিজ প্রেম ভরে, দিক টল মল করে,
পদ ভরে অবনী দোলায়।
আধ আধ কথা কয়, মুখের বাহির নয়,
নিজ পারিষদ গুণ গায় ॥
দেখ ভাই অবনীমণ্ডলে নিত্যানন্দ।
গৌরমুখ হেরি পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
পরিধান পীত ধটি, আঁটনি না রহে কটি,
অন্তর্ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
অঙ্গ হেলি হেলি চলে, গৌর গৌর বলে,
নিশি দিশি একই না জানে ॥
যুগে যুগে রাম, সুজন প্রতিপালন,
পাষণ্ড খণ্ডরি নাশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গুণ গান বৃন্দাবন দাস ॥

নর হরিদাস। নর হরিদাস একজন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ কবি; ইনিও অধিকাংশ গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিয়াছেন; আমরা এই স্থলে তাঁহার একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

বরাড়ি।

সহজে ঢল ঢল, সজল নিরমল,
কমল জিনিয়া আঁখি শোভা।
বদন মণ্ডল, কোটী শশধর,
হেরইতে জগমন লোভা ॥
করুণাময় অবতার।
দেখিয়া দীন হীন, করল প্রেম দান,
আগম নিগমের সার ॥ ধ্রু ॥
অঙ্গ সুচিক্কণ, ভুবন মোহন,
কণ্ঠে মণিময় হার।
বচনে রচন, শ্রবণে দূরে গেল,
পাতকীর মনের আঁধিয়ার ॥
নবীন করিবর, জিনিয়া ভুজবর,
তাহে শোভে হেম দণ্ড।
দেখিয়া সব লোক, পাসরে দুঃখ শোক,
খণ্ডয়ে হৃদয়পাষণ্ড ॥
নিতাইর করুণায়, অবনী ভাসল,
পূরল জগজন আশ।
ও প্রেম রস, লেশ না পাইয়ে,
কাঁদয়ে নর হরিদাস ॥

গৌরীদাস। আমরা হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথিতে একটি মাত্র গৌরীদাস রচিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহাও সম্পূর্ণ রূপে গৌরীদাস প্রণীত নহে; এই গীতিটিতে গৌরীদাস ও জ্ঞান দাস উভয়েরই ভণিতা দেওয়া আছে; কিন্তু জ্ঞান দাসের নাম শেষে সং-

যুক্ত হওয়ায় ইহাই জানা যাইতেছে যে,এই পদটি অগ্রে গৌরীদাস রচনা করেন, তদনন্তর জ্ঞানদাস ইহার সংস্করণ করিয়াছিলেন; এই জন্য উভয়েরই ভণিতা সংযুক্ত হইয়াছে। গোবিন্দদাসও এইরূপে তদীয় পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক মহাজন রচিত পদ সংস্করণ করিয়া তাহাতে নিজের ভণিতাও সংযুক্ত করিয়াছেন, যথা—

" রায় বসন্ত, মধুপ আনন্দিত,
নিন্দিত দাস গোবিন্দ।"

বোধ হয় নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে জ্ঞান দাসও সেইরূপ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক আমরা সেই পদটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম;—

ধানশি।

পূরবে গোবর্দ্ধন, ধরল অনুজ যার,
জগজনে বলে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে, আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে,
গুণবান নিত্যানন্দ নাম॥
পরম উদার, করুণাময় বিগ্রহ,
ভুবন মঙ্গল গুণধাম।
গৌর পিরীতি রসে, কটির বসন খসে,
অবতার অতি অনুপাম॥
নাচত গায়ত, হরি বোল বোলায়ত,
অবিরত গৌর গোপাল।
হাস প্রকাশ, মিলিত মধুরাধরে,
বোয়ত পরম রসাল॥
রাম দাসের পঁহু, সুন্দরে রসবস,
গৌরীদাস আন নাহি জানে।
অখিল লোক যত, এহ রসে উনমত,
জ্ঞানদাস গুণ গানে।

আমরা হস্ত লিখিত পুঁথি প্রভৃতি হইতে এই দ্বাত্রিংশ বৈষ্ণব কবির পদাবলী প্রদান করিলাম; এইরূপ আরও কত অপরিচিত মহাজন নির্জ্জন স্থানে বসবাস করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা কি? প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে আমরা দৃঢ় ব্রত; আমরা এ পর্য্যন্ত সেই সকল পুঁথি হইতে যাঁহাদের পদাবলী পাইয়াছি তাঁহাদেরই এক একটি পদ প্রদান করিয়াছি। ইহার পর যদি আরও মহাজন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের লক্ষ্য হন, তাহাও ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে বিরত হইব না। অতএব আমরা এই প্রস্তাব এই স্থানেই উপসংহার করিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাবে অগ্রসর হইতেছি।

প্রথম প্রস্তাব সমাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম প্রস্তাবে আমরা বৈষ্ণব পদ কর্ত্তাগণের পদের পরিচয় দিয়াছি; তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদির পরিচয় দিবার নিমিত্ত আমরা এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক কবি আছেন যাঁহারা পদ কর্ত্তা নহেন অথচ অনেক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; আমরা এক্ষণে সেই সকল মহাজন গণের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। এস্থলে ইহাও বলিয়া-রাখা আবশ্যক যে, বৈষ্ণব কবিগণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই দ্বিবিধ ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস

গোস্বামী, কবিকর্ণপূর প্রভৃতি মহাজনগণ প্রায় সমুদায় গ্রন্থই সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন; তবে তাঁহাদের প্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থ যে নাই তাহাও নহে; ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালাতে দুই এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা এই প্রস্তাবে তাঁহাদের রচিত অপরিচিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ উভয়েরই আলোচনা করিব। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় তদীয় 'ঐতিহাসিক রহস্যে' 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ' নামে একটি এই বিষয়ক প্রস্তাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই প্রস্তাবটি তাঁহার অনেক অনুসন্ধানের ফল; কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ প্রণীত গ্রন্থ সমুদ্র-বিশেষ; তাহা যতই মন্থন করা যাইবে ততই তাহার অভ্যন্তর হইতে অমৃত সমুত্থিত হইবে। রামদাস বাবু এতাধিক অনুসন্ধান করিয়াও আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই; কেন না ঐ রূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি প্রণীত অনেক গ্রন্থ এক্ষণেও নির্জ্জনে বসবাস করিতেছে; —তাঁহাদের কেহই আর খোজ খবর করিতেছেন না। আমরা হস্তলিখিত পুঁথি অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক অপরিচিত অথচ সুন্দর গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে তাহাদেরই পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর একটি কথা; রামদাস বাবুর প্রস্তাবে যে দুই একটি ভ্রম হইয়াছে, আমরা এই প্রস্তাবে সে গুলিও সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে আমরা সংস্কৃত গ্রন্থেরই পরিচয় দিতেছি; পরে বাঙ্গালা গ্রন্থ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

তুলস্যষ্টক। অনুষ্টুপছন্দে রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী। বিষয় তুলসীর গুণ-কীর্ত্তন; গ্রন্থ সংখ্যা ৮। প্রারম্ভবাক্য—

বৃন্দবিন্দময়ীং দেবীং ভবরোগবিনাশিনীং।
গন্ধামোহিতদিকচক্রাং তুলসীং প্রণমাম্যহম্॥

সমাপ্তি বাক্য—

জ্ঞানরূপাং মহালক্ষ্মীং হরিপ্রেমরসস্থলীং।
পরানন্দৈকসুভগাং তুলসীং প্রণমামাহম্॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং তুলসীপ্রণামাষ্টকং পূর্ণম্।

রাধিকাষ্টোত্তরশত নাম। অনুষ্টুপ-ছন্দে বিরচিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। বিষয়—রাধিকাদেবীর অষ্টাধিক শতনাম কীর্ত্তন। গ্রন্থ সংখ্যা ১৮। আমাদের ধারণা ছিল চৈতন্যচন্দ্র নিজে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই; কিংবা যদিও করিয়া থাকেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু হস্ত লিখিত পুঁথির মধ্যে তাঁহার রচিত দুই একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া আমাদের সে ভ্রম অন্তর্হিত হইয়াছে। চৈতন্যচন্দ্র রচিত যখন দুই একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন তাঁহার রচিত বৃহৎ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। যাহা হউক আমরা এক্ষণে এই গ্রন্থের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম;—

প্রারম্ভ বাক্য—

শ্রীমদ্রাধা রসময়ী রসজ্ঞা রসিকা তথা।
রসেশ্বরী **** রসপূর্ণা রসপ্রদা॥

সমাপ্তি বাক্য—

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়া মর্দ্ধরাত্রিকে।
সর্ব্বসিদ্ধি র্ভবেত্তস্য কৃষ্ণপ্রেম যতো ভবেৎ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রবিরচিতং শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশত নাম সম্পূর্ণম্।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রনামাষ্টোত্তরশতং। অনুষ্টুপ ছন্দে গ্রথিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। বিষয়—গৌরাঙ্গের অষ্টাধিক শত নাম কীর্ত্তন। গ্রন্থসংখ্যা ২২।

প্রারম্ভ বাক্য—

নমস্কৃত্য প্রবক্ষামি দেবদেবং জগদ্‌গুরুং।
নামাষ্টোত্তরশতং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং।১
বিশ্বম্ভরোজিতক্রোধো মায়া মানুষকর্ম্মকৃৎ।
অমায়িনায়িনাং শ্রেষ্ঠো বরদেশো দ্বিজোত্তমঃ॥ ২

সমাপ্তি বাক্য—

বিশ্বম্ভরায় গৌরায় চৈতন্যায় মহাত্মনে।
সচীপুত্রায় মিত্রায় লক্ষ্মীশায় নমোনমঃ॥

ইতি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যবিরচিতং শ্রীচৈতন্য চন্দ্র নামাষ্টোত্তরশতং সর্ব্বাপরাধ ভঞ্জনং সম্পূর্ণম্।

রাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা। শ্রী কবি কর্ণপূর প্রণীত। নানাবিধ ছন্দে বিরচিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার পরিবারাদি বর্ণন। শ্লোক সংখ্যা ১৩৮।

প্রারম্ভ বাক্য—

যে স্থিতাঃ সতাংরত্যা প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রলোকয়োঃ।
*** পরিবারাস্তে বৃন্দাবননাথয়োঃ॥ ১
মান্যা ভ্রাতা বয়স্তস্য বসস্যাঃ সেবকাদয়ঃ।
শ্রীগোষ্ঠযুবরাজস্য প্রেয়স্যশ্চ পূরক্রমাৎ ।২

সমাপ্তি বাক্য—

শাকে তৃশশ্চক্রে নভসি নভোমণি দিনে ষষ্ঠ্যা
ব্রজপতি ** মণি রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকাদীপি॥

বৈষ্ণবাভিধান। শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামি বিরচিত। বিষয়—সমুদয় বৈষ্ণবগণের বন্দনা। শ্লোক সংখ্যা ২৬।

প্রারম্ভ বাক্য—

লোক্যং লোপ্যং সুমধুবরসং স্বাদয়ন্ যোহবতীর্ণো
ধন্যগৌড়ে ব্রজপতিসুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আচাণ্ডালান্‌সকলজগতে প্রেমভক্তি প্রদাতা
কারুণ্যাব্জির্বসতু**দিশঃ শ্রীসচিনন্দনোমে॥

সমাপ্তি বাক্য—

বন্দে ভক্তপদদ্বন্দ্বং সর্ব্ববিঘ্ননিনাশকং।
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ লোকাঃ সদা প্রীণুন্তিহি॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামিনা বিরচিতং বৈষ্ণবাভিধানং সম্পূর্ণম্।

কৃপাম্বুধিস্তব। শ্রীমজ্জীব গোস্বামি বিরচিত। স্তোত্র গ্রন্থ। গ্রন্থ সংখ্যা ১০।

প্রারম্ভ বাক্য—

* * * * শ্রীগুরুবক্ত্রাদুপদিষ্টস্য পদ্ধতিঃ।
জীবনে মরণে বাপি রাধাকৃষ্ণগতির্ম্মম॥

সমাপ্তি বাক্য—

ইদং কারুণ্যং পূরী ** শব্দাভং নরকং যয়ৌ।
তৌভক্তৌ ভবেন্নিত্যং রাধাকৃষ্ণগতির্ম্মম॥

ইতি শ্রীমজ্জীব গোস্বামি বিরচিতঃ কৃপাম্বুধিস্তবঃ সম্পূর্ণঃ।

কেশবাষ্টক। শ্রীকবি কর্ণপূর বিরচিত। বিষয়—কেশব বা শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন। গ্রন্থ সংখ্যা ৯।

প্রারম্ভ বাক্য—

নবপ্রিয়কমঞ্জরী রচিতকর্ণপূরশ্রিয়ং
বিনিদ্রতর মালতী কলিত শেখরেণোজ্জ্বলং।
দরোচ্ছ্বসিত যূথিকা গ্রথিত *** বৈকক্ষকং।
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং॥

সমাপ্তি বাক্য—

ইদং নিখিলবল্লরীকুলমহোৎসবোল্লাসনং
ক্রমেণ কিল যঃপুমান্ পঠতি সুষ্ঠুপদাষ্টকং।
তমুজ্জ্বলধিয়ং সদা নিজপদারবিন্দদ্বয়ে রতিং
* * * চঞ্চলাং সুখয়তা দ্বিশাখাসখঃ॥

ইতি কেশবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

বৃন্দাবন ধ্যানং। শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিত। বিষয়—বৃন্দাবনের গুণ কীর্ত্তন ও ধ্যান। গ্রন্থ সংখ্যা ১০।

প্রারম্ভ বাক্য—

শ্রীবৃন্দাবনং যদোগোকুলস্য মণিমণ্ডপে নানা রত্ননির্ম্মিতং।
নানা বৃক্ষকল্পতরকত শতং নানালতাগন্ধ-পুষ্পবিকশিতং॥

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি শ্রীবৃন্দাবনধ্যানং সম্পূর্ণম্।

যুগলাষ্টক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রবিরচিত। বিষয়—রাধা কৃষ্ণের যুগলস্তোত্র। গ্রন্থ-সংখ্যা ৯।

প্রারম্ভ বাক্য—

হে সৌন্দর্য্য নিদান রূপ গরিমা মাধুর্য্যলীলানট।
হে আশ্চর্য্য বিশেষশোভনাহধর; হে বংশি বিভূষিবিভো।
হে বৃন্দাবিটপীবিলাসবিলসি, কেলিকলাকৌমুদী।
হে রাধে হে কৃষ্ণচন্দ্র কদাচরণশরণং বি-দেহি॥

সমাপ্তি বাক্য—

কৃপানিধান করুণাময়, কল্পবৃক্ষ কারুণ্যধাম,
অতিকাতরলোকরক্ষ হা কৃষ্ণ হা রমণ হা গতি নাথ দেব।
হা হা কদাপি করুণা ভবিতা মমার্থে
হে রাধে হে কৃষ্ণচন্দ্র কদাচরণশরণংবিদেহি।

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিরচিতং যুগলাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

চাটুপুষ্পাঞ্জলি। স্তোত্রগ্রন্থ। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি বিরচিত। বিষয় শ্রীরাধার স্তোত্র। গ্রন্থসংখ্যা ২৪। শ্রীযুক্ত রামদাস বাবু ইহার সংখ্যা ২৩ বলিয়াছেন এবং সমাপ্তি বাক্য প্রদান করেন নাই। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত গ্রন্থে ইহার ২৪টি শ্লোক এবং প্রারম্ভ শ্লোকার্দ্ধে দুই প্রকার পাঠ দেখিলাম। রামদাস বাবুর উদ্ধৃত পাঠও ইহাতে আছে।

প্রারম্ভ শ্লোক—

প্রথম পাঠ—

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতীবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্॥

দ্বিতীয় পাঠ—

নবগোরোচনাগৌরীমিন্দ্রগোপনিভাম্বরাং।
মণিস্তবকবিদ্যোতীবেণিব্যালাঙ্গনাফণাম্॥

সমাপ্তি বাক্য—

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃষ্ণাস্পদং॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনাবিরচিতঃ চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

মথুরামাহাত্ম্য। সংগ্রহগ্রন্থ। সংগ্রহগ্র-

স্তুকর্ত্তা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী। বিষয়—মথুরার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও স্তুতি। শ্লোকসংখ্যা ১৫৭। আমরা যে পুঁথি পাইয়াছি তাহাতে ইহার শ্লোক সংখ্যা ১২৭ আছে; কিন্তু রামদাস বাবু ইহার সংখ্যা ১৫০০ লিখিয়াছেন; অথচ তিনি ইহার সমাপ্তি শ্লোক প্রদান করেন নাই; আমরা যে গ্রন্থ পাইয়াছি তাহাতেও তাঁহার উদ্ধৃত "ইতি মথুরামাহাত্ম্য সংগ্রহঃ সমাপ্তঃ" এ বাক্য নাই। সুতরাং কোন্‌টি ঠিক্ তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

প্রারম্ভ বাক্য

হরিরপিভজমানেভ্যঃ প্রায়োমুক্তিং দদাতি নতু ভক্তিম।
বিহিততদুন্নতিসত্রাং মথুরে ধন্যাং নমামি ত্বাং॥

সমাপ্তি বাক্য—

যস্যাংধরাং সমুদ্ধৃতমুৎপন্নশ্চাপি সুকরঃ।
ততস্তাং নগরীং সৌরীংভুত্বা প্রত্যাম্মুখী পুনঃ।

আমরা হস্তলিখিত পুঁথিতে এই কয় খানি নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহার পর যদি প্রাপ্ত হই ক্রমশঃ উল্লিখিত হইবে। এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈষ্ণববন্দনা। শ্রীদৈবকীনন্দন দাস প্রণীত। বিষয়—সমুদয় বৈষ্ণবগণের গুণকীর্ত্তন; গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৬০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মনুষ্য জানিয়া॥
সেই অপরাধে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হৈনু।
মনেতে বিচারি এই নিরূপণ কৈনু॥
নিমাই পণ্ডিত কত পাতকী উদ্ধার।
করিলেন, মোর কেন নহিল নিস্তার॥

সমাপ্তিবাক্য—

ক্রমভঙ্গে দোষ মোর কিছু না লইবে।
আপনার গুণে দোষ সকল ক্ষমিবে॥
শ্রদ্ধায় পড়িলে তবে প্রেমভক্তিলভে।
দৈবকী নন্দন কহে সেই প্রেম লোভে॥
ইতি শ্রীদৈবকীনন্দন দাসেন বিরচিতং
শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা সম্পূর্ণং।

বস্তুতত্ত্বসার। শ্রীলোচন দাস বিরচিত পয়ারচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—প্রকৃতি, পুরুষতত্ত্ব, পরকীয়া আসক্তি ইত্যাদি বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা অনূ্যন ২০০।

প্রারম্ভবাক্য—

বন্দিব শ্রীগুরু পদ মনের আনন্দে।
চিত্তদৃঢ় রহু মোর সেই পদ দ্বন্দ্বে॥
সেই পাদপদ্ম মোর ভরসা কেবল।
সেই বলে হয় মোর সর্ব্বত্র মঙ্গল॥

সমাপ্তি বাক্য—

এইরূপে জীব সব সংসার ভ্রময়।
সংসার বন্ধন হৈতে মুক্ত নাহি হয়।
এইত কহিল আমি যে জানি বিচার।
বিস্তারি বর্ণিতে মোর শক্তি নাহি আর॥
হৃদয়ে একান্ত ভাবি শ্রীগুরুচরণ।
বস্তুতত্ত্ব সার কহে এদাস লোচন॥

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। শ্রীনরোত্তম দাস রচিত। বিষয়—রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণন। অধিকাংশ ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ২৫০।

প্রারম্ভবাক্য—

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম, কেবল ভক্তি সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মনে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণভক্তি হয় যাহা হলে॥
গুরু মুখ সুবাক্য, হৃদি করি মহা সৌখ্য
আর না করিহ মনে আশ।
শ্রীগুরু চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সব আশ॥

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীগৌরচন্দ্র মোরে বলান যেই বাণী।
তাহা বলি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোক নাথ প্রভু পদ দ্বন্দ্ব হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা কহেন নরোত্তম দাস।

প্রেমভক্তি চিন্তামণি। শ্রীনরোত্তম দাস প্রণীত। বিষয়—সাধ্য-সাধন নির্ণয় ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা। ইহা পয়ার ও ত্রিপদী-চ্ছন্দে রচিত; গ্রন্থসংখ্যা অনূ্যন ৩০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

এই মতে গুরু শিষ্য দোহে এক ঠাই।
প্রশ্নোত্তর করে দোহে আনন্দিত হই॥
শিষ্য নিবেদন করে শ্রীগুরু গোঁসাই।
সনিয়ম যে করিল শ্রীদাস গোঁসাই॥
তাহাই শুনিতে মোর হরিষ অন্তরে।
সাধন নির্ণয় সেই কহিবা আমারে॥

সমাপ্তি বাক্য—

ভক্তি চিন্তামণি কিছু সংক্ষেপে কহিল।
মনে কিছু নাহি স্ফুরে অতেব রহিল।
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥
ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি চিন্তামণি সম্পূর্ণং।

শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান। গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। বিষয়—বৃন্দাবনের সমুদয় স্থান বর্ণন ও স্তুতি। গ্রন্থখানি পয়ারে রচিত। গ্রন্থসংখ্যা ১০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

বায়ব্য হইতে যমুনা আইলা বৃন্দাবনে।
শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি মথুরা প্রদক্ষিণে।
গোকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা পূর্ব্ব মুখে।
প্রয়াগে গঙ্গার সনে গেলা দুহুঁর সুখে।

সমাপ্তিবাক্য—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান কহেন কৃষ্ণ দাস॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ বিরচিতং
শ্রীবৃন্দাবনধ্যানং সম্পূর্ণম্।

প্রেম রত্নাবলী। গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন ও রাগ নির্ণয়। পয়ারচ্ছন্দে বিরচিত; গ্রন্থ সংখ্যা অনূ্যন ২০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীরূপ গোঁসাই দয়াবান্।
জয় সনাতন প্রেম ভক্তি দেহ দান॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট সব ভক্তগণ সাথ॥
জয় বৃন্দাবন ভূমি সর্ব্ব পুণ্য রাশি।
জয় শ্রীমদন গোপাল পূর্ণ শশী॥

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
প্রেম রত্নাবলী গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীরাগ রত্নাবলী গ্রন্থঃ সম্পূর্ণ।

রসকদম্ব। শ্রীযদুনন্দন দাস অনুবা-

দিত। এখানি অনুবাদ গ্রন্থ। শ্রীরূপ গোস্বামী যে বিদগ্ধ মাধব নামক নাটক প্রণয়ন করেন, যদুনন্দন তাহাই বাঙ্গালা পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন ; তাহারই নাম রসকদম্ব। অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। ইহার বিষয়—রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা অন্যূন ২০০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

কৃষ্ণলীলা শিখরিণী, চন্দ্রসুধা উন্মাদিনী,
তাহাকে দমন করে যেবা।
রাধাদি প্রণয় তাতে, ঘনসার সুরভিতে,
সে মাধুরী পান করে যেবা ॥
বিষম সংসার পথ, তাপোদ্গম অবিরত,
তৃষ্ণায় পীড়িত জন মনে।
তাতে চেষ্টা যত যত, এই কৃষ্ণলীলামৃত,
শিখরিণী করয়ে হরণে ॥
হেম বর্ণ ধরি হরি, জগতে করুণা করি,
অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে।
উন্নত উজ্জ্বল রস, সেই ভক্তি প্রেম রস,
সে ভক্তি বিলায় ক্ষিতিতলে ॥

সমাপ্তি বাক্য—

ঠাকুর বৈষ্ণব পদে করোঁ পরণাম।
দোষ না লইবে প্রভু মাগোঁ এই দান ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা রস কদম্ব আখ্যান।
গায় দীন হীন যদুনন্দনাভিধান ॥

ইতি শ্রীবিদগ্ধ মাধব গ্রন্থ পয়ার সম্পূর্ণ।

ইতি সপ্তম অঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

শরণ দর্পণ। শ্রীরামচন্দ্র দাস বিরচিত। বিষয়—গুরু ভক্তি আকর্ষণ। ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত ; গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ১২০।

আরম্ভ বাক্য—

প্রথমে বন্দিব গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
কৃষ্ণ প্রাপ্তির যে হোঁ মূল।
অকূলে তিমির নাশ, দীপ্তি করে পরকাশ,
বন্দো সেই চরণ অতুল ॥
যারে গুরু কৃপা হয়, কৃষ্ণ পদ সেই পায়,
সেই হয় পরম সুধীর।
গুরু পদে যত ভক্তি, রাধাকৃষ্ণে তত আর্ত্তি,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববেদ সার ॥

সমাপ্তি বাক্য—

কেহ না করিহ রোষ, ক্ষেমিবা সকল দোষ,
যেন কহি বালকের ভাষ।
শুনরে রসিক ভাই, শরণ দর্পণ এই,
যে কহিল রামচন্দ্র দাস ॥

ইতি শরণ দর্পণ সমাপ্ত।

চৌষট্টিদণ্ড নির্ণয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত। বিষয় শ্রীরাধিকার চৌষট্টি দণ্ড সময়ের সমুদায় কার্য্য নিরূপণ। গ্রন্থ সংখ্যা ৩২।

প্রারম্ভ বাক্য—

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
দন্তধাবন ক্রিয়াদি সারিলা আপনি ॥

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৌষট্টিদণ্ডের কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি চৌষট্টিদণ্ড নির্ণয় সেবা সমাপ্তঃ।

গুরু শিষ্য সংবাদ। শ্রীনরোত্তম দাস প্রণীত। বিষয়—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে উপদেশ প্রদান। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ২০০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

এক দিন গুরু শিষ্য একত্রে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করেন আনন্দিত হয়্যা ॥

সমাপ্তি বাক্য—

ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি তাতে মাধুর্য্য বিহরে॥
শ্রীলোকনাথ চরণ শরণ অভিলাষ।
গুরু শিষ্য সংবাদ কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীগুরু শিষ্য সংবাদে উপাস্য উপাসনা তত্ত্ব নিরূপণে দশম পটলঃ সমাপ্তঃ।

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি। শ্রীরাধাবল্লভ দাস বিরচিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া সংসার-তপ্ত ভক্তের বিলাপ। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সংস্কৃতে যে বিলাপ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, রাধাবল্লভ দাস তাহা বাঙ্গালা পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ৫০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

শ্রারতি মঞ্জরী পুছেন শ্রীরূপ মঞ্জরী।
তবতুল্যরূপ গুণ অন্যে নাহি হেরি॥
ব্রজপুরে খ্যাতা তুমি পতিব্রতা এক।
পর পুরুষের মুখ কভু নাহি দেখ॥

সমাপ্তি বাক্য—

রঘুনাথ দাস গোঁসাই মন অভিলাষে।
সংস্কৃতে কৈলা এই বিলাপ প্রকাশে॥
তাহার পদ আরাধন হয় ত আমার।
অষ্টাঙ্গ হইয়া করি কোটি নমস্কার॥
মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা পদ সেবা আশে।
বিলাপ পুষ্পাঞ্জলি কহে রাধাবল্লভ দাসে॥

রাগমার্গ লহরী। শ্রীরূপ গোস্বামী হরিভক্তি রসামৃত সিন্ধু নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ৪ খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্ব বিভাগের অন্তর্গত সাধন লহরী হইতে কবি এই রাগমার্গ লহরী অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থ সংখ্যা ২৫০।

প্রারম্ভ বাক্য—

জয় জয় মহাপ্রভু গৌর ভগবান্।
তোমার পদারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীরূপ পদারবিন্দ আজ্ঞা শিরে ধরি।
কহিলাম রাগানুগামার্গ ভজন লহরী॥

গীত গোবিন্দ। শ্রীরসময় দাস অনুবাদিত। রসময় দাস শ্রীজয়দেব গোস্বামি প্রণীত সংস্কৃত গীত গোবিন্দের বাঙ্গালা পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ৮০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

জয় জয় সচীপুত্র ব্রজেন্দ্র কুমার।
কৃপা করি দেহ নিজ সেবা অধিকার॥
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপার সাগর।
তোমার পদারবিন্দে প্রণতি বিস্তর॥

সমাপ্তি বাক্য—

অতিদীন অতিহীন রসময় দাস।
শ্রীগীত গোবিন্দ ভাষা করিল প্রকাশ॥

রাগময়কণ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত। শ্রীরূপ গোস্বামী রিপুদমন বিষয়ে রাগময়কণ প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণ দাস সেই গ্রন্থ সংক্ষেপ করিয়াছেন।

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
রাগময়িকণা গ্রন্থ কহে কৃষ্ণ দাস॥
ইতি রাগময়িকণা সম্পূর্ণা।

প্রেমকল্পতরু। শ্রীমুকুন্দ দাস স্বামি বিরচিত। বিষয়—সাধ্য সাধন তত্ত্ব নিরূপণ। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ৪০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

প্রথমে বন্দিব গুরু রসের মূরতি।
অজ্ঞান তম নাশেন দিয়া প্রেম ভক্তি॥

সমাপ্তি বাক্য—

প্রেম কল্পতরু কথা সাধ্য সাধন।
মুকুন্দ দাস কহে নিজ ভক্তের কারণ॥

ইতি শ্রীপ্রেম কল্পতরু গ্রন্থঃ বিরচিতঃ শ্রীমুকুন্দ দাস স্বামিনা।

কুঞ্জরা স্তব। শ্রীযদুনন্দন দাস প্রণীত। বিষয়—শ্রীরাধার স্তব। গ্রন্থ সংখ্যা ১০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

প্রবেশিয়া নিজ চিত্ত সেই সেবা বটে।
মানসে করিব সেবা রাধার নিকটে॥

সমাপ্তি বাক্য—

কবিকর্ণ পূরের কারুণ্য লীলাতে এসব।
শ্রীযদুনন্দন কহে কুঞ্জরাজস্তব॥

ইতি কুঞ্জরাজ স্তবঃ সম্পূর্ণঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত। শ্রীযদুনন্দন দাস বিরচিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা অনুন ২০০০।

সমাপ্তি বাক্য—

তুমি বড় দয়াবান্, কর মোর পরিত্রাণ,
পতিত পাবন সবে বলি।
গাইল গোবিন্দ লীলা, যাহা মনে উপজিলা,
তাঁর গুণ আর কৃপাবলী॥
শ্রীকৃষ্ণ পদ দ্বন্দ্ব, মৃদু মৃদু অরবিন্দ,
তাঁর নখাঞ্চলে মোর আশ।
যে পদ আশ্রমে স্থিত, গাইল কৃষ্ণ কর্ণামৃত,
শ্রীযদুনন্দন দাসের দাস॥

সম্পূর্ণ মিদং শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতং।

রাগমালা। শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ বিরচিত। বিষয়—গুরুগুণ কীর্ত্তন। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ২০০।

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে করিমাত্র ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এই শরণ আখ্যান॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব চরণ করি আশ।
রাগমালা সম্পূর্ণ কিছু কহে কৃষ্ণ দাস॥

উপাসনা পটল। শ্রীনরোত্তম দাস প্রণীত। সংস্কৃত বাঙ্গালা গ্রন্থ। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ৩০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ পতি যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ চরণে শরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
উপাসনা পটল কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রী উপাসনা পটলঃ সমাপ্তঃ।

সাধ্য প্রেম চন্দ্রিকা। শ্রীনরোত্তম দাস প্রণীত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ১৫০।

সমাপ্তি বাক্য—

বুঝিয়া ভাবিহ ভাই রাখিহ ইহাতে।
শরণ মনন এই জান দৃঢ় চিত্তে॥
শ্রীগুরু পাদপদ্ম মনে করি আশ।
সাধ্য প্রেম চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥
এই গ্রন্থ জান ভাই পরম কারণে।
ইহা বই রত্ন নাই এ তিন ভুবনে॥

ইতি শ্রী সাধ্য প্রেম চন্দ্রিকা গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

কারিকা। শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিত।

এখানি গদ্য গ্রন্থ। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের গুণ ব্যাখ্যা ইত্যাদি। সকলের ধারণা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গ ভাষার সর্ব্বপ্রথম গদ্য-লেখক; যদিও তাঁহার কিছু পূর্ব্বে দুই চারি জন গদ্য লেখক ছিলেন, কিন্তু রাম-মোহনকেই এক প্রকার প্রথম লেখক বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা 'বাঙ্গালা সাহিত্য' বিষয়ে বহুদিন হইতে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, বঙ্গভাষায় পদ্য ও গদ্য লিখিবার রীতি একই সময়ে প্রচ-লিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেরূপ বঙ্গভাষার প্রথম পদ্য-লেখক, তাহারা সেই রূপই ইহার প্রথম গদ্য গ্রন্থ-প্রণেতা। আ-মরা এ সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া নূতন ধরণে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের' ইতি-বৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি; গ্রন্থ খানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি প্র-ণীত এই কারিকা গ্রন্থখানি আমাদের বহুল প্রমাণের অন্যতম। রূপ গোস্বামী পঞ্চ-দশ শতাব্দীর বা চৈতন্য চন্দ্রের সমসাম-য়িক লোক; ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বহু-বিধ পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও একখানি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; সেই গ্রন্থ খানিরই নাম কারিকা। কারিকা গ্রন্থ খানি হস্ত লিখিত পুঁথির প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং গ্রন্থ খানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। যাহা হউক তখনকার রচনা কি প্রকার ছিল দেখাইবার জন্য এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রারম্ভ বাক্য—

"শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ, গন্ধ গুণ, রূপগুণ, রসগুণ, স্পর্শ গুণ, এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধি-কাতে ও বসে। শব্দ গুণ কর্ণে, গন্ধ গুণ নাসাতে, রূপ গুণ নেত্রে, রসগুণ অধরে, ও স্পর্শ গুণ অঙ্গে। এই পঞ্চ গুণে পূর্ব্ব রাগের উদয়। পূর্ব্ব রাগের মূল দুই; হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ।" ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

"আগে তার সেবা; তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান সদা করিবে। ইতি। ইতি শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিতং শ্রীকারিকা পুস্তকং সম্পূর্ণং।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

মোক্ষমূলরের হিবার্টবক্তৃতা *

১।

ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের মূল কি?

মোক্ষমূলরের কথাগুলি বিশদরূপে উপলব্ধি করা ও তৎসমস্ত পাঠকের নিকট সমুপস্থিত করা আমার উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধে মোক্ষমূলরের সহিত তর্ক করিব না। তবে সময়ে সময়ে ও স্থলবিশেষে আমার নিজের দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, আশা করি প্রবন্ধটি তাঁহাদের নিকট নীরস বোধ হইবে না।

মোক্ষমূলর গ্রন্থারম্ভে ভূমিকা করিতেছেন ... "আমরা কিরূপে দেখিতে পাই, কিরূপে শুনিতে পাই, কিরূপে আমাদের হৃদয়ে ভাবের উদয় হয়, কিরূপে একটি ভাব অন্য একটি ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, কিরূপ একভাব হইতে অন্যভাবের বিশ্লেষণ হয়, তাহা অনেক পণ্ডিতে আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু কেন আমরা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানাতীত দেবতার প্রতি বিশ্বাস করি তাহা কেহই সুন্দর রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই।"

পাঠক! প্রাচীন পণ্ডিতেরা সত্যই বলিতেন যে 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' আজি কত সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ধর্ম্মতত্ত্বের গবেষণা হইতেছে। কিন্তু আজিও যিনি ধর্ম্মের কথা বলিবেন তাঁহাকে সেই ভূমি-পত্তন হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ভোজনং যতদূরই অগ্রসর হইয়া থাকুক না কেন, সকলকেই পুনরায় সেই 'প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা' বলিয়া গণ্ডূষ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। মোক্ষমূলরও ধর্ম্মগৃহের মূলপত্তন হইতে আরম্ভ করিলেন। দেখা যাউক ধর্ম্ম-প্রাসাদ তাঁহা হইতে কতদূর নির্ম্মিত হইয়া উঠে।

পণ্ডিতেরা ধর্ম্মতত্ত্বের কিরূপ অসম্পূর্ণ, অনুচিত, ও অযথা ব্যাখ্যা করেন, তাহা দেখাইবার জন্য মোক্ষমূলর "ষ্ট্রস্" নামক একজন জর্ম্মণ পণ্ডিতকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের নিকট সমুপস্থিত করিতেছেন।

ষ্ট্রস্ বলেন—'ঈশ্বরের প্রতি আত্মনির্ভর, ও ঈশ্বরের নিকট ঐহিক পারত্রিব সুখের প্রত্যাশা ও প্রার্থনা, করাই ধর্ম্ম। ষ্ট্রস্ আরও বলেন যে—'আমরা এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট হইতে ঐহিক বা পারত্রিক

* Maxmullor's Hibbert Lectures. 1878.

সুখের প্রত্যাশা করি না। তবে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আত্মনির্ভর এখনও করিয়া থাকি'।

মোক্ষমূলর 'ষ্ট্রসের' এই দুইটি মতের উল্লেখ করিয়া 'ষ্ট্রসের' প্রতি নানারূপ বক্রোক্তি ও উপহাস প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 'ষ্ট্রসের' অপরাধ ভাল করিয়া বুঝিলাম না। কারণ, আমরাও প্রায় সচরাচর দেখিতে পাই যে, এখনকার ধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের নিকট সুখের প্রত্যাশা করেন না, তাঁহারা কেবল ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করিয়া থাকেন।

'ষ্ট্রসের' ভ্রান্তিপ্রদর্শন করিয়া মোক্ষমূলর নিজে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে মোক্ষমূলর ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক কএকটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন। মোক্ষমূলর বলিতেছেন "ধর্ম্ম অতি প্রাচীন পদার্থ। বেদ রচিত হইবার অনেক পূর্ব্বে মনুষ্য পরমেশ্বরের সত্তা, মাহাত্ম্য প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। কারণ বেদেও পরমেশ্বরকে 'দেব' বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। দেব—দিব্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং 'দেবের' ধাত্বর্থ 'উজ্জ্বল'। কিন্তু বেদে 'দেব' 'পরমেশ্বর' এই অর্থে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ল্যাটিন ভাষাতেও পরমেশ্বরকে 'দিবস্ অর্থাৎ দেবঃ' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে হিন্দুরা ল্যাটিন হইতে পৃথক হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বরের ধারণা করিতে শিখিয়াছিল ও তাঁহাকে 'দেবঃ' বলিয়া আহ্বান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।'

মোক্ষমূলর ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা আমাদের বিবেচনায় অবশ্য স্বীকার্য্য।

মোক্ষমূলর আরও বলেন, যে যেখানে মনুষ্য বাস করে সেখানেই ধর্ম্মও অনুশীলিত হইয়া থাকে।

লবক্ ও স্পেনসার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, অনেক জাতি একেবারেই ধর্ম্মজ্ঞানহীন। কিন্তু আমরা মোক্ষমূলরের কথাই প্রকৃত বলিয়া মনে করি। কি কারণে এরূপ মনে করি তাহা পরে জানা যাইবে।

মোক্ষমূলর এই সঙ্গে আরও একটি কথা বলেন, "যেখানে ধর্ম্ম অনুশীলিত হয়, সেই খানেই ধর্ম্মতত্ত্বেরও গবেষণা হইয়া থাকে।"

আমরা ইহাতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি না। তবে, তর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও ক্ষতি নাই। মোক্ষমূলর যে তিনটি আনুষঙ্গিক বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, তাহার এক বার পুনরাবৃত্তি করিয়া লওয়া যাউক।

১। ধর্ম্ম অতি প্রাচীন পদার্থ।

২। যেখানে মনুষ্য সেখানেই ধর্ম্ম।

৩। যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই ধর্ম্মতত্ত্বের গবেষণা।

আনুষঙ্গিক বিষয় কয়টির উল্লেখ করিয়া, মোক্ষমূলর নিজে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

'ধর্ম্ম ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দের (Religion) ধাত্বর্থ এর—" মনোযোগ, অভিনিবেশ " *। কিন্তু ধাত্বর্থ যাহাই হউক, 'ধর্ম্ম' কথার অর্থ কি? মোক্ষমূলর নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অন্য অন্য পণ্ডিতের অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিতেছেন।

ক্যাণ্ট বলেন, " ধর্ম্ম ও নীতি এক কথা "।

ফিকৃটি বলেন " ধর্ম্মের সহিত নীতির কোন সংস্রব নাই। জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক কথা "।

শ্লিয়ারমেকার বলেন " ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরই ধর্ম্ম "।

হেগেল বলেন " যদি অন্যের উপর আত্মনির্ভর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে কুক্কুর সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক জন্তু। সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতাই ধর্ম্ম।"

কোমৎ বলেন, 'মনুষ্যের প্রতি প্রীতি, মনুষ্যের পূজাই ধর্ম্ম'।

ফুয়রবাক্ বলেন "আত্মানুরাগই ধর্ম্ম"।

মোক্ষমূলর ইহাঁদের সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজে একরূপ ধর্ম্মের লক্ষণ করিতেছেন। "যে শক্তিদ্বারা আমরা " অদৃষ্ট অসীম " পদার্থের উপলব্ধি করি তাহাই ধর্ম্ম।" কিন্তু অসীম পদার্থ কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে মোক্ষমূলর বলিতেছেন—"যে পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যাহা আমাদের জ্ঞানাতীত, অথচ যাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।" এস্থলে আবার প্রশ্ন হইতেছে—"যাহা ইন্দ্রিয়াতীত ও জ্ঞানাতীত, তাহার উপলব্ধি কিরূপে সম্ভবিতে পারে?" এতদুত্তরে মোক্ষমূলর বলিতেছেন "যখন কোন বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, তখন আমরা ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা তাহার কিয়দংশ দেখিতে ও স্পর্শ করিতে পারি, আর কিয়দংশ আমরা বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া লই, এবং আর কিয়দংশ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ ও বুদ্ধি দ্বারা অনুভব না করিয়াও উপলব্ধি করিতে পারি। এই শেষোক্ত অংশই অসীম পদার্থ। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। যখন মনুষ্য প্রথম রামধনুক দেখিয়াছিল, তখন ইহাতে সে তিনটি মাত্র বর্ণের কল্পনা করিতে পারিয়াছিল। এক্ষণে মনুষ্য ঐ রামধনুকে সাতটি বর্ণ দেখিতে পায়। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে প্রথম হইতেই মনুষ্য রামধনুকের সাতটি বর্ণের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু অতি আদিম অবস্থায় সে ঐ সাতটি বর্ণের মধ্যে তিনটির মাত্র নাম করণ করিতে পারিত। এক্ষণে সে আর চারিটি বর্ণের নাম করণ করিতে শিখিয়াছে। মনুষ্য প্রথমে আকাশকে " নীল আকাশ " বলিয়া বুঝিতে ও অভিহিত করিতে পারিত না। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্য অতি আদিম অবস্থাতেও আকাশের নীলিমা উপলব্ধি করিতে পারিত। সে কেবল তাহার নাম করণ করিতে শিখিয়াছিল না। সেই রূপ আমরা প্রত্যেক পদার্থেই তাহার

* সংস্কৃতে ধর্ম্ম=ধৃ+কর্ত্তৃ (মন)—অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্ব সংসার ধারণ করিয়া আছেন। যিনি বিশ্ব সংসারের অবলম্বন।

"অসীম" অংশের উপলব্ধি করিতে পারি, কেবল আমরা আজিও তাহার নামকরণ করিতে শিখি নাই।"

মোক্ষমূলর আরও দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন

"—তুমি এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছ, যে ঐ দূরে আকাশ ও পৃথিবী একত্র সম্মিলিত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি কি ইহাও উপলব্ধি করিতেছ না যে, উহার পরে আরও আকাশ রহিয়াছে, উহার পরে আরও পৃথিবী রহিয়াছে ? কিম্বা এই ক্ষুদ্র সর্ষপকণার কথা ভাবিয়া দেখ। তুমি দেখিতেছ যে ইহা অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু তুমি কি উপলব্ধি করিতেছ না যে, ইহারও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে ? সেইরূপে যে পদার্থ তুমি দেখিতেছ, সেই পদার্থের "অসীম" অংশ তুমি উপলব্ধিও করিতেছ। তুমি কেবল তাহার নামকরণ করিতে পারিতেছ না।"

মোক্ষমূলরের ধর্ম্মের এই লক্ষণটি সংক্ষেপে এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১। সকল পদার্থের তিনটি অংশ আছে। দৃষ্ট অংশ, অনুভূত অংশ ও অদৃষ্ট এবং অননুভূত অংশ।

২। এই অদৃষ্ট এবং অননুভূত অংশকে অসীম পদার্থ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

৩। যে শক্তি দ্বারা "অসীম পদার্থ" উপলব্ধি করা যায় তাহাই ধর্ম্ম।

মোক্ষমূলরের ধর্ম্মের এই লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা দুইটি কথা বলিতে চাই।

(ক) মোক্ষমূলরের এই ব্যাখ্যাটি নূতন নহে। প্রথমে হ্যামিণ্টন ও পরে ম্যান্সেল এই লক্ষণটিকে যথাসাধ্য বলবৎ করিতে চেষ্টা করেন। মিল এই লক্ষণটির সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন পণ্ডিতই এই লক্ষণের সমাদর করেন না। ফলতঃ ইহা যেন অত্যন্ত সুবুদ্ধি-রচনা বলিয়া আমাদেরও বোধ হয়। আর এক কথা, যে লক্ষণ হ্যামিণ্টন ও ম্যান্সেল বিশদ ও সর্ব্বগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, মোক্ষমূলর হইতে সেই লক্ষণের সর্ব্বাঙ্গীণতা প্রত্যাশা করা যায় না। হ্যামিণ্টন ও ম্যান্সেল এই লক্ষণটিকে "Philosophy of the conditioned" এই আখ্যা দিয়াছেন।

(খ) মোক্ষমূলরের লক্ষণে ২য় আপত্তি এই যে, যাহা অদৃষ্ট ও অননুভূত তাহা প্রায়ই কল্পনাবহুল হইয়া থাকে। মোক্ষমূলর কি স্বীকার করিবেন যে ধর্ম্মও কল্পনা-বহুল? যাহার অস্তিত্ব কল্পনানির্ম্মিত তাহা লইয়া "কবির চিত্ত-ফুলবন" সুশোভিত হইতে পারে ; কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে তাহা বিশ্বাস্য ও আদরণীয় হইবে কেন ?

মোক্ষমূলরের সাপক্ষে এই এক তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, মোক্ষমূলর ধর্ম্মের ইতিহাস ও মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছেন। ধর্ম্ম সত্য কি অসত্য তাহা বিবেচনা করিতেছেন না। কিন্তু মোক্ষমূলর ধর্ম্মের যে ইতিহাস দিতেছেন তাহাতে ধর্ম্ম অসত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ধার্ম্মিক মোক্ষমূলর ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোন্নতির জন্য বক্তৃতা করিতে করিতে ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতেছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

ধর্ম্মের আদিম বা প্রাথমিক বিকাশ কিরূপ?

উলঙ্গ অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে কিরূপ ধর্ম্মের আলোচনা হইয়া থাকে তাহা প্রদর্শন করাই মোক্ষমূলরের দ্বিতীয় বক্তৃতার উদ্দেশ্য। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অসভ্যদের দেশে বসন্ত কোকিলের ন্যায় দুই একমাস অবস্থান করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে 'সবজান্তা' হইয়া পড়েন। তাঁহারা অকুতোভয়ে লিখিতে আরম্ভ করেন 'অসভ্যদের ধর্ম্ম নাই,' প্রস্তর বা শিলাপূজাই অসভ্যদের ধর্ম্ম, 'অসভ্য জাতিরা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কল্পনাও করিতে পারে না', ইত্যাদি ইত্যাদি। মোক্ষমূলর এই সমস্ত হঠাৎ পণ্ডিতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি অসভ্যদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

(ক)

'কতকগুলি অসভ্যজাতির মধ্যে অতি উচ্চ ও অতি মহান্ ধর্ম্মভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। 'যাহাদিগকে আমরা অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদের কতকগুলির মধ্যে ধর্ম্ম ও মনুষ্য-জীবনের সমস্যা অতি সুন্দর রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। অসভ্যদের ধর্ম্ম বিষয়ক মীমাংসা অনেক সময়ে সভ্যতাভিমানী জাতিদের মীমাংসার সমতুল্য হইয়া থাকে'।

(খ)

'অসভ্যদের ভাষা সভ্যদের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি অসভ্যের মধ্যে অতি সুন্দর ব্যাকরণ ও অভিধান দৃষ্ট হয়। তাহাদের ব্যাকরণ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাহারা ইন্দ্রিয়াগোচর বিষয় সম্বন্ধেও প্রগাঢ় চিন্তা করিতে শিখিয়াছিল।'

(গ)

'কেহ কেহ বলেন যে অসভ্যদের চিন্তাশক্তি দুর্ব্বল, কারণ তাহারা কেবল এক দুই তিন এই তিনটি মাত্র সংখ্যার গণনা করিতে পারে চারি বলিতে হইলে, তাহারা বলে 'দুই দুই'। কিন্তু সভ্য আর্য্যজাতিও 'চারি' স্থলে 'চতুর্' কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'চতুর' ইহার অর্থ তিন ও এক। ফলতঃ অসভ্যই হউক বা সভ্যই হউক সকলেই তিন ও চারি এই দুইয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারে। তবে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করিয়া থাকে।'

(ঘ)

'অনেকে মনে করেন, অসভ্যজাতির ইতিহাস নাই। ইহা একটি বিষম ভ্রম। অসভ্য জাতিরা পদ্যে আপন আপন ইতিহাস লিখিয়া রাখে। পদ্যে লিখিবার কারণ এই যে, গদ্যে প্রক্ষেপণার (interpolation) যেরূপ সম্ভাবনা, পদ্যে সেরূপ নহে। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে কোনরূপ ইতিহাস নাই। কিন্তু ইতিহাসে যাহা কিছু

প্রয়োজনীয় সে সমস্তই হিন্দুদের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

(চ)

'কেহ কেহ বলেন যে অসভ্য জাতিদের মধ্যে নীতি নাই। ইহার অর্থ এই যে, অসভ্য জাতির মধ্যে সভ্যজাতির নীতি নাই। কিন্তু সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই কোনরূপ না কোনরূপ নীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে'।

(ছ)

'সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই জ্ঞানাতীত ইন্দ্রিয়াতীত দেবতায় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়।'

(জ)

সাধারণতঃ ধর্ম্মের বিকাশ সম্বন্ধে একটি মত বহুলরূপে প্রচলিত আছে। সেই মতটি এইঃ—মনুষ্য সর্ব্ব প্রথমে প্রস্তর পূজা করিত। পরে তাহারা নানাবিধ দেব দেবীর পূজা করিতে শিখে। তাহার পরে মনুষ্যের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচলিত হয়।

মোক্ষমূলর এই মতটি ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন এবং তিনি এই মতটির ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার জন্য হিন্দুদিগের ধর্ম্মোন্নতির পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। যে সময়ে হিন্দুরা উপনিষদ বিশ্বাস করিত, তৎকালে হিন্দুরা একেশ্বরবাদী ছিল। পৌরাণিক হিন্দুরা তেত্রিশকোটী দেবদেবীর পূজা করিতেন এবং বর্ত্তমান হিন্দুরা গাভী, শালগ্রাম প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং হিন্দুদের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে সকল সময়ে ধর্ম্মের উন্নতি হয় না, অনেক সময়ে ধর্ম্মের অবনতিও হইয়া থাকে।

মোক্ষমূলর দ্বিতীয় বক্তৃতায় অসভ্য জাতি সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তদ্দ্বারা মনুষ্যের মন হইতে অনেক ভ্রম নিরাকৃত হইবে। লোকে সাধারণ কথায় বলে, "যাহাকে দেখিতে পারি না, তাহার চলন বাকা"। সেইরূপ যিনি অসভ্যজাতিদিগকে ঘৃণাচক্ষে দেখিবেন, তিনি তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাইবেন না। আর যিনি অসভ্য জাতিদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন, তিনি অসভ্যের মধ্যেও মনুষ্যের মহত্ব, জ্ঞান, চিন্তা, ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতির চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। মোক্ষমূলর অসভ্যদিগকে ভাল বাসেন। সুতরাং তিনি অসভ্যদের মধ্যেও অনেক সদনুষ্ঠানের কথা জানিতে পারিয়াছেন এবং আমাদের বোধ হয় যে মোক্ষমূলরের বক্তৃতায় অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত অসভ্যদিগকে ভাল বাসিতে ও ভক্তি করিতে শিখিবেন। এই দ্বিতীয় বক্তৃতাটির জন্য, মোক্ষমূলর সর্ব্বসাধারণের ও বিশেষত অসভ্য জাতিদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৩। ভারতবর্ষের প্রাচীন পুস্তক মালায় ধর্ম্মের কথা কি কি জানাযায়?

মোক্ষমূলর ধর্ম্মের ইতিহাস আমূল বর্ণনা করিবার জন্য প্রাচীন হিন্দুদের ধর্ম্ম আদ্যোপান্ত বিচার করিয়াছেন। পৃথিবীস্থ অন্য কোন জাতির মধ্যেই ধর্ম্মের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এজন্য মোক্ষমূলর ইউরোপীয়দের নিকট হিন্দুগণের ধর্ম্মের সবিস্তার বর্ণনা করিতেছেন। মোক্ষমূলরের এতদ্বিষয়ক বক্তৃতাগুলির সারাংশ আমরা আগামী বারে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিব।—

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। পদ্যমালা, প্রথম ভাগ।

২। পদ্যমালা, দ্বিতীয় ভাগ।

মধ্যস্থের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু শিশুদিগের জন্য এই দুই খানি পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং শিশুশিক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে যেরূপ ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তিনি এই উভয় পুস্তকেই তাহার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এই দুই খানি পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের এই মাত্র এস্থলে বলা কর্ত্তব্য হইতেছে যে, শিক্ষাসমিতির নিকট এইরূপ বস্তুর সর্ব্বতোভাবেই আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইদানীং অনেক অপাঠ্য ও কুপাঠ্য পুস্তক অনুরোধ ও উপরোধের বিচিত্র মহিমায় বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হইয়া সুকুমারমতি শিশুদিগের প্রকৃত শিক্ষার পথে কাঁটা দিতেছে। পদ্যমালার ন্যায় প্রয়োজনের উপযোগী গ্রন্থ পাঠশালাসমূহে প্রচলিত হইলে, উহা যে শিশুদিগের চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করিবে, তাহাতে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রকৃতির অমল সৌন্দর্য্য চিত্রগুণে শিশুচিত্তে অঙ্কিত করিয়া সরল ও মধুর ভাষায় কিরূপ নীতিশিক্ষা দেওয়া যায়, পদ্যমালা তাহার এক সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। ইহার যে কোন পাঠ আলোচনা কর, তাহাতেই লেখকের সহৃদয়তা ও সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে। আমরা এই হেতু পুনরপি বলিতেছি যে, এই পুস্তক দুখানি পাঠশালাসমূহে বহুলপরিমাণে প্রচারিত দেখিলে আমরা বস্তুতঃই নিতান্ত সুখী হইব।

৩। "নীতি কুসুম। প্রথমভাগ। (বালকদিগের পাঠোপযোগী নীতিবিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।) শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত।" শিশুশিক্ষার নিমিত্ত এখানিও নিতান্ত মন্দ পুস্তক নহে। ইহার দুই একটি পাঠ সরল ও সদ্ভাবপূর্ণ বোধ হইল।

৪। "পদ্যবিন্দু। প্রথম ভাগ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে প্রণীত।" এই খানি পদ্যমালার ন্যায় প্রশংসনীয় না হইলেও শিশুশিক্ষার নিতান্ত অনুপযুক্ত নহে।

৫। "নীতিসংগ্রহ। শ্রীকালীকিশোর বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত।" ইহাতে পৌরাণিক আখ্যায়িকার বিবিধ প্রসঙ্গে নানাবিধ নীতিকথার অবতারণা করা হইয়াছে,

এবং গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যে অনিন্দনীয়, গ্রন্থের অনেক স্থলেই তাহার পরিচয় আছে।

৬। "চিহ্ন বোধ। (বিরামাদি বোধক চিহ্ন-সমূহের ব্যবহারপ্রণালী।) শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার প্রণীত।"—বাঙ্গালায় এই বোধ হয় 'চিহ্ন বোধ' নামে এক খানি পৃথক্ গ্রন্থ প্রথম রচিত হইল। কিন্তু চিহ্ন বোধ রচনার প্রকৃত সময় এখনও হইয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষা যে দিনে দিনে ব্যাকরণের শাসনাধীন হইতেছে, সংস্কৃত ভাষার বজ্রকঠোর ব্যাকরণশাস্ত্রের মাহাত্ম্যই তাহার মুখ্য কারণ। কমা ও সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্নের সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণ কি সংস্কৃত সাহিত্যের কোন দিনও কোন সম্পর্ক ছিল না। ইহা ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নূতন প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং কাজে কাজেই ইহাতে এক্ষণ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাচারের উচ্ছৃঙ্খলা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, এরূপ পুস্তক বালকদিগের সামান্য উপকারে আসিলেও গ্রন্থকার আপনার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিতে পারিবেন।

৭। "শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক (বালক বালিকা ও ব্যবসায়িগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য) শ্রীকামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও সঙ্কলিত।" বালকেরা যাহাতে গণিত শাস্ত্রের অনেক কথা মুখে মুখে শিখিতে ও অনায়াসে মুখস্থ করিতে পারে, গ্রন্থকার তজ্জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন।

৮। "নারীশিক্ষা। Words for Women শ্রীমতী মনোমোহিনী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত।" গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং নারীশিক্ষা ও নারীজন-স্পৃহণীয় কমনীয়তার একটি প্রশংসার্হ দৃষ্টান্তস্থল। তিনি ভাল ইংরেজী জানেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যেও অপ্রবিষ্ট নহেন। তাঁহার অনুবাদ প্রশংসার্হ হইয়াছে। যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মে হৃদয়ের সহিত অনুরাগী, এই গ্রন্থপাঠে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন; এবং খৃষ্টধর্ম্মে যাঁহাদিগের বিশ্বাস নাই, তাঁহারাও ইহার অনেক অংশ পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। আমরা তাঁহাকে এই স্থলে সসঙ্কোচে ও অতি সশঙ্কভাবে এই একটি কথা জিজ্ঞাসা করি যে, বংশোপাধির ব্যবহার করিতে হইলে স্ত্রীলোকের পক্ষে ভট্টাচার্য্য না লিখিয়া ভট্টাচার্য্যা কিংবা ভট্টাচার্য্যজায়া লিখিলে কিছু দোষ হইত কি?

৯। "আদর (প্রিয়তমার প্রতি) শ্রীকল্পনাকান্ত গুহ প্রকাশিত।"

১০। "আদরের আর একটুকু—প্রিয়তমার প্রতি—(আলিঙ্গন করিয়া) লাউজিনা নিবাসী শ্রীকল্পনাকান্ত গুহ কর্ত্তৃক প্রণীত।"

এই দুখানি পুঁথি মুদ্রিত ও প্রচারিত না হইয়া গ্রন্থকারের অতলস্পর্শ কল্পনাসমুদ্রের অন্তস্তলে থাকিলেই ভাল ছিল। মনের সকল কথাই যদি মনুষ্য মুখে আনে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে পাগল বলে। কিন্তু গ্রন্থকারকে লোকে পাগল না বলিলেও নিতান্ত নির্ল্লজ্জ ও যার পর নাই নিকৃষ্ট রুচির আদুরে ছেলে বলিবে সন্দেহ নাই।

১১। "স্বপ্ন-সঙ্গীত। গীতিকাব্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।” স্বপ্ন সঙ্গীত বিশেষ প্রশংসার গীতিকাব্য নহে। পাঠক-বর্গ নিম্নের পংক্তি কএকটি পড়িলেই নিজেরা বিচার করিয়া দেখিতে সমর্থ হইবেন।

“ কুলবধূ সম ব্রীড়া,
জানে কত রঙ্গ ক্রীড়া,
পুরবধূ সম স্মৃতি জানে কত ছলা,
সম্মুখে আসিলে কেহ,
সরমে আবরে দেহ,
অন্যান্তিকে কিন্তু, মরি, নহেত অথলা।
তারতম্য আছে হায়,—
প্রেয়সীর মূর্ত্তি প্রায়,
দেখিলেই যাই মোরা সকলি পাসরি।”

১২। বসন্তোপহার (গীতি-কাব্য-সংগ্রহ)—গ্রন্থকার ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে,—

“কবিতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে জনৈক সুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়কে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহার প্রতি রচয়িতার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, ইনি বঙ্গসাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত এবং গ্রন্থকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বঙ্গভাষার অদ্বিতীয় লেখক ভূতপূর্ব্ব বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয় যে শ্রেণীর সমালোচক, ইনিও সেই শ্রেণীস্থ। তিনি পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা মুদ্রিত করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। শুদ্ধ সেই আশ্বাসে গ্রন্থখানি সাধারণ্যে প্রচারিত হইল।”

স্বকৃত গ্রন্থে স্বয়ং এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া সুরুচির পরিচায়ক কি না, তাহা বলিতে পারি না এবং এই গ্রন্থনিবদ্ধ কবিতাগুলিও আমাদিগের নিকট অত প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। রমা বাই শীর্ষক কবিতার তিনটি পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—

“নবীন বয়সে, মধুর আবেশে,
মধুর ভাবেতে মগনা আপনি,
কে তুমি যুবতি ভারতী-ভাষিণী?”

এখানে ‘ মধুর আবেশে ’ এই শব্দ দুইটির অর্থ কি? আমাদের বোধ হয় যে, ক্ষমতাবান্ কবির একটি বাক্য কিংবা একটি শব্দও নিরর্থক প্রযুক্ত হয় না। গ্রন্থকার কল্পনার সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন,—

“চাই না ক সতি, কুটিল মুরতি
হেরিতে তোমার নয়ন-চাপে,
যাতে “বটতলা” নিত্য ঝালা পালা,
মুদ্রাযন্ত্র যার দাপটে কাঁপে।”

আমরা প্রকৃতই এই পংক্তি কয়টির অর্থ বুঝিলাম না। নয়ন-চাপ বলিলে ভ্রূ বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু কল্পনার নয়ন-চাপে যেরূপ কুটিল মূর্ত্তির প্রদর্শন সম্ভব, তাহাতে বটতলা ঝালা পালা হইবে কেন, এবং মুদ্রাযন্ত্রই বা তাহার দাপটে কি নিমিত্ত কাঁপিয়া উঠিবে? কোথায় কবি-কল্পনার সেই কমনীয় মূর্ত্তি! আর কোথায় সেই মূর্ত্তির দাপট, বটতলা ও মুদ্রাযন্ত্র। শব্দ-বিন্যাস সম্বন্ধে গ্রন্থকার আরও অনেক স্থলে এইরূপ নিন্দিত রুচির পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

“রমণী রোদন ফাটায়ে গগন
ফাটায়ে হৃদয় ভাসিয়া যায়;”

এই খানে ফাটায়ে শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে

কি? যাহা হউক মোটের উপরে গ্রন্থখানি মন্দ নহে! গ্রন্থকারের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ, গ্রন্থোক্ত কবিতানিচয়ও উৎসাহপ্রদ। ইহার কোন কোন কবিতা পড়িয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি।

১৩। "কুসুমাঞ্জলি (পদ্য সন্দর্ভ), শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীমোজাম্মেল হক্ কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত।" বঙ্গবাসী মুসলমান ভদ্রলোকেরা এইরূপ সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, ইহা আমরা কখনও জানিতাম না। এই পুস্তকের 'মহরম' ছাড়া আর সমস্ত কবিতাই হিন্দুর প্রাণে ও হিন্দুর ভাষায় লিখিত। সুতরাং গ্রন্থকার হিন্দুবাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ।

১৪। "চিত্রলেখা। প্রথমখণ্ড, শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র গাঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক।" এই পুস্তকের কবিতাগুলি সাধারণতঃ সরল ও মধুর। উমার শিবপূজা নামক কবিতাটি হেমবাবুর অনুকরণে লিখিত হইয়াছে,কিন্তু কবিতাটির কোন কোন অংশ যে অনুকরণচিহ্নশূন্য ও নূতন সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

১৫। "জাতীয় গান অথবা 'জয় জয় বাঙ্গালীর জয়।' শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত।" এই গ্রন্থ ১৬৪ পংক্তিতে পরিসমাপ্ত; ইহার শেষ দুই পংক্তি এই;--

'কাঁপুক ভূধর কাঁপুক সাগর,
জয় জয় জয় বাঙ্গালীর জয়।'

১৬। "সঙ্গীতরঞ্জন। প্রথমখণ্ড। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শীল কর্তৃক রচিত।" ইহাতে নানাবিধ রাগরাগিণীর এক শত বারটি গীত আছে। গীতগুলি ধর্ম্মবিষয়ক ও সাধারণতঃ ভক্তিরসপূর্ণ।

১৭। "নৈতিক সঙ্গীত। প্রথমভাগ। শ্রীহরিমোহন চৌধুরী প্রণীত।" ইহাও কএকটি নীতিমূলক সঙ্গীতে গ্রথিত। দুই একটি গীতের দুই একটি পংক্তি সুন্দর বোধ হইল।

১৮। "সঙ্গীত পুষ্পহার। অর্থাৎ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। প্রথমখণ্ড।" গ্রন্থকার একজন ভগবদ্ভক্ত সাধু, গ্রন্থখানি ভক্তির উদ্দীপক। শব্দবিন্যাস বিষয়ে মধ্যে মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ রীতি ও চিরসম্মানিত রুচির সহিত বিরোধ দৃষ্ট হয়। যথা;—

"আয় রে পুরবাসী সবে,
প্রেমরসময়ী জননীর মহোৎসবে।"

এখানে 'প্রেমরসময়ী' এই বিশেষণটি রীতি ও রুচি উভয়েরই বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু গ্রন্থকার একজন প্রকৃত ভক্তিমান্ ব্যক্তি। তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সমস্তই হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে। তিনি বোধ হয় রীতি ও রুচির কথা লইয়া বিচার করিবার অবসর পান নাই অথবা আবশ্যকতাও অনুভব করেন নাই।

১৯। "সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাঁথা। প্রথমখণ্ড।" যাঁহারা বাঙ্গালি-হৃদয়ের খাটি বাঙ্গালা কবিতা পড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সংগীত-সংগ্রহ পাঠ করিলে অপরিসীম আনন্দলাভ করিবেন। এই গ্রন্থে বাউলের সুরে রচিত একশত আটানব্বইটি গীত আছে। গীতগুলি মধুর, মনোহর এবং প্রগাঢ় কবিত্বপূর্ণ। ফলতঃ, এই গীতগুলির সংগ্রহবিষয়ে প্রকাশক বিস্তর পরি-

শ্রম করিয়াছেন, এবং ইহাও আমরা প্রীতির সহিত বলিতে পারি যে, তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। আমরা পাঠককে গ্রন্থের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে নিম্নে দুই একটি গীত তুলিয়া দিলাম।

রাগিণী ললিত—তাল খেমটা।

"মন হলি না মনের মত কি করি। একবার ডুবলি না মন, একবার ডুবলি না মন, গুরুর পদে, ঠিক হয়ে দণ্ড চারি॥

কমল পুষ্প ছেড়ে কেন, শিমুল ফুলে মজিলি। ওরে ধুতুরার মধু খেয়ে, মন আমার পাগল হলি॥

শালগেরাম ছাড়িয়া কেন, লোড়ার মাথায় ফুল দিলি। ওরে সাধুসঙ্গ ত্যজ্য করে, অসৎ সঙ্গে মজিলি।

রাগিণী মনোহর সই—তাল লোভা।

"দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলেম আর পেলেম না।

বহুদিন ভাবতরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে, সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা। তারে আমার আমার মনে করি, আমার হ'য়ে আর হ'ল না॥

সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হ'য়ে, মরমে জ্বলছে আগুণ আর নিবে না। আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না॥

পথিক কয় ভেবনারে, ডুবে যাও রূপ সাগরে, বিরলে ব'সে কর যোগসাধনা। একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না॥"

২০। "প্রেমোৎসর্গ। শ্রীপ্যারীভূষণ ভাদুড়ী প্রণীত। শ্রীজানকীনাথ মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথমখণ্ড।" এই গ্রন্থ ১৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার উপসংহারে বিরহবিধুরা কুলীনকন্যা কোকিলকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন;—

'শুন বলি পিকবর, যথা আছে প্রাণেশ্বর,
সেথা তুমি করহ গমন।
বসি তরুশাখা পরে, ডাক তুমি কুহুস্বরে,
ভেদ কর নাথের শ্রবণ।'

গ্রন্থের আবরণপত্রে একটি পুরাতন সংস্কৃত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার শেষ পংক্তিতে লেখা আছে যে,—

'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি,দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।'

আমরা এই নীতির অধীন হইয়া এই গ্রন্থের দোষ-গুণের সমালোচনায় বিরত হইলাম। গুণের কথা এই বলিতে পারি যে প্রেম এই শব্দটি পৃথিবীবাসী মনুষ্যমাত্রেরই প্রাণপ্রিয়, প্রেমের জন্য উৎসর্গই পুঞ্জীকৃত পুণ্যসঞ্চয়ের চরমফল, 'প্রেমোৎসর্গ' এই নামটি সমাসশাস্ত্রের নিয়মানুসারে সর্ব্বথা বিশুদ্ধ, এবং সুতরাংই বলিতে পারি যে, গ্রন্থের নামকরণ সর্ব্বথাই গ্রন্থকারের সুরুচির পরিচায়ক হইয়াছে।

২১। "বনমালা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পদ্যাবলী।" এই গ্রন্থের মুখপত্র নিম্নলিখিত কবিতাটিতে অলঙ্কৃত রহিয়াছে;—

"তুলি নানা জাতি ফুল
হৃদয় কাননে
গাঁথি 'বনমালা' দিনু বিভুর চরণে॥

পাঠক এই পংক্তি কয়টি পাঠ করিলেই

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইবেন। আমরা সংক্ষেপে এস্থলে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা এই আধ্যাত্মিক পদ্যাবলী পাঠ করিয়া বস্তুতঃই প্রীত হইয়াছি, এবং গ্রন্থকারকে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। তিনি সুকবি, সুলেখক ও সুগভীর ভক্তিশালী সাধু। তিনি প্রকৃতির পুষ্পিত সৌন্দর্য্যদর্শনে হৃদয়ে যে সকল ভাব পোষণ করিতে পারেন, যদি কবিমাত্রই প্রকৃতিকে সেই চক্ষে দেখিত, এবং দেখিয়া হৃদয়ে সেই সকল ভাব পোষণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে কাব্যের অঙ্গে কোথাও কালিমা থাকিত না এবং কাব্য পাঠে কেহই কুৎসিত নীতির কণ্টকিত বর্ত্মে পাদচারণ করিতে প্ররোচিত হইত না। আমরা পুনরপি বলিতেছি 'বনমালা' প্রকৃতই বনমালা বটে, এবং যে ইহার ঘ্রাণ লইবে, সেই পুলকিত হইবে। আমরা 'স্বভাবসঙ্গ' নামক কবিতাটির একার্দ্ধ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমাদের দৃঢ় ভরসা আছে যে, পাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন।

"প্রকৃতির সুকোমল সুখসহবাসে আহা!
কতই আরাম;
চল মন যাই তথা, বনের বিহঙ্গ যথা,
তরুশাখে বসি সদা গায় হরিনাম;
সুমন্দ মলয়ানীল বহে অবিরাম,
চল সে আনন্দ ধামে ত্যজি লোকালয়রে
নিরাপদে করিগে বিশ্রাম।

(২)
চন্দ্রাতপ সম ঐ প্রশান্ত গগণ কিবা!
সুনীল বরণ!
করে তাহে ঝল মল, রবি শশী তারাদল,
হেরিলে এ শোভা আহা! জুড়ায় নয়ন;
ইচ্ছা হয় নদীতটে বিছায়ে বসন,
স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধনেত্রে সৌরলোক সনে রে
করি সুখে প্রেম আলাপন।

(৩)
কবিচিত্ত-প্রমোদিনী ফুটন্ত গোলাপ, আয়!
তোরে বক্ষে ধরি—
জুড়াই তাপিত হিয়া, একদৃষ্টে নিরখিয়া;
নাসারন্ধ্রে সদ্য মকরন্দ পান করি;
হরিদ্ বরণ পত্রে ঢাকা আহা মরি!
কিরূপ লাবণ্য, তোর সহাস্য বদনে রে
লইল আমার প্রাণ হরি।

(৪)
শ্বেতকান্তি সুধামুখী কুবলয়, কমলিনী,
মল্লিকা মালতী;
যত সব ফুলমালা, প্রেমগন্ধা সুরবালা,
বনলতা, মৃগবধূ সরলা সুমতী;
গিরিসুতা শৈবলিনী, বিহঙ্গ দম্পতী,
তুয়া সবাকারে আমি বড় ভালবাসিরে
পুণ্যবতী তোরা সাধ্বী সতী।

এস্থলে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, এই পুস্তকের সকল কবিতাই এইরূপ সুন্দর ও সুখপাঠ্য নহে।

২২। "শ্রীগুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরীর নিদর্শন। প্রথম সংক্ষিপ্ত বিভাগ।"—এই পুস্তকের একার্দ্ধের নাম ব্রহ্মসমালোচনা, অপরার্দ্ধের নাম ধর্ম্মসমালোচনা। কিন্তু

উল্লিখিত সমালোচনাদ্বয়ের কোনরূপ সমালোচনা করিতে আমাদিগের অধিকার আছে কি না, সে বিষয়ে বড় গভীর সন্দেহ হইতেছে। কারণ, এই গ্রন্থখানি পড়িতে বহু চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সকল অংশ পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, এবং যাহা পড়িয়াছি তাহাও ভাল করিয়া বুঝি নাই। গ্রন্থকার এক স্থলে লিখিতেছেন,—

"কোন কোন বায়ুকে 'প্রাণ' বলা যায়, সেই বায়ুগণ বিচ্যুত হওয়ায় মধুকৈটভের মৃত্যু হইল; এই মৃত মধুকৈটভ 'পৃথিবী' নামে অভিহিত। অন্যভাগে আর একটি পরমাণুসমবায়ের সৃষ্টি হয়, তাহাকে 'শিব' বলা গিয়া থাকে।"

গ্রন্থকার তদীয় কল্পনার আকুঞ্চন ও বিকুঞ্চন করিয়া পৌরাণিক সৃষ্টিবাদকে বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদের ছাঁচে ঢালিবার নিমিত্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় যে, তাঁহার পরিশ্রম সফল হয় নাই।

২৩। "ঐতিহাসিক পাঠ। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।" যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের নিকট রজনী বাবুর নূতন পরিচয় দিবার কিছুই আবশ্যকতা নাই। তাঁহার এই গ্রন্থসম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা সর্ব্বাংশেই তাঁহার লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে ছাত্রবর্গ একই সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠের ফল লাভ করিবে, এবং যে সকল বিষয় বহু ইংরেজী গ্রন্থ না পড়িলে তাহাদের কখনও জানিবার সম্ভাবনা নাই, এই একই পুস্তকে তাহারা তাহা জানিতে পারিবে।

২৪। "স্বাস্থ্যশিক্ষা। বালকবালিকাদিগের অবশ্য-জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় নূতনবিধ গ্রন্থ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ভারত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" এখানিও ছাত্রশিক্ষার জন্য একখানি বিশেষ প্রশংসাহ পুস্তক। লেখা সরল ও সুন্দর, সমস্ত কথাই সুখবোধ্য এবং বালকবালিকার অবশ্য-জ্ঞাতব্য।

২৫। "নর-শারীর-বিধান। শ্রীআশুতোষ মিত্র প্রণীত।" বাঙ্গালায় নর-শারীর-বিধান সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বোধ হয় এখানি তন্মধ্যে সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাহাতে সকল শ্রেণীর পাঠকই অতি সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য পরিগ্রহ করিতে পারে, ইহাই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে একথা বলিতে পারি যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। যদি কেহ হক্সলি প্রণীত শারীরবিধানের * সহিত এই নরশারীরবিধান মিলাইয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালাভাষার এই অলক্ষিত উন্নতি দর্শনে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

২৬। "গোপালন অর্থাৎ গো প্রতিপালন ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। রাজ শ্রীক-

* Huxely on Physiology.

মলকৃষ্ণ সিংহ প্রণীত। শ্রীগোলোকচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।”

২৭। “অশ্বতত্ত্ব। প্রথমখণ্ড। শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরুক্মিণীকান্ত ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।” গো-পালন গৃহস্থ মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য; আর যাঁহারা একটু বড় গোছের গৃহস্থ অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়াও ব্যবহার করিয়া থাকেন, অশ্বতত্ত্ব পাঠে তাঁহারাও উপকৃত হইবেন। এই উভয় পুস্তকেই গ্রন্থকারের নৈপুণ্য, শ্রমশীলতা ও বিদ্যাবত্তার বিশিষ্ট পরিচয় আছে। যদি এদেশের ধনিসন্তানেরা রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের অনুকরণে এইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসমাজ অনেক প্রকারেই উপকৃত হইতে পারে।

২৮। “জাল প্রতাপ চাঁদ।”—এই গ্রন্থ কাহার লিখিত, গ্রন্থে তাহার কোন পরিচয় নাই। কিন্তু গ্রন্থকার যে একজন সুশিক্ষিত, সুলেখক ও অতি সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, এই গ্রন্থের দুটি পৃষ্ঠা পড়িলেই তাহা অনায়াসে বোধগম্য হয়। যাঁহারা উপন্যাসের মত ইতিহাস পড়িতে চান, তাঁহারা জাল প্রতাপচাঁদের এই অপূর্ব্বকাহিনী পাঠ করুন। বাঙ্গালায় কিরূপে ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হয়, জালপ্রতাপচাঁদ-রচয়িতা তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ইতিহাস পাঠ যে অনেক সময়ে উপন্যাস পাঠের মত সুখপ্রদ হইতে পারে, তিনি এই পুস্তকে তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। ইহার ভাষা জলের মত তরল, মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, মাঝে মাঝে রসিকতারও আঘ্রাণ আছে। গ্রন্থের আগাগোড়া সর্ব্বত্রই সমান ধীরতা, সমান স্বজাতিবাৎসল্য। ভাষার নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এইরূপ গুণবহুল পুস্তকে তাহা সহনীয়।

২৯। “কবিতা কলাপ। শ্রীচণ্ডীচরণ রায় প্রণীত।”—ইহাতে শিবসঙ্গীত, গোধূলী, মধুযামিনী ও বর্ষারজনী প্রভৃতি নামে কতকগুলি অসম্বন্ধ খণ্ড কবিতা নিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িয়াবোধ হইল, গ্রন্থকার কাব্যসাহিত্যে অনুরাগী এবং শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ।

“ঈষত ঈষত হাসি থাকি থাকি থাকিয়া—
পড়িছে যেন রে মরি চঞ্চলা গলিয়া।
নয়নে বিজলি ছটা, দশনে দামিনী ঘটা,
অধরে তড়িত-লতা ত্রিভুবন মোহিয়া।”

এখানে একই বস্তু অর্থাৎ বিদ্যুৎ হাস্যে চঞ্চলা, নয়নে বিজলি, দশনে দামিনী এবং অধরে তড়িৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়া শব্দের বৈচিত্র্যমাত্র প্রদর্শন করিতেছে।

৩০। “গ্রন্থাবলী। (গদ্য ও পদ্য) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।”—ইহা মাসে মাসে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে, এবং ইহার মুদ্রণাদি সমস্তই অতি সুন্দর হইয়াছে। গুরুদাস বাবু এইরূপে কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়ের ১৪ টাকা মূল্যের ২৩ খানি গ্রন্থ অগ্রিম দেয় ২॥০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। যদি তাঁহার এই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়, তাহা হ-

হইলে বুঝিব যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির দিন এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। যদি ইংলণ্ডের একজন সুকবির গ্রন্থাবলী এইরূপ সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে যাইত, তাহা হইলে বোধ হয়, দশ হাজার লোক একই দিনে তাহার গ্রাহক হইত, বোধ হয় দেশের ধনিসন্তানেরাও মুক্তহস্তে গ্রন্থকারের সাহায্য করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গের অধিকতর দুর্ভাগ্য লেখকগণ তাদৃশ সম্পদের আশা করিলে, মন দুঃখভরে অবসন্ন হয়।

৩১। "গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।"—পঞ্জিকা খানি বিষয়-বাহুল্যে এইরূপ বিভূষিত যে, সংক্ষেপে ইহার বিবরণ দেওয়া দুষ্কর। ইহাতে দিন-ক্ষণের কথা ছাড়া আইন আদালতের কথা, ষ্টাম্পের কথা, এবং আরও কত বিষয়েরই কথা যে অতি সঙ্কীর্ণস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত কিরূপ কার্য্যক্ষম ও উদ্যমশীল লোক এই একখানি পঞ্জিকাই তাহার প্রমাণ।

৩২। "রামধনু। সাপ্তাহিক বৈজ্ঞানিক পত্র; শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত।"—প্রতি মাসে ইহার চারি সংখ্যা বাহির হয় এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য একটি পয়সা মাত্র। বাঙ্গালায় কেহ কোন দিন এত অল্প মূল্যে এইরূপ মূল্যবান্ বস্তু সাধারণ্যে প্রচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। বাবু সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ রসায়ণশাস্ত্রের নিত্যপরীক্ষিত সত্যসমূহ কখনও গল্পচ্ছলে, কখনও পত্রচ্ছলে এবং কখনও বা কথোপকথনের প্রণালীতে এই পত্রিকায় প্রকটন করিয়া ইহাকে সর্ব্বাংশেই একখানি আদরের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ভাষা অতি সরল। শিশুরাও ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে; এবং যে সকল কুলকামিনীরা শিশুশিক্ষা ও চরিতাবলী মাত্র পাঠ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগেরও অতি সহজে বোধগম্য হইবে। অথচ, বিজ্ঞানের সহিত যাহাদের কোন পরিচয় নাই, এবং যাহারা কোন দিনও কোন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করে নাই, এই রামধনু যদি তাহাদিগের হাতে থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানলভ্য বহুবিধ সুখে অনায়াসে তাহারা প্রবেশের অধিকার লাভ করিবে এবং বিজ্ঞানসাধ্য বহুবিধ কার্য্য অবহেলায় তাহারা সম্পাদন করিতে পারিবে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা তিন চারিশতের অধিক হইবে না; কিন্তু এইরূপ প্রশংসার্হ পত্রিকার তিন চারি সহস্র গ্রাহক হইলেও সম্পাদকের সমুচিত পুরস্কার হয় না। ইহার সুযোগ্য ও সদুৎসাহী সম্পাদক বস্তুতঃ সমস্ত বঙ্গবাসীরই কৃতজ্ঞতাভাজন। ইনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ না করিয়াও সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত, তাঁহার এই অসহায় অবস্থায়, একাকী যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা মনে করিলে, তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মে।

দশ মহাবিদ্যা।*

আমার এক বাল্য-সখা সমালোচনার অতি সহজ ও সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—'মাইকেল নবমশ্রেণীর কবি', 'ভারতচন্দ্র চতুর্থ শ্রেণীর কবি', 'বায়রণ ষষ্ঠ শ্রেণীর কবি', 'মণ্টগমরি সপ্তমশ্রেণীর কবি'। এইরূপে যখনই আমার বাল্যবন্ধুকে কোন কবির কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তখনই আমার বন্ধু ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া, নয়নদ্বয় কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত করিয়া নাসারন্ধ্র কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া, বদনমণ্ডলে পাণ্ডিত্যের ও গাম্ভীর্য্যের অলৌকিক চিহ্ন প্রকটিত করিয়া বলিতেন, 'ঐ কবি দ্বাদশ শ্রেণীর বা ত্রয়োদশ শ্রেণীর'। এইরূপ সমালোচনায় সকল পক্ষেই বিশেষ সুবিধা হইত। সমালোচক এক কথায় তাঁহার কার্য্য সম্পাদিত করিতেন, কবিসম্বন্ধে আমারও বিশেষ জ্ঞানলাভ হইত এবং কবির প্রতিও কিছুমাত্র অন্যায় প্রদর্শন করা হইত না। ইয়ুরোপে ইহা অপেক্ষাও সমালোচনার আর এক সুন্দর ও সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সমালোচক বলিতেন—"কবির বিদ্যা ৫, কবির কল্পনা ৪, কবির ভাষা ৩, কবির বর্ণনা শক্তি ৫"। এক কথায় পাঠক, সমালোচক, ও গ্রন্থকার সকলেই পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিলাভ করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা এরূপ কবি-সমালোচনায় নিতান্ত অক্ষম। হেম বাবু কোন্ শ্রেণীর কবি, তিনি মাইকেল অপেক্ষা কতটুকু নীচু, বা নবীনচন্দ্র অপেক্ষা কতটুকু উচু, এই সমস্ত দুরূহ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা আমাদের সাধ্যাতীত, সুতরাং আমরা কবি-সমালোচনা না করিয়া, এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য কাব্য-সমালোচনা করিব। আমরা হেম বাবুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া তৎপ্রণীত 'দশমহাবিদ্যারই' যথাশক্তি আলোচনা করিব।

সর্ব্বাগ্রে দশমহাবিদ্যার আখ্যায়িকাটির বর্ণনা করা যাউক। "একদা মহাদেব সতীশোকে বিলাপ ও রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি নারদ বীণাবাদন করিতে করিতে শিবসকাশে সমুপস্থিত হইলেন। মহাদেব সতীবিরহে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় বিলাপ করিতেছিলেন, নারদের সুধাসিক্ত সঙ্গীতে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিলেন 'বৎস নারদ! আমার বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য এতক্ষণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-

* শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য দশ আনা।

রূপা জগন্ময়ী সতীকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গীত শ্রবণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি এবং পুনরায় সতীকে আমার সম্মুখে বিরাজমানা দেখিতেছি।' নারদ এই সংবাদে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিল 'প্রভো! আমিও মাতৃরূপা স্নেহময়ী সতীকে দর্শন করিব'। নারদ সতীদর্শনাশায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন,

'কহ ত্রিপুরারি কোথা গেলে তাঁরি
 দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ মনের মতন
 সাধনে আবার পুজিব॥'

"তথন ভক্তবৎসল মহাদেব সতীপ্রদর্শন দ্বারা নারদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থে সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিলেন। অমনি

'মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল॥
বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীমজটা আকাশেতে উঠিল'॥

দেখিতে দেখিতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গিরি, নদী, বৃক্ষ, লতা সমস্তই একে একে অদৃশ্য হইল। গ্রহ, নক্ষত্র, প্রভৃতি সমস্ত তিরোহিত হইল। বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তু এইরূপে শিবদেহে প্রবিষ্ট হইলে, মহাদেব, মায়াবলে সম্মুখে এক মহাকাশ সৃজন করিলেন। এই নীলবর্ণ মহাকাশের উপর দেখিতে দেখিতে এক রাশিচক্র স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ রাশিচক্র দশকক্ষে বিভক্ত হইল। এবং তথন দেখা গেল যে ঐ রাশিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী ভিন্নভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

নারদ দূর হইতে দেবীর দশমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দূর হইতে দেখাতে তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। তিনি বলিলেন, 'দেব যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে নিকটে গিয়া এই দশমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি।' নারদ বলিলেন,—

'কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা
দেখিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা'॥

"তথন ভক্তবৎসল মহাদেব কৈলাস পর্ব্বত সহিত নারদকে পূর্ব্বোক্ত রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থাপিত করাইলেন। বালকস্বভাব নারদ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, 'আমি আরও নিকটে যাইয়া দেখিব' মহাদেব এবার নারদের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, তুমি এখান হইতেই সমস্ত দেখিতে পাইবে'। "তথন নারদ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, দশ কক্ষে দশ মহাবিদ্যার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যার দশ প্রকার লীলা দেখিয়া নারদ আনন্দে বিভোর হইয়া পুনরায় বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও সেই গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর পুনরপি বৃহদাকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর

হইতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু পুনরায় বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বচক্রস্থ দেবীর দশটি মূর্ত্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া গৌরীরূপ ধারণ করিল। তখন হরগৌরী, একাঙ্গ হইয়া, কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন"। ৫৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে এতগুলি বর্ণনাবহুল ঘটনার সমাবেশ হেম বাবুর অসাধারণ লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষালাভ করিব? এই উপাখ্যান দ্বারা আমাদের জ্ঞান, নীতি বা সুখ কিছুমাত্র উন্নত হইবে কি না? কেহ হয় ত বলিবেন, কবিতা হইতে এরূপ লাভের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। কবিতা কবি-হৃদয়ের ভাবোদ্গার, ইহাতে লাভালাভ বিবেচনা করা অবিধেয়। বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, আকাশে চন্দ্র উদিত হয়, দেখিয়া সুখী হই, এই পর্য্যন্ত, ইহাতে আবার লাভালাভ বিবেচনা করিব কি? কিন্তু লাভালাভ বিবেচনা করি বা না করি, লাভালাভ সর্ব্বদাই সর্ব্বকার্য্যে সঙ্ঘটিত হইতেছে। যিনি বিবেচক, তিনি কতটুকু লাভ, কতটুকু অলাভ, পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারিত করেন। আর যিনি স্থূলদর্শী তিনি লাভালাভের পরিমাণ নির্দ্ধারণে অক্ষম। ফলতঃ অন্য অন্য বিষয়ে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থাপন করা যেমন যুক্তিসঙ্গত, কবিতাতেও সেইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করা তেমনই বিজ্ঞান-সম্মত। লাভালাভ বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা অধম, মধ্যম ও উত্তম। যে কবিতায় মনুষ্যসমাজের জ্ঞান, নীতি বা সুখ ব্যাহত হয়, তাহাকে অধম কবিতা বলা যাইতে পারে; যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ, এ তিনের একটিরও কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি না হয়, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে পারে। আর যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ পরিপুষ্ট, পরিমার্জ্জিত বা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যদি কবিতার এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায়, তাহা হইলে হেমবাবুর কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

হেম বাবু একস্থলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"সুখ কি জীবিতমানে? কিবা অথ নির্ব্বাণে?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমল বিধাতার
মানস হতে কি এ মলিনতা রচনা?"

এই প্রশ্নই অন্য এক স্থলে স্বতন্ত্র ভাষায় জিজ্ঞাসিত হইতেছে;—

"উৎকট ইহ লীলা, তাঁহারে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব, শিব! আছিলেন এ ভবে?
জীব দুঃখ তবে কি গো! অনাদ্যারি রচনা?
অদম্য তবে কি দেব! পরাণীর যাতনা?
জগৎসৃজনলীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে?
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে!"

'অশুভ সৃজন কার?' এই প্রশ্নটিকে দশমহাবিদ্যার মূল ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ

করা যাইতে পারে। এই প্রশ্নটির উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত "দশমহাবিদ্যা" দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অগ্রে প্রশ্নটি কিরূপ গুরুতর তাহার মীমাংসা করা যাউক, পরে ইহার উত্তর কি তাহারও নির্দ্ধারণ করা যাইবে।

'অশুভ সৃজন কার?' তুমি আমি সকলেই, কেহ বা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহ বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, আপনাকে আপনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। উদ্যমশীল সাহসী যুবক সংসারের কুটিলস্রোতে এক একটি সৎপ্রবৃত্তি, এক একটি সদাশা বিসর্জ্জন দেয়, আর কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে, 'অশুভ সৃজন কার?' সদনুষ্ঠায়ী সদনুষ্ঠানের চারিদিকে সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে 'অশুভ সৃজন কার?' ধার্ম্মিক সহস্র চেষ্টাতেও ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করতঃ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে "অশুভ সৃজন কার?" বিধবা মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীরা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে—'অশুভ সৃজন কার?' আর যিনি জ্ঞানী তিনিও পরদুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করেন—'অশুভ সৃজন কার?'

আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তরও দিতেছি। কেহ বলিতেছি—'অশুভ সংসার নিয়ম'। কেহ বলিতেছি—'অশুভ ঈশ্বর-লীলা'। কেহ বলিতেছি—'অশুভ শয়তানের বা আহ্রিমানের দুষ্টতার ফল'। কেহ বলিতেছি—'অশুভ গ্রহবৈগুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়।' দেখা যাউক 'দশমহাবিদ্যা' এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

কবি বলিতেছেন—

"না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ, নহে জীবলীলা
মোচন আছে রে আপদে।
পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাণ্ডারে
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে, বাঁধা দশপুরী
ক্রমে জীব পূর্ণকামনা।
শোক দুঃখ তাপ, সকলি দমন
এমনি বিধানে যোজনা॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে
অনন্ত জীবিত মণ্ডলী॥"

অর্থাৎ—"এই যে দুঃখরাশি অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ, এ অশুভ চিরদিন থাকিবে না। এক একটি করিয়া বিবর্ত্তের (Evolution) স্বাভাবিক নিয়মে এই অশুভমালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। শোক, দুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়া এক একটি করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইবে। এবং সর্ব্বশেষে এই দুঃখময় জগতেই

মনুষ্য 'পূর্ণসুখ' দেখিতে পারিবে।" যে কবি আশার এই মোহনস্বরে পাঠকদিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা শোক-পীড়িত, দুঃখাহত, বা তাপদিগ্ধ তাঁহারাও এই সান্ত্বনাময় কাব্যের গ্রন্থকারকে একান্তচিত্তে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

কবি যে শুদ্ধ আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি আমাদের গন্তব্য পথেরও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন—

"লক্ষ্য করি তারি (চরম শুভের) পথ,চালা নিজ মনোরথ

জীবজন্মে ভয় কিরে? জগদম্বা জননী।"

অর্থাৎ "মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! আকাশে বিদ্যুৎ ক্রূর হাস্য করিতেছে; করুক, ভীত হইওনা। শরীরে অগণিত বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতেছে; হউক, তাহাতেও বিচলিত হইওনা। যাহাদিগকে লইয়া তোমার সংসার-বিপণি সাজাইয়াছিলে তাহারা কোথায় গেল আর ফিরিল না; হউক, তাহাতেও বিষণ্ণ হইও না। সেই চরম শুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। জগদম্বা এক্ষণে তোমাকে বিবিধ তাড়না দিতেছেন; দিউন তাহার জন্যও বিলাপ করিওনা। কারণ ইহা নিশ্চিত জানিও জগন্ময়ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তোমার সর্ব্বদুঃখ হরণ করিবেন।" যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার দুঃখে শোকে এই জপমালা স্মরণ করিতে পারিবে। দুঃখ শোকে তাহার কিছুই কষ্ট হইবে না। কবিও একস্থলে ইহার আভাস দিয়াছেন;— তিনি বলিয়াছেন…" হের দশরূপ (দশরূপা দশমহাবিদ্যা)

ভবার্ণবে পাবে কূল।"

আমাদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কবি আরও এক স্থলে বলিয়াছেন।

"ধরম ধরম পর, আপন ক্রিয়াকর,

সংযত করি মন, তাহাদেরি নিয়মে"

অর্থাৎ "যে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছ, সে সেই কর্ম্ম অনুসারে আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। তুমি তোমার কার্য্য কর। জগতের দুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ বা নিরাশাস হইও না। সদা 'সত্যপথে রাখি মন' নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর।"

পূর্ব্বোক্ত সকল কথাগুলি একত্রিত করিলে, হেম বাবুর 'দশ মহাবিদ্যায়' কি শিক্ষা করা যায়? হেম বাবু বলেন "মনুষ্য! দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। বর্ত্তমান অশুভ চিরস্থায়ি নহে। ঈশ্বর-কৃপায় এ অশুভ নিরাকৃত হইয়া, ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। যাহাতে এই চরম শুভ জগতে আসিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। বর্ত্তমান সময়ে, সত্যপথে থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য অনুসারে আপন আপন জীবন নিয়মিত কর"। ভগবদ্গীতা হইতেও এই শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন;—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজস্ব নৈবং পাপং অবাপ্স্যসি"॥

"অর্থাৎ সুখ, দুঃখ,লাভ, অলাভ,জয়, পরাজয়,প্রভৃতির বিচার এক্ষণে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে তোমার প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হইবে না।" হেম বাবুর শিক্ষা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পরাধীন দেশে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই নৈরাশ্যের অন্ধকূপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। রুদ্ধবেগা নদীর ন্যায়,পরাধীন ব্যক্তির হৃদ্গত যাবতীয় আশা, হৃদয়েই পর্য্যবসিত হয়। নৈরাশ্যপ্রবণ পরাধীন দেশে যিনি হেম বাবুর ন্যায় আশার সঞ্জীবন সঙ্গীত শ্রবণ করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিষ্কৃত করেন। এস্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, যে কবি ভারত-বিলাপ ও ভারত-সঙ্গীত লিখিয়া আমাদের নিরাশহৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই কবিই "দশ মহাবিদ্যা" লিখিয়া আমাদের নৈরাশ্যের দমন করিতেছেন। সংক্ষেপতঃ লাভালাভ বিবেচনায় আমরা হেম বাবুর দশমহাবিদ্যাকে উত্তম শ্রেণীভুক্ত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে "দশমহাবিদ্যা" পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে।

কবি বলিতেছেন অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরাকৃত হইয়া অশুভ স্থলে শুভ আসিবে। কিন্তু এ কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ ইতিহাস। পৃথিবীতে কিরূপে অল্পে অল্পে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় কিরূপে অল্পে অল্পে অশুভ স্থলে শুভ আনীত হইতেছে। কবি বলিতেছেন যে, সংসার-পটের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাইবে, মনুষ্য মনুষ্যকে আত্মরক্ষার্থ বিনাশ করিতেছে। সে অঙ্কের মূলমন্ত্র "সংহার"। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী, নরমুণ্ডমালে বিভূষিত হইয়া অহরহঃ নর বিনাশ করিতেছেন। সেখানে, যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত তাহাই পদদলিত হইতেছে। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী বিভীষণা, রক্তাক্তবদনা, উলঙ্গা, লোহিতনয়না, কৃষ্ণবরণা।

আবার সংসার-পটের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তথায় অশুভ কথঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে। দেখিবে তথায় সভ্যতার এই প্রথম উন্মেষ হইতেছে। প্রকৃতিরূপা দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোলরসনা, অট্টহাসিনী। কিন্তু এ অঙ্কে দেবী উলঙ্গিনী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের চতুর্দ্দিকে এখনও চিতা জ্বলিতেছে। কিন্তু ঐ চিতার মধ্যেই প্রস্ফুটিত পদ্মও দেখা যাইতেছে। দেবী অসভ্য মনুষ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অঙ্কুর প্ররোপিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পূর্ব্বে পর্ব্বতগহ্বরে, বৃক্ষকোটরে বা ভূগর্ভে বাস করিত। এক্ষণে তাহারা জ্ঞানবলে খড়্গ কর্ত্তরী লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসভূমি প্রস্তুত করিতেছে।

সংসার-পটের তৃতীয় অঙ্কে দেবী মনু-

ষ্যকে সভ্যতার পথে আরও অগ্রসর করাইতেছেন। সেখানে দেবী নরনারীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম প্রথম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়-প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

কবি দেখাইতেছেন সংসার-পটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর আর সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। তিনি সেখানে মনুষ্যের মনে অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিণয়-প্রথা প্রচলিত ছিল না, ততদিন অপত্যস্নেহের প্রাবল্য অনুভূত হইত না। কিন্তু এখন নরনারী সন্তান সন্ততির প্রতি প্রচুরস্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

সংসারপটের পঞ্চম অঙ্কে মনুষ্যের মনে প্রথম ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদিত হইতেছে। সংসারপটের ষষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব অঙ্কে মনুষ্য প্রত্যুপকার স্বরূপ পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসারপটের সপ্তম অঙ্কে মনুষ্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রমলাঘব করিতেছে। সংসারপটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য-অসুরকে নিহত করিতেছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভ্যতার বিকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিদ্র্যকে পরাভূত করিতে শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে সভ্যদেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

সংসারপটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, এবং পাপের জন্য অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসারপটের দশম অঙ্কে মনুষ্য দুঃখ শোক তাপ প্রভৃতি সমস্ত পরাভব করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার মধুর শাসনে পরস্পর দয়ার অমৃতসিঞ্চনে সর্ব্ব প্রকার সুখভোগ করিতেছে।

কবি যে সভ্যতার এই দশ মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কি কেবল কবিকল্পনা? সভ্যতার এই চিত্র যে কল্পনা-বহুল, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, কল্পনা-বাহুল্য সত্ত্বেও এই বর্ণনার মূলভিত্তি ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি বিজ্ঞানের চক্ষে ইতিহাস আলোচনা করেন, তিনি জানেন যে সভ্যতার পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ মূর্ত্তিগুলিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজিও বিরাজ করিতেছে। ফিজি দ্বীপের নরখাদক অধিবাসী যে সভ্যতার সংহারময়ীর মূর্ত্তির অধীনে বাস করেন, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আর ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন, কনগ্রীভ প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ যে সভ্যতার কমলাত্মিকা মূর্ত্তির অধীনে বাস করেন, ইহাই বা কে না স্বীকার করিবে? হেম বাবু দেবীর দশমূর্ত্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর বিমিশ্রণ সম্পাদন করিয়াছেন।

কিন্তু হেম বাবু দেবীর দশমূর্ত্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা বিষয়ে

কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এক্ষণে তাহারও আলোচনা করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। মহামেঘবরণা, দন্তুরা, নৃমুণ্ডমালিনী কালীর সহিত সভ্যতার সংহারময়ী মূর্ত্তির সংযোজনা, আমাদের বিবেচনায় বড়ই পরিপাটি হইয়াছে। দেবীর তারা মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার জ্ঞানময়ী অবস্থার সংযোজনা মন্দ হয় নাই। কারণ জ্ঞানই মনুষ্যের প্রধান ত্রাণোপায়। দেবীর ষোড়শী মূর্ত্তির সভ্যতার প্রেমময়ী মূর্ত্তির অবস্থার সংযোজনা বড়ই মধুর হইয়াছে। কারণ বয়সের প্রথম উন্মেষেই প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস। ভুবনেশ্বরীর সহিত স্নেহের সংযোগ মন্দ হয় নাই। কারণ, ভুবনেশ্বরী জগন্মাতারূপিণী। কিন্তু ভৈরবীকে কেন ভক্তিবিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা হইল? ধূমাবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতঙ্গী কেন প্রীতিদায়িনী? বগলা কেন দারিদ্র্য-দলনী? ছিন্নমস্তাতে পাপহারিণী মূর্ত্তির কল্পনা সুন্দর হইয়াছে। পাপী পাপাঙ্কুশতাড়নায় আপনার মস্তক আপনি বলি দিতে পারে। দয়াময়ীর সহিত মহালক্ষ্মীর সংহোজনা সুন্দর হইয়াছে। কারণ ধনসূর্য্য হইতে উত্তাপ না প্রাপ্ত হইলে দয়ালতা অঙ্কুরিত হয় না। ইহা দ্বারা দেখা গেল, দুই তিনটি মূর্ত্তি ভিন্ন প্রায় আর সকল গুলিতেই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণনা সম্বন্ধে হেম বাবুর সহিত আমাদের একটু বিবাদ আছে। তিনি কয়েকটি মূর্ত্তি পুরাণোক্ত প্রণালীতে বর্ণন করিয়াছেন। আবার আর কয়েকটি মূর্ত্তি নিজ কল্পনা হইতে আঁকিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আর কয়েকটি মূর্ত্তিতে পুরাণ ও স্বকপোলকল্পনা উভয়ই বিমিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 'ছিন্নমস্তার' রূপ পুরাণানুমোদিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পুরাণের পরিত্যজ্য-অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু 'বগলা' ও 'ষোড়শী' কবি নিজ কল্পনানুসারে সজ্জিত করিয়াছেন। 'মাতঙ্গী' 'ভৈরবী' প্রভৃতি মূর্ত্তিতে কল্পনা ও পুরাণ উভয়ই সম্মিলিত আছে। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন কবি এইরূপে স্বাধীনতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন মূর্ত্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের চরিত্রগত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত ছিল। কয়েক স্থলে মূর্ত্তিগুলির রূপের সহিত, তাহাদের চরিত্রগত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। ধূমাবতীকে শ্রমাতুরা, ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বৃদ্ধা বিধবার রূপে বর্ণনা করা বড় সুন্দর হইয়াছে। এই রূপে ছিন্নমস্তাতে মদনোন্মাদের বর্ণনা বড় উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানময়ী তারাকে লম্বোদরা বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লম্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিংবা জ্ঞানের সহিত পিঙ্গল বর্ণের কি সম্বন্ধ? যিনি স্নেহময়ী তাঁহার হস্তে অঙ্কুশ, অভয় বর প্রভৃতি কেন? ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবীর মস্তকে মাল্য বড় সুন্দর দেখাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্তন রক্তলেপিত কেন? যদি হেমবাবু পৌরাণিকী বর্ণনা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার

সহিত বিবাদ করিতাম না। কিন্তু যখন তিনি মধ্যে মধ্যে কবি-সুলভ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তিগুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেই ভাল হইত।

আমরা 'দশমহাবিদ্যার' প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহার কল্পনা, ভাষা, চরিত্র-বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা হেমবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

১ম—কল্পনা।

পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে 'দশমহাবিদ্যার' রূপ প্রথম কল্পিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশরূপের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঐ দশ রূপের 'দশমহাবিদ্যা' অভিধান তখনও দেওয়া হয় নাই। তদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীর দশমূর্ত্তির নামগুলির সহিত 'দশমহাবিদ্যা'র নামগুলির ঐক্য হয় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ নাম এই—দুর্গা, দশভুজা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী, জগদ্ধাত্রী, কালী, মুক্তকেশী, তারা, ছিন্নমস্তকা, জগদ্গৌরী। শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে দেবী পূর্ব্বোক্ত দশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অসুর বধ করিয়াছিলেন *। ইহার পর কালীকৈবল্যদায়িনী নামক পুস্তকে দেবীর এই দশমূর্ত্তিকে দশমহাবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কালীকৈবল্যদায়িনী বোধ হয় তন্ত্রের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদায়িনী দেবীর দশমূর্ত্তির ভিন্ন আখ্যা দিয়াছেন যথা—"কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা।" কালীকৈবল্যদায়িনী অনুসারেও দেবী অসুরবধার্থ এই দশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও আবার কালীকৈবল্যদায়িনীতে যে সমস্ত অসুরের নাম বর্ণিত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা হয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ছিন্নমস্তা নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদায়িনীতে ছিন্নমস্তা অঘোর নামক অসুর বধ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তারা শুম্ভবধ করিয়াছেন, কালীকৈবল্যদায়িনীতে তারা ঊর্দ্ধশিখ অসুর বধ করিতেছেন। কিন্তু কালীকৈবল্যদায়িনী দশমহাবিদ্যার পূজার যে ক্রম লিখিয়াছেন, আজিও বঙ্গদেশে সেই ক্রম অবলম্বিত হইয়া থাকে। কালীকৈবল্যদায়িনী বলেন

"কার্ত্তিকের অমাবাস্যা স্বাতিঋক্ষ তায়।
মহানিশা মধ্যেতে পূজিবে কালিকায়॥
* * *
তারা পূজা ফাল্গুন মাসেতে নিরূপিত
* * *
আশ্বিনেতে কোজাগর পৌর্ণমাসী তিথি।
মহালক্ষ্মী আরাধের নক্ষত্র রেবতী॥"

ইহা দেখিয়া এইরূপ বোধ হয় যে, যদিও কালীকৈবল্যদায়িনী পৌরাণিক মতের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই মত অনুসারে বঙ্গদেশ সমস্ত পরিচালিত হইত।†

* See Ward's "View of the History, Literature & Religion of the Hindus." P. 79.

† অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে,

কালীকৈবল্যদায়িনীর গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য অন্য কবিরাও এই দশমহাবিদ্যার উল্লেখ, আরাধনা, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে দুই এক মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যার' ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের লেখকেরাও 'দশমহাবিদ্যার' কল্পনায় মোহিত হইয়া উঁহাদের রূপ বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আমাদের জাতিমধ্যে 'দশমহাবিদ্যার' প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বহুকাল হইতেই বিদ্যমান আছে।

ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেল্‌টদিগের ন্যায় ও নরওয়ে সুইডেনবাসী স্কাণ্ডিনাবিয়ানদিগের ন্যায় ভারতীয় হিন্দুরাও অদ্ভুতরসের পক্ষপাতী। এজন্য হিন্দুকবিরাও অনেক সময়ে অদ্ভুতরসের অবতারণা করিয়া থাকেন। শকুন্তলার জন্ম, শকুন্তলার শকুন্তসাহায্যে প্রাণরক্ষা, শকুন্তলার অপ্‌সরা কর্ত্তৃক অপহরণ, মহাদেবের কপোলনিঃসৃতজ্যোতিঃ দ্বারা কামদেবের বিনাশ, মন্দারকুসুমাঘাতে ইন্দুমতীর প্রাণত্যাগ, সমুদ্রমন্থনে ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতির সমুত্থান, কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তাড়কারাক্ষসীবধ ও হরধনুর্ভঙ্গ, কৃষ্ণের পূতনাবধ, কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি অদ্ভুতরস-বহুল নানা চিত্র আমাদের কাব্যে ও পুরাণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দশমহাবিদ্যার আদ্যোপান্ত অদ্ভুতভাব বহুল। এবং বোধ হয় এই জন্যই দশমহাবিদ্যা আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন উভয় দল দ্বারাই এত সমাদৃত হইয়া থাকে। হেম বাবু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাগণের অদ্ভুতত্ব প্রায়শঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারিবে।

কালীকৈবল্যদায়িনীতে ধূমাবতীর বর্ণনা এইরূপ;—

"ধূমারূপে কাত্যায়নী হইল প্রকাশ।
অতি বৃদ্ধা বিধবা পক্কতা কেশপাশ॥
বৃদ্ধকলেবর অতি ক্ষুধায় কাতর।
ধূম্রবর্ণা, বাতাসে দুলিছে পয়োধর॥
কাক-ধ্বজ রথেতে করিয়া আরোহণ।
ভগ্নকটি, বিস্তারিত মলিন বদন॥
বাম হাতে কুলা, ডানি হাত কম্পমান।
কাত্যায়নী নিকটে হৈল বিদ্যমান॥"

ভারতচন্দ্র ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন;—

"দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিল নয়ন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
অতি বৃদ্ধা, বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তার-বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান, আর হস্তে কুলা॥"

হেম বাবু ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন;—

"কাছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে।

বঙ্গদেশের পূজার ক্রম দেখিয়া কালীকৈবল্যদায়িনী তাহা নিজ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন।

দীর্ঘা বিরলরদ শুভ্রবরণচ্ছদ
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে॥
লম্বিত পয়োধরা, ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীবদুঃখ বিনাশে।
শ্রমক্লান্ত প্রাণিক্লেশ ঘুচাইতে রূক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে॥
বিবর্ণা অতি চঞ্চলা, হস্তে স্থাপিত কুলা
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥"

কোন কোন স্থলে হেম বাবু পুরাণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে বর্ণনা-মাধুর্য্যে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাতঙ্গীর-রূপ বর্ণনা করিতেছেন ;—

"রক্তপদ্মাসনা বামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজে খড়্গচর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥"

কালী কৈবল্য দায়িনী মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

"পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবসনা মাতঙ্গী॥
চতুর্ভুজ খড়্গাচর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরা।
ত্রিলোচনী মুক্তকেশী মৃগাঙ্ক-শেখরা॥"

হেম বাবু মাতঙ্গীর এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন:——

"সুচারু মনোহর, হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগণে।
বীণা বাজিছে করে, বাদনে থরে থরে,
কুন্তল দলমল সুন্দর বাদনে॥
কলহংস শোভাসম, শ্বেতমাল্য নিরুপম,
মাতঙ্গী শঙ্খের মালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি[illegible] ভবতলে, সর্ব্বজীব দুঃখদলে,
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদ্মাদলে বসেছে॥"

সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইতেছে, যে কোন২ স্থলে হেমবাবুও পূর্ব্ব কবিকর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন।

হেমবাবু ছিন্নমস্তার রূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

"হের আর ঊর্দ্ধদেশে, মদনোন্মত্তার বেশে,
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে
বিকট উৎকট ফুর্ত্তি ... ..."
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া॥

কালীকৈবল্যদায়িনী ছিন্নমস্তার রূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী করিলা অভয়।
চিন্তানাই সুস্থ হও ক্ষুধা শান্তি* হয়॥
এত বলি নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন।
আপনার বাম করে করিলা ধারণ॥
কণ্ঠ হৈতে তিন ধারা তিনদিকে ধায়।
একধারা ছিন্নমস্তা অতি সুখে খায়॥
দুই ধারা দুই সখি সুখে করে পান।
নিজরক্তে ক্ষুধানল করিল নির্ব্বাণ॥"

এইরূপে হেম বাবু কখনও বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে পরাজিত করিয়াছেন, কখনও বা তাঁহাদের কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শুদ্ধ পুরাণের মধ্যে নিজ কল্পনা কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি নিজে কয়েকটি অদ্ভুতরস-বহুল চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এইরূপ দুই তিনটি চিত্রের উল্লেখ করিতেছি।

---

* দেবী ছিন্নমস্তারূপে ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই।

(ক) যেখানে মহাদেব সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিতেছেন এবং বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একেএকে শিবদেহে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেখানে কবির কল্পনা এক সুন্দর ও অদ্ভুত চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

"শ্বাসরোধ করি ভীম শুষিলেন অচিরে॥
বিশ্ব অঙ্গ লুকাইল মহাকাল শরীরে॥
একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্রতারা রশ্মি মেঘ অভ্রসনে ডুবিল॥
....
স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয়ে ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব অঙ্গে মিশিল॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বাকার ধায়রে।
ঝড়ে যেন অরণ্যেরে পল্লবেতে ছায়রে॥"

(খ) কবি আর একস্থলে সৃষ্টির ও সভ্যতার আদিম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

"হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা,
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী॥
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে॥
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপ মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে॥
অঙ্গহতে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করাল বদনা কালী নৃত্যকরে হুঙ্কারে॥"

(গ) কবি আরএক স্থলে সভ্যতার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

"কেহ নীজ মুণ্ড কাটে জীয়ে পুনু রক্তচাটে
শাঁকিনী রূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া
* ... ...
কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে ছুটিছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি মুখে কি বিকট ভঙ্গিমা।
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া করে করতালি দিয়া
ডাকিনী ধাইছে কত সৃক্কণী রক্তিমা॥
জড় প্রকৃতির ছলে, শিবদেহ পদতলে
নৃমুণ্ডমালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে।
সংহার নিরূপণ বদনেতে বিদারণ
শিশু কর কড়মড়ি চর্ব্বণেতে গিলিছে।

(ঘ) বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেঃ—

"ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বনে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে॥
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিলে পুনু স্রোতধারা তরসে॥
পতঙ্গ, কীট, পশু,পুনু পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে॥
মিলাইল দশরূপ উমারূপ ধরিল।
হরগৌরী রূপে সতী হিমালয়ে উদিল॥"

আমরা এক্ষণে হেম বাবুর ভাষার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

যে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়, তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাষাকে ইংরেজিতে ভাবের প্রতিধ্বনি কহে। নর্ত্তকীর নৃত্য কখন দ্রুত কখন বা ধীর হইয়া থাকে। গ্রের নৃত্যবর্ণনা পাঠ করিলে ঐ বর্ণনার মধ্যেও যেন দ্রুতত্ব ও ধীরত্ব অনুভূত হয়। দ্রুতনৃত্য গ্রে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন

"Now pursuing, now retreating
Now in circling troops they meet."

আবার ধীর নৃত্য বর্ণনাকালে কবি বর্ণনা করিতেছেন—

"Slow melting strains their queen's approach declare."

এইরূপ ভাষা বাস্তবিকই ভাবের প্রতিধ্বনি। হেম বাবুর ভাষা অনেক স্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া অনুভূত হয়। নারদ বীণা বাদন করিতেছেন, বীণা কখনও বা পঞ্চমে নাবিতেছে, কখনও বা সপ্তমে উঠিতেছে। যখন নারদ বীণা পঞ্চমে নাবাইতেছেন, তখন কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নাবিতেছে. যথা ;—

'মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে ॥
রুণু রুণু নিক্বণ কোমলে মিলিয়া।'

আবার নারদের বীণা যখন সপ্তমে উঠিতেছে তখন কবির ভাষাও সেই সপ্তম তানের অনুকরণ করিতেছে ;—

'ক্রমে গুরু গর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া।'

যখন আনন্দের কথা বলা হইতেছে তখন কবির ভাষাতেও যেন সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে,—

'আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল ॥'

যখন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা করা হইতেছে, তখন কবির ভাষাতেও সে ধীরগতির ভঙ্গিমা দেখা যাইতেছে।

'মৃদু হাসি রঞ্জিল মহাদেব বদনে।
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে ॥
ধীর মৃদুল গতি কৈলাস চলিল।
মধ্যগগন ভাষে শিবপুরী বসিল ॥'

এই কয় পংক্তি পড়িলে মনে হয় যেন কৈলাস পর্ব্বত ধীরে ধীরে তোমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তখন হেমবাবুর ভাষার মধ্যেও সেই ভয়ানক ও বীভৎসত্বের ছায়া পড়িয়াছে।

" শুক্তি শম্বুক শাঁখ, মুখব্যাদন ফাঁক,
রক্ত জল বিদেহ লেহি লেহি চলিছে।
পন্নগ সুভীষণ ফটা প্রসারণ
উৎকট গর্জ্জন তরঙ্গে দুলিছে ॥
কূর্ম্ম কমঠি কূট উর্ম্মিতে লট পট
লোহিত তৃষাতুর সংপুট খুলিছে ॥"

এইরূপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখা যাইতে পারিবে।

এক্ষণে চরিত্রবিন্যাস সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিয়া আমরা এ সমালোচনার উপসংহার করিব। আমাদের বিবেচনায় দশমহাবিদ্যার প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে শিবের শিবত্ব সংরক্ষিত হয় নাই। যিনি দেবাদি দেব জগদ্গুরু তিনি স্ত্রীশোকে অধীর হইয়া,—

'ছুড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতি বিহীন কৈলা কায়া।'

এখানে মহাদেবকে নিতান্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাব্যাংশে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি দশমহাবিদ্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। বঙ্গভাষায় এরূপ হৃদয়বিদারক সুমধুর বিলাপ আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।—

"হরষ সুধাসম হৃদয় উচাটিত
দম্পতী পরণয় বাসে।
কত সুখে যাপন অহরহ বৎসর
দক্ষদুহিতা ছিল পাশে॥
....
কত বিধ খেলন মুরতি প্রকটন
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা।
থাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অঙ্কন
সে সব বিলসিত লীলা॥
সেই যোগ সাধন, কেনই ঘুচাইলে
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কেনই তেয়াগিলি কেনই সমাপিলি
সে সাধ এতদিন পরে॥"

এই সমস্ত কবিতার এক একটি পদ বঙ্গ সাহিত্যরূপ নুতন কাননে একএকটি প্রস্ফুটিত পুষ্প কিন্তু আমাদের মনে হয়, যেন দেবাদিদেব জগৎস্রষ্টা মহাদেবের মুখে এ কথাগুলি তাদৃশ শোভা পাইতেছে না। আমরা স্বীকার করি মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, শিবের যে অবমাননা করিয়াছেন, হেমবাবু তাহা হইতে শিবকে অনেক উচ্চে রাখিয়াছেন। কিন্তু শিবকে আরও উচ্চে রাখিলে শিবের সম্মান রক্ষা করা হইত। দেখুন ঐরূপ অবস্থায় কালিদাস শিবকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। কালিদাসে শিব সতীশোকে ক্রন্দন করিতেছেন না। তিনি হৃদয়ের শোক হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া তপোমগ্ন আছেন। দেবদারুতলে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া মহাদেব তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া আছেন। তিনি আজি বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দেহে বদন মণ্ডলে শোকের, বিষাদের বা বিলাপের চিহ্নমাত্র নাই, তিনি ধীর, স্থির ও নিশ্চল।

"অবৃষ্টিসংরম্ভ মিবাম্বু বাহং
অপামিবাধার মনুত্তরঙ্গং
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিষ্কম্প মিব প্রদীপং।"

মহাদেব অবৃষ্টি সংরম্ভ মেঘের ন্যায় তরঙ্গ বিহীন সমুদ্রের ন্যায়, নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়। কালিদাস এ স্থলে শোকের বর্ণনা করিয়াও শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যদি হেম বাবু পুরাণোক্ত শিববিলাপ বর্ণনা না করিয়া কালিদাসের শিবচিত্র আমাদের সম্মুখে তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে 'দশমহাবিদ্যা' আরও মহামুল্য ও নিরবদ্য হইত।

আমরা নিরপেক্ষ ভাবে যথাশক্তি হেম বাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করিলাম। যদি কেহ আমাদের সমালোচনা এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের সহিত স্বীকার করিবেন, যে দশমহাবিদ্যা বঙ্গভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ন। আমরা আশা করি, যে বঙ্গবাসী এ উজ্জ্বল রত্নের যথোচিত সমাদর করিয়া চিরদিন ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, যে 'দশমহাবিদ্যা' সাধারণ পাঠকের নিকট সমাদৃত হইতেছে না। আমরা এ সংবাদে

দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বিস্মিত হই নাই। কারণ সাধারণ পাঠকের মনস্তুষ্টি হয় এরূপ কথা 'দশমহাবিদ্যায়' নাই। দেখুন ইহাতে 'প্রিয়তমে' নাই, 'প্রাণনাথ' নাই, 'কুটিল কটাক্ষ' নাই, 'মধুর হাসি নাই, 'পদ্মানন' নাই, 'বিধুমুখী' নাই। বলিতে কি ইহাতে 'কোকিল ঝঙ্কার' নাই, 'ভ্রমরগুঞ্জন' নাই, 'বসন্ত সমীরণ' নাই, 'বিবাহ' নাই, 'পূর্ব্বরাগ' নাই, 'মিলন' নাই, 'বিচ্ছেদ' নাই। আবার অন্যদিকে ইহাতে 'বীররস' নাই, 'ভারত-উদ্ধার' নাই, 'দেশ উদ্ধার' নাই। দুঃখের কথা বলিব কি, 'পরাধীনতার দুর্ভেদ্য নিগড়' নাই। ইহাতে আছে কি যে সাধারণ বঙ্গবাসী পড়িয়া সুখী হইতে পারে? দেখদেখি হেম বাবু আগে কেমন লিখিতেন।

'অই শশী অইখানে, এই স্থানে দুই জনে,
কতবার মনে মনে কত আশা করেছি
প্রমদার মুখচন্দ্র কতবার হেরেছি।'

দেখদেখি কেমন মধুর ভাব, কেমন সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সকল সরস কবিতা না লিখিয়া হেম বাবু লিখিয়াছেন কি না,

"কূর্ম্মকমটীকূট উর্ম্মিতে লটপট"

এসকল কথা কে পড়ে? যদি উচ্চদরের কবিতা পড়িতে হয় ইংরেজীতে পড়িব —"Ruin seize thee, ruthless King." পড়িব, "Hereditary bondsmen know ye not" পড়িব। বাঙ্গালায় পড়িতে হইলে সরস জিনিশ পড়িব। যাহা অর্দ্ধ নিদ্রিত অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় পড়া যায় এমন জিনিশ পড়িব। কে তোমার কালীতারা লইয়া মাথা বকাবকি করে?

ঠিক্ কথা! ভাই বঙ্গবাসি! খবরদার এসব বধখৎ পড়িও না। হেমচন্দ্র অধঃপাতে যাউক। তুমি 'কোমলকুসুম', 'কুসুমকোরক', 'নবনলিনী', 'নর্ম্মবিলাসিনী', 'কমকামিনী' প্রভৃতি যে সকল নবেল ও কবিতা নিত্য নিত্য বাহির হইতেছে তাহা পাঠ কর, আর যদি সময় পাও তবে একটু একটু লণ্ডন রহস্য পড়িও!

আর কবিবর হেমচন্দ্র! যদি আপনি সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে চান, তাহা হইলে আর এরূপ পুস্তক লিখিবেন না। কিন্তু যদি বঙ্গভাষাকে জগন্মান্যা ও জগৎপূজ্যা করিতে চান, যদি নিজে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিতে চান, যদি কবি-জীবন সার্থক করিতে চান, যদি প্রকৃত দেশহিতৈষীর হৃদয়ের পূজা চান, তাহা হইলে এইরূপ কবিতা লিখিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগকে সবলে উর্দ্ধে উঠাইয়া নিজের ও দেশের অতুল মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন। যদি বঙ্গের ক্ষমতাবান্ লেখকেরা ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠার নিকৃষ্ট প্রলোভনে, সাধারণ রুচির পঙ্কিল প্রবাহে প্রবাহিত না হইয়া, এইরূপ ক্ষমতার এইরূপ প্রয়োগে অন্ততঃ দুইটি পাঠকেরও রুচি পরিবর্ত্ত করিতে সমর্থ হন,—সাতকোটি বাঙ্গালির মধ্যে অন্ততঃ দুইটিকেও জীবনগত কর্ত্তব্যের দুর্গমবর্ত্মে পাদচারণা করিতে প্ররোচিত করেন, তাহা হইলেই বলিতে পারি তাঁহাদের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে।

কয়েকটি দোহাঁ।

অলীপতঙ্গ মৃগ মীন গজ্
ইয়াঁকে একহি আঁচ।
তুলসী ওয়াকো ক্যাগত্
যাকো পিছে পাঁচ।

গন্ধলোভে ভ্রমর বিনষ্ট হয়। রূপলোভে পতঙ্গ বিনষ্ট হয়। শব্দলোভে মৃগ বিনষ্ট হয়। খাদ্যলোভে মৎস্য বিনষ্ট হয়। স্পর্শলোভে হস্তী বিনষ্ট হয়। তুলসীদাস কহেন—যাহাদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পাঁচ বিষয়েই লোভ তাহাদের (অর্থাৎ মনুষ্যের) অবস্থা কি শোচনীয়।

হস্তী চলে বাজার মে
কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুন্‌কে দুর্ভাব নহি
যঁও নিন্দে সংসার॥

হস্তী যখন বাজার দিয়া চলিয়া যায় তখন হাজার হাজার কুকুর খেউ খেউ করে, কিন্তু হস্তী কুকুরের শব্দে কর্ণপাত করে না। সেইরূপ সংসারের নিন্দায় সাধুগণ বিচলিত হন না।

পণ্ডিত ও মশাল্‌চী
ইন্‌কি গত্ কহা না যায়।
পর্‌কে দিয়া দেখায় কে
আপ আঁধারে যায়॥

পণ্ডিত ও মশালচী ইহাঁদের উভয়েরই অবস্থা শোচনীয় ইহাঁরা অন্যকে প্রদীপ দেখাইয়া আপনারা অন্ধকারে গমন করেন।

চম্পায় হেঁর্ তিন গুণ
রঙ্ রূপ আউর বাস।
এক অবগুণ হেয় যো
ভমরা না যাওয়ে পাশ্॥

চম্পক পুষ্পের তিন গুণ বর্ণ, রূপ ও গন্ধ। কিন্তু ইহাঁর এক দোষ এই যে ইহার নিকট ভ্রমর যায় না।

যাঁহা কাম্ তাঁহা রাম নহি
যাঁহা রাম্ তাঁহা নহি কাম।
দোনো এক্ নাহি মিলে
রবি রজনী এক ঠাম্॥

যেখানে ভোগাভিলাষ সেখানে ঈশ্বরসেবা হয় না। আর যেখানে ঈশ্বরসেবা, সেখানে ভোগাভিলাষ থাকে না। যেমন দিবারাত্রি একত্রে থাকিতে পারে না, সেই রূপ ঈশ্বরসেবা ও ভোগাভিলাষ একত্রে থাকে না।

এইরূপ ও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনেক তুলসীদাসী দোহাঁ সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইয়া বটতলায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। পাঠকগণ "বেণীমাধব দে এবং কোম্পানির" নিকট তত্ত্ব করিলে অতি অল্প মূল্যে এই পুস্তক পাইতে পারিবেন।

রাজপুতানার ইতিহাস।

(৩৩৩ পৃষ্ঠার পর।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৭৩৭ সংবৎসরে (খৃঃ ১৬৮১) জয়সিংহ রাণাপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এস্থলে জয়সিংহের জন্মসময়ের একটি ঘটনার বিবৃতি করা যাইতেছে ;—রাণাদ্রিগের চিরপ্রচলিত রীতি এই যে, নবপ্রসূত পুত্রের বাহুতে পিতা স্বয়ং অমর নামক এক প্রকার তৃণ বাঁধিয়া দিয়া থাকেন। কতিপয় ঘটিকা মধ্যে রাজসিংহের দুই মহিষীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। জ্যেষ্ঠ ভীমসিংহ, কনিষ্ঠ জয়সিংহ। রাজসিংহ ভ্রমক্রমে কনিষ্ঠ জয়সিংহের বাহুতেই তৃণ বাঁধিয়া দিলেন। অনেকে ইহাকে ভ্রম নির্দ্দেশ না করিয়া কহিয়া থাকেন, জয়সিংহের জননীর প্রতি রাজসিংহের যথেষ্ট প্রীতি ছিল, সেই জন্য ভ্রমের ভাণ করিয়া কৌশলে জয়সিংহকে উত্তরাধিকারিত্বে বরণ করতঃ প্রিয়তমা মহিষীর মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। শিশুদ্বয় যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলে একদা রাজসিংহ ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কা দূর করণাভিলাষে জ্যেষ্ঠপুত্র ভীমসিংহের হস্তে নিষ্কোষিত তরবারী প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি ভ্রাতার জীবনসংহার করিয়া সিংহাসন প্রাপ্তির পথ নিরুদ্বেগ কর। এই প্রস্তাবে অনিষ্টাপাতের পরিবর্ত্তে আশাতীত শুভফল ফলিল। জ্যেষ্ঠ কুমার শপথ পূর্ব্বক সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “কনিষ্ঠ সিংহাসন লাভ করুন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি ; আমি এখনি উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ; আমি যদি রাজধানীর সীমার মধ্যে আর জল গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমি আপনার পুত্রবাচ্য হইব না।” এই কথা কহিয়া ভীমসিংহ স্বগণসমভিব্যাহারে অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য স্থানান্তর যাত্রা করিলেন। অসহনীয় তপনতাপে ক্লান্ত হইয়া ভীমসিংহ নগরসীমা সন্নিহিত পবিত্র ডুম্বুর বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া জন্মভূমির প্রতি শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাকে পিপাসাতুর দেখিয়া ভৃত্য রৌপ্যপানপাত্রে নির্ঝরবারি আনিয়া প্রদান করিল ; ভীম তাহা পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল ; তৎক্ষণাৎ পানপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি বাহাদুর সাহের সমীপে উপনীত হইয়া সার্দ্ধত্রিসহস্র অশ্বের অধিনায়কত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং তাঁহার উপযোগী ব্যয় সংকুলান জন্য দ্বিপঞ্চাশৎ সংখ্যক গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন।

অনধিক কাল মধ্যেই তিনি সম্রাটসেনাপতির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া লোকলীলা সংবরণ করিলেন।

রাণাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই জয়সিংহ সম্রাট্ কুমার আজিম ও দেল্হর খাঁয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় আরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই শুভ সমিতি উপলক্ষে মহারাণা দশ সহস্র অশ্বারোহী ও চল্লিশ সহস্র পদাতি পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও ষষ্টিসহস্র লোক এই ব্যাপার দর্শনে আগমন করিয়াছিল। এই সন্ধিসূত্রে আজিম স্বয়ং সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আকবরের বিদ্রোহিতায় সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া রাণার কিছু অর্থদণ্ড এবং তিনটি প্রদেশ হস্তবহির্ভূত হইল। তাঁহার শিবির ও পতাকার লোহিতবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবার আদেশ হইল। ভবিষ্যতে রাণা উহা পুনর্ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারের প্রতিভূ স্বরূপে দেল্হরের পুত্রেরা আজিমের নিকট অবস্থিত হইলেন। দেল্হর রাণাকে এই রূপ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ;— "তোমার সামন্তবর্গ অসভ্য, তোমার নিরাপদের জন্য আমার পুত্রেরা প্রতিভূ রহিয়াছে,যদি তাহাদের জীবন বিনিময়ে তোমাকে পূর্ব্বের মত সম্মানার্হ পদে পুনঃস্থাপিত করিতে পারি,তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানিব, কারণ তোমার পিতার সহিত আমার অত্যন্ত সৌহার্দ্য ছিল।"

জয়সিংহ পঞ্চদশ ক্রোশ আয়ত একটি সরোবর খনন করিয়া তাহার নাম জয়সমুদ্র রাখেন। ইহারই তীরে প্রিয়তমা মহিষী প্রমর বংশীয় রাজপুত্রী কমলা দেবীর প্রাসাদ প্রস্তুত করেন। জয়সিংহের শেষ কাল সুখ সৌভাগ্যে অতিবাহিত হয় নাই। পুত্র অমর সিংহের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। জয়সিংহ সতত কমলাদেবীর সহবাসসুখে জয়সমুদ্র তীরে বাস করিতেন ; কুমার অমরসিংহ পঞ্চোলী মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রাজধানীতে থাকিতেন। মন্ত্রীর সহিত কুমারের প্রণয় ভঙ্গ হওয়ায় কোন বিশেষ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা করিয়া জয়সিংহ উদয়পুরে আগমন করিলেন। অমরসিংহ মাতুলালয় বুঁদী প্রদেশে পলায়ন করিয়া তত্রত্য হরবংশীয় সামন্তবর্গের প্ররোচনায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এই গৃহবিবাদ নিবারণের উদ্দেশে রাণা গডবর প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য গানোরা সামন্তকে পুত্র সমীপে প্রেরণ করিলেন। ওদিকে অমরসিংহ অধিকাংশ সামন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া কমলমেরুর ধনাগার হস্তগত করিতে উপস্থিত হইলেন কিন্তু তত্রত্য দেপ্রা শাসনকর্ত্তার কৌশলে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি শান্তি সংস্থাপন প্রস্তাবে সম্মত হইলে একলিঙ্গের মন্দিরে পিতাপুত্রে সন্ধি হইল। তাহাতে ইহা স্থির হইল যে, রাণা রাজধানীতে অবস্থিতি করিবেন, তাঁহার মৃত্যুকালের পূর্ব্বে কুমার অমরসিংহ রাজধানী প্রবেশ করিবেন না। জয়সিংহ যৌবন সময়ে যেরূপ অধ্যবসায়শীল ও সাহস সম্পন্ন ছিলেন,ঘূর্ণিত বয়সে

তাঁহাতে তাহার কিছুই ছিল না। জয়সমুদ্ররূপ কীর্ত্তি না থাকিলে তিনি ইতিবৃত্তে কোন মতে পরিচিত হইতে পারিতেন না।

১৭৫৬ সংবতে (খৃঃ ১৭০০) অমরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রতাপ-পুত্র অমর হইতে এই নামটি রাজস্থানে অতি পবিত্র ও পূজনীয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অমরসিংহ পিতৃবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রজালোকে কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল, নতুবা তিনি মোগল সাম্রাজ্য পতন সাধন করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন, আরঙ্গজেবের পুত্রগণ পরস্পরের বিদ্বেষ করিতেছে। যাহা হউক, মোগলসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সাহ আলমের সহিত রাণা অমরসিংহ গোপনে এক সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকটিত হইতেছে ;—

"এই সন্ধিপত্রে প্রকৃতিপুঞ্জের সুখোদ্দেশে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় তুমি প্রস্তাব করিলে এবং আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম ; জগদীশ্বরের কৃপায় সে গুলি বলবৎ থাকুক।

"১ম। সাহ জেহানের সময় চিতোর নগর যে ভাবে ছিল, তাহার পুনঃস্থাপন।

"২য়। গোহত্যা নিবারণ।

"৩য়। সাহ জেহানের সময়ের প্রদেশ গুলি পুনঃ-প্রদান।

"৪র্থ। স্বর্গবাসী মহাত্মা আকবরের সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে যেরূপ স্বাধীনতা ছিল, সেইরূপ থাকিবে।

"৫ম। তোমার দ্বারা যে পদচ্যুত হইবে, সে সম্রাট্ সমীপে কোন প্রকার প্রসাদ লাভ করিতে পারিবে না।

"৬ষ্ঠ। দক্ষিণাপথে রাজপুত সৈন্যের সহায়তা করিবার নিষেধ।"

এই সময়ে সাহ আলম সিন্ধুর পশ্চিমস্থিত জনপদসমূহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তদুপলক্ষে বহু মিবারসেনা তাঁহার সহকারিত্ব করিত। তাহারা সুক্তোৎ সামন্তের অধিনায়কত্বে বীরত্ব-পরিচায়ক বিবিধ সমর কার্য্য সমাধা করিয়াছিল।

এই সময়ের ভারতেতিহাস যাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মোগল রাজ্যের পতন ও ব্রিটিশ রাজ্যের উন্নতির ক্রম অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। আরঙ্গজেব রাজপুতগণকে পদে পদে অপমানিত করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়াছিলেন। মহামনা আকবর বহুযত্নে যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আরঙ্গজেবের বুদ্ধিদোষে তাহার পতন হইল। রাজপুতদিগের সহিত তাঁহার শোণিত সম্বন্ধ ছিল। রাজ্যের বহু মঙ্গল সম্ভাবনা তাহাতেই নির্ভর করিত ; সম্মান, বৃত্তি, এমন কি কৃতার্থতার পুরস্কার স্বরূপে প্রদেশ দান করাও আরঙ্গজেবের ইচ্ছাধীন ছিল ; তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে রাজপুতসেনা সমবেত হইয়া ভারত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ককেশশের দুরন্ত হিমশিলার মধ্যস্থ আফগানদিগকে বশীভূত করিতে যাইত। এই সকল দুরূহ ব্যাপারের পুরস্কার স্বরূপে তিনি রাজপুতদিগকে

পদে পদে অপমানই করিতেন। সময়ে সময়ে তাহাদিগকে করভারে পীড়িত করিতেন। জেজিয়া-কর সাম্রাজ্য উৎসন্নের এক প্রধান কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমস্ত হিন্দুজাতিকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভাবিতেন, যে ব্যক্তি মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া এই পতিত জীবন লইয়া রহিল, তাহার পক্ষে জেজিয়া কর অতি সামান্য দণ্ডমাত্র।

মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই রাজপুত নির্দ্দয় দুর্জ্জন আরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হইবে ইহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে একটি মাত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে। চর্ম্মোণ্বতী নদীতীরে রামপুর প্রদেশের অধিকারী গোপালরাও রাণাবংশের শাখাবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন। ইনি কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথে সম্রাটের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। এদিকে তাঁহার পুত্র রামপুরে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল। পিতার নিকট অর্থ প্রেরণ না করিয়া সে সমস্তই আত্মসাৎ করিতে লাগিল। গোপাল রাও বিরক্ত হইয়া আরঙ্গজেবের নিকট আবেদন করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত পুত্র দেখিল, এক কৌশল খেলিতে পারিলে সম্রাটও সন্তুষ্ট হইবেন, আপনার অভীষ্টও সিদ্ধ হইবে। সে কৌশল, মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ। স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ মাত্রই দুর্জ্জন সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ সহকারে রামপুর প্রদেশের অধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইল। দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের বিসদৃশ ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত ও ভগ্নচিত্ত হইয়া গোপাল রাও শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামপুর প্রদেশে গমন করিয়া লুপ্ত অধিকার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া রাণার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিষ্ঠুর সম্রাট্ বিদ্রোহাশঙ্কায় মালব প্রদেশে রাণার গতি প্রতীক্ষা করিবার জন্য আজিমকে প্রেরণ করিলেন। রাণা অস্ত্র ধারণ করিলে মালব তাঁহার সহিত মিলিত হইল। ওদিকে নিমাই সিন্ধিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনা সমভিব্যাহারে নর্ম্মদার পরপারস্থ প্রদেশ আক্রমণ করিল। এই অলক্ষিতপূর্ব্ব ব্যাপারে ভীত হইয়া সম্রাট্ আর জয়সিংহকে আজিমের সাহায্যে পাঠাইতে পারিলেন না। ফলতঃ এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা উন্নত হইয়া উঠিল, রাজপুত বীরগণ যার পর নাই বিরক্ত হইল, সম্রাটের পুত্র পৌত্রগণ আপনাদিগের মধ্যে বাদ বিসংবাদ আরম্ভ করিল; এই বিষম গোলযোগ সময়ে ১৭০৭ খৃঃ অব্দের অষ্টাবিংশ জিকদে, অর্দ্ধশতাব্দী কাল বীভৎস-রস সমন্বিত রাজত্বের পর আরঙ্গজেব স্বনাম বিখ্যাত আরঙ্গাবাদ নগরে জীবলীলা সংবরণ করিলেন।

আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম সম্রাট সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সমারোহে ভারত সাম্রাজ্যের মুকুট ধারণ করিলেন। বুঁদেলা বংশীয় দত্তিয়ারাজ রাও দলপৎ এবং হরবংশীয় কোটারাজ রামসিংহ তাঁহার পৃষ্ঠবল ছিলেন। ওদিকে কাবুল হইতে প্রকৃত উত্তরাধিকারী

মৌজিম মিবার ও মাড়োয়ার সামন্ত সম-ভিব্যাহারে আগ্রায় আসিয়া উপনীত হই-লেন। আজিম তাঁহার বিরুদ্ধে আগ্রা যাত্রা করিলেন। জোজোএর সমরে আজিম পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে আজিম, তদীয় পুত্র বেদরবক্ত এবং কোটা ও দত্তিয়া-রাজ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। মৌজিম সাহ আলম বাহাদুর সাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করি-লেন। মৌজিম বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন, অধিকন্তু রাজপুতের সহিত তাঁহার শোণিত সম্বন্ধ ছিল বলিয়া তিনি তাহা-দিগের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ছিলেন। ম-হাত্মা টড্ কহেন, 'যদি সাহ জেহানের পরই সাহ আলম বাহাদুর সাহের আবি-র্ভাব হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এখন পর্য্যন্তও দিল্লির সিংহাসনে মোগলরাজ প্রতিষ্ঠিত দেখা যাইত, এত অল্পদিনে টাই-মুর বংশের অধিকারচ্যুতি ঘটিত না। আ-রঙ্গজেব হিন্দুজাতির উপর এরূপ অনপনেয় গুরুতর আঘাত প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, বাহাদুর সাহের গুণ পরম্পরায় তাহার প্র-তিকার সাধিত হইল না। দুর্ব্বৃত্তের উত্তরা-ধিকারী বিবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াও রাজপুত-দিগের বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন নাই।

অনধিক কাল মধ্যেই সম্রাটের প্রতীতি জন্মিল যে, রাজপুতদিগের নিকট সমুচিত সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশা নাই। দক্ষিণা-পথে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্রাট চিহ্ন ধা-রণ করায় সাহ আলম যাইয়া তাহাকে দমন করিলেন, এমন সময়ে লাহোরের শিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পঞ্চম শতাব্দী হইতে ইহাদিগের জাতিসাধারণ একতা সংস্থাপিত হয়। গত শতাব্দী হ-ইতে তাহারা একপ্রকার স্বাধীন ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। ইহারা নানকের শিষ্য; আরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে ইহারা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বৈরনির্যাতনে দীক্ষিত হয়। এত-দুপলক্ষে অম্বর ও মাড়োয়ারপতি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু কোন নিগূঢ় কারণ বশতঃ তাঁহারা সাহ আলমের অনু-মতির অপেক্ষা না করিয়াই শিবির হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। মুসলমান লেখকেরা বলেন, তাঁহারা অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন ক-রিবার মানসেই এবংবিধ ব্যবহার করেন। ফলতঃ তাহা নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয় না। সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহারা আপন আপন সামন্ত-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিলে সম্রাট তাঁহাদের প্রার্থনা জানিতে উৎসুক হইলেন। তাঁহারা তাহার কোন সদুত্তর প্রদান না করিলে এককালে রাজশিবির হইতে উদয়পুরে রাণার নিকট আসিয়া উ-পনীত হইলেন। তথায় তাঁহাদের তিন-জনে একটি সন্ধি হইল। এই সন্ধিসূত্রে তাঁহারা পরস্পর সম্রাটের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। প্রতাপের অনুজ্ঞানুসারে এতদিন তাঁহারা পরস্পর কোন বৈবাহিক সম্বন্ধে নিবদ্ধ হইতে পারিতেন না, কারণ মোগলের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মিবারের চক্ষে

অম্বর ও মাড়োয়ার পতিতরূপে পরিগণিত ছিলেন, কিন্তু এই সন্ধিসূত্রে সেই পাতিত্য দোষ অপনীত হইল। মিবারপতি মহারাণা তাহাদের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন; তাহাতে এই নিয়ম রহিল যে, ঐ কন্যারগর্ভে পুত্রসন্তান হইলে জ্যেষ্ঠ সত্বেও সে উত্তরাধিকারী হইবে; কিন্তু যদি কন্যাসন্তান জন্মে, তবে যেন সে কখনও যবনকরে প্রদত্তা না হয়। এই নিয়মে আপাততঃ মধুর ফল উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা হইল বটে, কিন্তু চিরপ্রচলিত জ্যেষ্ঠাধিকারিত্ব সত্বের বিলোপ নিবন্ধনে ভবিষ্যতে বিবিধ অনিষ্টাপাতের সূত্রপাত হইল। এই সন্ধিদ্বারা বাবর-প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য বিলোপদশায় পতিত হইল বটে, কিন্তু রাজপুতদিগের পারিবারিক ব্যাপার পরম্পরার বিসম্বাদ বিদূরিত করিবার জন্য মধ্যস্থরূপে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বগ্রাস করিয়া ফেলিল।

রামপুরের রতনসিংহ মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজা মুস্‌লিম খাঁ নামে অভিহিত হন; তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রথমতঃ সন্ধিবদ্ধ মিলিত সেনা চালিত হয়, কিন্তু মুস্‌লিম খাঁ তাহাদিগের উপর জয়লাভ করিয়া সম্রাটের নিকট পুরস্কার লাভ করে। এই সময়ে সম্রাট্ সংবাদ পাইলেন যে, রাণা তাঁহার রাজ্যধ্বংস করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। ইহার পরেই প্রচারিত হইল যে, সাবলদাস নামক রাণার জনৈক সেনানায়ক পুরমণ্ডলের শাসনকর্তা ফিরোজখাঁকে আক্রমণ করিয়াছে; খাঁসাহেব তাহার নিকট নিতান্ত হতবল হইয়া অজমীরে পলায়ন করিয়াছেন। ওদিকে বীরপ্রবর দুর্গাদাস, যিনি আরঙ্গজেবপুত্র বিদ্রোহী আকবরকে বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বীয় প্রতিপালক মাড়োয়ারপতির নিকট সাহায্যলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া মিবারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দৈনিক ব্যয়ের জন্য পাঁচশত টাকা করিয়া প্রদত্ত হইতে লাগিল। এই সকল মণি কাঞ্চনী যোগের ফলাফল সাহ আলম অবগত হইতে পারিলেন না, কারণ তিনি এই সময়েই বিষ সংযোগে বিলুপ্তজীবন হইলেন। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে এত শীঘ্র মোগল সিংহাসনের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। হিন্দুকুশ হইতে দক্ষিণ মহাসাগর পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যে কেবল মাত্র তিনি সুশৃঙ্খলা সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রাণ-বিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে দিল্লি দরবারে কেবল শোণিতপাতের ব্যবস্থা হইয়া উঠিল। দোয়াব হইতে সৈয়দনামা ভ্রাতৃদ্বয় আগমন করিয়া সাম্রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল; সম্রাট এক্ষণে তাহাদের শাসনাধীন হইলেন; তাহাদের ইচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল; তাহাদেরহাতে সম্রাট ক্রীড়াপুত্তল মাত্র হইলেন। ফিরোক্ক সেরকে তাহারা সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। এদিকে রাজস্থানের মিলিত সেনার কার্য্যারম্ভ হইল।

মুসলমানেরা রাজস্থানের দেবমন্দিরের ধ্বংস সাধন করিয়া সেই সেই স্থলে আপনাদিগের ভজনালয় সংস্থাপিত করিয়া গ্রামে গ্রামে কাজী ও মোল্লার আস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে রাজপুতেরা সেই সকল ভজনালয় বিধ্বংসিত করিয়া মোল্লা ও কাজীদিগের অবমাননা করিতে লাগিল। যশোবন্তের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র অজিত সিংহ মাড়োয়ার হইতে মোগলদিগকে বিদূরিত করিয়া অপহৃত রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিলেন। সম্বর নামক লবণ সরোবর তীরে মিলিত সেনার শিবির সংস্থাপিত হয়। এই সরোবর অম্বর, মাড়োয়ার ও মিবারের সীমা নিবদ্ধ করে; ইহার লাভাংশ উক্ত তিন রাজ্যে সমাংশে বিভক্ত হইত।

একতার অভাবই ভারতের পতনের মূল-কারণ। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতর হুসেনআলি আমিরউল্ ওমরা অজিতের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। চক্রান্তে পড়িয়া অজিত তাহার পদানত হইলেন। তিনি ফিরোকসের সম্রাটকে রাজকর ও এক কন্যা দান করিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করিলেন। সম্রাটের এই বিবাহই ভারতে ইংরেজ অভ্যুদয়ের সূত্রপাত করিয়া দিল। সম্রাটের পৃষ্ঠে একটি বিষম স্ফোটক হওয়ায় তিনি শয্যাগত হইলেন। ক্রমে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। রাজচিকিৎসকবর্গ অস্ত্রচিকিৎসায় অসমর্থ হওয়ায় সম্রাটের জীবন সংশয় বিবেচিত হইয়া শুভ বিবাহের বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই সময়ে সৌরাষ্ট্রের রাজসভায় ইংরেজ বণিক্‌দিগের দূত উপস্থিত ছিলেন, সেই সঙ্গে হামিল্‌টন নামক জনৈক চিকিৎসক থাকার সমাচার পাইয়া সম্রাট্ তাঁহাকেই লইয়া গেলেন। তাঁহার চিকিৎসায় ফিরোকসের আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনার আদেশ করিলেন। নিঃস্বার্থ মহামতি হামিল্‌টন আপনার জন্য কোন পুরস্কার প্রার্থনা না করিয়া ইংরেজবণিকদিগের জন্য কিঞ্চিৎ ভূম্যধিকার এবং বাণিজ্য কার্য্যের সত্ব প্রার্থনা করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা হইল। সেই একজন নিঃস্বার্থ চিকিৎসকের সৌজন্যে এখন বিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যে ইংরেজ আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কলিকাতার সামান্য সমাধি স্থানে এই মহানুভবের দেহ অতি দীনভাবে নিহিত রহিয়াছে; তাহাতে কিছুমাত্র পরিচয় চিহ্ন নাই। পাঠক! ইংরেজ চরিত্রে ইহা অপেক্ষা আর কি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা কর!

মহাসমারোহে ফিরোকসেরের বিবাহ সম্পন্ন হইল; শ্রুত হওয়া যায়, তদনুরূপ বৈবাহিক সমারোহ তাহার পূর্ব্বে আর কেহ কখনই নয়নগোচর করে নাই। এই বিবাহের পরই আবার সেই ঘৃণাকর জেজিয়া করের আবির্ভাব হইল। হিন্দুগণ তাহাতে নিতান্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সৈয়দদিগের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ফিরোকসের এনায়েৎ উল্লা খাঁকে দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইনি আরঙ্গজেবের দেওয়ান ছিলেন, সুতরাং জেজিয়া করের নিতান্ত পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদিও এবার জেজিয়ার ভার পূর্ব্বাপেক্ষা * লঘু হইল বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত নামের জন্য হিন্দুমাত্রেই বিরক্ত হইয়া উঠিল।

অজিত রাজপুত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করায় রাণা কোন অংশে হীনবল হন নাই, বরং তিনি এ সময়ে অভূতপূর্ব্ব পরাক্রম বিস্তার দ্বারা সম্রাটকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাহা হউক ত্বরায় সম্রাটের সহিত রাণার সন্ধি হইয়া গেল। এই সন্ধির প্রস্তাবপরম্পরা পাঠ করিলে রাণারই প্রাধান্য উপলব্ধি হয়। নিম্নে সেগুলি প্রদত্ত হইল। যথা ;—

"১ম। রাণা সাতহাজারী মন্‌সব হইলেন।

"২য়। পঞ্জা, সিলমোহর এবং স্বাক্ষর যুক্ত ফার্ম্মাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল যে, জেজিয়া কর রহিত হইবে। হিন্দুর উপরে উহা আর কখন স্থাপিত হইবে না। কোন মোগলসম্রাট উহা আর মিবারে সংস্থাপন করিবেন না। উহা স্থগিত হউক।

"৩য়। দক্ষিণাপথে যে এক সহস্র মিবারসেনা সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহারা আর তথায় থাকিবে না।

"৪র্থ। বিধ্বংসিত হিন্দুদেবমন্দিরগুলি পুনর্নির্ম্মিত হইবে ; ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

"৫ম। রাণার প্রতিকূলতাচরণ মানসে তাঁহার পিতৃব্য, ভ্রাতা অথবা সামন্তগণসম্রাট্‌সমীপে উপনীত হইলে তাঁহার দ্বারা কোন প্রকারে উৎসাহ প্রাপ্ত হইবে না।

"৬ষ্ঠ। দেওলা, বাঁসোয়ারা, দুংগড়পুর, সিরোহী ও অন্যান্য প্রদেশের ভৌমিক, যাহাদের উপর রাণার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, তাহারা সম্রাটসভায় উপস্থিত হইতে পারিবে না।

"৭ম। রাণার নিকট সম্রাটের যত সৈন্যের প্রয়োজন হইবে, তাহাদের কার্য্য শেষ হইলে সমস্ত হিসাব নিষ্পত্তি করিয়া দিতে হইবে।

"৮ম। রাণার যে সকল হক্‌দার, জমিদার ও মন্‌সবদার সম্রাটের কার্য্য প্রাণপণে সম্পন্ন করিবে, রাণার নিকট তাহার তালিকা থাকিবে। যাহারা অবাধ্য হইবে, রাণা তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন।

"পূর্ব্বে রাণার যে পঞ্চ্‌হাজারী মন্‌সবদারী ছিল, সেই পদ পরিপোষণের জন্য ফুলিয়া, মণ্ডলগড়, বেডনোর, পুর, বাসর, গৈয়সপুর, পর্ধার, বাঁসোয়ারা ও দুংগড়পুর প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ পঞ্চহাজারের পর সম্রাট রাজটীকা লাভের সময় এক হাজার ও সিনসিনির জয়লাভে এক হাজার বর্দ্ধিত হইয়া সাতহাজারী হইল। অনুগ্রহ চিহ্নের স্বরূপে রাণা দুই তিনটি ঘোটক পাইবেন।

"পুরস্কার স্বরূপে রাণাকে তিন কোটী ডাম * প্রদত্ত হইবে, 'তন্মধ্যে ফর্ম্মাণ অনুদিগের প্রতি কর।

* প্রত্যেক দুই হাজার টাকার প্রতি ১৩৲ তের টাকা।

† Tax on infidels. বিধর্ম্মী কাফের।

* ১৲ এক টাকায় ৪০ চল্লিশড্যাম।

সারে দুই, এবং দক্ষিণাপথের সেনা পরিপোষণের জন্য এক কোটী নির্দ্ধারিত হইল। ইহার মধ্যে রাণা তৎক্ষণাৎ দুই কোটী চাহেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সিরোহী প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে ইদর, কেকৃরি, মণ্ডল, জাহাজপুর, মালপুর ও অপর একটি প্রদেশ রাণার প্রার্থনা রহিল।"

এই সন্ধিসূত্রেই মিবারের উন্নতি ও মোগলদিগের অবনতি আরম্ভ হইল। ওদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়া সাহু রাজার অধীনে চতুর্দ্দিকে উপদ্রব আরম্ভ করিল। কোন স্থানে রাজ্য সংস্থাপন করা তাহাদের কোন কালেই উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল বিজিত প্রদেশে চৌথ ও দশমুখী * আদায় করিয়াই চলিয়া যাইত। ইহাতেই তাহারা, অনেক জনপদের উৎসন্ন দশা উপস্থিত করে। আবার চর্ম্মোণ্বতীর পশ্চিমপারবাসী জাঠেরা প্রবল হইয়া আপনাদের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিল। সিনসিনির আক্রমণ হইতে ইংরেজহস্তে ভরতপুরের পতনপর্য্যন্ত তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল।

১৭১৬ খৃঃ অব্দে অমরসিংহের মৃত্যু হইল। ইনি অতিশয় কার্য্যকুশল ও উচ্চমনা ছিলেন বলিয়া অদ্যাপি রাজস্থানে তাঁহার খ্যাতি রহিয়াছে। কৃষি ও শিল্প বিদ্যার প্রতি তাঁহার যে যথোচিত উৎসাহ ছিল তাহারও অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ নানাবিধ গুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া অদ্যাপি তিনি রাজপুতগণের স্মরণপথে জাগরুক রহিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

*Fourth and tenth of all territorial income.

আয়ুর্ব্বেদ।

(৩০৪ পৃষ্ঠার পর।)

স্বাস্থ্যপালন বিধি।

স্নানকালে ওষ্ঠ ও পদযুগল পরিমার্জ্জন করিয়া প্রথমতঃ মস্তক, চক্ষুঃ ও নাসিকাতে কিঞ্চিৎ জল ছিটাইয়া দিয়া পশ্চাৎ জলে অবতরণ করিবে। (১)

অপরিজ্ঞাত, গভীর ও হিংস্র প্রাণিযুক্ত জলাশয়ে স্নান করিবে না। (২)

পরিশ্রান্ত হইয়া, কিংবা মুখ, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি হস্তদ্বারা আচ্ছাদন না করিয়া

(১) দ্বিঃপরিমৃজ্যোষ্ঠৌ পদৌ চাভ্যুক্ষ্য মূর্দ্ধনি খানিচোপস্পৃশেৎ। (চরকঃ)

(২) ন নগ্নঃ প্রবিশেজ্জলং, নথানাজ্ঞাতগাম্ভীর্য্যং নহিংস্রপ্রাণিসেবিতং॥

(ভাবপ্রকাশঃ)

এবং উলঙ্গ অবস্থায় অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবে না। (১)

অস্নাত অবস্থায় শরীরোষ্মা বাহ্যতঃ সমস্ত শরীরে বিস্তৃত থাকে। স্নান করিবামাত্র বাহ্যশৈত্যাভিঘাতে ঐ শরীরোষ্মা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া জাঠরাগ্নিকে অধিকতর প্রদীপ্ত করে। (২)

আহারবিধি।

প্রাণিগণের আহারই জীবনধারণের মূল। উহাদ্বারা সদ্যপ্রীতি ও বললাভ হয়, এবং আয়ুঃ, তেজঃ, উৎসাহ, ওজঃ, স্মৃতিশক্তি, ও জাঠরাগ্নি বৃদ্ধিলাভ করে। (৩)

এক দিবা রাত্রিতে দুইবার মাত্র আহার করিবে। দিবা কিংবা রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইলে দ্বিতীয় প্রহর মধ্যে আহার করা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রথম প্রহর মধ্যে আহার করিলে শরীরে রসসঞ্চয় হইয়া থাকে, দ্বিতীয় প্রহর অতীত করিলে বলক্ষয় হয়। (৪)

যথোচিতরূপে মলমূত্র ও বায়ু নিঃসৃত হইলে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা ও শরীরের লঘুতা বোধ হইলে, শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ ও ইন্দ্রিয় সকল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে, এবং বিশুদ্ধ উদ্গারোদয় ও সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহার করা কর্ত্তব্য। (৫)

এই সমস্ত লক্ষণের অন্যথাভাব হইলে কেবল পূর্ব্বোক্ত সময়ের অনুরোধে ঐ সময়ে (অর্থাৎ এক প্রহর অন্তে দ্বিতীয় প্রহর মধ্যে) কখনও আহার করিবে না। এবং যখনই ঐসমস্ত লক্ষণের প্রকাশ হইবে তখনই আহার করিবে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কালের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। (৬)

অকালে, অতীতকালে, হীনমাত্রায় বা অধিকমাত্রায় আহার করিবে না। কারণ অকালে (অর্থাৎ পূর্ব্বভুক্ত অন্নের অজীর্ণাবস্থায়) আহার করিলে বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা প্রভৃতি নানাবিধ উৎকটরোগ উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু ঘটায়। (৭)

---

(১) নাবিগতক্লমো নানাপ্লুতবদনো ন নগ্ন উপস্পৃশেৎ। (চরকঃ)

(২) বাহ্যেশ্চ সেকৈঃ শীতাদ্যৈরুষ্মান্তর্যাতিপীড়িতঃ। নরস্য স্নাতমাত্রস্য দীপ্যতে তেন পাবকঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যোবলকৃদ্দেহধারকঃ। আয়ুস্তেজঃসমুৎসাহস্মৃত্যোজোঽগ্নিবিবর্দ্ধনঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৪) বিচার্য্যদোষকালাদীন্‌কালয়োরুভয়োরপি॥ (সুশ্রুতঃ) অপিচ—সায়ং প্রাতর্ম্মনুষ্যাণাং ভোজনং শ্রুতিবোধিতং। নান্তরা ভোজনংকুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমোবিধিঃ॥—যামমধ্যেন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ। যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাৎবলক্ষয়ঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫) প্রসৃষ্টেবিণ্মূত্রে হৃদি সুবিমলে দোষে স্বপথগে। বিশুদ্ধে চোদ্গারে ক্ষুদুপগমনে বাতেঽনুসরতি। তথাগ্নাবুদ্রিক্তে বিশদকরণে দেহেচ সুলঘৌ। প্রযুঞ্জীতাহারং বিধিনিয়মিতঃ কালঃ সহি মতঃ॥ (বাভটঃ)

(৬) ক্ষুৎসম্ভবতি পক্বেষু রসদোষমলেষু চ। কালে বা যদি বাঽকালে সোঽন্নকালউদাহৃতঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৭) নাপ্রাপ্তাতীতকালংবা হীনাধিকমথা-

অতীতকালে আহার করিলে বায়ুদ্বারা জঠরস্থ অগ্নি হীনতেজঃ হয়। সুতরাং ভুক্ত বস্তু সম্যক্ রূপে পরিপাচিত হয় না, এবং পুনর্ব্বার সম্যক্ ক্ষুধারও উদ্রেক হয় না।(১)

হীনমাত্রায় আহার করিলে অতৃপ্তি ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় আহার করিলে আলস্য, শরীরের গুরুত্ব, উদরের আটোপ (অর্থাৎ গুড়গুড় শব্দ),অগ্নিমান্দ্য এবং অগ্নিমান্দ্যজনিত নানাবিধ রোগ জন্মে। (২)

সম্যক্ রূপে ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও যদি আহার করা না যায়, তবে অঙ্গমর্দ্দ (শরীর মোড়া), অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, ধাতুদাহ ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। (৩)

অতএব যথাকালে পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে উত্তম আসনে অবক্রভাবে উপবিষ্ট হইয়া অভ্যস্ত, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অনতি উষ্ণ, দ্রবাধিক, পরিমিত, মনের প্রিয়, উত্তমরূপে পরিপাচিত, নির্দ্দোষ অন্ন আহার করিবে। (৪)

হস্তপদাদি প্রক্ষালন না করিয়া কিংবা মল মূত্রাদির বেগযুক্ত হইয়া কিংবা জলে অবস্থান করিয়া আহার করিবে না। (৫)

অতি উষ্ণ অন্ন বল নষ্ট করে, অতি শীতল ও শুষ্ক অন্ন অজীর্ণকারক হয়, অতি ক্লিন্ন (মাড়যুক্ত) অন্ন শরীরের গ্লানি উৎপাদন করে। অতএব হিতকারক যুক্তিযুক্ত অন্ন আহার করিবে। (৬)

দূষিত, উচ্ছিষ্ট,তৃণ, পাষাণ ও লোষ্ট্রাদি বিশিষ্ট, নিজের অপ্রিয়, ব্যুষিত (বাসি), দুর্গন্ধ ও অস্বাদু অন্ন ভোজন করিবে না।(৭)

সদ্যঃকৃত অন্ন জলদ্বারা ধৌত করিয়া ভক্ষণ করিলে শীঘ্র পরিপাক পায় এবং উহা বলকারক, শীতল, মধুর, রুক্ষ, শ্রান্তিনাশক, ও তৃপ্তিকারক।

পিবা। অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানঃ শরীরে হ্যলঘৌ নরঃ। তাংস্তান্ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণং বা নিযচ্ছতি॥ (সুশ্রুতঃ)

(১) অতীতকালে ভুঞ্জানোবায়ুনোপহতেঽনলে। কৃচ্ছ্রাদ্বিপচ্যতেভুক্তং দ্বিতীয়ঞ্চ নকাঙ্ক্ষতি॥ (সুশ্রুতঃ)

(২) হীনমাত্রমসন্তোষং করোতি চ বলক্ষয়ং। আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকং॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩) ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎস্যাদঙ্গমর্দ্দোঽরুচিঃ শ্রমঃ। তন্দ্রা লোচনদৌর্ব্বল্যং ধাতুদাহোবলক্ষয়ঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৪) ভোক্তারং বিজনে রম্যে নিঃসম্বাধে শুভে শুচৌ। * * * সুখমুচ্চৈঃ সমাসীনঃ সমদেহোঽন্নতৎপরঃ। কালে সাত্ম্যংলঘুস্নিগ্ধংক্ষিপ্রমুষ্ণং দ্রবোত্তরং। বুভুক্ষিতোঽন্নমশ্নীয়ান্মাত্রাবদ্বিদিতাগমঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৫) নাপ্রক্ষালিতপাণিপাদোভুঞ্জীত মূত্রোচ্চারপীড়িতো ন সন্ধ্যয়োর্নাপাশ্রিত ইত্যাদি॥ (সুশ্রুতঃ)

(৬) অত্যুষ্ণান্নং বলংহন্তি শীতশুষ্কঞ্চদুর্জরং। অতিক্লিন্নং গ্লানিকরং যুক্তিযুক্তংহি ভোজনং॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৭) দুষ্টমুচ্ছিষ্টং পাষাণতৃণলোষ্ট্রবৎ। দ্বিষ্টং ব্যুষিতমস্বাদু পূতিচান্নং বিবর্জ্জয়েৎ॥ (সুশ্রুতঃ)

ব্যুষিতপানীয়ভক্ত (পান্তভাত) মেদ, ঘর্ম্ম ও কফকারক, ত্রিদোষ-বর্দ্ধক, রুক্ষ, এবং অতিশয় মলমূত্রকারক। (১)

অতিশয় দ্রুত আহার করিলে অন্নের দোষ গুণ অনুভূত হয় না। অতিশয় ধীরে ধীরে আহার করিলে অন্ন ক্রমশঃ অতি শীতল ও অপ্রিয় হইয়া থাকে। অতএব অনতি দ্রুত ও অনতি বিলম্বিত ভাবে ভোজন করিবে। (২)

আহারের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আদা ও সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া ভক্ষণ করিবে। কারণ, উহাতে জিহ্বা ও কণ্ঠ পরিষ্কৃত এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও মুখরুচি জন্মে। (৩)

আহারকালে প্রথমতঃ মধুর দ্রব্য, মধ্যে অম্ল ও লবণ দ্রব্য, অবশেষে কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে। (৪)

প্রথম ভুক্ত মধুর রস প্রবৃদ্ধ বায়ু ও পিত্তের শমতা বিধান করে। মধ্যে ভুক্ত অম্ল ও লবণ রস পিত্তাশয়ে অগ্নি বৃদ্ধি করে। অন্তে ভুক্ত কটু, তিক্ত, ও কষায় রস বর্দ্ধিত কফের দমন করে। (৫)

কিন্তু দুগ্ধ পান ভোজনাবসান কালেই কর্ত্তব্য। কারণ উহাতে পূর্ব্বভুক্ত কটু তিক্তাদি দ্রব্যের উৎকট বিদাহ বিনষ্ট করে। (৬)

পূর্ব্বোক্ত মধুর দ্রব্য মধ্যে ঘৃতযুক্ত দ্রব্য এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্রব্য অগ্রে আহার করিবে। তৎপরে মৃদুদ্রব্য এবং তদনন্তর দ্রব দ্রব্য আহার করিবে। (৭)

স্বভাবতঃ গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধমাত্রায় এবং লঘুপাক দ্রব্য পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তিমত আহার করিবে।

---

(১) সদ্যোঽন্নং বারিণা ধৌতং শীঘ্রপাকং বলপ্রদং।
শীতলং মধুরংরুক্ষং শ্রমঘ্নংতর্পণং পরং॥
পানীয়ভক্তংব্যুষিতং মেদঃস্বেদকফপ্রদং।
ত্রিদোষকোপনং রুক্ষং মলকৃৎমূত্রলং পরং॥
(চক্রপাণিকৃত দ্রব্যগুণঃ)

(২) অতিদ্রুতাশিতাহারে গুণান্ দোষান্নবিন্দতি। ভোজ্যং শীতমহৃদ্যঞ্চ স্যাদ্বিলম্বিতমশ্নতঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) ভোজনাগ্রে সদাপথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণং। অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনং॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৪) পূর্ব্বংমধুরমশ্নীয়াৎ মধ্যেঽম্ললবণৌরসৌ। পশ্চাচ্ছেষান্ রসান্ বৈদ্যো ভোজনেষ্বচারয়েৎ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৫) ভোজনে পূর্ব্বভুক্তোমধুরোরসঃ বুভুক্ষিতস্য বাতপিত্তয়োঃ শমকোভবতি। ভোজনমধ্যে ভুক্তাবম্ললবণৌ পিত্তাশয়ে বহ্নিবৃদ্ধিং কুরুতঃ। ভোজনান্তসময়ে ভুক্তাকটুতিক্তকষায়রসা কফং শময়ন্তীতি॥
(ভাবপ্রকাশঃ)

(৬) বিদাহীন্যন্নপানানি যানি ভুঙ্‌ক্তেহি মানবঃ। তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং ভোজনান্তে পয়ঃ পিবেৎ। তথাচ—কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং নদধ্যন্তং কদাচন। অপিচ—লবণাম্লকটূষ্ণাণি বিদাহীন্যতি যানিচ। তদ্দোষং হর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

(৭) ঘৃতপূর্ব্বং সমশ্নীয়াৎ কঠিনংপ্রাক্‌ততোমৃদূং। অন্তে পুনর্দ্রবাশীতুবলান্ন রোগেণ মুচ্যতে॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

ভোজ্যবস্তু মধ্যে যে যে দ্রব্য অধিকতর স্বাদু, সেই সেই দ্রব্য উত্তরোত্তর ভোজন করিবে।

যে দ্রব্য একবার খাইলে পুনর্ব্বার তাহা খাইতে স্পৃহা জন্মে, এস্থলে তাহারই নাম স্বাদু দ্রব্য।

স্বাদু অন্ন, মনের প্রফুল্লতাকারক এবং হর্ষ, সুখ, বল, পুষ্টি, ও উৎসাহ বর্দ্ধক। (১)

ভোজনান্তে রুটি, পিষ্টক, ও চিপীটক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য কখনও খাইবে না। ভোজনের পূর্ব্বে ক্ষুধিতাবস্থায় একান্ত উহা খাইতে হইলেও অতি স্বল্পমাত্রায় খাইবে। (২)

উদরের চারিভাগের দুই ভাগ অন্নদ্বারা এবং একভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে। অবশিষ্ট একভাগ বায়ুর গমনাগমনের নিমিত্ত শূন্য রাখিবে। (৩)

ভোজনকালে অন্নরসে প্রথমতঃ জিহ্বা সরস থাকে, কিন্তু কিছুকাল আহার করিলে জিহ্বা আর তত সরস থাকে না। সুতরাং ক্রমশঃ রসবোধের স্বল্পতা ও জিহ্বার জড়তা জন্মিয়া থাকে। অতএব ঐ দোষ নিবৃত্তি এবং জাঠরাগ্নির বৃদ্ধির নিমিত্ত আহার কালে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জলপান করা কর্ত্তব্য।

আহারের আদ্যে অধিক জলপান করিলে শরীরের কৃশতা ও মন্দাগ্নি জন্মে এবং আহারের অন্তে অধিক জলপান করিলে শরীরের স্থূলতা ও কফ বৃদ্ধি পায়। আহারের মধ্যে অল্প অল্প জলপান করিলে অগ্নিদীপ্তি হয়। আহার কালে একেবারে জলপান না করিলে অন্ন সম্যক্ রূপে পরিপাক পায় না। এবং অধিক জলপান করিলেও ঐ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব অন্নপরিপাকার্থ মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জলপান বর্ত্তব্য।

যদি পিপাসার উদয় হইলেও জলপান না করা যায়, তবে কণ্ঠ ও মুখশোষ, শ্রুতিহ্রাস, রক্তশোষ ও হৃদয়ে ব্যথা জন্মিয়া থাকে।

তৃষিত অবস্থায় জলপান না করিয়া অন্ন আহার করিলে এবং ক্ষুধিত অবস্থায় অন্ন আহার না করিয়া জলপান করিলে, যথাক্রমে গুল্ম ও জলোদর রোগ জন্মিতে পারে। অতএব তৃষিত অবস্থায় অন্ন আহার এবং ক্ষুধিত অবস্থায় জলপান এই উভয়ই নিষিদ্ধ। (৪)

---

(১) গুরুণামর্দ্ধসৌহিত্যং লঘূনাংতৃপ্তিরিষ্যতে। যদ্যৎস্বাদুতরং তত্র বিদধ্যাদুত্তরোত্তরং। ভুক্ত্বাচ যৎ প্রার্থয়তে ভূয়স্তৎ স্বাদুভোজনং। সৌমনস্যং বলংপুষ্টিং উৎসাহং হর্ষণংসুখং। স্বাদুসঞ্জনয়ত্যন্ন মস্বাদুচ বিপর্য্যয়ং॥ (সুশ্রুতঃ)

(২) গুরুপিষ্টময়ং তস্মাত্তণ্ডুলান্‌পৃথুকানপি। নজাতু ভুক্তবান্ খাদেৎমাত্রাং খাদেদ্বুভুক্ষিতঃ॥ (চরকঃ)

(৩) অন্নেন কুক্ষের্দ্ধাবংশৌ পানেনৈকং প্রপূরয়েৎ। আশ্রয়ং পবনাদীনাং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥ (বাভটঃ)

(৪) রসেনান্নস্য রসনা প্রথমেনাপতর্পিতা। নতথাস্বাদুমাপ্নোতি ততঃ শোধ্যাহম্বুনান্তরা। ভুক্তস্যাদৌ জলং পীতং কার্শ্যং মন্দাগ্নিদোষকৃৎ। মধ্যেহগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠং অন্তে

অন্ন পাকের নিয়ম ও গুণ।

তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পাঁচগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে উহার রস গালিত করিয়া ফেলিবে। উক্ত প্রকারে সুসিদ্ধ,নির্ম্মল ও ঈষদুষ্ণ অন্ন,অগ্নি-বর্দ্ধক,তৃপ্তি ও রুচিকারক,লঘুপাক ও সুপথ্য।

অধৌত তণ্ডুলের অন্ন কিংবা অস্রাবিত অন্ন কিংবা অতি শীতল অন্ন, গুরুপাক, অরুচিকারক ও কফবর্দ্ধক। (১)

ভোজনান্ত বিধি।

আহারান্তে দন্ত লগ্ন অন্ন কণাদি সম্যক্ রূপে নিঃসৃত করিয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে মুখপ্রক্ষালন করিবে। অন্যথা মুখে নিতান্ত দুর্গন্ধ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণতঃ অন্নের জীর্ণাবস্থায় বায়ু, পচ্যমানাবস্থায় পিত্ত, এবং ভুক্ত মাত্রে কফ-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভোজনান্তে কফদোষ শান্তির নিমিত্ত এবং মুখের সৌগন্ধি সম্পাদনার্থ অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের ধূম পান করিবে। এবং গুবাক, লবঙ্গ, জাতীফল, খদির ও কর্পূরাদির সহিত তাম্বূল কিংবা কটু, তিক্ত, কষায় রস যুক্ত হরীতকী প্রভৃতি ভক্ষণ করিবে। (২)

অধিক পরিমাণে তাম্বূল ভক্ষণ করাও অবিহিত। কারণ তাহাতে দেহ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, কেশ, দন্ত, বল, বর্ণ, ও জঠরাগ্নি প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়া যায়। এবং বায়ু-পিত্তজন্য রোগ ও শোষ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা হয়।

বিরিক্ত (যেব্যক্তি জোলাপ লইয়াছে), ক্ষুধিত, বিষার্ত্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, মত্ততা,মূর্চ্ছা, চক্ষুও দণ্ডরোগ যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে তাম্বূল ভক্ষণ করা দূষণীয়। কারণ উহাতে অগ্নিমান্দ্য হয়,ও রক্তপিত্তাদিরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৩)

আহারান্তে যাবৎ অন্নভোজনজন্য

স্থৌল্যকফপ্রদং। অত্যম্বুপানান্নবিপচ্যতেহন্নং নিরম্বুপানাচ্চ সএবদোষঃ। তস্মান্নরোবহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবদ ভূরি। বিষাক্তেন পিপাসায়াঃ শোষঃকণ্ঠাস্যয়োর্ভবেৎ। শ্রবণস্যাবরোধশ্চ রক্তশোষোহৃদিব্যথা। তৃষিতস্ত নচাশ্নীয়াৎ ক্ষুধিতোনপিবেজ্জলং। তৃষিতস্তু ভবেৎগুল্মী ক্ষুধিতস্তু জলোদরী॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(১) সুধৌতাস্তণ্ডুলাঃ স্ফীতা স্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ। তৎভক্তং প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদংগুণবন্মতং॥ ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু। অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যংকফপ্রদং॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) দন্তান্তরগতং চান্নং শোধনেনাহরেচ্ছনৈঃ।
কুর্য্যাদনাহৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাং॥
জীর্ণেঽন্নেবর্দ্ধতে বায়ুর্বিদগ্ধে পিত্তমেবতু।
ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি তস্মাৎভুক্তে হরেৎ কফং॥
ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যৈর্ব্বাকষায়কটুতিক্তকৈঃ।
পূগকঙ্কোলকর্পূরলবঙ্গসুমনঃফলৈঃ॥
কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বামুখবৈশদ্যকারকৈঃ।
তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বাবিচক্ষণঃ॥
(সুশ্রুতঃ)

(৩) তাম্বূলং নাতিসেবেত নবিরিক্তো বুভুক্ষিতঃ। দেহদৃক্‌কফপিত্তাগ্নিশ্রোত্রবর্ণবলক্ষয়ঃ। শোষঃ পিত্তানিলাস্রংস্যাৎ অতি-

ক্লান্তি বিদূরিত না হয়, তাবৎ কোন পরিশ্রমজনক কার্য্য না করিয়া রাজবৎ সুখোপবিষ্ট থাকিবে। তৎপরে একশত পদ গমন করতঃ বাম পার্শ্বে ভরদিয়া পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কাল উপবিষ্ট থাকিবে। (১)

ভোজনান্তে উপবেশন করিলে তন্দ্রার আবির্ভাব হয়, শয়ন করিলে শরীরের স্থূলতা জন্মে, চক্রমণ (অর্থাৎ ধীরে ধীরে পাদচারণ) করিলে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। অধিক বেগে ধাবমান হইলে মৃত্যু ঘটে। (২)

আহারান্তে আর্দ্রশয্যায় উপবেশন, অগ্নি ও রৌদ্র সেবা, নদীসন্তরণ, পদব্রজে বা অশ্বাদি যানে দূরপথগমন, (৩) এবং যুদ্ধ, গান, ব্যায়াম, অধ্যয়ন, স্ত্রীসেবন, ও বেগে ধাবন প্রভৃতি কার্য্য করিবে না। কারণ উহাতে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া শারীরিক অনিষ্ট ঘটায়। (৪)

আহারান্তে মনের অপ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সেবিত হইলে কিংবা অধিক হাস্য করিলে কিংবা অরুচি অন্ন ভুক্ত হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া শরীরের গ্লানি উৎপাদন করে, অতএব সর্ব্বথা উক্ত বিষয়ে সাবধান থাকিবে। (৫)

গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্য কোনও কালে দিবানিদ্রা বিধেয় নহে। কারণ উহাতে শ্লেষ্মাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া কাস, শ্বাস, সর্দ্দি, শিরঃশূল, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, জ্বর, ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মায়। এবং অবৈধরূপে রাত্রিজাগরণ করিলেও ঐ সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। (৬)

কিন্তু যাহাদিগের দিবানিদ্রা কিংবা রাত্রিজাগরণ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের উহাতে (অর্থাৎ দিবা নিদ্রা কিংবা রাত্রি জাগরণে) বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে না। (৭)

তাম্বূলচর্ব্বণাৎ। বিষমূর্চ্ছামদার্ত্তানাং ক্ষয়িণাং রক্তপিত্তিনাং॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(১) ভুক্তা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমোগতঃ। ততঃ পদশতং গত্বা বামপার্শ্বেতু সংবিশেৎ॥ (সুশ্রুতঃ)

(২) ভুক্ত্বোপবিশতস্তন্দ্রা শয়ানস্যতু পুষ্টতা। আয়ুশ্চংক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতিধাবতঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) শয়নং চাসনংবাপিনেচ্ছেদ্বাপিদ্রবোত্তরং। নাগ্ন্যাতপৌনপ্লবনং নযানং নাপিবাহনং॥ (সুশ্রুতঃ)

(৪) ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ধাবনং যানমেবচ। যুদ্ধংগীতঞ্চপাঠঞ্চ মুহূর্ত্তং ভুক্তবাংস্ত্যজেৎ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫) শব্দরূপরসস্পর্শগন্ধাশ্চাপি জুগুপ্সিতাঃ। অশুচ্যন্নং তথাভুক্তমতিহাস্যঞ্চ বাময়েৎ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৬) সর্ব্বর্ত্তুষু দিবাস্বাপো প্রতিষিদ্ধোঽন্যত্রগ্রীষ্মাৎ। * * * তত্র স্বপতামধর্ম্মঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপশ্চ। তৎপ্রকোপাচ্চ কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়শিরোগৌরবাঙ্গমর্দ্দারুচিজ্বরাগ্নিদৌর্ব্বল্যানি ভবন্তি। রাত্রাবপি জাগরিতবতাং বাতপিত্তনিমিত্তাস্তত্রবোপদ্রবা ভবন্তি॥ (সুশ্রুতঃ)

(৭) নিদ্রা সাত্ম্যকৃতা যৈস্তু রাত্রৌবাযদি বা দিবা। নতেষাং স্বপতাং দোষো জাগ্রতাংবা বিধীয়তে॥ (সুশ্রুতঃ)

বরং অভ্যস্ত দিবানিদ্রার ব্যাঘাত করিলে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া শারীরিক অসুখ উৎপাদন করে। (১)

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, কৃশ, ক্ষত ক্ষীণ, মদ্যপায়ী, সর্ব্বদা যান বাহনে রত (অর্থাৎ সর্ব্বদা গাড়ী, পাল্কী, কিংবা অশ্বহস্তিদ্বারা গমন শীল), পরিশ্রান্ত, অভুক্ত, ক্ষীণমেদ, ক্ষীণস্বেদ, ক্ষীণকফ, ক্ষীণরস, ও ক্ষীণরক্ত ব্যক্তির পক্ষে এবং অজীর্ণযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে মুহূর্ত্তকাল (দুইদণ্ড) দিবানিদ্রা বিধেয়।

রাত্রিজাগরিত ব্যক্তির পক্ষে জাগরণকালের অর্দ্ধ পরিমিত সময় দিবানিদ্রা বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (২)

গ্রীষ্মকালে রাত্রি পরিমাণের স্বল্পতাহেতু দিবানিদ্রা বিহিত হইয়াছে। (৩)

পাদচারণ বিধি।

নখ, শ্মশ্রু, প্রভৃতি কর্ত্তন করিয়া, পবিত্র ও পরিস্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে লঘু উষ্ণীষ (পাগুড়ি), হস্তে দণ্ড ও ছত্র, পদে পাদুকা ধারণ করতঃ উত্তম সহচর সঙ্গে লইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ অভিভাবকের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক, অনন্যচিত্তে সমতল ও পবিত্রস্থানে পাদচারণ করিবে।

রাত্রিকালে কিংবা কেশ, অস্থি, কণ্টক, প্রস্তর, তুষ ভস্ম, ও অঙ্গার প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য যুক্ত স্থানে, পূজাস্থানে, চতুষ্পথে এবং গর্ত্তাদিযুক্ত স্থানে পাদচারণ করিবে না।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে (যাহাতে শরীরের ক্লেশ না হয় এরূপ ভাবে) পাদচারণ করিলে আয়ু, বল, মেধা, অগ্নিবৃদ্ধি, এবং ইন্দ্রিয় সকল অধিক শক্তিশালী হয়।

অধিক পথ পর্য্যটন করিলে শরীরস্থ কফ ও মেদ ক্ষীণ হইয়া যায়, বর্ণ ও সৌকুমার্য্য নষ্টহয়। সুতরাং বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া নানা বিধ উৎকট রোগ জন্মায়। এবং অকাল জরা ও দুর্ব্বলতা জন্মে।

একেবারে না হাটিলে প্রথমতঃ সুখ ও সৌকুমার্য্য জন্মে বটে, কিন্তু পরে শরীরে কফ ও মেদঃ বৃদ্ধি হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। সুতরাং শরীর নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। (৪)

---

(১) উচিতোহি দিবাস্বপ্নো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) প্রতিবিদ্ধেষপিতু বালবৃদ্ধস্ত্রীকর্ষিতক্ষতক্ষীণমদ্যনিত্যযানবাহনাধ্বকর্ম্মপরিশ্রান্তানামভুক্তবতাং মেদঃস্বেদঃকফরসরক্তক্ষীণানামজীর্ণিনাঞ্চ মুহূর্ত্তং দিবাস্বপনমপ্রতিষিদ্ধং। রাত্রাবপি জাগরিতবতাং জাগরিতকালাদর্দ্ধমিষ্যতে দিবাস্বপ্নঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩) রাত্রীণাঞ্চাতিসংক্ষেপাদ্দিবাস্বপ্নঃ প্রশস্যতে। (চরকঃ)

(৪) তত্রাদিতএব নীচনখরোম্না শুচিনা শুক্লবাসসা লঘূষ্ণীষছত্রোপানৎকেন দণ্ডপাণিনা কালে হিতমিতমধুরপূর্ব্বাভিভাষিণা বন্ধুভূতোনভূতানাম্ভগুরুবৃদ্ধানুমতেন সুসহায়েনানন্যমনসা খলুপচরিতব্যং। তদপিন রাত্রৌ নকেশাস্থিকণ্টকাশ্মতুষভস্মোৎকরকপালাঙ্গারামেধ্যস্থানবলিভূমিষু ন বিষমেন্দ্রকীলচত্তষ্পথশ্বভ্রাণামুপরিষ্টাৎ।

যত্তু চংক্রমণং নাতিদেহপীড়াকরং ভবেৎ। তদায়ুর্ব্বলমেধাগ্নি প্রদমিন্দ্রিয়বোধনং॥ অ-

মৃণ্ময়ী।

(ষষ্ঠ খণ্ড ৫৬৬ পৃষ্ঠার পর।)

তৃতীয়চিত্র।

প্রচণ্ড ভাস্কর-তেজে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তেজঃপুঞ্জ ও আলোকময় বায়ুময়ী বসুমতী অনন্ত আকাশের একদেশে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। তদীয় অণু ও পরমাণু সমুষ্টি চক্রাকার গতিবিশিষ্ট হওয়ায়, যাবতীয় পরমাণুর গতির একসঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘুরাইতে লাগিল। বর্তুলের চক্রাকার গতির সহিত এই গতির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে; কিন্তু বর্তুলের অক্ষদণ্ড ভূপৃষ্ঠে দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায়, বর্তুল এক স্থানেই ঘুরিতে থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর কোনও অক্ষদণ্ড না থাকায় পৃথিবী চক্রাকার গতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অনন্ত আকাশের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে গিয়া পড়িয়া যে কি হইত কে বলিবে। কিন্তু পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহাদির নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে যাইবার উপায় নাই। জগন্নিয়ন্তা জগতের যাবতীয় জড়পদার্থের শাসন জন্য যে অমোঘ নিয়মাবলী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কেন্দ্রাভিকর্ষণী ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি প্রভাবে সৌর জগতের যাবতীয় গ্রহ সূর্য্যের নির্দ্দিষ্ট দূরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; এবং উপগ্রহ মণ্ডলীও স্ব স্ব গ্রহগণকে পরিবেষ্টন করিয়া এবং উহাদিগের নির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে এবং আবহমানকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ঘুরিতে থাকিবে। উল্কাপিণ্ড ও ধূমকেতু মণ্ডলী অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং যখনই যে গ্রহের আকর্ষণানুবর্ত্তী হইতেছে, তখনই তৎকর্তৃক আকৃষ্ট ও তৎসঙ্গে সম্মিলিত হইয়া সেই গ্রহের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে।

বিভাবসু সবিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী তেজঃপুঞ্জ ও আলোকময় বায়বীয় আকারে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সৌর ও নাক্ষত্রিক জগৎ হইতে পরিভ্রম্যমাণ অসংখ্য জড় পদার্থের সম্পাতে তাহার কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর কাল সহকারে প্রচণ্ড তেজের হ্রাসতার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ী বায়ুময়ী মূর্ত্তির অপচয় এবং শৈত্যগুণ-

ধ্বাবর্ণকফস্থৌল্যসৌদ্ধমার্য্য বিনাশনঃ। অত্যধ্বাবিপরীতোঽস্মাজ্জরা দৌর্ব্বল্যকৃচ্চসঃ। আস্যা। বর্ণকফস্থৌল্যসৌকুমার্য্যকরী সুখা॥
(সুশ্রুতঃ)

শালিনী মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির উপচয় আরম্ভ হইল।

এস্থলে পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কাল সহকারে তেজের হ্রাসতা ঘটিবে কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে ইহাও প্রাকৃতিক কার্য্য। একখণ্ড জ্বলন্ত ও প্রতপ্ত অঙ্গার ক্ষণকাল অগ্নিকুণ্ড হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখ, তাহা হইলে দেখিবে যে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই উহার রক্তিমা আভা ক্রমে ম্লান হইতে হইতে পরিশেষে একেবারে তিরোহিত হইবে এবং দাহ্যগুণবিশিষ্ট জ্বলন্ত অঙ্গার তখন আর স্পর্শ মাত্রও উত্তপ্ত বোধ হইবে না। জ্বলন্ত অঙ্গার বাস্তবিকই নিবিয়া যাইবে। যে শক্তিপ্রভাবে জ্বলন্ত অনলের তেজের হ্রাসতা ঘটে তাহাকে তাপের বিকীরণ শক্তি কহে।

এস্থলে বিকীরণ শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পাঠক! এই জড়জগতের প্রাকৃতিক শক্তি সমূহই প্রাণস্বরূপ। শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না, এবং সুসম্পন্ন কোনও কার্য্য বিনাশ করিতেও আবার শক্তির প্রয়োজন। সংহতি (Cohesion) নামক প্রাকৃতিক শক্তি প্রভাবে পদার্থের পরমাণু-সমষ্টি দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায় আকারপ্রাপ্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে; পদার্থের এই স্বাভাবিকী অবস্থার ব্যভিচার ঘটাইয়া উহার পরমাণু সমষ্টির বিশ্লেষণ সংঘটন করিতেও বিলক্ষণ শক্তির প্রয়োজন। তাপ এই শেষোক্ত শক্তির নামান্তর। ইহার প্রভাবে পদার্থের পরমাণু সমষ্টির দৃঢ় বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, এবং উহাদের মধ্যে একপ্রকার প্রবল আন্দোলন বা অগ্রপশ্চাৎ গতি সমুৎপন্ন হয়। ইহাকে আলোক বা তেজোহিল্লোল কহে। কোনও স্থলে আলোক বা তেজ উদ্ভূত হইলে, সেই আলোক বা তেজের হিল্লোল সমীপবর্ত্তী স্থিতিস্থাপক গুণোপেত ইথার নামক অতীন্দ্রিয় পদার্থের পরমাণু সমষ্টির স্থিরভাব বিনাশ করিয়া প্রবল তরঙ্গ সঙ্ঘাত করিয়া দেয়। এই পদার্থ আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী, সুতরাং কোনও স্থলে তাপ বা আলোক উদ্ভূত হইবা মাত্র উহা একেবারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া পড়ে। যে শক্তিপ্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ইথার বিলোড়িত হয়, তাহা অসীম হইলে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রযুজ্য পদার্থের পরমাণু সমষ্টিকে আন্দোলিত রাখিতে পারিলে, পদার্থের পরমাণু সমষ্টি আর স্বস্ব ভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু এশক্তি অসীম না হইলে প্রযুজ্য পদার্থের পরমাণু সমষ্টিকে আন্দোলিত রাখিতে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী ইথার নামক পদার্থকে বিলোড়িত রাখিতে উহার পরাক্রম যেমন ব্যয়িত হইতে থাকে, ক্ষণবিলুপ্ত সংহতি শক্তিরও তেমন পুনঃসঞ্চার হইতে থাকে। জ্বলন্ত ও প্রতপ্ত অঙ্গারখণ্ড অগ্নিকুণ্ড হইতে স্বতন্ত্রীকৃত হইলে, উহার আলোকময় ও তেজঃপুঞ্জ পরমাণু সমষ্টিকে পূর্ব্ববৎ প্রবলতররূপে আন্দোলিত রাখিতে আর নূতন শক্তি প্রযুজ্য হয় না; কিন্তু স্বকীয় পরমাণু সমষ্টিকে আন্দোলিত রা-

খিতে এবং বিশ্বব্যাপী ইথারের প্রশান্তভাব বিনাশ করিতে উহার তেজ যেমন ব্যয়িত হইতে থাকে, অঙ্গারখণ্ড তেমন মলিন হইয়া আইসে। অনন্তর সর্ব্বথা এ তেজের অপচয় ঘটিলেই উহা একেবারে নিবিয়া যায়।

যে কারণে জলদঙ্গারখণ্ড অগ্নিকুণ্ড হইতে স্থানান্তরিত হইলে উহার তেজ ক্রমে হ্রাস পাইতে পাইতে পরিশেষে একেবারে নিবিয়া যায়, সেই কারণেই অনন্ত অনলরাশি সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরক্ষণ হইতেই পৃথিবীর তাপ ও আলোক হ্রাসতা পাইতে থাকিল; এবং এই তাপের হ্রাসতার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আকারের ও পরিবর্ত্ত ঘটিতে লাগিল। তাপসংযোগে সংঘাত-কঠিন দ্রব্য দ্রব বা তরল, এবং তরল দ্রব্য বায়বীয় আকার ধারণ করে। বায়বীয় দ্রব্য হইতে তাপ বিমুক্ত হইতে থাকিলে সেই দ্রব্য প্রথমে তরল, পরে শ্যান এবং পরিশেষে সংঘাতকঠিন হইয়া যায়। তুষারখণ্ড উত্তাপসম্পাতে তরল জল, এবং জল উত্তপ্ত হইলে অদৃশ্য বাষ্পাকারে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে আবার জলীয় বাষ্প শৈত্য প্রভাবে প্রথমে তরল এবং পরিশেষে কঠিন তুষারে পরিবর্ত্তিত হয়। তেজঃপুঞ্জ বায়ুময়ী বসুমতীর যেমন তেজের হ্রাসতা ঘটিতে লাগিল, তেমন প্রথমে উহার উপরিভাগস্থ বায়ুবৎ পদার্থ এবং পরিশেষে সমগ্র গোলক তরল ভাবাপন্ন হইল। কিন্তু তখনও তেজের সর্ব্বথা হ্রাস ঘটে নাই, সুতরাং তাৎকালিক এ প্রকার তরল পদার্থও যার পর নাই উষ্ণ ছিল। অনন্তর কালসহকারে তেজের আরও হ্রাসতা ঘটায় ক্রমে উপরিভাগস্থ তরল পদার্থ জমিয়া কঠিন হইতে লাগিল। এই কঠিন পদার্থ গুরুতা প্রযুক্ত যেমন নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে লাগিল, তেমন নিম্নপ্রদেশে উত্তাপাধিক্য প্রযুক্ত তরল হইয়া গেল। এইরূপে যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইলে, পৃথিবীর উপরিভাগের ও মধ্যদেশের তেজ যখন আরও অধিক হ্রাস হইয়া আসিল, তখন এই সকল উপরিভাগস্থ কঠিন পদার্থ অনায়াসে তন্নিম্নস্থ তরল পদার্থ ভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যভাগে গিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল। সে সময়েও উপরিস্থ পদার্থসমূহ পূর্ব্ববৎ সংঘাতকঠিন হইতেছিল। জল জমিয়া তুষারে পরিণত হইলে সেই তুষার জলের উপরে ভাসমান থাকে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন অনেক পদার্থ আছে যাহারা ঠিক্ তুষারের ন্যায় কঠিন অবস্থাতে তরল অবস্থা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে লঘু থাকে, সুতরাং সে সকল পদার্থ নিম্নগামী না হইয়া তরল পদার্থের উপরেই ভাসমান থাকে। এই প্রকারে যখন উপরিস্থ যাবতীয় পদার্থ কঠিন হইয়া গেল, কিন্তু কঠিন অবস্থায় তরল অবস্থা অপেক্ষা লঘুতা প্রযুক্ত আর তরল পদার্থের নিম্নে যাইতে পারিল না, তখন সমগ্র কঠিন ভাবাপন্ন উপরিভাগের অধোদেশে এবং পৃথিবীর মধ্যভাগস্থ কঠিন ভাবাপন্ন পদার্থের উপরে তরল পদার্থ রহিয়া গেল। এ প্রকার তরল পদার্থ ভূগর্ভে

অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমনকালে এ সকল পদার্থ এখনও পৃথিবীর উপরিভাগে উঠিয়া থাকে। পৃথিবীর তাপ যতই হ্রাসতা পাইতেছে উহার আয়তনও ততই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উপরিভাগের তাপ মধ্যভাগের তাপ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে হ্রাস হওয়ায়, উপরিভাগস্থ কঠিন পদার্থের আয়তন তন্নিম্নস্থ তরল পদার্থের আয়তন অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে, এবং এই তরল পদার্থের আয়তন উহার নিম্নভাগস্থ কঠিন পদার্থের আয়তন অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে সঙ্কীর্ণ হইতেছে; এজন্য পৃথিবীর মধ্যদেশস্থ কঠিন পদার্থ ও সেই কঠিন পদার্থের উপরিস্থ তরল পদার্থ, সর্ব্বোপরিস্থ কঠিন ভাবাপন্ন পদার্থকে ক্রমশঃ ভেদ করিয়া উপরে উপরেই উঠিবে। এই প্রকারে অভ্যন্তরস্থ কঠিন পদার্থের উপরে উঠায় ভূপৃষ্ঠে আদিম কালীন পর্ব্বত, এবং তরল পদার্থের উপরে উঠায় তাৎকালিক মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইল। সে সময়ের সমুদ্র বর্ত্তমান সময়ের সমুদ্রের ন্যায় ছিল না। উহার ফুটন্ত ও জ্বলন্ত তরল পদার্থ যারপর নাই উত্তপ্ত ছিল। ভূপৃষ্ঠস্থ উষ্ণপ্রস্রবণ সকল বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উত্তপ্ত রহিয়াছে।

পাঠক! যে কালের কথা বলিতেছি সে সময়েও পৃথিবী বৃহৎ মরুৎরাশি কর্ত্তৃক পরিবৃত ছিল। কিন্তু তৎকালের বায়ু বর্ত্তমান কালের বায়ু অপেক্ষা সর্ব্বোতোভাবে ভিন্ন প্রাকৃতিক। পৃথিবীর উপরিভাগ যখন পুর্ব্বোক্ত প্রকারে কঠিন ভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ হইল তখন ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত নানা জাতীয় পদার্থ পরস্পর রাসায়নিক প্রক্রিয়াপ্রভাবে সংবদ্ধ হইয়া নানা জাতীয় মৃত্তিকা সমুৎপন্ন করিল এবং অম্লজান (Oxygen), যবক্ষার জন (Nitric acid), আঙ্গারিক অম্ল (Carbonic acid) অবজনিত হারিতিক অম্ল (Hydrochloric acid), গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid), জলীয় বাষ্প (Vapour of water) প্রভৃতি নানাবিধ বায়ু বিমুক্ত করিয়া দিল। এসকলের সংমিশ্রণে এক প্রকার প্রগাঢ় বায়ু তরল ও কঠিন ভাবাপন্ন সমগ্র পৃথিবীকে পরিবৃত করিল। এই সকল প্রগাঢ় বায়ু গুরুতা প্রযুক্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে অধিক দূর ব্যাপিয়া ছিল না এবং উত্তাপের হ্রাসতার সঙ্গে সঙ্গে তরল ভাবাপন্ন হওয়ায় সততই উহাদের বর্ষণ হইত। এ প্রকার সতত অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণে সেই আদিম কালীন মরুৎ রাশি গুরুতা পরিহার করিয়া ক্রমে লঘু হইতে লাগিল, এবং আদিম কালীন শৈলমালা ও মহাসমুদ্রাদিও সতত বিধৌত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থার দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিল। এই সময় হইতেই পৃথিবী প্রকৃত প্রস্তাবে মৃণ্ময়ী হইলেন। আদিম কালীন বিজলিছটা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘনঘটা এবং অজস্র প্রতপ্ত বারিবর্ষণই আমাদের নায়িকার গুভজাত কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিল।

শ্রীসূ:—

কৃষ্ণা

বা

কলিকাতা শতাব্দী পূর্ব্বে।

(৩৩৭ পৃষ্ঠার পর।)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এই রাত্রিতে বাবুর বৈঠকখানায় বিস্তর লোক ছিল না। চৌধুরী মহাশয় ও নবকবি চলিয়া গেলে কর্ত্তাবাবু মুচ্‌কে হাসিয়া কথক ঠাকুরকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি ব্যাপকতার সহিত পুঁথি খুলিয়া পড়িলেন :—

" ওঁ হরি হরি স্বাহা
গোদন্তং হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজিহ্বয়া।
চূর্ণং কৃত্বা যস্য শিরে দীয়তে স বশী ভবেৎ॥
কাক-জিহ্বা বচা কুষ্ঠং নিম্বপত্রং স-কুঙ্কুমং।
আত্মরক্তং সভাবেয়ং বশী ভবতি মানবঃ॥
ওঁ নমঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো নমঃ।
সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। "

কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরূপ, ঠাকুর মহাশয় কিরূপ'? কথক ঠাকুর কহিলেন, 'ওঁ হরি হরি স্বাহা বলিয়া এই কয়েকটি দ্রব্য একত্র করিয়া যাঁহার শিরে দিবেন তাঁহাকে বশ হইতেই হবে।' কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি জিনিস?' কথকঠাকুর উত্তর করিলেন 'গোদন্ত হরিতাল সহিত কাকজিহ্বা একত্র করিয়া শোধন করিতে হইবে তৎপরে আপনি ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া যাঁহার শিরোদেশে কিঞ্চিৎ অংশ দিবেন তাঁহাকে বশ হতেই হবে।'

কর্ত্তা। গোদন্ত কি গরুর দন্ত?

কথক। না না এক প্রকার হরিতাল।

কর্ত্তা। তার পর—কাকজিহ্বা?

কথক। কাক জিহ্বা, কাকের জিহ্বা।

কর্ত্তা। সে কিরূপে পাওয়া যাবে?

কথক। কেন মহাশয় একজন গুলেন্দাজকে হুকুম করুন দুই একটা কাক মেরে আপনার কাছে নিয়ে আসে।

কর্ত্তা। সকলে যে জান্‌তে পার্‌বে।

কথক। দিবসে না হউক, এত শুক্লপক্ষ, আজই হউক, আর কালই হউক, রাত্রিকালে গাছ নাড়া দিলে অনেক কাক উড়্‌বে, সেই সময়ে দুই একটি মার্‌তে পার্‌বে।

কর্ত্তা। (বিশেষ আনন্দিত হইয়া) সেই সৎপরামর্শ। তার পর শোধন কর্‌তে হবে না বল্‌লেন?

কথক। (গম্ভীরভাবে) হাঁ লক্ষ্মীজনার্দ্দনের ষোড়শোপচারে পূজা কর্‌তে হবে, সে কাজ আজ্ঞা হয় ত আমি কর্‌বো।

কর্ত্তা। তা বই কি, এ সব কি সাতকান করা উচিত।

কথক। তা হবে না মহাশয়, যাঁহাকে বশ কর্‌তে প্রয়াস পাচ্চেন, তিনি যদি ঘুণাক্ষরে শুনেন তা হলে সব পণ্ড হবে।

কর্ত্তা। তাই ত শোধনের পর কি হবে?

কথক। দুই দ্রব্যের কিছু কিছু অংশ অলক্ষ্যভাবে তাঁর মাথায় দিবেন।

কর্ত্তা। আচ্ছা, কিন্তু পূজার কিরূপ আয়োজন কর্‌তে হবে?

কথক। এই দুই দ্রব্য রাখিবার জন্য একটি রৌপ্য পাত্র প্রস্তত কর্‌তে হবে, না হয় বাটিতে যা আছে তাই দিবেন। আর লক্ষ্মীজনার্দ্দন, ষষ্ঠী. মার্কণ্ডের পূজা, হোম, আসন, অঙ্গুরী, মধুপর্ক, আর নৈবেদ্যাদি, অধিক আর আপনাকে কি বল্‌বো যত সংক্ষেপে হয় তাই কর্‌বেন।

কর্ত্তা। কিন্তু ফল্‌বে তো?

কথক। এতো মহাশয়, আমার নিজের কথা নয়।

কর্ত্তা। তা ত নয়, তবে তুমি কখন অন্য কোন লোক্‌কে দিয়েচ?

কথক। তা দুই পাঁচ জনকে দিয়েছি বই কি, কি জানেন মহাশয়, যার হয় সে ত আর বলে না পাছে কথক ঠাকুরকে কিছু দিতে হয়।

কর্ত্তা। (হাসিয়া) আমার কাছে আর সে ভয় নেই। তুমি মন দিয়ে বেশ্ করে শোধন করো।

কথক। তা কি মহাশয়কে বিশেষ করে বল্‌তে হবে, আপনি যদি সিদ্ধ হন তা এক জোড়া শাল বক্‌সিস লব।

এই কথোপকথনের পর কর্ত্তাবাবু গুলেন্দাজকে গোপনে ডাকাইয়া দুইটি কাক মারিতে হুকুম দিলেন। এদিকে কথক ঠাকুর বহু অনুসন্ধানের পর গোদন্ত হরিতাল সংগ্রহ করিলেন, পরে শুভ দিন দেখিয়া ষোড়শোপচারে পূজায় বসিলেন। পূজা অন্তে এই দুই দ্রব্যের কিয়দংশ একটি বিল্বপত্রে জড়াইয়া কর্ত্তাবাবুর হস্তে দিলেন। কর্ত্তাবাবু সযত্নে উহাকে একটি কৌটায় রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে কৃষ্ণার মস্তকে দিবেন; অনেক ক্ষণ চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কৃষ্ণা যখন অবগুণ্ঠিতা হইয়া চন্দন ঘষিবেন, তখনই কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে দিয়া যাইবার সময় তাঁহার মস্তকে উহা দিবেন। কৃষ্ণা যদি ফিরিয়া চাহেন তাহা হইলে তিনি বলিবেন হঠাৎ বিল্বপত্র তাহার হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছে। তিনি এইরূপ ভাবিয়া পর দিবস তাহাই করিলেন, কৃষ্ণাও ফিরিয়া দেখিলেন, কি পড়িল। সুচতুর কহিলেন, "আহা আমার বিল্বপত্র হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে" এ বলিয়া তুলিয়া লইলেন।

কাকজিহ্বা ও গোদন্ত হরিতাল কৃষ্ণার মস্তকে দিয়া এক সপ্তাহ যৎপরোনাস্তি আশার সহিত অপেক্ষা করিলেন, কৃষ্ণার অনুরাগের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তখন জানিলেন কিছুই হইল না। পুনর্ব্বার কথক ঠাকুরকে ডাকিলেন, এবার কথক ঠাকুর বহুচিন্তার পর কহিলেন, "মহাশয়, একটি মাহুলি আছে, উহার ফল প্রত্যক্ষ, কিন্তু কিছু ব্যয় ভূষণের আবশ্যক।"

কর্ত্তাবাবু কহিলেন 'কত?' কথক ঠাকুর কহিলেন 'অধিক নয় বিশ পঁচিশ টাকার মধ্যে। এটি শাস্ত্রীয় নয় বটে, কিন্তু এর ফল প্রত্যক্ষ শুনা আছে, যদি অনুমতি দেন তবে চেষ্টা করি। কি জানেন মহাশয় এখন কলিকাল শাস্ত্রের কথা সব খাটে না।' কর্ত্তা কহিলেন, 'আচ্ছা সংগ্রহ কর'।

কথক ঠাকুর তিন চারিদিন আসিলেন না, পরে এক দিবস প্রভাতে শশব্যস্তে আসিয়া গোপনে কর্ত্তাবাবুর হস্তে একটি মাদুলি দিলেন। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি ধারণ করিতে হইবে? কথক পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে কহিলেন 'হা, কিন্তু কিছু প্রক্রিয়া আবশ্যক।' কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি?' কথক কহিলেন, এই মাদুলি তাঁহাকে দেখাইয়া তিন পা অগ্রসর হইয়া তিন পা পিছনে যাইতে হইবে। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহা হলে কি হবে?' কথক উত্তর করিলেন, 'যিনি দিয়াছেন তিনি দম্ভ করে বলেছেন, 'রাত্রিতে তাঁকে আস্‌তেই হবে'। বাবু হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কহিলেন 'বটে?' পর দিবস তাহাই করিলেন এবং রাত্রিকালে ঠাকুর বাটীর পশ্চাতে একটি গৃহের দ্বার খুলিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি এক প্রহর, দুই প্রহর, তিন প্রহর অতীত হইল, কৃষ্ণা আসিলেন না। প্রভাত হইল কথক ঠাকুর আসিলেন, বাবু শুষ্ক ও মলিন মুখে কহিলেন 'কিছুই হইল না'। এইরূপে তিন রাত্রি আশা করিয়া রহিলেন, পরে চতুর্থ দিবস প্রভাতে কথক ঠাকুর আসিলে, তিনি সরোষে কহিলেন, তুমি যাও। কথক অটল ভাবে কহিলেন, 'মহাশয় ইহার ভিতর অবশ্য কোন গোলযোগ আছে।' কর্ত্তা থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন 'কি?' কথক ঠাকুর বলিলেন 'আপনার গ্রহ-ফল দেখি'। কর্ত্তা তখন নাচার হইয়া 'ঠিকুজি' আনিয়া দিলেন। কথক অনেক ক্ষণ দেখিয়া কহিলেন 'এই যে আপনার দ্বাদশ রাহু রহিয়াছে, এতে কি কখন সুবিধা হতে পারে, আপনি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া স্বস্ত্যয়ন করুন নতুবা স্বয়ং বৃহস্পতি কোন ফল দিতে পারিবেন না'।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে গুণনিধির জন্মতিথিপূজা নিকটবর্ত্তী। তদানিন্তন ক্ষুদ্র কলিকাতার ক্ষুদ্র বঙ্গসমাজের মহাসুখের কাল অধিক দূর নহে। অনেকেই প্রত্যাশাপন্ন। কেহ বার্ষিক, কেহ বৃত্তি, কেহ পুরস্কার, কেহ ভোজন, কেহ বসন, কেহ প্রমোদ, কেহ প্রশংসা প্রভৃতি নানারূপ আশায় আশ্বাসিত হইয়া নানাপ্রকার লোক সেই দিন লক্ষ্য করিয়া আছে। অনেকে বাবুকে অনেক প্রকার যুক্তি দিতেছে, অনেক প্রকার প্রকরণ, উপকরণের প্রস্তাব করিতেছে, বাবু কখন মৃদুহাস্য, কখন উচ্চহাস্য করিতেছেন, কখন বা রসালাপে সরস কমলের ন্যায় সৌভাগ্য সলিলে ঢল ঢল ভাসিতেছেন, কখন বা ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বলিতেছেন 'এরূপ আমার মত নহে'। যিনি

প্রস্তাব করিতেছেন, তিনি হতাশ হইয়া বিষণ্ণবদনে কহিতেছেন 'দেখুন আপনার যেরূপ রুচি'। যাহা হউক গুণনিধি এক্ষণে শশব্যস্ত ও প্রকাশ্য সুখী, কেননা তাঁহার হৃদয়ে যে বিশেষ অসুখ আছে, সে অসুখ বলিবার নহে, কাহাকে জানাইবার নহে। সে দুঃখের শান্তি নাই। সে তাপের কারণ নিদানে নির্ণীত হয় নাই, চরক, সুশ্রুত, বাভটে উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। গুণনিধি ধন ঐশ্বর্য্য সৌভাগ্য সত্ত্বে অসুখী। এ অসুখ সামান্য নহে, গোলাপ কণ্টক নহে,—এ প্রকৃত অসুখ। ধনবান্ সর্ব্বদাই মনে করেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ইন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়, বাহ্য ও অন্তর, সত্য ও ধর্ম্ম সমস্ত অর্থসাধ্য ও অর্থসেব্য। যখন সেই অর্থে কোন বিষয় দুঃসাধ্য বা অসাধ্য বিবেচনা করেন, তখন তাঁহাদিগের দুঃখের আর সীমা থাকে না। সেই দুঃখে দুঃখী জনের পক্ষে সেই দুঃখ রোগ, দুর্ভাগ্য, দুর্ভিক্ষ, ঝটিকা, বন্যা প্রভৃতির অপেক্ষা অধিক ক্লেশপ্রদ। এইরূপে বিধাতা পৃথিবীর ধনী ও নির্ধনের সুখ ও দুঃখের সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

যাহা হউক অদ্য প্রভাতে গুণনিধির বৈঠকখানায় বিস্তর লোক সমাসীন। এক দিকে স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়া বাবুর জন্মতিথির ঠিক্ সময় নিরূপণ করিতেছেন। অপরদিকে দৈবজ্ঞগণ একত্র হইয়া আগামী ৫৫ বৎসরের শুভাশুভ নির্ঘণ্ট করিতেছেন। এক দিকে কবি সম্প্রদায় বাবুকে দুই চারিটি নূতন কবির দলের লড়ায়ের প্রস্তাব করিতেছেন, ভট্টাচার্য্যেরা সন্দেশ, ঘড়া, উত্তম সাটী বিতরণের ব্যবস্থা দিতেছেন, দূরে দশ বারটি সমাজচ্যুত ভদ্র লোক পুনরায় সমাজে আসিতে পারেন এই আশায় দীনভাবে নানা রূপ স্তব স্তুতি করিতেছেন। বৈটকখানার বাহিরে কপাটের কিঞ্চিৎ অন্তরে অবগুণ্ঠিতা কয়েকটি ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক উপস্থিত আছে, বাবু সাবকাশ মত তাহাদেরও আবেদন শুনিবেন। দপ্তর খানায় তৈল, সন্দেশ, দধি, মাখন, ও কাপড় ওয়াল, বাজন্দর প্রভৃতি বিস্তর লোক আপনাপন জিনিশের গুণকীর্ত্তন করিয়া দাওনজিকে দস্তুর মত দস্তুরি দিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। এইরূপ কোলাহলে বহির্বাটী পরিপূর্ণ। অন্দরে গৃহিণীও বিশেষ ব্যস্ত। পল্লীর অনেক কুলমহিলা, সধবা ও বিধবা, মালিনী, নাপ্তিনী ও গোয়ালিনী প্রভৃতি অনেক লোক অনেক রূপ সুপরিস করিতেছে গৃহিণী কয়েক জন প্রিয় সহচরী সহায়ে তাহাদিগের প্রার্থনা অসাধ্য, দুঃসাধ্য সুসাধ্য, বা দূরসাধ্য তাহার বিচার করিতেছেন। কৃষ্ণা এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া শুনিতেছেন, তাঁহার কোন প্রার্থনা নাই, সুতরাং আশা, ভরসা, হতাশা কিছুই নাই; কিন্তু কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন কৃষ্ণাকে ভাল সাটী ও সোনার কঙ্কণ দিবেন, সে কথা কৃষ্ণা শুনেন নাই।

সর্ব্বপশ্চাতে রূপচাঁদের দরবারও আজ নিতান্ত মন্দ নয়। রূপচাঁদও আজ বড় ব্যস্ত। অনেক দাস দাসী আজ নিজের নিজের জন্য তাহাদিগের মেয়ে বোনঝি

প্রভৃতির জন্য, রূপচাঁদকে সুপারিস করিতেছে এবং আপনাপন কাজের গুরুত্ব ও গুণের ব্যাখ্যা করিতেছে। রূপচাঁদ বিশেষ ক্ষমতাবান্ লোক, সে এ সমস্ত শুনিতেছে ও সময়ে সময়ে কর্ত্তাবাবুর ডাকে উত্তর দিতেছে, এবং সম্মুখে কতকগুলি কড়ি রাখিয়া বাবুর জন্য সংবৎসর যে সমস্ত ঘৃতকুম্ভ আনিয়াছিল, তাহারও তালিকা রাখিতেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য কর্ত্তাবাবুর জন্মতিথিপূজা। প্রভাতে সদর বাটীর দ্বারদেশে দুইটি সপত্র কদলী বৃক্ষ ও সপুচ্ছ নারিকেল ফল সমাচ্ছাদিত পূর্ণ কুম্ভ রাখা হইয়াছে, এবং দ্বারের উপরে আম্রপত্রের মালা ঝুলান হইয়াছে। কর্ত্তা বাবু প্রাতে উঠিয়া মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া সবান্ধবে ভাগীরথীতীরে আসিয়া বসিলেন। সেই খানে রূপচাঁদ বাবুর কোমল অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। বাবু স্নানহেতু জলে নামিলেন, পুরোহিত অমনি রূপচাঁদের হাত হইতে একটি লেঠা মাছ লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বাবুর হস্তে দিলেন। বাবু উহা কষ্টস্পৃষ্টে লইয়া জলে ছাড়িয়া দিলেন, অমনি বন্ধুসকল একস্বরে বলিয়া উঠিল "বেস্ বেস্, বেস্ ছাড়া হইয়াছে"—যেন বাবু কত দুরূহ কার্য্য করিলেন। জলের মাছ জলে গেল, কর্ত্তার সৌভাগ্য স্থির রহিল। স্নানান্তে বাবু তীরে উঠিয়া নববস্ত্র পরিলেন, পরিবার সময়ে রূপচাঁদ অনেক সহায়তা করিল। তৎপর অন্য একজন ভৃত্য সভয়ে ও সসম্ভ্রমে স্কন্ধদেশে একখানি কোঁচান উড়ানি রাখিল। ইত্যবসরে পুরোহিত একটি ফুলমালা বাবুর গলদেশে দিলেন। বাবু জোড়হস্তে প্রণাম করিয়া বাটী অভিমুখে চলিলেন। পল্লীস্থ অনেক দুঃখিনী অবলা পূর্ণকুম্ভ লইয়া রাস্তার দুই ধারে দণ্ডায়মানা, বাবু যাইবার সময়ে সকলের পূর্ণকুম্ভে এক একটি টাকা দিতে ইঙ্গিত করাতে রূপচাঁদ কোনটিতে একটি কোনটিতে দুইটি ফেলিয়া যাইতে লাগিল। বাবু গৃহপ্রবেশের সময় অন্তঃপুর হইতে শঙ্খধ্বনি হইল। গুণনিধি সেই বেশে লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিতে চলিলেন। তিনি ঠাকুর বাটীতে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন পূজার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণা সে স্থানে উপস্থিত নাই, সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে আহ্নিক করিতে বসিলেন। আহ্নিকান্তে কর্ত্তাবাবু পুনরায় চারিদিকে চাহিলেন, কৃষ্ণা নাই, নিশ্বাস ফেলিলেন। এদিকে জন্মতিথিপূজা আরম্ভ হইল। বাবু আসনে বসিয়া রহিলেন। পুরোহিত বহু আড়ম্বর করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, ধুম ধূনার সুগন্ধি ধূমে ঠাকুরবাটী পরিব্যাপ্ত হইল। তিন চারি দণ্ডকাল ধরিয়া পূজা হইল। পূজার পর বাবু বাৎসরিক নিয়মিত কাঁচা দুগ্ধ ও তিল বাটা একত্রে পান করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। বাবুর হৃদয় আজ ক্ষুণ্ণ, মুখে যে একটু হাসি আসিতেছে, সে হাসি বর্ষাকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় অতি অল্পক্ষণ মাত্র প্রকাশ পাইতেছে।

কাঁদিছে হৃদয় কিন্তু দেখাবার নয়।
বাহিরে সমাজ-ভয়, অন্তরে প্রলয়॥

গুণনিধি এইরূপ চিত্তে পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে পা দিলেন। সৌভাগ্যমলয়ানিল এখনও আশারূপ নন্দন-বন হইতে বিকশিত কুসুমরেণুর সুগন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। মানসরূপ সরোবরে অভিলাষ মরাল নিকটবর্ত্তিনী তমস্বিনীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া এখনও ডুবিয়া ডুবিয়া সুখে সন্তরণ করিতেছে।

ক্রমে বেলা অবসান হইল। আনন্দময়ী সন্ধ্যা উপস্থিত। বাহির বাটীতে দীপমালা প্রজ্বলিত হইতেছে। রাত্রির অভিনব দৃশ্য সুরসিক দর্শক বৃন্দের সমক্ষে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে, অবকাশের জন্য, কিয়ৎকালের নিমিত্ত, আমরা যবনিকা ফেলিলাম। ভরসা করি, ইত্যবসরে মাননীয় সুবিখ্যাত বঙ্গীয় সমালোচক সম্প্রদায় একতান বাদনে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি করিবেন।

(ক্রমশঃ।)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র।"

২। "কমলে কামিনী বা ফুলেশ্বরী।"

৩। "ঊষা হরণ বা অপূর্ব্ব মিলন।"

৪। "হর-বিলাপ।"

৫। "মায়াবতী।"

৬। "প্রণয় পারিজাত বা মন্মথ মনোরমা।"—শ্রীরাধা নাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

এই তালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক গুলি সাধারণতঃ গীতি-নাটক নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহার প্রথম পাঁচ খানি পৌরাণিক কথা লইয়া রচিত হইয়াছে। এ সকল কথা এত দিন যাত্রার সামগ্রী ছিল, এইক্ষণ গীতিনাটকে গ্রথিত হইতেছে। শেষোক্ত পুস্তক খানি পৌরাণিক কোনও প্রসিদ্ধ কথা লইয়া রচিত হইয়া না থাকিলেও ইহার নায়ক নায়িকা এবং অপ্সরা ও পিশাচী পৌরাণিক কল্পনার ছায়াতলেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

গ্রন্থকার গীত-রচনায় অনেক স্থলে বিশিষ্ট গুণপণা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার একটি গীতের সমস্ত শব্দই মকারাদি এবং আর একটি গীতের সমস্ত শব্দই পকারাদি। আমরা এই গীত দুইটি নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

ম

"মনমথ মনোরমা মরি মরি মিলিল!
মিথুন মিলনে মন মহামোদে মাতিল।
মনোরমা মনোমত, মিলিয়াছে মনমত,
মধু মাখা মধুর মিলনে মন মজিল!
মানস মোহন মিলনেতে মন মোহিল।"

প

"প্রণয় প্রসূন পারিজাত প্রস্ফুটিত।
পুলকে পাইল প্রীতি প্রেম-পীড়িত।

"প্রেম পরিণয়, পূত প্রেমে প্রেমময়,
প্রেমিকা প্রেমিক পাশে প্রেমে পালিত।
প্রেমপাগলিনী পানা,পেয়ে পতি পতিপ্রাণা,
পাইলা পরমপ্রীতি প্রেমে প্রমোদিত।
প্রণয় পারিজাতে প্রণয়ী পুলকিত।"

কিন্তু আমাদিগের নিকট এইরূপ বর্ণগত গুণপণার গীত অপেক্ষা রাধানাথ বাবুর অন্যান্য অনেক গীত অধিকতর প্রীতিপ্রদ বোধ হইয়াছে।

বাবু রাধানাথ মিত্র কবিতা রচনায় নূতন ব্রতী কিংবা অকৃতী নহেন। তাঁহার মেঘেতে বিজলী কিংবা উষাহরণ পড়িলে সকলেরই মনে এইরূপ আশা জন্মিবে যে, তিনি যদি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে পৌরাণিক কোন প্রসঙ্গ লইয়া তিনি একখানি দীর্ঘ স্থায়ি ও সুপাঠ্য কাব্য রচনা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কেন এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহার সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতেছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

৭। "অশ্রুকুঞ্জ। শ্রীরাধানাথ মিত্র দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত।" ইহাতে ভারতভূমির প্রতি ভক্তি ও ভাল বাসার পরিচায়ক পোনরটি সঙ্গীত আছে। গীত গুলি প্রশংসাযোগ্য। ইহার প্রথম গীতটি পাঠসময়ে আমরা অশ্রুকুঞ্জে এক ফোটা অশ্রু উপহার দিয়াছি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে এইরূপ জাতীয় সংগীতের নাম গন্ধও ছিল না। এইক্ষণ লিপিকুশল ব্যক্তি মাত্রই সঙ্গীতচ্ছলে জননী জন্মভূমির উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা 'সময়ের লক্ষণ' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

৮। "চিন্তা কুসুম। শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।" আমরা এই নবীন গ্রন্থকারের লুক্রেসিয়া নামক কাব্য পাঠ করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, তাঁহার এই চিন্তা কুসুম পাঠে ততোধিক প্রীতি লাভ করিলাম। এই গ্রন্থে প্রলাপ, প্রফুল্লকমল, প্রেম, অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিকল ইত্যাদি শীর্ষক কতক গুলি উৎকৃষ্ট খণ্ডকবিতা নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার কোন কোন কবিতা পড়িয়া আমরা গ্রন্থকারকে উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন লোক বলিয়া মনে করিয়াছি। কালীপ্রসন্ন বাবুর রচনা কিরূপ হৃদয়হারিণী তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা চিন্তা কুসুমের কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এইরূপ লেখা যে কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই মনোমদ হইবে, তাহাতে আমাদিগের অণুমাত্রও সংশয় নাই।

* * * * *

পাষাণ হৃদয়ে তারে রেখেছি আঁকিয়া
নয়নের জলে হায় সে মূর্ত্তি কি মুছা যায়
সেই মূর্ত্তি সেই থানে রহেছে জাগিয়া।
পাষাণ হৃদয়ে তারে রেখেছি আঁকিয়া।
বিষাদবারিধি বুকে বহে যদি শত মুখে
তবু কি সে চিত্র যাবে অন্তর ছাড়িয়া?
পাষাণ হৃদয়ে তারে রেখেছি আঁকিয়া।
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রাণ কাঁপিবে, পলাবে জ্ঞান
তথাপি সে মূর্ত্তি রবে হৃদয় শোভিয়া।
পাষাণ হৃদয়ে তারে রেখেছি আঁকিয়া॥

*　　*　　*　　*

মনে আছে পুর্ব্ব কথা পুর্ব্বের সকলি
হতেছে স্মরণ ;
উচ্চ আশা ছিল মনে রাখিতাম সঙ্গোপনে
কোথা সে আশার ছল নিশার স্বপন।
দুরাশার প্রলোভনে কত কি ভেবেছি মনে
সে সব সুখের স্বপ্ন কোথায় এখন !
ভেঙ্গেছে সে সুখস্বপ্ন গিয়াছে এখন
ছল দুরাশার।
স্মৃতিমাত্রে পরিণত সে সুখ হয়েছে গত
সুখপ্রদ কই আর সুন্দর সংসার !
সকলি তো দূরে গেছে তবু চিন্তা মনে আছে
দিবা নিশা বর্ষ মাস গেছে বার বার
তখনো আমার চিন্তা এখনো আমার।

*　　*　　*　　*

বঙ্গভাষা।

কে তুমি বিরলে বসি কাঁদিতেছ সুবদনে,
কৃশাঙ্গ মলিন মুখ দুঃখনীর দুনয়নে !
সুরূপা মধুর বাণী
সুধা মাখা অনুমানি
অতুল কোমল কান্তি
কে তুমি লো সুলোচনে।

৯। "আর্য্যগাথা। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক বিরচিত ও শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" ইহাও একখানি সুখপাঠ্য ও সম্মানার্হ গীতিকাব্য। গ্রন্থকার যে কবির হৃদয় লইয়া প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে জানেন, তাঁহার এই গ্রন্থের প্রতি গীতেই তাহার পরিচয় আছে।

১০। "কুলীন বিরহ নাটক। প্রথম খণ্ড। শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত।" গ্রন্থকার আপনাকে ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ শাস্ত্রের ভট্টাচার্য্য, তাঁহার এই অনার্য্যগ্রন্থপাঠে আমরা তাহা বুদ্ধিস্থ করিতে সক্ষম হইলাম না। বাঙ্গালায় ইদানীং অনেক প্রকার কদর্য্য পুস্তক লিখিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এই কুলীন বিরহ নাটকের মত কদর্য্য বস্তু শীঘ্র আমাদিগের হাতে উঠে নাই। মেছো বাজারের জেলেনীরা যদি হাতে কালীকমল লইয়া নাটক লিখিতে বসে, বোধ হয় তাহারাও এই ভট্টাচার্য্য গ্রন্থকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রুচির পরিচয় দান করিবে। কেবল যে কুরুচিই এই গ্রন্থের মুখ্য দোষ, তাহা নহে, ইহার একটি পংক্তিতেও বুদ্ধিমত্তা কিংবা কোন রূপ মানসিক ক্ষমতার পরিচয় নাই। কাব্য অথবা নাটক কাহাকে বলে, গ্রন্থকার তাহা জানেন না। ভদ্র লোকের জন্য পুঁথি লিখিতে গেলে, অন্ততঃ শব্দ বিন্যাস বিষয়েও যে একটুকু সাবধান হইতে হয়, বোধ হয় তাহাও তিনি বোঝেন না। তাঁহার এই গ্রন্থ তদীয় অদৃষ্টপুর্ব্ব নাটকের প্রথম খণ্ড বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা জননী বঙ্গভারতীর নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই প্রার্থনা করি, ইহার দ্বিতীয় খণ্ড যেন কখনও প্রকাশিত না হয়। গ্রন্থকারের রচনা-ক্ষমতা কিরূপ অদ্ভুত, তাহার নিদর্শন স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পুস্তকের কোন স্থান হইতেই কোনও অংশ উদ্ধৃত করিয়া

দিতে আমাদিগের সাহস হয় না। আমরা তথাপি চো'খ মুখ বুজিয়া নিম্নে কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলাম। গ্রন্থকার যে বর্ণবিন্যাস বিষয়েও ঘোরতর ভট্টাচার্য্য এই পংক্তি কয়টিতে তাহারও বিশিষ্ট পরিচয় আছে।

"বিমলা। এই যে—জাই গো জাই। কোথা লো বিরহিনী! বেস্ অমন করে যে বসে আছিস্! আজ্ ব্যের দিন; আহ্লাদের সীমা নিই; রসে গদ গদ হবি 'মরা গাছে ডালা মেল্‌বে' তুই কি কচি ছেলে—কিছু বুঝিচ্ শুঝিচ্ নি। আয় আয় চুল গুল বেন্ধে দি, দেখেই যেন মনোহরের মন্ ভুলে যায়।

"বিরহিনী। নে ভাই। চিকণ ঠাট্টা করিস্‌নি; এখন আর চিকণ কালনি; "বুড় শালীকের ঘারে লোম।"

"বিম। ওলো! গাল্ উঠেনি।

"বির। গাল উঠা আবার কিসের—

"সরলা। ওলো মাগী! কাল্ হতে বুঝা যাবে? আঁচলে আঁচলে বেঁধে রাখ্‌তে চাবী; কেউ যেন দেখ্‌তে পায়নি।

"বির। আমি রাখ্‌তে চাইনি; যার কাজ থাকে নে যা, ওলো বিমলে! ও সরলে! তোরা যেয়ে বাপ্ মাকে বলে আয়; আমি ব্যে বস্‌বো নি।"

'জাই গো জাই,—এস্থলে পাঠশালার দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরাও এইক্ষণ আর বর্গীয় জ ব্যবহার করে না। 'বুড় শালীকের ঘারে লোম।' এস্থলে ঘাড়ে লেখা উচিত ছিল। কিছু 'বুঝিচ্ শুঝিচ্ নি।' 'চিকণ ঠাট্টা করিসনি;' এ সকল স্থলে কি অর্থে কেমন করিয়া 'নি' ব্যবহৃত হইল, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আমরা উড়ে দিগের বাঙ্গালা পড়িয়াছি, এই গ্রন্থের অনেক স্থলে এমন আশ্চর্য্য রকমের বাঙ্গালা আছে যে, উড়ে বাঙ্গালাও তাহার নিকট ধিক্কৃত ও লজ্জিত হয়।

১১। "সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তত্ত্ব অর্থাৎ হানিমান প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা প্রণালী বিবৃতি এবং সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা।"—চিকিৎসা গ্রন্থ যে সাধারণতঃ অব্যবসায়ীর ব্যবহারোপযোগী হয় না, তাহার মুখ্য কারণ ভাষার কাঠিন্য। অথচ চিকিৎসা গ্রন্থে চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন আছে, গৃহস্থেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা তত্ত্ব চিকিৎসক ও গৃহস্থ উভয়েরই ব্যবহারে আসিবে। ইহার ভাষা সরল, সুখবোধ্য এবং বিষয়াংশে ইহা অতীব মূল্যবান্ বস্তু। যাঁহারা হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই বহুযত্নসংকলিত পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে বিশিষ্টরূপ উপকৃত হইবেন এবং অন্যেরও উপকার করিতে পারিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

১২। "সুখ। (পার্থিব ও আধ্যাত্মিক)। কলিকাতা। বাগবাজার ষ্ট্রীট ২—১ নং মণিরায় যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।' এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি, পার্থিব সুখ হইতে আধ্যাত্মিক সুখের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার

জন্য লিখিত হইয়াছে। সুতরাং লেখকের অভিপ্রায় সাধু। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কিছু মাত্র নূতনত্ব দেখিতে পাইলাম না। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক সুখকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট রেখাদ্বারা পৃথক্ করা যায় কিনা, সে বিষয় আমাদের সন্দেহ আছে। প্রকৃত সুখ কিসে হইবে, তাহাও নিশ্চয়তার সহিত বলিবার যো নাই। যদি এই বিষয়ে কোন মীমাংসা সম্ভব হয়, তবে তাহাতে পৌহুঁছিতে এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিদ্বারা অগ্রসর হইতে হইবে। লেখক পার্থিব সুখের অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণ করিতে যে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া আধ্যাত্মিক সুখের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারাযায়। লেখকের লিপিকুশলতা সাধারণতঃ দোষশূন্য; আমাদের ভরসা হয়, তিনি চেষ্টা করিলে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিতে পারেন।

১৩। "শ্মশান ও জীবন। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।"—বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখনী অবিশ্রান্তই বটে।

"অবিরাম গতি, নদী বাধা নাহি মানে;
বিরাম যে কি, তা, গঙ্গা কভুনাহি জানে।"

কিন্তু অবিশ্রান্ত হইলেও তদীয় লেখনী যে অমলমুক্তাফল-প্রসবিনী সে বিষয়ে এইক্ষণ আর কাহারও সন্দেহ নাই। আমাদিগের অদ্যকার সমালোচ্য শ্মশান ও জীবন নামক অভিনব খণ্ডকাব্যও এই কথার অন্যতর প্রমাণ। ইহাতে দার্শনিক চিন্তা এবং কবিতার কল-গাথা একত্র মিশিয়াছে এবং আমাদিগের বিবেচনায় ইহা একথানি সুপাঠ্য বস্তু হইয়াছে। ইহার দ্বারা রাজকৃষ্ণ বাবুর 'গ্রন্থাবলী' অলঙ্কৃত হইবে।

১৪। 'নব্যভারত। মাসিকপত্র ও সমালোচন। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।' আমরা ইহার প্রথম দুই সংখ্যা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া বিশিষ্ট রূপে উৎসাহিত হইয়াছি। এক ভাবে দেখিতে গেলে, বঙ্গীয় লেখকগণ ইদানীং দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণির লেখকগণ ধীর অথচ উৎসাহহীন, স্বজাতিবৎসল ও স্বদেশভক্ত অথচ আশাশূন্য। আর এক শ্রেণির লেখকেরা নূতন উৎসাহ ও নূতন আশায় উৎফুল্ল, উদ্যমপূর্ণ এবং অনুরাগের নূতন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। যাঁহারা নব্যভারতের সহিত প্রকৃত রূপে সম্বন্ধ, তাঁহাদিগকে এই শেষোক্ত শ্রেণির বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, কোনও অংশেও সত্যের অপলাপ হইবে না। ইহাঁরা সত্যপ্রিয় ও কর্ত্তব্য পরায়ণ। সমাজ ও রাজনীতির নূতন সংস্করণই ইহাঁদিগের মূল উদ্দেশ্য। ইহাঁদিগের এই নূতন উৎসাহ দিন কতক অটুট রহিলে দেশের উপকার হইবে সন্দেহ নাই। ইহাঁদিগের এই উদ্যমে বাঙ্গালার সাহিত্যেরও যে আংশিক পরিপুষ্টি হইবে, তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বীকার করা যাইতে পারে।

১৫। "হোমিওপ্যাথি—প্রচারক। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। ঢাকা হোমিওপ্যাথিক স্কুল হইতে প্রকাশিত।" আমরা এই পত্রিকাখানির দুই সংখ্যা পাঠকরিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি।

যাঁহারা ইহার লেখক, তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট হোমিওপেথিক চিকিৎসক বলিয়া ঢাকাতে সুনাম উপার্জ্জন করিয়াছেন। ইহাঁরা যে আপনাদের চিকিৎসাশাস্ত্র সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন, ঢাকার হোমিওপ্যাথিক স্কুল ও সমালোচ্য মাসিক পত্রিকাখানি তাহার নিদর্শন। পত্রিকাখানির অন্যান্য বিষয় হইতে "চিকিৎসিত রোগ বিবরণ" সাধারণের পক্ষে সুপাঠ্য ও মনোরম হইবে এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই। যদি ইহা এইরূপ দক্ষতার সহিত বরাবর লিখিত হয়, তবে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র প্রচারে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী হইবে, আমরা নিঃসংশয় চিত্তে একথা বলিতে পারি।

১৬। "ভেদ বমি অর্থাৎ ভেদ বমি না হওয়ার সম্বন্ধে সর্ব্বদা পালনীয় সাধারণ উপদেশ ইত্যাদি। সহর সেরপুর চারু যন্ত্র। মূল্য ৵১০ পাই।" ইহার অবয়ব ডিমাই ১৬ পেজির ১২ পৃষ্ঠা; ইহাতে সাধারণতঃ শরীরের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং বিশেষতঃ ভেদ বমি হইতে শরীর রক্ষণোপযোগী কতকগুলি উপদেশ গ্রথিত হইয়াছে। পুস্তকখানিকে ভাজ করিয়া চাদরের আঁচলে বাঁধিয়াই যেখানে ইচ্ছা সেখানে নেওয়া যাইতে পারে, সুতরাং প্রত্যেকে ইহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে এবং ইহা দ্বারা আপনার স্বাস্থ্য নিয়মিত করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাস্থ্যবিষয়ে অল্প লোকেই উপদেশের অধীন হইতে চাহে; চিরাভ্যস্ত রীতি নীতি পরিত্যাগ করা সাধারণ লোকের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। শৈশবে যে সমস্ত কদভ্যাস সৃষ্ট হয়, চির জীবন তাহা প্রবল থাকে। আমাদের দেশে সন্তানের স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে শিক্ষিত পিতামাতাও যৎপরোনাস্তি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রোগের পূর্ব্বে সন্তানের আহার শয়নাদি কোন নিয়মাধীন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা উহার ঔচ্ছৃঙ্খলতার সম্পূর্ণ প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় পশ্চাৎ প্রদত্ত কোন উপদেশই সুফল প্রদান করে না। এই জন্য আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির 'সাধারণ উপদেশ' গুলির কার্য্যকারিতা সম্পর্কে কিছু সন্দিহান হই; কিন্তু রোগ আরম্ভ হইলে গ্রন্থকার যেরূপ আচরণ বিধি দিয়াছেন, ভরসা করি তাহা প্রত্যেকেই প্রতিপালনে যত্নশীল হইবেন।

১৭। সারস্বত পত্র। ইহাও একখানি সংবাদ পত্র এবং ইহা ঢাকার স্বনামবিখ্যাত সারস্বত সমাজের মুখপত্র বলিয়া প্রচারিত। এদেশের পণ্ডিত সমাজের সহিত সাহিত্যসমাজ কিংবা রাজনৈতিক জগতের কোনও সংস্রব নাই। যদি সারস্বত পত্র বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতবৃন্দকে বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভারতীয় রাজনীতির সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এক মহান্ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ আত্ম সম্পর্কে বিলাপ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে,

"মন তুমি কৃষিকাজ জান না,

এমন মানব জমিন্, রৈল পতিত,
আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত সোণা।"

এই অপূর্ব্ব গীতের দুই একটি পদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে, আমাদিগের পণ্ডিতসমাজ সম্পর্কে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রযুক্ত হইতে পারে। যাঁহাদিগকে লইয়া বঙ্গের পণ্ডিত-সমাজ, তাঁহাদিগের মধ্যে এইক্ষণও অনেক প্রকৃত প্রতিভান্বিত পুরুষ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহারা ন্যায়ের দুর্ব্বোধ তত্ত্বে অনায়াসে অবগাহন করিতে পারেন, বাদার্থের অনুস্বার ও বিসর্গ লইয়া সৃষ্টি স্থিতি বিঘটন করিতে শক্তি রাখেন, এবং ভাষার আকুঞ্চন ও বিকুঞ্চন বিষয়ে এখনও অনেকে বীণাপাণির বরপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ বিচিত্র শক্তির শেষ ফল কি? না, ঘৃতপুষ্ট ধনিসন্তানের স্তুতি-গীতগান এবং যাহার নিকট একটি পয়সার প্রত্যাশা আছে, তাহার নিকট একবার সেই চিরশ্রুত "শ্রুত্বাতিদূরে" কবিতার আবৃত্তি পাঠ। ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয়। আমরা ভরসা করি, সারস্বত পত্র মৃতকল্প পণ্ডিতসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সমাজের শক্তিবর্দ্ধন করিবে এবং প্রাচীন ও নব্যের সম্মিলনভূমি হইয়া আপনাকে সার্থক করিতে ক্ষমবান্ হইবে। ইহার লেখা বিশুদ্ধ কিন্তু একটুকু সংস্কৃত-বহুল। বোধ হয় কালে ইহা এক খানি গণ্য মান্য পত্রিকা হইয়া উঠিতে পারিবে।

১৮। সময়—ইহা একখানা সুলভ এবং মূল্যবান্ সাপ্তাহিক পত্র। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নব প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এ দেশে সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চ্চার উৎসাহ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সময়, ও এই শ্রেণীস্থ কয়েক খানি পত্রিকার প্রফুল্লিত নবচ্ছবি দর্শন করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। সংবাদ পত্রের বহুল প্রচার এদেশে যে পরিমাণ প্রার্থনীয়, ইহাদিগের এইরূপ সতেজ ও সোৎসাহ আবির্ভাব সেই পরিমাণে আনন্দদায়ক। আমরা সময়ের কএক সংখ্যা পাঠ করিয়াই সুখী হইয়াছি, এবং ইহা যে বর্ত্তমান থাকিলে কালে একখানি বিশেষ মান্য সংবাদ পত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা, ঐ সমুদায় নবাবির্ভূত পত্র সমূহের নিকট এই মাত্র আশা করি যে, যেমন অবয়ব ও বাহ্যিক সৌষ্ঠব বিষয়ে, তাঁহারা বাঙ্গালায় নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, বিষয়ের গুরুত্বেও তেমনি তাঁহারা তাহাদের বৈশেষিকতা অক্ষুন্ন রাখিতে যত্নবান্ হইবেন।

লেখক পাঠক ও সমালোচক।

বাণিজ্য-জীবী ইংরেজদিগের ভাষায় বাণিজ্যোপযোগী একটি প্রবচন আছে। যথা—"আধসের যুক্তির অপেক্ষা আধছটাক উপমা অধিক মূল্যবান *"॥ এই প্রবচন অনুসারে আমরা লেখক, পাঠক ও সমালোচক ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা উপমা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমরা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন অনুসন্ধান করিয়া তিনটি উপমা সংগ্রহ করিয়াছি। কালিদাস উপমা বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু পাঠক যখন আমাদের উপমা সমুচ্চয় পাঠ করিবেন, তখন বা বিক্রমাদিত্যের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হয়! অহো! বয়ং কালিদাস-প্রতিদ্বন্দ্বিনঃ। আমাদিগকে ধন্য!

প্রথম উপমা। লেখক ব্রহ্মাস্বরূপ। দেখুন, লোক-পিতামহ সুরূপ, বিরূপ, কুরূপ, অরূপ, বহুরূপ, প্রভৃতি কতপ্রকার রূপেরই সৃষ্টি করিতেছেন। পৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য বাস করে, কিন্তু একজনের মুখ আর একজনের মত নয়। বৃক্ষে বৃক্ষে কত কোটি পত্র বিরাজ করিতেছে, কিন্তু একটি পত্রের আকৃতি আর একটি পত্রের মত নয়। অহো! ব্রহ্মার উদ্ভাবন বৈচিত্র্য অচিন্তনীয়। এইরূপে লেখকের উদ্ভাবন-বৈচিত্র্যও অচিন্তনীয়। লেখক ব্রহ্মার ন্যায় বহুতর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখক ব্রহ্মার জগৎ লইয়া স্বীয় উদ্ভাবন-তৃষার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে না পারিয়া অন্য অন্য জগতেরও উদ্ভাবন করিয়াছেন। ড্যাণ্টে, মিলটন, বাল্মীকি, নরক সৃষ্টি করিয়াছেন। মিলটন কালিদাস ও হোমর স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ড্র্যাগন, ইউনিকরণ, ফিনিক্স, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি কত প্রকার অদ্ভুত জীবই লেখক কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত দেখিয়া কে না বলিবে যে লেখক ব্রহ্মার ন্যায় বা ব্রহ্মা অপেক্ষাও সৃজন কুশল?

পাঠক স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ। লেখক যাহা সৃষ্টি করিলেন, পাঠক তাহার প্রতিপালন করেন। বিষ্ণু কখনও কখনও সুরূপ, সুশীল, শিশু সন্তানকে প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া বিরূপ দুঃশীল শিশুর প্রতিপোষণ করেন। পাঠকও অনেক সময়ে সুরচিত, সুযোগ্য, সুবাস, সুশীতল কাব্যের

* "An ounce of illustration is worth a pound of argument."

বিনাশ সম্পাদন করিয়া দুর্গন্ধময় ন্যক্কার জনক, বিভীষণ, বীভৎস কাব্যের সমাদর করেন, দীনবন্ধু ও মাইকেলের অনাদর করিয়া বটতলার নাটক-ময়ী দুষ্ট-সরস্বতীর উপাসনা করেন। বিষ্ণু অসুর বধার্থ নানা যুগে নানা অবতার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পাঠকও কাব্যাসুরবধার্থ নানা বেশ পরিগ্রহ করেন। পাঠক কখনও বা মৌনীবেশ ধারণ করেন; এই বেশে দীনবন্ধুর সুরধনী নামক অপ্সরা নিহত হইয়াছে। পাঠক কখনও বা ক্রুদ্ধবেশ ধারণ করেন, এই বেশে বিদ্যাসুন্দর নামক পিশাচ নিহত হইতেছে। পাঠক কখনও বা বিরক্ত। এই বেশে রাজনারায়ণ বসুর ধর্ম্মতত্ত্বদীধিতি নামক বলির পাতাল গমন হইতেছে। পাঠক কখনও বা উন্মত্ত। এইবেশে কোন কোন কবির স্বর্গ গমনের পথ নিরুদ্ধ হইতেছে। মদীয় উপমার সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পাদন করিবার জন্য আর একটি কথা এস্থলে বলিতে হইতেছে। বিষ্ণু অপেক্ষা লক্ষ্মী অধিকতর আদরণীয়া। বোধ হয় এই জন্য এখনকার কাব্যেরা বিষ্ণু অপেক্ষা লক্ষ্মীর (পাঠক অপেক্ষা পাঠিকার) মনস্তুষ্টির জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতেছেন। কোন কোন কাব্য বিনা নিমন্ত্রণে রবাহূতের ন্যায় লক্ষ্মীর দ্বারে সমুপস্থিত হইতেছেন *।

সমালোচক সাক্ষাৎ শিবাবতার।

" অতিবড় জ্ঞানী তিনি তর্কেতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ "॥

কাব্য-সমুদ্র-মন্থনে কত পাঠক কত কি সংগ্রহ করিলেন। কোন পাঠক সুধা, কোন পাঠক লক্ষ্মী, কোন পাঠক ঐরাবত, কোন পাঠক উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি মহার্ঘরত্ন লাভ করিলেন। সর্ব্বশেষে সমালোচকরূপ মহাদেব আসিয়া ' গ্রাসিল গরলপ্রবাহে '। সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, এইখানে আমার উপমার ঈষৎ স্খলন হই তেছে। মহাদেব একবার মাত্র ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমালোচকরূপ মহাদেব দিনে শতবার লেখকরূপী ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করিতেছেন। তবে ইচ্ছা করিলে সমালোচক আবার মোহন বেশও ধারণ করিতে পারেন। তখন,

" জটাজূট মুকুট হয়, হয় ফণি মণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র, দিব্য পৈতা ফণি ॥
ছাই দিব্য চন্দন, বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হয় সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ " ॥

তাহা হইলেই পাঠক দেখিলেন লেখক পাঠক ও সমালোচক, বিধি বিষ্ণু ও হরের সহিত উপমিত হইতে পারেন কি না। এইটি আমাদের দিব্যোপমা। মর্ত্ত্য ও পাতাল হইতে যে দুইটি উপমা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে শেষ

---

* একজন লেখক অর্দ্ধ মূল্যে পাঠিকাদিগকে পুস্তক বিক্রয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। আমি বিজ্ঞাপন দিতেছি যে আমি যখন পুস্তক লিখিব তখন বিনা মূল্যে পাঠিকাদিগের নিকট পুস্তক বিক্রয় করিব। কিঞ্চিৎ ডাকমাসুল লইতে আমার আপত্তি থাকিবে না।

করিতে হইতেছে। মর্ত্ত্যে যত যত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণের ব্যাপার সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ও সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। আমরা লেখক পাঠক ও সমালোচককে রাধাকৃষ্ণ ঘটিত ব্যাপার সমূহের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি। লেখক কৃষ্ণ রূপী। কৃষ্ণ নিরন্ন, নির্ব্বস্ত্র, বন্যফলমূলভোজী। অনেক লেখক ও যদৃচ্ছালব্ধ খাদ্যের দ্বারা উদরপূর্ত্তি করেন। কৃষ্ণের এক মাত্র গুণ এই যে, তিনিবংশীবাদনে বড় নিপুণ। লেখক ও বংশীবাদন ব্যবসায়ে সুদক্ষ। তবে কোন লেখক বা কদম্বতলার কৃষ্ণের ন্যায় মনোহর বংশীবাদনে পশু পক্ষীরও চিত্ত বিনোদন করেন। আর কোন লেখক নিম্ববৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া গান্ধার রাগিণী সংযোগে পশু পক্ষীর ভীতি ও বিরক্তি বর্দ্ধন করেন।

পাঠক রাধিকারূপী। তিনি রাজকন্যা, সুরূপা, সুকেশী, সুবেশী ইত্যাদি। তাঁহার গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার লেখকের প্রতি অনুরাগ আছে; কিন্তু তিনি মনের সাধে লেখকের সহিত আলাপ করিতে পারেন না। পাপিষ্ঠা ননদিনী শাশুড়ী স্বরূপা সংসারিকী চিন্তার জন্য তিনি দুই একবার কখনও কখনও গোপনে গোপনে লেখকের সহিত আলাপ করিয়া লয়েন।

সমালোচক বৃন্দাদূতী। ইনি নানা ছন্দে বন্ধে কথা কহিতে পারেন। ইহাঁর হাতনাড়া মুখনাড়া দেখিলে লোকের প্লীহা চমকিয়া উঠে। ইনি যখন কোনও সামান্য কথাও কহেন, তখনও বিকৃত স্বরে, বিকৃত মুখভঙ্গীতে, নাক মুখ ঘুরাইয়া কথা না কহিলে ইহাঁর তৃপ্তি হয় না। ইনি মনে করিলে কথার চোটে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলেন। ইহাঁর আজ্ঞায় আম্রবৃক্ষে কাঁটালের উদ্গম হয়, অন্ধে চক্ষু পায়, কুকবি সুকবি হয়, কাক কোকিল হয়, ও কোকিল কাক হইয়া পড়ে। বান্ধবের সম্পাদক মহাশয়! রাগ করিবেন না। উপমার অনুরোধে আর একটা কথা বলিতে হইতেছে। যাত্রার দলে অধিকারী ভিন্ন আর কেহও বৃন্দাদূতী সাজিতে পারেন না। সেইরূপ মাসিক পত্রে সম্পাদক ভিন্ন আর কাহারও সমালোচক সাজিবার অধিকার নাই। তবে বৃন্দাদূতীর তামাক খাইবার প্রয়োজন হইলে য়্যাসিষ্টাণ্ট দূতী কিয়ৎকালের জন্য আসর রক্ষা করিয়া থাকেন। কোন কোন মাসিক পত্রে আসিষ্টাণ্ট সমালোচকের প্রথা অল্পে অল্পে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে সমালোচকে ও বৃন্দাদূতীতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।

এবারে পাতালের উপমার কথা বলিতেছি। পাঠক সহস্র-শীর্ষ অনন্ত দেব। * সহস্র শীর্ষের সহস্র প্রকার রুচি। কোন শীর্ষ সরস কাব্য চাহেন, কোন শীর্ষ নীরস কাব্যের পক্ষপাতী। কোন শীর্ষ চাহেন বিজ্ঞান, কোন শীর্ষ চাহেন দর্শন, কোন শীর্ষ চাহেন থিওসফি, কোন শীর্ষ চাহেন হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, কোন শীর্ষ চাহেন ব্রা-

* Hydra headed.

ঃধর্ম্মের নিরবদ্যতা, কোন শীর্ষ চাহেন দাসত্ব, কোন শীর্ষ চাহেন ভারত-উদ্ধার। যখনই যে শীর্ষের ক্রোধ উপস্থিত হয়, তখনই সেই শীর্ষের মুহুর্ম্মুহু বিকম্পনে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।

লেখক ঐরাবত তুল্য। ইনি সহস্র শীর্ষ অনন্তের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। অনন্ত যে দিকে শরীর পরিচালিত করিবেন, মহাপ্রভু ঐরাবত ও সেই দিকে পরিচালিত হইবেন। যখন অনন্ত দেব পুণ্যের দিকে ঝোঁক দেন, তখন ঐরাবত হইতে বাল্মীকি, বেদব্যাস প্রভৃতি মন্দাকিনী নিঃসৃত হন। আর যখন অনন্ত দেব পাপের দিকে ঢলিয়া পড়েন, তখন ঐরাবত হইতে পঙ্কিল জয়দেব, ভারত-চন্দ্র প্রভৃতি উদ্গীর্ণ হয়।

সমালোচক ঐরাবত পৃষ্ঠস্থ কচ্ছপ সদৃশ। কঠোর, কর্দ্দম-বিহারী কদাকার। কচ্ছপ ঐরাবতের পক্ষে নিতান্ত ভারবহ। সংসারের কোন কার্য্যই কচ্ছপ হইতে সম্পাদিত হয় না। দেখুন কচ্ছপ আহারে, বিহারে শয়নে উপবেশনে কোন কার্য্যেই মনুষ্যের ব্যবহারে লাগে না। পরন্তু কচ্ছপের নাম করিলে কার্য্যহানি হয়। সেই রূপে সমালোচক মনুষ্যের কোন কাজে লাগে? আর সমালোচকের নামে যে কার্য্যহানি হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

যদি সমালোচকগণ আমাদের এই ক্ষুদ্র ও অসার প্রবন্ধের অনির্ব্বচনীয় প্রশংসা না করেন, এবং যদি পাঠক আমাদের এই প্রবন্ধ আদরের সহিত কণ্ঠস্থ না করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের নামে আরও নিকৃষ্ট উপমা সংগ্রহ করিব, এবং নগরে নগরে দেশে দেশে বনে বনে, ঘরে ঘরে, দ্বারে প্রচার করিব যে

" পরম অধর্ম্মাচারী সমালোচগণ "
ও " পরম অধর্ম্মাচারী পাপিষ্ঠ পাঠক "।

শ্রীঃ—

প্রাচীন পেচকের নবীন দর্শন

আমার শয়নগৃহের অনতিদূরে এক প্রাচীন পেচক বাস করেন। পেচকবর মহাজ্ঞানী। আমি একদা তাঁহার জ্ঞানের প্রাচুর্য্য ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলাম। পেচকরাজ সর্ব্বদাই ম্লানমুখে অবস্থিতি করেন দেখিয়া আমি একদা সহানুভূতি প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ' পেচকবর! আপনি গম্ভীরভাবে সর্ব্বদা কিসের চিন্তা করেন? ' পেচকবর গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন " আমি ভাবিতেছি ডিম্ব ও শাবক এ উভয়ের মধ্যে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী? ডিম্ব না হইলে শাবক হয় না। আবার অন্যদিকে বিনা শাবকে ডিম্বেরও উৎপত্তি অসম্ভব। আমি ভাবিতেছি ডিম্বই শাবকের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা শাবকই ডিম্বের পূর্ব্ববর্ত্তী।"

আমি পেচকরাজের প্রশ্ন শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম, এবং আমার মনুষ্যবুদ্ধিতে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া পেচকরাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম ' ভো জ্ঞানার্ণব, আপনি এ প্রশ্নের কি মীমাংসা করিয়াছেন ? ' পেচকবর বলিলেন, ' এ প্রশ্নের মীমাংসা অতি জটিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যদি ডিম্বের ডিম্বত্বকে ডিম্বতাবচ্ছেদে কার্য্যাবচ্ছিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ডিম্বকেই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যদি শাবকের শাবকত্বাবচ্ছেদকে শাবকত্বাবচ্ছিন্ন হইতে পৃথক করা যায় তাহা হইলে শাবকত্বকেই কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতে হয়। ' আমি এই মীমাংসায় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম ' পেচকবর ! আমি সংস্কৃত বুঝি না, আপনি ইংরাজীতে ইহার ব্যাখ্যা করুন। ' পেচকবর বলিলেন—"If you take the causativity of the egg abstracted from the permanent possibility of the chicken *i. e* if the homogeneity of the egg be evolved from the heterogeneity of the chicken, then according to egoistic hedonism superinduced upon Hedonistic Utilitarianism, the egg is the cause of the chicken and *vice versa*." আমি ইংরাজীতে এই ব্যাখ্যা শুনিবামাত্রই আনন্দে গদ্ গদ্ হইয়া পেচকবরের অগাধ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলাম এবং সেইদিন অবধিই পেচকবরকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি করিয়া আসিতেছি।

গতকল্য নিশাভাগে পেচকবর ' অহো অহো অত্যাহিতঃ অত্যাহিতঃ* ' বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিয়া আমার নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত সমুৎপাদন করিতেছিলেন। আমি আস্তে ব্যস্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পেচকরাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম " আপনি কি বলিতেছেন ?" পেচকবর বলিলেন " অত্যাহিতঃ অত্যাহিতঃ " আমি বলিলাম " জ্ঞানসিন্ধো ! আপনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হইয়াছেন। আজি এই শারদীয় পার্ব্বণে " অত্যাহিতঃ " কোথা হইতে আসিবে ? ' পেচকবর অধিকতর কর্কশরবে বলিলেন " অত্যাহিতঃ অত্যাহিতঃ "। আমি বলিলাম ' জ্ঞানজলধে, আপনি কি বলিতেছেন প্রকাশ করিয়া বলুন।' পেচকরাজ বলিলেন ' শ্রবণ কর। তোমাদের প্রথম অত্যাহিত এই যে তোমরা আজিও পেচকের আদর করিতে শিখিলে না। তোমরা শুকশারী কোকিল ময়না প্রভৃতি হইতে জ্ঞানলাভ কর, কিন্তু জ্ঞান-প্রস্রবণ পেচককে অনাদর কর। যতদিন তোমরা পেচকের সমাদর করিতে না শিখিবে ততদিন তোমাদের "অত্যাহিতঃ।" আমি বলিলাম "জ্ঞানবারিধে ! ইংরাজেরা আমাদের জ্ঞানগুরু। তাহারাও ত আপনার সমাদর করে না। যদি ইংরাজী হইতে আপনি দু একটা নজীর আমাদিগকে দেখাইতে পারেন তাহা হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া আমরা আপনার ও আপনাদের

* ইংরাজীতে পেচকের রবের অনুকরণ "Towhit Towhit Towhoo Towhoo."

সমাদর করিব।” পেচকবর উত্তর করিলেন—“ইংরাজেরা তোমাদের ন্যায় মূর্খ ও লক্ষ্মীছাড়া নহে। তাহারা পেচকের পূজা করিতে জানে। আমি তিন জনের দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১মনং শেক্সপীয়ার্

“Then nightly sings the staring owl
Tuwhoo
Tuwhit ! tuwho ! a merry note. ”

২য় নং টেনিসন

“I would mock thy (owl's) chaunt anew ;
But I can not mimick it ;
Not a whit of thy tuwhoo,
Thee to woo to thy tuwhit,
Thee to woo to thy tuwhoo
With a lengthened loud halloo
Tuwhit,tuwhit,tuwhit,tuwhoo-o-o”

৩য় নং ওয়ার্ডসওয়ার্থ

“He.............................
Blew mimic hootings to the silent owls,
That they might answer him. And they would shout
Across the watery vale and shout again,
Responsive to his call, with quivering peals
And long halloos and screams and echoes loud
Redoubled and redoubled. Concourse wild
Of jocund mirth and din.”

পেচকরাজ এই তিন প্রবল নজীর দেখাইয়া গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘আর চাই?’ আমি বলিলাম—‘না।’ পেচকরাজ বলিলেন ‘কেবল দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতি ব্যতীত আর সমস্ত জাতিতেই মনুষ্যপেচক আছে।’ আমি বলিলাম “জ্ঞানপয়োদ! মনুষ্য-পেচক কিরূপ জন্তু।” পেচকবর বলিলেন—‘মনুষ্য-পেচক অন্ধকার প্রিয়, গুহাবাসী, নিন্দাপ্রিয়, জগতের সকল দ্রব্যই তাহার চক্ষে বিষময়, কদর্য্য ও কুফলপ্রসূ। ইয়ুরোপে এই মনুষ্য পেচকের দল ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে “Pessimist” বলে। তোমরা বাঙ্গালায় ইহাদিগকে ‘প্যাঁচামী’ বলিতে পার।’

আমি বলিলাম—‘জ্ঞানাব্ধে! আপনি দুই চারিটি মনুষ্য প্যাঁচার দৃষ্টান্ত দিয়া আমার জ্ঞান-পিপাসার শান্তি করুন।’

পেচকবর বলিলেন ‘আমি তিনটি দৃষ্টান্ত দিব। ১ম দৃষ্টান্ত ভল্‌টেয়ার্। ভল্‌টেয়ার্ পেচক-শ্রেষ্ঠ। তাহার চক্ষুর আবর্ত্তনে, কুটিল হাস্যে, এবং উষ্ণ নিশ্বাসে ফ্রান্সের ধর্ম্ম, নীতি, উদারতা প্রভৃতি ঠাকুরুণ দিদীর উপকথা সমস্ত পুড়িয়া ছারখার হইল। মনুষ্য মনুষ্যকে বিনাশ করিতে লাগিল। রক্ত-স্রোতে ফ্রান্সদেশ পরিপ্লাবিত হইল। ২য় দৃষ্টান্ত সুইফ্‌ট। সুইফ্‌ট পেচক বাদে বড় নিপুণ ছিলেন। সুইফ্‌ট দেখাইলেন জ্যোতিষ অসার, বিজ্ঞান অসার, ধর্ম্ম অসার, রাজনীতি অসার, বল অসার, বুদ্ধি অসার।

সুইফ্‌ট আরও দেখাইলেন মনুষ্য পশু অপেক্ষাও অধম। ৩য় দৃষ্টান্ত থ্যাকারে।' থ্যাকারের নাম স্মরণ করিয়াই পেচকরাজ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বারম্বার 'অত্যাহিতঃ অত্যাহিতঃ' করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—'জ্ঞান-পারাবার! কি হইয়াছে?' পেচকরাজ বলিলেন 'বৎস থ্যাকারের জন্য আমার হৃদয়ে ঘন ঘন শল্যবিদ্ধ হইতেছে। আহা! আর কে দেখাইবে যে, বালকের সরলতা, যুবতীর প্রেম, যুবকের উদারতা, মাতার আদর, পিতার স্নেহ, পুত্রের ভক্তি, যাজকের ধর্ম্মানুরাগ, দেশহিতৈষীর দেশানুরাগ সকলই আকাশকুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় কথার কথা। ভ্যানিটী ফেয়ার পেচক-বাদের বাইবেল স্বরূপ। আহা! থ্যাকারে বিহনে পেচকমাতার ক্রোড়-দেশ শূন্য হইতেছে। ইয়ূরোপে এতদ্ভিন্ন আর ও সহস্র সহস্র মনুষ্য পেচক আছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে পেচকও নাই, পেচকের সমাদরও নাই।' আমি বলিলাম 'জ্ঞানরত্নাকর! আপনি নিরাশ হইবেন না। সবুরে মেওয়া ফলে। কিন্তু আপনি এক্ষণে 'অত্যাহিতঃ' বলিতেছিলেন কেন? পেচকবর বলিলেন 'এই যে পূজা আসিতেছে ইহা অত্যাহিতঃ।' আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম—'হে অহিতদর্শিন! আজি বালক বালিকা যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই মুখ হর্ষ-প্রফুল্ল। ইহার মধ্যে আপনি কি অত্যাহিত দেখিলেন?" পেচকবর হাসিয়া বলিলেন "আগে কাহার কথা বলিব? আগে বালকের কথা শুনিবে কি বৃদ্ধের কথা শুনিবে?" আমি বলিলাম 'হে বর্ত্তুল-লোচন! আমি অগ্রে বালকের কথাই শুনিব।' পেচকবর বলিলেন—'শ্রবণ কর। ঐ যে বালকটি দেখিতেছ, নূতনবস্ত্র পরিধান করিয়া জুতা পায়ে দিয়া, নূতন রুমালে কটিদেশ বন্ধন করিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ, যে ঐ বালকটি বড় সুখী। কিন্তু ঐ বালকটি কি ভাবিতেছে জান? বালকটি ভাবিতেছে—আমার কাপড়টা ভাল নয়। দাদার কাপড়টি বেশ। রাম দাদার কাপড়টি আরও সুন্দর। আমার জুতাটা ভাল নয়, রাম দাদার জুতাটি কেমন চক্‌চকে, মুখ দেখা যায়। সে পাঁচ জনের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার মন তাহার কাপড়ের দিকেই রহিয়াছে, এতদিন কোন গোল ছিল না। পূজার সময় ভাল কাপড় হইবে বলিয়া সে এত দিন আপনাকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজি তাহার মনে বড় আঘাত লাগিয়াছে। আবার কি আশ্চর্য্য! ঐ কথাই তাহার মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে পূজাটা বালকের পক্ষে ঘোর অত্যাহিত।„

আমি বলিলাম " হে খন্দনাসিক! তুমি যেরূপ বালকের কথা বলিলে এরূপ পেচক-বুদ্ধি বালক অনেক আছে সত্য, কিন্তু সকল বালকই যে এইরূপ তাহার প্রমাণ কি?"

পেচকবর বলিলেন—" তুমি বাল্যাবস্থায় কিরূপ ভাবিতে?"

আমি বলিলাম—" হে জ্ঞান-পারাবার! এরূপ ব্যক্তিগত প্রশ্ন রুচিবিরুদ্ধ—out of etiquette.

পেচকবর বলিলেন—"সত্যানুসন্ধানের জন্য যে রুচির মস্তকে পদাঘাত করিতে না পারে সে পেচকদের মধ্যেও অধম পেচক বলিয়া ঘৃণিত হয়।"

আমি বলিলাম—"হে জ্ঞান-প্রচেতঃ! আমি পেচক বুদ্ধি ছিলাম, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও সকল বালকই যে পেচক-বুদ্ধি ইহা কিরূপে প্রমাণিত হইবে?"

পেচকবর বলিলেন—" যে বালকের চিন্তাশক্তি আছে সে বালকই ঐরূপে নিজ-চিন্তাকে নিয়োজিত করে। এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি বালক আছে যাহারা পশুর ন্যায় জড়বুদ্ধি। তাহাদের সুখদুঃখের বোধও নাই। তাহারা মৃৎপিণ্ডবৎ চিরকালই সমানভাবে অবস্থিতি করে।" আমি দেখিলাম—পেচক-বুদ্ধি মনুষ্যবুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। আমি বলিলাম—"হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! আপনি যুবকের মধ্যে কি অত্যাহিত দেখিয়াছেন?"

পেচকবর বলিলেন—" অগ্রে পাঠার্থী যুবকের কথা বিবেচনা করুন। বাঁধা গোরুর দড়ি খুলিয়া দিলে গোরুটি যেমন আগু পাছু না ভাবিয়া এদিকে সেদিকে ধাবমান হয়, যুবকও পূজার ছুটিতে সেইরূপ ছুটা ছুটি করিতেছে। কিন্তু যুবক "পূজার ছুটিতে পড়িব" এই আশায় আপনাকে প্রতারিত করিয়া অনেক সময়ে কর্ত্তব্যকার্য্যের অবহেলা করিয়াছে। যখন পূজা ফুরাইবে তখন এই এক গুণ আমোদের পরিবর্ত্তে বাছাদিগকে চারি গুণ কষ্ট পাইতে হইবে। সুতরাং পূজাটা পাঠার্থী যুবকের পক্ষে অত্যাহিতঃ"। আমি বলিলাম "হে কমলাবাহন! তুমিত সর্ব্বদাই নিজ কোটরে বাস কর। তুমি এত ব্যাপার কোথা হইতে দেখিলে?"

পেচকবর ইংরাজী আশ্রয় করিয়া বলিলেন "I have evolved these from out the depth of my moral consciousness."

আমি বলিলাম ' পেচক শার্দ্দূল! পাঠার্থী ভিন্ন অন্য প্রকারের যুবকে আপনি কি অত্যাহিত দেখিয়াছেন?'।

পেচক উত্তর করিল ' যাহারা ফুল বাবু তাহারা ত চিরকালই সুখী। পূজার সময় তাহারা কিছু অধিকতর সুখী হয় বটে। কিন্তু তাহাদের সুখ পশুদের সুখ হইতেও ঘৃণ্য। তাহাদের সুখই তাহাদের দুঃখ।'

আমি বলিলাম ' সর্ব্বহিংসিন্! আপনি যুবতীতে কি অত্যাহিত দেখিতেছেন?'

পেচক বলিলেন ' যে বালিকা সে বালকের ন্যায় কাপড় গহণা প্রভৃতির কথা লইয়া আপনাকে ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে ক্লিশিত করিতেছে। যাহারা বয়ঃসন্ধি অতীত হইয়াছে সে হয়ত পিত্রালয়ে থাকিয়া শ্বশুরালয়ের ভাবনা ভাবিতেছে, নয় শ্বশুরালয়ে থাকিয়া পিত্রালয়ের ভাবনা ভাবিতেছে। যে এতকাল প্রোষিত ভর্ত্তিকাছিল, সে অদ্য পতি সমাগমে হৃষ্ট হইয়াছে বটে। কিন্তু এই হর্ষে তাহার বিষাদ দ্বিগুণিত হইবে।

পিপাসার্ত্তকে একবিন্দু জল প্রদান করিলে তাহার পিপাসা বর্দ্ধিত হয় মাত্র। অন্ধকারময়ী রজনীতে বিদ্যুতালোকে অন্ধকার বর্দ্ধিতই হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে পূজাটা 'অত্যাহিতঃ'।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'বিরুপাক্ষ! আপনি প্রৌঢ়ে কি অত্যাহিত দেখিতেছেন।'

পেচকবর উত্তর করিলেন 'টাকার অত্যনাটন।,

আমি এই 'অত্যাহিত' হইতে যৎপরোনাস্তি ভুগিতেছিলাম ইহার যাথার্থ আমি বলিবা মাত্রই অনুভব করিলাম। এবং পেচককে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি বৃদ্ধ মাতাতেকি "অত্যাহিত" দেখিতেছেন?' পেচক উত্তর করিলেন "আজি মাতার কষ্টের সীমা নাই যে সকল সন্তান সন্ততি গুলি তাঁহার ক্রোড় শূন্য করিয়া" পেচকের কথা শেষ না হইতে হইতে বলিলাম "পণ্ডিতপ্রবর? আজি আহ্লাদের দিনে আপনার বিষাদোক্তি আমার ভাল লাগিতেছে না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষণ স্থায়ী সুখ ভোগ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে। আপনি সেই প্রবৃত্তির ব্যাঘাত জন্মাইবেন না। আমি বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া আপনার "প্যাঁচামী" দর্শন শ্রবণ করিব। আজি আপনি ক্ষান্ত হউন।

আমার কথা শুনিয়া পেচকবর বারম্বার অত্যাহিতঃ অত্যাহিতঃ করিতে করিতে কোটরে প্রবেশ করিলেন।

ইতি শ্রীপেচকানন্দ দেবশর্ম্মা।

মুক্তিবাদ।

মুখবন্ধ।

প্রত্যক্ষ প্রমিতির সহিত তুলনায়, স্মৃতি নিতান্ত দুর্ব্বলা। যে বিষয় যখন প্রত্যক্ষের গোচর হয়, উহা তখন বলবদ্রূপে অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। পরে যখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যালোকসন্নিভ প্রত্যক্ষ দশা অতিক্রম করিয়া ঐ সকল বিষয় স্মৃতির ক্ষীণালোকে প্রবিষ্ট হয়, তখন উহা অপেক্ষাকৃত অস্ফুটভাবে প্রতিভাত এবং তদ্দ্বারা অল্পমাত্রায় অন্তঃকরণ প্রণোদিত হয়। ক্রমে ঐ সকল বিষয় অতীতকালরূপ চক্রবালের দূরতর স্থানে উপনীত হয়; তখন স্মৃতিলোচনেও উহা অতি লঘু ও অস্ফুট বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং পরিশেষে একেবারেই অলক্ষ্য হইয়া পড়ে।

ইংলণ্ড রোমকগণ কর্ত্তৃক বিজিত, উদীচ্য স্কট প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক নিপীড়িত; অনন্তর এঙ্গ্ল স্যাক্সন জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়; পরে আবার দিনেমার ও ফরাশী দেশীয় বিজেতৃগণ পর্য্যায়ক্রমে বাহুবলে উহা অধিকৃত করেন—এইরূপে ইংলণ্ডবা-

সীরা পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণে, স্বাধীনতা রক্ষণে অসমর্থ হইয়া, পরের পদানত হইয়াছিল। তথাপি বর্ত্তমান সৌভাগ্যদশায় এই সকল কথা কয়জন স্যাকসন মনে করে। সামাজিক বন্ধনের শিথিলতানিবন্ধন বিজিত স্যাকসন জাতি নবাগত বিজেতাদিগের সহধর্ম্মিণী হইয়া নিজ জন্মভূমি স্বাধীনতার আবাসস্থলী ও বীরভূমি বলিয়া অভিমান করিতেছে।

এদিকে বৈবস্বত মনুর সময় হইতে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরন্তর বৈদেশিক শত্রুর সহিত সমরে, অদ্ভুত বীর্য্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, অদ্য বিধি-দুর্ব্বিপাকে পরের পদানত হইয়াছে এবং রাবণ-নিগৃহীতা সীতার ন্যায় বিজেতার সহধর্ম্মিণী না হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছে বলিয়া কেবল বিদেশীয়গণ নহে, তাহাদের শিক্ষাবলে পরিবর্ত্তিতমতি অনেক স্বদেশীয় ব্যক্তিও হিন্দুজাতিকে দুর্ব্বল, ভীরু, স্বীয় প্রাধান্য ও স্বাধীনতা লাভের উপযোগী গুণরাজিতে বিবর্জ্জিত এবং পুনরভ্যুত্থানের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহা যে মারাত্মকভ্রম তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি প্রাসঙ্গিক বিষয় বলিয়া, এইক্ষণ আমি তদপনোদনের নিমিত্ত, প্রমাণপরম্পরা উপন্যাস করিতে অভিলাষী নই। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে, "অঙ্গারও অগ্নিপ্রবেশে উজ্জ্বলতা ধারণ করে" তুলসীরাম দাসের এই মহার্হ উপদেশ জাতির অভ্যুত্থান সম্বন্ধেও সম্যক্ প্রয়োজ্য। *

প্রাগুক্ত কারণে আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশের কলঙ্ক বড় তীব্র। যদিও পূর্ব্বে গৌড়ে, বিক্রমপুরে এবং পরে যশোহর প্রভৃতি প্রদেশে অনেক বীরপুরুষ জন্মধারণ করিয়া তত্তৎকালে বঙ্গীয় হিন্দুজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ; তথাপি যে অশুভ দিনে নবদ্বীপের রাজধানী, সপ্তদশ সৈনিক হস্তে স্বীয় স্বাধীনতা রত্নে বঞ্চিত হয় ; তদবধি শত্রুর না হউক, পরের তুলিকায় চিত্রিত ইতিহাসে ও বর্ত্তমান মানব সমাজে বঙ্গীয় হিন্দুগণ নিতান্ত কাপুরুষ রূপে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। যাবৎ স্বদেশোদ্ধারের শ্রম-জলে এই কলঙ্ক প্রক্ষালিত না হইবে ; তাবৎ পরেও আমাদের প্রতি উহা আরোপ করিবে এবং আমাদিগকেও অবনত মস্তকে এবং মলিন মুখে তাহা বহন করিতে হইবে।

পরন্তু বীরতা, একতা, এবং সাংসারিক অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণে আমাদিগকে—পরে যতই কেন হীন বলিয়া নিন্দা না করুক ; আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে—বুদ্ধির সূক্ষ্মতা বিষয়ে বঙ্গীয় হিন্দুদিগকে, বোধহয়, কোন জাতিই নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ নহেন। বঙ্গ দেশীয় নৈয়ায়িকগণ স্বপ্রণীত দর্শনশাস্ত্রীয় গ্রন্থে যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন অন্যত্র প্রায় তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবর্ষেত কি চিতোর, কি লাহোর, কি সেতারা, কি পুনা, কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমুদায়

* "কয়লাকে ময়লা টেটে
যব আগ করে প্রবেশ"।
তুলসীরাম দাসের ভণিতা।

দেশ এই বিষয়ে বঙ্গদেশের নিকট অবনত মস্তক হইয়া স্বস্ব দেশীয় ছাত্রগণকে ন্যায় দর্শন অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপ প্রেরণ করিতেছেন। বস্তুতঃ যদিও মিথিলা দেশীয় গঙ্গেশোপাধ্যায় আদৌ নব্যন্যায় দর্শন প্রচার করিয়াছিলেন; তথাপি রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক গণই উহার পরিবর্দ্ধন ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও চিন্তাশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহাতে ভারতবর্ষে, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি তত্তৎকাল দুর্লভ ছিল।

যাঁহারা, এই প্রকারে বঙ্গদেশের একমাত্র প্রাধান্যের নিদান, তাহাদের গ্রন্থ সকল মুদ্রিত, অনূদিত, ও প্রচারিত হইয়া উক্ত মনীষিগণের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয়—এই বিষয়ে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রের যত্ন করা বর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাঁদের প্রণীত গ্রন্থ নিচয় এমন দুরূহ এবং সাংসারিক বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে অসংসৃষ্ট, যে সাধারণ পাঠকগণ উহার মর্ম্ম বোধে এবং উপাদেয়তা পরিগ্রহে অসমর্থ। গ্রীশ দেশে এক আভাণক আছে যে "সক্রেটিস দর্শন শাস্ত্র স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করেন।" আমরা বলিতে পারি যে "বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণ দর্শন শাস্ত্র, পৃথিবী হইতে স্বর্গে উত্তোলন করিয়াছেন।" ইহা দ্বারা আমি এইরূপ বলিতেছিনা যে প্রাচীন ন্যায় দর্শন নিতান্ত প্রাঞ্জল ও অনায়াস সাধ্য। গোতম প্রণীত পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায় সূত্র, বাৎস্যায়ন কৃত তদ্ভাষ্য, উদ্যোতকর কৃত বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রকৃত ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা, এবং উদয়নাচার্য্য কৃত ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি—এই প্রাচীন গ্রন্থ সকলও দুরূহ। কিন্তু এই কাঠিন্য অন্যরূপ—ঐসকল গ্রন্থ অতি প্রাচীন ও সংক্ষিপ্ত এবং কালক্রমে ভাষার রীতিরও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; এই নিমিত্ত স্থানে স্থানে উহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে। বিশেষতঃ গোতম প্রণীত সূত্র গ্রন্থ, অন্যান্য সূত্র গ্রন্থের ন্যায়, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখিত। উহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হইলে, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পদাধ্যাহার করিয়া সূত্রকে সম্পূর্ণ না করিলে, কোন অর্থ প্রতীয়মান হয় না। এদিকে নব্য ন্যায়, নূতন গ্রন্থ, অদ্যাপি তাহার ভাষার রীতির কোন পরিবর্ত্ত ঘটে নাই। সংস্কৃতভাষায় যৎসামান্য জ্ঞান থাকিলেই, উহার অর্থ বোধ হয়। তথাপি উহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা এমন দুরূহ এবং মনের একাগ্রতা সাপেক্ষ যে, বিষয়ান্তর চিন্তা, সম্পূর্ণরূপে, পরিহার না করিলে, উহার প্রতিপাদ্য বিষয়, কোন রূপেই হৃদয়ঙ্গম হয় না।

এই কারণে সাধারণ পাঠকগণের রুচি অনুসারে এবং বঙ্গভাষার বর্ত্তমান দর্শন শাস্ত্রের অনুপযোগী দুর্ব্বল অবস্থায়, ন্যায় দর্শনের নব্য গ্রন্থ সকল অনূদিত ও প্রচারিত হওয়া নিতান্ত আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। দর্শন শাস্ত্রীয় যেসকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক আনীত হইয়াছে,

তাহাও নদী হইতে পরিগৃহীত মতস্য,কূপে পরিরক্ষিত হইলে যদ্রূপ হয়, তদ্রূপ রসে ও গুণে নিকৃষ্ট হইয়া, সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের, কিয়ৎ পরিমাণে, গৌরব হানিকর হইয়াছে। তথাপি ঐসকল গ্রন্থের অনুশীলনে যে উপকার লাভ হয় তাহা মনে করিলে এতদ্বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করাও অকর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

ইহার অনুশীলনে আমার বিবেচনায় ১ সমুদায় হিন্দুশাস্ত্র রূপ দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়' এই নিমিত্তই পক্ষিল স্বামী স্বপ্রণীত ন্যায় ভাষ্যে 'প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং' বলিয়া এই দর্শনের প্রশংসা গান করিয়াছেন ; ২ সাধারণের অলক্ষ্য পদার্থের-সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যবোধে শক্তিজন্মে; ৩কার্য্যকারণের সম্বন্ধ, বিশেষতঃ, আধ্যাত্মিক জগতের কার্য্যকারণ ভাব ও অজ্ঞাত পূর্ব্ব মানসিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হয় ; ৪ একতান চিত্ত হইবার অভ্যাস হয় ; ৫ আত্মাদর বৃদ্ধি পায় ও গড্ডলিকা প্রবাহক্রমে পরের অনুগামী হইবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হয় ; ৬ অতি সূক্ষ্ম রূপে সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মে ৭ চিত্তের সঙ্কীর্ণভাব বিদূরিত হইয়া মতের উদারতা সংসাধিত হয়।

এই সকল বিবেচনা করিয়া নব্য ন্যায় দর্শনের প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দখণ্ডের অপেক্ষাকৃত দুরূহ গ্রন্থ সকলে হস্তার্পণ না করিয়া সাধারণের কিয়ৎপরিমাণে রুচির অনুগামী অপেক্ষাকৃত সরল গদাধর প্রণীত মুক্তিবাদ,অনুবাদ পূর্ব্বক, প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে এবং পাঠকগণ এতৎপাঠে অনুরাগ প্রদর্শন করিলে ক্রমে কঠিনতর পুস্তকে হস্তার্পণ করিতে সাহস হইবে।

গদাধর প্রণীত মুক্তিবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, প্রাচীন মুক্তিবাদ,* এবং ৫০০ শত বৎসর অতীত হইল সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত তত্ত্বচিন্তামণি মধ্যে, মুক্তিবাদ নামে এক পরিচ্ছেদ† প্রচারিত হইয়াছিল ; গদাধর প্রণীত মুক্তিবাদ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সংস্করণে উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব ইহাকে নব মুক্তিবাদ ‡ বলে। ইহাতে সমধিক নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয় না ; তথাপি সাংখ্য, প্রভাকর ও ভট্ট নামক মীমাংসক এবং একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী নামক বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মুক্তিবিষয়ক মত সকল উদ্ধৃত ও সুন্দররূপে বিচারিত হইয়াছে বলিয়া তৎপ্রচারে প্রাচীন মুক্তিবিষয়ক প্রবন্ধ দ্বয় একপ্রকার বঙ্গদেশে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত বিলুপ্তপ্রায় মুক্তিবিষয়ক প্রবন্ধদ্বয়মধ্যে

---

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত ১৮৭৭ সনে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন।

† শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৮৭৫ সনে যে ২য় ভাগ অনুমান চিন্তামণি মুদ্রিত করেন। তন্মধ্যে এই পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হইয়াছে।

‡ গদাধর প্রণীত মুক্তিবাদের শিবরাম কৃত এক টীকা আছে;উহাতে 'গদাধরোক্তে নবমুক্তিবাদে' এইরূপ নির্দ্দেশ আছে।

প্রাচীন মুক্তিবাদে সাকারোপাসক বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষিত সালোক্যাদি মুক্তিও নিরূপিত হইয়াছে যথা—

"সালোক্যমথ সারূপ্যং সার্ষ্টিঃ সামীপ্য মেবচ।
সাযুজ্যঞ্চেতি মুনয়ো মুক্তিং পঞ্চবিধাং বিদুঃ॥

১ সালোক্য, ২ সারূপ্য, ৩ সার্ষ্টিঃ, ৪ সামীপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধমুক্তি মুনিগণ অবগত আছেন।

উক্ত গ্রন্থে সালোক্য প্রভৃতির বিশেষ২ লক্ষণও লক্ষিত হইয়াছে যথা;—

তত্র ভগবতা সমমেকস্মিন্ লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যেঽবস্থানং সালোক্যম্।

বৈকুণ্ঠ নামক দিব্যধামে ৺ ভগবানের সহিত একত্রাবস্থানকে সালোক্য নামক মুক্তি কহে। ১।

সারূপ্যঞ্চ ভগবতাসহ সমানরূপতা শ্রীবৎসবনমালা লক্ষ্মী সরস্বতীযুক্ত চতুর্ভুজশরীরাবচ্ছিন্নত্বমিতিযাবৎ সালোক্যেঽপি চতুর্ভুজাবচ্ছিন্নত্ব মস্ত্যেব, বৈকুণ্ঠবাসিনাং সর্ব্বেষামেব চতুর্ভুজত্বাৎ; পরন্তু শ্রীবৎসাদিরূপাশেষ—বিশেষণ—বিশিষ্টত্বং নতত্রেতি তদপেক্ষয়া তস্যাধিক্যম্।

ভগবানের সহিত সমানরূপতাই সারূপ্য মুক্তি; এই মুক্তিতে শ্রীবৎসবনমালা লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্ত চতুর্ভুজশরীর লাভ হয়; সালোক্যমুক্তিতেও চতুর্ভুজশরীর লাভ হয় কারণ বৈকুণ্ঠবাসিমাত্রই চতুর্ভুজ; কিন্তু শ্রীবৎসাদি, সমুদায় লক্ষণ উহাতে লব্ধ হয় না। ২।

"সার্ষ্টিঃ ভগবদৈশ্বর্য্যং কর্ত্তুমকর্ত্তু মন্যথা কর্ত্তুং সমর্থত্বাৎ।"

ভগবানের তুল্য শক্তিলাভকে সার্ষ্টিঃ মুক্তি বলে; এই অবস্থায় করিতে, না করিতে, বা অন্যথা করিতে সামর্থ্য হয়। ৩।

"সামীপ্যঞ্চ তথাভূতবিশেষণৈশ্বর্য্যাদিযুক্তত্বে সতি ভগবতঃ অতি সমীপে নিয়তমবস্থানং।"

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ও ঐশ্বর্য্যলাভ পূর্ব্বক ভগবানের সমীপে নিয়ত অবস্থানকে সামীপ্য নামক মুক্তি বলে। ৪।

"সাযুজ্যঞ্চ নির্ব্বাণম্।"

নির্ব্বাণ মুক্তিকেই সাযুজ্য বলে। ৫

নির্ব্বাণ মুক্তি মতভেদে নানারূপ,—উহা গদাধর প্রণীত মুক্তিবাদে বিচারিত হইবে।

এই স্থানে বক্তব্য এই যে, তপশ্চর্য্যা প্রভৃতি উপায়ে, পাপ প্রক্ষালিত ও আত্মোৎকর্ষ সংসাধিত হইলে, মনুষ্য যে অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে পারে—ইহা প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই, স্থানে স্থানে, স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন মুক্তিবাদে যে প্রকার সাকারোপাসকদিগের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির নিরূপণ আছে, গঙ্গেশোপাধ্যায় এবং গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রণীত মুক্তিবিষয়ক গ্রন্থদ্বয়ে তাহার কোন উল্লেখ নাই। প্রত্যুত সাকারোপাসক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি এক স্থানে গঙ্গেশ এবং তাহার শিষ্যানুশিষ্য গদাধর ভট্টাচার্য্য একটু কুটিল কটাক্ষও নিক্ষেপ করিয়াছেন। যথা,

"তস্মাদবিবেকিনঃ সুখমা লিপ্সবো

বহুতর দুঃখানুবিদ্ধমপি সুখমুদ্দিশ্য ' শিরোমদীয়ং যদি যাতি যাতু ' " * ইত্যাদি কৃত্বা পরদারাদিষ্বপি প্রবর্ত্তমানাঃ 'বরং বৃন্দাবনেহরণ্যে,† 'ইত্যাদি বদন্তশ্চনাত্রাধিকারিণঃ"

অতএব যে সকল অবিবেকী সুখমাত্র কাম লোক বহুতর দুঃখানুবিদ্ধ সুখের প্রত্যাশায়ও ' আমার প্রাণ যায় যাউক ' এইরূপ অধ্যবসায়ে, পরদারাদি রূপ অতি গর্হিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ; কিংবা "বৃন্দাবনে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হওয়াও ভাল ; বৈশেষিকগণের নির্ব্বাণমুক্তির বাসনা করি না ' এইরূপ বলে তাহারা পরম পুরুষার্থ মুক্তির অনধিকারী।

বস্তুতঃ এতদ্দেশীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত এই যে ' ইহ লোকে পুরুষকারোপার্জ্জিত রাজত্বাদি পদ যেমন কালে লয় পায়, তদ্রূপ পুণ্যোপার্জ্জিত পারলৌকিক ইন্দ্রত্বাদি পদও সময়ে বিনষ্ট হয় ;‡ অতএব যাহা হইতে পুনর্ব্বার বিচ্যুত হইতে না হয়, সেই নির্ব্বাণমুক্তিই পরম পুরুষার্থ ; বিবেকি জনের তল্লাভ কামনায়ই যত্ন করা কর্ত্তব্য "। বোধ হয় এই নিমিত্তই হউক, কিম্বা পৌরাণিকগণের বৈকুণ্ঠবাসাদি কথা—কেবল জড়মতি ব্যক্তিবর্গকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার প্রলোভন মাত্র " এই বিবেচনায়ই হউক, নব্য দার্শনিকগণ সালোক্যাদিমুক্তি বিষয়ে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তিরই আলোচনা করিয়াছেন।* ইত্যলংপল্লবিতেন।

মুক্তিবাদ।

প্রয়োজন কামনায়ই তদুপায়ে লোকের প্রবৃত্তি হয় ; অতএব শাস্ত্রকারগণ প্রথমতঃ শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রদর্শন করেন। তন্মধ্যে সুখ, সুখ—ভোগ (১) এবং দুঃখাভাব স্বতঃপ্রয়োজন : বিষয়ান্তরের ইচ্ছার অনধীন ইচ্ছার বিষয়কে স্বতঃ প্রয়োজন বলে। প্রয়োজনান্তরের কারণ নহে, ঈদৃশ প্রয়োজনকে স্বতঃ প্রয়োজন

" প্রয়োজনমুদ্দিশ্যৈব পুমাংসস্তদুপায়ে প্রবর্ত্তন্তে,অতঃ শাস্ত্রস্য প্রয়োজনং প্রথমতো

---

* এই শ্লোকের সমুদয় অংশ এই ' যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি ! শিরোমদীয়ং যদি যাতি যাতু। লূনানি নূনং জনকাত্মজার্থে দশাননেনাপি দশাননানি '।

† এই শ্লোকের সমুদয় অংশ এই— 'বরংবৃন্দাবনেহরণ্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং। নচ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন "।

‡ এতদ্দেশীয় দার্শনিকগণ বলেন— ' যথেহ কর্ম্ম চিতোলোকঃ ক্ষীয়তে তথামুত্র পুণ্য চিতোলোক ' ইতি।

* সালোক্যাদিদশায়াং দুঃখনিবৃত্তিসত্ত্বেহপি নাসাবাত্যন্তিকী : * * * অতঃ সালোক্যাদেঃ স্বতঃপুরুষার্থত্বাভাবাৎ তদুত্তরং শরীরপরিগ্রহেণ বন্ধসম্ভবাচ্চ তেষাং তুচ্ছতয়া নির্ব্বাণমেবোদ্দেশ্যং ; তত্ত্বজ্ঞানে তান্ত্রিকাণাং প্রবৃত্তের্নির্ব্বাণমেবাপবর্গপদশক্যম্ তদন্যেষাস্তু গৌণমুক্তিপদপ্রয়োগবিষয়তা ইতি প্রাচীন মুক্তিবাদঃ।

(১) গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগ—' সুখ ভোগকে স্বতঃ প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

বলিলে, সুখের স্বতঃ প্রয়োজনত্ব রক্ষা পায় না; সুখভোগরূপ প্রয়োজনের সুখও এক কারণ (১) অন্য বিষয়ক ইচ্ছার অধীন—ইচ্ছারবিষয় ভোজনাদি গৌণ প্রয়োজন। সুখাদিরূপ ফলের অভিলাষেই লোকের তাহাতে ইচ্ছাহয়।

তথাচ দুঃখাসংস্পৃষ্ট সুখরূপ স্বর্গের (২) ন্যায়, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যার ফল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ ও স্বতই প্রয়োজন। মুক্তির প্রমাণ এই—এতৎপ্রদীপত্ব ধর্ম্মের ন্যায়: কার্য্য মাত্র বৃত্তি, কিংবা নানাকালীন কার্য্য মাত্র বৃত্তি বলিয়া, দেবদত্ত-দুঃখত্ব বা দুঃখত্ব ধর্ম্ম, স্বাশ্রয়াসমানকালীনধ্বংস প্রতিযোগি বৃত্তিরূপে, অনুমিত হয়। 'আত্মাকে জানিতে হইবে; সে আর পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয় না,

দশস্মৃতিশাস্ত্রকৃতঃ। তত্র স্বতঃ প্রয়োজনং সুখং তদ্ভোগোদুঃখাভাবশ্চ। তত্ত্বঞ্চ অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বম্; নতু প্রয়োজনান্বয়জনকত্বে সতি, প্রয়োজনত্বম্; সুখ-সাক্ষাৎকাররূপং ভোগংপ্রতি বিষয়তয়া জনকে সুখেঽব্যাপ্তেঃ। গৌণপ্রয়োজনঞ্চ অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ো ভোজনাদিঃ। তত্র সুখাদিরূপফলানুসন্ধানাদেবেচ্ছোৎপত্তেঃ"।

"দুঃখাসম্ভিন্ন—সুখরূপতয়া স্বর্গস্যেবান্বীক্ষিক্যাদিশাস্ত্রফলস্য অপবর্গস্যাত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপস্য স্বতএব প্রয়োজনত্বম্। মুক্তৌপ্রমাণন্তু—দুঃখত্বং দেবদত্তদুঃখত্বং বা স্বাশ্রয়াসমানকালীন–ধ্বংসপ্রতিযোগিবৃত্তি, কার্য্যমাত্রবৃত্তিত্বাৎ সন্ততিত্বাদ্বা,এতৎপ্রদীপত্ববৎ; সন্ততিত্বঞ্চ নানাকালীনকার্য্যমাত্রবৃত্তিত্বম্। "আত্মাজ্ঞাতব্যো নাস পুনরাবর্ত্ততে ইতিশ্রুতিশ্চপ্রমাণম্। আবর্ত্ততে শরীরীভবতীত্যর্থঃ"।

(১) প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় কারণ; সুখভোগ সুখের মানসিক প্রত্যক্ষ; তাহার প্রতি সুখ ও কারণ।

(২) লৌকিক সুখ ত্রিবিধ সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক—তথাচ—ভগবদগীতার ১৮শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

'অত্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিয়চ্ছতি। যত্তদগ্রেবিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্। তত্ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্'। বিষয়েন্দ্রিয়—সম্বন্ধাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্। পরিণামে বিষমিব তত্ সুখং রাজসং স্মৃতম্।' 'যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহন মাত্মনঃ। নিদ্রালস্য—প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্' ইতি।

যে সুখে ভোগ সুখের ন্যায় সহসা লোক রত হয় না, কিন্তু ক্রমে অভ্যাস দ্বারা আসক্ত হয় এবং আসক্ত হইলে দুঃখের একান্ত অবসান হয়; মনঃসংযম পূর্ব্বক উহা লাভ করিতে হয় বলিয়া আপততঃ বিষের ন্যায় বিদ্বেষ বিষয় হইলেও পরিণামে অমৃত বত্ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়—ঈদৃশ সুখ সাত্বিক সুখ এই নামে অভিহিত। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধ নিবন্ধন লোকে আপাততঃ অমৃত বোধে যে সুখে রত হয় এবং উত্তর কালে বিষবৎজ্ঞানে যাহা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করে উহাকে রাজসিক সুখ বলে। যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে চিত্তের মোহকর এবং নিদ্রা আ-

অর্থাৎ শরীর ধারণ করে না। এই শ্রুতিও এতদ্বিষয়ে প্রমাণ। (৩)

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই প্রাগুক্ত মুক্তি সুখের বিরোধী ; অতএব লোকের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? উত্তর—মুক্ত দশায় সুখ নাথাকিলেও, আত্যন্তিক হউক কি না হউক,দুঃখের পর্য্যবসান হয় বলিয়াই, লোকের তাহাতে ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছা হয় বলিয়া উহার প্রয়োজনত্ব উপপন্ন হয়। নিয়ত সুখের অভাব আছে এই নিমিত্ত, মুক্তি বিষয়ে,লোকের দ্বেষ জন্মিতে পারে ; সুতরাং তদ্বিষয়ে ইচ্ছা অসম্ভব—ইহা বলা যায় না ; কারণ স্বতঃ প্রয়োজনীভূত—বিষয় দ্বেষের গোচর হয় না। (ক্রমশঃ)

নচা পবর্গস্য উক্তরূপস্য সুখবিরোধিতয়া ন পুরুষার্থত্বসম্ভবঃ ; সুখাভাব নিয়তত্বেঽপি, দুঃখাভাবত্বেন আত্যন্তিকত্বাবিশেষিতেন তদ্বিশেষিতেন চ তত্রেচ্ছোৎপত্তৌ বাধকাভাবেন প্রয়োজনত্বোপ পত্তেঃ। নচ সুখাভাব নিয়তত্বেন তত্র দ্বেষসম্ভবানেচ্ছা—সম্ভব ইতিবাচ্যম্। স্বতঃপ্রয়োজনস্য দ্বেষবিষয়ত্বাযোগাৎ।

লস্য ও কর্ত্তব্যের লঙ্ঘন হইতে উৎপন্ন ঈদৃশ সুখকে তামস সুখ বলে। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয়—মানবজাতির সমুদায় লৌকিক সুখই দুঃখ সংস্পৃষ্ট। যে সুখে দুঃখের সম্পর্ক নাই তাহাকে স্বর্গ বলে।

(৩) নৈয়ায়িক মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এই চারি প্রমাণ। যে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে; তাহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়—অর্থাৎ ঈদৃশ দশায় উপনীত হয়—যে তাহার কোনরূপ দুঃখ অনুভব করিতে হয় না। পরন্তু এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, সুতরাং গ্রন্থকার অনুমান ও আপ্ত বাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ বেদদ্বারা উহা প্রমাণ করিতেছেন।—জ্ঞানের বিষয় এক না হইলে একাকার জ্ঞান হয় না। মনুষ্য নানা হইলেও যে এক ধর্ম্ম সমুদায় মনুষ্যে আছে বলিয়া "মনুষ্য" ইত্যাকার জ্ঞান প্রত্যেক মনুষ্য বিষয়েই উৎপন্ন হয় উহার নাম মনুষ্যত্ব জাতি ; তাহাদের মতে উহা সমুদায় মনুষ্যে এক ; অন্যথা অদৃষ্ট পূর্ব্ব মনুষ্য দর্শনে ; 'মনুষ্য' এই বোধ জন্মিতে পারে না ; পূর্ব্বদৃষ্ট মনুষ্যের সহিত সাদৃশ্য দর্শনে অদৃষ্ট পূর্ব্ব মনুষ্য বিষয়ে "মনুষ্য" এই বোধ জন্মে ইহাও বলা যায় না, কারণ সাদৃশ্যের অর্থ এক ধর্ম্মবত্ব ; সমুদায় মনুষ্যে অখণ্ড একধর্ম্ম নাথাকিলে সাদৃশ্য বোধ অসম্ভব ;। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে সমুদায় মনুষ্যে মনুষ্যত্ব নামক এক জাতি আছে। তদ্রূপ সমুদায় সুখে সুখত্ব এবং দুঃখে দুঃখত্ব প্রভৃতি জাতিও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।—কোন বস্তুর উত্তরকালে তাহার যে অভাব হয় ; উহাকে তাহার ধ্বংস বলে—; যাহার যে অভাব সে তাহার প্রতিযোগী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। স্ব শব্দে এইস্থানে দুঃখত্ব পরিগৃহীত হইয়াছে ; তাতাহার আশ্রয় দুঃখ ; তাহার অসমানকালী দুঃখ ধ্বংস,যে দুঃখনাশের পর পুনর্ব্বার দুঃখ উৎপন্ন হয় না। ঐ দুঃখনাশের প্রতিযোগী দুঃখ, দুঃখত্বে তদ্বৃত্তিতা আছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

প্রথমখণ্ড।

(৩৪৮ পৃষ্ঠার পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

তবকত নেছরি গ্রন্থে বাঙ্গালার ভৌগোলিক তত্ত্ব বিশেষরূপে লিখিত হয় নাই। কেবল বঙ্গমধ্যবর্ত্তী কয়েকটি-নগর, প্রদেশ ও প্রত্যন্ত রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নদীয়া, লক্ষ্মণাবতী, বঙ্গ, রাল (রাঢ়), বারেন্দ্র, দেবকোট, বর্দ্ধনকোটী, নারকোটি, কেল্লা বিষ্ণুকোট (বিষণকোট), সমতট (সনকট বা সকনট), কামরূপ (কামরূদ), জগন্নাথ (উড়িষ্যা), জাজনগর প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে।

একখণ্ড হস্তলিখিত গ্রন্থে 'লক্ষ্মণোর' নামটি বিকৃতভাবে লিখিত ছিল, তদ্দর্শনে মেজর ষ্টুয়ার্ট ইহাকে 'নগর' লিখিয়া গিয়াছেন। ষ্টুয়ার্টের স্খলিত পদানুসরণ করিয়া অন্যান্য লেখকগণ লক্ষণোরকে নগর বলিয়া উদ্যাপি উচ্চারণ করিতেছেন।

বারণি ও আফেক প্রণীত তওরিকে ফিরোজসাহি পাঠে অনুমিত হয় যে ফিরোজসাহের সময়ে ফিরোজবাদ বা হজরত পাণ্ডুয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নিকটেই "একদলার" বিখ্যাত দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

৮৫০ হিঃ সালে পুনর্ব্বার গৌড়ে বাঙ্গালার রাজাসন স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই নবনির্ম্মিত তণ্ডা নগরে রাজধানী উঠিয়া আইসে। রেনেল সাহেব পাগলা নদীর তটে তণ্ডা (তরা) র স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজ ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিছ সাহেব বলেন যে তণ্ডানগরী গঙ্গাতীর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু বর্ষাকালে তণ্ডার নিম্নভাগ গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়। ব্রোকের মানচিত্রেও সুতীর উত্তর দিকে গঙ্গাতীর হইতে ২। ৩ মাইল দূরে তণ্ডা নগরী চিত্রিত রহিয়াছে।

স্বাধীন পাঠান রাজন্যবর্গের শাসন সময়ের মুদ্রা ও প্রস্তর-লিপি সমূহে লক্ষ্মণাবতী, ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও, সহরনৌ, ঘিয়াসপুর, সোনারগাঁও, মৌজমাবাদ, ফতেয়াবাদ, খলিফ্‌তাবাদ, হুসিনাবাদ, প্রভৃতি নগর গুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ৭ টি নগরে মুদ্রিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে এই সকল স্থানে টাকশাল স্থাপিত ছিল। আজম সাহের একটি মুদ্রায়

'জান্নতাবাদ' নগরের উল্লেখ আছে। জান্নতাবাদ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পশ্চাৎ লিখিত হইবে। লক্ষ্মণাবতী, ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও পাঠকগণ নিকট বিশেষরূপে পরিচিত।

সহরনৌ (নূতন সহর) বোধহয় প্রাচীন লক্ষ্মণাবতীর নিকটেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিনিসীয় ভ্রমণকারী নিকলো ডি কোণ্টীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে গঙ্গাতীরস্থ 'সারনোবি' (Cernovo) নগরের উল্লেখ আছে। কর্ণেল ইউল সারনোবিকেই 'সহরনৌ' অবধারণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমরাও তাহার মত অনুমোদন করিতেছি। *

মৌজমাবাদ পূর্ব্ববঙ্গস্থিত কোন একটি নগরী। ৭৫৮—৫৯ হিং অব্দে সেকেন্দর এই নগরী নির্ম্মাণ করেন। সোনারগাঁয়ের অনতিদূরে এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু স্থল নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন।

পাঠান শাসিত বাঙ্গালার বিভাগ সমূহের প্রকৃততত্ত্ব সংগ্রহ করা সুকঠিন। কিন্তু সেই সময়ে বাঙ্গালা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। তদানীন্তন বাঙ্গালার সীমা সম্বন্ধে প্রফেসার বুকমান যাহা লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসের চতুর্থখণ্ডে আমরা তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিব।

পাঠানদিগের পরেই মোগলদিগের অধিকার। মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজস্ব-সচিব তোড়ল মল্ল সমগ্র বাঙ্গালাকে নিম্নলিখিতরূপ উনবিংশ সরকারে বিভাগ করিয়াছিলেন। যথা—

১। সরকার জান্নতাবাদ বা লক্ষ্মণাবতী, কহলগাঁয়ের নিকটবর্ত্তী তেলিয়াগড়ি হইতে গঙ্গার উত্তর পার দিয়া বর্ত্তমান ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার কয়েকটি মহাল ও মালদহ জিলার অধীন প্রায় সকল স্থান এই সরকারের অধীন ছিল। ইহার পরগণা বা মহাল সংখ্যা ৬৬। ও খালিসা রাজস্ব ৪৭১১৭৪ টাকা। †

২। সরকার পূর্ণিয়া—আধুনিক পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমপার্শ্বের অধিকাংশ এই সরকারের অধীন ছিল। ইহার মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৯। রাজস্ব ১৬০২১৯ টাকা।

৩। সরকার তাঁজপুর—আধুনিক পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাংশ ও দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ২৯। রাজস্ব ১৬২৯৬ টাকা।

৪। সরকার পাঁজরা—দিনাজপুরের উত্তরপূর্ব্ব দিকস্থ, অত্রাই নদীর তীরবর্ত্তী হাওলি মহাল পাঁজরা হইতে এই সরকার পাঁজরা নাম লাভ করিয়াছিল। আধুনিক দিনাজপুরের অধিকাংশ এই সরকারের অধীন। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ২১। রাজস্ব ১৪৫০৮১ টাকা।

* The travels of Nicolo Conti, Hakluyt Society.

† ৪০ দামে এক টাকা। দাম আধুনিক এক পয়সা হইতেও কিছু অধিক। 'দাম' নহে।

৫। সরকার ঘোড়াঘাট—বর্ত্তমান দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগোড়া জিলার কিয়দংশ লইয়া এই সরকার গঠিত হইয়াছিল। ইহার সীমান্তে কুঁচ হাজো ও কুঁচবিহার রাজ্য ছিল। সুতরাং সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য এই সরকারে আবগান সররদারদিগকে প্রচুর পরিমাণে জায়গির দিতে হইয়াছিল। এই সরকারে প্রাচীন কালে যথেষ্ট পরিমাণ রেশম জন্মিত। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৮৮। রাজস্ব ২০২০৭৭ টাকা। *

৬। সরকার বারবকাবাদ—বারবক সাহের নামানুসারে এই সরকারের নামকরণ হইয়াছিল। লক্ষ্মণাবতী সরকারের সীমান্ত হইতে গঙ্গার তীর দিয়া বাগাড়া পর্য্যন্ত এই সরকার বিস্তৃত ছিল। আধুনিক মালদহ ও দিনাজপুরের কিয়দংশ ও রাজসাহী, বগোড়ার অধিকাংশ ইহার অধীন ছিল। এই সরকারে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৩৮। রাজস্ব ৪৩৬২৮৮ টাকা।

৭। সরকার বাজু—আধুনিক রাজসাহী, বগোড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকার কিয়দংশ এই সরকারের অধীন ছিল। এই সরকারের অধীন সমস্ত মহালের নামের অন্তেই বাজু শব্দ সংযুক্ত ছিল যথা 'ঢাকা বাজু'* শোনাবাজু, প্রতাপবাজু ইত্যাদি। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৩২। রাজস্ব ৯৮৭৯২১ টাকা।

৮। সরকার শ্রীহট্ট—সুন্মা ও বড়বক্রের উভয় তীরস্থিত স্থান ইহার অধীন ছিল। প্রাচীন কালে এই সরকার হইতে দাস দাসী ও খোঁজা ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। † মুসলমানগণ শ্রীহট্টবাসীদিগকে যাদুকর বলিয়া ভয় করিত। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৮। রাজস্ব ১৬৭০৩২ টাকা।

৯। সরকার সুবর্ণ গ্রাম—মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরস্থিত স্থান সমূহ ইহার অধীন ছিল। আধুনিক ঢাকা, ত্রিপুরা ও নওয়াখালির অধিকাংশ লইয়া এই

* গ্রন্থান্তরে রাজস্ব ২০৯৫৭৭ টাকা লিখিত আছে। See the Fifth Report on the affairs of the East India Company. (1st Ed.) page 256.

* মেজর ষ্টুয়ার্ট ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন যে ঢাকা নিতান্ত অভিনব, কারণ আইন আকবরিতে ইহার উল্লেখ নাই। আইন আকবরিতে ঢাকার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (Blockmann's text edition p. 407.) ঢাকা নগরী 'ঢাকা বাজু' মহালের মধ্যগত ছিল; গ্লেডুইন সাহেব ইহাকে 'ঢকাবাজু' লিখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ষ্টুয়ার্ট ভ্রমমার্গে পাদবিক্ষেপ করিয়াছেন।

‡ আইন আকবরি, তজক জাহাঙ্গিরী ও মার্কোপালোর গ্রন্থে এই ঘৃণিত বৃত্তান্ত লিখিত আছে। জাহাঙ্গির একখণ্ড ঘোষণাপত্র দ্বারা শ্রীহট্ট বাসীদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, তাহারা ভবিষ্যতে কোন বালকের মুষ্ক চ্ছেদন করিতে পারিবে না। তৎপর শ্রীহট্টবাসীদিগের ঘৃণিত ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছিল।

সরকার গঠিত হইয়াছিল। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৫২। রাজস্ব ৩৩০০০০ টাকা।

১০। সরকার চট্টগ্রাম—সমুদ্রতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ। কালিদাসবর্ণিত "তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ" সম্ভবতঃ এই চট্টগ্রাম প্রদেশই হইবে। মহাল বা পরগণা ৭। রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা।

১১। সরকার ফতেয়াবাদ—চট্টগ্রাম সরকারের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হইতে যশোহর পর্য্যন্ত এই সরকার সংকীর্ণভাবে প্রসারিত ছিল। আধুনিক যশোহরের কিয়দংশ সমস্ত ফরিদপুর জেলা বাথরগঞ্জের দক্ষিণাংশ, ঢাকার কিয়দংশ ও দক্ষিণসাহাবাজপুর, সনদ্বীপ, সিদ্ধিরচর প্রভৃতি স্থান গুলি এই সরকারের অধীন ছিল। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৩ টি মাত্র। রাজস্ব ১৯৯২৩৯ টাকা।

১২। সরকার বা ইসমাইলপুর—এই সরকার প্রধানতঃ গঙ্গার পশ্চিম পারদিয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার পশ্চিমদিকে সরকার খলিফতাবাদ বা যশোহর। চর রাবণাবাদের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত ভূভাগ এই সরকারের অধীন ছিল। বঙ্গীয় ব দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে হিজলী পর্য্যন্ত ভাটি প্রদেশের নিম্নভাগ লইয়া এই সরকার গঠিত হইয়াছিল। মহাল বা পরগণা সংখ্যা ৪। রাজস্ব ১৭৮৭৫৬টাকা।*

১৩। সরকার মহম্মদাবাদ—প্রাচীন ভূষণা ইহার অধীন। আধুনিক নদীয়া ও যশোহরের উত্তরভাগ ও ফরিদপুরের পাশ্চিমভাগ লইয়া এই সরকার গঠিত হইয়াছিল। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৮৮। রাজস্ব ২৯০২৫৬ টাকা।

১৪। সরকার খলিফতাবাদ—আধুনিক যশোহরের অধিকাংশ ও বাথরগঞ্জের পশ্চিমাংশ এই সরকারের অধীন ছিল। বাগের হাটের নিকটবর্ত্তী হাওলি পরগণা খলিফতাবাদ হইতে এই সরকারের নামকরণ হইয়াছিল। যশোহর বা রসুলপুর এই সরকার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মহাল। ইহার অধীন মহাল মুঁড়াগাছা ও মালিকপুর যশোহরের রাজগণের আদিপুরুষ ভবেশ্বর রায়কে বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা আজিম খাঁ দান করিয়াছিলেন। মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৩৫। রাজস্ব ১৩৫০৫৩ টাকা।

১৫। সরকার সপ্তগ্রাম—হুগলী বা শাখাগঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ অল্পমাত্র ভূমি এই সরকারের অধীন ছিল। কিন্তু হুগলী নদীর পূর্ব্বপার দিয়া মুরশিদাবাদের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্ত হইতে আধুনিক ডায়েমণ্ড হারবার পর্য্যন্ত সমগ্রভূভাগ সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। 'কলকত্তা' (কলিকতা) এই সরকারের অন্তর্গত একটি মহাল।* মহাল ও পরগণা সংখ্যা ৫৩। রাজস্ব ৪১৮১১৮ টাকা।

---

* মতান্তরে রাজস্ব ১৭৮২৬৬ টাকা। (E. I. Co's Fifth Report, page 257.)

* বঙ্গবাসী পত্রিকায় কলিকাতার ইতিহাস লেখক বলেন আইন আকবরীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থে কলিকাতার উল্লেখ নাই। কিন্তু কয়েক পংক্তি পরেই লিখিয়াছেন যে তবকতই নেছরি গ্রন্থে কলিকাতার উল্লেখ

১৬। সরকার উদম্বর বা তণ্ডা—মুরশিদাবাদের অধিকাংশ ও বীরভূমের কিয়দংশ এই সরকারের অধীন ছিল। প্রাচীন রাজধানী তণ্ডা নগরী এই সরকার মধ্যে অবস্থিত। তৎপর সুজার শাসনকালেও ইহাই রাজধানী বিভাগ। অবশেষে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে এই সরকার মধ্যেই মুকস্থদ বা মুকস্থদাবাদের স্থানে মুরশিদাবাদ নগরী নির্ম্মিত হয়। মহাল বা পরগণা সংখ্যা ৫২। রাজস্ব ৬০১৯৮৫ টাকা। কিন্তু হপ্ত ইকলেম গ্রন্থে রাজস্ব ৫৯৭৫৭০ টাকা লিখিত হইয়াছে।

১৭। সরকার সরিফাবাদ—উদম্বর বা তণ্ডা সরকারের দক্ষিণদিকে। বর্দ্ধমান ও বীরভূমের অধিকাংশ এই সরকারের অধীন ছিল। বর্দ্ধমান নগরীও ইহার অন্তর্গত। এই সরকারে ২৬টি মহাল বা পরগণা। রাজস্ব ৫৬২২১৮ টাকা। *

১৮। সরকার সুলেমানাবাদ—আধুনিক নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কয়েকটি পরগণা ও সমগ্র হুগলি জেলা লইয়া এই সরকার গঠিত হইয়াছিল। এই সরকারের প্রধান নগর সলিমাবাদ দামোদর নদের বামতীরে ছিল। কবিকঙ্কনের চণ্ডী কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে। এই সরকারের নানা স্থানে হিন্দু,বৌদ্ধ ও মুসলমান দিগের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাল বা পরগণা সংখ্যা ৩১। রাজস্ব ৪৪০৭৪৯ টাকা।

১৯। সরকার মদারণ—পূর্ব্বোক্ত সরকার দুইটির পশ্চিমদিকে লক্ষণোর নগরী হইতে খণ্ডঘোষ, জাহানাবাদ, চন্দ্রকোণা দিয়া মণ্ডলঘাট পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এই সরকার বিস্তৃত ছিল। মুসলমানেরা যেরূপ বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের রাজার প্রতি অত্যাচার করিত, তদ্রূপ তাঁহারাও সুযোগ ক্রমে সরকার মদারণের অন্তর্গত স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতেন। এই সরকারের মহাল ও পরগণা সংখ্যা ১৬। রাজস্ব ২৩৫০৮৫ টাকা।

রাজা তোড়লমল্ল সমগ্র বাঙ্গালা এই রূপে উনবিংশ সরকারে বিভক্ত করিয়াছেন। আকবরের সচিব বাঙ্গালার যে সমস্ত ভূমি তাহার জমাবন্দীভুক্ত করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই যে পাঠান-শাসনকালে কিংবা মোগলশাসনারম্ভে যবন রাজপুত্রের অধীন ছিল এমত নহে। এমতাবস্থায়ও তোড়লমল্ল কি কারণে সেই পরকরতলগত প্রদেশ স্বীয় জমাবন্দীর অধীন করিয়াছিলেন তাহা জমিদারি কার্য্যাভিজ্ঞ পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত সরকারসমূহের ভূমি প্রধানতঃ খালিসা ও জায়গীর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

আছে। বাঙ্গালির ‘নাটকী’ বিদ্যা কি ইতিহাস বিভাগে প্রচারিত হইবে না কি?

* হপ্তইকলমে গ্রন্থে বর্দ্ধমান প্রদেশের স্ত্রীলোক দিগের কদর্য্য ব্যবহার সম্বন্ধে একটি বর্ণনা দৃষ্ট হয়। লকমান সাহেব লাটিন ভাষায় এই বর্ণনাটি তাহার বাঙ্গলার ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত না করিলেও বোধ হয় লকমানের ইতিহাসের অঙ্গহানি হইত না।

ছিল। যে সকল ভূমি হইতে রাজা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর গ্রহণ করিতেন তাহাকেই খালিসা বলা হইত। প্রোক্ত ঊনবিংশ সরকারের খালিসা রাজস্ব (লবণের'মাস্থল, জল কর ও বাজারের জমা সহ) ২৫৩৪৮২১০৬ দাম বা ৬৩৩৭০৫২ টাকা নির্ণীত হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুবিখ্যাত সেরেস্তাদার গ্রাণ্টসাহেব জায়গীর * ভূমির তৎকালীন রাজস্ব ৪৩৪৮৮৯২ টাকা অবধারণ করিয়াছেন। সুতরাং আকবরের সময়ে বাঙ্গালার মোট রাজস্ব ১০৬৮৫৯৪৪ টাকা নির্ণীত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে রাজা ভূমির করস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতেন। প্রোক্ত রাজস্ব সেই চতুর্থাংশের পরিবর্ত্তে গৃহীত হইত। সুতরাং সরলভাবে বিবেচনা করিলে নির্ণীত হইবে যে সেই সময় বাঙ্গালায় অন্যূন ৪২৭৪৩৭৭৬ টাকার শস্য উৎপন্ন হইত। † (ক্রমশঃ)

শ্রী—সিংহ।

* জায়গীর সাধারণত দুই প্রকার 'চাকরাণ' ও 'জমিদারি জায়গীর'। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য প্রদেশীয় জমিদারদিগকেই অধিকাংশ স্থান শোষোক্ত শ্রেণীর জায়গীর দেওয়া হইত। তদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকার জায়গীর সম্বন্ধে পশ্চাৎ বর্ণনা করা হইবে।

† আইন আকবরি গ্রন্থে বঙ্গীয় প্রজাদিগের অবস্থা এইরূপ লিখিত হইয়াছেঃ— The ryots of Bengal are obedient and ready to pay taxes. During eight months of the year they pay the required sums by instalments. They personally bring the money in rupees and Goldmuhrrs to the appointed place. Payment in kind is not usual. Grain is always cheap. The people do not object to a survey of the lands, and the amount of the land tax is settled by the collector and the ryot.

"বঙ্গ নারীর গৃহ ধর্ম্ম।"

বাল্য ভাগ।

নারী পঞ্চম বর্ষ বয়স হইতেই, গৃহধর্ম্মের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিবেন। এই বয়স হইতেই তাঁহাকে কিছু কিছু সহজ সহজ সংসারের কর্ম্মে,মাতা ও মাতামহী প্রভৃতির সহায়তা করিতে হইবে।

বর্ণপরিচয়, ও সংযুক্ত বর্ণ শিক্ষার সহিত—ছোট ছোট দু একখানি তৈযশ মার্জ্জন, ছোট ছোট ভাই ভগিনী গণের কাপড় গুলি কাঁচিয়া দেওয়া,আগত ভিক্ষুককে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া, আহারের সময় ঠাঁই করিয়া দেওয়া, গৃহের ঘটি বাটী গুলি গুছাইয়া রাখা, বাপ, বড় ভাই প্রভৃতির পা ধুইবার

জল দেওয়া, এবং মাতার রন্ধন বা অন্য কাজের সময়, ক্রন্দনশীল শিশু ভাই ভগিনীকে ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা করা অথবা খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখা, অনায়াস সাধ্য। বালিকা এরূপে ক্রমে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকার্য্য অভ্যাস করিলে, কর্ম্মিষ্ঠা হইয়া উঠিতে পারেন। ইহা ছাড়া আর একটি বিশেষ ফলও আছে। এখন অনেক বালিকা শৈশব কাল হইতে বালকদের মত কেবল লেখা পড়াই শিখেন, গৃহ কর্ম্ম করিতে ঘৃণা বা দাস দাসীর কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ভাবী কালে তাঁহারা এরূপ বাবু হইয়া উঠেন যে রাজার ঘরে বিবাহ না হইলে তাঁহাদিগকে কান্দিয়া জীবন কাটাইতে হয়, এবং ধনহীন স্বামীর বদন বিষতুল্য দেখেন। বালিকারা শিক্ষার সঙ্গে গৃহকর্ম্ম শিখিলে, ওরূপ হইবার সম্ভাবনা কম।

বালিকারা স্বাধীন ভাবে কদাচ কোন কাজ করিবেন না। পিতা মাতা ও বড় ভাই প্রভৃতি গুরু জনেরা যাহা বলিবেন তাহাই করিবেন। যাহা তাঁহারা নিষেধ করেন, চুপ করিয়া গোপনেও তাহা করিবেন না। এরূপে চলিলে সকলে তাঁহাদিগকে সুশীলা বলিবে। সুশীলা বালিকা হওয়া কম প্রশংসার কথা নহে।

পুরুষেরা বলেন—"দেশের স্ত্রী লোকেরা পুরুষ অপেক্ষা বেশী মিথ্যা কথা কহেন।" একথাটি নিতান্ত মিথ্যা নহে। বালিকাদের মিথ্যা কহিবার ও গোপন করিবার একটি প্রবৃত্তি সহজেই জন্মে। মাতা বড় ভগিনী প্রভৃতি হয়ত আপনাদের দোষে একটি মূল্যবান দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন—স্বামী ও শ্বশ্রূ জানিলে গালি দিবেন এই ভয়ে বালিকাকে শিখাইয়া রাখিলেন,—"জিজ্ঞাসা করিলে একথা বলিস্ না"—এইরূপে উহাদের ক্রমে মিথ্যা কহিবার ও গোপন করিবার স্বভাব জন্মে।—এই স্বভাব এরূপ ভয়ঙ্কর হয় যে ঐ বালিকা হয় ত আর এক দিন—আপনি কোন মন্দ কাজ করিয়া মাতার শিক্ষানুযায়ী মাতাকেই মিথ্যা কহিয়া বঞ্চনা করে।—অতএব শিক্ষা ও গৃহ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের এরূপ শিক্ষা পাওয়া উচিত যে সংসারে মিথ্যা কথা একবারে না কহিয়াও চলা যাইতে পারে। এবং মিথ্যা কথা কহা চুরী করা, মানুষ মারা এবং অসতী হওয়ার মত বড় পাপ।

এক অশিক্ষিতা মাতার কন্যা, কুশিক্ষা ক্রমে একটি সামান্য মাটির কলসী ভাঙ্গিয়াও অস্বীকার করিয়াছিল। আর একজন উহা দেখিয়াছিল, পরে তাহার মাতা তজ্জন্য তাহাকে এরূপ মারিলেন যে তাহাতে তাহার একটি চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল।

আর এক সুশিক্ষিতা মাতার কন্যা খেলা করিতে যাইয়া হাতের সুবর্ণ বলয় হারাইয়া ফেলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বালিকা ভয়ে কান্দিয়া বলিলেন—"মা আমি বালা নিজ দোষে হারাইয়াছি।"—মাতা আনন্দে কন্যাকে কোলে তুলিয়া তাহার ললাটে শত শত চুম্বন দিয়া বলিলেন—"মা, তুই আজ সকল সোণার

গহনা হারাইয়া আসিলেও আমি মারিতাম্ না।”—ফলতঃ সত্য কথার এতই মহিমা।

আর একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। বালিকাগণ সমবয়সি বালকগণের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়ায়। বাল্য কাল হইতে এরূপ করায় কতগুলিন পুরুষ স্বভাব তাহাদের শরীরস্থ হয়। যথা পরস্পর মারা মারি, গাছে চড়িয়া ফল পাড়া, ডুডু খেলা, পাখীর বাসা ভাঙ্গিয়া ছানা বাহির করা, ইত্যাদি। নারীসুলভ কোমলতা, দয়া, ভক্তি, বিশ্বাস এবং লজ্জার বদলে যেন নিষ্ঠুরতা, কঠিনতা, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস ও লজ্জাহীনতা নারী শরীরে স্থান না পায়, শিশুকাল হইতেই এজন্য সাবধান হওয়া উচিত। শিশুকালে যে অভ্যাস করিবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমে পাকিয়া উঠিবে।—আমার বিবেচনায় বাল্য কাল হইতেই বালক বালিকা গণকে পৃথক পৃথক রাখিয়া সুশিক্ষিত ও কার্য্যে পটু করিয়া তুলা উচিত।

এক জনের একটি মাত্র কন্যা ছিল। সুতরাং পিতা মাতা তাহাকেই পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন। এবং পুরুষের পোষাক্ পরাইয়া রাখিতেন। ঐ দিকে কন্যাটিও আপনাকে মনে মনে পুরুষ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সমবয়স্ক বালক গণের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত। পিতা মাতা বারণ করিতেন না। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, পুরুষরূপীকন্যা সম্পূর্ণ রূপে পুরুষের স্বভাব পাইল। বৃক্ষে আরোহণ, লম্ফন, সন্তরণ, বেগে ধাবন প্রভৃতি কার্য্যে অতিশয় পটু হইল।—কথা বার্ত্তাও পুরুষের মতই অভ্যাস হইয়া উঠিল, রাগিলে পুরুষের মত গালি দিত, লজ্জা কাহাকে বলে জানিত না। নির্ভয়ে গাছে উঠিয়া পাখীর ছানা বাহির করিয়া আনিত—এবং বর্সি লইয়া মাছ মারিত। অতঃপর ইহার বিবাহের সময় হইলে পিতা মাতা ইহাকে ভাল করিবার অনেক যত্ন করিলেন—কিন্তু ভাল করিতে পারিলেন না। অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া একটি যুবক ইহাকে বিবাহ করেন। আমরা শুনিয়াছি—বধূ হইয়াও কন্যার স্বভাব যায় নাই। শ্বশ্রূ ননদ হইতে প্রতিবেশী পর্য্যন্ত অনেকেই ইহার গালি ও কিল খাইয়া থাকেন। অল্প দিন হইল ইহাঁর দুর্ভাগা স্বামী,ইহারই অত্যাচারে আত্মহত্যা করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার এবং মনোরমার পুরুষভাবও এ সূত্রে গঠিত।

ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও বিরল নহে। একটি বালক শিশুকালে কেবল একদল বালিকার সঙ্গে কাটাইয়া আপন প্রকৃতি ঠিক্ স্ত্রীলোকের মত করিয়াছিলেন। বড় হইলে সে পুরুষদের কাছে যাইতে লজ্জা করিত। সর্ব্বদা স্ত্রীসমাজে আলাপ করিতে ভাল বাসিত। মেয়েলী কথা কহিত ও সেইরূপ গালি দিত। ক্রোধ হইলে চীৎকার করিয়া কান্দিত। পুরুষ সমাজে কথা মুখে ফুটিত না। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার ভয় ও লজ্জা বেশী ছিল। পিতা মাতা বহু চেষ্টায় ইহার সংশোধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আমাদের দেশ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থা অনেক ভিন্ন—এদেশীয় নারীগণের পক্ষে ঐ সকল দেশীয় নারীর অনুকরণ শোভা পায় না। সুতরাং সেরূপ উপায়ে ইহাদের শিক্ষা বিধান সমুচিত বোধ হয় না। আমাদের দেশের নারীগণ সুনীতি শিক্ষা করিবে এবং উত্তম গৃহিণী হইবে, সুশীলা, শান্ত, লজ্জাশীলা, সুধীরা, নির্লোভ এবং ধর্ম্মভীরু হইবে ইহাই আমাদের ইচ্ছা। অতএব ইহাদের গোড়া গুড়ি ঐ আকারের শিক্ষাই ভাল।

কুমারীভাগ।

পঞ্চম হইতে অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য ভাগ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময় মধ্যে বালিকাদের যাহা শিক্ষণীয় তাহা একরূপ লিখিত হইয়াছে। অষ্টম বৎসর হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত কুমারী ভাগ নির্দ্দেশ করিতেছি। সচরাচর দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই এদেশীয় কন্যাগণ বিবাহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই কাল মধ্যে নারীদের যে শিক্ষা হয়—সেই শিক্ষাই তাহাদিগকে ভাবী ভাল মন্দের দিকে অগ্রসর করে। এই সময়ের শিক্ষা যাহাতে বিশেষ সাবধানে ও যত্নের সহিত নির্ব্বাহিত হয় তৎপক্ষে মনোযোগী হওয়া চাই।

নারীগণের বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই লেখা পড়া ও সংসারের কর্ম্মে একরূপ পটু হওয়া উচিত। যত্ন করিলে এই সময়ের মধ্যে উহা হওয়াও অসম্ভব নয়। আমার বিবেচনায় এইকাল মধ্যে সমস্ত প্রকারের রন্ধন-প্রণালী এবং লেখা পড়ায় মোটা মুটি শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। চিঠি পত্র শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারা, ও টাকা পয়সার হিসাব রাখিতে পারা—শিখিতেই হইবে। উলের কাজ ও চিত্র প্রভৃতি বাবুয়ানা কাজ না শিখিয়া, এ সময়ের মধ্যে লেপের খোল, বালিষের খোল, মশারি, জামা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় শিলাই কর্ম্ম গুলি শিখাই ভাল।

দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই বঙ্গনারীর এক পিতা মাতার গৃহ হইতে নূতন আর এক পিতা মাতার গৃহে যাইতে হয়। পূর্ব্ব পিতা মাতা স্বাভাবিক পিতৃমাতৃস্নেহ গুণে ভাল বাসেন; কিন্তু এ নব পিতা মাতার গৃহে কর্ম্মে পটুতা ও চরিত্রের উৎকর্ষতা না দেখাইতে পারিলে ভালবাসার পাত্রী হওয়া যায় না। যাহা বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছ তাহার পরীক্ষা কিম্বা প্রদর্শনস্থল স্বামীর আলয়। এখানে শ্বশ্রূ, ননদ, দেবর, ভাসুর এবং তাহাদের পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেরই মনোরক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা যিনি পারেন তিনিই লক্ষ্মী বধূ। নচেৎ অলক্ষ্মী নামে অভিহিত হইবেন। সংসারে যে নারী কেবল গায়ে ফু দিয়া বেড়ান, এবং স্বামীর মনোমত কার্য্য ব্যতীত সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীনতা দেখান ও আর কাহারো কথা শুনিতে ভাল বাসেন না, তিনি অতি ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। যাহাতে নারীগণ এরূপ নিন্দিতরূপে নূতন

সংসারে যাইয়া পা না দেন অগ্রেই তৎপক্ষে সাবধান হওয়া উচিত।

বিবাহের পূর্ব্বে নারীগণ এরূপ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন, যাহা সমাজে চল আছে। নচেৎ চিরকাল গাউন পরিয়া ও পাদুকা ব্যবহার করিয়া অবশেষে শ্বশুর বাড়ীতে সাটী পরিয়া কুলবধূ হইতে কষ্টানুভব করিবেন। একষ্ট স্বীকার না করিতে গেলেই আবার হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

বিবাহের পূর্ব্বে বঙ্গীয় হিন্দুনারীগণের উপন্যাস ও নাটক পাঠ করা অসমুচিত। উপন্যাস ও নাটকের অধিকাংশই কুরুচিপূর্ণ ও বিদেশীয়ভাবে লিখিত। ইহাতে বাল্যশিক্ষার অমূল্য সময় নষ্ট হয়। এবং কোমল হৃদয়ে কল্পনার নায়ক প্রভৃতির চিত্র আকৃষ্ট হয়। ভবিষ্যতে ইহাতে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুনারীর নৃত্য গীত শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

বধূ ভাগ।

বিবাহিত হইবার পর হইতে সন্তান হইবার পূর্ব্ব এই সময়কে "বধূ ভাগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এইকাল মধ্যে নারীর কি কি করা উচিত, এ প্রস্তাবে কেবল তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

নারীগণের বধূত্ব কাল বড় অবসর কাল। এসময়ে তাহাদিগকে নানা কাজে বিব্রত হইতে হয় না; সন্তান লালন পালন করিতে হয় না। শ্বশুর শ্বাশুরী এবং স্বামী প্রভৃতি সকলেই তাহাদিগকে সুখে এবং সজ্জিত অবস্থায় রাখিতে ইচ্ছা করেন। বিশেষতঃ স্বামী বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। এইকাল বড় বিষম কাল। এই অবস্থায় পড়িয়া অনেক নারী পৃথিবী তৃণবৎ মনে করেন। এবং নিজের ভাবি শুভাশুভ না চিনিয়া স্বামীর দুর্ব্বলতা অনুসন্ধান করেন, এমন কি অনেকে স্বামি-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা জানিতে পারিয়া আপনি তাহার হৃদয়ে বসেন এবং তাহাকে বানরের ন্যায় নাচাইয়া তাহাকে ও আপনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলেন এবং ক্রমে দুর্বিনীত ব্যবহারে আত্মীয় স্বজনকে বিষতুল্য করেন। এরূপ নারী সংসারে বিরল নহে। ইহারা সুখ ও সংসার-ধ্বংস রূপিণী। যাঁহারা বাল্যকাল হইতে কুশিক্ষা এবং কুসংসর্গ পাইয়া আইসেন, তাঁহাদেরই এরূপ দশা দেখা গিয়া থাকে। আমার বিবেচনায় নারী-হৃদয়ের ন্যায় পরিস্কৃত দর্পণ আর নাই, উহার নিকট যাহা ধরিবে তাহাই প্রতিফলিত হইবে। সুতরাং কদাপিও পাপ চিত্র ইহারা যেন দেখিতে না পায়। পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালি পরিবারের গৃহস্থ জীবন একসময়ে সর্ব্ব দেশের লোভনীয় ছিল, এখন অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীর দোষে ইহা ঘৃণ্য হইয়া পড়িতেছে। এজন্যই অনেক প্রাচীন মহাশয়েরা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান। স্ত্রীশিক্ষার ফল যদি এই হয়, তবে অশ্রদ্ধা কেনই বা করিবেন না? বধূর অবস্থায় নারীগণ স্বয়ং একটু সাবধান হইলে এরূপ হইবে না। তুমি বধূ, তুমি বধূই থাকিবে, গৃহিণীকে "সময়ে

পদচ্যুত করিওনা। সুখে থাও পর। সংসার আছে, গৃহিণী আছেন, শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী আছেন। তুমি মন্ত্রী মহাশয় না হইলেও চলিতে পারে। তুমি স্বামীর নিকট বোনাপার্টীর দূতী না হইলেও চলিতে পারে। স্বামীর হৃদয়ে হুল ফুটাইয়া পরিজন-বর্গের চক্ষে বিষ ঢালিয়া তোমার কাজ কি? তুমি এই বধূত্ব কালের অবসরে আপনার অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা কর। লেখা পড়া আধ আধ (কর্ম্মচালান গোচ) শিখিয়াছ—এখন ভালরূপে শিক্ষা করিয়া সরস্বতী হও। সূঁচিকর্ম্মের মোটা শিলাই শিখিয়াছ, এখন নানাবিধ সূক্ষ্ম শিল্পে পারদর্শিনী হও। মোটা মোটি ভাত ব্যঞ্জন রাঁধিতে জান, এখন পোলাও কালিয়া পিষ্টক ও নানাবিধ মিষ্টান্ন রাঁধিতে অন্নপূর্ণা হও। তুমি শুদ্ধ বাঙ্গালা জান, এখনকার চলিত বিদ্যা ইংরেজী শিক্ষা কর। ইংরেজী শিখিলে আপন শিশুকে স্বয়ং একটু একটু ইংরেজী পড়াইতে পারিবে। সন্তান হইলে শিশুপালন পদ্ধতি মুহূর্ত্তমধ্যে জানিতে পারিবে না, অতএব এই অবসরে ঐ সম্বন্ধে যে সকল ভাল বহি আছে তাহাও পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। যে নারীর বিবাহ হইলেও এতগুলি কাজ শিখিতে হইবে, তাহার পক্ষে শরীর সাজাইয়া ঘুমাইয়া অসৎ গল্প করিয়া এবং অপকৃষ্ট নাটক ও আখ্যায়িকা পড়িয়া সময় নষ্ট করা বড়ই দুঃখের বিষয়।

শ্রীস্বর্ণলতা গুপ্তা
সাং গালা গ্রাম।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য।

ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি আলোচনা করিলে অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানা যাইতে পারে। দেশের বাণিজ্যে কত টাকা আয় হইতেছে, সেই টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইতেছে, কি প্রণালীতে বিদেশের সহিত বাণিজ্য চলিতেছে, এবং কি উপায়ে তাহাদের সহিত টাকা আদান প্রদান হইতেছে, এ সমস্ত বিষয় যেমন কৌতূহলজনক, তেমনই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা রাজনীতির কথা লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন করেন, দেশের আর্থিক অবস্থায় তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা একান্ত লজ্জাজনক। ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সহিত রাজনীতির একটি গুরুতর প্রশ্ন সম্পৃক্ত আছে। সেই প্রশ্নটি সাধারণের অধিকতর হৃদয়ঙ্গম হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। প্রশ্নটি ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

অনেকেই এই বলিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে দেশলাইটি পর্য্যন্তও বিদেশ হইতে আনীত হয়,—আমাদের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই আমরা বিলাত হইতে আনি। ইহা এক

সম্পর্কে বিলাপের বিষয় বটে; কিন্তু কেন বিলাপের বিষয়, তাহার সদুত্তর অনেকেই দিতে পারেন না। কেহ কেহ এতদূর মূর্খ আছেন যে তিনি হয় ত বলিবেন যে, বিলাত হইতে এই সমস্ত জিনিষ আমদানি হইতেছে, তজ্জন্য আমরা বিলাতে টাকা পাঠাইতেছি; সুতরাং আমাদের অর্থকোষ শূন্য হইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ যাঁহারা দেশলাইর বিরুদ্ধে চীৎকার করেন, তাহাদের অনেককেই উল্লিখিত যুক্তি প্রয়োগ করিতে শুনা যায়। কিন্তু ঐ যুক্তি সত্য হওয়া দূরে থাকুক, একভাবে বলিতে গেলে, উহার বিপরীত যুক্তি সত্য। আমরা যদি আরও অধিক জিনিব আমদানি করিতে পারিতাম এবং আমাদের রপ্তানি যদি ঠিক্ থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্য ছিল। কিন্তু তথাপি দেশলাই প্রভৃতির আমদানিতে কি দোষ আছে তাহা আমরা পশ্চাতে বলিব।

আমদানি ও রপ্তানি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অর্থব্যবহার শাস্ত্রের গুটি কএক কথা জানা একান্ত আবশ্যক। সে কএকটি কথা এই :—

১। প্রত্যেক দেশের আমদানি ও রপ্তানি সমান্। যদি কোন কারণে ইহার কোনটি বেশী হয়, তবে শীঘ্রই স্বাভাবিক নিয়মে তাহা সমান হইয়া যায়। যথা মনে কর,--চীন ও জাপানে বাণিজ্য চলিতেছে; চীন জাপানে জুতা পাঠায়, জাপান চীনে কাপড় পাঠায়। নিয়ম মতে, চীন যদি ২ কোটি টাকার জুতা পাঠায় তবে জাপান ২ কোটি টাকার কাপড় পাঠাইবে। এক্ষণে মনে কর, জাপানে এক বৎসর জুতার বেশী টান * পড়াতে চীন ৩ কোটি টাকার জুতা পাঠাইয়াছে। কিন্তু চীনে কাপড়ের পূর্ব্বের মত টান থাকাতে জাপান সেই ২ কোটি টাকার কাপড়ই পাঠাইতেছে। সুতরাং জাপান হইতে চীনে ১ কোটি টাকা নগদ বেশী গেল। এক্ষণে দুই কারণে, চীনে জুতার দর বৃদ্ধি হইবে। প্রথম কারণ এই যে, যে পরিমাণ টান, সে পরিমাণ জিনিষ সংগ্রহ না থাকিলে জিনিষের দর অবশ্যই বাড়ে; কেন না, যে বেশী টাকা দিতে পারে, সেই জিনিষ নেয়। দ্বিতীয় কারণএই যে,চীনে পূর্ব্বে যে চলিত ধন ছিল এক্ষণে তাহা হইতে ১কোটি টাকা বাড়িল। সুতরাং জিনিষের মূল্যও বৃদ্ধি পাইল। † জুতার দর বৃদ্ধি পাইলে দুই কারণে জাপানে জুতার আমদানি কমিবে। প্রথম কারণ এই যে, দর বাড়িলে অল্প লোকে জুতা কি-

* Demand এই স্থলে কাটতি বা কাটাও শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† মনে কর,কোন একদেশে বাণিজ্যের জন্য ৮ কোটি টাকা চলিতেছে এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জিনিষ আছে,—ধর যেন ৪ কোটি মণ। সুতরাং প্রত্যেক মণের মূল্য ২৲টাকা। এক্ষণ যদি কোন কারণে ৮ কোটি টাকা কমিয়া ৪ কোটি হয়; তবে প্রত্যেক মণের মূল্য ১৲ টাকা হইবে; আবার যদি ৪ কোটি টাকা বাড়িয়া ১৬ কোটি হয়,তবে প্রত্যেক মণের মূল্য ৪ টাকা হইবে। সুতরাং চলিত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দাম বাড়ে।

নিবে, দ্বিতীয় কারণ এই যে, চীন হইতে জুতা যে দরে আনা যায়, সে দরে জাপানেই জুতা প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপে চীনে জুতার রপ্তানি কমিয়া যাইয়া শীঘ্রই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আর এক কারণে এই পূর্ব্বাবস্থা আরও শীঘ্র প্রাপ্ত হয়। সে কারণ এই যে, জাপান হইতে চীনে টাকা যাওয়াতে, জাপানের চলিত মুদ্রা কমিল; সুতরাং জাপানে জিনিষেরও মূল্য কমিল। এই জিনিষের মধ্যে অবশ্য কাপড়েরও মূল্য কমিবে। কাপড়ের মূল্য কমাতে চীনে পূর্ব্ব হইতে অধিক কাপড় রপ্তানি হইবে। অর্থাৎ যেমন একদিকে জাপানের জুতার বাবদে ৩ কোটী আমদানি কমিয়া ২॥ কোটি হইবে, তেমন কাপড়ের বাবদে রপ্তানি ২ কোটি বাড়িয়া ২॥ কোটি হইবে। অতএব যে রূপই হউক, প্রত্যেক দেশের আমদানি ও রপ্তানি সমান।

২। আমদানিতে যেমন জিনিষ বুঝায়, তেমন কর্জ্জা টাকার সুদ, খাজানা কিংবা অন্যান্য প্রকারের দেনাও বুঝাইতে পারে। জাপান যে চীন দেশে ২ কোটি টাকার জিনিষ রপ্তানি করে বলিয়া ধরিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে সে যে ২ কোটি টাকার জিনিষই আমদানি করিবে, এমন নহে। মনে কর জাপানের চীনকে ১ কোটি টাকা সুদ ও খাজানা বাবদে দিতে হয়; এই টাকাটা যদি তাহার নগদ মুদ্রায় দিতে হয়, তবে জাপানের চলিত মুদ্রা কমিয়া যায়, এবং চীনের চলিত মুদ্রা বাড়ে; সুতরাং এই উভয় দেশের কোন দেশেই মূল্যের স্থিরতা থাকে না, এবং প্রজাগণ অস্থিরতার অসুবিধা ভোগ করে। কিন্তু জাপান ঐ ১ কোটি টাকা নগদ না দিয়া এক কোটি টাকার কাপড় দিতে পারে। ইহাতে দ্রষ্টব্যে বোধ হইবে যে, জাপানের জিনিস রপ্তানি ২ কোটি এবং আমদানি ১ কোটি। কিন্তু বস্তুতঃ এস্থলে জাপান ১ কোটি টাকার জিনিষ রপ্তানি করিয়াছে, এবং সুদ ও খাজানা বাবদে আর ১ কোটির জিনিষ রপ্তানি করিয়াছে। সুতরাং সুদ খাজানা ও অন্যান্য দেনা আমদানির স্থলাভিষিক্ত; অর্থাৎ আমদানি জিনিষের মূল্য + সুদ ও খাজানা প্রভৃতি বাবত দেনা = রপ্তানি জিনিষের মূল্য। অথবা বিদেশে আমাদিগকে যত মুদ্রা পাঠাইতে হয়, বিদেশ হইতে তত মুদ্রা আনীত হইয়া থাকে।

আমরা স্পষ্টতার অনুরোধে উল্লিখিত নিয়ম দুইটি আর এক ভাষায় বর্ণনা করিতেছি। ১ম নিয়ম এই যে যদি দুই দেশের মধ্যে কেহ কাহারও নিকট ঋণী না থাকে, তবে উভয় দেশের আমদানি ও রপ্তানি সমান। চীন ও জাপান যদি কেহ কাহারও নিকট সুদ, খাজানা প্রভৃতি বাবদ না ধারে, তবে চীন হইতে জাপানে যত টাকার জিনিষ রপ্তানি হইবে, জাপান হইতেও চীনে ঠিক তত টাকার জিনিস রপ্তানি হইবে। ২য় নিয়ম এই যে, যদি এক দেশ আর এক দেশের নিকট ঋণী থাকে, তবে ঋণী দেশ উত্তমর্ণ দেশ হইতে যত জিনিষ আমদানি করিবে, উত্তমর্ণ দেশের নিকট তাহা হইতে অধিক জিনিষ রপ্তানি করিবে, এবং এই

রপ্তানির আধিক্য উক্তঋণের সমান হইবে। যদি জাপান চীনের নিকট ২ কোটি টাকা স্থদ বাবদে ধারে, তবে জাপান চীন হইতে যত জিনিষ আমদানি করিবে, তাহা হইতে ২ কোটি টাকার অধিক জিনিষ চীনদেশে রপ্তানি করিবে।

৩। বাণিজ্যকারী উভয় দেশের মধ্যে আমদানির ও রপ্তানির সাম্য থাকিলে এক দেশ হইতে অন্যদেশে টাকা পাঠাইতে হয় না। ব্যাঙ্ক বিল কিংবা (private) ঘরাণা-বিল দ্বারাই কার্য্য চলে। মনেকর, চীনের ক জাপানের খ এর নিকট হইতে ১ শত টাকার কাপড় খরিদ করিয়াছে; এবং চীনের ঘ, জাপানের গএর নিকট ১ শত টাকার জুতা বিক্রয় করিয়াছে। এই কারবার বিনা টাকায় দুই প্রকার চলিতে পারে। প্রথমতঃ, কাপড় ক্রেতা ক ও জুতা ক্রেতা গ দায়িক, কাপড়-বিক্রেতা খ ও জুতা-বিক্রেতা ঘ প্রাপক। কাপড়-ক্রেতা ক, কাপড় বিক্রেতা খ এর নিকট এক খানা ধার পত্র দেয়, * কাপড় বিক্রেতা খ, জুতা ক্রেতা গ এর নিকট সেই ধার পত্র বিক্রয় করিয়া টাকা লয়, জুতা-ক্রেতা গ, জুতা বিক্রেতা ঘ এর নিকট ১০০ টাকার পরিবর্ত্তে ঐ ধার পত্র পাঠাইয়া দেয়, জুতা বিক্রেতা ঘ উহা কাপড়-ক্রেতা ক এর নিকট উপস্থিত করিবা মাত্র, ক তাহাকে ১০০ টাকা দেয়। এক্ষণে কাপড়ক্রেতা ক ও জুতা বিক্রেতা ঘ চীনবাসী এবং কাপড়বিক্রেতা খ ও জুতা-ক্রেতা গ জাপানবাসী। কাপড়-ক্রেতা ক বিদেশীয় কাপড় বিক্রেতা খএর নিকট টাকার পরিবর্ত্তে একখণ্ড ধারপত্র দিয়া জিনিষ ক্রয় করে, কিন্তু স্বদেশীয় জুতা-বিক্রেতা ঘএর নিকট টাকা পরিশোধ করে; কাপড়-বিক্রেতা খ বিদেশীয় কাপড় ক্রেতা কএর নিকট প্রাপ্য টাকা, স্বদেশীয় জুতা-ক্রেতা গএর নিকট কএর ধার পত্র বেচিয়া পায়। জুতা-ক্রেতা ঘ বিদেশীয় জুতা-বিক্রেতা ঘকে, তাহার জিনিষের বাবদ টাকা না পাঠাইয়া, ঐ ধারপত্র পাঠায়। জুতা বিক্রেতা ঘ ঐ ধারপত্র পাইয়াই গএর নিকট জিনিষ বিক্রয় করে; এবং স্বদেশীয় কাপড়-ক্রেতা কএর নিকট ঐ পত্র ফিরাইয়া দিয়া টাকা বুঝিয়া লয়। নিম্ন প্রদত্ত চিত্র দ্বারা এই ব্যাপার সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। তীরমুখে ক প্রদত্ত ধার পত্রের গতি ধর। ধারপত্র ক হইতে খএর হাতে, খ হইতে গএর হাতে, গ হইতে ঘএর হাতে, এবং অবশেষে ঘ হইতে পুনরায় কএর হাতে যাইয়া পৌঁছে।

চীন



জাপান

দ্বিতীয়; ব্যাঙ্কবিল দ্বারা। চীনযাত্রী ক

* যথা—আমি শ্রীক অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে কেহ এই ধার পত্র আমার নিকট উপস্থিত করিলে দৃষ্টি মাত্র তাহাকে ১০০ টাকা দিব।

চীনের ব্যাঙ্কে টাকা দিয়া জাপান ব্যাঙ্কের উপর একখানা বিল ক্রয় করে *। ক ঐ বিল জাপানবাসী খকে দিয়া জিনিষ ক্রয় করে। আবার গ জাপান ব্যাঙ্কে টাকা দিয়া চীনের ব্যাঙ্কের উপর একখানা বিল ক্রয় করে, এবং উহা ঘকে দিয়া ঘএর নিকট জিনিষ ক্রয় করে। খ কএর প্রদত্ত বিল জাপানব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলেই টাকা পায়। ঘও গএর প্রদত্ত বিল চীনের ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলেই টাকা পায়। অবশেষে চীনের ব্যাঙ্ক ও জাপানের ব্যাঙ্ক পরস্পরে আপনাদের লেনা দেনা কাটাকাটি করে। সুতরাং বাণিজ্যের জন্য এক দেশ হইতে অন্য দেশে টাকা নিয়া যাইতে হয় না। যাহারা হুণ্ডি ও বরাতচিঠির কারবারে অভিজ্ঞ, তাহাদিগকে এবিষয় বুঝাইতে হইবে না।

এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।

ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বৎসরেই আমদানি হইতে রপ্তানি বেশী †। আমরা যত টাকার জিনিষ বিদেশ হইতে আনি, তাহা হইতে অনেক বেশী টাকার জিনিষ বিদেশে পাঠাই। এই বেশী জিনিষের পরিবর্ত্তে একটি কপর্দ্দকও আমাদের এদেশে আসে না। বস্তুতঃ আমরা অন্যান্য দেশের নিকট যে ঋণী আছি, ঐ ঋণ পরিশোধ দিবার জন্যই আমাদিগকে এই বেশী জিনিষ পাঠাইতে হয়। আমরা টাকা পাঠাইতে পারি না, কারণ তাহা হইলে আমাদের দেশের চলিত মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইয়া মূল্যের অস্থিরতা এবং তজ্জন্য প্রজার অসুবিধা উৎপাদন করে। সুতরাং টাকার পরিবর্ত্তে জিনিষ পাঠাই। মর্‌ডিঞ্জেন সাহেব লিখিয়াছেন "কোন দেশের আমদানি হইতে রপ্তানির আধিক্য, অন্য দেশের নিকট ঋণী থাকার পরিচায়ক।" বস্তুতঃ ইহা সত্য কি না, আমরা সম্প্রতিই দেখিতেছি। ১৮৭৬ সনের জুলাই মাসের ষ্টেটিষ্টিকেল রেপোর্টার হইতে ক্রমান্বয়ে প্রথম দশ বৎসরের ও ষ্টেট্‌সম্যান্স ইয়ারবুক্ হইতে শেষ ৫ বৎসরের আমদানি ও রপ্তানির তালিকা পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিলাম।

---

* বিলের ফারম যথা ;—

'জাপান ব্যাঙ্ক বরাবরে—

যে এই বিল উপস্থিত করিবে তাহাকে ১০০ টাকা দিবা।'

(স্বাক্ষর)

চীন ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি।

† এই বিষয়ে অনেকের আশ্চর্য্য ভ্রম আছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষের রপ্তানি হইতে আমদানি বেশী। কোন এক সংখ্যক বামাবোধিনী পত্রিকায় অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে "ভারতবর্ষের রপ্তানি হইতে আমদানি অধিক, ইহার কারণ এদেশের লোকের বাণিজ্যের প্রতি বিরাগ ইত্যাদি।"

বৎসর	আমদানি। টাকা	রপ্তানি। টাকা	আমদানি হইতে রপ্তানির আধিক্য।
১৮৬৫—৬৬	৫৬,১৫,৬১,২৯০	৬৭,৬৫,৬৪,৭৫০	১১,৪৯,৯৯,৪৬০
১৮৬৬—৬৭	৪২,২৭,৫৬,[illegible]০০	৪৪,২৯,১৪,৯৭০	২,০১,৫৮,৪৫০
১৮৬৭—৬৮	৪৭,৪৮,১১,৫৭০	৫১,৪৪,৬০,০২০	৪,৯৬,৪৮,৪৫০
১৮৬৮—৬৯	৫১,১৪,৬০,৯৬০	৫৪,৪৫,৭৭,৪৫০	৩,৩১,১৬,৪৯০
১৮৬৯—৭০	৪৬,৮৮,২৩,২৭০	৫৩,৫১,৩৭,২৯০	৬,৬৩,১৪,০২০
১৮৭০—৭১	৩৯,৯১,৩৯,৪২০	৫৭,৫৫,৬৯,৫০০	১৭,৬৪,৩০,০৮০
১৮৭১—৭২	৪৩,৬৬,৫৬,৬২০	৬৪,৬৮,৫৩,৭৪০	২১,০১,৯৭,১২০
১৮৭২—৭৩	৩৬,৪৩,১২,১০০	৫৬,৫৪,০০,৪২০	২০,১০,৮৮,৩২০
১৮৭৩—৭৪	৩৯,৬১,৮৫,৬২০	৫৬,৯৪,০০,৭৩০	১৫,৩১,১৫,১১০
১৮৭৪—৭৫	৪৪,৩৬,৩১,৩৩০	৫৭,৯৮,৪৫,৩৮০	১৩,৬২,১৪,০৫০
১৮৭৫—৭৬	৪৪,১৮,৮০,৬২০	৬০,২৯,১৭,৩১০	১৬,১০,৩৬,৬৯০
১৮৭৬—৭৭	৪৮,৮৭,৬৭,৫১০	৬৫,০৪,৩৭,৮৯০	১৬,১৬,৭১,৩৮০
১৮৭৭—৭৮	৫৮,৮১,৯৬,৪৪০	৬৭,৪৩,৩২,২৪০	৮,৬১,৩৬,৮০০
১৮৭৮—৭৯	৪৪,১৫,৭৩;৪৩০	৬৪,৯১,৯৭,৭৪০	২০,০৬,২৪,৩১০ *

ইহাতে প্রথম দশ বৎসরে অর্থাৎ ১৮৬৫ হইতে ১৮৭৫ পর্য্যন্ত গড়পড়তায় প্রতিবৎসর আমদানি হইতে ১১,৬১,২৮,১৮০ টাকা বেশী জিনিষ রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে প্রতি বৎসর গড়ে ১৫,২৩,৬৭,২৯৫ টাকার বেশী জিনিষ রপ্তানি হইয়াছে। অথবা ১৮৬৬ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরে মোট ১৭৭,০৭,৯৬,৭৩০ এক অর্ব্বুদ সাতাত্তরকোটী সাত লক্ষ ছয়ানব্বই হাজার সাত শত ত্রিশ টাকার বেশী জিনিষ রপ্তানি হইয়াছে। এই এক অর্ব্বুদ সাতাত্তর কোটি টাকার জিনিষের পরিবর্ত্তে আমরা এক কপর্দ্দকও ফিরিয়া পাই নাই। এই জিনিষ দ্বারা অন্যান্য দেশের, প্রধানতঃ ইংলণ্ডের নিকট, আমাদের যে ঋণ † ছিল, তাহা পরিশোধ করিয়াছি। ভারতবর্ষের দ্বারা ইংলণ্ডের কোন উপকার হয় কি না, উল্লিখিত

* এই স্থানে এবং স্থানান্তরে যে সমস্ত টাকার অঙ্ক লিখিত হইল, তাহাতে প্রতি পাউণ্ড দশ টাকা হিসাবে ধরা গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান এক্সেঞ্জ অনুসারে ১ টাকা = ১ শিলিং ৭ৡ পেন্স; অথবা এক পাউণ্ড = ১২৶৫ পাই। সুতরাং উল্লিখিত তালিকার প্রত্যেক অঙ্ককে $\frac{১২৶৫}{১০}$ দিয়া গুণ করা উচিত।

† ঋণদ্বারা সর্ব্বপ্রকার দেয়কে লক্ষকরা হইয়াছে। যথা, ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের ব্যয়, পেন্‌সন্ ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র হিসাব দ্বারাই তাহা বুঝা যাইবে। এত ঋণ যদি টাকাদ্বারা আমাদিগকে পরিশোধ করিতে হইত, তবে ভারতবর্ষের ধনকোষ এত দিনে প্রায় শূন্য হইত। ১৭৭ কোটী টাকা যদি ১৪বৎসরে আমরা ইংলণ্ডে পাঠাইতাম, এবং প্রতিবৎসর আরও ১৫।০ কোটী করিয়া টাকা পাঠাইতে থাকিতাম, তবে আমাদিগের কি উপায় হইত বল দেখি? কিন্তু যেহেতু এত ঋণ আমরা টাকায় পাঠাইতে পারি না, সুতরাং কৃষক দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এত টাকার শস্য উৎপাদন করিতেছে, এবং সেই শস্য আমরা বিলাতে ও অন্যান্য স্থানে পাঠাইয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছি। কৃষকগণ যে ভারতবর্ষের অন্ন যোগাইতেছে, তাহা নহে, তাহারা চা, কার্পাস, নীল, পাট, অহিফেন, প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া ভারতবর্ষের ঋণ পরিশোধ করিতেছে। যদি উল্লিখিত ১৪ বৎসরে আমাদিগকে ১৭৭ কোটী টাকার ঋণ পরিশোধ করিতে না হইত, তাহা হইলে ইহাদ্বারা আমরা অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করিতে পারিতাম। ১৭৭ কোটী টাকার জিনিষের কিয়দংশ দেশে রাখিয়া কৃষকগণকে পেটভরা ভাত এবং উপযুক্ত বস্ত্র যোগান যাইত, আর বাকী জিনিষদ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে নানাবিধ যন্ত্রাদি আনিয়া, এক্ষণে বিদেশীয় মূলধনে যে সমস্ত কার্য্য চলিতেছে, সেই সমস্ত কার্য্যই তাহাদের সহায়তা ব্যতীত করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের দেশে যে জিনিষ উৎপন্ন হয়, আমরা তাহা দ্বারা বিদেশের ঋণ পরিশোধ করিয়াই কুলাইতে পারিতেছি না, সুতরাং রেলওয়ে বল, কারবার বল, সমুদায়ই বিদেশীয় মূলধন দ্বারা চলিতেছে।

রেলওয়ে বিস্তারের দরুণ ইংলণ্ডীয় বণিকেরা এদেশে এক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাকল্যে ৯৬ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ষ্টেটসেক্রেটরী ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে বৎসর বৎসর যে ১২ কোটী টাকা নেন, যদি অন্ততঃ সেই টাকাটা আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় বণিকের নিকট হইতে অর্দ্ধক্রান্তিও না নিয়া আমরা আট বৎসরে ৯৬ কোটী টাকার রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে পারি। তাহা দূরে থাকুক, শুধু কতগুলি ইংরেজের খোরপোষ যোগাইতে অকারণ কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া ভারতবর্ষের যে প্রতিবৎসর ৮ কোটী টাকা লাগান হইতেছে, যদি ঐ সমস্ত সৈন্য উঠাইয়া দিয়া সেই ৮ কোটী আমাদিগকে বাচাইতে দেয়, তাহা হইলেও আমরা ১২ বৎসরে ৯৬ কোটী টাকার রেল বিদেশীয় সাহায্য ব্যতিরেকে অনায়াসে নির্ম্মাণ করিতে পারি। "অমুক বিল পাস হইলে আমরা আমাদের মূলধন লইয়া এদেশ হইতে উঠিয়া যাইব" যখন ইংরেজগণ এই কথা বলে, তখন তাহাদিগকে বলা উচিত যে, ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে যাহারা মাস ১২ হাজার টাকা করিয়া বেতন পাইতেছে, তাহাদিগকে ৫ হাজার টাকা করিয়া বেতন দেও, আর এদেশের সৈন্য সংখ্যা অর্দ্ধেক

কমাও, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সংখ্যা এবং বেতনটাও কিছু হ্রাস কর, আমরা তোমাদের নিকট এক কপর্দ্দক মূলধনও চাহিব না, তোমরা উহা উঠাইয়া নিয়া যে-খানে ইচ্ছা সেখানে ফেলিয়া দেও। তো-মাদের মূলধন উঠাইয়া নিলেই বাচি। পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবে, এ দেশের আমদানি ও রপ্তানিতে কোন বিশেষ রাজনৈতিক প্রশ্ন লুক্কায়িত আছে কি না।

বিদেশীয় মূলধন কি ভাবে আমাদের দেশে আসে, তাহা হয় ত অনেকে না জানিতে পারেন। কাহারও এরূপ বিশ্বাস আছে যে, সাহেবগণ সঙ্গে করিয়া এদেশে টাকা লইয়া আইসেন এবং তাহা দ্বারায় এদেশে কারবার খোলেন। বস্তুতঃ এদে-শের টাকা কোন দেশে নীত হয় না। বরং আমরা যতখানি স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানি করি, তাহার অধিক স্বর্ণ ও রৌপ্য আম-দানি হয়। নিম্নে ইহার একটি তালিকা দেওয়া গেল। Administration Reports এ ইহা Import & Export of Treasure বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

সন	আমদানি। টাকা	রপ্তানি। টাকা	রপ্তানি হইতে আমদানির আধিক্য।
১৮৭০	১৩,৯৫,৪৮,০৭০	১,০৪,২৩,৫৩০	১২,৯১,২৪,৫৪০
১৮৭১	৫,৪৪,৪৮,২৩০	২,২২,০৭,৭৬০	৩,২২,৪০,৪৭০
১৮৭২	১১,৫৭,৩৮,১৩০	১,৪৭,৬০,৯৪০	১০,০৯,৭৭,১৯০
১৮৭৩	৪,৫৫,৬৫,৮৫০	১,২৯,৮০,৭৯০	৩,২৫,৮৫,০৬০
১৮৭৪	৫,৭৯,২৫,৩৪০	১,৯১,৪০,৭১০	৩,৮৭,৮৪,৬৩০
১৮৭৫	৮,১৪,১০,৪৭০	১,৬২,৫৩,০৯০	৬,৫১,৫৭,৩৮০
১৮৭৬	৫,৩০,০৭,২২০	২,২০,০২,২৩০	৩,১০,০৪,৯৪০
১৮৭৭	১১,৪৩,৬১,১৮০	৪,০২,৯৮,৯৮০	৭,৪০,৬২,২০০
১৮৭৮	১৭,৩৫,৫৪,৫৯০	২,২১,০৯,৯৬০	১৫,১৪,৪৪,৬৩০
১৮৭৯	৭,০৫,৬৭,৪৯০	৩,৯৮,২২,২৮০	৩,০৭,৪৫,২১০

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে উপলব্ধি হইবে যে, আমাদের দেশহইতে যে পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য বিদেশে প্রেরিত হয়, আমাদের দেশ তাহা হইতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৭ কোটি টাকার স্বর্ণ রৌপ্য অধিক আম-দানী হয়, সুতরাং স্বর্ণ রৌপ্যের পরিমাণ আমাদের দেশে বৃদ্ধিই পাইতেছে। *

এক্ষণে কি প্রণালীতে বিদেশীয় মূলধন আনীত হয়, এবং আমাদের দেনা পরি-

* কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই টাকা আমদানিতেই কি আমা-দের দেশের জিনিষের মূল্য বাড়িতেছে? আমাদের বোধ হয় তাহা নহে। জিনিষের মূল্য অন্য কারণে বাঁড়িতেছে। বাণিজ্যের পসার (activity) বাড়িলে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে

শাধ হয়, তাহা বলা যাইতেছে। আমরা আমাদের দেনা পরিশোধ করিতে বিদেশে টাকা পাঠাইতেছি না; এবং রেলওয়ে প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য বিদেশ হইতে যে মূলধন আমরা আনিতেছি, তাহাও টাকায় আনিতেছি না। ব্যাঙ্ক এবং ঘরাণা বিল দ্বারাই এই সমস্ত লেনা দেনা চলিতেছে।

একটি কল্পিত হিসাব ধরিয়া, প্রথমতঃ কথাটি বুঝান যাউক। মনে কর ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে কারবার; ভারতবর্ষের সুদ খাজানা কর্ম্মচারীদিগের পেনসন, ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের ব্যয় প্রভৃতি বাবদ ১০ কোটি টাকা ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট পাঠান আবশ্যক। আবার আমদানি হইতে রপ্তানির আধিক্য বাবদে, এবং ভারতবর্ষে কারবারের জন্য মূলধন বাবদে, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষে ১০ কোটি টাকা পাঠান আবশ্যক। ইংলণ্ডের সহিত এই সমস্ত লেনা দেনা নিম্ন লিখিত প্রণালীতে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সেক্রেটরী অব ষ্টেট (মনে কর লর্ড কিম্বারলি) ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কের (ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল) উপর সমগ্রে দশ কোটী টাকা মূল্যের কতকগুলি বিল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করেন। ইহাকে Homedraft বলে। * ভারতবর্ষে যাহাদিগকে টাকা পাঠাইতে হইবে, তাহারা ঐ বিল ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট হইতে ক্রয় করে। এই ভাবে, বিল বিক্রয় করিয়া ষ্টেট সেক্রেটরী তাঁহার প্রাপ্য ১০ কোটি টাকা উশুল করেন। পরে বিল ক্রেতাগণ ঐ বিল ভারতবর্ষে তাহাদের কার্য্যকারকের নিকট অথবা জিনিষবিক্রেতাগণের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহারা উহা সরকারি ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইয়া টাকা লইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট ভারতবর্ষের যাহা দেয়, ষ্টেট সেক্রেটরীর বিল ভাঙ্গিয়া ভারতবর্ষ সেই দেয় হইতে মুক্ত হয়। আবার ইংরেজ ব্যবসায়ীদের যে টাকা ভারতবর্ষে পাঠান আবশ্যক তাহা তাহারা ইংলণ্ডে দেয়, এবং বিল দ্বারা ভারতবর্ষে সেই টাকা উঠাইয়া লয়।

কিন্তু প্রকৃত হিসাবে রপ্তানি বাবত ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড যত টাকা দিতে বাধ্য,

---

' যে মুদ্রা আমদানি হইতেছে, তাহা বাণিজ্যের পসারে লাগিতেছে; মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে নাই।

* আমরা Homo draftএর ফারম দেখি নাই, কিন্তু উহার মর্ম্ম এইরূপ হইতে পারে; যথা—

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট

বরাবরে—

দৃষ্টিমাত্র এই বিল বাহককে এত টাকা দিবা।

ইংলণ্ড। (স্বাক্ষর)

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত

ষ্টেট সেক্রেটরী

ইংলিশম্যান, ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্রিকার প্রথম স্তম্ভে পাঠক প্রায়শঃই এইরূপ দেখিতে পাইবেন যে 'বর্ত্তমান সপ্তাহে ষ্টেট সেক্রেটরী ২॥০ লক্ষ টাকার (Home draft) বিক্রয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।'

আমদানি এবং ষ্টেট সেক্রেটরীর বিল একত্র করিয়াও তাহা পোষে না। বাকী টাকা ঘরাণা (private) বিল দ্বারা দেওয়া হয়। অর্থাৎ বিলাতের "জন্" যেমন ভারতবর্ষের রামুসাহা হইতে ১ কোটি টাকার পাট কিনিয়াছে। আবার ভারতবর্ষের কালু সাহেব বিলাতে তাহার পুত্র লুই সাহেবের নিকট ১ কোটি টাকা পাঠাইতে চাহে। এক্ষণে, চীন ও জাপানে যে প্রকার ব্যাঙ্ক ও ঘরাণা বিল দ্বারা টাকা লেনা দেনার কথা বলা গিয়াছে, ইহাও সেই প্রকার চলিবে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এক্ষণে কল্পনা ছাড়িয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

নিম্ন লিখিত দেশের সহিত ভারতবর্ষের প্রধান কারবার হইয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেন (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড), চীন, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ। কোন্ দেশ হইতে কত আমদানি ও কোন্ দেশে কত রপ্তানি হয়, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল। উহাতে দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে আমাদের আমদানি ও রপ্তানি প্রায় সমান। কিন্তু অন্যান্য দেশ রপ্তানির আধিক্য বাবদ যাহা আমাদিগের নিকট ধারে, তাহা তাহারা প্রায়শঃই ইংলণ্ডের উপর বরাত দেয়, কারণ ইংলণ্ড প্রায় সকল দেশের নিকটই ধারে। অতএব হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা সব জিনিষই ইংলণ্ডে রপ্তানি করি, এইরূপ মনে করিতে পারি।

•	গ্রেটব্রিটেন	ফ্রান্স	ইটালী	ইউনাইটেড ষ্টেটস্	চীন এবং হংকং	ষ্ট্রেইটসেটেলমেণ্ট	সিংহল	মরেসিয়াস	অষ্ট্রেলিয়া
আমদানী	৩২২১১৩০৩০	৪৫১১০৫০	৩৪৯২২৯০	২৭৯৭১৭০	১৪০৩৬৭৩০	১০৭৯৭০২০	৫৩০৫৫৫০	৬৪২৪৭১০	২৯৮২৯৮০
রপ্তানি—	২৯২৯৮১৫২০	৫৯৬৩০৫৭০	১৮৬৭৬৯০০	১৯৩০৩৪০০	১২৬৩৪৯৩৫০	২৩৪৩২৮৫০	২৪৯৬৩২৩০	১১১৭৯৭৫০	৪৪৯৭৪০০
মোট—	৬১৫০৯৪৫৫	৬৪১৪১৬২০	২২১৬৯১৯০	২২১০০৫৭০	১৪০৩৮৬০৮৪	৩৪২২৯৮৭০	৩০২৬৮৭৮০	১৭৬০৪৪৬০	৭৪৮০৩৮০
শতকরা—	৪৯	৫	১.৮	১.৮	১১	৩	২.৬	১.৪	.৬

উল্লিখিত হিসাব দৃষ্টে দেখা যাইবে যে, আমাদের গ্রেটব্রিটেনের সহিত কারবারই সর্ব্ব-প্রধান। চীনে যে রপ্তানি হয়, চীন হইতে আমদানি তাহার তুলনায় কিছুই নহে। চীন বাকী টাকা নগদ না দিয়া বিলাতের উপর বরাত দেয়। বিলাত আমদানির দরুণ চীনের নিকট অনেক টাকা ধারে। আমরা ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট যে টাকা ধারী, তিনি তাহা ঐ বরাতী টাকা হইতে কাটাইয়া লন। অর্থাৎ চীন আমাদের নিকট ধারে, বিলাত চীনের নিটক ধারে, আমরা বিলাতের নিকট ধারি, স্থতরাং বরাতে বরাতে চলিয়া যায়, টাকা লেনা দেনা করিতে হয় না। অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যেও, যে পরিমাণ আমদানি হয়, তাহার বেশী রপ্তানি হয়, সে সমস্ত দেশও তাহাদের দেয় টাকা চীনের ন্যায় ইংলণ্ডের উপর বরাত দেয়।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের কারবারকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। *

১ম—দ্রব্যজাত যাহা আমদানি হয় ও যাহা রপ্তানি হয়।

২য়—নগদ মুদ্রা।

৩য়—ষ্টেট সেক্রেটরীর বিল দ্বারা যে কারবার নিষ্পন্ন হয়।

৪র্থ—ঘরাণা (private) বিল দ্বারা যে কারবার নিষ্পন্ন হয়।

৫ম—জাহাজের ভাড়া।

এই পাঁচ ভাগের ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ দ্রব্যজাত আমদানিও রপ্তানি। ১৮৩৫ সন হইতে ১৮৭১ সন পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরে ১০১২ কোটি টাকার দ্রব্যজাত বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছে; যথা—

রপ্তানির মূল্য	১০১২ কোটি।
আমদানির মূল্য	৫৮৩ ”
বাকী	৪২৯ কোটি।

বিদেশের নিকট রপ্তানির দরুণ ৩৫ বৎসরে এই ৪২৯ কোটি টাকা আমাদের প্রাপ্য ছিল।

২য় নগদ মুদ্রা। উল্লিখিত ৩৫ বৎসরে ভারতবর্ষ ৩১২ কোটী নগদ আমদানি এবং ৩৭ কোটিমাত্র রপ্তানি করিয়াছে, স্থতরাং ২৭৫ কোটী টাকা অধিক আমদানি হইয়াছে। এই টাকা উল্লিখিত ৪২৯ কোটী টাকা হইতে বাদ যাইবে; যথা—

রপ্তানির দরুণ প্রাপ্য	৪২৯ কোটী
নগদ মুদ্রা আমদানি	২৭৫ ,,
বাকী প্রাপ্য	১৫৪ কোটী

এই ১৫৪ কোটী টাকা বিদেশ সমূহ আমাদের নিকট ৩৫ বৎসরে ধারিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যাহা ধারে, তাহা প্রায়ই ইংলণ্ডের উপর বরাত দেয়। স্থতরাং ঐ ১৫৪ কোটি প্রায় সমস্তের জন্যই ইংলণ্ড আমাদের নিকট দায়ী ছিল। কিন্তু আমরা অন্যান্য বাবদে উহা হইতে ৪০ অধিক টাকার জন্য ইংলণ্ডের নিকট দা৯০ ছিলাম। স্থতরাং ঐ টাকা কাটাকাটি৹

* এই হিসাব সর রিচার্ড টেম্বল সাহেবের রাজস্ব সংক্রান্ত মিনিট হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হইয়া গিয়াছে এবং বাকী টাকা বিদেশীয় মূলধন স্বরূপে আমাদের দেশেই রাখা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে টাকা আসিবার কথা

(১৮৩৫—৭০)

বিদেশীয় বাণিজ্যের বাবত——	১৫৪ কোটি
ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যে মূলধন পাঠাইয়াছে অথবা তাহাদিগ হইতে যে টাকা কর্জ্জ আনা হইয়াছে——	৪১ কোটি
মোট।	১৯৫ কোটি

উল্লিখিত ৩৫ বৎসরের নিম্ন লিখিত প্রকার পাওনা দেনার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে; যথা—

ভারতবর্ষ হইতে যে টাকা যাইবার কথা

(১৮৩৫—৭০)

ষ্টেট সেক্রেটরী বরাবরে নিম্নের (ক) চিহ্নিত তপছিলের দরুণ——	১১৩ কোটি
(খ) জাহাজ ভাড়া——	
(গ) ভারতবর্ষে ইংলণ্ডবাসীদের যে সিকিউরিটি আছে তাহার সুদ (যাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়)——	
(ঘ) ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ভারতবর্ষস্থ কারবারে যে মুনাফা হয়, তাহার যে অংশ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়——	
(ঙ) ভারত বাসী ইংরেজেরা যে টাকা আপনাদের পরিবারাদির খরচের জন্য ইংলণ্ডে পাঠায়——	
(খ), (গ), (ঘ), ও (ঙ)এর মোট——	৮২ কোটি
মোট	১৯৫ টাকা

(ক) ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট কি কি বাবদে আমাদিগকে টাকা পাঠাইতে হয়, তাহার সাধারণ হিসাব দেওয়া গেল।

১ম, ইণ্ডিয়া শাসনের জন্য ইংলণ্ডে যে সমস্ত আফিস আছে তাহার ব্যয়। এই ব্যয় সামান্য নহে। ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে ১৫ জন মেম্বর। প্রত্যেকের বেতন মাসিক ১।১ হাজার টাকা। যদি অতিরিক্ত কোন সেক্রটরী নিযুক্ত হয়, তবে তাঁহার এবং অধীনস্থ সেক্রেটরিগণের বেতনও ভারতবর্ষের বহন করিতে হয়। কোন মেম্বর দশ বৎসর কাজ করিলেই তিনি মাসিক ৬০০ টাকা বেতন পাইতে পারেন।* ইহার উপরে আফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারী-দিগের বেতন। পাঠক এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারেন, ইহাতে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সমস্ত ব্যয় বৎসরে কত দাঁড়ায়।

২য়, যে সমস্ত সৈনিক ও সিবিলিয়ান

* Government Gazette of 1858 page 488—89.

পেন্‌সন ও বিদায় লইয়া বিলাত যায় তাহাদের পেন্‌সন ও বেতন। শুদ্ধ এক পেন্‌সনে বৎসর বৎসর প্রায় ২ কি ২॥০ কোটি টাকা দিতে হয়। অবশ্য পূর্ব্বে এত ছিল না। ক্রমেই বাড়িতেছে। সৈনিকগণ ভারতবর্ষে দুই তিন বৎসর কাজ করিয়াই পেনসন পাইতে পারে।

৩য়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সরকারী প্রয়োজনে বিলাত হইতে যে সমস্ত জিনিষাদি আনয়ন করেন তাহার মূল্য। ইহাও বার্ষিক দুই-কোটিটাকার অধিক। Adminstration Report এ ইহা Government Stores বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। বাণিজ্যের আমদানির হিসাবে এই সরকারী আমদানি ধরা হয়না। সম্প্রতি লর্ড রিপণের সুব্যবস্থায় এই আমদানি কমিতেছে; এখানে যে জিনিষ সুলভে পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণে আর বিলাত হইতে আনীত হয় না। (যথা অমৃতলাল রায়ের ছাপার কালী, প্রেমচাঁদ মিস্ত্রির ছুরী ইত্যাদি।)

৪র্থ। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে প্রভৃতি পাব্লিক ওয়ার্কের জন্য এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদির জন্য বিলাত হইতে যে টাকা কর্জ্জ করেন তাহার সুদ। ১৮৭৯ সালের আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়, গ্রেটব্রিটেনের নিকট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ৫৯,০০,৮২,০০০ টাকা সসুদ কর্জ্জ (national debt bearing interest) আছে। শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা সুদ ধরিলে বৎসর প্রায় ২।০ কোটী টাকা সুদ হইবে।

১৮৭৭ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত তিন সনে নিম্নলিখিত টাকা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ইংলণ্ডে ব্যয়িত হইয়াছে।

১৮৭৭	১৩,৪৬,৭৭,৬৩০৲
১৮৭৮	১৪,০৪,৮৩,৫০০৲
১৮৭৯	১৩,৮৫,১২,৯৬০৲

অর্থাৎ উক্ত তিন বৎসরে গড়ে প্রত্যেক বৎসর প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটরী হোম ড্রেফট্ দ্বারা এই টাকা উশুল করিয়াছেন।

খ, গ, ঘ, এবং ঙ চিহ্নিত দেনা ব্যাঙ্ক এবং প্রাইবেট বিল দ্বারা পরিশোধ হয়।

অতএব দেখা গেল যে ভারতবর্ষের দেনা পাওনা সমান। ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ কমিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস যে ভ্রমাত্মক তাহা এক্ষণে অনেকেই বুঝিয়া থাকিবেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে।

আমদানির অল্পতা যে আনন্দের বিষয় না হইয়া দুঃখেরই বিষয়, বোধ হয়, তাহাও সকলে বুঝিয়াছেন। ইংলণ্ডের রপ্তানি হইতে আমদানি বেশী; ইহার অর্থ এই যে ইংলণ্ডের নিকট প্রায় সকল দেশই ঋণী আছে, তাহারা জিনিষ দ্বারা সেইঋণ পরিশোধ করে। বস্তুতঃ রপ্তানি হইতে আমদানির অধিক্য দেশের ধনবত্তার পরিচায়ক, আবার আমদানি হইতে রপ্তানির আধিক্য দেশের দরিদ্রতার পরিচায়ক।

পূর্ব্বে যে ১৯৫ কোটির উল্লেখ হইয়াছে তাহার ১৫৪ কোটী আমরা বাণিজ্য দ্বারা পরিশোধ করিয়াছি। বাকী ৪১ কোটী আমাদিগের দিতে হইত; কিন্তু ইংরেজের

আমাদের দেশে কারবারের জন্য যে টাকা পাঠাইয়াছে, তাহার সঙ্গে কাটাকাটি হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজ বণিকেরা আমাদের এই উপকার করিতেছে যে, যদি তাহারা ৪১ কোটি না পাঠাইত,তবে আমাদের আরও জিনিষ অথবা টাকা পাঠাইতে হইত। এই উপকারের জন্যই এত চীৎকার হইতেছে যে, ইলবার্ট বিল পাস হইলে ইংরেজগণ তাহাদের মূলধন উঠাইয়া নিবে।

কিন্তু একপক্ষে ইংরেজ বণিকেরা আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন,তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,আমরা আমাদের দেয় ঋণ টাকায় পরিশোধ না করিয়া জিনিষ দ্বারায় পরিশোধ করি। কিন্তু এই জিনিষ জন্মায় কাহাদের উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে ? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইংরেজদের। আমাদের টাকা, যাহার যাহা কিছু আছে, তাহাও ঘরে পড়িয়া থাকে ; আমরাও " তাকিয়ার উপর বৃহত্তর তাকিয়ার ন্যায়" ঠেস্ দিয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু ইংরেজ বিদেশ হইতে আসিয়া তাহার অর্থ দ্বারা আমাদের দেশের জঙ্গল আবাদ করে, ভূমিকর্ষণ করে এবং ফসল জন্মায়। সেই ফসল আমাদের বাণিজ্যের সম্বল, তাহা দ্বারাই আমরা আমাদের ঋণ পরিশোধ করি। ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও অর্থ বিষয়ে একেবারে নির্ধনী হয় নাই। তাহার স্বর্ণ রৌপ্যের ভাণ্ডারও কমিয়া যায় নাই। কিন্তু যে তেজ, উদ্যম ও অধ্যবসায় সেই অর্থ খাটাইবে, তাহার অভাব ;—যে চক্ষু নিজদেশের আসন্ন দুর্গতি চাহিয়া দেখিবে, সে চক্ষু নিমিলিত। এক্ষণেও আমাদের যাহা আছে, তাহা খাটাইতে শিখিলে, এবং জাহাজ প্রভৃতি নিজেরা চালাইতে পারিলে অন্ততঃ বার্ষিক দুই কোটি টাকা বাঁচাইতে পারি।

আমরা এক স্থলে বলিয়াছি যে, যদিও আমদানি বেশী হওয়া মন্দ নহে; বরং ভাল, তথাপি যে সকল জিনিষ আমাদের দেশে আমদানি হইতেছে, তাহা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তাহার প্রথম কারণ এই যে, আমরা যে সকল জিনিষ রপ্তানি করি, তাহা প্রায় সমস্তই উপকরণ সামগ্রী (raw materials) অর্থাৎ যে সকল স্বভাবতঃ অব্যবহার্য্য সামগ্রী দ্বারা ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহা ; যথা—পাট, কার্পাস ইত্যাদি। আর আমরা যে সকল জিনিষ আমদানি করি, তাহা প্রায় সমস্তই প্রস্তুত (manufactured) সামগ্রী ; এ দুইয়ে প্রভেদ এই যে, উপকরণ সামগ্রী দ্বারা নূতন অর্থ জন্মান যায় ; যথা ২ কোটি টাকার কার্পাস কিনিয়া আনিলে, তাহার উপর ১ কোটি ব্যয় করিয়া কাপড় প্রস্তুত করিলে, তাহা ৪ কোটি টাকায় বিক্রয় করা যায় ; সুতরাং ১ কোটি টাকা লাভ থাকে। আর প্রস্তুত সামগ্রী কেবল নিঃশেষ (Consumption) করিবার জন্যই আনা হয় ; যথা মদ, কাপড় ইত্যাদি ; সুতরাং তাহা দ্বারা নূতন অর্থ জন্মান যায় না। আমরা যাহা অপরকে দিতেছি, অপরে তাহা নিয়া অধিকতর ধনী হইতেছে। আমরা যাহা আনিতেছি, তাহা অমনি নিঃশেষ

করিতেছি, সুতরাং আমাদের ধন বাড়িতেছে না।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের রপ্তানির জিনিষ প্রায় সমগ্রই ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভূমির উৎপাদিকা শক্তির একটি সীমা আছে। যদিও ভূমি হইতে উৎপন্ন জিনিষের পরিমাণ এক্ষণে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, চির দিন এইরূপ পাইবে না। এদিকে আমাদের লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং ভূমি হইতে উৎপন্ন জিনিষের দেশীয় প্রয়োজন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; লোক যে পরিমাণে বাড়ে, জিনিষ সে পরিমাণে বাড়ে না, চির দিন বাড়িতে পারেও না। সুতরাং ভূমি হইতে উৎপন্ন পদার্থের রপ্তানি ক্রমশঃই কমিতে থাকিবে। এ অবস্থায় বিদেশের নিকট আমাদের যে দেনা, তাহা দিতে আমরা দিন দিনই অশক্ত হইব। যদি প্রস্তুত জিনিষ রপ্তানি এবং উপকরণ জিনিষ আমদানি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের উপকার হইত। নিম্নে আমাদের এক বৎসরের আমদানি ও রপ্তানি জিনিষের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

আমদানি ১৮৭৭—৭৮

পোষাক ...	৫৫,৭৬,৯৭০
কয়লা ...	১,০০,৭৯,৩২০
কার্পাস বস্ত্রাদি ...	২০,১৭,২৭,১৬০
ছুরী প্রভৃতি ...	৪৪,৮২,২৮০
সুরা	১,৪০,১৫,৫৯০
যন্ত্রাদি	৮৫,০৯,৯৭০,
ধাতুদ্রব্য (তাম্রলৌহ ইত্যাদি)	৩,৬০,৫৪,৬৪০
খাদ্য	৬৫,৮৭,৯৭০
রেলওয়ে প্লেণ্ট ...	৯০,৭০,০২০
লবণ	৪০,১৩,৬৫০
রেশম (কাচা) ...	৬৭,৮০,৬৯০
রেশম (প্রস্তুত) ...	৮০,৪৮,৩৩৯
মসলা	৪৮,৮৮,৮৪০
চিনি	৭৯,৮০,৩৬০
পশমী দ্রব্য বস্ত্রাদি ...	৭৮,২৭,৮১০
বিবিধ	৫,৫৭,১৬,৯৩০
মোট—	৩৭,৩৩,৬০,০৩০
সরকারি জিনিষ ...	২,১৩,৮১,৮২০
	৩৯,৪৭,৪১,৮৫০

রপ্তানি।

কফি	১,৩৩,৮৪,৯৯০
কার্পাস (কাচা) ...	৯,৩৮,৩৫,৩৪০
বস্ত্রাদি	৪৪,২২,৮৬০
সুতা	৬৮,২০,৫৮০
নীল	৩,৪৯,৪৩,৩৪০
অন্যান্য রং ...	৪০,৬৬,৬০০
শস্য (তণ্ডুল, গম ইত্যাদি)	১০,১৩,৪১,০০০
চামরা	৩,৭৫,৬৮,৮৭০
পাট (কাচা) ...	৩,৫১,৮১,১৪০
পাট (প্রস্তুত) ...	৭৭,১১,২৭০
লাক্ষা ...	৩৩,৩০,৩৯০
তৈল (বিবিধ প্রকার)	৩৭,১৫,৫২০
অহিফেন ...	১২,৩৭,৪৩,৫৫০
সোরা	৩৭,৯০,০২০
শস্যের দানা ...	৭,৩৬,০২,৮৪০
রেশম (কাচা) ...	৭০,৩৫,৪৯০
রেশম (প্রস্তুত) ...	১৫,১০,৮০০

মসলা	২২,৬১,১৫০
চিনি	৭৪,৫৮,৫১০
চা	৩,০৪,৪৫,৭১০
বাহাদুরী ও শিশুকাষ্ঠ	৪০,৬৬,৫২০
তামাকু	৯,৩০,৩৭০
পশম (কাচা) ...	৯৪,৩৬,৪৫০
পশমী বস্ত্রাদি ...	২০,৭৮,৭৩০
বিবিধ	১,৮৭,৪৯,২৯০
মোট—	৬৩,১৪,৩৫,৩৩০
বিদেশী আমদানি মাল	
পুনঃ রপ্তানি	২,০৪,২১,৮০০
সরকারি জিনিষ ...	৩,৬৬,১৫০
মোট—	৬৫,২২,২৩,২৮০

এই তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, আমরা যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য ধাতু দ্রব্য ভিন্ন স্থায়ী প্রয়োজনীয় আর প্রায় কোন জিনিষই আমদানি করি না। উল্লিখিত যন্ত্রাদি প্রস্তুত সামগ্রী হইলেও উহা নিঃশেষ হইয়া যায় না; এবং স্থায়ী মূলধনের (fixed capital) কার্য্য করে, সুতরাং উহা দ্বারা নূতন অর্থ জন্মান হয়। ইহা ব্যতীত আর প্রায় সমস্ত বস্তুই আমরা নিষ্ফল ব্যবহারের (unproductive consumption) জন্য আনি। যাহা সকল প্রয়োজনের জন্য আনা হয়—যথা লবণ, চিনি ইত্যাদি—তাহাও অনর্থক আনা হয়; কারণ ঐ সকল জিনিষই আমরা চেষ্টা করিলে সমান ব্যয়ে দেশে প্রস্তুত করিতে পারি। আমাদের দেশে পরিশ্রমের মূল্য যেরূপ সামান্য, তাহাতে লৌহ প্রভৃতি যন্ত্রোপকরণ এবং অল্পসুদের টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে বিদেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছুই ভয় করিতে হয় না। ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত জিনিষ বিদেশ হইতে আনি তাহা দেশে প্রস্তুত করিতে পারিলে, আমাদের আর কোন উপকার না হইলেও, এই এক বিশেষ উপকার হয়, যে ঐ উপলক্ষে বহু ব্যক্তির জীবিকার সংস্থান করা হয়, বহু পরিশ্রমিলোকের অন্নবস্ত্রের যোগাড় হয়। এই ক্ষণে সমস্ত লোকেরই ভূমির উপর নির্ভর থাকাতে ভূমির মূল্য ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ইহাও যে এক কারণ, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু অনেক শ্রমজীবী কার্য্যান্তরে নিবিষ্ট হইলে ভূমির প্রতি লোকের অপেক্ষাকৃত অল্প আকর্ষণ থাকিবে। ইংলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড ও ভারতবর্ষের কৃষকের অবস্থায় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে যাহার ভূমিকর্ষণ এবং ভূমির উন্নতি-করণোপযোগী অর্থ থাকে, সেই কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; যাহার তাহা না থাকে, সে কোন কারখানায় নিযুক্ত হয়।* আয়র্লণ্ডে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, অর্থ থাকুক আর না থাকুক, সকলকেই কৃষক হইতে হইবে; সুতরাং ভূমির উন্নতি না হইয়া দিন দিনই অবনতি হইতে থাকে। অথচ ভূমির মূল্য বাড়িতে থাকে, প্রজাগণ খাজানা আদায়ে অশক্ত হয়, এবং ভূম্যধিকারিগণ ইচ্ছানুরূপ তাহাদের উপর অত্যাচার

* ইংলণ্ডের Poorlawও এবিষয়ে সহায়তা করে বটে, Vide Systems of Land Tenure in various Countries. Edited by J. G. Probyn.

করিতে পারে। যদি এই বঙ্গদেশে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইত, এবং কারখানা থাকিত, তবে প্রজা ও ভূম্যধিকারীতে বর্ত্তমান যে অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, কখনও তাহা হইতে পারিত না। প্রজাগণ এক টুকরা ভূমির জন্য জমীদারের অত্যাচার সহ্য করা আবশ্যক মনে করিত না, জমীদারও প্রজার নিকট উপযুক্ত খাজানা প্রাপ্ত হইয়া অত্যাচারের কোন প্রয়োজন দেখিত না।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে ১৮৩৫ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরে আমরা বিদেশকে বিবিধ দেনা বাবত ১৫৪৲কোটি টাকা দিয়াছি। কিন্তু এই দেনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ; পেন্‌সনভোগীদের পেন্‌সন বৃদ্ধি পাইয়াছে ; বিদেশীয় মূলধন ক্রমশঃই এদেশে আনীত হওয়াতে, তাহার সুদ বৃদ্ধি পাইতেছে ; ইংরেজ ব্যবসায়ী ও ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, তাহাদের মুনাফা ও বেতন বৃদ্ধি পাইতেছে ; স্থূল কথা, আমরা ইংলণ্ডের নিকট যে যে বাবদে ধারি, প্রায় সেই সকল বাবদেই আমাদের দেনা বাড়িয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সে দিন ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের কথা উঠিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, লর্ডলিটনের সময় সিবিল কর্ম্মচারীদিগের পেন্সন্ ১॥০ কোটিরও কম ছিল, রিপণ বাহাদুরের সময় তাহা বাড়িয়া ২কোটিরও উপর উঠিয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটরীর বিলের দরুণ ১৮৩৫ সনে ২কোটী ১৮৭০ সনে ৮ কোটী এবং ১৮৭৯ সনে ১৩ কোটী টাকা দিতে হইয়াছে। এই দেনাও উত্তরোত্তরই বাড়িতেছে। যখন সকল দিক দিয়াই আমাদের দেনা বাড়িতেছে, তখন আমাদের রপ্তানিও কাজে কাজেই বৃদ্ধি পাইতেছে। হাণ্টর সাহেব বর্ত্তমান বাণিজ্য-সাম্যের (Balance of trade) অতি সুন্দর একটি হিসাব প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৭৫ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষ গড়ে প্রতি বৎসর আমদানি বাদে ২১ কোটী টাকার জিনিষ বেশী রপ্তানি করিয়াছে। এই জিনিষের এক তৃতীয়াংশের মূল্য, অর্থাৎ সাত কোটি টাকা নগদ পাইয়াছে। (অর্থাৎ উক্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর রপ্তানি বাদে ৭ কোটি টাকা নগদ বেশী আমদানি হইয়াছে)। আর এক তৃতীয়াংশ জিনিষ দ্বারা, ভারতবর্ষ কারবারের জন্য যে বিদেশী মূলধন খাটাইয়াছে, তাহার সুদ পরিশোধ করিয়াছে। বাকী তৃতীয়াংশ জিনিষ দ্বারা ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট যে দেনা আছে, তাহা পরিশোধ করিয়াছে। যথা—

ইংলণ্ড হইতে উশুল নগদ	৭ কোটি
ইংলণ্ডকে দেয় সুদ কাটাকাটি করিয়া	৭ কোটি
সিবিল কর্ম্মচারিগণের পেন্‌সন, ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের বেতন ইত্যাদি বাবদ ষ্টেট সেক্রেটরীর বিল ভাঙ্গিয়া	৭ কোটি
মোট	২১ কোটি

বলা বাহুল্য যে হাণ্টর সাহেবের এই বিবরণ পরিষ্কার হইলেও ঠিক্ শুদ্ধ নহে। ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণের বেতন যাহা বিলাতে প্রেরিত হয় তাহা ইহাতে ধরা হয় নাই। ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের বেতন, পেনসন প্রভৃতি বাবদে সম্প্রতি ৭ কোটিরও অনেক বেশী ব্যয় হইতেছে। জাহাজ ভাড়াও ধরা হয়নাই। তথাপি অল্প কথায় বুঝাইবার জন্য হিসাবটি বেশ সুন্দর।

অতএব দেখা যাইতেছে যে,যদি আমাদিগকে ইংলণ্ড হইতে মূলধন আনিতে না হইত; এবং ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের ব্যয় বহন কিংবা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের পেনসন দিতে না হইত, তাহা হইলে আমরা ১৪ কোটী টাকার জিনিষ রপ্তানি না করিয়া পারিতাম, কিংবা ঐ জিনিষ রপ্তানি করিয়া এবং উহার পরিবর্ত্তে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি খরিদ করিয়া ব্যবসায় বিস্তার করিতে পারিতাম। শেষোক্ত ব্যয় দ্বারা বুঝা যায়, ইংলণ্ড আমাদের এদেশ দ্বারা উপকৃত হইতেছে কি না। সুদ বাবদ ব্যয়কে সম্প্রতি গণনায় আনি না, কারণ ইংলণ্ড তাঁহার মূলধন ভারতবর্ষে না লাগাইয়া অন্যত্র লাগাইলেও ঐ ৭ কোটি টাকা সুদ পাইত। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহাদের হাতে না থাকিলে, অন্য ৭ কোটি টাকার এক কপর্দ্দকও পাইত না। এই ৭ কোটি টাকা নগদ না যাইয়া জিনিষে যাওয়াতে, ইংলণ্ড অধিকতর উপকৃত হইতেছে; কারণ নগদ গেলে ইংলণ্ডের মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া মূল্যের অস্থিরতা সুতরাং বাণিজ্যের বৈষম্য জন্মাইত। কিন্তু ঐ টাকা জিনিষে যাওয়াতে উপকার বই কোন ক্ষতিই হইতেছে না। গ্রেটব্রিটেনে সর্ব্ব শুদ্ধ ২॥ কোটী লোক, সুতরাং মনে করিতে পারি যে ভারতবর্ষ হাতে থাকাতে, প্রত্যেক গ্রেটব্রিটেনবাসীর গৃহে প্রায় ৬ টাকার জিনিষ প্রতিবৎসর বিনামূল্যে (মাগ্না) যাইতেছে।

ব্রাইট সাহেব সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হাতে না থাকিলে ইংলণ্ডের তাহাতে লাভ বই লোকসান নাই। তিনি যদি শুধু অর্থসম্পর্কে এই কথা বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান রাখিয়া বলিতে হইবে যে, ইহা তাঁহার ভ্রম। কিন্তু যদি এই ভাবিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে হস্তে লইয়া, তাঁহার দায়িত্ব পরিশোধ করিতে পারিতেছে না; তাহা হইলে আমাদের আপত্তি নাই। বস্তুতঃ অর্থসম্পর্কে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতেছে; এবং দিন দিনই অধিকতর উপকৃত হইতে থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট অল্প কৃতজ্ঞ হইবে না। আমরা এই মাত্র চাই যে, যেমন আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতাটা বুঝি, তাঁহারাও তাঁহাদেরটা সেই রূপ বুঝুন।

ইংলণ্ডের মূলধন দ্বারা আমরা উপকৃত হইতেছি, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। ইংলণ্ডের মূলধন না হইলে ভারতবর্ষ বাচে না, একথা বলিতে চাই না; যদি ভারতবাসীদিগের তেজ, উদ্যম, উৎসাহ থাকে, তবে এখনও তাহারা তাঁহাদের

টাকা খাটাইয়া জগতের বণিক্‌সমাজে উচ্চ আসন লাভ করিতে পারে। যদি সৈন্যের ব্যয়, ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের ব্যয়, সিবিলিয়ানের বেতন ও সংখ্যা প্রভৃতি কমিয়া যায়, তাহা হইলে বিলাতী মূলধনে আমাদের প্রয়োজনও থাকে না। কিন্তু যখন এই সমস্ত ব্যয়ের উপর আমাদের কোন হস্ত নাই, এবং ইংলণ্ডের স্বার্থ থাকাতে ইহা হ্রাস হওয়া সম্ভবও নহে, তখন বলিতে হইবে যে বর্ত্তমান অবস্থায় ইংলণ্ডের মূলধন আমাদের বিশেষ উপকার করিতেছে। ইংলণ্ডে টাকার সুদ যেমন কম, হলণ্ড ভিন্ন আর কোন দেশেই তেমন নহে। কিন্তু হলণ্ড অন্যের নিকট টাকা লাগাইতে পারে, এমন ধনী নহে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই ইংলণ্ডের নিকট হইতে কর্জ্জ করে, কারণ আর কোথাও তেমন অল্পসুদে টাকা পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষও তাহাই করে। ইংলণ্ডে টাকার সুদ সাধারণতঃ শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা, ভারতবর্ষে ন্যূনকল্পে ১৮ টাকা। যাহারা অল্প টাকার কারবার করে, তাহাদের নিকট ৩৬ টাকা সুদের কম টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায় না। এত সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিলে, আমরা কখনও বিদেশী বণিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারি না, এমন কি আমাদের বিদেশী বাণিজ্য একেবারে লোপ হইয়া যায়। মনে কর শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া কারবার আরম্ভ করিলে, যদি কোন জিনিষ ২ টাকা বিক্রয় করিতে পারি, তবে ৩৬ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ করিলে সে জিনিষ কোন মতেও ১০।১২ টাকার ন্যূন বিক্রয় করিতে পারিব না। যাহাদের ঘরে অল্প টাকা আছে, তাহারা প্রায় সকলেই যাহাতে বেশী সুদ হয়, এমন কারবার করে * কেবল মাত্র যাহারা ঐরূপ কারবারে টাকা লাগাইতে পারে না, কিংবা পসন্দ করে না, তাহারাই অল্প সুদে সন্তুষ্ট থাকিয়া ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এদেশে যে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতে তাহারা সর্ব্বসাকল্যে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা মূলধন ব্যয় করিয়াছে; তাহাতে ১৮৭৮ সনে তাহাদের ব্যয় বাদে ৫ কোটি টাকা মুনাফা হইয়াছে; ইহাতে শতকরা বার্ষিক ৫। টাকারও কম মুনাফা দাঁড়াইল। এইরূপ

* আমাদের দেশে টাকা কর্জ্জ লাগানই এক ব্যবসায়। কেহ হয় ত বলিবেন যে বেশী সুদের অর্থ, বেশী মুনাফা—বেশী মুনাফা পাওয়া গেলেই লোকে বেশী সুদে কর্জ্জ করে। যদি একমাত্র কারবারের জন্যই আমাদের দেশে লোকে টাকা কর্জ্জ করিত, তাহা হইলে একথা সত্য হইত বটে; কিন্তু যাহারা বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ করে, তাহারা কারবারের জন্য কর্জ্জ করে না। সাধারণতঃ বিলাসিতার জন্য কিংবা বিবাহ পূজাদি নিত্য কর্ম্মের জন্য এবং কখনও বা রাজস্ব আদায়ের জন্য, বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ হইয়া থাকে; আর অনেক সময় কৃষকগণ উপায়ান্তর রহিত হইয়া মারাত্মক সুদে কর্জ্জ করিয়া থাকে।

অল্প মুনাকায় দেশীয় লোকের কারবার করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইংরেজের পক্ষে ইহা যথেষ্ট হইতেও অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজদের মূলধন না খাটাইলে আমরা সস্তায় জিনিষ বিক্রয় করিতে পারি না; সস্তায় জিনিষ বিক্রয় না করিলে, আমাদের বিদেশীয় বাণিজ্য বন্ধ হয়; এবং বিদেশীয় বাণিজ্য বন্ধ হইলে আমরা আমাদের দেয় ঋণ পরিশোধ করিতে অশক্ত হই। সুতরাং বিদেশের মূলধন আনা আমাদের একান্ত আবশ্যক। আবার আর এক দিকে দেখিতে গেলে, ইহা এক প্রকার প্রমাদের কথা। কারণ এদেশে যত বৃহৎ বৃহৎ কারবার,তাহা প্রায় সমস্তই ইংরেজদের হাতে গড়াইয়া পড়িতেছে। দেশীয় মহাজন তাহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠে না; কারণ তাহাদের ন্যায় তাহারা অল্প সুদে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এই কারণে ক্রমে ক্রমে বিদেশীয় ধন আমাদের দেশে অধিক প্রবেশ করিতেছে; এবং ক্রমে ক্রমেই আমাদিগকে বিদেশের নিকট ঋণী হইতে হইতেছে।

সর্ব্বশেষে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। আমাদের দেশ পূর্ব্ব হইতে ধনী না নির্ধনী হইতেছে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করা আবশ্যক, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে যেমন পূর্ব্ব হইতে এক্ষণে আমাদের বাণিজ্যের সজীবতা এবং স্বর্ণ রৌপ্যের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে; তেমন অন্য দিকে আমাদের দেনা বাড়িতেছে। সুতরাং এই প্রশ্নটির আলোচনা না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, আমরা ক্রমে ক্রমেই নির্ধনী হইয়া যাইতেছি, আবার কেহ কেহ এইরূপও বিশ্বাস করেন যে আমাদের দেশ পূর্ব্ব হইতে ধনী হইতেছে। ইহার কোন্ মত সত্য ঠিক করিয়া বলা কঠিন। দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে পূর্ব্বের অবস্থায় আর এইক্ষণকার অবস্থায় অল্পই সমতা আছে। ইহা এক প্রকার ঠিক যে, এক্ষণে যত দরিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে এত ছিল না, আবার ইহাও ঠিক যে, পূর্ব্বে যে শ্রেণীস্থ লোক দরিদ্র ছিল, এক্ষণে সেই শ্রেণীস্থ লোকের হস্তেও কিছু কিছু করিয়া ধন আসিতেছে। ইহা হইতে আর এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—ধন কাহাকে বলে? টাকাকেই কি ধন বলিব? আমরা দেখিয়াছি যে, পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে স্বর্ণ রৌপ্য বাড়িয়াছে, তাই বলিয়া আমরা ধনী হইয়াছি কি? যিনি অর্থব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে, টাকাই ধন নহে। পূর্ব্বে যাহার বার্ষিক একশত টাকা মুনাফা ছিল, সেও ধনী বলিয়া পরিচিত হইত; এক্ষণে যে একহাজার টাকা মুনাফা পায়, তাহাকেও কেহ ধনী বলে না। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে যে জিনিষ ১ টাকায় পাওয়া যাইত, এক্ষণে হয় ত সেই জিনিষ ১০টাকায় পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদিগকে ধনীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, যাহার যে পরিমাণ অভাব মোচন করিবার ক্ষমতা আছে, সে সেই পরিমাণ ধনী।

দেশের ধনবৃদ্ধি সামান্যতঃ তিন প্রকারে বুঝা যাইতে পারে। যথা—১ম আমদানি ও রপ্তানি, ২য় প্রজাসমূহের সামাজিক অবস্থা, এবং ৩য় সেবিঙ্স্ বেঙ্ক্।

১। পূর্ব্বের আমদানি ও রপ্তানির সঙ্গে বর্ত্তমান আমদানি ও রপ্তানি তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। শুধু যে রপ্তানি কমিতেছে, তাহা নহে,আমদানিও বাড়িতেছে। ১৮৭০ হইতে ১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত ৫বৎসরে প্রতি বৎসর গড়ে মোট ৯৮,৩৫,১৭,৯৪২টাকার জিনিষ আমদানি ও রপ্তানি হইয়াছে ; ১৮৭৫ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর মোট ১১৩,২১,৫৬,১৭৬ টাকার জিনিশ আমদানি ও রপ্তানি হইয়াছে। ইহা ধন বৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয়।

২য়। প্রজাগণের সামাজিক অবস্থায়ও কিছু উন্নতি দেখা যায় ; তাহারা পূর্ব্বে মোটা কাপড় পরিত, এক্ষণে তাহা হইতে অনেক সরস কাপড় পরে। পূর্ব্বে প্রায়শঃই মাটিয়া বাসন ব্যবহার করিত, এক্ষণে ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদি ব্যবহার করে, পূর্ব্বে ঘোড়া গাড়ি, টুল, বেঞ্চ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল না, এক্ষণে সামান্য লোকেও ঐ সকল ব্যবহার করে। ইহা ধনবৃদ্ধিরই পরিচায়ক বলিতে হইবে।

৩য়। সেবিঙ্স্ বেঙ্কের হিসাবেও দেখা যায় যে, উহার জমা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ ইহাতে তাহাদের উদ্বর্ত্ত টাকা দিয়া থাকে, সুতরাং উহার উন্নতিতে প্রকাশ পায় যে,সাধারণ লোকে কিছু কিছু উদ্বর্ত্ত করিতেছে।

আবার আর এক পক্ষে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষের ধনসম্পর্কে পূর্ব্বের যে সকল গল্প আছে, এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষকে রত্নপুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয় না। এক বাদসাহ ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন, আজ অতি অল্প লোকের ঘর হইতে ১ কোটি টাকা বাহির হয়। পূর্ব্বে মধ্যম শ্রেণীস্থ লোকদিগের কোন অনটন ছিল না ; আজ প্রায় সকলেই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। এই সমস্ত, দেশ নির্ধনী হওয়ারই লক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেকে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। টেম্পল সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, বিদেশীয়ের নিকট ভারতবর্ষের ধনবত্তা প্রতিভাত হওয়ার কারণ এই যে, ভারতবর্ষের ধন কতকগুলি কেন্দ্রে নিবদ্ধ ছিল, এবং ঐ সকল স্থলে ধনের পূর্ণবিকাশ দেখিয়াই তাঁহারা মনে করিত যে সমস্ত ভারতবর্ষই ঐরূপ ধনী। বাস্তবিক ঐসকল কেন্দ্র স্থল ভিন্ন,অন্য কোথাও ধনের আধিক্য দৃষ্ট হইতনা। মুসলমানদিগের সময় রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত এবং তদ্দ্বারা আপনাদের বিলাসিতার মন্দির নির্ম্মাণ করিত। বিদেশীয়েরা রাজার সম্পদ দেখিয়াই প্রজার সম্পদ অনুমান করিত ; কিন্তু ভারতবর্ষে যে এই দুইয়ে কোন সম্পর্ক ছিল না, তাহা তাহারা জানিত না।

পূর্ব্বে লোকসংখ্যা অতি সামান্য ছিল; ভূমিতে যাহা উৎপন্ন হইত, সাংসারিক ব্যয়ের জন্য তাহা লাগিত না; সুতরাং মধ্যম শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা বেশ স্বচ্ছন্দে ছিল; কিন্তু এক্ষণে লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, ভূমির শস্য সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে না; অন্য অন্য লাভজনক ব্যবসায়েও মধ্যমশ্রেণীস্থ লোকের মতি জন্মিতেছে না; সুতরাং তাহাদের অবস্থা খারাপ হইতেছে। পূর্ব্বে ধন যেরূপ এক হাতে আবদ্ধ থাকিত, এক্ষণ সে প্রকার থাকে না। এইক্ষণ ধন বিভাগ হইয়া সকলের হাতে হাতে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং তাহার চাকচিক্য নাই। ধন আছে, কিন্তু দ্রষ্টব্যে দেখায় না।

আমরা কোন নূতন সত্য প্রতিপাদন করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখি নাই। দেশীয়দিগকে কোন উপায় প্রদর্শন করিয়া দেওয়াও এপ্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু দেশের বাণিজ্যের অবস্থা কি প্রকার, আমদানি ও রপ্তানিতে কি সম্বন্ধ, এবং তাহার সহিত রাজনৈতিক কি কি প্রশ্ন সম্পৃক্ত, এই সমস্ত সাধারণের গোচর করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা দেশের দুরবস্থায় দুঃখিত হন, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে অবশ্যই কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রী——

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম।

(কথোপকথনচ্ছলে লিখিত)

(১ম দিন)

পাত্রগণ। { গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্ন, এম, এ।
বিনোদবিহারী বসু এম, এ। }

বিনোদ। সংস্কৃত দেবভাষা। সংস্কৃতদর্শন প্রভৃতি, বোধ হয়, দেব লোকের জন্য লিখিত হইয়াছিল। অতএব ও সব ছাড়িয়া দাও। যাহাতে মর্ত্ত্য লোকের উপকার হয়, আইস, এইরূপ শাস্ত্রের আলোচনা করা যাউক। ভগবদ্গীতা শুনিয়া মর্ত্ত্য লোকের কোন লাভ নাই। আইস তৎপরিবর্ত্তে কোনরূপ বিজ্ঞানের আলোচনা করা যাউক।

গোপীনাথ। যে সংস্কৃত শাস্ত্রে মর্ত্ত্য লোকের উপকার হয় না তাহা আমি নিজেও পাঠ করি না, এবং অন্যকেও পাঠ করিতে বলি না। ভগবদ্গীতায় মর্ত্ত্য লোকের উপকার সম্ভব-পর, তাই তো-

মাকে ভগবদ্গীতা শুনিতে অনুরোধ করি।

বিনোদ। ভগবদ্গীতায় মর্ত্ত্য লোকের কিছুমাত্র উপকার নাই। আকাশে রামধনু বড় সুন্দর দেখায়, কিন্তু উহাতে মনুষ্যের কিছুমাত্র উপকার সংসাধিত হয় না। সেইরূপ—

গোপী। সেইরূপ ভগবদ্গীতাতেও কিছু উপকার সাধিত হয় না। কিন্তু ভায়া! ভগবদ্গীতা বিষয়টা কি কিছু বোধ আছে কি?

বিনোদ। ভগবদ্গীতা অর্থে (Divine Lay)।* ইহাতেই বোধ হইতেছে ইহা (Lyrical ballad)।†

গোপী। ভায়ার সংস্কৃতে জ্ঞান খুব টন্‌টনে। ভায়ার এই জ্ঞানটা কি প্রত্যাদেশ-লব্ধ?

বিনোদ। প্রায় প্রত্যাদেশ-লব্ধই বটে। যাহা সাহেবের কাছে শুনা যায় তাহার সহিত প্রত্যাদেশের কোন প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। সাহেব সাক্ষাৎ দেবাবতার।

গোপী। তাহা ঠিক্। কিন্তু কোন্ সাহেবের পবিত্র গোমুখী হইতে ভায়ার এই জ্ঞান-মন্দাকিনী নিঃসৃত হইয়াছে?

বিনোদ। সাহেবের নামটা আমার মনে নাই।

গোপী। ভালই হইয়াছে। এরূপ সাহেবের নাম মুখে আনিলে গঙ্গাস্নানেও প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

বিনোদ। কেন? সাহেবের অপরাধ?

গোপী। ভগবদ্গীতার বিষয়—মনুষ্য-জীবনের সমস্যানির্ণয়। ভগবদ্গীতার রচনা তর্কশাস্ত্রের রচনার ন্যায় গ্রন্থনা-যুক্ত। ভগবদ্গীতাকে গীতিকাব্য বলাও যা, গির্জাঘরের উচ্চতা দেখিয়া গিরিগোবর্দ্ধনের উচ্চতা অনুমান করিয়া লওয়াও তা।

বিনোদ। ভগবদ্গীতায় মনুষ্যজীবনের কোন্ সমস্যাটি নির্ণীত হইয়াছে?

গোপী। মনুষ্য-জীবনের শত শত সমস্যা ভগবদ্গীতায় মীমাংসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধানটি এই—"কর্ত্তব্য-বিমুখের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন সম্বন্ধে উপদেশ।" যে পুস্তকে শুদ্ধ এই উপদেশটিও থাকে, তাহাকে কি তুমি দেবলোকের পুস্তক বলিয়া উপহাস করিতে পার।

বিনোদ। না। তাহা মর্ত্ত্যলোকেরই পুস্তক সন্দেহ নাই। কারণ অধিকাংশ মর্ত্ত্যই কর্ত্তব্য-বিমুখ। কিন্তু ভগবদ্গীতায় যে এই উপদেশ আছে তাহা তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার?

গোপী। প্রমাণের প্রয়োজন নাই। যাহার সহিত ভগবদ্গীতার চাক্ষুষ আলাপ মাত্রও হইয়াছে, সেও জানে—যে "কর্ত্তব্য বিমুখকে কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রণোদিত করাই ভগবদ্গীতার মূল সূত্র।"

বিনোদ। কথাটা একটু প্রকাশ করিয়া বল।

* দেব-সঙ্গীত।

† বিবিধ ছন্দোবদ্ধ গীতিকাব্য।

গোপী। বলিতেছি। দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনের জন্য যুদ্ধকরা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য-কার্য্য।* দেখ দুর্য্যোধনাদি কুরুবংশীয়েরা বড়ই দুঃশীল ছিল। জ্ঞাতিহিংসা, পরস্বাপহরণ, প্রতারণা, প্রভৃতি বহুবিধ দুষ্কর্ম্ম তাহাদের নিত্যব্রত ছিল। ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় মাত্রেরই কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। অতএব কুরুবংশীয়ের সহিত যুদ্ধ করা অর্জ্জুনেরও কর্ত্তব্য ছিল। বটে কি না?

বিনোদ। কর্ত্তব্য থাকুক বা না থাকুক এখন আর সে বিষয়ে তর্ক করায় লাভ কি? অর্জ্জুন অনেককাল মর্ত্ত্য-লোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। কুরুক্ষেত্র সমরও অনেক কাল হইল ফুরাইয়া গিয়াছে।

গোপী। কে বলিল ফুরাইয়া গিয়াছে? এই সে দিন যখন নেপোলিয়ন বিশ্ববিজয়ী সেনাবৃন্দ লইয়া ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত রণানল প্রজ্বলিত করেন, তখনও ইয়ুরোপে এই দুষ্টদমনের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। তখনও অর্জ্জুনরূপী ওয়েলিংটন দুর্য্যোধনরূপী নেপোলিয়নকে নিহত করিবার জন্য আপনাকে আপনি মনে মনে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বিনোদ। ঠিক কথা। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কি না এ বিষয় লইয়া পার্লেমেণ্টেও মহা বাদানুবাদ চলিয়াছিল। ফক্স বলিলেন, নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়, বর্ক বলিলেন উচিত।

গোপী। ভায়ার ইংরেজী জ্ঞানটি যেমন টন্‌টনে, সংস্কৃত জ্ঞানটি যদি তাহার শতাংশের একাংশও হইত, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ভারতবাসীদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। সে যাহা হউক, এখন কাজের কথা বলা যাউক। দুষ্ট দমনার্থে অস্ত্রধারণ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। অর্জ্জুনের উচিত ছিল যে তিনি কুরুবংশীয়দের নিধন সাধনার্থে অস্ত্র ধারণ করেন। বটে কি না?

বিনোদ। হাঁ। বোধ হয় বটে।

গোপী। আর এক দিক হইতে দেখ। অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া সর্ব্বললামভূতা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই পরিণীতা পত্নী, কুরুবংশীয়দের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। দুঃশাসন, তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে আপন উরুদেশে বসাইতে চাহিয়াছিলেন। যে কুরুবংশীয়দের দ্বারা অর্জ্জুনের প্রিয়তমা, পরিণীতা পত্নী এইরূপে অপমানিতা হইয়াছিলেন, সেই কুরুবংশীয়দের নিধন সাধনার্থে অর্জ্জুনের অস্ত্র ধারণ করা উচিত কি না?

---

* সংস্কৃতে কর্ত্তব্য কার্য্যকে "ধর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত করে।

বিনোদ। একবার উচিত, সহস্র বার উচিত। পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর অপমান! ইহা যে সহ্য করে, সে কাপুরুষ।

গোপী। তোমার "বোধ হয়" টা তবে ঘুচিয়াছে?

বিনোদ। সম্পূর্ণ ঘুচিয়াছে।

গোপী। বেশ কথা। কিন্তু আরও একটু দেখ। অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির নির্লোভ, নিষ্কাম, নিরঞ্জন, নিরত্যয়, নির্লেপ, নির্ব্বিঘ্ন মহাপুরুষ। যে পাপিষ্ঠ এই মহাপুরুষকে প্রতারণা দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় নিয়োজিত করে, যাহাদের মন্ত্রণায় এই নরদেবতা, হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ভিক্ষুকের বেশে বনে বনে ভ্রমণ করেন, সেই পাপিষ্ঠদিগকে নিধন করা ক্ষত্রিয়মাত্রেরই, বিশেষতঃ অর্জ্জুনের, কর্ত্তব্য কার্য্য কি না?

বিনোদ। একশতবার কর্ত্তব্য, একসহস্র বার কর্ত্তব্য! অর্জ্জুন যদি এই কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে তিনি কাপুরুষ।

গোপী। বেশ কথা। এখন একবার ভগবদ্গীতার কথা ভাবিয়া দেখ। পাণ্ডবেরা নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াও কুরুবংশীয়দের সহিত প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী হন নাই। তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট পাঁচ ভ্রাতার জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন। বলদর্পী দুর্য্যোধন বলিল—বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিব না *। তখন অগত্যা যুদ্ধসজ্জা হইল। ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রদেশ হইতেও সৈন্যসংগ্রহ হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রে এই বিশাল সমুদ্রের ন্যায় কুরুপাণ্ডবের সৈন্যব্যূহ সজ্জিত হইল। এই স্থলে ভগবদ্গীতা আরব্ধ হইল।

বিনোদ। ভগবদ্গীতার কাব্যাংশও ত বড় সুন্দর বোধ হইতেছে।

গোপী। কাব্যাংশে ভগবদ্গীতা ভূতলে অতুল। দেখ ভূতভাবন ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার বক্তা। শত্রুনিসূদন, বিশ্ববিজেতা, শিবপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় ইহার শ্রোতা। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমরাঙ্গণ যে কুরুক্ষেত্র তাহাই ইহার স্থল, আর যখন রণোন্মুখ কুরুপাণ্ডবের শঙ্খনাদে পৃথিবী তুমুল কলরবে পরিপূরিত হইতেছে তাহাই ইহার সময়। স্থানকালপাত্রসম্বন্ধে এরূপ সমৃদ্ধ কাব্য আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

বিনোদ। অতিশয়োক্তি নিষ্প্রয়োজন। এরূপ কাব্য ভূতলে অনেক আছে। কিন্তু ভগবদ্গীতা যে কাব্যাংশে বিশেষ সমৃদ্ধ, ইহা আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি। তুমি কাজের কথা বলিতে থাক।

গোপী। কুরুপাণ্ডব নিজ নিজ শঙ্খনাদ করিতেছেন, এমত সময়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন;—"প্রভো! আমি সৈনিকদিগকে বিশিষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সমরাঙ্গণের মধ্যস্থলে রথ লইয়া চলুন।" কৃষ্ণ

*সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যাতে যাচ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥

তাহাই করিলেন। অর্জ্জুন বিপক্ষ পক্ষে সৈন্যদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, বিপক্ষ পক্ষের কেহ বা তাঁহার পিতামহ, কেহ বা পিতৃস্থলীয় (পিতৃব্য প্রভৃতি), কেহ বা তাঁহার আচার্য্য, কেহ বা তাঁহার মাতুল, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা পুত্রসম্পর্কীয়, কেহ বা পৌত্রসম্পর্কীয়, কেহ বা শ্বশুর, কেহ বা বন্ধু, কেহ বা সখা, কেহ বা সুহৃদ্। যুদ্ধ করিয়া এই সব স্বসম্পর্কীয়দিগকে নিহত করিতে হইবে, এই ভাবিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় দয়াতে পরিপ্লুত হইল। তিনি ধনুঃ শর পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমা হইতে এ নৃশংস কার্য্য সম্পাদিত হইবে না। আমি যুদ্ধ করিব না।" অর্জ্জুন কুরুবংশীয়ের দুঃশীলতা, পত্নীর অপমান, ভ্রাতার লাঞ্ছনা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া রণে পরাঙ্মুখ হইলেন। এ অবস্থায় তুমি অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্যবিমুখ বল কি না?

বিনোদ। অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য-বিমুখ বলিতে পারি, কিন্তু অর্জ্জুনের নিন্দা করিতে পারিতেছি না।

গোপী। কেন? যে কেহ কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয়, সেই ত নিন্দার পাত্র।

বিনোদ। ঠিক্। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে কর্ত্তব্য-বিমুখ হয়। কেহ বা আলস্যবশতঃ, কেহ বা দৌর্ব্বল্যবশতঃ, কেহ বা অক্ষমতানিবন্ধন, কেহ বা লোকনিন্দাভয়ে, কর্ত্তব্য বিমুখ হয়। এ সকল কর্ত্তব্য-বিমুখের নিন্দা করিতে পারি। কিন্তু যে অধর্ম্মভয়ে কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে নিন্দা করিতে পারি না। বরং তাহার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়।

গোপী। "অধর্ম্মভয়" আবার কি? কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য-বিমুখতাই অধর্ম্ম।

বিনোদ। এই নিষ্ঠুর মতের সমর্থন করিতে পারিতেছি না।

গোপী। কেন?

বিনোদ। মনে কর, আমাকে কর্ত্তব্য-প্রতিপালনের জন্য সহস্র প্রাণিহত্যা করিতে হয়। এ স্থলে বরং কর্ত্তব্য বিমুখ হওয়া ভাল, তথাপি সহস্র প্রাণি হত্যা করা ভাল নয়।

গোপী। কিন্তু তুমি দেখিতেছ না যে, ঐ সহস্র প্রাণি হত্যা না করিলে জগতে লক্ষ প্রাণিহত্যার পথ পরিষ্কৃত হইবে। যদি সহস্র প্রাণিহত্যা করিয়া, লক্ষ প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সহস্র প্রাণিবধ করা ভাল নয়?

বিনোদ। কথাটা একটা মোটামুটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে ভাল হয়।

গোপী। আচ্ছা। মনে কর তুমি একজন বিচারপতি। চণ্ড নামে একজন অপরাধী তোমার নিকট হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইল। তুমি দেখিলে যে, সে হত্যাকারী বটে। কিন্তু ইহাও দেখিলে যে, ঐ হত্যাকারীর একটি বিধবা মাতা, দুইটি বিধবা ভগ্নী, একটি

যুবতী স্ত্রী ও দুইটি শিশু সন্তান আছে। যদি হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হয়, তাহা হইলে উহার এতগুলি পরিবার হয় ত অন্নাভাবে মারা যাইতে পারে। কিন্তু যদি হত্যাকারীর দণ্ড না হয়, তাহা হইলে উহা হইতে শত শত লোকের প্রাণ হানি হইতে পারে। এজন্য হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড করা তোমার কর্ত্তব্য-কার্য্য, তাহার দুঃস্থ পরিবারের প্রতি দয়াপ্রকাশ তোমার কর্ত্তব্য-কার্য্য নহে।

বিনোদ। হাঁ—এখন বুঝিলাম। অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিলে কুরুবংশীয়েরা আরও শত শত দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিত। সুতরাং যুদ্ধ দ্বারা কুরুবংশীয়দিগকে নিহত করাই অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য কার্য্য হইল। পাপিষ্ঠ কুরুবংশীয়দের প্রতি দয়া প্রকাশ করা অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। কিন্তু এ সব ত তুমি নিজের কথা বলিতেছ। ভগবদ্গীতার কথা বল না কেন?

গোপী। আমি ভগবদ্গীতার কথা বলিতেছি। অর্জ্জুন যখন ভ্রান্ত দয়াবশে কর্ত্তব্য বিমুখ হইলেন, কৃষ্ণ তখন তাঁহাকে বিবিধ উপদেশ দিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অভিমুখে পুনরানয়ন করিলেন। ভগবদ্গীতার ইহা বিষয়। এখন তুমি ভগবদ্গীতাকে—"কর্ত্তব্য-বিমুখের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন সম্বন্ধে উপদেশ" এই আখ্যা দিতে পার কি না?

বিনোদ। পারি।

গোপী। এখন তবে কৃষ্ণ কি কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার ব্যাখা করা যাউক।

বিনোদ। কর। কিন্তু অগ্রে আমার একটি কথার উত্তর দিয়া লও।

গোপী। কি কথা?

বিনোদ। কৃষ্ণ, জগদীশ্বর হইয়াও এক পাণ্ডবের পক্ষে যোগ দিলেন কেন?

গোপী। কৃষ্ণ দুই পক্ষকেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রস্তুত ছিলেন ইবা কেন বলি? তিনি দুই পক্ষেরই সাহায্য করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনকে তিনি বলদ্বারা সাহায্য করিলেন, পাণ্ডবদিগকে তিনি মন্ত্রণা দ্বারা সাহায্য করিলেন।

বিনোদ। কিন্তু ইহাতেও ত একটু পক্ষপাতিত্ব করা হইল?

গোপী। হইল বটে। কিন্তু কৃষ্ণ প্রথম প্রথম কুরুবংশীয়দিগকে মন্ত্রণা দ্বারা সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কুরুরা তাঁহার মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া শকুনিকে আপনাদের মন্ত্রগুরু পদে দীক্ষিত করিলেন। সুতরাং তিনি আর কুরুদিগকে মন্ত্রণা দিতেন না। কৃষ্ণকে যদি ধর্ম্মজ্ঞান বলিয়া মনে করিয়া লও, তাহা হইলে এখানেও একটি স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য দেখিতে পাইবে।

বিনোদ। সে কিরূপ?

গোপী। পাপী ও পুণ্যাত্মা ইহাদের উভয়েরই মনে ধর্ম্মজ্ঞান বড় প্রবল থাকে। কিন্তু পাপী কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হয় বলিয়া, পাপীর ধর্ম্মজ্ঞান অতি অল্প সময়ের ম-

ধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পুণ্যাত্মার মনে ধর্ম্মজ্ঞান ক্রমশঃ ই অধিকতর রূপে বিকশিত হয়। যৎকালে ধার্ম্মিক পাণ্ডুদের সঙ্গে কৃষ্ণের বন্ধুতাক্রমশঃ ই গাঢ়তর হইতে লাগিল তৎকালেই পাপী কুরুরা ক্রমশঃ কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। ইহার অর্থ এই যে ধর্ম্মজ্ঞান পাপীদের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া পুণ্যাত্মার মনে আশ্রয় লাভ করিল।

গোপী। ঠিক্ বটে। ধর্ম্মজ্ঞানকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায় বোধ হয় না। কারণ ইংরাজীতেও বলে—'Conscience is the voice of God' * কিন্তু এসব বাজে কথা যাউক। কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় কি কি উপদেশ দিয়াছেন, তুমি তাহার বৃত্তান্ত বিবরণ কর।

বিনোদ। করিতেছি। কিন্তু আজি আমার কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে। আজি এই খানেই ক্ষান্ত হওয়া যাক্। কালি আবার সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে এই কথার অবতরণ করা যাইবে।

গোপী। আচ্ছা, তাই ভাল।

দ্বিতীয় দিন।

(পরদিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে গোপী ও বিনোদ পুনর্ম্মিলিত হইয়া একথা সে কথার পর ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন)

গোপী। কর্ত্তব্য বিমুখ অর্জ্জুন কার্য্যকালে ধনুঃশর ত্যাগ করিলে পর, কৃষ্ণ মনে করিলেন, অর্জ্জুন অব্যবস্থিত চিত্ততা হেতু এইরূপ করিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন 'হে অর্জ্জুন এই বিষম সময়ে তুমি কেন এই রূপে মোহপ্রাপ্ত হইতেছ? এইরূপ মোহ অনার্য্যদিগেরই হওয়া সম্ভব। ইহাতে তোমার ইহকাল পরকাল উভয়ই লোপ হইবে। এইরূপ ক্লৈব্য (দীনভাব) তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি এই হেয় চিত্তদৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ কর'।

বিনোদ। অর্জ্জুন এই তিরস্কার শুনিয়া কি বলিলেন?

গোপী। অর্জ্জুন বলিলেন—'হে নাথ! বরং আমি ভিক্ষান্ন দ্বারা উদর পরিপূরিত করিব, তথাপি এই মহা পাতকে আমি লিপ্ত হইতে পারিব না। যে যুদ্ধে জ্ঞাতি ও গুরুগণের রক্তপাত করিতে হয়, সে যুদ্ধে জয়ী হওয়া অপেক্ষা পরাজিত হওয়া অনেক ভাল।'

বিনোদ। অর্জ্জুন মন্দ বলে নাই। দেখা যাউক কৃষ্ণ ইহার কি উত্তর দেন।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ, অতএব অগ্রে তোমার সঙ্গে পণ্ডিতের ন্যায় তর্ক করা যাউক। পরে তোমার সঙ্গে সংসারীর ন্যায় তর্ক করিব।'

বিনোদ। পণ্ডিতী তর্ক ও সংসারী তর্কে কিছু প্রভেদ আছে না কি?

গোপী। আছে বৈ কি। পণ্ডিতী তর্কে ভ-

---

* অর্থাৎ—'ধর্ম্মজ্ঞানই দেববাণী।'

মণ্ডলের আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইয়া তর্ক করিতে হয়। পণ্ডিতী তর্ক অতি বিস্তীর্ণ ভূমির উপর দণ্ডায়মান। কিন্তু সংসারী তর্ক অপেক্ষাকৃত অনেক সঙ্কীর্ণ। যখন আমরা সভ্যতার নিম্ন দেশে অবস্থান করি,তখন সংসারী তর্ক ভিন্ন অন্য কোনরূপ তর্ক আমাদের মনে উদিত হয় না। কিন্তু যখন আমাদের জ্ঞান বহুবিস্তৃত হয়; তখন আমাদের তর্ক প্রণালীও সংসারী অবস্থা ছাড়াইয়া পণ্ডিতী অবস্থায় প্রবেশ করে। সংসারী তর্ক বুঝিবার জন্য কোন প্রকার জ্ঞান কি বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পণ্ডিতী তর্ক বুঝিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন।

বিনোদ। বুঝিলাম। এখন তুমি কৃষ্ণের পণ্ডিতী তর্কের ব্যাখ্যা কর।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! তুমি অশোচ্য বিষয়ের জন্য শোক করিও না। পণ্ডিতেরা, মৃত বা জীবিত ইহাদের কাহারও জন্য শোক করেন না। কারণ জীবন মরণ এই সমস্ত কথা নিরর্থ। আমি তুমি আমরা চিরকালই জীবিত আছি ও থাকিব। মনুষ্য যেমন এক বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যবস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আমরাও কখন বা এক দেহ কখন বা অন্যদেহ ধারণ করি। দেখ যে অগ্নি শীতকালে সুখকর, সেই অগ্নিই গ্রীষ্মকালে অতীব কষ্টকর। যে জল গ্রীষ্মকালে সুখকর, শীতকালে সেই জলই অতীব কষ্টকর। সেইরূপ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা ভেদে কখন বা সুখকর কখন বা কষ্টকর। যুবার মৃত্যু কষ্টকর; বৃদ্ধের মৃত্যু সুখকর। জন্ম মৃত্যু যখন এত অনিত্য, এত অস্থির,তখন কেন তাহাদের জন্য শোক বা হর্ষ প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করিবে?'

বিনোদ। কৃষ্ণের এই পণ্ডিতী তর্ক শুনিয়া অর্জ্জুন কি বলিলেন?

গোপী। অর্জ্জুন কিছু বলিলেন না। কৃষ্ণই বলিতে লাগিলেন—' হে অর্জ্জুন, যদি তুমি মনেকর যে ইহাদের শোকে তোমার মৃত্যু হইতে পারে, তাহা হইলেও তুমি বড় ভ্রান্ত। কেন না ইহাঁদের আত্মা যেমন নিত্য,তোমার আত্মাও ত সেইরূপ নিত্য। মনুষ্যের শরীর অনিত্য, কিন্তু তোমার ও ইহাঁদের সকলের আত্মাই অবিনাশী ও নিত্য। ফলতঃ এক আত্মা অন্য আত্মাকে বিনাশ করিতে যেরূপ অক্ষম, এক আত্মা অন্য আত্মা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেও সেইরূপ অসমর্থ। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শরীর হত হইলেও আত্মা হত হয় না। আত্মা শস্ত্রে ছিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে আর্দ্র হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না। আরও দেখ যদি আত্মা নিত্যই হয়, তাহা হইলেও ত তোমার শোকের কোন কারণ দেখিতেছি না। যেখানে দেখা যাইতেছে যে জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, সেখানে এই অপরিহার্য্য ঘটনার জন্য শোক করা মূঢ়ের

কার্য্য। আরও দেখ তুমি আত্মার আদিও দেখ নাই, অন্তও দেখিতে পাইবে না, শুদ্ধ ইহার মধ্যকাল দেখিয়া শোক করা অন্যায়।'

বিনোদ। তার পর।

গোপী। এই খানে কৃষ্ণের পণ্ডিতী তর্ক শেষ হইল। পণ্ডিতী তর্ক শেষ হইলে, তিনি সংসারী তর্ক আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন 'হে অর্জ্জুন! আরও দেখ যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। তোমাদের এই যুদ্ধটি ন্যায়সঙ্গত ও ইহা তোমাদের অযত্ন লব্ধ। এ সুযোগ ছাড়িও না। যদি তুমি এই যুদ্ধে বিমুখ হও, তাহা হইলে তুমি স্বধর্ম্মত্যাগ পাপে লিপ্ত হইবে। আর সকলে তোমার নিন্দা করিবে। দেখ যশস্বী ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু, নিন্দা অপেক্ষা, শ্রেয়ঃ। তুমি যুদ্ধ-বিমুখ হইলে অন্য অন্য ক্ষত্রিয়েরা তোমাকে ভীরু বলিয়া নিন্দা করিবেন। রণস্থলে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তুমি স্বর্গে যাইবে। আর যদি রণস্থলে তোমার জয় হয়, তাহা হইলে তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবে। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধে লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, জয় হইবে কি পরাজয় হইবে, ধর্ম্ম হইবে কি অধর্ম্ম হইবে, এ সব বিচার না করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই রূপে যদি নিষ্কাম হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে কোন রূপ পাপগ্রস্ত হইতে হইবে না।'

বিনোদ। এখানে আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যদি কর্ম্ম করিতে হয় তাহা হইলে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিব কেন? কৃষ্ণের এই উপদেশটি যেন—'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'।

গোপী। কৃষ্ণের যুক্তিগুলি শুনিয়া লও পরে উপহাস করিও। কৃষ্ণ দেখাইতেছেন যে সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম অনেক উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণের প্রথম যুক্তি এই সকাম কর্ম্মে নৈষ্ফল্য আছে, নিষ্কাম কর্ম্মে নৈষ্ফল্য নাই। যদি কোন দৈব কারণে কামকামীর কামনা নিষ্ফল হয় তাহা হইলে সকাম ব্যক্তির মনোবেদনার সীমা থাকে না। কিন্তু যিনি নিষ্কাম তাঁহার মনোবেদনার স্থল নাই।

বিনোদ। ঠিক্ কথা। কিন্তু সকাম হইলে কর্ম্মে যেমন উদ্যোগ থাকে নিষ্কাম হইলে বোধ হয় তাহা থাকে না।

গোপী। কৃষ্ণ দ্বিতীয় যুক্তি দ্বারা একথারও খণ্ডন করিয়াছেন। যে সকাম, তাহার কামনা নানা দিকে প্রধাবিত হয়। সে কখনও বা ধনের কামনা করে, কখনও বা যশের কামনা করে। এখন, ধনের দিকে লোভ থাকিলে যশ উপেক্ষা করিতে হয়। আবার যশের দিকে লোভ থাকিলে ধনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি সকাম,

সে এইরূপ দোটানায় পড়িয়া কোন দিকেই বাঞ্ছনীয় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না।

বিনোদ। আর যে নিষ্কাম, সে অনুত্তরঙ্গ কূপ মধ্যে পতিত হইয়া হাবুডুবু খায়।

গোপী। না। সে কর্ত্তব্য-পথের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া এক দিকেই চলিতে থাকে।

বিনোদ। যে নিষ্কাম, তাহার আবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি? পৃথিবী পুড়িয়া যাউক না কেন, তাহাতেও তাহার ক্ষতি নাই।

গোপী। যে ষোলআনা নিষ্কাম তাহার পক্ষে একথা খাটে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকে কর্ত্তব্য-কার্য্যের সৌকর্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই নিষ্কাম হইতে পারে না।

বিনোদ। সে কিরূপ?

গোপী। শোন। এস্থলে নিষ্কাম বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে, তুমি তোমার নিজের সম্বন্ধে নিষ্কাম। কিন্তু তুমি অন্যের সম্বন্ধে বা পৃথিবীর সম্বন্ধে নিষ্কাম নহ। পৃথিবীর মঙ্গল তোমার প্রার্থনীয়। এবং তুমি জান যে কর্ত্তব্য সম্পাদন পৃথিবীর মঙ্গলের অনন্যভূত উপাদান। আবার তুমি ইহাও বুঝিয়াছ যে নিষ্কাম না হইলে সুচারুরূপে কর্ত্তব্য-সম্পাদন হয় না। এজন্য তুমি বলিতেছ মনুষ্যের নিষ্কাম হওয়া উচিত। এখানে তোমার নিষ্কামত্ব আলস্য বা ঘৃণার ফল নহে। তোমার নিষ্কামত্ব নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার ফল। অন্যের কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিব বলিয়া আমি নিজের কামনা পরিত্যাগ করিলাম।

গোপী। ভাই! কৃষ্ণের এই মতটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত্। কোম্তেরও এই মত "Live for others" অন্যের মঙ্গল সাধনার্থে নিজ জীবন ব্যয়িত কর। কৃষ্ণ এই মত সম্বন্ধে আর যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত আমার নিকট বিস্তারিত ভাবে বর্ণিতকর।

গোপী। বলিতেছি। এক্ষণে তুমি বুঝিলে যে নিষ্কাম কর্ম্ম অকাম কর্ম্ম অপেক্ষা তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

(১ম) নিষ্কাম কর্ম্মে সাফল্য বা বৈফল্যের স্থল নাই।

(২য়) নিষ্কাম কর্ম্ম, অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন হইলেও মনস্তাপের কারণীভূত হয়না।

(৩য়) নিষ্কাম কর্ম্ম একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্যের দিকেই পরিচালিত হয়, সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে।

বিনোদ। হাঁ, বুঝিলাম। নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বও অঙ্গীকার করিয়া লইলাম।

গোপী। কিন্তু এস্থলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি নিষ্কাম কর্ম্ম সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা এত সহজ, সুখসাধ্য ও নিরবদ্য হয়, তাহা হইলে সকল লোকে নিষ্কাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকাম কর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করে কেন?

বিনোদ। মনুষ্য ভ্রান্ত অথবা মূর্খ, তাই এইরূপ করে।

গোপী। কৃষ্ণ প্রায় ঐ কথাই বলিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "মনুষ্য বেদের কথায় অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এইরূপ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। সকাম কর্ম্ম কর, তাহা হইলে ইহকালে সুখ ও পরকালে স্বর্গলাভ করিবে, বেদ এই সমস্ত আপাতরমণীয় কিন্তু পরিণামে বিষময় উপদেশ দিয়া মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু হে অর্জ্জুন বেদের এ কথায় বিশ্বাস করিও না। যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মকৃৎ তাঁহারাই প্রকৃত যোগী। যোগী সুখ দুঃখের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন।

বিনোদ। কৃষ্ণের এই কথায় অর্জ্জুন কি বলিলেন।

গোপী। অর্জ্জুন বলিলেন—'হে ভগবন্ —আপনি যোগ ও যোগীর যে লক্ষণ করিলেন, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম না। যোগীর স্পষ্টরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন।'

বিনোদ। কৃষ্ণ ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—যে নিষ্কাম কর্ম্মকৃত, সেই প্রকৃত যোগী। তবে আবার অর্জ্জুন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?

গোপী। যোগীর সাধারণ অর্থ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। কৃষ্ণ ইহার নূতন অর্থ করিলেন দেখিয়া অর্জ্জুন যোগীর প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন—'যিনি সর্ব্ব কাম পরাজিত করিয়াছেন, যিনি ভয়ক্রোধ শূন্য, যিনি শুভপ্রার্থী নহেন, যিনি সর্ব্ব বিষয়ে স্নেহ শূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়জিৎ, যিনি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, তিনিই যোগী'।

বিনোদ। কৃষ্ণ ত এখানে কর্ম্মের কথা কিছুই বলিলেন না।

গোপী। না। সেই জন্য ই অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'হে প্রভো! যোগী হইলে যদি এত মহান্ হওয়া যায়, তবে আমি যাহাতে যোগী হইতে পারি সেই চেষ্টা করি না কেন? যাহাতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি, সেই চেষ্টা করি না কেন? আমাকে কেন পাপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইতেছেন?'

বিনোদ। কৃষ্ণ ইহার কি উত্তর দিলেন?

গোপী। কৃষ্ণের উত্তরটি বড় সুন্দর। কিন্তু আজি রাত্রি অধিক হইয়াছে। আজি এই খানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম করা যাউক। কল্য আবার এখান হইতেই কথা আরম্ভ হইবে।

বিনোদ। আচ্ছা—তাই ভাল।

ক্রমশঃ।

প্রাচীন ভারত।

আর্য্যজাতি ও সমাজ।

নানা দেশ, প্রদেশ, গ্রাম-নগর, নানাবিধ সুন্দর সৌধশোভিত আধুনিক প্রাচীনা পৃথ্বী যখন নবীনা—এ সকলের মুখ পর্য্যন্তও যখন সন্দর্শন করেনাই; যখন মনুষ্যআবাস এই সকল স্থান দুর্গম-দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যানী মধ্যে পরিগণিত ছিল—যখন ইহা সিংহ-ব্যাঘ্র, দ্বীপী-ভল্লুক প্রভৃতি নরমাংসলোলুপ হিংস্রশ্বাপদবর্গের আবাসভূমি ও ক্রীড়াস্থল ছিল,তখন কাস্পীয় সমুদ্রের তীরবর্ত্তী উত্তর কুরুবর্ষে উত্তরকালের সুসভ্য-পূজনীয় আর্য্যগণ পুত্র-কলত্রাদি সহিত সুখ-স্বচ্ছন্দে, সামান্য পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বসবাস করিতেছিলেন; তখন তাঁহারা স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই যে, তাঁহাদেরই বংশধরগণ এক সময়ে পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়া সকলের সর্ব্বময় প্রভু হইবেন—অন্য সকল জাতিকে জ্ঞান-সভ্যতায় উন্নীত করিবেন—তাঁহাদের সেই মধু-স্রাবী সুললিত ভাষা সকলেরই সমালোচ্য হইবে। তখন তাঁহারা আপনা লইয়াই ব্যস্ত—মৃগয়ায় কাতর; হিংস্রশ্বাপদবর্গকে বিদূরিত করিয়া দেশ প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য করাই তখন তাঁহাদের প্রধান সাধন স্বরূপ ছিল। উত্তর কুরুবর্ষে সকলেই স্ব স্ব পরিবারবর্গ লইয়া সুখে দিনাতিপাত করিতেছিলেন; কিন্তু বংশবৃদ্ধিসহকারে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পাইল—নানাদিকে তাঁহাদের নানা প্রকার অভাব বাড়িল; সুতরাং সেই সর্ব্বসুখপ্রদ কুরুবর্ষে সকলের স্থান সংকুলান হইয়া উঠিল না; বাসস্থানের সংকুলন হইলেও আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য হইল, কাযেই আহার-প্রাপণোপযোগী সুন্দর স্থানান্বেষণার্থ তাঁহাদের মধ্যেই এক প্রবল দল পুত্র-কলত্রাদি সমভিব্যাহারে স্বর্গতুল্য জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; তথায় নানাবিধ অসভ্য-দুর্দ্দান্ত নরাকৃতি পশুদিগকে বিদূরিত করিয়া আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক সুখে বসবাস এবং মূর্খপ্লাবিত দেশে কথঞ্চিৎ জ্ঞানসুধা বিতরণ করিয়া আপনাদের সম্যক উন্নতি সাধন ও অসভ্যদিগকে সভ্যতার পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; ইহারাই উত্তরকালে কেলটিক জাতি বলিয়া অভিহিত। এই রূপে ক্রমে ক্রমে এই সূতিকাগার হইতে দৈতনিক, স্লাভোনিক প্রভৃতি জাতিগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ইয়ুরোপ মহাদেশময় বিকীর্ণ হইয়া প্রাচীন গ্রীক-রোমক প্রভৃতি মাননীয় জাতিগণের সৃষ্টিসাধন করিয়াছেন; ইহাঁরাই এককালে জ্ঞান ও সভ্যতায় সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় ছিলেন; ইহাঁদের নিকট হইতেই ইংরাজ, জর্ম্মন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি আধু-

নিক সুসভ্য জাতিগণ বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন ; সেই মন্ত্র প্রভাবেই আজ তাঁহাদের এই অতুল কীর্ত্তি—এতাদৃশ অদ্ভুতকার্য্য কলাপ—অসম্ভব শিল্পনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে ; জানি না রোমীয়গণ যদি ইংলণ্ডের চারি শতাব্দীর শাসনদণ্ড না ধরিতেন—যদি খৃষ্টের বিমল সুযুক্তিপরিপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ নীতিনিচয় বৃক্ষোপসেবক ড্রুইদ ইংরাজগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করাইতেন; তাহা হইলে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তসময়েও তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানীয়, সকল লোক পূজনীয় হইতেন কি না। রোমীয়গণের সহবাসে ইংলন্দের যে আভ্যন্তরিক বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, একথা অন্তঃসারবিহীন ব্যতীত সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন ; যদিও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তৎকালিকী অসভ্য ব্রিটেনবাসীগণের সুসভ্য রোমীয়গণের সহিত বাস কিছুদিনের জন্য অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল ; তত্রাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে রোমীয়গণই চিরতিমিরাবৃত ইংলণ্ডে ঘোর ঘন-ঘটাযুক্ত তমোময় মেঘরাশি বিদারণ পূর্ব্বক সর্ব্বলোকপূজনীয়া অরুণ মহিষী ঊষা আনয়ন করিয়া ব্রিটেন বাসীদিগকে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া যান। তাঁহারাই ইংলণ্ডে সাহিত্যের বিমল রস প্রথম প্রবেশ করান এবং যে জন্য ইংলণ্ড আজি সর্ব্বদেশমান্য সেই লাভজনক সামুদ্রিক বাণিজ্যের তাঁহারাই প্রথম পথ প্রদর্শক।

ধন্য প্রাচীন উত্তর-কুরুবাসীগণ! তোমরা কখন স্বপ্নেও অনুভব কর নাই যে, তোমাদেরই উত্তরাধিকারীগণ এতাদৃশ দুরূহ ব্যাপার সংসাধন করিতে সমর্থ হইবেন—তোমাদেরই বংশধরগণ এই অনন্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে সুনিয়মে লালন করিবেন। যাহা হউক সেই পৈতৃক বাসস্থান হইতে দুই তিন প্রধান দল বিমুক্ত হইয়া গেলে পারসিক ও হিন্দুগণের পিতৃপুরুষ ধীরপদ-বিক্ষেপে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া এক দল ইরাণ দেশে অবতীর্ণ হইয়া তথায় জ্ঞানজ্যোতি বিকীরণ ও জোরাস্তার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ; অপরদল অভ্রংলিহ দুরারোহ হিন্দুকুশ ও হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া খণ্ড-নদী-প্রধাবিত খণ্ড সিন্ধু প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করিতে লাগিলেন ; ইহঁারাই হিন্দুগণের পিতৃপুরুষ ; ইহাদের সাহিত্য, ইহাদের বিজ্ঞান, ইহাদের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি সমুদায়ই পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবমণ্ডলীর বরেণ্য হইয়াছে, সকলকেই সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছে।

ধন্য এসিয়া! ধন্য ভারতবর্ষ ; এসিয়াই এই ধরাধামের গুরু—এসিয়াই সকলের প্রথম আবাস স্থান, ইহাই সকলের শিক্ষা গুরু ; রোমক, গ্রীক, মিসরীয়, থীবীয়, ফিনিসীয়, ইহুদি, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণ, মার্কিন; সকলেই এই এসিয়া হইতে জ্ঞানজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; ধর্ম্ম বল, সাহিত্য বল, বি-

জ্ঞান বল, এক কথায় সকলই এসিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। যৎকালে অসভ্যতা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন সভ্যতা-সূর্য্য বালারুণ-কিরণের ন্যায় এসিয়ার স্থানে স্থানে পতিত হইয়া সেই সকল স্থান উল্লসিত করিতেছিল,—সেই সকল স্থান ইহার বৃহৎ বৃহৎ নদীদ্বয়ের মধ্যগত স্থান যথা, সিন্ধু ও গঙ্গা, হোয়ানহো ও ইয়ঙ্গটসি কিয়াঙ্গ এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস। তাহার শত শত বৎসর পরে পূর্ব্ব দেশোদিত সূর্য্য পশ্চিমগামী হইল; হইয়া নীলনদ তীরস্থিত দেশ স্বীয় অপূর্ব্ব আভায় আলোকিত করিতে লাগিল। ক্রমে তথা হইতে উত্তরবাহী হইয়া প্রাচীন রোম ও গ্রীসে উদিত হয়। কিন্তু যখন আরো অধিকতর পশ্চিমগামী হইয়া সমুদ্র কূলবর্ত্তী স্থল প্রফুল্লিত করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন উহা পূর্ব্বদেশবাসী জনগণের নয়ন হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া গেল। পূর্ব্ব দেশবাসীগণ বুঝিলেন, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আর শীঘ্র সমুদিত হইতেছে না। তবে উদয় আশা একেবারে বিরহিত নহে, অস্তগত সূর্য্য পুনরায় নবভাবে পূর্ব্বভাগে উদিত হইয়া তাহাদিগকে আলোকিত করিতে পারে। এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই তাঁহারা এতাবৎকাল দীনাবস্থায় অজ্ঞান-অন্ধকারে বাস করিতেছেন, জানি না কত দিনে অস্তগত সূর্য্য পুনরুদিত হইবে। হতভাগ্য ভারত! সে সূর্য্য আর কি কখন পুনরুদিত হইবে? নিজ দল বল সঙ্গে যখন পশ্চিম-গগনে দেখা দিয়াছে, তখন কি আর তাঁহার গতি প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে? হায়! পূজনীয়া সেই ভারত আজি মহাশ্মশান। চতুর্দ্দিকেই ভস্মস্তূপ বিরাজমান, শৃগাল, কুকুর, শকুনি গৃধিনী ইহার উপর মহানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। হায়, যে ভারত রাম, ভার্গব, কর্ণার্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃষ্ণ বিক্রমের প্রদর্শনাকুল, সেই সুরসেবিত ভারত আজি মহাশ্মশানক্ষেত্র যে ভারত ব্যাস বাল্মিকী, কালিদাস, ভবভূতি, বান, শ্রীহর্ষের কবিত্ব-সরোজ-সরোবর, সেই ভারত আজি মহাশ্মশান। যে ভারত শঙ্কর, ভাস্কর, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহিরের ক্রীড়াস্থল, যাহা মনু, পরাশর, অঙ্গিরা, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, শংখ, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, চৈতন্যের বাসভূমি—যে ভারত লীলাবতীর লীলাস্থল, বেদ বিদ্যার প্রসূতি, মানব কুলের উপদেশক, জগতের পূজ্য, সেই ভারত আজি ভস্মপরিপূর্ণ, শৃগাল-কুকুর ধাবিত মহাশ্মশান। একথা স্মরণ করিলেও হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ মুহূর্ত্তেক মধ্যে শীতল হইয়া যায়, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশস্থিত অন্তরাত্মা উড়িয়া যায়। ভারতবর্ষ চিরকাল সকলকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছেন; যিনি যাহা চাহিয়াছেন, অকাতরে তিনি তাহাই দিয়াছেন; জ্ঞান বল, সাহিত্য বল, সভ্যতা বল, ধর্ম্মবল, বিজ্ঞানবল, ব্যবস্থা-শাস্ত্র বল, সকল এই ভারতবর্ষ কল্পতরুর ন্যায় মুক্তহস্তে চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিয়াছেন; তাই আজি তিনি পথের ভিখারিণী, তাই আজি তাঁহার কিছুই নাই। তাঁহার এই দারিদ্র তাঁহার মহা গৌরবের বিষয়; আজি

মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট হইতে এই জন্য পূজা পাইতেছেন; একজন এই জন্যই এই কথা বলিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছেন, "ভারত সমস্ত জগতের শৈশব-দোলা; তথা হইতে জগন্মাতা স্বীয় সন্তান সন্ততিগণকে সুদূর পশ্চিমদেশে প্রেরণ করিয়া ইয়ুরোপীয় সমাজে ভাষা, ব্যবহার, নীতি, সাহিত্য এবং ধর্ম্ম পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছেন। ইহারা আপনাদের জন্মভূমি প্রচণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে পারস্য,আরব,মিসর এবং তুষার মণ্ডিত ইয়ুরোপে আগমন করিয়া আপনাদের যথার্থ পৈতৃক স্থান বিস্মৃত এবং তাঁহাদের গাত্রচর্ম্ম হিমানীসংসর্গে ধবলিত বা সূর্য্যের প্রখর তাপে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে সত্য,কিন্তু তাঁহাদের মুখকান্তিতে সেই আদিম জাতির ছাঁচ অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাপিত সুসভ্য রাজ্যসকল ধ্বংশই হউক এবং ধ্বংশাবশেষ কিছুই না রহুক—নব নব জাতি সেই ভস্মস্তূপ হইতে উত্থিত বা প্রাচীন নগরীর স্থানে নব নব নগরীই সংস্থাপিত হউক, তত্রাপি কাল ও ধ্বংশ উভয়ে একযোগেও এই আদিম জাতির চিত্ত বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

দর্শনশাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করে যে, ভাষার সমুদয় প্রকৃতিই বহুপূর্ব্বদেশ হইতে গৃহীত এবং ধন্য ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ! তোমাদের নিকট হইতেই অধুনাতন সমুদায় ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বরণুফ সে দিন বলিলেন যে "সংস্কৃত ভাষার আলোচনা জন্য গ্রীক ও লাটিন অধিকতর বোধগম্য হইয়াছে; এবং সাভোনিক ও জর্ম্মান ভাষাসম্বন্ধেও এই কথা বলা অযৌক্তিক নহে।

মনু, মিসরীয়, হিব্রু, গ্রীক এবং রোমীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রাণদান করিয়াছেন এবং এক্ষণেও তাঁহার ব্যবস্থা সমুদায় ইয়ুরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের অন্তরে নিহিত আছে। কমিন এই স্থানে বলিয়াছেন যে "ভারতের দর্শনেতিবৃত্ত সমুদায় জগতের দর্শনেতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।"

এইরূপে আমরা সকলের মূল ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাচীন ও নবীন জাতি সকলের কবিত্ব ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গাথা দর্শন করিতে পাই। এমন কি জোরাস্তারের উপাসনা প্রণালী, মিসরের সঙ্কেতাবলী—ইলুসিসের রহস্য, আবেস্তার নারীপৌরোহিত্য, বাইবেলের জিনেসিস্‌ ও ভবিষ্যদ্বাণী, সামীয় ঋষির নীতি এবং খৃষ্টের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রণালী প্রভৃতি যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর, যাহা কিছু উপদেশক সমুদায়ই এই স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

মানবজাতির শৈশবদোলা ভারত! তোমায় প্রণাম করি; যাহাকে শ্বাপদোচিত শত শত আক্রমণ বহু শতাব্দীতেও বিস্মৃতির গর্ভে লীন করিতে পারে নাই, সেই পূজনীয়া-জগদ্ধাত্রী ভারত তোমাকে প্রণাম করি;—প্রেম-ভক্তি-কবিত্ব ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি ভারত তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আমরা কি আর আপনার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সুখী হইব?" *

* India is the world's cradle;

এই রূপে ভারতের মহিমা সহস্র লোকে সহস্র মুখে কীর্ত্তন করিয়াছে।

কাস্পীয় সমুদ্রের তীরবর্ত্তী উত্তর কুরু হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হইলেন, এবং পশ্চিম ও দক্ষিণবাহী হইয়া আপনাপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন; ইহারাই গ্রীক,রোমক, পারসীক ও হিন্দুগণের পিতৃপুরুষ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; এই

---

thence it is, that the common mother in sending forth her children even to the utmost West, has in unfading testimony of our origin bequeathed us the legacy of her language, her laws, her *morale*, her literature and her religion.

Traversing Persia, Arabia, Egypt and even forcing their way to the cold and cloudy north, far from the sunny soil of their birth; in vain they may forget their point of departure, their skin may remain brown or become white from contact with snows of the West; of the civilization founded by them splendid kingdoms may fall and leave no trace behind but some few ruins of sculptured columns; new people may rise from the ashes of the first; new cities flourish on the site of the old; but time and ruin united fail to obliterate the ever-legible stamp of origin.

Science now admits, as a truth needing no further demonstration, that all the idioms of antiquity were derived from the far East; and thanks to the labours of Indian philalogists, our modern languages have there found their derivation and their roots.

It was but yesterday that the lamented Burnouf drew the attention of his class to our much better comprehension of the Greek and Latin, since we have commenced the study of Sanscrit.

And do we not assign the same origin to Sclavonic and Germanic languages?

Manou inspired Egyptian, Hebrew, Greek and Roman legislation and his spirit still permeates the whole economy of our European laws.

Cousin has some-where said "The history of Indian philosophy is the abridged history of the philosophy of the world."

But this is not all. The emigrant tribes, together with their laws, their usages, their customs and their language, carried with them equally

হিন্দুগণই বিশেষ রূপে 'আর্য্য' বলিয়া অভিহিত। আর্য্য শব্দের অর্থ পূজনীয়—শ্রেষ্ঠ; কথাটি সংস্কৃত ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন; ঋ ধাতুর অর্থ গতি-প্রাপণ ও জ্ঞান। এই

their pious memories of the gods of that home which they were to see no more—of those domestic gods whom they had burnt before leaving for ever.

So, in returning to the foundation-head, do we find in India all the poetic and religious traditions of ancient and modern peoples. The worship of Zoraster, the symbols of Egypt, the mysteries of Eleusis and the priestesses of Vesta, the Genesis and prophecies of the Bible, the *morale* of the Samian sage, and the sublime teaching of the philosopher of Bethlehem.

*   *   *   *   *   *

Soil of ancient India, cradle of humanity, hail! Hail, venerable and efficient nurse, whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! Hail, father land of faith, of love; poetry and of science! May we hail a revival of thy past in our Western future.

Jacoliot's "Bible in India."

জ্ঞানার্থকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিরা আপনাদিগকে আর্য্য শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করিয়া আর্য্য পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান আছে তিনিই আর্য্য। মনু-আর্য্য শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—

কর্ত্তব্য মাচরন্ কাম মকর্ত্তব্য মনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সবৈ আর্য্য ইতিস্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত আচারে অবস্থান করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জ্জন করেন তাঁহারাই আর্য্য বলিয়া অভিহিত। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদেশিক পণ্ডিতগণ আর্য্য শব্দের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতেও আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু সে ঋ ধাতুর অর্থ কৃষি কর্ম্ম করা; সুতরাং ইহাঁদের মতে যাঁহারা তদানীন্তন সময়ে কৃষি কর্ম্মে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই আর্য্য বলিয়া কথিত; আমরা একথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ যে কৃষি কর্ম্ম পরিজ্ঞাত ছিলেন না তাহা নহে। প্রত্যুত কৃষি, পশুপালন ও মৃগয়াই তাঁহাদের ভরণ পোষণের প্রধান সাধন স্বরূপ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহারা আর্য্য নামে আখ্যাত হইতেন তাহা কখনই নহে; বিশেষতঃ আমরা যখন ধাত্বর্থ ও মনু প্রভৃতি ব্যবস্থাপক হইতে স্বীয় মত পরিপোষক মত প্রাপ্ত হইতেছি, তখন ইহাঁদের এই কল্পিত ভ্রমাত্মক মতের পোষকতা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ নহি। পূর্ব্বতন ঋষিগণ জ্ঞান গুণকে এতাদৃশ গৌরবান্বিত জ্ঞান

করিতেন যে, জ্ঞানার্জ্জন ও জন্ম গ্রহণ তাঁহাদিগের নিকট সমান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত; এবং এই জন্যই ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দ্বিজ নাম হইয়াছে। দ্বিজ অর্থাৎ যাঁহারা দুইবার জন্ম গ্রহণ করেন; একবার মাতৃগর্ভ হইতে,দ্বিতীয়বার উপনয়ন সময়ে; 'মাতুঃ সকাশাৎ জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।' এই উপনয়ন-সময় জ্ঞানশিক্ষার প্রারম্ভকাল বলিয়া তাহা পুনর্জ্জন্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; তবেই যখন জ্ঞানশিক্ষার প্রথমকাল পুনর্জন্ম বলিয়া কীর্ত্তিত, তখন সেই জ্ঞান অর্জ্জন করিলে তাঁহার কিরূপ নাম হওয়া উচিত? জ্ঞান যে কি রমণীয় পদার্থ, তাহা পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই অগ্রে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহারা আর্য্য ও যাহারা তাঁহাদের পীড়নকারী এবং হিতাহিত জ্ঞান-পরিশূন্য তাহারাই অনার্য্য বলিয়া অভিহিত।

তবে কি পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মত সম্পূর্ণ রূপে ভিত্তিশূন্য ও সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক? তাহা নহে; তাহাও এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত; কিন্তু সেই ভিত্তির তাঁহারা অন্যার্থ সংঘটন করিয়াছেন। তাঁহারাও আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু হইতে নিষ্পাদন স্বীকার করেন, কিন্তু সে ধাতুর অর্থ কৃষি কর্ম্ম করা-বা কৃষি কার্য্যে ফল প্রাপ্ত হওয়া—অন্যকথায় প্রাপ্ত হওয়া। ঋ ধাতুর এই প্রাপণ অর্থে সংস্কৃত ভাষায় অপর একটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; তাহা আর্য্য নহে—'অর্য্য'; এই 'অর্য্য' বৈশ্যদিগের উপাধি; বৈশ্যগণকেই পূর্ব্বে অর্য্য বলিত; বাণিজ্যাদি লাভবান্ কার্য্যে অর্থ প্রাপণই বৈশ্যদিগের 'অর্য্য' নাম হইবার কারণ; বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্যও করিতেন; বোধ হয় এই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋ ধাতু অর্থে কৃষি কার্য্য স্থির করিয়াছেন—বস্তুতঃ তাহা নহে। মহামুনি পাণিনীও এই অর্য্য শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি বলেন অর্য্য বৈশ্য ও আর্য্য ব্রাহ্মণ,যথা;—'অর্য্যঃ স্বামী-বৈশ্যয়োঃ' এবং 'আর্য্যো ব্রাহ্মণকুমারয়োঃ।' বোধ হয় এই সাদৃশ্য দৃষ্টে ও এদেশীয় ভাষায় 'আর' (Ear = to plough) এই কথার সহিত আর্য্য শব্দের সৌসাদৃশ্য থাকা হেতু তাঁহারা এই শব্দটিকে কৃষি কর্ম্মাসক্ত লোক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এতাদৃশ বহুতর শব্দ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার ধাতু হইতে নিষ্পাদন করা কোন ক্রমেই যুক্তি যুক্ত নহে এবং তাহা সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না; আর্য্য শব্দ সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই ঘটিয়াছে।

আর্য্য এই কথাটি জ্ঞানবান্ লোকের প্রতি প্রযুজ্য; হিন্দুগণ আপনাদিগকে এই পবিত্র শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ভিন্ন দেশবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তদানীন্তন অন্য লোকদিগকে অনার্য্য, ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্য বলিলে আমরা এক্ষণে কি বুঝিব? আমরাও কি এতাধিক গৌরবান্বিত শব্দ এতাদৃশ সঙ্কীর্ণ অর্থেই প্রয়োগ করিব? কখনই নহে;

আমরা বলিব ইদানীন্তন প্রায় যাবতীয় সুসভ্য জাতিই এই আর্য্যজাতির অন্তর্ভূত; গঙ্গাতীরবাসী, খর্ব্বকায়, শ্যামবর্ণ, অর্দ্ধ উলঙ্গ ব্রহ্মসূত্রধারী কণ্ডূয়নকারী শর্ম্মণোপাধিক ব্রাহ্মণ ও রাইন নদীতীরস্থিত দীর্ঘকায়, শ্বেতবর্ণ, সুন্দর বস্ত্রাবৃত শ্বেত শ্মশ্রূধারী জর্ম্মণোপাধিক জর্ম্মাণ; সীন নদীতীরবর্ত্তী অমিতবিক্রমশালী ফ্রেঞ্চ ও টেম্‌স্ নদীতীরবর্ত্তী সুসভ্য ইংরেজ; টাইবর তীরবাসী ধীর ইতালীয় ও নেভা তীরস্থিত দুর্দ্দম রুষ; ডানিয়ুব তীরবাসী সুবুদ্ধি অষ্ট্রিয় Ind:ক্ষেস তীরবাসী নির্ব্বিরোধী গ্রীক—সকলেই সেই আর্য্যবংশসম্ভূত সকলেরই পিতৃপুরুষ সেই উত্তর-কুরু-বাসী পূজনীয় আর্য্যগণ।

হিন্দুগণের পিতৃপুরুষ উত্তর কুরু হইতে আগমন করিয়া সপ্তনদীপ্রধাবিত সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে বাস করিতে ছিলেন; ক্রমে বংশ বৃদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বগামী হইয়া সরস্বতী ও দৃষদ্বতী (কাগার) নদীদ্বয়ের মধ্যগত স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। যখন আর্য্যগণ প্রথমে ভারত-ক্ষেত্র পদার্পণ করেন তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ছিল কিনা নির্ণয় করা সুকঠিন; কিন্তু পরে তাহার সূত্রপাত হইল; এই জাতি প্রথা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। পূর্ব্বতন সমুদায় জাতি মধ্যেই ইহা অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল; মিসরীয়, মিডীয়, পারসীক, রোমীয়, এথেনীয় প্রভৃতি যে কোন প্রাচীন জাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তাহাতেই ইহা পরিলক্ষিত হয়, তবে হিন্দুগণ আপনাদের জাতি প্রথা যেরূপ কঠিন নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছেন, সেরূপ কোন কালে, কোন সমাজে বর্ত্তমান ছিল কি না সন্দেহ। এ প্রকার জাতিভেদ প্রথা তদানীন্তন সমাজ সংরক্ষণের বিশেষ উপযোগী ছিল তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ধর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ থাকায় ইদানীন্তন ইহা হইতে যে অনেক অন্যায় কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের কার্য্য জ্ঞানার্জ্জন, জ্ঞান শিক্ষা দেওন, এবং রাজ্য ও সাধারণ মঙ্গল হেতু তপশ্চরণ প্রভৃতি। অন্য কোন জাতিই এই সকল কার্য্য করিতে পারিতেন না,—করিলে অতি কঠোর রাজ-দণ্ডে বিশেষ রূপে দণ্ডিত হইতেন। এই জন্যই আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই শম্বুক নামক জনৈক শূদ্র তপশ্চরণ করিতেছিলেন বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র দয়ার অবতার হইয়াও স্বহস্তে তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার উচিত প্রতিফল প্রদান করেন। জাতি-প্রথা ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়াই তাঁহার এতাদৃশ লোম-হর্ষণ কার্য্য সৎকার্য্য বলিয়া গণনীয় হইয়াছে। এক্ষণে সেই জাতি প্রথা কি প্রকার ছিল তাহাই দেখিতে হইতেছে। আর্য্যগণ প্রধানতঃ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন; যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; তন্মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজাতি এবং চতুর্থ এক জাতি, এতদ্ব্যতীত অন্য শুদ্ধ জাতি নাই;—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক।

অনেকে অনুমান করেন যে উত্তর কুরু হইতে যে দল ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তাঁহারাই দ্বিজাতি ও আর্য্য শব্দে অভিহিত; এবং যে জাতি তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরাজিত হয় তাহারাই শূদ্র; কিন্তু এ অনুমান ও যুক্তি আমাদের মতে ভিত্তিশূন্য ও ভ্রমসঙ্কুল। শূদ্রগণও এদেশের আদিম অধিবাসী নহেন—ঔপনিবেশিক মাত্র; তবে সমাজে তাঁহাদের এপ্রকার নিকৃষ্ট ভাবে বাস করার নানা কারণ আছে। প্রথমতঃ আমরা দেখাইব, শূদ্রগণ এখানকার আদিম অধিবাসী নহেন, অন্য তিন জাতির ন্যায় ঔপনিবেশিক মাত্র। ইহা প্রমাণ করিতে গেলে অগ্রে দেখা আবশ্যক কোন সমাজকে স্থায়ী ও সুশৃঙ্খলে রক্ষা করিতে হইলে কি কি প্রকার লোকের প্রয়োজন, এবং তাঁহারা কি কি কার্য্য সাধন করিবেন। ইহার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই ধর্ম্মালোচক, শান্তিরক্ষক, সমাজ পরিপালক ও পরিশ্রমসহিষ্ণু এই চারি প্রকার লোকের প্রয়োজন এবং তাঁহারা ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মোপদেশ, বিগ্রহাদি হইতে দেশ রক্ষা করিয়া শান্তিস্থাপন, সকলের অর্থ সাহায্য ও সমগ্র সমাজের ভরণ পোষণ, এবং অপর দল সমাজের জন্য কেবল কায়িক পরিশ্রম করিবেন। এপ্রকার বন্দোবস্ত না থাকিলে সমাজ কখনও সুশৃঙ্খলে চলিতে পারেনা ও সে সমাজ কখন স্থায়ী হয় না: এই জন্যই পূর্ব্বতন আর্য্য-তাপসেরা সমাজ সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত আপনাদের মধ্য হইতেই এই চারি প্রকার কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার লোক নির্ব্বাচণ করেন; তাঁহারাই পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; সর্ব্ব প্রথমে যে কোন প্রকার জাতিভেদ-প্রথা ছিল না তাহা ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন; যথা, আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই;—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥

অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মময়, কোন বর্ণবিভেদ ছিল না, পরে কর্ম্মানুসারে লোক বিভিন্ন বর্ণে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা-গণের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থায় দেখিতে পাই, যে ব্রাহ্মণ আপন কর্ম্মে মনোযোগী নহেন তিনি তদ্দণ্ডেই শূদ্র-পদবাচ্য এবং শূদ্র সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিলে তিনি ব্রাহ্মণবৎ পূজনীয়; মনু বলিয়াছেন;—

শূদ্র ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণাশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যান এইরূপে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ইত্যাদি পদ বাচ্য হইতে পারেন। মহর্ষি আপস্তম্বও জাতির এই পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করেন; তিনি বলিয়াছেন;—

ধর্ম্মচর্য্যায়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং
বর্ণমাপদ্যেত জাতি পরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বোবর্ণো জঘণ্যং জঘণ্যং
বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তৌ॥

অর্থাৎ ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা নীচ বর্ণীয় লোক উত্তম বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং অধ-

স্বাচরণে উচ্চবর্ণীয় লোকও নিম্নবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া যায়। তাহা হইলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মধ্যে কেহ অসৎকার্য্য করিলে নীচ ও সৎকার্য্য করিলে উচ্চ বর্ণীয় হইতে পারিতেন; যখন ব্যবস্থাপক-গণের ব্যবস্থা মধ্যে এই প্রকার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে তখন যে ইহা সমাজে বিশেষ প্রচরদ্রূপ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই; না হইলে তাঁহারা কখনই এই সকল ব্যবস্থা স্বস্ব রচিত পবিত্র সংহিতায় সন্নি[illegible]ত ক- করিতেন না; এই সকল দ্বারা স্পষ্টতঃই জানা যাইতেছে যে মন্বাদি সংহিতাকার-গণের সময়ে সমাজে জাতি প্রথা তত প্রবল ছিল না। তদানীন্তন বিবাহ প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারাযায়, তখনকার বিবাহ প্রথা এই প্রকার—ব্রাহ্মণ অন্য তিন বর্ণীয়া কন্যারও পাণিপীড়ন করিতে পারিতেন, এইরূপে ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও শূদ্রাকে এবং বৈশ্য শূদ্র-কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারিতেন; তাহাতে তাঁহাদের জাতির কিছুমাত্র অবমাননা হইত না; মহর্ষি বশিষ্ঠ নীচবর্ণীয়া অশ্বমালাকে এবং মুণ্ডপাল সুরঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহারা সমাজে নিন্দনীয় হন নাই; প্রত্যুত এই দুই রমণী নানা সৎকার্য্য সংসাধন করিয়া তৎকালে সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন; ইহাতেই বিলক্ষণ জানা যাইতেছে তদানীন্তন জাতি-প্রথা অত্যন্ত শিথিল ছিল।

যখন দেখা যাইতেছে শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণের গৃহিণী হইতেছেন—তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ-পুত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে, তখন কি প্রকারে বলি সেই ব্রাহ্মণ সেই শূদ্রকে চণ্ডালবৎ ঘৃণা করিতেন? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে যখন জাতি-প্রথা ছিল না, তখন সকলের সহিতই আদান প্রদান ও ভক্ষণাদি চলিত; অনন্তর জাতি-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও এই সকল কার্য্য অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, পরে নানা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা হেতু এই সকল নিয়ম ক্রমে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে আর্য্যগণ ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, অসুর, শক প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। শূদ্রগণ যদি তাহাই হইতেন তাহা হইলে তাহারাও ঐরূপ কোন শব্দে আখ্যাত হইতেন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ব্যাস-প্রমুখ মহর্ষিগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন 'সকলেই ব্রাহ্ম্য—কর্ম্মানুসারে সকলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে দাঁড়াইয়াছেন' তখন একথায় অবিশ্বাস করিবার অন্য কোন কারণই নাই। শূদ্রগণও ব্রহ্মকায়া হইতে উৎপন্ন; সুতরাং তাঁহারা অন্য তিন বর্ণের সহিত একজাতীয় এবং সকলেই উত্তর কুরুতে একত্রে বসবাস করিয়াছিলেন ও এক যোগেই ভারতে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। এক জাতীয় না হইলে কখনই তাহাদের সহিত আদান-ভক্ষণ থাকিত না; এই স্থলে যদি কেহ বলেন, সত্য অন্য তিন জাতিই শূদ্র-

কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু শূদ্র ত শূদ্রকন্যা ভিন্ন অন্য কোন কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিতেন না। তাহার কারণ আছে; যখন দেখা যাইতেছে ক্ষত্রিয় পুরুষ ব্রাহ্মণী গৃহিণী করিতে পারিতেন না, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ার পাণিগ্রহণে অধিকারী ছিলেন না, তখন শূদ্র কি প্রকারে বৈশ্য কন্যার বা তদূর্দ্ধের পাণিগ্রহণে সমর্থ হইবেন? উচ্চ বর্ণীয় পুরুষ তন্নিম্নবর্ণীয়া যে কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু নিম্নবর্ণীয় কোন পুরুষ কখনই কোন উচ্চবর্ণীয়া কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিতেন না; ইহাই তদানীন্তন আর্য্য সমাজের নিয়ম ছিল। শূদ্র সর্ব্ব নিম্ন বর্ণীয়, সুতরাং শূদ্রভিন্ন তিনি অন্য কোন বর্ণীয়া কন্যাকেই দারারূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন না; করিলে সে কন্যা পতিত হইতেন। আর্য্যগণ চারিবর্ণই স্বীকার করিয়াছেন, আর পঞ্চমবর্ণ ছিল না; তাহা হইলেই দৈত্য অসুর প্রভৃতি সকলে কোন বর্ণেরই অন্তর্ভূত নহে; তাহারা এক স্বতন্ত্র জাতি, তাহাদের সহিত ইহাদের কোন সংস্রবই ছিল না; তাহারা যেন ব্রহ্মারই সৃজিত নহে, ইহাদিগকেই আর্য্যগণ অতিশয় ঘৃণা করিতেন এবং স্পর্শ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতেন। কিন্তু শূদ্রগণ সমাজে কখনই এতাদৃশ ঘৃণিত হন নাই, ইহাতেই বিশেষরূপ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে শূদ্রগণ তাঁহাদের এক বংশীয়ই ছিলেন, ক্রমে কার্য্যবশতঃ তাঁহারা নিম্নস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; তাঁহারাও যদি অসুরগণের ন্যায় এদেশের আদিম অধিবাসী হইতেন, তাহা হইলে আর্য্যগণ কখনই তাহাদিগকে ব্রহ্ম-কায়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং তাঁহাদের প্রস্তুত অন্নাদিও ভক্ষণ করিতেন না *। এই সকল দেখিয়া বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, শূদ্রগণ বিজিত জাতি নহেন এবং এই জন্যই যাঁহারা শূদ্রগণকে স্পার্টান বিজিত হেলট্‌দিগের ন্যায় বলেন তাঁহাদের অনুমান ও যুক্তি ভ্রমাত্মক। শূদ্রগণও অন্যান্য তিন জাতির ন্যায় ঔপনিবেশিক ও আর্য্যজাতি মধ্যে পরিগণিত।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

---

* আদিত্য ও অগ্নিপুরাণ, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রণীত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ ৭৮ পৃষ্ঠা।

অগ্নিকুল।

মুখবন্ধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অর্ব্বলী ভূধরের অনতিদূরে ভাস্তি নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এখানে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের আবাস-ভূমি। জনপদ আধুনিক নহে, গৃহাদি এবং অধিবা[illegible]গুলীর সাংসারিক সুশৃঙ্খলা দৃষ্টে প্রা[illegible]-বলিয়া অনুভূত হয়। এক একখানি[illegible]ক্ষুদ্র বাটি দুই তিনটি ইষ্টকে কি প্রস্তর[illegible] সজ্জিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিপা[illegible] আম্র, খর্জ্জুর, কাঁঠাল, জাম, হরীতকী, না[illegible]রকেল, আমলকী, প্রভৃতি ফলদ বৃক্ষে [illegible]ষ্টিত। অদূরে দুই একখানি শস্য ক্ষেত্র।

এই স্থান সমধিক স্বা[illegible]কর; বালক বালিকা স্ত্রী পুরুষ সকলেই [illegible]বল এবং সুন্দর। কাহারও বদন অ[illegible]ভাব-ক্লিষ্ট নহে, সকলেই প্রফুল্লচিত্ত। সম[illegible] জনপদ একবাটি এবং সমস্ত অধিবাসী এক পরিবার তুল্য প্রীতি-ভাব-পূর্ণ। বালক, বালিকা, মাতা, ভগিনী, কে কাহার বুঝিবার সাধ্য নাই। সকল গৃহেই প্রীতি, সকল গৃহেই শান্তি, দয়া, মায়া, স্নেহ, সৌজন্য বিরাজিত। এক গৃহে দশটি সুপক্ক ফল আহরিত হইলে, তাহা শত খণ্ডীকৃত হইয়া বিতরিত হইয়া থাকে। যাঁহার নিজ গৃহে শিশু নাই তিনিও অপরের শিশুর জন্য সুখাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন। এক গৃহে মৃত্যু উপস্থিত হইলে জনপদ মধ্যে ব্যাকুলতা পূর্ণ রোদন-ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইবে। এক গৃহে উৎসব হইলে জনপদ উৎসবপূর্ণ হইবে। এক গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে—সমস্ত জনপদবাসী তাহার অভ্যর্থনা করিবে। যাহার গৃহে যাহা ভাল থাকিবে তাহাই আনিয়া দিবে। বালক বালিকা যুবক যুবতী যে কেহ হউক, অশিষ্ট ব্যবহার করিলে যে কোন প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া পূর্ব্বে দেখিতে কি শুনিতে পান, তিনিই অভিভাবকের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন ও শাসন করিবেন ইহাতে কাহারও অসন্তুষ্টি বা অসম্মান জ্ঞান হইবার নহে।

আজি জনপদ উৎস[illegible]—আজি বাসন্তী পঞ্চমী। দুই প্রহরের সময় দেব দেবীর অর্চ্চনা হইয়াছে, অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্কৃত ও পূজিত হইয়াছে। গৃহে গৃহে সকলে ভোজন পান করিয়াছে। বৃদ্ধ এবং যুবক বৃন্দ অর্ব্বুদে গমন করিয়াছে। আজি হইতে দিবসত্রয় তথায় যুদ্ধ-নৈপুণ্য, শারীরিক [illegible] এবং অস্ত্র চালনাদি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিজয়ী মাল্য চন্দন এবং অস্ত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। নারীগণ রঙ্গস্থলে উপস্থিত

থাকেন, অনেক সময় বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া কুমারীগণ পিতা মাতার অনুমতি লইয়া বিজয়ীর সহিত বিবাহিত হন। অর্ব্বুদ দেব-নিবাস পর্ব্বত। গ্রীকগণের অলিম্পীয়ার ন্যায় এই অত্যুচ্চ মহীধর আর্য্যগণের পূজিত। অলিম্পীয়ার প্রসিদ্ধ ক্রীড়ার ন্যায় অর্ব্বুদও প্রসিদ্ধ ক্রীড়াস্থল, সুতরাং আজি দ্বিপ্রহরের পরে ভাস্তি জনপদ প্রায় শূন্য হইয়াছে।

কেবল বালক বালিকা এবং নারীগণ, বিচরণ এবং ক্রীড়া করিতেছে। জনপদ পুরুষশূন্য সুতরাং যুবতীগণ আজি দলে দলে কাননে কান্তারে পর্ব্বতশৃঙ্গে আনন্দে নিঃশঙ্ক চিত্তে এবং অসাবধানে ভ্রমণ করিতেছে। সকলেরই কুঙ্কুম-রঞ্জিত বসন। হস্তে রক্তিম পল্লব।

আর এক স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়া কুমারীগণ যাইতেছে। ইহারা আরো স্বাধীনা এবং নিঃসঙ্কুচিতা। কাহারো মস্তকে বস্ত্র নাই। কেশ-জাল উন্মুক্ত। নূতন রঞ্জিত ঘাগরী, রঞ্জিত ওড়না, রঞ্জিত কাঁচলী। কাহার হস্তে চ্যুত-মুকুল, কাহারও হস্তে অলক্তক-সন্নিভ লোহিত নবীন পল্লব-দাম। বৈকালিক তপনের হেম কর কুমারীগণের সুমনোহর বদন চুম্বন করিতেছে, ঈষদুন্মেষিত বক্ষ স্পর্শ করিতেছে। কোন কোন কুমারীবা হস্তস্থিত নবপল্লব গুচ্ছে দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। শাখায় শাখায় কোকিল শুক পাপিয়া বসিয়া বসন্ত-বিজয় মধুর স্বরে ঘোষণা করিতেছে। বৃক্ষরাজী অনন্ত অসংখ্য রক্তিম নব পত্রে সজ্জিত হইয়াছে। যে দিকে চাও, সুরঞ্জিত, সুরক্তিম, সুকোমল, মোহন এবং মধুর। আজি প্রকৃতি উৎসবপূর্ণ।

কুমারীগণ আনন্দে গাহিয়া গাহিয়া ধীরে ধীরে শৈলবিহারে যাইতেছে। কোমল কামিনীকণ্ঠ এক স্বরে পঞ্চমে উঠিয়া—বসন্ত বিঘোষিত করিতেছে।

'আইল ধরাতে আজি বসন্ত রাজন।
রক্তিম সাজেতে করি জগত মোহন॥
নব দল
নব বল
এই সকল মধুর কোমল
অমিয়-স্বর-কোকিল
বিস্তারি ... ন আহা মধুর শাসন॥
(২)
ব...য়ে মধু মলয়
তরু মুকুল দোলয়
—পরিমল লুটয়
লুঠি দেই স... দিক্ নবরাজদান॥
(৩)
আজি ...হা, সরসি সুপরশ
গলয়ি...র তুষার বিষ,
নাশয়ি ও হিম-কলুষ
ঢালছ সকল দেশে শান্তির ঝড়ন॥
সব মিলি চল হেরি—নব সো বিধান॥

এদিকে দ্বাদশ বর্ষ এবং তন্নিম্ন বয়স্ক বালকগণ অর্ব্বলীর উপত্যকায়, আপনাপন শারীরিক বল পরীক্ষা এবং তদ্রূপ নানাবিধ ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে! গ্রীশে যেরূপ অলিম্পীয়ার খেলা ব্যতীত ও স্থিমিয়ান প্রভৃতি নানা প্রসিদ্ধ ক্রীড়াস্থল যথা তথা

নির্দ্দিষ্ট ছিল, আর্য্যাবর্ত্তেও সেইরূপ অসংখ্য ক্রীড়া স্থল নির্দ্দিষ্ট। যাহারা অলিম্পীয়ায় যাইতে অশক্ত, তাহারা[illegible]ই নিকটবর্ত্তী রঙ্গস্থলে খেলাই[illegible]। অর্ব্বলীভূধরও ঐরূপ ক্রীড়া-স্থল, অর্ব্বু[illegible] নিকটে বলিয়া ইহার গৌরব কম।—এখানে আজি কেবল বালকেরাই খেলাইতেছে। কিন্তু এখনও তাহাদের দর্শক আসিতেছে না বলিয়া খেলায় তত উৎসাহ নাই। ইহাদের উৎসাহদাতা এবং দর্শক কুমারীগণ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কলকণ্ঠ [illegible]গোচর হইল—দশবার জন বালক ঐস্বর [illegible] করিয়া ধাবিত হইল।—দেখিতে দেখি[illegible] কোমল সহচরীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া [illegible]রা প্রত্যা-বৃত্ত হইল। বালকেরা, কো[illegible]ল দর্শন এবং কোমল বাক্যের উৎসাহে[illegible] পুনরায় ক্রীড়া আরম্ভ করিল।

বালিকা এবং কুমারীগণ [illegible]রোবরের সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় স[illegible] এবং ফুল্ল বদনে ঘাস-শয্যায় বসিয়া [illegible]খেলা দেখিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে দুইটি কুমারীর মন অন্য দিগে ধাবিত। উহারা ধীরে ধীরে উঠিয়া উহার কিছু দূরে একটি লতা পরিবেষ্টিত নিকুঞ্জে আসিয়া বসিল। একটির নাম মহাশ্বেতা, আর একটির নাম সুভদ্রা। উভয়েই, সুখদ পঞ্চদশ-বর্ষ-দেশীয়া, উভয়েই সুন্দরী।

মহাশ্বেতার সৌন্দর্য্য ভিন্নরূপ। এরূপ দুর্ল্লভ। বর্ণ নির্ম্মল শুভ্র, তাহাতে ঈষৎ লোহিত রাগযুক্ত। কেশ জাল ঈশৎ স্বর্ণাভ এবং আজঙ্ঘা তরঙ্গায়িত। চক্ষু আকর্ণ-লম্বিত এবং সুগাঢ় নীলিম। ললাট, ভ্রূ, মুখমণ্ডল, এবং নাসিকা, মোহনভাবের আদর্শ। বপু ক্ষীণ, তথাপি সিংহ রমণীর ন্যায় তেজোভাবপূর্ণ, সাহসপূর্ণ ও প্রশান্ত-দর্শন।

সুভদ্রা গৌরাঙ্গী—ঈষৎ স্থূলগাত্রা, তাহার গাঢ় কৃষ্ণ চক্ষু, সুদীর্ঘ সরল ভ্রমর-কালী কেশকলাপ, সুন্দর বদন, সুন্দর নাসিকা।—তাহার শরীরে তেজ নাই, উহা নারীজন-সুলভ শান্তিভাব-পূর্ণ এবং বিলাস-লাঞ্ছিত। তথাপি, এ অপূর্ব্ব কোমল ও স্নিগ্ধ মাধুরী এবং মোহন সৌন্দর্য্য মহাশ্বে-তার সুতীব্র মহোজ্জ্বল রূপ-রাশির নিকট নিষ্প্রভ। যেন একটি মশালের নিকট অতি-ক্ষুদ্র দেউটি মিটিং করিতেছে। অথবা এক খণ্ড উজ্জ্বল হীরকের নিকট একটুকরা স্বর্ণ পড়িয়া রহিয়াছে। সাধারণে হীরার আদর জানে না, স্বর্ণ পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং লোকের মত লোক হইলে হীরার গুণ বুঝিয়া লয়। ভান্তি জ[illegible]দে প্রায় সক-লেই সুভদ্রার রূপের প্রশংসা করে। কে-বল দুই চারি জনে মহাশ্বেতার রূপে বিস্মিত হয়। মহাশ্বেতার রূপ বিক্রম-আকর্ষি, সুভ-দ্রার রূপ বিলাসী, মোহন। মহাশ্বেতা ক্ষত্রিয়া। সুভদ্রা বৈশ্যকন্যা।

সুভদ্রা হাসিয়া বলিল, "মহাশ্বেতে! তোমার কুঞ্জে আসিলাম, এখন আমি তোমার সেই তাপস কুমার হইতে পারিলে তো তুমি সুখী হইবে?"

মহাশ্বেতা বলিলেন "কাল তিনি আ-

সিয়া ছিলেন।” সুভদ্রা বলিল, “আচ্ছা সখি,—তাঁহার সহিত কিরূপে তোমার প্রণয় হইল,—কিরূপেই বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল।”

মহাশ্বেতা বলিলেন, “সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। তিনি একদিন আমাদের বাড়ী অতিথি হইয়াছিলেন। বাবা বাড়ী নাই তা তুমি জান। মা তোমার ভাই অরুণের বিবাহে কায কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। সন্ধ্যা-কাল, আমি একাকিনী—গৃহে আলোক জ্বালিতেছিলাম, এই সময় তিনি আসি-লেন। অতিথি জানিয়া আমি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে বসাইলাম—তিনি আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন—সখি, সে হাসি এখনও আমার হৃদয়ে লাগিয়া আছে।”

সুভদ্রার গাল রক্তিম হইল,—একটু লজ্জা হইল—বলিল “তারপর?”

মহাশ্বেতা বলিলেন,—“মাকে যাইয়া সংবাদ দিলাম, মা বলিলেন ‘আমি যাইতে পারিতেছি না, তুমি যাইয়া তাঁহার যথো-চিত সৎকার কর।’ আমি বাড়ী আসিয়া তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনাদির যায়গা করিয়া দিয়া ফল মূলাদি আহরণ করিয়া দিলাম।—তিনি সে সকল নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া আহারে বসিলেন। এইবার আলোর নিকটে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, পরাক্রম, উদারতা প্র-ভৃতি সংমিলিত হইয়া যে শোভা বিশিষ্ট হয়, সেই পূর্ণ শোভা আমি এই প্রথম দেখিলাম। অবাক্ ও স্তম্ভিত হইলাম, আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল—ঐরূপ ধীরে ধীরে যেন হৃদয়ে প্রবেশ করিল—ঐ সময়ে একবার চক্ষু মুদিলাম,—চক্ষু মুদিয়া দেখি, হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে—চাহিলাম, দেখি তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন—আমার লজ্জা করিল।

“তিনি আমাকে বলিলেন। ‘হীন বেশ তাপস দেখিয়া কি ঘৃণা করিতেছ?’ আমি কিছু বলিতে পারিলাম না। কিন্তু মনে মনে বলিলাম ‘তুমি রাজার রাজা, ও হীন বেশ নহে, ঐ রাজ বেশ।’

“এই সময়ে পৃথিবী মহামেঘ-ঘোরা হ-ইল। বাতাস বহিল, ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল।—আমার কি হইল, গৃহা-ন্তরে যাইলাম না। দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

“তিনি হাসিয়া বলিলেন, ‘ঝড় আ-মার উপকারি। ঝড় না হইলে আমাকে একাকী থাকিতে হইত’। আমি কথা কহিতে পারিলাম না, হাসিলাম। হাসি দেখিয়া তাঁহার সাহস হইল। বলিলেন, ‘সুন্দরি, আজি হইতে দেবারাধনা ছাড়িয়া তোমার আরাধনা করিব ইচ্ছা করিয়াছি’। আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল। এত কথা কহিতে জানি, কিন্তু পোড়ামুখে তখন একটা কথাও আসিল না। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধা হইয়া গেলাম। তিনি যাহা বলি-লেন, তাহাই করিলাম, তাহাই ভাল শুনি-লাম। শেষে জ্ঞান হইল, কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম, বলিলাম ‘আর্য্য আমার সর্ব্বনাশ হইল, কি উপায় হইবে’?

"তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই' তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, আমি তোমার স্বামী, ঈশ্বর সাক্ষাতে যজ্ঞোপবিত ধারণকরিয়া বলিতেছিতোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। বিবাহ যত দিন না হইবে, দুই দিন পরে এক দিন তোমাকে নিয়ত দেখা দিব'। এই বলিয়া তাহার থর্গীচর্ম্মের অঙ্গুরী আমায় পরাইয়া দিলেন, এই দেখ সে অঙ্গুরী।"

সুভদ্রা শিহরিয়া বলিল, 'তোমার মত তেজস্বিনী রমণী এত সহজে গলিয়া গেল ইহাই আশ্চর্য্য।'

মহাশ্বেতা হাসিয়া বলিলেন, সে যে অনন্ত অসীম বিষম তেজ। সুভদ্রে, সকলেই কি সকলের জন্য জন্মিয়া থাকে? সোহাগেই স্বর্ণ গলিয়া থাকে, কঠিন স্বর্ণ আর কে গালিতে পারে? বিধাতা আমাকে তাঁহারি জন্যই গড়িয়াছেন।

সুভদ্রা বলিল 'তিনি এখানে আসিলে তুমি কিরূপে জানিতে পার'?।

মহাশ্বেতা হাসিয়া বলিলেন, 'তিনি দুদিন পরে একদিন সন্ধ্যা সময়ে আসিয়া থাকেন'।

সুভদ্রা বলিল, তাছাড়া যদি আসেন?

মহাশ্বেতা বলিলেন, তাহা হইলে একটি অশোক পল্লব কোন উপায়ে আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন তবেই আমি জানিতে পারি'।

সুভদ্রা বলিল—'যদি আর কেহ এইরূপে প্রতারণা করে?'

'না সুভদ্রে! তুমি বৈ একথা আর কোন লোকে জানে না'—এই বলিয়া মহাশ্বেতা হাসিতে লাগিলেন।

সুভদ্রা বলিল, 'সখি, আমি বুঝি মরিব —কালি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমাকে যেন একটা ভূতে ধরিয়া গলা টিপিয়া মারিতেছে।'

মহাশ্বেতা বলিলেন—'স্বপ্ন যে দেখে, তার না ফলিয়া আর এক জনের ভাগ্যে ফলিয়া থাকে। হয় ত আমিই মরিব।'

তবে তোমার তপস্বীকে আমায় দিয়া যাইবে কেমন? সুভদ্রা এই বলিয়া হাসিতে লাগিল, মহাশ্বেতাও হাসিতে লাগিলেন।

এমন সময় নিকুঞ্জের পশ্চাদ্দেশে লতা গুল্ম কাঁপিয়া উঠিল, সুভদ্রা চমকিয়া বলিল 'সখি নিকুঞ্জ কাঁপিয়া উঠিল কেন, বুঝি কোন বন্য জন্তু আসিয়া ইহার সহিত গাত্র ঘর্ষণ করিতেছে।'

মহাশ্বেতা দেখিলেন যথার্থই নিকুঞ্জ কম্পিত হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন, বলিলেন, 'সুভদ্রা শীঘ্র বাহির হইয়া আয়।'

সুভদ্রাও বাহির হইয়া আসিল। উভয়ই ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র রঙ্গস্থলাভিমুখে চলিলেন। মহাশ্বেতা কুঞ্জের চারিদিকে দেদেখিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, সুভদ্রার ভয়ে তাহা পারিলেন না।

কুমারকুমারীগণ রঙ্গস্থলে আসিবার পূর্ব্বে দুইটি বিদেশী লোক এই স্থানে আসিয়াছিল, ইহার একজনের নাম ভীমদণ্ড. আর একজনের নাম শিলাসিংহ। ভীমদণ্ড এদেশের আচারনীতি অনেকটা অবগত

ছিল, তাহাতেই আজি উৎসব এবং কুমারী গণকে দেখিতে পাইবে বলিয়া আসিয়া ছিল। ভীমের আর একটি গুপ্ত অভিসন্ধিও ছিল। সেটি এই,—

ভীম অনেক দিন হইল একবার ভাস্তি জনপদে প্রচারক সঙ্গে আসিয়া মহাশ্বেতার রূপ-মাধুরীতে বিমোহিত হইয়াছিল, তখন অভিষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় করিতে পারে নাই। ইহার পরেও আরো দুই তিন বার মহাশ্বেতাকে দেখিবে বলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কোন উপায়ে তাহা পারে নাই। রমণী কে, বাটি কোথায় বা উহার নাম কি, জানিতে না পারিয়া এই সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল। তদনুসারে বান্ধব শিলাকে সঙ্গে করিয়া অদ্য আসিয়াছে। লুক্কাইত থাকিয়া রমণীগণের মুক্ত রূপরাশি দেখিবে এবং মহাশ্বেতা আসেন কিনা তাহাও দেখিবে এইজন্য নিকুঞ্জ পশ্চাতে সুবিধাজনক স্থান দেখিয়া লুকাইয়াছিল। এবং সৌভাগ্য বশতঃ আশাতিরিক্ত ফল লাভও করিল।

ভীম একান্ত আনন্দিত হইয়া মনে মনে বলিল এখন একটি অশোকপল্লব দিয়াই এতদিনের পোষিত আশা পূর্ণ করিতে পারিব। মনের কথা শিলাকে কিছুই জানাইব না।

শিলা—বলিল, 'ভীম দেখিয়াছ ঐ মেয়েটি, যার নাম সুভদ্রা, বড় সুন্দরী'।

ভীম বলিল, 'তুই বড় সুন্দরী চিনিস'।

শিলা- 'তুমি কি তবে ঐটিকে সুন্দরী বল'।

ভীম—'সহস্রবার'।

শিলা,—'তা হোক, আমার মনের মত ঐটি'।

ভীম,—'চল এখন যাই'।

শিলা,—'খেলা দেখিব না'?

ভীম,—'পরস্ব আসিয়া দেখিব'।

শিলা,—'আজ তবে কিজন্য আসিলাম?'

ভীম,—'না ভাই, সেনাপতি জানিলে বিপদ ঘটিবে চল'।

শিলা অসন্তুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তবে চল, তোমার সঙ্গে আর কোথাও যাইব না'।

ভীম হাসিয়া বলিল, 'তুমি রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছ আগে জানিলে তোমাকে আনিতাম না, চল' এই বলিয়া প্রস্থান করিল। শিলা ভীমের অনুগত এবং উপকৃত, সুতরাং আর কিছু না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন বৈকালে পুনরায় খেলা আরম্ভ হইয়াছে। কুমারীগণ কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে, এমন সময়ে এক অপরিচিত লোক তথায় উপস্থিত হইল। হঠাৎ অপরিচিত লোক দেখিয়া কুমারীগণ লজ্জিত হইয়া সকলে এক দিগে সরিয়া গেল। বালকেরা মল্ল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণেকের জন্য তাহাকে দেখিতে লাগিল।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল, 'আমি অদ্য

তোমাদের মল্ল দেখিয়া কল্য আবু যাইব। এজন্য অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, তোমরা থামিলে কেন, লজ্জা কি?'

আগন্তুকের এই কথা শুনিয়া বালকগণ অধিকতর সাবধান এবং কৌশলের সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিল।

এদিকে আগন্তুক একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া দেখিতে লাগিল।

আগন্তুক অপরিসীম দীর্ঘ কলেবর এবং তদনুরূপ স্থূল। স্কন্ধ উহার মহিষের ন্যায়, বক্ষ সিংহের ন্যায়, হস্ত পদ লৌহতুল্য দৃঢ়। চক্ষু ক্ষুদ্র হইলেও অত্যুজ্জ্বল, মুখমণ্ডল নির্ম্মল না হইলেও কুৎসিত নহে। বর্ণ নগৌর নশ্যাম। ফলতঃ এই ব্যক্তিকে সহসা দেখিলেই বীরলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। আগন্তুকের বয়স যতই হউক, উহাকে ত্রিশ কি বত্রিশ বৎসরের অধিক বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

কুমারীগণ উহার শারীরিক গঠন দেখিয়া একটু প্রীত হইল। সুভদ্রা এত সন্তুষ্ট হইল যে, মহাশ্বেতার কাণে কাণে বলিল, 'অর্ব্বুদে গেলে এ ব্যক্তি অবশ্যই মালাচন্দন পাইবে। ইহাকে সিংহের মত বলবান্ দেখা যাইতেছে।'

মহাশ্বেতা হাসিয়া বলিলেন, 'না সুভদ্রে, অর্ব্বুদে অনেক দেশের বড় বড় বীরপুরুষ আসিয়া থাকে, মল্ল না দেখিয়া বীরত্বের কথা কে বলিতে পারে?'

মহাশ্বেতা হাসিয়া কথা বলিবার সময় আগন্তুকের দিকে একবার চাহিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তাহার চক্ষুও মহাশ্বেতার প্রতি স্থাপিত ছিল, সুতরাং হঠাৎ চারি চক্ষু একত্র হইল—আগন্তুকও একটু হাসিল। মহাশ্বেতা লজ্জা পাইলেন।

পরস্পর সহাস্য দৃষ্টি সকলেই দেখিতে পাইল। ইহাতে মহাশ্বেতার সমবয়স্কাগণ সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া একটু বক্রহাসি হাসিল। মহাশ্বেতা ইহাতে অধিকতর লজ্জিতা হইলেন।

এদিকে আগন্তুক মনে করিল, 'যে ভাব দেখিতেছি ইহাতে বোধ হয় পল্লবের প্রয়োজন না হইতেও পারে—যাহা হউক ইহাদিগের নিকট একটু বাহবা লইতে হইবে।' কিছুকাল পরে দাঁড়াইয়া বলিল, 'তোমরা এতক্ষণ খেলাইতেছ, দেখি তোমাদের গায়ে কত বল, এই পাথরখানা টানিয়া আন?—এই বলিয়া যে প্রস্তর খণ্ডে স্বয়ং বসিয়াছিল তাহাই দেখাইয়া দিল।

বালকেরা এক জন দুই জন তিন জন করিয়া ক্রমে দশ বার জনেও টানিয়া আনিতে পারিল না। আগন্তুক ইহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। একটি বালক বলিল, 'তুমি টানিয়া আনতো দেখি?'

আগন্তুক সহাস্যবদনে অনায়াসে সেই বিপুল প্রস্তর হস্তে তুলিয়া বলিল, 'ছুড়িয়া দিলে ধরিতে পারিবে?'

বালকগণ একান্ত বিস্মিত হইল। ইতিমধ্যে আগন্তুক ঐ প্রস্তর ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিয়া পৃষ্ঠে, বক্ষে এবং বাহুতে আঘাত সহ্য করিতে লাগিল।

এই অসম্ভব শারীরিক সামর্থ্য দেখিয়া কুমারীগণ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

সুভদ্রা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল— ‘আমিতো আগেই বলিয়াছি এ অসাধারণ বলবান্।’

মহাশ্বেতা বলিলেন, ‘চল ঘরে যাই রাত্রি হইয়া আসিল।’ খেলা ভঙ্গ হইল সকলে গৃহাভিমুখে চলিল।

সকলে চলিয়া গেলে, আগন্তুক তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া স্বতন্ত্র পথ ধরিল। ইহাতে সকলে মনে করিল, এ ব্যক্তি যেমন বলবান্, তেমনই সাহসী। একাকীই রজনীযোগে অর্ব্বুদে চলিল।

বলা বাহুল্য যে আগন্তুক আর কেহ নহে,সেই ভীমদণ্ড। ভীমদণ্ড যখন দেখিতে পাইল যে, আর কেহ পথে নাই তখন পুনরায় ফিরিয়া আসিল। এবং একটি অশোকতরু অন্বেষণ করিয়া একটি পল্লব ভাঙ্গিয়া আনিল। পরে নিঃশব্দে ভাক্তি জনপদে প্রবেশ করিল। এই সময় এক বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশ্বেতার বাড়ী কোথায়?’

বৃদ্ধা বলিল ‘কেন অতিথি হইবে?’ ভীম বলিল, ‘না, মহাশ্বেতার আজি বিপদ্ দেখিতেছি তাই কিরূপে সাবধান করিব বুঝিতে পারিতেছি না।’

বৃদ্ধা সবিস্ময়ে বলিল ‘কি বিপদ্?’

ভীম বলিল ‘সর্পদংশন’।

বৃদ্ধা তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ‘কিরূপে বুঝিলে?’

ভীম বলিল, ‘বুড়ি তোমার পুণ্যের বলে আমার সহিত দেখা হইল, আমি পৃথিবীর আদি অন্ত সকলই জানি তুমি প্রশ্ন করিও না, অবিশ্বাস করিও না, যাহা বলি তাহা কর, অন্যে জানিলে তুমি সবংশে নাশ হইবে। সাবধান, এই পল্লব গ্রহণ কর, শতবার কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু বলিবে না, বলিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, এই পল্লব এখনই মহাশ্বেতার হস্তে দিবে। তাহাকেও কিছু বলিবে না, সাবধান, সাবধান, সাবধান। এই বলিয়া পল্লব মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ভীম এত শীঘ্র একটি বৃক্ষান্তরালে লুকাইল যে, বৃদ্ধা পল্লব তুলিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

কুসংস্কারসমাচ্ছন্না বৃদ্ধা ইহাতে বড় ভয় পাইল, মনে ভাবিল এদেবতা ব্যতীত আর কিছু নহে। পরে ভক্তিপূর্ণমনে প্রণাম করিয়া বলিল, ‘মহাদেব তোমাকে পাইয়াও হারাইলাম, এত শীঘ্র অন্তর্ধান হইলে বাবা!’—এই বলিয়া মহাশ্বেতার নিকট চলিল।

মহাশ্বেতা আগ্রহসহকারে পল্লব গ্রহণ করিলেন, বৃদ্ধাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। বৃদ্ধা ইহাতে আরো বিস্মিতা হইয়া আপন গৃহাভিমুখে গমন করিল।

বৃদ্ধা গমন করিলে মহাশ্বেতা পল্লবটি সযত্নে কতবার হৃদয়ে ধারণ করিলেন, কত বার চুম্বন করিলেন। পরে দ্রুতপদে নিকুঞ্জাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে কে গান করিতেছিল তাহার দুইটি পদ নরাঙ্কিতের ন্যায় মহাশ্বেতার কর্ণে প্রবেশ করিল।

—‘আজি তোর ডুবিল লো সুখের তপন।
ডুবিলি বিষাদ ঘোরে নাহি লো মোচন॥’

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভীমদণ্ড ইত্যবসরে নিকুঞ্জের নিকট আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মনে একবার ভয়, একবার ভাবনা এবং আহ্লাদ হইতে লাগিল। আপনা আপনি বলিল, 'আমার অদৃষ্ট ভাল, অভীষ্টসিদ্ধি পক্ষে কিছুই আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, যদি এ রূপবতী রমণী অদৃষ্টে ঘটে, তবে ইহাকে কোথায় রাখিব?—না হয় বৌদ্ধধর্ম্ম ছাড়িয়া ইহাকে লইয়া সংসার করিব। ইহাকে হৃদয়ে করিয়া যে অবস্থায় যেখানে থাকিব তাহাই আমার স্বর্গবাস তাহাই নির্ব্বাণের শান্তিভবন হইবে।'

এমন সময় অদূরে একটি ছায়া মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল, মূর্ত্তি ক্রমেই নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া দুরাচার ভীমের আর আনন্দের সীমা রহিল না—আহ্লাদে অধীর হইয়া কিছু নৃত্য করিল। পরে ভাবিয়া দেখিল, বাহিরে থাকিলে বাসনা সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, রমণী তাহাকে চিনিতে পারিবে। সুতরাং আঁধারপূর্ণ নিকুঞ্জমধ্যে যাইয়া উপবেশন করিল।

এদিকে মহাশ্বেতা উপস্থিতা হইয়া একেবারে নিকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কোমল বাহুলতায় ভীমকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভীম অধীর ও অসহিষ্ণু হইয়া তাহার সুকোমল গণ্ড এবং বিম্বাধরে আপন কর্কশ মুখ স্পর্শ করিল। এ গণ্ড তেমন কোমল, তেমন মসৃণ নয়,—এযে কণ্টকবৎ বিদ্ধ হয়!!! মহাশ্বেতার সন্দেহ ও ভয় হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি ভীমপাষাণ ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইলেন।

ক্ষুধিত-ক্ষিপ্ত সিংহ বহুকাল পরে আহার জন্য কোমলপ্রাণ একটি শশক ধরিয়াছে, সেই শশক পলাইবার চেষ্টা করিল, সে ভয়ঙ্কর সিংহ কি কখন ত্যাগস্বীকারে সমর্থ হয়!!!

ভীম পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, মহাশ্বেতা অগ্রে অগ্রে দৌড়িলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাশ্বেতা বাটির দিকে না দৌড়িয়া বিপরীত দিকে দৌড়িতে লাগিলেন। রজনী জনমানবশূন্য, অনন্তপ্রসারি পথ, কত দৌড়িবেন, যে কোমলপদে দূর্ব্বাদল বিদ্ধ হয়, সে পায়ে কত সহিবে। তথাপি প্রাণের ভয়ে, ধর্ম্মের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন।

ভীমের চক্ষুতে রক্ত ছুটিতেছে, নিঃশ্বাসে প্রজ্বলিত বাষ্প বাহির হইতেছে। ক্রোধে শরীর দ্বিগুণ স্ফীত হইয়াছে। দণ্ডে দণ্ডে করকা শব্দ হইতেছে। পদাঘাতে লতাগুল্ম দলিত হইতেছে। উপলরাশি বিষম শব্দে চূর্ণীভূত হইতেছে। মত্ত করী কিংবা ক্ষিপ্ত গণ্ডারের ন্যায় মহাবল ভীম ভয়ঙ্কর দৌড়িতেছে।

হায়, কোথায় আরাবলী আর কোথায় পার্ব্বতী!! মহাশ্বেতা পার্ব্বতীতীরে আসিয়া আর পথ পাইলেন না। সম্মুখে বিপুল স্রোত পাষাণ ভেদ করিয়া গঙ্গায় ছুটিতেছে। মহাশ্বেতা সেই মহাস্রোতে

ডুবিবার জন্য প্রায় বিংশতি হস্ত উর্দ্ধতীর দেশ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, শূন্যে দুলিতে লাগিলেন, পড়িতে পাইলেন না। ভীমের বিশাল লৌহহস্তে তাঁহার উন্মুক্ত কেশরাশি ধৃত রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভীম তুলামুষ্টির ন্যায় তাহাকে কেশ ধরিয়া উঠাইল।

মহাশ্বেতা গলদেশে এবং মস্তকে বিষম বেদনা পাইলেন। কাহারই কথা কহিবার সাধ্য নাই। ভীম মহাশ্বেতাকে ধরিয়া গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার শরীর বহিয়া জল ধারার ন্যায় ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে।

মহাশ্বেতাও পরিশ্রান্ত হইয়া ভীমের পদমূলে বসিয়া পড়িয়াছেন, তাহার কেশাগ্র ভীম-করে।

কিছুকাল পরে মহাশ্বেতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিলেন "ছাড়িয়া দাও"। ভীম বলিল, 'তুমি ছাড়িয়া দিবার বস্তু?' মহাশ্বেতা বলিলেন, একটু নরম হইয়া বলিলেন, 'আমি বিবাহিতা, তাহা না হইলে তোমার বাসনা পূর্ণ হইত, তোমাকে অযোগ্য পাত্র মনে করিতাম না, কিন্তু এখন কিছুতেই তোমার ইচ্ছার দাসী করিতে পারিবে না—ছাড়িয়া দাও, তুমি বীর, তোমার মহত্ব থাকা উচিত।'

ভীম বলিল, 'রূপসি, আমি তোমাকে বিবাহ করিব, পূর্ব্বগুপ্তপ্রণয়জন্য যে অপরাধ তাহা ক্ষমা করিব। তুমি এখনও অবিবাহিতা।'

মহাশ্বেতা বলিলেন, 'অধর্ম্ম করিও না'।

ভীম বলিল, 'অধর্ম্ম করিলে যদি সুখ হয় তবে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তেমন অধর্ম্ম করিয়া থাকি।'

মহা। 'তবে আমি পিশাচের হস্তে পড়িয়াছি।'

ভীম। 'এই পিশাচকে দেবতা বলিয়া মানিতে হইবে।'

মহা। তোমার মাতা ভগিনী এরূপ বিপদে পড়িলে তুমি কি তাহাদের শত্রুকে উৎসাহ দিয়া থাক?'

ভীম। যে তোমার প্রণয়ে পাগল, সে কিরূপে শত্রু হইবে। এস কেন আর আমাকে কষ্ট দাও।'

মহাশ্বেত দেখিলেন, কাকুতি মিনতি কি ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়াও ইহার হস্তে আজি নিস্তার নাই, সুতরাং আচ্ছাদিত ক্রোধানল মুক্ত করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দে গভীর নিনাদে বলিলেন, 'নরাধম জানিস্ না, আমি সামান্য স্ত্রীলোক নই। ক্ষত্রিয় রক্ত মাংসে এ শরীর গঠিত। হাতে অস্ত্র থাকিলে তোর মত শত শত কুকুরকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম। তথাপি সাহস করিয়া বলিতেছি তুই কদাপি বলে আমার সতীত্ব হরণ করিতে পারিবি না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমি আমার সতীত্ব রক্ষা করিব।' এই বলিয়া এরূপ বলে ভীমের কটীদেশে পদাঘাত করিলেন যে, ভীম বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া অমনি চিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মহাশ্বেতা তখনই উহার চক্ষের উপর বসিয়া দুই হস্তে গলা চিপিয়া ধরিলেন।

ভীম প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখিয়া ক্রোধে ও বেদনায় আপন লৌহমুষ্টি বিষম বেগে মহাশ্বেতার সুকোমল গ্রীবা দেশে ক্ষেপণ করিল। বালা বেদনায় হস্ত পরিত্যাগ করিলেন—ভীম তখনই মহাক্রোধে উঠিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

মহাশ্বেতা তথাপি ভীমের হস্ত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেন না।—মরিবার জন্য শরীর ছাড়িয়া দিলেন। ভীম শীঘ্র ছাড়িল না, যখন দেখিল মহাশ্বেতার চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত জিহ্বা বাহির হইয়াছে তখন পরিত্যাগ করিল। মহাশ্বেতা বৃন্তছিন্ন পুষ্পের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া রহিলেন।

নিষ্ঠুরের তথাপি দয়া হইল না। নির্দ্দয়, নির্ম্মম, পাষাণ, পশু তথাপি দুঃখ করিলনা—দুঃখিনী সতীর বীরত্বের প্রশংসা করিল না,—হায় হায় ঐ দেবদুর্লভ, পবিত্র মৃত দেহের অসম্মান করিল!!—নীচাশয় পরে এহেন স্বর্ণপ্রতীমা জলে ডুবাইয়া প্রস্থান করিল। একবার দেখিল না বাঁচিবে কি না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে মহাশ্বেতাকে অনাগত দেখিয়া তাহার মাতা সুভদ্রার বাড়ী গমন করিলেন। মহাশ্বেতা তথায় নাই। ক্রমে একে একে সকল বাড়ী খুজিলেন, মহাশ্বেতা নাই। সকল বাড়ীর লোক একত্র হইল, সকলে মিলিয়া কত তল্লাস করিল,—এইরূপে রজনী প্রভাত হইল, এক দিন গেল, দুই দিন গেল, মহাশ্বেতা আসিল না। মহাশ্বেতার জন্য ভাস্তি বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইল।

যে বৃদ্ধার সহিত ভীমের দেখা হইয়ছিল তাহার ভীমের প্রতি এখন সন্দেহবোধ হইতে লাগিল। ভাবিল—হয় সর্ব্বনাশ হইবে—মহাশ্বেতার মাকে সকল বলিব, তাহার ক্রন্দন সহ্য হয় না। সুতরাং সকল কথা তাহাকে বলিল।—সেই সময়ে একটি বালক নিকুঞ্জে একটি উষ্ণীষ পাইয়া আনিয়া দেখাইল, কুমারীগণ দেখিয়া চিনিতে পারিল, এ উষ্ণীষ অপরিচিত সেই আগন্তুকের। আগন্তুক তবে কে?—উষ্ণীষের বন্ধন প্রণালী এবং বর্ণ দেখিয়া বৃদ্ধগণ বলিল, তাহারা এরূপ উষ্ণীষ, দৈত্য গণের মস্তকে দেখিতে পাইয়া থাকেন—সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই দৈত্যদিগের উষ্ণীষ। ইহার পর সকলে এক বাক্যে বলিল 'মহাশ্বেতাকে তবে দৈত্যগণই চুরি করিয়াছে।' ইহা শুনিয়া মহাশ্বেতার মা একবারে হতাশ, এবং উন্মাদপ্রায় হইলেন,—শত সান্ত্বনায় ও আর প্রকৃতিস্থ হইলেন না। অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া কেবল রোদন করিয়া দিন যামিনী কাটাইতে লাগিলেন।

বিপদ্ একাকী আইসে না, অন্য বিপদকে ডাকিয়া আনে। কয়েক দিন পরে আর এক বিষম বিপজ্জনক সংবাদ আসিল, 'বিদেশে মহাশ্বেতার পিতা দৈত্য সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছেন।'

বিপদের উপর এই বিপৎপাত হওয়াতে মহাশ্বেতার মাতা সম্পূর্ণরূপে উন্মাদ হইলেন। কত চিকিৎসা, কত সুশ্রূষা কিছু-

তেই আর ভাল হইলেন না। কত দিন উন্মাদকে বান্ধিয়া রাখিতে পারা যায়? স্বামিসন্তানশোকাকুলা রমণী কাননে, কান্তারে, জঙ্গলে, নদী-তীরে, শৈলশিখরে, এবং পর্ব্বত-শৃঙ্খলে,—'হায় মহাশ্বেতে, হায় মহাশ্বেতে' বলিয়া রোদন করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। শেষে ভাস্তিজনপদে তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

তিনি দূরস্থানে পর্ব্বতে ও বন জঙ্গলে বিচরণ করিতে লাগিলেন, রজনীযোগে পথিকগণ কি গৃহস্থগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রেতাত্মা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে শাখাপল্লববিশিষ্ট হইয়া এই উন্মাদিনীর কথা ছড়াইয়া পড়িল। কেহ ভূত বলিয়া তাঁহাকে ভয় করিতে লাগিল, কেহ দেবতা বলিয়া তাঁহার নামে পূজা দিতে আরম্ভ করিল।—এইরূপে বহু কুসংস্কারাপন্ন নরনারীর হৃদয় তিনি ভয়ভক্তিতে অধিকার করিলেন।

অগ্নিকুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শমীকানন।

সুবিখ্যাত অর্ব্বুদাচলের দুই ক্রোশ দূরে শমীকাননে একটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী চরিতেছে। নবদূর্ব্বাদল চর্ব্বণ করিতেছে, আর এক এক বার কাণ তুলিয়া শুনিতেছে—কি শুনিতেছে? মধুর ধ্বনি,—এ প্রিয় জনের কোমল কণ্ঠরব,—তাই শুনিতেছে।

বায়ুর বিপরীত দিক্ হইতে ধ্বনি হইতেছে। সুতরাং তরঙ্গে নাচাইয়া,বায়ু সকল কথা গাভীর কাণে আনিতেছে না। স্বর যখন পঞ্চমে ঝঙ্কার দিতেছে, তখন কেবল কিছু কিছু শুনা যাইতেছিল মাত্র। গাভী মানবী হইলে শুদ্ধ স্বরকাকলী শুনিত না, অন্ততঃ বুঝিতে পারিত—

মুছিনু যামিনী-গগণ-মসী,
লিখিনু, ভানুরূপ পরকাশি,
ছড়াইনু অমৃত দশ দিশি,
জানি কিবা অমৃতে জ্বলিবেরে গলিত আগুন
নিশি মসী ছিল ভাল ভানুতে করিল কিগুণ।
ভানু হ'তে ভাল শশী
হতইত পূর্ণমাসী।
শুধুই থাকিলে বসি
তবে কেন হায় আমি করি এত আয়োজন
মুছিনু যামিনী আহা, ভানু করিনু অঙ্কন।

একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক এই সময় গোচারণ স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। গাভী তাহাকে চিনিয়া তাহার গা চাটিতে আসিল। বালক কিছুকাল দাঁড়াইয়া কণ্ঠবর লক্ষ করিল,পরে একটুকু হাসিয়া সেইদিগে চলিল। গাভী ঘাস ছাড়িয়া সঙ্গে চলিল।

শৈবগণ যে শ্লোকটি দ্বারা শিবের ধ্যান কহেন, এ অসাধারণ বালকের রূপবর্ণন তাহা পাঠ করিলে, বা লিখিলেই হইতে পারে। তবে ইহার মাথায় জটা, ত্রিনয়ন, কিংবা অঙ্গে বিভূতি, পঞ্চবক্ত্র নাই, এবং বাঘ ছালে কটী আটা নহে। পরিধান কৃষ্ণাজীন,হস্তে কমণ্ডলু এবং ফুল বিল্বপত্র।

অধিকদূর যাইতে হইল না। নিকটেই সুকণ্ঠের উৎস। এ মনোহর উৎস,—মোমগঠিত জীবিত কন্যা। বনদেবী, যোগে-

শ্বরের যোগিনী, বা নারায়ণ-সোহাগিনী বাল সরস্বতী। বয়েস সবে তের বৎসর, যৌবনের কলিকা, প্রীতির সুগন্ধ গোলাপ। চুলের ডালি বিছাইয়া একটি বালিকা নীলগগণ-পটে শরতের শশীর মত শুইয়া আছে। পরিধান সুকোমল মৃগছাল। গাছের শিকর তাহার উপাধান হইয়াছে। বালা বৃক্ষ-পত্রের ফাঁক দিয়া আকাশ দেখিতেছে, আর যাহা মনে লইতেছে তাহাই গাইতেছে।

এমন সময় বালক আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল, বালার অমনি কণ্ঠরোধ হইল। একটু হাসিয়া উঠিয়া বসিল। হাসির আবেগে গোলাপী গালে একটু টোল পড়িল। মুখচ্ছবি উহাতে শতগুণ বাড়াইল।

বালক নিটোল গালের টোলে অঙ্গুলী ছুয়াইয়া বলিল, 'মুছিনু যামিনী গগণমসী' না, কি গাইতেছিলে?'

বালা হাসিয়া বলিল 'আমার মাথা আর মুণ্ড। আজকার দিনটা যে গরম হয়েছে?' বালক বলিল "ও তাই বুঝি 'নিশি-মসী পুছিয়া যে ভানু পরকাশ' করেছিলে, তা গরম লাগে ব'লে দুঃখ করা হচ্ছিল?"

বালিকা ইহাতে রাগিয়া বলিল 'তা আবার বলিলে আমি কিন্তু ছুটিয়া পালাব' বালক বালিকাকে আরো রাগাইতে চাহিল ও ভাল বাসিল, হাসিয়া আবার কহিল

'মুছিনু যামিনী গগণ মসী'।
'লেখিনু ভানুরূপ পরকাশি'॥
ছড়াইনু অম্--ৎ—' অমনি বালিকা সিংহীর ন্যায় লম্ফ দিয়া দুই হস্তে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, বালকের হস্তস্থিত ফুল বেলপাতা পড়িয়া গেল। গাভী তাহা চর্ব্বণ করিতে লাগিল।

বালিকা অপ্রস্তুতা হইয়া মুখ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, মনে মনে ডরাইল, মুখে তাহার ছায়া পড়িল। বালক গম্ভীর স্বরে বলিল 'গায়ত্রি, এই তোমার কাজ, ফুল বিল্লপত্র ফেলিয়া দিলে?'

বালিকার নাম গায়ত্রী। গায়ত্রী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'তুমি রাগ করিও না, আমি এখনই কুড়াইয়া দিই'। বালক বলিল 'তোমার বুদ্ধি নাই, ফুল মাটিতে পড়িয়াছে, গাভী উহা খাইতেছে, ঐ ফুলে কি দৈব কার্য্য হয়ে থাকে? আজ পূজায় ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, অবশ্য কোন বিপদ্ হইবে'।

গায়ত্রী এবার আরো ভয় পাইল। কাঁদিয়া ফেলিল। বালক তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য হাসিয়া বলিল, 'ফুল ফেলিয়াছ, বেশ করিয়াছ। আমি এখনই আর ফুল আনিতেছি, তার জন্য দুঃখ কি'?

গায়ত্রী কি মনে করিয়া ছুটিয়া পলাইল, গাভী পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। গায়ত্রীর গোচারণ হইল না।

বেলা প্রায় দেড় প্রহর। বালক অবগাহনে চলিল। দ্বিতীয় স্নানান্তে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া তাহাকে সমাপন করিতে হইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি ফুল পত্র আহরণ করিয়া স্নানে চলিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শমী কানন সুদীর্ঘ,সুপ্রশস্ত। একদিকে একজন মনুষ্য সবলে চীৎকার করিলে অপর দিগ হইতে শুনা যায় না। গায়ত্রী যখন ছুটিয়া পলাইল, ঠিক্ ঐ সময় দুইজন লোক আর একদিগ হইতে আসিতেছিল। পথে গায়ত্রীর সহিত দেখা হইল। তাহারা কি বলিবে বলিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে বলিল। গায়ত্রী কর্ণপাত না করিয়াই চলিল, একজন দৌড়িয়া তাহাকে ধরিল। গায়ত্রী তাহার হাতে বিজাতীয় দংশন করিল,রক্তপাত হইতে লাগিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া যেই তাহার চুল ধরিবে, অমনি তাহার সঙ্গী বলিল 'বালিকাকে দুঃখ দিও না, ক্রোধ সংবরণ কর, বেদনা সহ্যকর'। ইহাতে সে কিছুই না বলিয়া বালিকাকে ছাড়িয়া দিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিকটে আসিয়া বলিল 'ই মা-ই! ভয় নাই, আমরা একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর দিয়া চলিয়া যাও।

গায়ত্রী অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল দুইজন বলবান্। উভয়ে বস্ত্রাবৃত, একজনের হাতে একটি ক্ষুদ্র নিশান ও এক খানি তালপত্রের পুঁথি। নিশান সর্পলাঞ্ছিত। আর একজনের হাতে একখানি বড় লাঠি। যাহার হাতে পুঁথি তিনি বলিলেন, 'নিকটে কোন জলাশয় আছে কি না বলিয়া দাও, আমাদের বড় পিপাসা হইয়াছে। সরলা গায়ত্রী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "জল পান করিবে, শিব পূজা করিয়াছ ?" পুস্তকধারী এ কথায় একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, 'মা-ই! পিপাসুক পথিককে জলের কথা বল, আমরা তোমার সন্তান হইলে অত কথা না বলিয়া এখনি ক্রোড়ে লইয়া দুগ্ধপান করাইতে না ?' বালিকা লজ্জা ও স্নেহ জানে না,তথাপি কথা মিষ্ট শুনিল। তথাপি ক্ষুদ্র মস্তক নমিত করিল, প্রতিপদের চাঁদের মত একটু হাসিয়া পথ দেখাইয়া বলিল 'সোজা যাও, অস্থলও স্নানে গিয়াছে'।

লোক দুইটি সেই পথে চলিল,অস্থলকে বুঝিতে পারিল না, ভাবিল বালিকার কেহ হইবে। অস্থল সেই অষ্টদশ-বর্ষীয় বালক।

যে দুই জন লোকের কথা বলা হইল, ইহারা বৌদ্ধ—একজন প্রচারক আর এক জন তাহার সহকারী। ইহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করা, জাতিভেদ নষ্ট করা এবং হিন্দুধর্ম্ম ও বৈদিকক্রিয়া লোপ করা। ইহাদের বিজয়-নিশান সর্ব্বত্র উড়িয়াছে। ইহাদিগের শুক্রনীতি সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অটল হিন্দু বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহার প্রতি জিহ্বাগ্র প্রদর্শন করিতেছে। যেখানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ বৌদ্ধপ্রচারক একবার গমন করিয়াছে, সেখানেই লোকসমাজ উহার বিশাল তাড়িতবেগে উদ্বেলিত, দিশাহারা হইয়াছে, ঐ সর্পলাঞ্ছিত হরিৎ পতাকা বই আর কিছু দেখিতে পায় নাই। কিন্তু ভৈরব হিন্দুধর্ম্ম এরূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচণ্ড ঝড়েও ইহা অকম্পিত। একদিগে হিন্দুদেবালয় বৌদ্ধমঠে পরিণত হইতেছে,

আর দিগে বৌদ্ধমন্দির হিন্দুদেবগৃহে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং বৌদ্ধগণ এখন এই প্রবল বিরোধী ধর্ম্মের মূলোৎপাটনে দৃঢ়কল্প হইয়া নানা উপায় স্থির করিতেছে।

বৌদ্ধনীতি, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধযুক্তি এবং বৌদ্ধবীর্য্য পুনঃ পুনঃ অটল হিন্দু-পাষাণে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, কিছুতেই কিছু হয় না। তথাপি বৌদ্ধগণ নিশ্চেষ্ট নহে। তাহাদের সমস্ত উদ্যম এখন অত্যাচারে পরিণত হইয়াছে। তাহারা দল বান্ধিয়া হিন্দুর তীর্থস্থান, ও হিন্দু পুণ্যক্ষেত্রের পীড়া উৎপাদন করিতেছে।

অর্ব্বুদ পর্ব্বত পুণ্যতীর্থ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ. তথায় মুনি ঋষিগণ সমিৎ কুশাদি আহরণ করিয়া হোম তপ ও যাগ যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন, বৌদ্ধগণ সেই স্থান মলমূত্রে অপবিত্র করিয়া রাখে। দেবমূর্ত্তি দেখিলে ভাঙ্গিয়া আইসে, দেবারাধনা দেখিলে তাহার বাধা জন্মায়। অন্ততঃ ইহাই তাহাদের এখন প্রিয়-কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এই জন্যই অতিবৃহৎ একদল বৌদ্ধ সসৈন্যে রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছে।

উল্লিখিত লোক দুইটি এই দলের। ইহাদের এক জনের নাম ধর্ম্মসহায়। ইনিই প্রচারক, অপরের নাম ভীমদণ্ড,—সেই ভীমদণ্ড।

জলাশয়ের পথ দেখাইয়া গায়ত্রী চলিয়া গেলে ভীমদণ্ড বলিল—

'এ ভাবে কত কালে কি হইবে, পশ্চাতে থাকিয়া ঢিল নিক্ষেপ করা পুরুষত্ব নহে।'

ধর্ম্মসহায় বলিলেন, 'তবে তুমি কি বল রক্তপাত করিতে?'

ভী। আবশ্যক হইলে তাহাই কর্ত্তব্য।

ধ। আবশ্যক, ধর্ম্মপ্রচার, যুক্তির বিচার।

ভী। ধর্ম্মপ্রচার আবশ্যক বটে, কিন্তু তজ্জন্য যুক্তির বিচার আবশ্যক নহে।

ধ। কেন?

ভী। যাহার বুদ্ধি বেশী তাহার যুক্তি শক্ত, আপনি পণ্ডিত আপনার যুক্তি শক্ত, কিন্তু হিন্দুমুনিগণ মধ্যে আপনার চেয়েও পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ ও কূটতর্কী আছে। তর্কে বিরোধ বৃদ্ধি হয়, বিশ্বাস নষ্ট হয়। যে বল অকাট্য, অদম্য, এখানে তাই প্রয়োগ করা উচিত বোধ হয়।

ধ। জীবহিংসা ও নরশোণিতপাত আমাদের ইচ্ছাবিরোধী। তবে যদি একান্তই হিন্দুরা অস্ত্র গ্রহণ করে, আমরাও বাধ্য হইব। এরূপ ইচ্ছা নহে, শোণিতপাত জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করি।

ভী। তবে আবুশিরে উঠিয়া চোরের মত অত্যাচার করিয়া আসি কেন?

ধ। চোরের মত কেন করিব, বীরের মত আদিষ্ট কার্য্য করিয়া আসি।

ভী। আদেশ পালন করি সত্য, কিন্তু বীরের মত নহে। এবার চলুন প্রধানের আদেশ লওয়া যাক্ যে, আমরা যথারীতি বিজ্ঞাপন করিব। এত দিনের মধ্যে এদেশ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে, আমরা বল-প্রয়োগে বাধ্য হইব।

ধ। অবশেষে ইহাই প্রয়োজনীয় বটে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, জলাশয় তটে উপস্থিত হইয়া তাড়াতাড়ি করপুটে জলপান করিল। উঠিবার কালে বামদিগে চক্ষু পড়িল—ভীমদণ্ড বলিল "মহাশয় দেখুন ফুল দিয়া পূজা করিতেছে,এই বুঝি সেই পাগল মেয়েটির 'অতুল' হইবে।"

ধর্ম্মসহায় দেখিলেন, অষ্টাদশবর্ষীয় মনোহর বালক নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করিতেছে। সম্মুখে মৃণ্ময় শিব, ফুল বিল্বদলে পূজিত ও সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি দুই তিন বার তাহাকে ডাকিলেন, পরে শরীর ধরিয়া ধাক্কাইলেন, কিন্তু বালক তেমনই রহিল, তাহার সংজ্ঞা নাই। তাহার অঙ্গুলি গ্রন্থিও চেষ্টা করিয়া ছাড়াইতে পারিলেন না। ইহাতে আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বালকের আত্মা বহির্জগৎ ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্য অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মসহায় তখন চীৎকার করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'এই কষ্টকর ধর্ম্মপালনে বালকও যখন পরমানন্দ ভোগ করে—তখন অনন্তকালে ইহা বিলয় পাইবে না!'

ভীমদণ্ড বলিল, 'হিন্দুধর্ম্ম কেবল কুহকপূর্ণ। ভেল্কী ও মায়াবিদ্যা শিক্ষাই এ ধর্ম্মের শেষসীমা—আমি কিছু তামাসা করিতেছি দেখুন'—এই বলিয়া সপাত্র শিব-ফুল-বিল্বদল উঠাইয়া জলে ফেলাইল। এবং অতুলকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া জলে ডুবাইল।

ধর্ম্মসহায় বলিলেন, 'কি করিলে, ইহার প্রাণ যাইবে শীঘ্র উঠাও।'

ভীমদণ্ড হাসিয়া বলিল, 'চিন্তা নাই মরিবে না, আপনি উঠিবে, কতক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিবে?'

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় গায়ত্রী ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় দৌড়িয়া আসিল। তাহার হাতে ফুলবিল্বপত্র। ললাট ও দক্ষিণ হস্ত ক্ষত হইয়া শোণিতধারা পড়িতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আসিয়াই একবার উন্মাদের ন্যায় এদিগ ওদিগ চাহিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—'ঐ কমণ্ডলু দেখিতেছি, অতুল কোথায়?'

ধর্ম্মসহায় বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া ভীমদণ্ডের মুখ-পানে চাহিলেন। ভীমদণ্ড হাসিয়া বলিল 'তোমার অতুলকে মারিয়া ফেলিয়াছি।' গায়ত্রী দৃঢ়তা সহ বলিল 'অতুলকে দুইজনে মারিতে পারে না।'

ভীমদণ্ড। আমি একাকী তার মত দুইজন মারিতে পারি।

গায়ত্রী। হুঁঃ!—এক দিন তোমার মত বিশ জনকে সে মারিয়াছিল, সাত জন মরিয়াছিল,আর সব পালাইয়া বাঁচিয়াছিল।

কোন পূর্ব্ব কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া ভীমদণ্ড অধোবদন হইল। আর ধর্ম্মসহায়ের মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল—"তবে কি এই বালকের এত শক্তি?"

গায়ত্রী বলিল,—"অতুল কোথা, শীঘ্র বল, আমি তোমাদিগকে জলের কথা বলিয়াছিলাম।"

ধর্ম্মসহায় বলিলেন, 'অতুল জলের মধ্যে যপ করিতেছে।' ভীমদণ্ড একটু হাসিল। কিন্তু এ সংবাদে বালিকা কিছুমাত্র চিন্তিতা হইল না। বরং তাহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল।—অতুল পূজান্তে অনেক দিন জলমগ্ন হইয়া দীর্ঘ কাল উপাসনা করিয়া থাকে। সুতরাং গায়ত্রী তাহাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। এবং আপন ফুল বেল পাতা জলে ভাসাইল।

গায়ত্রীকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া, ভীমদণ্ড ও ধর্ম্মসহায় আরো বিস্মিত হইয়া এ উহার মুখ পানে চাহিল। গায়ত্রী ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল।

ধর্ম্মসহায় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন 'মা-ই, তোমার হাতে ও কপালে রক্ত কেন?'

গায়ত্রী হাসিয়া বলিল, 'অতুলের ফুল বেল পাতা আমার দোষে নষ্ট হইয়াছিল, অতুল রাগ করিয়াছিল—তাই তার ফুল ও বেলপাতা আনিতে গিয়াছিলাম। বেল পাতা পাড়িতে বেলের কাঁটা ফুটিয়াছে।'

ধর্ম্মসহায়,—অতুল তোমার কে?

গায়ত্রী,—কে?

ধর্ম্ম,—তবে যে তার রাগে ভয় পাইলে?

গায়ত্রী,—আমি যে তার ফুল নষ্ট করিয়াছি।

ধর্ম্ম,—ফুল না আনিলে কি সে তোমাকে মারিত?

গায়ত্রী,—মারিবে কেন?

ধর্ম্ম,—তবে ভয় পাইলে ও ফুল আনিতে গেলে কেন?

গায়ত্রী। না যাইব কেন?

ধর্ম্ম। অতুল তোমাকে বিবাহ করিবে?

গায়ত্রী মৃদু হাসিয়া তড়িদ্বেগে পালাইল।

ভীমদণ্ড হাসিয়া বলিল, 'বালিকাটি বেশ সুন্দরী, কিন্তু পাগল পাড়া।'

ধর্ম্মসহায় ধীরে বলিলেন,—'বালিকা পাগলিনী নয় ভীম,—রত্ন বিশেষ।'

গায়ত্রীকে দেখিয়া ভীমদণ্ডের হৃদয়ে দাগ বসিয়াছিল—মনে মনে বলিল 'এ রত্ন হরণ করিব'।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অতুলের পিতা নাই। মাতা দেবী অরুন্ধতী। আশ্রম গায়ত্রীর বৃদ্ধ পিতা মাতার আশ্রমের অতি নিকট। গায়ত্রীর পিতার নাম বৃহস্পতি, মাতার নাম প্রকৃতি। বৃদ্ধ বৃহস্পতি পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক। মাতা স্নেহরূপিণী দয়ার দেবতা।

গায়ত্রী বাড়ী আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল, প্রকৃতি সস্নেহে তাহার তুষার-ধবল ললাট চুম্বন করিয়া আবিল কেশ-গুচ্ছ সরাইয়া অঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিলেন। ক্ষত ললাট দেখিয়া তাঁহার দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল—কাতরে বলিলেন, 'মা আর গাছে গাছে মাঠে মাঠে রৌদ্রে রৌদ্রে বেড়াস্ না, কাঁটার আচরে এই হইয়াছে?' গায়ত্রী বলিল বেলপাতা পাড়িয়াছিলাম—বৃহস্পতি শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন, "বেল পাতা কে প্যাড়িতে বলিয়াছিল'? গায়ত্রী কিছু বলিল না; মায়ের গণ্ড লেহন করিতে

লাগিল। —এমন সময় অরুন্ধতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকৃতি কন্যাকে ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি কুশাসন আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। অরুন্ধতী বসিলেন না, বলিলেন অহুল কোথায় গিয়াছে এখনও আসিতেছে না, তাই দেখিতে আসিয়াছি, এখানে আসিয়াছে কি? অনেক বেলা হইয়াছে"। গায়ত্রী কি কথা মায়ের কাণে কাণে বলিল, প্রকৃতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আবার ত সে দৈত্যদের হাতে পড়ে নাই"? অরুন্ধতী, কি হইয়াছে, কি হইয়াছে বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন, গায়ত্রী লাজ পাইল। প্রকৃতী, গায়ত্রী যাহা বলিল তাহা খুলিয়া বলিলেন। বৃহস্পতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'দেবি! ব্যস্ত হইবেন না, অহুলের বিপদ্ ঘটিবে না, ধর্ম্ম আপনি তাহার সহায়'।

অরুন্ধতী মৃদুস্বরে প্রকৃতির প্রতি লক্ষ করিয়া বলিলেন, 'আমি কালি বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি। অহুল আমার যেন অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইল'। 'বৃহস্পতি বলিলেন এ ভাল স্বপ্ন আপনার অহুল রাজা ও দীর্ঘায়ু হইবে'।

এমন সময় অহুল আসিয়া হাস্য মুখে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বলিল 'মা আশ্রম ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন কেন? গায়ত্রীর মৃগ শিশুটি আমাদের আশ্রমে ছিল, তাহাকে সিংহে মারিয়াছে।'

একথা শুনিবা মাত্র গায়ত্রী নিতান্ত বালিকার মত ধুলায় লুটাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলে নিরুত্তর। অহুল বলিল "গায়ত্রী, তুমি কান্দিও না, তোমায় আমি চারিটি মৃগ শাবক ধরিয়া দিব, দেখ এসে, সিংহটাকে তীর দিয়া মারিয়াছি, সিংহ পুচ্ছটি তোমায় কাটিয়া দিব কেমন?" গায়ত্রী কান্দিতে কান্দিতে দাঁড়াইল, অরুন্ধতী ও প্রকৃতি তাহার ধুলা মুছাইয়া দিলেন।

পরে সবে মিলিয়া মৃত সিংহ দেখিতে চলিল। গায়ত্রী গাভীটি ছাড়িয়া গেল না। এদিগে ভীমদণ্ড ও ধর্ম্ম সহায়, গায়ত্রী চলিয়া গেলে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু নিমজ্জিত অহুল উঠিলনা, ইহাতে উভয়ে বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া অবশেষ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় ধর্ম্মসহায় বলিলেন 'ভীম তুমি নিরস্ত্র একটি বালকের প্রাণ নাশ করিলে।'

ভীম বলিল, 'মরিলে ভাসিয়া উঠিত, না মরিলেও ভাসিয়া উঠিত। হিন্দুরা কুহক জানে, এ তাহারই বলে ডুবিয়া আছে'।

ধর্ম্ম। অনুমানফল সত্য অসত্য দুইই হইতে পারে। মরা অসম্ভব নহে।

ভীম। তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি, যেরূপ জানিতে পারিলাম তাহাতে এই পাষণ্ডই ত সে দিন তীর দিয়া আমাদের অনেককে মারিয়াছিল, বেশ হইয়াছে, বৈরনির্য্যাতন করিয়াছি।

ধর্ম্ম। এরূপে বৈরনির্য্যাতন করিবার শিক্ষা তুমি পাও নাই—বিনা দোষে, বিনা কারণে, অস্ত্রহীন এবং অন্যচিন্তাগত ব্যক্তিকে মারিলে কি পৌরুষ? তুমি দণ্ডার্হ।

ভীম। আমি যে আপনার বিবেচনায় সাজা পাইব তা আশ্চর্য্য নহে। বুঝিয়াছি

আপনি কি জন্য আমার প্রতি অযথা দোষারোপ করিবেন।

ধর্ম্ম। তোমার দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের ফলভোগ কিরূপে এড়াইবে ?

ভীম। আমি দুর্ব্বিনীত না আপনি ?

ধর্ম্ম। সাবধানে কথা বলিও।

ভীম। সাবধানেই বলিতেছি।

ধর্ম্ম। তুমি ক্রোধী, তোমার হিতাহিত জ্ঞান নাই, তোমার দ্বারা আমার কার্য্যের অনিষ্ট হইয়াছে, আমার সহিত বিবাদ বাঁধাইবে বলিয়া এ পর্য্যন্ত কিছু বলি নাই।

ভীম। আপনার চেয়ে অনিষ্ট করি নাই, বৌদ্ধপতাকা হস্তে করিয়া হিন্দু-যশঃ কীর্ত্তন করি নাই ! !

ধর্ম্ম। তুমি বৌদ্ধ কুলাঙ্গার।

ভীম। আপনি অযোগ্য প্রচারক।

ধর্ম্ম। নীতি ও ভদ্রতা শিক্ষা কর। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।

ভীম। (অট্টহাস্যে) আমি আপনাকে কখনই ক্ষমা করিব না, শুধু বৌদ্ধপাষাণে গা ঢাকা দিয়া থাকিলে চলিবে না, অন্তরে আপনি হিন্দু, আমি একথা না বুঝিতে পারি এমত নহে।

ধর্ম্মসহায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, 'কি বলিলি নরাধম !'—বলিয়া নিশানদণ্ডে ভীমদণ্ডের মস্তকে আঘাত করিলেন। তাহার মস্তকে লাগিয়া দণ্ড দ্বিধা হইয়া গেল। ভীম, রক্তিমলোচনে গম্ভীর স্বরে বলিল, 'সহায়জী, কি বলিব তোমারেও ঐরূপ দুইখান করিবার বল এ শরীরে রাখি—হাতে তোমার নিশান, কি বলিব ?'

রৌদ্রমূর্ত্তি ভীমের সহিবার এত শক্তি আছে, ইহা ভাবিয়া বিস্মিত, এবং আপন কাজ মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া নিরীহ প্রচারক ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলেন। ভীম নিঃশব্দে তাহার পাছে পাছে চলিল।

উভয়ে যথাস্থানে পৌঁছিলে প্রধানের বিচারে উভয়েই অবনীত হইয়া সাধারণ সৈন্য দলে ভুক্ত হইলেন !

দ্বিতীয় প্রচারক ও দ্বিতীয় সহকারী তাহাদের স্থলে নিযুক্ত হইল। উভয়কেই নির্ব্বাক্ হইয়া প্রধানের আদেশ শিরোধার্য্য জ্ঞান করিতে হইল। অন্যথা মুণ্ড খসিবে ॥

বাঙ্গালির দৌর্ব্বল্য।

চঞ্চলতা বাঙ্গালি-জীবনের এক প্রধান কলঙ্ক। কেহ হয়ত বলিবেন যে, যে বাঙ্গালি শুইলে বসিতে চাহে না, এবং বসিলে দাঁড়াইতে চাহে না, তাহাকে চঞ্চল বলিয়া নির্দ্দেশ করা তাহাকে অকারণ নিন্দা কিংবা অযথোচিত উপহাস করা মাত্র। কিন্তু শারীরিক চঞ্চলতা এবং মানসিক চঞ্চলতা ঠিক্ এক কথা নহে। বাঙ্গালি শরীরে সচল হউক, আর অচল হউক, তাহার মন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় দুই মিনিট এক ভাবে ঠিক্ থাকিতে পারে না। ছায়াবাজীর ছবি গুলি পট হইতে যত সকালে অপসারিত হয়, বাঙ্গালির মনের ভাব ও কল্পনা তাহা হইতেও সকালে পরিবর্ত্তিত হয়। তিন তাসের ছবির ন্যায় তাহার চিত্ত যে কোথায় থাকে, তাহা সে আপনিও ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে না।

পাপের এক নাম মানসিক দুর্ব্বলতা। ইংরেজেরা যে সকল কার্য্যকে পাপ নামক অতবড় একটা আখ্যা দেওয়া উচিত কিংবা আবশ্যক বোধ করেন না, তাহাদিগকে তাঁহারা মানসিক দুর্ব্বলতা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আবার অনেক কার্য্য, যাহা আমরা পাপ মনে করি, তাহা যদি সংসারের মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া করা হয়, তবে ইংরেজেরা তাহাকে মানসিক দুর্ব্বলতা বলিতে চাহেন না, তাহাকে তাঁহারা মানসিক সাহস (moral courage) বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাধারণের মত-বিরুদ্ধ কোন একটা কার্য্যও যদি দৃঢ়তার সহিত করা যায়, তবে তাহা সাহসের কার্য্য বলিয়া প্রশংসিত হয়। পক্ষান্তরে, যদি প্রকৃত কোন সাধারণ হিতকর ফল মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কেহ একদল ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে অসংখ্য উত্তোলিত অসির নিম্নে দাঁড়াইয়া বলিতেছে যে এজগতে ঈশ্বর নাই। সকলে তাহাকে পিশাচ, নারকী, পাপিষ্ঠ বলিয়া দূর দূর করিতেছে, কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শকেরা বাহবা দিয়া বলিতেছে যে লোকটার দুরন্ত সাহস। অনেকে তাহার এই অসীম সাহস দেখিয়াই তাহার পক্ষাবলম্বন করিতেছে। কোন শিক্ষিত যুবক এই ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষাকী সভ্যতার মধ্যে কৌপীন পরিধানে করঙ্গ হস্তে দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে। বালক বালিকাগণ তাহা দেখিয়া খল খল হাসিতেছে। কিন্তু অনেকে তাহার এই অসাধারণ সাহস দেখিয়াই মহাপুরুষ জ্ঞানে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। পক্ষান্তরে, দশ ব্যক্তি একত্র নিযুক্ত হইয়া কোন গ্রাম লুণ্ঠন করিতে যাইতেছে। এক ব্যক্তি ভয়ে পশ্চাৎপদ হইল। এস্থলে যদিও তাহার কার্য্য-কল

সাধারণের মঙ্গলজনক হউক, তথাপি সকলে তাহাকে ভীরু বলিয়া ঘৃণা করিবে। তুমি জাতি-ভেদ মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত যবনান্ন গ্রহণ করিলে; সাধু সাধু বলিয়া অনেকে তোমার অনুসরণ করিল। আমি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া যবনান্ন গ্রহণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া সকলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। তুমি হিন্দু ধর্ম্মকে প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়া এবং হিন্দুসমাজের অত্যাচার মস্তকে বহন করিয়া খ্রীষ্টান্ হইলে। তোমাকে সকলে প্রশংসা করিল, অনেকে তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। আমি উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষায় খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় লইলাম; সকলে আমার মুখে কালি দিল। ইহা কেন? না তুমি প্রত্যেক কার্য্যেই মানসিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছ; আর আমার প্রত্যেক কার্য্যই মানসিক দুর্ব্বলতার ফল। তোমার কার্য্য পুণ্য না হইলেও প্রশংসার্হ; আমার কার্য্য পাপ না হইলেও নিন্দাযোগ্য।

উল্লিখিত প্রকার দুর্ব্বলতা বাঙ্গালির মধ্যে কিছু মাত্রাধিক দৃষ্ট হয়। অনেক সময় উহা তাহাকে কার্য্যের অনুপযুক্ত করে। বাঙ্গালি অনুরোধ এড়াইতে জানে না। তাহার চক্ষুর্লজ্জা শার্দ্দূল হইতেও অধিক। এই জন্য তাহার প্রায়শঃই এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিতে হয়, যাহা তাহার পালন করিবার প্রবৃত্তি কিংবা ক্ষমতা নাই। সুতরাং সে অনেক সময়ে মিথ্যাবাদী এবং অবিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হয়। নিমচাঁদ আমার নিকট বড় হাতযোড় করিয়া বলিল 'আমাকে একটি নকলনবিশী দেওয়ার জন্য শ্যাম বাবুর নিকট একটুকু অনুরোধ করিয়া দিন।' আমি যদি তখন তাহাকে প্রকৃত কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেই যে আমার শ্যাম বাবুর সহিত পরিচয় নাই, কিংবা আমি তাহার নিকট আরও দু একটির জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিংবা তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব নাই, কিংবা তাহার নিকট অনুরোধ করিলে আমার সম্মানের হানি হয়, অথবা যদি তাহাকে বলি যে আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া জানি না, কিংবা তুমি সেই কার্য্যের উপযুক্ত নও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই সমস্ত জঞ্জাল চুকিয়া যায়। নিমচাঁদ একটুকু অসন্তুষ্ট হয়, এই মাত্র। কিন্তু আমি তাহার সেই অসন্তুষ্ট ছবি এড়াইবার জন্য তাহাকে এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম যে 'আচ্ছা আপনি আজি আসুন, আমি সময়ান্তরে আপনার জন্য অনুরোধ করিব।' কিন্তু আমি উপরোক্ত কোন কারণে আমার সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছি না। তখন ফল হইল এই যে, সেই ইংরেজিওয়ালা নিমচাঁদ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন দেখিয়া আমাকে এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি জাতিকে মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, এবং কপট, বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল।

বাঙ্গালিও মিথ্যাকথা কহে, ইংরেজও মিথ্যাকথা কহে এবং বোধ হয় এ বিষয়ে কেহ কাহারও নিকটে পরাস্ত হয় না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থ্যক্য এই যে বাঙ্গালি আত্মীয়কুটুম্বের অনুরোধে—তাহাদের চক্ষু-

লজ্জা এড়াইবার জন্য—মিথ্যা কহিতে সম্মত হয়। কিন্তু ইংরেজ অনুরোধে পড়িবার লোক নহে—বিশেষতঃ আত্মীয়ের অনুরোধ। সে সর্ব্বদাই নীতির দ্বারা পরিচালিত ; এবং যেহেতু ইংরেজের প্রধান নীতি আত্মস্বার্থ ও জাতীয় উপকার, সুতরাং সে অর্থের বিনিময়ে এবং অপর জাতির বিরুদ্ধে স্বজাতির পক্ষে মিথ্যা কহিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় না। বাঙ্গালি ও ইংরেজের তুলনা করিতে গেলে ইহাদের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষিত হয় যে, ইংরেজ অসৎকার্য্য করিলেও তাহা সাহসের সহিত এবং নীতির নামে করে ; বাঙ্গালি সৎকার্য্য করিলেও, তাহা সন্দেহ-দোদুল্যমান চিত্তে করিয়া থাকে।

উন্নতির ব্যবসায় এবং রাজকীয় কার্য্যের জন্য মনুষ্যের স্বভাবে দুইটি উপকরণ একান্ত আবশ্যক। ১ম, সাহস ; ২য় সিদ্ধান্তকরণ ক্ষমতা (decision)। অনেকে ভবিষ্যৎ গণনা করিতে করিতে কার্য্যের সুযোগ হারাইয়া ফেলেন, এবং পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে থাকেন। অন্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্যও এই দুই উপকরণ আবশ্যক। যাহাদের ইহার অভাব আছে, তাহারা কখনই প্রভুত্ব করিতে পারে না, এবং তাহারা চিরকালই পরের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। দশজনে এক স্থানে মিলিয়া পরামর্শ করিতেছে, এই জঙ্গল পার হইতে পারিব কি না। কেহ বলিতেছে পারিব, কেহ আশঙ্কা করিতেছে পারিব না। ইতিমধ্যে একজন সকলকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া সাহসের সহিত বলিল ‘ কোন ভয় নাই, তোমরা আমার পশ্চাতে আইস।’ সকলের যেরূপ বুদ্ধি ও বল, হয়ত তাহার তাহা হইতে অধিক হইবে না। তথাপি সকলেই তাহার সাহসে সাহসী হইয়া, এবং প্রত্যেকেই আপনার পূর্ণশক্তি প্রকাশ করিয়া অনায়াসে সেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল ভেদ করিয়া গেল। ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে কি করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। ক্লাইব যদি ওয়াটসন হইত, তাহা হইলে আজি ভারতবর্ষে ইংরেজ নাম থাকিত কি না সন্দেহ। অনেক পুরুষ আপনার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে তিন দিবস ভাবনায় অধীর থাকে, এবং তাহাতেও কিছু সিদ্ধান্ত করিতে নাপারিয়া একবার মাতার,একবার পিশীমার, একবার খুড়ীমার, এবং একবার স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য যে এতাদৃশ পুরুষ কখনও গৃহে কর্তৃত্ব করিতে পারে না। যাহারা লোক খাটাইয়াছে, তাহারা এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারে। তুমি যদি তোমার ভৃত্য কিংবা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে একবার জানিতে দেও যে তোমার স্বমত দৃঢ় নহে, এবং তুমি অপরের পরামর্শে চালিত হও, তাহা হইলে তুমি কখনই তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। অনেকে অপরের দ্বারা তোমাকে তাহাদের স্বার্থানুযায়ী পরামর্শ দেওয়াইবে, অনেকে নিজেরাই তোমাকে পরামর্শ দিতে উদ্যত হইবে। ব্যবসায় সম্পর্কে সিদ্ধান্তকরণ ক্ষমতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অমুক জিনিশ এক্ষণে ক্রয়

করিলে লাভ হইবে কি লোকসান হইবে, চিন্তা করিতে করিতে ক্রয়ের সুযোগ হয়ত চলিয়া গেল। কিংবা অমুক জিনিশ এক্ষণে বিক্রয় করিলে লাভ হইবে না আরও কিছু পরে বিক্রয় করিলে অধিকতর লাভ হইবে, মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে হয়ত বিক্রয়ের সুযোগ আর রহিল না। এই প্রকার প্রায় জীবনের সমস্ত কার্য্যেই সাহস ও সিদ্ধান্ত করা অতীব প্রয়োজনীয়। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালি জীবনে এই দুই এরই একান্ত অভাব। সেক্ষপীর লুসিওর মুখে বলাইয়াছেন

"Our doubts are traitors,
And make us lose the good we oft might win
By fearing to attempt."

কেহ হয়ত বলিবেন যে আমি লোককে পরিণাম চিন্তা না করিয়াই কার্য্য করিতে বলিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে। কিন্তু পরিণামে কি হইবে এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে করিতে হইবে। ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে অভ্যাস হয়। কিন্তু অল্প বাঙ্গালিই ইহা অভ্যাস করিতে চেষ্টা করে। অনেক সময় আমরা সুদীর্ঘ চিন্তা করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হই,—আমাদের প্রথম যাহা মনে হয়, তাহাই সত্য। এইরূপ একটি গল্প আছে যে কোন এক সিবিলিয়ান যখন ভারতবর্ষে আসিবার জন্য যাত্রা করে, তখন তাহার কোন এক জ্ঞানী বন্ধু তাহাকে বলিয়াছিলেন যে " উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক শুনিয়াই রায় দিও, এবং পশ্চাৎ উহা ধীরে ধীরে বসিয়া লিখিও।" তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এই যে উভয় পক্ষের তর্ক শুনিলে হঠাৎ যে সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয়, তাহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভব, কিন্তু প্রথমে যুক্তির মধ্যে প্রবেশ করিলে হয়ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়।

অনেকে যেমন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করিতে করিতে কার্য্যের সুযোগ হারায়, তেমন অনেকে আবার কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ চিন্তায় ব্যাকুল হয়। অনেকে বাজার হইতে একটি জিনিশ ক্রয় করিয়া ঠকিলাম কি জিতিলাম,এই চিন্তায় সমস্ত রাত্রে ঘুমায় না। যাহা করিয়াছি ভালই করিয়াছি, এই বলিয়া অনেকেই মনকে সান্ত্বনা দিতে জানে না। বরং যদি কোন একটা কার্য্য অন্যায়ই করা হইল, তাহা তৎক্ষণাৎ অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত কর এবং প্রতিজ্ঞা কর যে ভবিষ্যতে আর উহা করিব না, কিংবা যদি তাহার প্রতিবিধান থাকে তাহা ঠিক্ করিয়া লও। কিন্তু যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য অনুতাপ করিয়া মনকে অশান্তিতে ডুবাইলে ফল কি? অনেকে বলিতে পারেন যে অনুতাপ যত স্থায়ী হইবে, তাহা প্রতিবিধানের যত্ন তত দৃঢ়তর হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুতাপে মন এতাদৃশ নিস্তেজ হইয়া যায় যে, অবশেষে কার্য্যকরণ ক্ষমতা একেবারে রহিত হয়। মনকে যত সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাখিতে পার, ততই কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি

একবার আছাড় খাইলে পুনরায় আছাড় খাইতে ভয় না করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, সে কার্য্য করিতে পারে? না যে ব্যক্তি একবার ভূপতিত হইয়া সাবধানতার ছলে আর মস্তকোত্তলন করিতে চায় না, সে কার্য্য করিতে পারে? এক ব্যক্তি বিপদকে বিপদ জ্ঞান করে না, পরিণামের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য করিতেছে, একপথে অকৃতকার্য্য হইতেছে, কিন্তু তাহাতে উৎসাহ ভঙ্গ নাই, অমনি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিতেছে। আর এক ব্যক্তি বিপদের আশঙ্কায় জড়সর, একবার কোন কার্য্যে বিপন্ন কিংবা অকৃতকার্য্য হইলে অনুতাপে অধীর হইয়া পড়ে এবং আপনার জীবনের ভার আপনি সহ্য করিতে না পারিয়া হয়ত আত্মহত্যা করিয়া মরে। এই উভয়ের মধ্যে কাহার দ্বারা জগতের উপকার সাধিত হইতে পারে? কোন বাঙ্গালি যুবক সময়ে ভারত স্বাধীন, কিংবা স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত কোন এক সভায় যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু সেই একদিনের সভায় স্ত্রীশিক্ষারও প্রচার হইল না, ভারতবর্ষও স্বাধীন হইল না। সুতরাং সে তাহার বাকি জীবন তাহার যুবত্বের বহু দর্শনের কথা বলিয়া বলিয়া অন্যান্য যুবককে সভায় যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছে এবং বলিতেছে যে সভা করিলে পৃথিবীর কোন উপকার হয় না। বৃদ্ধ বাঙ্গালি প্রায় সর্ব্বদাই এরূপ বহুদর্শনের জপমালা হস্তে করিয়া থাকেন; এবং কোন যুবককে দেখিলেই একবার উহার আবৃত্তি করিয়া এক গণ্ডূষ শীতল জল তাহার উৎসাহদীপ্ত মস্তকে ঢালিয়া দেন।

বাঙ্গালি কোন কার্য্যই অধিক কাল ব্যাপিয়া করিতে পারে না। তাহার সহিষ্ণুতার অভাব মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। জোয়ারের জলের ন্যায় তরতর প্রবাহে তাহার উৎসাহ আসে, আবার দেখিতে দেখিতে তাহাতে ভাটা লাগিয়া যায়। তপ্ত কটাহে তৈল-ক্ষেপের ন্যায় ঝাঁ করিয়া তাহার ক্রোধ জন্মে, আবার কিয়ৎকাল পরেই তাহা বিরাম পড়ে। কোন বাঙ্গালি দীর্ঘকাল কাহার প্রতি ক্রোধ কিংবা প্রতিহিংসা পোষণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া জানি না।

সহিষ্ণুতার অভাবে বাঙ্গালি জ্ঞানী সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। তাহার কোন বিষয়ে অধ্যবসায় নাই। ইংরেজ যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া সাধারণতঃ একটা বিষয় অধ্যবসায়ের সহিত শিক্ষা করিতে থাকে, এবং অন্যান্য বিষয় উহার আনুষঙ্গিক রূপে পড়ে। বাঙ্গালি শিক্ষিত যুবক সকল বিষয়েই পণ্ডিত হইতে চাহে, এবং অতি সত্বরই প্রশংসা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। সুতরাং কোন বিষয়েই তাহার পূর্ণ অভিনিবেশ থাকে না। তাহার আজি ইচ্ছা ঐতিহাসিক হইব, কালি ইচ্ছা গণিতজ্ঞ হইব, পরশ্ব ইচ্ছা বিজ্ঞানবিদ্ হইব। বস্তুতঃ কোন ইচ্ছাই কার্য্যে পরিণত হয় না। যদি জীবনের একটি উদ্দেশ্য ঠিক্ করিয়া তৎসাধন পক্ষে কার্য্য করা যায়, তবে আমাদের জীবন-গতি অনেক সহজ হইয়া পড়ে।

সে উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত সাধারণ হইলেও তাহা সিদ্ধ হইবার সম্ভব। আর তুমি যদি একবারে পাঁচটি বৃহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ করিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে ধাবিত হও, তুমি কোন লক্ষ্য স্থলেই পৌছিতে পারিবে না, অথচ তুমি অনর্থক পরিশ্রম করিয়া শক্তিক্ষয় করিবে। আমাদের দু-ইটি উদ্দেশ্য থাকিলে তাহাব একটি একটি করিয়া সাধন করা আবশ্যক। মনে কর তোমার ইচ্ছা বিজ্ঞান চর্চ্চা করা। এই ইচ্ছা পূরণ করিতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং যদি তুমি অর্থোপার্জ্জনকে প্রথম লক্ষ করিয়া সেই দিকে তোমার শক্তির অধিকাংশ প্রয়োগ কর এবং বিজ্ঞান চর্চ্চাকে গৌণ উদ্দেশ্য রাখিয়া অবশিষ্ট শক্তি তাহাতে নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলে তোমার উভয় উদ্দেশ্যই কালে সফল হইবার সম্ভাবনা। আর যদি তাহা না করিয়া তুমি এক মুহূর্ত্তে বিজ্ঞানচর্চ্চা আবার পর মুহূর্ত্তে অর্থোপার্জ্জনের কল্পনা কর, এবং এক চিন্তার মধ্যে অন্য চিন্তা আসিতে দেও, তাহা হইলে তোমার মনের স্থিরতা থাকিবে না, এবং কোন কার্য্যই তুমি অভিনিবেশ সহকারে করিতে পারিবে না। আমি ইহা বলিতে চাহি না যে যাহার অর্থোপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহার অন্য কোন দিকে মনোযোগ করা অনুচিত। আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে এক চিন্তা দ্বারা অন্য চিন্তার ব্যাঘাত জন্মান উচিত নহে। আমি এই একখানা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতেছি, হঠাৎ আমার মনে হইল যে ইহাতে কোন ফল হইবে না, আমার নিজের এবং পরিবারের ভরণ পোষণ কে করিবে? অমনি আমি পুস্তক বন্ধ করিয়া কি উপায় অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিব, তাই ভাবিতে বসিলাম, এবং ভাবনায়ই আমার চেষ্টা পর্য্যবসিত করিয়া আবার পুস্তক খুলিলাম। আবার সেই দুরন্ত চিন্তা মনকে অধিকার করিল, আবার পুস্তক বন্ধ হইল। বলাবাহুল্য যে এইরূপ মানসিক শক্তি-ক্ষয়ে আমার বিজ্ঞান চর্চ্চাও হইবে না, অর্থোপার্জ্জনও হইবে না।

বাঙ্গালির আর একটি কলঙ্ক এই যে তাহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত হাল্‌কা। তাহার Seriousness এর একান্ত অভাব। রসিকতা বাঙ্গালি-জীবনের অন্নজল, উহা ভিন্ন সে এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারে না। কোন আত্মীয়ের সহিত আলাপ করিতে হইলে যদি তাহার পিতা মাতা কিংবা ভগ্নী উচ্চারণ করিয়া গালাগালি দিতে পারা যায়, তাহা হইলে নিজকে বড়ই কৃতার্থ মনে করা হয় এবং যাহাকে এবংবিধ গালি দেওয়া গেল, তাহাকেও পরমাপ্যায়িত করা হইল। বলাবাহুল্য যে এতাদৃশ রসিকতার উদ্ভব অত্যন্ত জঘন্য প্রবৃত্তি হইতেই হইয়াছিল, কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালি আজিও উহা বিশুদ্ধ আমোদ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। বাঙ্গালি গাম্ভীর্য্যের সহিত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তোমার নিকট বসিয়া একজন উল বুনিতেছে। তুমি হাস্য রসে গলিতে গলিতে তাহার হস্ত হইতে কাঁটাটি ও সূতা টুকু গ্রহণ করিলে, এবং একটি

পেচও উঠাইতে না পারিয়া অট্টহাস্যের সহিত তাহাকে উহা ফিরাইয়া দিলে,যেন অপ্যরগতা তোমার পক্ষে বড়ই বাহাদুরী হইল। তুমি ক্রিকেট খেলায়,হাসিতে হাসিতে অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বেটখানি ধরিলে, এবং একটি আঘাতও করিতে না পারিয়া সকলের হাস্যের উপর তোমার হাসি উঠাইয়া চলিয়া আসিলে,যেন ক্রিকেট খেলিতে না জানা তোমার পক্ষে বড়ই গৌরবের কার্য্য হইয়াছে।

আমাদের দেশে বেতন দ্বারা সম্মানের তারতম্য করিবার প্রবৃত্তিতেও এই মানসিক দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে যখন সকল জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়, তখন শুধুই স্বজাতিকে এবিষয়ে দোষী বলিতে পারা যায় না। তথাপি ইহা ঠিক্ যে, যাহাদের মন প্রশস্ত ও উন্নত, এবং যাহারা আত্মবলে আপনাদিগকে বলীয়ান্ মনে করে, তাহাদের সম্মানের তুলাদণ্ড স্বতন্ত্র। তাহারা সাধারণতঃ যাহার মধ্যে যে পরিমাণ আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ বা আভা দেখিতে পায়, তাহাকে সেই পরিমাণ সম্মান দিতে অগ্রসর হয়। স্ত্রীলোকেরা প্রায় সর্ব্বত্রই অর্থবল দ্বারা লোকের গুরুত্ব অনুভব করে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের পুরুষেরাও বেতন দ্বারা লোকের গৌরব নির্ণয় করিয়া থাকে।

অনেক বাঙ্গালি যুবককে দেখা যায় যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের সম্মুখীন হইতে কোন প্রকারেই তাহাদের পা সরে না। আপনা হইতে ঈষৎ উন্নত কাহাকেও দেখিলেই মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় ইহারা মস্তক অবনত করিয়া থাকে, যেন আপনার হীনতার ভারে আপনি অবসন্ন, তেজ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই,মুখে বাক্য নাই,যেন কত দয়ার পাত্র। স্বীকার করি যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগেরও ইহাতে অনেক পরিমাণে দোষ আছে, কেন না তাঁহাদের অনেকেই নিম্ন পদস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত সমুচিত ব্যবহার করেন না। কিন্তু যুবকদেরওযে অত্যন্ত ক্রটি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পক্ষেরই ক্রটী থাকুক, ফলতঃ বাঙ্গালিসমাজ এই কারণে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিহীন এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। অতি সামান্য বয়স এবং অর্থের প্রভেদে এদেশে এত অধিক সামাজিক প্রভেদ হয় যে, সমাজস্থ একের সহিত অন্যের সদ্ভাব থাকা দুষ্কর। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বৃদ্ধ এবং যুবক শ্রেণীতে শুধু যে সৌহার্দ্দ নাই, তাহা নহে, ইহাদের মধ্যে প্রকৃত অসদ্ভাব বর্ত্তমান। বৃদ্ধগণ যুবাদিগের সংসর্গে আসিতে চায় না; যুবকগণ প্রতিদানে বৃদ্ধদিগকে ঘৃণাকরে। আবার যে প্রকার বৃদ্ধ ও যুবকে শ্রেণীভেদ, সেই প্রকার যুবকদিগের মধ্যে বয়স ও পদ অনুসারে শ্রেণীভেদ। যে সমাজে এই প্রকার একাঙ্গের সহিত অপরাঙ্গের অপ্রীতি ও বিরোধ, সে সমাজের সার্ব্বাঙ্গিক উন্নতি এক্ষণেও বহুদূর।

বাঙ্গালির মানসিক বল উপার্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের যেন বক্ষঃস্ফীত হয়, এরূপ

ভাবে চরিত্র গঠন করা আবশ্যক। কার্য্য ক্ষেত্রে বিশেষ অভ্যাস দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপ বল উপার্জ্জিত হইতে পারে। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালি যুবককেই এই প্রকার দেখিতে চাই যে, তাহার বিদ্যা থাকুক কি না থাকুক, তাহার যেন সুনীতি এবং জীবনের একটি স্থির লক্ষ থাকে; তাহার সমস্ত কার্য্যই যেন সুনীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট লক্ষের দিকে ধাবিত হয়; তাহার অন্তরে যেন দৃঢ়তা থাকে, এবং যেন কিছুতেই সে লক্ষ ভ্রষ্ট না হয়; সে প্রত্যেক কার্য্যই যেন সাহসের সহিত সম্পাদন করে, এবং বিপদে কাতর না হইয়া পুনর্ব্বার বিপদকে আহ্বান করিয়া লয়; তাহার সম্মুখে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে অমনি যেন তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারে, এবং সন্দেহের তুফানে পড়িয়া যেন হাবু ডুবু না খায়; সে উচ্চ ব্যক্তির সংসর্গে গেলেও যেন কোন প্রকার হীনতাবোধে জড় সর হইয়া না পড়ে, এবং সর্ব্বদাই যেন আপনার বলে আপনি বলীয়ান্ রহে। এরূপ এক একটি যুবক এক একটি প্রভুসদৃশ। ইহাদের অসাধু হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প, কেন না অসাধুতা প্রায়শঃই মানসিক দৌর্ব্বল্যের ফল। সমাজের কর্ত্তৃত্ব, এবং সাধারণের সম্মান ও বিশ্বাস আপনা আপনি ইহাদের পদানত হয়। যাহার চরিত্রে বল আছে, সে কটুভাষী কিংবা অত্যাচারী হইলেও লোকে অবশ্যই তাহাকে ভয়, সম্মান ও বিশ্বাস করিবে। সমজীবিদিগের প্রশংসা অতি ধার্ম্মিক লোকের ভাগ্যে ঘটেও না। যাহারা ঐরূপ প্রশংসা খুজিতে যায়, তাহারা কোন কার্য্যও করিতে পারে না। সেক্ষপীরের অষ্টম হেনরী নাটকে কার্ডিনাল্ উলসি বলিতেছেন;—

"If I am traduced by tongues, which neither knew
My faculties, nor person, yet will be
The chronicles of my doing,—let me say,
'Tis but the fate of place, and the rough brake
That virtue must go through.........
...............If we shall stand still,
In fear our motion will be mocked or carp'd at,
We should take root here where we sit, or sit
State statues only."

শ্রী—

আত্মনির্ভর।

বিদুষী রমাবাই বিলাতে গিয়া খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বিস্ময় বা বিষাদের কিছুমাত্র কারণ দেখিতেছি না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"। অর্থাৎ "যাহারা আমাকে যেরূপ ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপেই অনুগ্রহ করি"। যে নারায়ণ আমাদের সচন্দন তুলসীপত্র গ্রহণ করেন, সেই নারায়ণই "যিহোবা, যোব, বিশু" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্নভিন্ন দেশে পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। চপলমতি তরুণবয়স্ক যুবকেরা দেবতার মধ্যে তারতম্য করিয়া থাকেন, কিন্তু "অভেদে যে জন বুঝে সেই ভক্ত ধীর"। একটি অল্পবয়স্কা যুবতী এই সব তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বাহ্যোজ্জ্বল খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। একেইত "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী"। তাহাতে আবার স্ত্রী যুবতী হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। রমাবাই খৃষ্টান হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিষাদের বিষয় কিছুই দেখিতেছি না। যে স্ত্রীলোক রমণীসুলভ শালীনতা, বিনয়, লজ্জা, সুকুমারতা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া দেশে দেশে পাণ্ডিত্যসূচক বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁহা হইতে পৃথিবীর মঙ্গল সংসাধিত হওয়া অসম্ভব। রমাবাই যদি এই সমস্ত "মর্কট" পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান সংকল্প অনুসারে চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহার নিজের ও অন্যের কথঞ্চিৎ মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে।

রমাবাই সম্বন্ধে আমাদের কলিকাতাস্থ কোন এক সহযোগী দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম মন্তব্যটি কৌতুকাবহ। সহযোগী বলিতেছেন—"রমাবাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্রভেদী শিখরদেশ হইতে, খৃষ্টধর্ম্মের অতলজলধি-তলে নিপতিত হইয়াছেন।" আমরা পূর্ব্বোক্ত উপমা পাঠ করিয়া মনে করিয়াছিলাম—"না হবে কেন? একে অবলা, তাহাতে এত ঊর্দ্ধে আরোহণ! পদস্খলন হইবারই কথা! সংস্কৃত শাস্ত্রে বলে অত্যুচ্চৈঃ 'পতনায়চ"। আমাদের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী একটি বলিলেন "যদি রমণী অত উচ্চে না উঠিয়া হিন্দুধর্ম্মের সমতলক্ষেত্রে বাসস্থান প্রস্তুত করিত তাহা হইলে তাহার কোন বিপদই ঘটিত না।"

আমাদের সহযোগীর দ্বিতীয় মন্তব্যটি পাঠ করিয়া আমরা মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি। সহযোগী বলিতেছেন—"আমরা এক্ষণে

আশা করি রমাবাই ইংলণ্ডীয় রমণীগণের দ্বারা আমাদের অজ্ঞানাবৃত রমণীদের বিদ্যা ও সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে কোন উপকার সম্পাদিত করিবেন।" যে রমণী অতল সমুদ্রতলে নিপতিত হইয়াছে তাহাকে তীরে আনয়ন করাই আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের সহযোগী আবার সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত রমণীর নিকট উপকার ভিক্ষা করিতেছেন। অহো কি দুর্দ্দৈব! আমাদের সহযোগী কি স্বার্থপর! তিনি যেন পণ্ডিতা রমাবাইকে বলিতেছেন—"ভো পণ্ডিতে! তুমি ডুবিয়াছ ডুবিয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু ডুবিয়া ডুবিয়াই আমাদের জন্য দুই একটা, যাহা পার, মুক্তার আয়োজন করিয়া লইয়া আসিবে।"

তামাসা থাউক। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ভিক্ষা আমাদের এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতেও অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। যাহাকে আমরা নিজেই কৃপাপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, আবার তাহারই নিকট আমরা অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে লজ্জিত হইতেছি না। পথিপার্শ্বস্থ অন্ধ ভিক্ষুকের আমরা সকলেরই নিকট নিজ নিজ দারিদ্র্য বিজ্ঞাপন করিতেছি। রমাবাই বালিকা। তিনি ভারতবর্ষের রমণীগণের কি উপকার করিতে পারেন? কেশব সেন প্রভৃতি মহা মহা সারথিরা যেখানে কিছু করিয়া আসিতে পারেন নাই, সেখানে দরিদ্রা রমাবাই কি করিবে? বিলাতের রমণীগণই বা আমাদের নারীগণের কি উপকার করিতে পারে? যদি রমণীগণকে শিক্ষিত করিতে হয়, সে শিক্ষা পুরুষেরা দিবে। যদি পুরুষেরা সে শিক্ষা দিতে কাতর বা অক্ষম হয়, তাহা হইলে সহস্র বিলাতী সাহায্য সত্বেও আমাদের রমণীরা যে অশিক্ষিতা সেই অশিক্ষিতাই থাকিবে। সৎপুরুষের সাহচর্য্য জনিত যে শিক্ষা সেই শিক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবে বোধোদয় শিশুশিক্ষা প্রভৃতির অধ্যাপনা, ও চিঠি লিখাতে শিখান, ইহা, বোধ হয়, আমরা বিলাতী সাহায্য ব্যতিরেকেও নিজে নিজেই চালাইতে পারি।

সংস্কৃতে বলে—"ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।" অর্থাৎ ভিক্ষাদ্বারা কোন প্রকারের দুঃখই নিবারিত হয় না। বিদ্যা বল, ধন বল, কীর্ত্তি বল, ক্ষমতা বল, শক্তি বল, সকলই নিজের আয়াসে অর্জ্জন করিতে হইবে। আত্মনির্ভর না শিক্ষা করিলে, শুদ্ধ অন্যের মুখাপেক্ষী হইলে, আমরা কোন বিষয়েই সাফল্যলাভ করিতে পারিব না। যে জাতি আমাদের ন্যায় সকল বিষয়েই অন্যের দয়া, সততার উপর নির্ভর করে, সে জাতির উন্নতি অসম্ভব। "লর্ড রিপণ দয়ালু" এই বলিয়া বা ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি। "টম্সন সাহেব খৃষ্টান; সুতরাং আমাদের ভাবনা কি?" এই বলিয়া আমরা আপনাদিগকে আশ্বাসিত করি। "অমুক সাহেব আমাকে বড় ভালবাসে। আমার ভয় কি?" এই বলিয়া আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করি। ফ-

লতঃ এইরূপ পরতন্ত্রতাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে। যতদিন না আমরা এই পরতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মনির্ভর শিক্ষা করিব, তত দিন আমাদের উন্নতির আশা বিড়ম্বনা।

আমাদের স্বভাবে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। যে অহঙ্কার অন্যের মনঃপীড়া উৎপাদন করে সে অহঙ্কারের কথা বলিতেছি না। যে অহঙ্কারের অন্য নাম আত্মমর্য্যাদা সে অহঙ্কার আমাদের নাই। যাহার আত্মমর্য্যাদা নাই, তাহার আত্মনির্ভর থাকিতে পারে না। হে বন্ধুগণ! আপনাকে অনাদর করিও না। আপনার ক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস সংস্থাপন কর। কখনও নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না! তোমার যে সমস্ত স্বাভাবিক গুণ আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে তুমিও গণ্য মান্য হইবে। আর এমার্সনের নিম্নোক্ত উপদেশ জপমালা কর।

"It is easy to see that…self-reliance must work a revolution in all the offices and relations of men; in their religion; in their education; in their pursuits; their modes of living; their association; in their property; in their speculative views."

অর্থাৎ—

"ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে আত্মনির্ভরের বলে মনুষ্যঘটিত সকল কার্য্যে ও সকল ব্যাপারে ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ধর্ম্মে, বিদ্যায়, ব্যবসায়, সাংসারিক অবস্থায়, মানসিক চিন্তায়, ধনে, দার্শনিক মতভেদে সর্ব্বত্রই আত্মনির্ভরের দ্বারা বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে।

অগ্নিকুল।

(৫২০ পৃষ্ঠার পর।)

সূর্য্য গ্রহণ।

বেলা বড় দণ্ডমাত্র। অতুল আপন আশ্রম স্থানে বসিয়া একবার গগণে একবার বিপিনে দৃষ্টি করিতেছে, সম্মুখে পাষাণ—থালার জল—সূর্য্য ঐজলে ডুবিয়া আছে। অরুন্ধতী স্নানে। গায়ত্রী আহ্লাদে আটখানা হইয়া এই সময়ে অতুলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গায়ত্রীর বড় আহ্লাদ হইয়াছে, তাহার মাতা আজ অতুলকে খাইতে বলিয়াছেন, সে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। গায়ত্রী আসিয়া কেবলই হাসিতে লাগিল, কিছু বলিতে পারিলনা। অতুল হাসির প্রত্যুত্তরে একটু হাসিয়া বলিল,—'গায়ত্রী!—এত হাসি কেন, কি হইয়াছে? শুনি কাছে এস'?—গায়ত্রী তাহার অতি নিকট আসিয়া আবার হাসিতে লাগিল।—অতুল আবার তাহার হাত ধরিয়া বলিল

—'কেন কি হইয়াছে'? গায়ত্রী হাত ধরিতেই অবশের ন্যায় বসিয়া পড়িল—আবার হাসিয়া বলিল—

'মা আজ তোমায় খাইতে বলিয়াছেন'।

অ—ভাল কথা—খাইব।

গা—গ্রহণের পরে খাইও।

অ—যদি এখন যাই?

গা—তুমি কি জাননা, গ্রহণের আগে পাক হয় না?

অ—পাক্ হইলে কি হয়?

গা—গ্রহণের পর সব নষ্ট হয়।

অ—কার কাছে একথা শুনিয়াছ?

গা—কেন তুমিইত সে দিন বলিয়াছিলে?

অ—'যাক্, তোমার বাবা কোথায়,—আশ্রমে'?

গা—না, অর্ব্বুদে যজ্ঞ করিতে গিয়াছেন।—থালায় জল কেন?

অতুল তাহার ক্ষুদ্র মস্তক ধরিয়া বলিল, 'কেন বুঝিতে পারিবে চাহিয়া দেখ?' গায়ত্রী জল-পূর্ণ থালা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং ধীরে মাতা তুলিয়া এক দৃষ্টে অতুলের দিকে চাহিল। চাহনির অর্থ স্বতন্ত্র। সরলা মেয়ে আপন প্রতিবিম্ব জলে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে—এ কাহার ছায়া বা কি বুঝিতে পারে নাই।

বালিকা নদীর জলে বৃষ্টির জলে কতবার স্নান করিয়াছে কিন্তু কখনও প্রণিধান করিয়া আপন ছায়া জলে দেখে নাই। এই প্রথম দর্শন।

অতুল গায়ত্রীর কুঞ্চিত ললাট, রক্তিম গাল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"থালায় কি দেখিয়া এমন হইলে?" গায়ত্রী বলিল, "থালায় মানুষের মুখ দেখিয়াছি—তুমি কি ঐ মানুষের মুখ দেখিবা বলিয়া থালায় জল রাখিয়াছ?" অতুল বুঝিল, হাসিয়া বলিল "হাঁ ঐ মুখ দেখিবার জন্যই বটে"—এই বলিয়া আবার তাহার মাতা ধরিয়া জল দেখাইল। এবার গায়ত্রী যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিল।—হাসিয়া অতুলের মুখপানে চাহিল। অতুল হাসিয়া বলিল "কি দেখিলে?" গায়ত্রী কিছু না বলিয়া আবার জল দেখিল—এবার একজনের ছায়া—ছায়া নিজের কি না দেখিবার জন্য একটু চেষ্টা করিল—মুখ দেখিতে পাইল না, নয়ন আবর্ত্তনে শুদ্ধ সুন্দর নাসাগ্রভাগ দেখিয়া বিরক্ত হইল। কিন্তু ইহাতেও ছাড়িল না, এবার অতুলের মাতা ধরিয়া জল দেখাইল নিজেও দেখিল,—আবার যুগলমূর্ত্তি। অতুল হাসিল, প্রতিবিম্ব হাসিল—দেখিয়া গায়ত্রী হাসিল, তাহার প্রতিবিম্বও হাসিল। গায়ত্রী এবার বিশেষ বুঝিল—হাসিয়া বলিল—"দেখ দেখ বেশ হইয়াছে, তুমিও দুইজন আমিও দুইজন।"

অতুল তাহার সারল্যে প্রীত হইয়া বলিল—"এস তোমার একজন আমাকে দাও,—আমার একজন তুমি লও—কেমন?" গায়ত্রী পুনঃ বিস্মিত হইয়া নয়ন বাঁকাইয়া অধর নাচাইয়া বলিল—"তা কিরূপে লইব তবে?" অতুল হাসিয়া আবার গায়ত্রীর মাতা ধরিয়া জল দেখাইয়া বলিল—"দেখ জলের আমাকে জলের তুমি

লইয়াছ, উপরের তোমাকে উপরের আমি লইয়াছি—কেমন ঠিক্ হইয়াছে ?" গায়ত্রী নির্ব্বাকে অহ্নলের মুখপানে চাহিল। অহ্নলের বদনে আগুণ জ্বলিয়াছে—দেখিয়া তাহার শরীর রোমাঞ্চ হইল--অমনি আঁখি ফিরাইল, আর চাহিবার ইচ্ছা থাকিলেও সাহস হইল না—অগ্নির এই প্রথম তাপ গায়ত্রীর সুশীতল হৃদয়ে স্পর্শ করিল। গায়ত্রী তড়িৎগতি বাড়ীর দিগে চলিল।

গায়ত্রী চলিয়া যাইবার কিছুকাল পরে অরুন্ধতী গৃহে আসিলেন। এবং কক্ষ হইতে বারিপাত্র রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা বলিতে পার,শমীবনে তিনজন নূতন লোক কেন বসিয়াছিল, উহারা ত দৈত্য নয় ?"

অহ্নল বলিল, "কখন দেখিলে মা ?"

অরুন্ধতী বলিলেন,—"আমি স্নানে যাইবার সময় দেখিয়াছিলাম, আমাকে দেখিয়া গাছের আড়ে লুকাইল—কিন্তু আসিবার বেলা দেখিতে পাই নাই।"

অহ্নল এই কথা শুনিবা মাত্রই তীর ধনু লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। মাতা নিষেধ করিলেন ও ডাকিলেন—সে তাহা শুনিল না। গমনে মাতৃ ডাক বাধাজনক নহে তাহাও সে জ্ঞাত আছে, সুতরাং ফিরিল না। অরুন্ধতী চিন্তিতা হইয়া আশ্রমকার্য্য করিতে লাগিলেন।

একদণ্ড পরে অহ্নল ঘর্ম্মাক্তশরীরে আসিয়া তীর ধনু রাখিল।—মায়ে ডাকিয়া বলিল,—"মা কৈ কিছুই ত দেখিতে পাইলাম না ?"

অরুন্ধতী বলিলেন—'হয় ত যাইয়া থাকিবে'। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন 'পরমেশ্বর আমার পাগল কে রক্ষা করিও'।

এমন সময় শিব নাম তারক ব্রহ্মনাম চারিদিগ হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টার ঘটা রোল পড়িয়া গেল। রৌদ্র হরিৎ আভ হইল। দেখিতে দেখিতে দুরন্ত রাহু সূর্য্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। মুনি ঋষি—এবং আশ্রমবাসিগণ মুক্তির জন্য অমনি ব্রহ্মনাম যপ করিতে বসিলেন।

অরুন্ধতী অহ্নলও যপে বসিলেন॥

* * * * * *

অহ্নল! তুমিও তবে তপস্যায় বসিলে? হায় দেখিতেছ না তোমার কণ্ঠ-মণি চোরে লইয়া যায় ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বতী নদীর দক্ষিণ পার হইতে অর্ব্বলীভূধরের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ দলে দলে বাস করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতেছে। তাহাদিগের আচার ব্যবহারে বৈদিক-ক্রিয়ারত আর্য্যগণ বিরক্ত ও উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। হিন্দুগণকে তাহারা অন্ধ বিশ্বাসী বলিয়া গালি দেয়,হিন্দুগণ তাহাদিগকে নাস্তিক ও দৈত্য বলিয়া ঘৃণা করে। বৌদ্ধ প্রচারকের আপন মত প্রচার করা এখন আর নিরাপদজনক নহে। শাস্ত্রদর্শী এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আর তাহার সহিত তর্ক করেন না। অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহাকে পাইলে, প্রহার করে। সুতরাং

বাহুবলে আপন মত প্রচার করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বল প্রকাশের পূর্ব্বে ছল-তালাস করা স্বভাবসিদ্ধ।—এই জন্য হিন্দু সমিতির প্রধান তীর্থ অর্ব্বুদ-শিখরে অদ্য সহস্র বৌদ্ধ প্রেরিত হইয়াছে। তথায় তাহারা পতাকা প্রোথিত করিয়া, গ্রহণোপলক্ষে আগত বৃদ্ধ মৌনী ঋষিগণের অপমান করিয়াছে—তাহাদিগের পূজার স্থান মল মূত্রে অপবিত্র করিয়াছে—এবং যোগসাধনের বাধা জন্মান হইয়াছে। বৌদ্ধগণ যখন অর্ব্বুদে থাইতেছিল, সেই সময় তাহাদের দলস্থ তিনজন লোক কি পরামর্শ করিয়া শমীবনে লুক্কাইত হইল। সঙ্গীগণ উৎসাহ অন্ধতায় আর তাহাদিগকে মনেও করিল না।

এই তিন ব্যক্তিকে অরুন্ধতী দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাদের একজনের নাম শিলাসিংহ, আর একজনের নাম জটায়ু সিংহ, তৃতীয়—আমাদের পরিচিত সেই ভীমদণ্ড। জটায়ু ভীমের ভগিনীপতি। শিলা জটায়ুর বন্ধু।

গায়ত্রী অহুলের নিকট হইতে বাড়ী যাইবার কালে দেখিতে পাইল, তাহার গাভী শমী-কাননে চরিতে চরিতে অনেক দূর যাইতেছে—তাহার হরিণ শিশুর কথা মনে পড়িয়া ভয় হইল। গাভীকে 'কাঞ্চনী' আয় আয় বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গাভীর নাম কাঞ্চনী। অশুভক্ষণে অবোধ কাঞ্চনী চলিতেই লাগিল। এইরূপে গাভী ও গায়ত্রী অনেক দূর যাইয়া পড়িল। এমন সময় ভীম, জটায়ু, ও শিলা তাহার সম্মুখীন হইল। গায়ত্রী ভীমকে চিনিতে পারিয়া বলিল 'আমার কাঞ্চনীকে ফিরাইয়া দাও'। ভীম সে কথার উত্তর নাদিয়া—হাসিয়া বলিল 'তোমার অহুল বাচিয়া আছে'?—'কেন তাহার কি হইয়াছে যে বাচিবে না'।!—এই বলিয়া আবার কাঞ্চনীকে গায়ত্রী ফিরাইয়া দিতে কহিল।—ভীম কহিল 'তুমি আমার হাত কামড়াইয়া দিয়াছিলে—আজ আমি যদি তোমাকে মারি?'—গায়ত্রী আপন সরলতায় সরলার ন্যায় বলিল 'না—আমাকে মারিও না'।

ভীম—'মারিব না,—আমার কথা শুনিবে'?

গা—'শুনিব।'

ভীম—'আমাকে পর মনে করিওনা'?

গা—'আচ্ছা—তা করিব না।'

ভীম—'ঠিক্'?

গা—, ঠিক্।'

ভীম—'তবে এস আমি তোমাকে কোলে করি'?

গা—'না'

ভীম—'তবে তোমাকে মারিব,—তোমার গাভী লইয়া যাইব'?

গায়ত্রী সত্য সত্যই ভয় পাইল, বলিল 'তবে—এখনি কোলে তুলিয়া নাবাইয়া দিবে কিন্তু'? ভীম হাসিয়া কোমলবপু গায়ত্রী সুন্দরীকে কোলে লইল। বালিকা কোলে উঠিয়া শিহরিল। পাষাণমুষ্টি সুগোল নবনী চাপিয়া ধরিল। 'ওরে আমারে ছা

ড়িয়া দে রে ছাড়িয়া দে, ওরে আমারে না দেখিয়া মা কান্দিবে রে বাবা কান্দিবে, ছাঁড়িয়া দে—অহুল আসিয়া তোরে তীর দিয়া মারিবে রে ছাড়িয়া দে'—এইরূপ কাতর স্বরে বালিকা কান্দিতে লাগিল, ভীমের কঠিন হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করিল না। মহাবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল—সঙ্গী দুইজনও দৌড়িল।

গায়ত্রী ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল।—কিয়দ্দূর গেলে, কাঞ্চনী গাভী, গায়ত্রী অপহৃত হইতেছে দেখিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সীতাহরণ কালে জটায়ু রাবণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল—সেরূপ না হউক, অন্ততঃ দস্যুগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দুইজনে কাঞ্চনীকে যষ্টির আঘাতে নিবৃত্ত করিতে লাগিল, একজনে গায়ত্রী সহ অদৃশ্য হইল। পুনঃ২ যষ্টি তাড়নায় গাভী অগত্যা ফিরিল। কোন পশুবিজ্ঞানবিৎ—তৎকালে কাঞ্চনীকে দেখিলে বুঝিতে পারিতেন প্রাণাধিক-বৎসবিরহ হইতে অধিকতর বেদনাগ্রস্থ হইয়া গাভী কি রূপে ফিরিয়াছিল।

এদিগে বেলা তৃতীয় প্রহর প্রায়। অহুল নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বৃহস্পতির আশ্রমে উপস্থিত হইল। প্রকৃতি পাককার্য্য সমাধা করিয়া নিমন্ত্রিতের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। বৃহস্পতি আজ কয়েকজন মুনিকে আহার করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং আয়োজন বিশিষ্টরূপে হইয়াছে। মুনীগণের সন্তোষ ও সেবার জন্য একটি পুষ্টাঙ্গ বৎসতরী যথাবিধানে হনন করা হইয়াছে। প্রকৃতি অহুলকে দেখিয়া বলিলেন 'নিমন্ত্রিত মুনিগণ আসিতেছেন না কেন বুঝিতে পারি না—তুমিই বা কিরূপে এখন আহার করিবে,—গায়ত্রী আসিলে তাড়াতাড়ি তোমার জায়গা করিয়া দেওয়া যাইত।'

অহুল বলিল, 'না মা! ব্যস্ত হইবেন না, আমি বনফল খাইয়াছি—আগে মুনিগণ আসুন, বোধ হয় তাঁদের উপাসনা কার্য্য এখনও সমাধা হয় নাই।'

প্রকৃতি বলিলেন, "মুনীদের যেন উপাসনা হয় নাই—আমার গায়ত্রী কোথায় গেল"।

অহুল। 'আপনি ত তারে কোথাও পাঠান নাই?'

প্রকৃ। 'না বাছা, সেই যে তোমার কাছে পাঠাইয়াছিলাম আরুফিরে আসে নাই।'

অহুল শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইল, বলিল 'আমি তবে তারে লয়ে আসি'।

প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে কি তবে তোমাদের বাড়ীতেই আছে?' 'থাকিতে পারে' এই কথা বলিয়া অহুল প্রস্থান করিল। অহুল প্রকৃতি দেবীকে ব্যস্ত করিল না, তিনিও একথায় নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অহুল চলিয়া গেলে বৃহস্পতি আশ্রমে আসিলেন। তাঁহার চক্ষু আরক্ত, বদনপ্রভা অনলবৎ, তুষারধবলিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু স্থানে স্থানে ছিন্ন এবং সেই সকল স্থান হইতে রুধিরপাত হইতেছে—প্রকৃতি ভীতা হই-

লেন, তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিলেন না—অমুচ্চ ও কম্পিতস্বরে আপনা আপনি বলিলেন—' এ মহাতপাব্রহ্মরক্ত কে পাত করিল—সে নির্পাত যাক্।'

বৃহস্পতি বিচক্ষণ ও মহাধীরপ্রকৃতি—প্রকৃতিকে ধীরে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পাক করিয়াছ?' প্রকৃতি কৃতার্থ হইলেন—বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—'পাক করিয়া বসিয়া আছি।' বৃহস্পতি পুনর জিজ্ঞাসিলেন—'গায়ত্রী কোথায়?' প্রকৃতি বলিলেন আশ্রমে নাই, অহুল তাহার তল্লাসে গিয়াছে। বৃহস্পতি ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। এই অবসরে প্রকৃতি তাঁহার পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন।—বৃহস্পতি পা ধুইয়া বলিলেন—'তুমি কতগুলিন পাতারি প্রস্তুত করিয়া রাখ—আমি গোময়জলে স্থান পরিষ্কার করিয়া আসন পাতিয়া রাখি।' প্রকৃতি পতির আদেশ পালন করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। পতির দুর্দ্দশার কারণ জানিতেও তাহার হৃদয় ব্যথা পাইল—এই জন্যই এতক্ষণ তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মনে করিয়াছেন, স্বামী আহারাদি করিয়া সুস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিবেন। অল্পক্ষণের মধ্যে মুনিসমাগমে বৃহস্পতির ক্ষুদ্র আশ্রম পূর্ণ হইল। বৃহস্পতি একে একে সকলকেই পাদ্য অর্ঘ দিয়া বসাইলেন। আশ্রমবেষ্টিত নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী তাহাদের মস্তকে শীতল ছায়া দান করিল। বায়ু শাখা পল্লব হিল্লোল করিয়া তাহাদের শ্রান্তি দূর ও ঘর্ম্ম মোচন করিতে লাগিল। কিন্তু আজি কাহারই মনে সুখ নাই। বৃক্ষশাখায় একটি কোকিল কুহুরবের তরঙ্গ তুলিতেছিল—এক কোপনপ্রকৃতি ঋষি লোষ্ট্রক্ষেপণ করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া আর একটি ঋষি বলিলেন 'ওহে নিরীহ কোকিলের কি অপরাধ, যাহার অপরাধ তাহার কি করিতে পারিয়াছ বল?'—'আপনারা যখন অশক্ত, তখন আমি কি করিতে পারি, নতুবা দৈত্যদমনে অসাধ কাহার?'—এই কথা বলিয়া তিনি বসিলেন। আর একজন বৃদ্ধ ঋষি তখন গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন 'আমি দেখিতেছি দৈবকার্য্য বিলোপ হইল, আর অর্ব্বুদশিখরে কেহ যাইবে না। আর নিঃশঙ্কমনে কেহ যাগযজ্ঞ করিতে পাইবে না, ঋষিগণ আর সামগান উচ্চরবে করিতে পারিবেন না, যেখানে তাহার অনুষ্ঠান হইবে, সেই খানেই নিরীশ্বরবাদী ও ধর্ম্মদ্বেষী দৈত্যগণ উপস্থিত হইয়া বাধা জন্মাইবে—শুদ্ধ বাধা নহে অপমান করিবে, ক্রমে এই পবিত্রস্থান পাপভূমি হইয়া উঠিল,—সুতরাং ইহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য—হয়, স্থান ত্যাগ, নয় দৈত্য দমন করা উচিত। আজ কি লোমহর্ষণ ব্যাপার চক্ষে দেখিলাম!! হায় হায়, শত শত পূজনীয় মুনি ঋষি আবু শিরে আজ কেমন নিষ্ঠুরতাসহ অপমানিত হইয়াছেন—আমি বলি চল, সবে মিলি এদেশ ছাড়িয়া পলায়ন করি?'—ইহা শুনিয়া সকলেই এ উহার মুখপানে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।—এমন সময় এ-

কটি ঋষিযুবা উচ্চরবে বলিয়া উঠিলেন—এখনও পালাইবার সময় হয় নাই। এখনও মুনি ঋষিগণের ছিন্নগুম্ফ শ্মশ্রু আছে, এখনও ব্রাহ্মণগণের গলে যজ্ঞসূত্র আছে, এখনও তাঁহাদের অনেকেই অক্ষত দেহে আছেন, এখনও তাঁহাদের রমণীগণ অপহৃতা হন নাই। ঋষিযুবার এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তি এরূপ সতেজে স্ফুরিত হইল যেন তাহার প্রত্যেক শব্দ মুনিমণ্ডলীর অন্তরের স্তরে স্তরে যাইয়া বিদ্যুৎবৎ চমকিতে লাগিল। এই যুবার নাম শৃঙ্গধর, ইনি ঋষিপ্রধান বিশ্বামিত্রের পালক পুত্র।'

শৃঙ্গধরের তেজগর্ভ বাক্যে বিনায়ক নামক এক বৃদ্ধ মুনি হাসিয়া বলিলেন, 'বাপু ক্ষান্ত হও, এবারে আমাদের দাঁড়ি গোঁফ ছিঁড়িয়া দিয়াছে, ইহার পর প্রাণ যাইবে। তোমার যে দাঁড়ি গোঁফ উঠে নাই, যন্ত্রণা কি বুঝিতে পারনা,—আমরা তাহা বুঝিতেছি। দৈত্য দমন দেবের অসাধ্য—নরে কি করিবে"। ইহাতে কয়েকজন বৃদ্ধ ঋষি হাসিলেন। সে হাস্য শৃঙ্গধরের শেলসম হৃদয়ে বিদ্ধ হইল,—তিনি এবারে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—'দৈত্য-পদ-দলন সহিতে পারা অপেক্ষা মরাও ভাল। আর যাঁহারা তাহাদের ভয়ে ব্যাকুল আমি নিশ্চয় কহিতেছি শত যাগ যজ্ঞ করিলেও তাঁহারা পরমার্থ লভিতে পারিবেন না, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য তপে যপে দেহ কঙ্কালাবশিষ্ট করিতে পারেন, যাঁহারা শুষ্ক বায়ু গ্রহণে কি অনশনে সুদীর্ঘকাল প্রাণধারণ করিতে পারেন, শারীরিক কষ্ট সহ্য যাঁহারা সুখের কারণ মনে করেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে কোন্ কার্য্য না সম্পন্ন করিতে পারেন? যে ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের প্রধান মানস পুত্র—যে ব্রাহ্মণ বীরজনক—রাজ জনক—ইচ্ছায় যাঁহারা শত শত সম্রাট গড়িতে পারিতেন, ইচ্ছায় সম্রাটকে ভিক্ষোপজীবী করিতে পারিতেন, আমরা কি সেই আর্য্যশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশধর নই? ক্ষত্রিয় কুপথগামী হইয়াছে—রাজগণ অশক্ত হইয়াছেন,—তাই বলিয়া কি ব্রাহ্মণ অশক্ত হইবেন,—আমরা ইচ্ছা করিলে আবার ক্ষত্রিয়—আবার বীর্য্যবান রাজা বানাইতে পারি—পারি কেন, তাহাই করিব—নিশ্চয় করিব—স্বয়ং ঋষিত্ব ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়ত্ব ধারণ করিব—যে কুঠারে সমিৎ আহরণ করিয়া থাকি ঐ কুঠারাঘাতে দৈত্য মুণ্ড খণ্ড করিব। আমরা একজন, শতজন বা সহস্রজন নহি, একত্র হইলে কত সহস্র হইব। পরশুরামের এক কুঠারাঘাতে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইয়াছিল—আমাদের শতসহস্র কুঠারাঘাতে কি জন কএক দৈত্য দমিত হইবে না—অবশ্য হইবে'।

এবারে 'অবশ্য হইবে'—'অবশ্য হইবে' বলিয়া উৎসাহে মাতিয়া সমস্ত মুনি ঋষি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কাহারো যজ্ঞোপবিত স্কন্ধচ্যুত, কাহারো বা কটির বসন খসিয়া পড়িল। সেই বৃদ্ধ বিনায়ক ঋষিই আবার অস্থিময় ভুজ-যষ্টি তুলিয়া বলিলেন, 'শৃঙ্গধর তুমি চিরজীবী হও, আমার যে উঠিবার শক্তি নাই,—

আমিও যাগ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে অস্ত্রধারণ করিব।' তখন 'আমরাও অস্ত্র লইব,—আমরাও যুদ্ধ করিব' বলিয়া ঋষিগণ সকলেই উৎক্ষিপ্ত হইল। বৃহস্পতি এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই—তিনি এখন বলিলেন 'এ পরামর্শ সুযৌক্তিক বটে। আর সময় নষ্ট না করিয়া শীঘ্র যাহাতে দল পুষ্ট হয় তাহা করাই এখন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।' শৃঙ্গধর বলিলেন 'অন্ততঃ চারি শত ব্রাহ্মণ একত্র করিয়া আমি কালি প্রত্যূষেই দৈত্য প্রোথিত নিশান অর্ব্বুদ বক্ষ হইতে তুলিয়া ফেলিব'। বৃহস্পতি বলিলেন, যাহা কর্ত্তব্য হয় রজনীতে স্থিরীকৃত হইবে, সকলেই সারাদিন উপবাসী, পাক প্রস্তুত হইয়াছে, এখন সকলে আহারে বসিলে ভাল হয়। আহারের কথা মনে উদয় হইয়া মুনিদের বিলুপ্ত ক্ষুধানল জ্বলিয়া উঠিল সকলে আহারে বসিলেন। অহ্নলের অনাগমে প্রকৃতি বিমর্ষ হইলেন, এক এক বার গায়ত্রীর উপর রাগ হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভোজন।

মুনিগণ ভোজনে বসিলেন। প্রকৃতি তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মাংস, অন্ন, সোম রস, ও দুগ্ধ প্রচুর। যাহার যাহা প্রিয় তাহাই তাহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ বিনায়ক মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু অদ্য মাংসের সুগন্ধে তাঁহার রসনা কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। প্রকৃতি দেবী মাংসপাত্র হস্তে তাহার সমীপস্থ হইলে—তিনি একবার বলিলেন 'মাংস ত, পরিত্যাগ করিয়াছিলাম—কিন্তু—' সকলে তাহার দিগে চাহিয়া হাসিল, বৃহস্পতি বলিলেন—'মাংস দাও।' বিনায়ক কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না, বলিলেন 'আচ্ছা দিন, ওঁরা যখন অনুরোধ করিতেছেন'—সকলে আবার হাসিল। প্রকৃতি তাঁহার পাত্রে মাংস এবং বৎসতরীর মস্তকটি দিয়া গেলেন। বিনায়ক বয়সে সকলের বড় সুতরাং তাহাকে মস্তক দেওয়া সম্ভ্রমজনক এবং সঙ্গত হইল। যুবকেরা বিরক্ত হইলেন—একজন আর একজনকে অস্ফুটরবে বলিলেন, 'দেখ বৃদ্ধের একটিও দন্ত নাই এত বড় মুণ্ড কিরূপে চর্ব্বণ করিবে?' কথা বৃদ্ধের কর্ণে গেল—তিনি হাসিয়া বলিলেন, —'ভাইরে! আমার দেড়শত বৎসর বয়স হইয়াছে, শত বৎসর যাবত দন্তশূন্য হইয়াছি—এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অন্যূন দুই তিন শত মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়াছি, ভাবনা করিও না—অস্থলে সুখাদ্য মুণ্ড পতিত হয় নাই—দেখ আমার দন্ত-মাংস তোমাদের দাঁত হইতেও কত শক্ত'—এই বলিয়া সবলে মুণ্ডের একভাগ মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন—তাহার বিকট বদন দেখিয়া কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। দুই বার মুণ্ড পিছলিয়া বাহির হইয়া পড়িল, দুইবার তাহা ঠেলিয়া মুখের মধ্যে দিলেন এবং বহুচেষ্টার পর উভয় দন্ত পাড়িয়া মাংসশ্রেণীর মধ্যে রাখিয়া এরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্পেষণ করিলেন যে, অচিরে একটি শব্দ

হইয়া উহা চূর্ণ হইয়া গেল—ঝোল এবং মস্তিষ্কসমূহ তাহার মুখে না পড়িয়া ওষ্ঠদ্বয়ের দুই পার্শ্ব বহিয়া বক্ষ ও শ্মশ্রু আপ্লুত করিল।—অমনি চর্ব্বণ করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন 'হুঃ কেমন, বুড় বলিয়া আর ঘৃণা করিবে?' যুবকেরা হাসিতে লাগিল। শৃঙ্গধরও হাসিয়া বলিলেন 'ঠাকুর দাদা, শুদ্ধ একটি বাছুরের মাতা খাইলেই আপনি বলবান হইবেন না—যুবকদের সঙ্গে থাকিয়া এমনই বড় শত্রু নিপাত করিতে পারিবেন ত,—নতুবা আমরা পেটুক বলিয়া কিন্তু হাতে তালি দিব,'—বিনায়ক হাসিয়া বলিলেন, 'দাদা তা তুমি দেখিয়া লইও—তোমরা উভরড়ে পালাইলেও এ বুড় কিছু হটিবার নয়—কৈ—মা সোমরস লইয়া আইস।' প্রকৃতি তাড়াতাড়ি আর এক মৃণ্ময়পাত্রে সোমসুধা আনিয়া দিলেন,—বৃদ্ধ মস্তক নাড়িয়া বলিলেন—এরূপ আরো চারি পাত্র ত আনিয়া দাও মা,—নহিলে এত গুল মাংস জঠরে পরিপাক পাইবে কেন? প্রকৃতি হাসিয়া একবারে একভাণ্ড সোম আনিয়া তাহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। দ্রব পদার্থ পাত্রান্তর করিতে হইলে যতটুক সময় লাগে, বৃদ্ধের সোমভাণ্ড উদরস্থ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। বৃদ্ধ ভয়ঙ্করনাদে একটি উদ্গার ছাড়িয়া বামহস্ত উদরে পরামর্শ করিতে করিতে বলিলেন—'ঔঃ—ওঃ—আজ খুব হইল'। শৃঙ্গধর বলিলেন 'ঠাকুরদাদা তবে এখন পত্রত্যাগ করিবার বিলম্ব কি?'—বৃদ্ধ জলগণ্ডূষ করিতে করিতে বলিলেন 'হুঃ'—যথা বিধানে সকলে পত্রত্যাগ করিলেন এবং আচমনাদি করিয়া হরিতকীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি খণ্ডীকৃত হরিতকী, ভোক্তৃগণকে দিলেন।

সোমপানে প্রমত্ত ঋষিগণ দৈত্যদমন করিবার উপায় স্থির করিতে করিতে বিদায় হইলেন—আগামী কল্য শত্রুর প্রোথিত নিশান ফেলাইয়া দেওয়া হইবে এবং যুদ্ধ বাধিলে যুদ্ধও করিতে হইবে ইহা স্থির হইয়া গেল। বিনায়ক অতিপানহেতু যাইতে অশক্ত সুতরাং বৃহস্পতি তাঁহাকে আপন মৃগাজিনে শয়ন করাইলেন।

এদিগে প্রতিবেশিনী শূদ্র রমণীগণ আসিয়া ভোজনাবশিষ্ট লইয়া স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিল।

প্রকৃতি তিনখানি পাতারি প্রস্তুত করিলেন, দুইখানি কন্যার ও নিজের, একখানি অঙ্কুলের।—কিন্তু উহারা এখন আসিতেছে না—ইহাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন।—বৃহস্পতি নিদ্রিত বিনায়ক ঋষির একপার্শ্বে বসিয়া তাল পত্রে কি লিখিতেছেন।—প্রকৃতিকে নিকট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আহার করিতেছ না কেন?"

প্রকৃতী বলিলেন, 'গায়ত্রী কোথায় গেল জানি না, অঙ্কুল অনুসন্ধানে গেল, সেও ফিরে আসিতেছে না—আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছি'।

বৃহস্পতি অতি ব্যস্ততাসহকারে খুঁতি পুথী রাখিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'কি—

তারা আসে নাই!!! আচ্ছা তুমি যাইয়া আহার কর, আমি স্বয়ং দেখিয়া আসিতেছি।'—এই বলিয়া বৃহস্পতি বাহিরে চলিলেন। প্রকৃতি আহার করিবেন কি অধিকতর চিন্তিতা হইয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং অস্ফুটশব্দে আপনা আপনি—বলিলেন 'কপালে কি আছে জানি না, গায়ত্রী কোথায় গেল, তার জন্য অহুল গেল সেও এল না, এখন ইনিই বা কোথায় চলিলেন—গায়ত্রীকে পাইলে ত অহুলই তাহাকে লইয়া আসিত—এখন করি কি?' এমন সময় আর এক বিপদ ঘটিল। বিনায়ক অধিক মাত্রায় মদ্য পানে বমন ও চিৎকার আরম্ভ করিলেন। গৃহে উপস্থিত অতিথির সৎকার না করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, এমন কি তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা কুল, মান, লজ্জা ও সম্পদ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন—প্রকৃতি অনাহারা, পরিশ্রান্তা এবং সর্ব্বোপরি চিন্তিতা, তথাপি বৃদ্ধ ঋষির শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন।—তাঁহার শরীরোপরি কত বমন উদ্গীরিত হইতেছে তাহাতে দৃক্‌পাৎশূন্য, কেমন করিয়া ঋষি স্থির হইবেন, কি করিলে তাঁহার নিদ্রা হইবে, এবং যন্ত্রণা দূর হইবে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—এরূপ চেষ্টার ফলে মুনি অনেক সুস্থ হইলেন এবং অর্দ্ধনিদ্রায় অর্দ্ধমত্ততায় বলিতে লাগিলেন—'কে ও অন্নপূর্ণা—আমি কি কাশীতে মা?'—প্রকৃতি বলিলেন—'পিতঃ! নিদ্রা আসুন, কিছুকাল স্থির হইয়া থাকুন?' বৃদ্ধ পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন,—'কে—মা, তুমি তবে কি আমার মা—মা—মা—তোমার পাদপদ্ম দাও,—প্রণাম করি বক্ষে ধারণ, করি,—এই কথা বলিয়া আবার প্রণাম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি নিতান্ত লজ্জিতা এবং ভীতা হইয়া তাহার মাতা ধরিয়া শয়ন করাইলেন—'মা আমি যে তোমার ছোট খোকাটি কোলে লও মা,—তুমি কি—দুর্গা—শারদা বরদা ঈশানী, মোক্ষদা, মা বরং দেহী মোক্ষং'—প্রভৃতি প্রলাপ বলিতে বলিতে ক্রমে বৃদ্ধের ক্ষীণস্বর হইল এবং নিদ্রা আসিল।

দিন গেল, রজনী আসিল। তথাপি গায়ত্রী কি অহুল আসিল না। বৃহস্পতি গালে হাত দিয়া অবশের মত আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রকৃতি কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কান্দিতে কান্দিতে দীপ জ্বালিলেন। কান্দিতে কান্দিতে স্বামীর পা ধুইবার জল ও সন্ধ্যা আহ্নিকের স্থান করিয়া দিলেন।

বৃহস্পতি সন্ধ্যা আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া বলিলেন 'দুর্ভাগিনীর জন্মকোষ্ঠী খানি দাও দেখি?'—প্রকৃতি তাহা দিলে তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বিশেষ করিয়া দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন—ঐ সঙ্গে তাঁহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল। প্রকৃতি, কান্দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিধাতার তবে কি ইচ্ছা?' বৃহস্পতি অশ্রু মোচন করিয়া ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন—'ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময় গায়ত্রীর অশুভ যোগ লিখা ছিল—হিসাব করিয়া

দেখিলাম তাহা পূর্ণ হইয়াছে ?' প্রকৃতি অধীরা হইয়া বলিলেন 'কি হইয়াছে ?' "দৈত্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইবে—তাহাই হইয়াছে' এই বলিয়া বৃহস্পতি নীরবে পুনঃ চিন্তা মগ্ন হইলেন। প্রকৃতি 'হা গায়ত্রী হা মা তোমার কপালে এই ছিল,' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এবারে বৃহস্পতির মুখমণ্ডল সহসা উজ্জ্বল হইল। বদন প্রসন্ন হইল—ডাকিয়া বলিলেন 'প্রকৃতি! দুঃখ করিও না, সীতাহরণ রক্ষকুল-নিধনের হেতুভূত হইয়াছিল। গায়ত্রী হরণে দৈত্য কুল নিধন হইবে·ইহা বিধিলিপি—আমি দেখিতেছি'। এই বলিয়া স্নেহ ভরে, প্রকৃতির নয়ন জল মুছিতে মুছিতে দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইয়া বলিলেন 'চল শ্রীমৎ বিনায়ক মহর্ষীকে দেখিয়া আসি—তিনি বোধ হয় এতক্ষণ সুস্থির হইয়া থাকিবেন—একথা শুনিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন'। প্রকৃতি নীরবে কান্দিতে কান্দিতে—স্বামী সঙ্গে চলিলেন।

আশ্চর্য্য !!—বিনায়ক ঋষি গৃহে নাই। বৃহস্পতি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—'কোপনস্বভাব বৃদ্ধ ঋষি যথাযোগ্য সৎকার নাপাইয়া হয়ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন —নতুবা নাজানাইয়া যাইবেন কেন ?'। প্রকৃতি ব্যথিতা হইলেন—ভীতা হইলেন, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—ভয় শোক এবং চিন্তায়—ক্ষীণ কম্পিত স্বরে বলিলেন 'মা জগদীশ তুমি জান জ্ঞান-স্বত্রে মুনির অবমাননা কি করিয়াছি'?

বৃহস্পতি প্রকৃতির নিষ্কলঙ্ক বদন পাঠ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, প্রকৃতি! তোমাতে আমার অবিশ্বাস নাই, তুমি নারীকুলের আদর্শ স্থানীয়,আমাহইতেই ঋষির অবমাননা হইয়া থাকিবে,—আমি, গায়ত্রীর অনুসন্ধানে গিয়া স্বয়ং তাঁহার কোন শুশ্রূষা করিতে পারি নাই, আমি এখনই তাঁহার আশ্রমে যাইব'।

বৃহস্পতি চলিয়া গেলে প্রকৃতি চিন্তাকুলিত হৃদয়ে—অভাগিনী গায়ত্রীর জন্ম কোষ্ঠি হাতে করিয়া বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আবু হইতে উদয়পুর যাইবার মধ্যপথে আরাবলী সঙ্কটে একটি যুবক বেড়াইতেছেন।—অশ্ব পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন—সে ঘাস খাইতেছে। এমন সময় রোদন ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল, তাঁহার বোধ হইল নিকটে কে কান্দিতেছে। সুতরাং কৌতূহল পরবশ হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।—ক্রন্দন ক্রমেই নিকট শুনা যাইতে লাগিল, অথচ চারিদিগে বেড়াইয়া কিছুই দেখিতে পান না। এমন সময় একটি বন্য বিড়াল একটুকরা রুটি মুখে করিয়া তাঁহার পার্শ্বদিয়া আসিয়া বাহির হইল, তিনি বিশেষ করিয়া দেখিলেন একটি প্রকাণ্ড বিবর। তাহার মুখে একখানি পাথর চাপা রহিয়াছে, বিবর ও পাথর একাকার নহে এই জন্য এক পাশে কিঞ্চিত ফাক্ রহিয়া গিয়াছে ঐ ফাক দিয়া বিড়াল বাহির হইয়াছে। তিনি ধীরে

ধীরে আসিয়া সুরঙ্গের নিকট কান পাতিয়া থাকিলেন,—এখন কথা স্পষ্টরূপে শুনা যাইতে লাগিল। কথা অধিক নহে, ক্রন্দন এবং প্রহার শব্দই অধিক।—

যুবক যেমন সাহসী, তেমনই দয়ালু সুতরাং জীবন ভয় না করিয়া—গহ্বরে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা বিফল হইল, কিন্তু বারম্বার পদাঘাত করায় প্রস্তরে ঠেকিয়া শব্দ হইতে লাগিল। তাহার প্রত্যুত্তরে ভিতর হইতে একটি তীর আসিয়া পড়িল সৌভাগ্য বশতঃ তাহা যুবকের গায় লাগিল না। তীরটি তুলিয়া তাহার ফলা দেখিয়া বুঝিলেন এ পরিচিত তীর।—ইহাতে পারশ-নাথের সর্পলাঞ্ছিত রহিয়াছে। সাহস হইল, চিৎকার করিয়া বলিলেন,—'কে ইহার মধ্যে আছ, পারশ নাথের দোহাই, বাহির হইয়া আইস'। এবারে আর একটি তীর আসিল। ইহাতে যুবক ক্রুদ্ধ এবং চমৎকৃত হইলেন। এমন সময় পদ-শব্দ হইল, পশ্চাত ফিরিয়া দেখেন কে আসিতেছে। আগন্তুক গহ্বরের নিকট আসিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। বিস্ময় ও ভয়ে তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল। যুবক তাহাকে চিনিতে পারিলেন—দাঁড়াইয়া বলিলেন 'আমার সঙ্গে আইস'। আগন্তুক কলের পুতুলের মত তাঁহার সঙ্গে চলিল। কিছু দূর যাইয়া যুবক বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন 'শিলাসিং! সত্য বলিও নচেৎ এইখানে তোমার জীবন শেষ হইবে—এগিরিসঙ্কটে কে বাস করে?'। —শিলা ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল—'ভীমদণ্ড সপরিবারে থাকে'। যুবক বলিলেন সাবধান মিথ্যা কথা বলিওনা—, তালিকায় ভীমদণ্ড অবিবাহিত লিখাইয়াছে'। শিলার জিহ্বা শুষ্ক হইল, কিছু কাল চিন্তার পর বলিল—'আজ্ঞে, পরে বিবাহ করিয়াছে'।—যুবক বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'আমি ঐ স্থানে স্বয়ং যাইব পথ দেখাইয়া দাও'। শিলা ভীত হইয়া ইতস্তত: করিয়া বলিল?—'এ সামান্য স্থানে আপনি যাইবেন না!'।—'আমি নিশ্চয় যাইব। পথ দেখাও, আর, মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবে ত কাটিয়া দুইখান করিব'।—এই কথা বলিয়া তরবারী উঠাইলেন। শিলা প্রাণের ভয়ে 'বন্ধু বন্ধু বন্ধু'—বলিয়া তিনবার ডাকিল —ইহা ভীমদণ্ডের সাঙ্কেতিক শব্দ। সুতরাং নিঃসন্দেহে সুরঙ্গদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। যুবক ভিতরে প্রবেশ করিলেন— শিলা ভীমের ভয়ে বাহিরে পলাইয়া রহিল। ভীম যুবককে দেখিয়া ব্যাকুল হইল। গহ্বরে একটি বৃদ্ধা ও একটি বালিকা ছিল— বৃদ্ধা ও ভীতা হইল—বালিকার কেবল ভরসা ও সাহস হইল—সেযুবকের পদতলে লুটাইয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিল—'আমার প্রাণ গেল তোমার পায় ধরি, মিনতি করি, আমায় উদ্ধার কর'—আবার পৃষ্ঠের ও হাতের ক্ষত স্থান দেখাইয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল 'তুমিও কি নিষ্ঠুর—দয়া নাই, দেখ আমার কি করিয়াছে— আমাকে মারিয়াছে, আরো মারিবে, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর—আমাকে চুরি করিয়া মারিয়া ফেলিবে—রক্ষা

কর"—। পরম রূপবতী বালিকার এহেন দশা দেখিয়া যুবক মনোবেদনা পাইলেন—তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন 'ভয় নাই—আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আসিয়াছি'। ভয়ঙ্কর বিপদে এই আশ্বাসবাক্য শুনিয়া বালিকার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। যুবক ভীমদণ্ডের প্রতি রোষকষাইত লোচনে চাহিয়া বলিলেন—'এ সকল কি?' ভীম হাতযোড় করিয়া বলিল 'স্ত্রী অবধ্যা হইলে যাহা করিতে হয় তাহাই করিয়াছি'। যুবক গম্ভীরশব্দে বলিলেন, 'মিথ্যা বলিও না, নরাধমের মত কাজ করিয়াছ—তোমার শরীরে কি একটুও দয়া নাই'— অমনি বালিকা সঙ্গে সঙ্গে কান্দিয়া বলিল 'না—একটুও দয়া নাই।' যুবক আর একবার বালিকার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন—দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—আহা এ রূপরাশি অতুলনীয়।—যতবার দেখিলেন তাহার স্নেহ ততই ঘনীভূত হইতে লাগিল। ভীমকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমার সঙ্গে আইস, প্রমাণ ব্যতীত ইহাকে তুমি পাইবে না—ভীম মনে মনে ভাবিল ইহাকে দিলে যদি আমার মঙ্গল হয় তবে দিই।—পরে প্রকাশ্যে বলিল আপনি ইহাকে বরং লইয়া যান—পরে বিবাহের প্রমাণ দিতে পারি ইহাকে লইব।

যুবক কিছু বলিলেন না, বালিকার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন এবং সত্বরে অশ্বারোহণ করিয়া তাহাকে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। ইঙ্গিতমাত্র তেজবান অশ্ব বেগে ধাবিত হইল।

যুবক চলিয়া গেলে শিলাসিংহ বাহির হইল, ভীমদণ্ড তাহাকে দেখিয়া বলিল—'বুঝিয়াছি এ তোমারই কাম,—নহিলে কাহার সাধ্য এ গুপ্ত স্থানের বিষয় জানিতে পারে—তুমিই সেনাপতিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলে?"

শিলা নানামত বুঝাইবার চেষ্টা করিল, ভীম বুঝিল না।—ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—'তুই নরাধম, বিশ্বাসঘাতক,—আমি তোরে সমুচিত প্রতিফল এখনি দিতেছি'। শিলা বলিল, 'তুমি চিরদিনই নির্ব্বোধ, এখন আবার রাগে অন্ধ হইয়াছ—তোমাকে প্রবোধ দেওয়া আমার অসাধ্য।—আমি কি করিয়াছি যে তুমি আমার শত্রু হইলে?' ভীম কথার আর কোন উত্তর না দিয়া আবার গহ্বরে প্রবিষ্ট হইল—শিলা বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল—এমন সময় ভীম তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল—বলিল, 'বিশ্বাসঘাতক! ভাবিয়াছ অক্ষতদেহে চলিয়া যাইবে?'—শিলা চাহিয়া দেখে ভীমের হস্তে তরবারী। তাহার ভয় হইল, বলিল 'ভীম, আমি তোমাকে ভয় করি না,—প্রাণের জন্যও ডরাই না,—যদি একান্তই আমার শত্রু হইয়া থাক শত্রুতা কর—ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি নিরস্ত্র, আমার হাতে এখন একখানি সামান্য ছড়ি থাকিলেও দেখিতাম তুমি কেমন ভীম'। ভীম অহঙ্কার করিয়া বলিল—'গহ্বরের দ্বার খোলা রহিয়াছে—যাও অস্ত্র লইয়া আইস'। শিলা গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দ্বার আঁটিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—'ভীম আমি

তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, বিনা অস্ত্রে তোমার সর্ব্বনাশ করিব'। ইহা শুনিয়া ভীমের চৈতন্য হইল, মনে মনে ভাবিল আমি নিতান্তই নির্ব্বোধ—কি জন্য শিলাকে গহ্বরে পাঠাইলাম। এখন কি করি—কোথা যাই, বাহির হইতে দ্বারও ত খোলা যাইবে না,—সেনাপতিকে গহ্বর মধ্যে মারিয়া ফেলিলাম না কেন,—আমার বিচার হইবে, দণ্ড হইবে,—নানাদিগে গোল বাধাইয়া ফেলিয়াছি—উপায় কি হইবে—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বসিয়া পড়িল, তাহার মাতা ঘুরিতে লাগিল। তরবারি খানি ভূমিতে রাখিয়া গালে হাত দিয়া আরো চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা অনেকক্ষণ করিতে হইল না,—হটাৎ চমকিয়া উঠিল, পশ্চাৎ ফিরিল—কে তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছে—চাহিয়া দেখে এক ব্রাহ্মণকুমার।—ভ্রুকুটি করিয়া বলিল 'কে তুমি?' ব্রাহ্মণকুমার তেমনই ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, 'তোমার যম'। ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারী ধরিবার জন্য পার্শ্বে হাত দিয়া অবাক হইল, তরবারী নাই। ব্রাহ্মণকুমার হাসিয়া বলিল তোমার তরবারী আমার হাতে। ভীম তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া দূরে সরিয়া গেল, ইহাতে ব্রাহ্মণকুমার তরবারী মৃত্তিকায় ফেলাইয়া ধনুকে টঙ্কার দিয়া বলিল কিছুতেই নিস্তার নাই পালাইলে তীর মারিব।" ভীম আগন্তুকের প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া উচ্চ রবে বলিল, 'তুমিই কি অতুল?'—আগন্তুক বিস্মিত হইয়া বলিল 'আমার নাম অতুল।' ভীম বলিল 'কি চাও তুমি?'

'প্রকৃত সম্বাদ বা তোমার ছিন্নমুণ্ড।'

'কি সম্বাদ জানিতে চাও?'

'তুমি অথবা তোমার দলের কেহ একটি মুনি-বালিকা চুরি করিয়াছে?' ভীম কিছু কাল চিন্তা করিয়া বলিল—'আমাকে কোন্ দলের স্থির করিয়াছ?' অতুল বিরক্ত হইয়া বলিল 'তোমার মত অনেকের মাতা কাড়িয়াছি—তুমি অসুর—শীঘ্র উত্তর দাও?' ভীম মনে মনে ভাবিল—বালিকা আমার হাত ছাড়া হইয়াছে, এখন তাহার কথা বলিলেই বা আমার ক্ষতি কি? প্রকাশ্যে বলিল,—বালিকার কথা বলিতে পারি। অতুল সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'শীঘ্র বল যথার্থ বলিলে বিপদ সময়ে আমি তোমার উপকার করিব।' ভীম বলিল 'যথার্থ কহিতেছি, আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ সূর্য্য নাথ একটি পরম রূপবতী ব্রাহ্মণ কন্যা আনিয়া বিবাহ করিয়াছেন।' অতুল বিকৃত বদনে বলিল, 'কিরূপে আনিয়াছে?'

ভীম—'তাহা আমি জানিনা।'

অতুল—'ব্রাহ্মণ বালিকার নাম শুনিয়াছ?'

ভীম—'গায়ত্রী।'

অতুল কিছুকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া বলিল—'আর জানিতে চাইনা, হইয়াছে?' এই বলিয়া বেগে প্রস্থান করিল—যাইবার কালে ভূপতিত তরবারী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

অস্থল গেল, কিন্তু ভীমের বিপদ গেল-না। চারিজন বৌদ্ধ সৈন্য আসিয়া ভীমকে লইয়া গেল। ভীম বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত কারাগারে রহিল।

প্রাচীন ভারত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথমে বলিয়াছি আর্য্যগণ চারি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত ছিলেন ; যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এক্ষণে তাঁহাদের কার্য্য ও বিবরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে ; পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আর্য্য সমাজের প্রথমাবস্থায় জাতিভেদ প্রথা ছিল না ; ইহা পরবর্ত্তী কালের সৃজিত। এক্ষণে দেখাযাউক, কোন্ সময় হইতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে ; ইহা দেখিতে গেলে আমাদিগকে আর্য্যজাতির প্রথম পুস্তক ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করিতে হয় ; ইহার একস্থলে আমরা জাতি-প্রথার আভাস প্রাপ্ত হই, যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূযদস্য তদ্বৈশ্যঃপদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

পুরুষ সূক্ত,১০ ম মণ্ডল, ৯০ ঋক।

ঋগ্বেদের যেস্থলে এই শ্লোকটি আছে তাহার উপরের কতিপয় শ্লোকের অর্থ এইরূপ "তাহা হইতে বিরাজ জন্মগ্রহণ করেন—বিরাজ হইতে পুরুষ। দেবতা ও ঋষিগণ এই পুরুষকে বলি প্রদান করিয়া একটি যজ্ঞ সমাধা করেন।" তদনন্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতেছে 'এই পুরুষের মুখ কি হইল এবং তাহার বাহু, ও উরু ও পদদ্বয়ই বা কোথায় গেল?' তাহার উত্তরে যে শ্লোক, তাহা আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি ; ইহার অর্থ, 'ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় বা রাজন্য তাঁহার বাহুদ্বয়—বৈশ্য তাঁহার উরু এবং শূদ্র তাঁহার পদদ্বয়।'

মনু প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণও চারিবর্ণ সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন *। আমাদের বিবেচনায় ইহার এক বিভিন্ন অথচ গভীর অর্থ আছে ; পূর্ব্বে বলিয়াছি 'কোন সমাজকে সুশৃঙ্খলে ও স্থায়ীরূপে রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মালোচক, দেশ-রক্ষক, সমাজ পরিপালক, ও পরিশ্রম সহিষ্ণু, এই চারিপ্রকার লোক আবশ্যক এবং তাঁহারা ক্রমান্বয়ে লোককে ধর্ম্মোপদেশ, দেশ হইতে বিগ্রহাদি বিদূরিত করিয়া শান্তিস্থাপন, সমগ্র সমাজের অর্থ-সাহায্য ও ভরণ পোষণ এবং সকলের নিমিত্তই পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমাদের বিবে-

* মনুসংহিতা ১। ৩১।

চনায় ঐসকল শ্লোকের অর্থ, ইহার সহিত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মোপদেশ, সকলকে জ্ঞান শিক্ষা, হিত পরামর্শ দিবেন, তাঁহার কার্য্য কেবল মুখ হইতেই সম্পন্ন হইবে; তাঁহাদের কার্য্য সমাধা করিতে শরীরের অন্য কোন অঙ্গেরই বিশেষ আবশ্যকতা নাই, এই জন্যই ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন; ক্ষত্রিয় দেশ রক্ষা করিবেন—দেশ রক্ষা করিতে হইলে শত্রুর সহিত সম্মুখ সমর করিতে হইবে;—যুদ্ধ করিবার সময় বাহুই তরবারি ধারণের নিমিত্ত আবশ্যকীয় এবং বাহু বলই প্রধান বল; এ সময় অন্য কোন অঙ্গেরই তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, তাই ক্ষত্রিয় বাহু হইতে উৎপন্ন; বৈশ্য সমাজ পোষণ ও সকলেরই অর্থ সাহায্য করিবেন; অন্য কথায় তাঁহারা সমাজ বা রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ; রাজ্য বা সমাজ তাঁহাদেরই উপর নির্ম্মিত, কেননা তাঁহারা আহারাদি না যোগাইলে কিম্বা অর্থ সাহায্য না করিলে সমাজ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে, সমাজ, গৃহের ছাদ স্বরূপ, এই স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান থাকে; শরীর ও স্তম্ভ অর্থাৎ উরুদেশ অবলম্বন করিয়াই দণ্ডায়মান থাকে; দণ্ডায়মান রাখিবার নিমিত্ত অন্য কোন অঙ্গেরই তত আবশ্যকতা নাই, সেই জন্যই বৈশ্যগণ উরু হইতে সমুৎপন্ন। পরিশেষে শূদ্র; তাঁহারা সকলের জন্যই পরিশ্রম স্বীকার করিবেন এবং দেশ হইতে দেশান্তরে গতিবিধি করিবেন; পরিশ্রম ও গমনাগমনে পদদ্বয়ই অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয়, এই জন্যই শূদ্রগণ পদ হইতে উৎপন্ন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই স্বস্ব বৃত্তি-নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে হইলেও আপনাপন নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ও পদদ্বয়ের সাহায্য আবশ্যক, এদিকেও তাঁহারা আপনাপন কার্য্য করিতে গেলে শূদ্রের সাহায্য আবশ্যক— কেননা শূদ্র সকলেরই কার্য্য করিবেন; এবং এই জন্যই শূদ্রগণ পদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এইক্ষণে এই চারি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত আছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি; মনু চতুর্ব্বর্ণের এইরূপ বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্যতু তপোবার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্যসেবনং॥
মনুসংহিতা ১১ অধ্যায়। ২২৬

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের রক্ষণ, বৈশ্যের বার্ত্তাশাস্ত্র এবং শূদ্রের সেবাই তপ।

আরও

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নোঽষ্টসু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশীগুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতীসত্যরতঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যংদানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যত্রপাঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে ক্ষত্র সব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ॥
ইতি পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে ২৬ অধ্যায়।

ভগবান মনু ক্ষত্রিয়ের এইপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

বৈশ্যের এইপ্রকার ;—

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদান রুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

আর সকলের সেবা করাই শূদ্রের ধর্ম্ম। জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ এই রূপে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইয়া বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু যজুর্ব্বেদের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত ইহা অত্যন্ত শিথিল ছিল, পরে ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইয়া আইসে। মনুর সময়েও ইহা সম্পূর্ণ রূপে দৃঢ় বদ্ধ হয় নাই ; কেননা তাঁহার সময়েই সমাজে অনেক সঙ্করবর্ণ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে ; এক্ষণে তাহাদের বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্কর বর্ণ। সঙ্কর বর্ণ সম্বন্ধে ভগবান মনু এইরূপ লিখিয়াছেন যে, 'যে সকল বর্ণ উচ্চবর্ণীয় পুরুষ কর্ত্তৃক তাহার ঠিক নিম্নবর্ণীয়া কন্যা হইতে উৎপন্ন, তাহারা তাহাদের পিতার তুল্যবর্ণীয়—কিন্তু সমান নহে ; কেননা তাহাদের মাতার নীচত্ব জন্য তাহারা তাহাদের পিতা ও মাতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইতেছে *।' এই রূপে তিনটি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ; মনু সেই তিনটিকেই এক 'অনন্তরজ' শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন ; কিন্তু তদীয় টীকাকার কুল্লুকভট্ট যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে এই তিনটিরই পৃথক সংজ্ঞা দিয়াছেন। ফলতঃ তাহা মনুর অভিপ্রেত নহে বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। তদনন্তর ব্রাহ্মণ হইতে একান্তর বৈশ্যকন্যায় অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য, এবং দ্ব্যন্তর শূদ্র কন্যায় নিষাদ বা পারশব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় হইতে একান্তর শূদ্র কন্যায় উগ্র ; অনন্তর ইহাদের বিলোমে ও, সূত, আয়োগব প্রভৃতি অনেক সঙ্কর বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। মহাত্মা মনুর মতে অনন্তরজগণ দ্বিজাতি-সমান ক্রিয়া কলাপ করিতে সমর্থ ; তিনি লিখিয়াছেন ;—

স্বজাতিজানন্তরজা ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

অর্থাৎ যে তিনজন সমান বর্ণীয়া কন্যা হইতে এবং যে তিন পুত্র ঠিক পরবর্ণীয়া কন্যা হইতে উৎপন্ন, সেই ছয়জন দ্বিজাতির কার্য্য করিবেন। তদ্ব্যতীত যাঁহারা বিভিন্ন প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা নীচবর্ণীয় বলিয়া গণ্য, এবং সর্ব্ব প্রকারে শূদ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট †। মহর্ষি মনু ব্যতীত অপর অনেকেই সঙ্কর বর্ণ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—আমরা নানা পুরাণাদিতে তাহাদের বৃত্তান্ত দর্শন করিতে পারি ; বাহুল্য ভয়ে তৎসকল উল্লেখে ক্ষান্ত রহিলাম। এক্ষণে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহাই বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। সামাজিক অবস্থা বলিতে গেলে তাৎকালিকী হিন্দুগণের আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, বিবাহ পদ্ধতি, সমাজে স্ত্রীগণের স্থান ও অবস্থা ইত্যাদি অগ্রে আমাদের মানস ক্ষেত্রে সমুদিত হয় ; এই জন্য সেই সকলই প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিবাহ। বর্ত্তমান কালের শারীরতাত্ত্বিকগণ মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে, রক্ত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া বিবাহ করিবে ; বিজ্ঞা-

* মনুসংহিতা। ১০ অধ্যায় ৬ শ্লোক।

† মনুসংহিতা ১০। ৪১।

সাংলোচনার ভূয়সি চর্চ্চা হওয়াতেই ইদানীং এই সকল ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইতেছে। যেমন কোন কৃষক একই ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ একই প্রকার বীজ রোপণ করিলে সেই ক্ষেত্র ক্রমে অনুর্ব্বর ও শস্যোৎপাদনে অক্ষম হয়, সেইরূপ রক্ত সম্বন্ধ বর্জ্জন না করিয়া যদি বিবাহ করা যায়, তাহা হইলে, তদুৎপন্ন সন্তান ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার কখনই পরিদৃষ্ট হয় না। বিবাহের এই সুপ্রণালীর অভাব বশতঃই অনেক ইউরোপীয় রাজবংশ আত্মীয় কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া একবারে উৎসন্ন হইয়াছেন। স্পেন দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এইরূপ করিয়াই অকর্ম্মণ্য, জড়বৎ সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন; একদা দিগ্বিজয়ী মুসলমান সম্রাট গণের অধঃপাতের অন্যতম কারণ ইহাকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় মহর্ষিগণ, ইহার এই অপকারিতা বহু পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই ইহার নিষেধক ব্যবস্থাও প্রদান করিয়া গিয়াছেন; মনু বলিয়াছেন ‘যে কন্যা বিবাহার্থীর মাতার অসপিণ্ডা ও পিতার অসগোত্রা, দ্বিজগণ তাহাকেই বিবাহ করিবেন।’ বিষ্ণু বলিয়াছেন ‘সগোত্রা ও সমান প্রবরাতে বিবাহ করিবে না এবং মাতা হইতে পঞ্চমী, পিতা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না।’ নারদ প্রভৃতি ঋষিগণও এই কথাই বলিয়াছেন।

বিবাহ প্রণালী ঋগ্বেদের পূর্ব্ব সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু তাৎলিকী বিবরণ অপরিজ্ঞেয়; ঋগ্বেদে বিবাহ প্রথার সম্যক ইতিহাস পাওয়া সুকঠিন; ইহাতে কেবল মাত্র বর ও কন্যার আচরণগত কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাও তৃপ্তিকর নহে, সুতরাং তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে মনুসংহিতা, অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্র এবং পুরাণাদির সময় বিবাহের যে প্রকার পদ্ধতি ছিল তাহাই বিবৃত্ত করা যাইতেছে। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, হিন্দুগণের বিবাহ, আচার ও ব্যবহার এই উভয়াত্মক সংস্কার, ইহা ব্রাহ্মণাদি ছয় বর্ণের দশবিধ সংস্কারের শেষ সংস্কার এবং শূদ্রের ইহাই এক মাত্র বৈদিক সংস্কার। বিবাহ হিন্দুগণের অবশ্য-করণীয়; যিনি না করেন তিনি অনেক ধর্ম্ম-কার্য্য হইতে বঞ্চিত; তাঁহার অনেক প্রকার ধর্ম্ম-চর্য্যায় অধিকার নাই; মনু স্বীয় সংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, “তিন ঋণ (ঋষি ঋণ, পিতৃঋণ, ও দেব ঋণ) পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে; যিনি ঐ সকল ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষলাভার্থ চেষ্টা করেন, তাঁহার অধোগতি হয়; বিধিবৎ বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন এবং শক্তি অনুযায়ী যজ্ঞসমাধা করিলে ঐ তিন ঋণ পরিশোধিত হয় এবং তৎপরে মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে; *।” তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন না করিলে কেহ পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি-

* মনু ৬। ৩৫—৩৬।

তেন না; তিন ঋণের মধ্যে ইহাও এক প্রধান; সুতরাং পিতৃঋণ পরিশোধার্থ বিবাহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ পুত্র উৎপন্ন না হইলে লোকে কখন পুৎকুণ্ড নামক ভীষণ নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পায়না,—এইজন্য ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিয়া পুত্রোৎপাদন করা হিন্দুধর্ম্ম সঙ্গত ও না করিলে মহাপাপ বলিয়া গণ্য। সকল শাস্ত্রেই এই প্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রীগণের বিবাহই একমাত্র বৈদিক সংস্কার; মনু বলিয়াছেন;—

বৈবাহিকোবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিষ্ক্রিয়া॥

অর্থাৎ স্ত্রীগণের বিবাহই উপনয়ন, পতিসেবা গুরুকুলে বাস তুল্য এবং গৃহকর্ম্ম সায়ং প্রাতর্হোমাদি সদৃশ।

মনুর মতে বিবাহ অষ্ট প্রকার; যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ *। কাহারও কাহারও মতে প্রথম ছয় প্রকার বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব ব্রাহ্মণের; চারি প্রকার অর্থাৎ প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়ের, এবং প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব এই তিন প্রকার বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের প্রযুজ্য। আবার অনেকের মতে প্রথম চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, ও প্রাজাপত্য ব্রাহ্মণের; গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়ের; এবং আসুর প্রথা বৈশ্য ও শূদ্রের বিধেয়। মনু আসুর ও পৈশাচ বিবাহ অতিশয় অবৈধ ও অন্যায় বলিয়াছেন। অষ্ট প্রকার বিবাহের প্রকরণ যথা;—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

যজ্ঞেতু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মে কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রবক্ষতে॥ ২৮

একং গোমিথুন দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যা প্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ২৯

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যা প্রদান মভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধি স্মৃতঃ॥ ৩০

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈচৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ ৩১

ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ।
গান্ধর্ব্বো সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কাম সম্ভবঃ॥ ৩২

হত্বা ছিত্বাচ ভিত্বাচ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যা হরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥৩৩

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বরহোযত্রোপগচ্ছতি।
সপাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচ শ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩৪

আমরা নিম্নে ইহার অর্থ প্রদান করিলাম;—

ব্রাহ্ম—কন্যাকে একখানি বসনে আ-

* মনু ৩।২১।

চ্ছাদিত করিয়া একটি বেদজ্ঞ পণ্ডিতকে আহ্বান ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে দান করা যায়, সেই বিবাহের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ।

দৈব—কন্যাকে সুন্দর বসন ও অলঙ্কারে সজ্জিতা করিয়া, যজ্ঞে ব্রতী ঋত্বিককে যজ্ঞ সম্পাদন কালে যে দান করা যায়, তাহার নাম দৈব বিবাহ।

আর্ষ—বরের নিকট হইতে এক কিম্বা দুই গোমিথুন ধর্ম্মার্থে গ্রহণ করিয়া যথা বিধি যে কন্যা দান করা যায়, তাহার নাম আর্ষ বিবাহ।

প্রাজাপত্য—কন্যার পিতা 'তোমরা উভয়ে সংসার ও ধর্ম্মকর' এই কথা বলিয়া যে কন্যা দান করেন, তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

আসুর—কন্যার পিতাকে তাহার আত্মীয় বা স্বয়ং তাঁহাকে সাধ্যমত অর্থ প্রদান করিয়া যে বিবাহ করা হয়, তাহার নাম আসুর বিবাহ।

গান্ধর্ব্ব—বর ও কন্যার স্ব স্ব ইচ্ছা ক্রমে পরস্পর যে সম্মিলন হয়, তাহাই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিয়া আখ্যাতঃ। এই বিবাহ প্রায় কামাসক্ত ভাবেই হইয়া থাকে।

রাক্ষস—যুদ্ধে কন্যার পিতা বা আত্মীয়কে হত কিম্বা আহত করিয়া, পরের সাহায্য কামনায়স্থিতা রোদনপরায়ণা কন্যাকে বল পূর্ব্বক গৃহ হইতে লইয়া গিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ।

পৈশাচ—কন্যা সুপ্তা, মত্তা বা প্রমত্তাবস্থায় অবস্থান করিলে, গোপনে ঐ কন্যা গমন করিয়া যে বিবাহ করা হয়, তাহার নাম পৈশাচ বিবাহ; ইহাই অষ্টম প্রথা এবং সকল প্রণালী হইতে নীচ ও হেয়।

বিবাহ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যত প্রধান প্রধান পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে মনুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দ্বিতীয় মহম্মদ। ইহাদের মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও সম্পূর্ণভ্রমশূন্য নহে। বিবাহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনু বলেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডং প্রয়োজনং" অর্থাৎ পুত্রের নিমিত্তই বিবাহ। বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য ইহা হইলেও ইহাই একমাত্র প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য নহে। ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোম্‌ত (Auguste compte) বলিয়াছেন যে, প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গ নিরপেক্ষভাবে, হৃদয় ও মনের যে মিলন তাহাই বিবাহ,—ইহাও বিবাহের প্রকৃত লক্ষণ নহে। প্রণয়ের লক্ষণ—হৃদয় ও মনের মিলন—সকলের সহিতই হইতে পারে, তাহা বলিয়া সে সমুদায় বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা; আমরা বলি শরীর, হৃদয় ও মনের মিলনই প্রকৃত বিবাহ; তাহা হইলেই আমরা বিবাহের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি "প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গ সাপেক্ষ হৃদয় ও মনের যে মিলন তাহাই বিবাহ।" কিন্তু মনু বিবাহের যে অষ্ট প্রকার প্রকরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিতেই এই তিনের মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই; রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে এ তিনের মিলন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু মনু এই দুই প্রথাকেও বিবা-

হের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি যে কেন এরূপ করিয়াছেন, তাহার গভীরভাব ইহার মধ্যেই নিহিত আছে; এই দুই কুৎসিত প্রথাকেও তিনি বিবাহ মধ্যে গণ্য করিয়া তিনি যে কত সাধু কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; তবে এ দুই প্রথাকেই তিনি যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা ইহাদের নাম করণেই বেশ জানিতে পারা যায়। রাক্ষস ও পৈশাচ এই উভয়বিধ বিবাহই বলপূর্ব্বক স্ত্রীগমন করা জন্য; মনু যে কোন প্রকার স্ত্রীগমনই বিবাহ বলিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন, কেননা সেরূপ না করিলে অবিবাহিতা কন্যার রাক্ষস বা পৈশাচিক ব্যবহারে কৌমার্য্য নষ্ট হইলে, অপর কেহই তাহাকে বিবাহ করিতেন না, সুতরাং তাহাকে আজীবন মন কষ্টে কাটাইতে হইত; তাহা নিবারণ জন্যাই মনু এই দুই প্রথাকেও বিবাহ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

এই অষ্ট প্রকার বিবাহ পরবর্ত্তী সকল স্মৃতিকার গণেরই অনুমোদিত; অন্য কেহই এ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নাই; বরং অনেকে মনু প্রণীত এই শ্লোক গুলিই বিভিন্নচ্ছন্দে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণগণ প্রথমোক্ত ছয় প্রকারে ও ক্ষত্রিয়গণ গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রণালী মতে পরিণয় কার্য্য সমাধা করিতেন; ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথাও বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল; ইহাতে কন্যা স্বয়ং নিজ মনোমত পতি মনোনীত করিতেন; এই সকল বিবাহের বহুল দৃষ্টান্ত নানা গ্রন্থাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। শকুন্তলার সহিত মহারাজ দুষ্মন্তের ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত রাজা যযাতির সংমিলন গান্ধর্ব্ব প্রথার উদাহরণ; মহামতি ভীষ্ম কাশীরাজতনয়া অম্বা ও অম্বালিকাকে হরণ করিয়া নিজ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ বা শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ রাক্ষস বিবাহের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বয়ম্বর দুই প্রকারে সম্পাদিত হইত; প্রথম, বহুতর বিবাহার্থী উপস্থিত হইলে কন্যা, তন্মধ্যে একজনকে স্বীয় মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে এবং দ্বিতীয়, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে পণ থাকিত, যে বিবাহার্থী ঐ পণানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেন তিনিই ঐ বিবাহার্থিনী কন্যার পাণি গ্রহণ করিতেন; ইন্দুমতীর সহিত সূর্য্য কুলোদ্ভব অজরাজার ও দময়ন্তীর সহিত নিষধরাজ নলের বিবাহ প্রথম-রীত্যানুমোদিত, এবং হরধনু ভঙ্গরূপ পণে স্থিতা জানকীর সহিত রঘুবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের ও সুবর্ণ মৎস্য-চক্ষু-ভেদরূপ পণে স্থিতা দ্রৌপদীর সহিত অর্জ্জুনের সম্মিলন দ্বিতীয় রীতির প্রধান দৃষ্টান্ত। যাহা হউক গান্ধর্ব্ব ও স্বয়ম্বর প্রথার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের মনে স্বতঃই এই উদয় হয় যে, তদানীন্তন কন্যাগণ ইদানীন্তন কন্যাগণের মত সুদৃঢ় অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধা ছিলেন না—তাঁহারাও স্বাধীনভাবে কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতে পারিতেন; এমন কি পতি-নির্ব্বাচন জন্য তাঁহাদের দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করারও কোন আপত্তি ছিল না—ইহাতে তাঁহাদের গুরু-

জনের কোন অবমাননা হইত না। মহারাজা অশ্বপতি স্বীয় আত্মজা সাবিত্রীকে পতি নির্ব্বাচনার্থে দূরদেশে প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই সকল কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ হইবার নিদর্শন। ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

হিন্দুদিগের অবনতি।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ানের গ্রন্থে লিখিত আছে যে ‘কোন ভারতবাসী কস্মিনকালেও মিথ্যাবাদের জন্য অভিযুক্ত হয় নাই।’ চন্দ্রগুপ্তের সভাস্থিত গ্রীকদূত মিগাস্থিনিস্ বলিয়াছিলেন যে মগধ শিবিরে নিয়ত ৪ লক্ষ লোক বাস করিত, কিন্তু তথাপি তিনি ২০০ ড্রামের অধিক মূল্যের সম্পত্তি চুরির অপরাধে কাহাকেও দণ্ডিত হইতে দেখেন নাই। চীন পর্য্যটক হুয়েস্থসাং ভারতবাসীগণকে অতীব সৎ, সাধু, নিরপেক্ষ এবং স্বার্থহীন বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। অন্য দূরে থাকুক, হিন্দুর চিরশত্রু মুসলমানগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজেল হিন্দুচরিত্রকে অতীব ধার্ম্মিক, শিষ্ট এবং সত্যপরায়ণ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। মার্কোপোলো গুজরাট দেশের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে যদি কোন বৈদেশিক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিও এতদ্দেশবাসী কোন বণিকের নিকট বিক্রয়ার্থ কোন বস্তু গচ্ছিত রাখে, তবে সে তাহা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া যাহার প্রাপ্য মূল্য তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, এবং বস্তুস্বামী তাহাকে যে পারিশ্রমিক দিতে ইচ্ছা করে সে তাহার তদতিরিক্ত একটি কড়ির জন্যও আপত্তি করে না। বস্তুতঃ বোধহয় যে, যে কোন ব্যক্তিই পর্য্যটন উপলক্ষে এদেশে আগমন করিতেন, তিনিই এদেশের সততা, সাধুতা, ও সত্যপ্রিয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। সেই এক যুগের কথা গিয়াছে। আর আধুনিক সময়ে মেকলে প্রভৃতি অস্মদ্দেশীয়দিগের যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন, এবং বর্ত্তমান ইলবার্টবিল উপলক্ষে যেসকল কথা লিখিত ও কথিত হইয়াছে, তাহাও অনেকেরই বহুকাল পর্য্যন্ত স্মরণ থাকিবে। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের অজ্ঞতা অথবা বিদ্বেষজনিত অতিশয়োক্তিবাদ দিয়াও ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসীর চরিত্রে ঘোর অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। এই ভয়ানক পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

“উনবিংশ শতাব্দি” নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত সিমুরকের ভারত বিলুণ্ঠন প্রবন্ধ হইতে নিম্নে যে অংশটি উদ্ধৃত হইল তাহাতে ভারতবাসীগণের চরিত্র অবনতির কারণের ঈষৎ আভাস পাওয়া যাইবে।—

‘বঙ্গীয় সিবিল সার্ভিসের অন্যতম কাষ্ট

সাহেব লিখিয়াছিলেন ' সর জন সোর এবং কেম্বল সাহেব সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে আমাদের (ইংরেজদের) শাসন যতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ততই দেশীয়দিগের স্বভাব দূষিত হইতে থাকে। আমরা যে দেশ শাসন করি, কএক বৎসরের মধ্যেই সেই দেশের লোকসমূহের যাহা কিছু সত্যপ্রিয়তা এবং সম্মান-বোধ থাকে, তাহা বহিস্কৃত করিতে কৃতকার্য্য হই, আর তৎপরিবর্ত্তে প্রবঞ্চনা এবং ছলনা শিক্ষা দি।.... আমাদের ব্যবস্থাদির ফলই এই যে লোকসমূহ উহাতে চতুর, অধার্ম্মিক এবং মামলাকারী হইয়া উঠে, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না।"

ইহা এক্ষণে অবধারিত সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সামাজিক নিয়ম এবং ব্যক্তিগত চরিত্র একে অন্যের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আমি এস্থলে সামাজিক নিয়মে শাসনকর্ত্তাদিগের বিধিব্যবস্থাকেই (আইন) লক্ষ্য করিতেছি। কোন সমাজের সাধারণ চরিত্রের যেরূপ গতি দৃষ্ট হয়, ব্যবহারিকগণ (legislators) প্রায়শঃই তদুপযোগী ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া থাকেন ; কখন কখন বা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে কিঞ্চিদুন্নত অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পরিপূরণ করেন। এই উভয় প্রকার ব্যবস্থাই সামাজিকগণের চরিত্রের উপর কার্য্য করিয়া ধীরে ধীরে উহাতে রূপান্তর উপস্থিত করিতে থাকে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই পূর্ব্বে একতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তখন রাজার মুখনিঃসৃত বাক্যই ব্যবস্থার ন্যায় সম্মানিত হইত, এবং রাজার অসীম শক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের অপ্রস্ফুটিত শক্তিকে ঢাকিয়া রাখায় উহাদের চরিত্রে ইদানীং দ্রষ্টব্য সাহস, বীর্য্য প্রভৃতি গুণনিচয় অতি অল্পই লক্ষিত হইত। ক্রমে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তিসমূহ যত পরিস্ফুটিত হইতে লাগিল, রাজার স্বেচ্ছাচার ও অনিয়মিত ক্ষমতা ততই প্রজার নিকট অসহনীয় বোধ হইতে আরম্ভ করিল, এবং রাজা ও প্রজার পরস্পর শক্তিসংঘর্ষে অবশেষে কোথাও বা সম্যক্ প্রজাতন্ত্র, কোথাও বা মিশ্রতন্ত্র সংস্থাপিত হইল। কিন্তু যেমন প্রজার শক্তিবিকাশে প্রজাতন্ত্র এবং মিশ্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমন আবার সেই প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র এবং মিশ্রতন্ত্র সামাজিকগণের চরিত্রের উপর কার্য্য করিয়া উহাকে অধিকতর বিকশিত করিতেছে। প্রজার যে সমস্ত গুণনিচয় একত্রিত হইয়া সমাজে নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে, ঐ নিয়ম সংস্থাপিত রহিয়াই সেই সমস্ত গুণনিচয়কে অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। যখন ইউরোপ প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ছিল না, তখন স্ত্রীজাতির অধীনতাতে পুরুষজাতির স্বভাব যেরূপ সঙ্কুচিত থাকে, সেইরূপই ছিল। কিন্তু যখন এবম্বিধ অধীনতাতে উভয় জাতিই বিরক্ত হওয়ায় স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত হইল, তখন উহার মঙ্গলজনক প্রভাব উভয়জাতির স্বভাবের উপর বিস্তৃত হইয়া সমাজের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া তুলিল। সুতরাং ইহা বুঝিতে বিলম্ব

হইবে না যে, যেরূপ চরিত্র অনুসারে রীতি নীতি কিম্বা ব্যবস্থা গঠিত হয়, তেমনই আবার রীতি নীতি এবং ব্যবস্থা অনুসারে পরবর্ত্তী চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু চরিত্র অনুসারে ব্যবস্থা গঠিত হওয়া একটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে স্থানে ব্যবস্থাপক স্বসামাজিক, প্রজার মঙ্গলাভিলাষী এবং প্রজার চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সেই স্থলেই প্রজার চরিত্র অনুসারে ব্যবস্থা গঠিত হইয়া থাকে; কারণ প্রজার মঙ্গলই তাহার উদ্দেশ্য, এবং প্রজার মতানুযায়ী কার্য্যেই তাহার শান্তির সম্ভাবনা। কিন্তু ব্যবস্থাপক ভিন্ন-সামাজিক এবং প্রজার চরিত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে, চরিত্রানুযায়ী ব্যবস্থা গঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে; এবং তাহা না হইলেই চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ হওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। যদি অনুপযুক্ত ব্যবস্থা সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায়, তবে সমাজ অচিরেই অবশ ও অসুস্থ হইয়া পড়ে।

হিন্দুজাতির চরিত্রে আজিকালি যে ঘোর অবনতি দৃষ্ট হইতেছে, নিঃসন্দেহ তাহার প্রধান কারণ এই যে. হিন্দুর চরিত্র স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যে সমাজ স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সমাজের রীতি নীতির সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তন-কৌশল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহার আদিম অবস্থায় কএকটি অপরিপক্ক রীতি বর্ত্তমান ছিল; এবং তদানীন্তন সমাজের জন্য ঐ অপরিপক্ক রীতিই সম্যক্ প্রশস্ত ছিল। ক্রমে অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত রীতির প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি কমিয়া যাইতে লাগিল, এবং বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ তাহা অনুভব করিয়া সাময়িক অবস্থার উপযোগী নূতন রীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিল। তখন ইহাতেই জনসাধারণ পরমাপ্যায়িত হইল; কিন্তু অবস্থার অধিকতর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত নূতন রীতিও পুরাতন এবং অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিল; তখন আবার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। স্থূল কথা, যে সমাজই স্বাভাবিক উপায়ে বিকশিত হইয়াছে, সেই সমাজেই এইরূপ কার্য্য হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠিত রীতির প্রতি সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত সে রীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, এবং যখনই উহার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তখনই উহার পরিবর্ত্তে নূতন রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাস্ত্রে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আর্য্যদিগের মধ্যে অতি পূর্ব্বে বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল না; কিন্তু আর্য্যসমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া অনুভূত হইলে বিবাহরীতি ব্যবস্থাবদ্ধ হয় এবং বিবাহ ব্যতিরেকে স্ত্রীগ্রহণ দণ্ডযোগ্য বলিয়া নির্ণীত হয়। কিন্তু বিবাহরীতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও অনেক কাল পর্য্যন্ত এতৎসম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রচলিত ছিল না। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, প্রথম বিবাহ সম্পর্কেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বর্ত্তমান ছিল। কেহ চুরি করিয়া বিবাহ করিত, কেহ বলপ্রয়োগ করিয়া বিবাহ করিত;

কাহারও মুখের কথায় বিবাহ হইত, কেহ বা পণদ্বারা কন্যা ক্রয় করিয়া আনিত। তখন বিবাহে মন্ত্রপাঠ আবশ্যক হইত না; কোনরূপ যাগ যজ্ঞ এবং দেবকার্য্য প্রয়োজনীয় ছিল না, কন্যা কিম্বা কন্যার পিতার সম্মতি অথবা কাহারও সম্মতি ব্যতিরেকে বল কিম্বা ছল প্রয়োগ দ্বারা কন্যাকে হস্তগত করাই বিবাহ বলিয়া মান্য হইত। ক্রমে সমাজের যত উন্নতি হইতে লাগিল, ততই এই সমস্ত রীতি নিন্দনীয় বলিয়া অনুভূত হইল; এবং অবশেষে নির্দ্দিষ্ট কএক প্রকার বিবাহই শাস্ত্রসঙ্গত এবং প্রত্যেক বিবাহেই যাগযজ্ঞ আবশ্যক বলিয়া মীমাংসিত হইল। ক্রমে বিধবাবিবাহের রীতিও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল,এবং সর্ব্বশেষে উহা একেবারেই নিষিদ্ধ বলিয়া কোন কোন স্থানে সিদ্ধান্ত হইল। বস্তুতঃ ইহা নিশ্চয় যে, আর্য্যসমাজ যতদিন স্বসামাজিক ব্যবস্থাপকগণের অধীনে ছিল, ততদিন উহাতে ভূয়ঃপরিবর্ত্তন এবং ভূয়ঃ উন্নতি হইয়াছিল এবং উহা স্বাভাবিক উপায়েই বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছিল। কিন্তু যদবধি উহার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়, তদবধিই উহার অবনতির সূত্রপাত হয়। যে লতাটি স্বাভাবিক উপায়ে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, সেই লতাটির প্রতি চাহিয়া দেখ, উহার পুরাতন অঙ্কুর যেটি শুষ্ক হইবার সেটি আপনাপনি শুষ্ক হইতেছে; যেটি জন্মিবার সেটি আপনা পুনি জন্মিতেছে; এবং উহার যতটুকু বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, ততটুকু আপনা আপনিই বাড়িতেছে। কিন্তু উহা টানিয়া বাড়াইতে চাও, ছিঁড়িয়া যাইবে; চাপিয়া রাখ, ম্রিয়মান হইয়া থাকিবে; উহার অঙ্কুরগুলি কাটিয়া ফেল, লতাটি শ্রীহীন হইবে, কিম্বা অচিরে মরিয়া যাইবে। সমাজ সম্পর্কেও তাহাই; যে রীতিটির প্রতি লোকের বিরাগ জন্মে নাই, তাহা উঠাইয়া দাও, সমাজ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, যে রীতিটি গ্রহণ করিবার সময় হয় নাই, তাহা চাপাইয়া দাও, সমাজ ভারগ্রস্ত হইয়া উত্থানশক্তি-রহিত হইবে।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, যদ্যপি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সামাজিক চরিত্রের উপর কার্য্য করে, তবে কোন সদ্ব্যবস্থা সময়ের অনুপযোগী হইলেও তাহা চরিত্রকে অবশ্যই উন্নতির দিকে পরিচালিত করিবে। ব্যবস্থা যে সামাজিক চরিত্রের উপর কার্য্য করে, তাহা ঠিক; কিন্তু সদ্ব্যবস্থা সময়ের অনুপযোগী হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত কথা। সেই ব্যবস্থাই উত্তম, যাহা সময়ের উপযোগী। যে ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবার জন্য লোক সক্ষম হয় নাই, এবং যদনুসারে কার্য্য করাইলে লোকের অন্তঃকরণ পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাকে কি প্রকার সুব্যবস্থা বলা যাইতে পারে? সদ্ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, সে যেন তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, অথচ যেন একের কার্য্য অন্যের স্বার্থকে আক্রমণ না করে। সুতরাং যে ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বিদ্যমান নাই, তদুপযোগী ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে তাহা কখনও সদ্ব্যবস্থা

বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ যে ব্যবস্থা সময়ের উপযোগী তাহাই সদ্ব্যবস্থা এবং এইরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই সামাজিক চরিত্রকে উন্নত করিয়া থাকে। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, হিন্দুসমাজ ভিন্ন-সামাজিক ব্যবস্থাপকগণের অধীন হইয়াছে পর অবধি অল্প সদ্ব্যবস্থাই প্রণীত হইয়াছে।

অনেকেই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুজাতি এমনই পরিবর্ত্তনবিদ্বেষী যে তাহাদের প্রাথমিক অবস্থায় সমাজের যে প্রকার গঠন ছিল, অদ্যাপিও তাহাই রহিয়াছে, অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা হিন্দুজাতির পুরাতন ইতিহাস যথেষ্ট মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, এবং তাঁহারা হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াও বিশ্বাস করা যায় না। কে বলিবে যে, বেদের সময়ে হিন্দুদিগের যে প্রকার সামাজিক গঠন ছিল মহাভারতের সময়েও তাহাই, এবং মহাভারতের সময় যাহা ছিল, অশোকের সময়েও তাহাই? এই তিনযুগের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, আচার স্বতন্ত্র, শিক্ষা স্বতন্ত্র, সমাজ স্বতন্ত্র, রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ স্বতন্ত্র। তবে যদি বসিবার রীতি ও শুইবার রীতিতে কোন পার্থক্য দৃষ্ট না হয়, তবে তাহা হিন্দুচরিত্রের দোষ নহে, অবস্থার দোষ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সে বসিবার রীতি পরিত্যাগ করিতে পারিত না, ইহা সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যে সব রীতি নীতি প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহা প্রায় একভাবেই ছিল, কারণ প্রাকৃতিক অবস্থার অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এবং যাহা শিক্ষা ও জ্ঞানের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তিত, নিয়তই উন্নত হইতেছিল। আর সেই পুরাতন হিন্দুসমাজের কি বা অদ্য দৃষ্ট হইতেছে? সে পবিত্রতা নাই, সেই সারল্য নাই, সে সত্যপ্রিয়তা নাই, আছে কেবল কঙ্কালাবশিষ্ট সমাজের কুরীতি ও কুসংস্কার। কিন্তু সে সমস্ত থাকিবার কারণ ইহা নয় যে, হিন্দুগণ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইবার সময় আসিবার পূর্ব্বেই হিন্দুসমাজ এইরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল যে, যে উপায় দ্বারা সাধারণতঃ সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সে উপায় আর রহিল না।

হিন্দুসমাজের কুসংস্কারসমূহ কি কারণে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। স্বাধীন সমাজে সামাজিক প্রশ্ন ও রাজনৈতিক প্রশ্নে অল্পই প্রভেদ লক্ষিত হয়। যে দেশে ব্যবস্থাপক এবং প্রজাবর্গ এক সমাজভুক্ত, সে দেশে সামাজিক রীতি নীতি ব্যবস্থা দ্বারা সময়ে সময়ে সৃষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে শ্যালিকাকে বিবাহ করা যাইতে পারিবে কি না, ইহা সম্পূর্ণ সামাজিক প্রশ্ন হইলেও, ব্যবস্থাপকসমিতি দ্বারা মীমাংসিত হইবে। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ

করা যাইতে পারে কি না, ইহা ব্যবস্থাপকগণ সিদ্ধান্ত করিবেন। বিবাহের সময় কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, ইহা সম্রাট স্বয়ং স্থির করিয়া ঘোষণা দ্বারা জানাইবেন। এইরূপ সামাজিক প্রশ্ন ব্যবস্থাপকগণ দ্বারা মীমাংসিত হইলে অনেক সুবিধা হয়। যখন জনসাধারণের মত কোন নূতন রীতি সংস্থাপনের জন্য উৎসুক হয়, ব্যবস্থাপকগণ তখন তাহা অনুভব করিয়া নূতন রীতি প্রণয়ন করেন, এবং উহা লঙ্ঘিত না হয় এই জন্য উপযুক্ত দণ্ডেরও ব্যবস্থা করেন। ব্যবস্থাপকগণ যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, ঐ রীতি সেই সীমায় প্রচলিত হয়, এবং তন্মধ্যে যে কেহ উহার লঙ্ঘন করে, সেই বিচারে দণ্ডিত হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপকগণের হস্তে সামাজিক রীতি প্রণয়নের ভার ন্যস্ত থাকিলে ফল এই হয় যে, যখন যে রীতি সময়োপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, তখনই সেই রীতি সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয়। হিন্দুসমাজ যখন স্বাধীন ছিল, তখনও সামাজিক প্রশ্নসমূহ রাজা স্বয়ং কিম্বা ব্যবস্থাপক-সমিতি মীমাংসা করিতেন, এবং যখন যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া অনুমিত হইত, তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া যাইত। সমাজের এইরূপ অবস্থায় কোন কুসংস্কার অধিককাল বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যখনই উহা কুসংস্কার বলিয়া সমাজের অগ্রণীগণ অনুভব করেন, তখনই উহার পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবস্থা প্রণীত হয়, এবং তখনই উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু সামাজিক প্রশ্ন ব্যবস্থাপকদিগের হস্তের বহির্ভূত হইলে, উহার মীমাংসা হওয়া সহজ নহে, এবং সেই মীমাংসার ফলও সর্ব্বত্র কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এক এক জন এক এক মত প্রচার করেন। সেই মত তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কএকটি ব্যক্তির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, এবং তাহারা উহা সমাজের ভয়ে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস পায় না। মনে কর, এক্ষণে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক কি না, এবিষয়ে একটি প্রশ্ন হইল। আমাদিগের মধ্যে কোন কোন হিন্দু বলিবেন যে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত, কেহ কেহ বলিবেন, উচিত নহে। একের মত অন্যে গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিবেন না, প্রত্যেকেই আপনার স্বার্থানুযায়ী মতাবলম্বন করিতে চাহিবে। আর যাহারা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিবে, তাহারাও সমাজের ভয়ে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে না। যদি কেহ অগ্রসর হয়, তবে বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা তাহাকে উৎপীড়ন করিতে আনন্দের সহিত সামাজিক বলকে আহ্বান করিবে। এ অবস্থায় কোন মতই ব্যাপ্তভাবে প্রচারিত হইতে পারে না, এবং যাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সামাজিক অত্যাচারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পারে, সেই মাত্র উক্ত মতানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। কোন রীতি কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজে ব্যাপ্ত করিতে হইলে, উহা এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি হইতে প্র-

চারিত হওয়া উচিত, যাহার ঐ তাবৎ সমাজের উপর আধিপত্য থাকে। যে সমাজের অধিনায়ক নাই, সে সমাজে সকলেরই একমত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব, এবং সে সমাজে কোন নূতন রীতি প্রচলিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যদ্যপি হিন্দুসমাজের ব্যবস্থার ভার হিন্দুব্যবস্থাপকগণের উপর ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে কখনই বর্ত্তমান কুসংস্কারসমূহ ইহাতে অধিককাল স্থান পাইতে পারিত না। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি যে সমস্ত কুরীতি আমাদের সমাজে এক্ষণে বিদ্যমান আছে, ইহা কবে যে দূরীভূত হইবে, তাহা ঈশ্বর জানেন। এই সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চীৎকার ব্যতীত সম্প্রতি অন্য কোন অস্ত্র ধারণ করিবার যো নাই; ব্যবস্থার প্রবল হস্ত ইহার বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে না। চীৎকারের ফল জনসাধারণের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। যদি সকল লোক এতদূর শিক্ষিত ও তাহাদের অন্তঃকরণ এতদূর উন্নত হয় যে, তাহাদের এই সমস্ত কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে কখনও মতি জন্মিবে না, তবেই চীৎকারে সুফল প্রসূত হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই বহু অজ্ঞ লোক থাকে, এবং শিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকের স্বার্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর আধিপত্য করে; সুতরাং এই শ্রেণীস্থ লোক যে কোন প্রকার শাসনাভাবে কোন স্বার্থসংসৃষ্ট কুসংস্কার পরিত্যাগ করিবে, তাহার সম্ভাবনা এক্ষণেও বহুদূরে রহিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে, সাধারণ মত যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন উহাই যথেষ্ট শাসনস্বরূপ কার্য্য করে। আমি ইহা একেবারে অসম্ভব বলিতে চাহি না। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, এইরূপ অনেক কার্য্য আছে, যাহার বিরুদ্ধে সাধারণ মত অত্যন্ত প্রবল, অথচ যাহা লোকে দিবানিশি করিতেছে। মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি কি সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত এবং নিন্দনীয় নয়? কিন্তু তথাপি অনেকে প্রকাশ্যে ঐ সমস্ত কার্য্য করিতেছে। সাধারণ মতের অত্যন্ত বিরুদ্ধ কার্য্যও যখন শিক্ষিত লোকে প্রকাশ্যভাবে করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তখন স্বার্থপরিচালিত অজ্ঞলোকে যে বিরত হইবে, তাহার ভরসা কি? আর সমাজের অরাজকতার অবস্থায় সাধারণ মত গঠিত হওয়াও কঠিন ব্যাপার। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মত যে প্রকার প্রবল হইতে পারে, শাস্ত্রসম্মত কার্য্যের বিরুদ্ধেও সেইরূপ হওয়া সহজ নহে। গোমাংসাহার পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু ক্রমে ইহা অনিষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে লোকের ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। ব্যবস্থাপকগণ যখন ইহা বুঝিতে পারিয়া গোমাংসাহার নিষেধ করিলেন, তখন উহা একেবারে রহিত হইয়া গেল; এবং অনেককাল পর্য্যন্ত উহা নিষিদ্ধ থাকাতে এক্ষণে লোকের মনের গতি এই প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, গোমাংসের নাম শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। বহুবিবাহ প্রথা ইউরোপে ব্যবস্থা দ্বারা বহুকাল অবধি নিষিদ্ধ আছে বলিয়া বহুবিবাহের নাম করিতে ইউরো-

পীয়গণ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে। কিন্তু যদি ঐরূপ কোন শাস্ত্রীয় নিষেধ না থাকিত এবং সেই নিষেধ অনেক কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া লোকের মনের গতি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তন না করিত, তাহা হইলে উল্লিখিত রীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মত এত প্রবল হইত কি না সন্দেহ। মনুষ্যমাত্রেরই অন্তঃকরণে যে একটু রক্ষণশীল ভাব আছে, তাহাতে তাহাকে প্রচলিত রীতি সমর্থন এবং অপ্রচলিত রীতির প্রত্যাখ্যান করিতে উপদেশ দেয়। তদুপরি যদি সেই রীতি শাস্ত্রসম্মত, এবং কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্মসংসৃষ্ট থাকে, তবে শাস্ত্রদ্বারা উহার পরিবর্ত্তন না হইলে পরিবর্ত্তন হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, যদ্যপি কোন রীতির প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিলে সেই রীতি পরিবর্ত্তনের যোগ্য হয়, তবে যখন লোকের ঐ প্রকার অশ্রদ্ধা জন্মে, তখন তাহারা উহা আপনা হইতেই ত্যাগ করিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থাপ্রণয়নের কোন প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ ইহা ভ্রম। লোকে অন্তরে কোন রীতি অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া অনুভব করে, তথাপি অভ্যাসবশে অথবা স্বার্থের দায়ে তাহার অনুসরণ করিতে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত কোন বহিঃশক্তি অথবা অত্যধিক অন্তঃশক্তি উক্ত রীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য না করে, সে পর্য্যন্ত উহা ক্ষান্ত হয় না। মাদক-সেবনের ন্যায় কুরীতির আচরণ গর্হিত বলিয়া অনুভূত হয়, অথচ সহজে পরিত্যক্ত হইবার নহে।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দুসমাজ স্বসামাজিক ব্যবস্থাপকগণের হস্তবহির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই ইহার কুসংস্কারসমূহ এতাদৃশ বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছে। অনেক কারণে হিন্দুগণ সামাজিক কর্তৃত্ব বিদেশীয় বিজেতৃগণের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহে নাই, এবং বিজেতৃগণও অনেক কারণে হিন্দুগণের সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করা কর্ত্তব্য মনে করে নাই। হিন্দুগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইলে, হিন্দুগণ যাহা কিছু বাচাইতে পারিয়াছে, তাহাই বাচাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা জানিত যে সমাজের উপর মুসলমানগণকে হস্তক্ষেপ করিতে দিলেই তাহাদের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। মুসলমানগণও বুঝিত যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপহরণ করা যত সহজ, ধর্ম্ম অপহরণ করা তত সহজ নহে; এবং এই জন্যই তাঁহারা হিন্দুদিগের সমাজ হিন্দুদিগের হস্তে থাকিতে আপত্তি করে নাই। মুসলমানশাসন অবসানে যখন ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও সেই একই কারণে হিন্দুগণ ইংরেজের প্রতি সামাজিক ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার দিতে অস্বীকৃত হইল। বিশেষতঃ মুসলমানশাসনে প্রায় ৮০০ শত বৎসর অবস্থান করিয়া হিন্দুগণের এক প্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সামাজিক প্রশ্ন রাজকীয় ব্যবস্থাপকগণ দ্বারা কখনও মীমাংসিত হইতে পারে না।

ইংরেজগণ যখন মুসলমানের স্থান অধিকার করিল, তখনও হিন্দুগণ কখন উল্লিখিত সংস্কার বশতঃ, কখন ইংরেজ ব্যবস্থাপকের প্রতি অবিশ্বাস হেতু, আপনাদের সমাজের কর্তৃত্ব আপনাদের হস্তেই রাখা উপযুক্ত জ্ঞান করিল। ইংরেজগণও বহুধর্ম্মান্বিত ভারতবাসিগণের উপর একাধিপতি হইয়া আপনাদের শান্তির জন্য কোন ধর্ম্ম বা সামাজিক রীতির উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত মনে করিলেন না। তথাপি যে কতকগুলি সামাজিক রীতি অত্যন্ত কদর্য্য এবং ভয়ঙ্কর ছিল, ইংরেজ-ব্যবস্থাপকগণ অনেক কৌশলে তাহারই উচ্ছেদ সাধন করিলেন।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে যদিও মুসলমান-বিজিত হিন্দুগণের স্বসামাজিক ব্যবস্থাপক অভাবে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া থাকুক, তথাপি যে সকল হিন্দুরাজ্য মুসলমান-বিজিত হয় নাই, তাহাতে ঐসকল কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায় কেন? ইহার অনেক কারণ আছে। কিন্তু প্রথমতঃ একটি কথা বলা আবশ্যক যে ইহা সকলেই জানেন যে বঙ্গদেশ প্রভৃতি যে যে স্থল মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, তাহা হইতে মুসলমান কর্ত্তৃক অবিজিত রাজ্য সমূহের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার অনেকাংশে উৎকৃষ্ট এবং যে সমস্ত কুসংস্কার আছে, তাহাও অত্যন্ত শিথিল। কিন্তু তথাপি কএক কারণে ঐ সমস্ত কুসংস্কার সম্যক দূরীভূত হইতে পারে নাই। প্রথম কারণ এই যে, ভারতে মুসলমান আগমনের পর হইতেই এদেশ হইতে জ্ঞানের জ্যোতি বিলুপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং প্রজার সহিত রাজার কি সম্বন্ধ এবং প্রজার প্রতি রাজার কি কর্ত্তব্য, তাহা হিন্দুরাজগণের অতি অল্পই পরিজ্ঞাত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরাজগণ মুসলমানগণের সঙ্গে সংগ্রামেই জীবনাতিপাত ক- করিতেন, প্রকৃতি-পুঞ্জের সামাজিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য সময় ও অবসর অল্পই পাইতেন। তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক আচার ব্যবহারের প্রতি তখন হিন্দুগণের এত প্রবল বিদ্বেষ ছিল যে, তাহারা কুসংস্কারকেও আদরের সহিত পরিপোষণ করিতেন, পাছে উহা পরিত্যাগ করিলে বৈদেশিক আচারের অনুকরণ করা হয়। চতুর্থ, অধিকাংশ হিন্দুই মুসলমানের অধীনে থাকাতে, যে অত্যল্প সংখ্যক হিন্দু স্বাধীন ছিল, তাহারাও সেই অধিকাংশের রীতি নীতিরই অনুসরণ করিত। পঞ্চমতঃ, যে শ্রেণীস্থ লোকের হস্তে পূর্ব্বে ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার ছিল, এবং যাহারা পরেও ব্যবস্থা অধ্যয়ন, সংরক্ষণ এবং লোক-সমাজে ব্যাখ্যান করিত, তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, কতকগুলি দারিদ্র-শূন্য, অর্থগৃধ্নু, বিতণ্ডাপ্রিয় মনুষ্যে পরিণত হইল। যাঁহারা পূর্ব্বে রাজ-নিয়োজিত হইয়া জনসাধারণের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ, কুরীতি সংশোধন এবং নূতন রীতি প্রণয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা কুসংস্কার সমর্থন দ্বারা বিদ্যা প্রকাশ ও অর্থোপার্জ্জন করিয়াই আত্মার চরিতার্থতা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কারণে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যেও কোন

সমাজ সংস্কার হইতে পারে নাই। যে রোগ অধিকাংশ স্থানকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট স্থানেও সংক্রামিত হইয়া উহাকে অসুস্থ করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে এবং ইংরেজ রাজত্বের অনুষ্ঠানে রাজায় প্রজায় যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, এইক্ষণ তাহা হইতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই একশত বৎসরে দেখা গিয়াছে যে, রাজা প্রজার ধর্ম্মনাশে কখনও উদ্যত হইবে না, এবং যেখানে তাহার নিজের স্বার্থ সংসৃষ্ট নাই, সেখানে রাজা প্রজার মঙ্গল কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহী। রাজার প্রতি প্রজার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবায় সামাজিক কতৃত্ব কিয়ৎপরিমাণে রাজার উপর ন্যস্ত হইতে পারে। ইংরেজগণ ব্যবস্থা দ্বারা সময়ে সময়ে হিন্দুসমাজের সংস্কার না করিয়াছেন, তাহাও নহে; ঐ সমস্ত সংস্কার অত্যন্ত সাবধানতার সহিত দেশীয় শ্রেষ্ঠলোকদিগের সহযোগেই করা হইয়াছে, এবং হিন্দু সমাজেরও তদ্দরুণ অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তথাপি যদি ইংরেজ ব্যবস্থাপক-সমিতির উপর জন-সাধারণের সম্যক্ বিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে ঐ সমিতির সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই সেই বিশ্বাস জন্মিবার একান্ত সম্ভাবনা। যদি কোন দিন প্রতিনিধি-প্রণালী ব্যবস্থাপক সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তখন অনেক সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতে পারিবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্তও এইরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে যে, কোন সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তজ্জন্য ব্যবস্থাপক সমিতিতে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাজের অগ্রণীদিগকে আহ্বান করা হইবে, এবং তাহাদের মত গ্রহণ করিয়া কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত কিনা, তাহা নির্ণীত হইবে। ইংরেজ ব্যবস্থাপকগণের হস্তে সামাজিক সংস্কারের ভার ন্যস্ত করিতে এই এক আশঙ্কা হয় যে, তাঁহারা সমাজের অবস্থা কিছুই জানেন না বলিয়া তাঁহারা সদ্ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারিবেন না, এবং তাঁহাদের আমূল সংস্কারের প্রবৃত্তি ও স্বদেশীয় রীতির অনুকরণ করিবার ইচ্ছা হয়ত তাহাদিগকে হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ রীতিসমূহ প্রণয়ন করিতে মতি জন্মাইবে। কিন্তু যদি এতৎসম্পর্কে এইরূপ নিয়ম করা হয় যে, হিন্দুদিগের সমাজসম্পর্কে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইলে, যেমন ব্যবস্থাপক সমিতিতে সাধারণ সভ্যগণ থাকিবেন, তেমন তদতিরিক্ত হিন্দুসমাজের বিভিন্ন দেশীয় অগ্রণীসমূহও তথায় বসিতে ও মত প্রদান করিতে অনুমতি পাইবেন, তবে এইরূপ অবস্থায় কোন ব্যবস্থা প্রণীত হইলে তাহা হিন্দুসমাজের অমঙ্গলজনক কিম্বা হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। এই উপায় অবলম্বন করিলে দায়াদি সম্পর্কে যে সকল পুরাতনবিধি এক্ষণকার সময়ের অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং যাহা শুধু গত্যন্তর রহিত হইয়া বিচারকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহাও অনায়াসে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইতে পারে।

হিন্দুগণের এবং রাজপুরুষগণের উভয়েরই ইহা এক্ষণে মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরীতি এবং কুসংস্কার বর্ত্তমান থাকিতে কোন সমাজেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। পুরাতন শাস্ত্র দ্বারা বর্ত্তমান সমাজ পরিচালিত করার চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায় ও অনিষ্টদায়ক। হিন্দুশাস্ত্রবেত্তাদিগের প্রতি রাজপুরুষগণের এক্ষণে এই প্রশ্ন করা উচিত নহে যে, অমুক কার্য্য শাস্ত্রসঙ্গত কি না, এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হওয়া উচিত যে,অমুক শাস্ত্রবিধি বর্ত্তমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কি না? হিন্দুসমাজের ব্যক্তিগণ এক্ষণে শাস্ত্রবেত্তা বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন; গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহাদিগকে শাস্ত্রকারের পদ প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্টের তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলা উচিত যে, তোমরা এক্ষণে মনু ও যাজ্ঞবল্কের আসন পরিগ্রহ করিয়া নূতন সমাজের জন্য নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন কর। পণ্ডিতগণের সেই নববিধান গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজ তাহা পালন করিতে কদাচ অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। এইরূপ উপায় অবলম্বনে জনসাধারণ কোন অসম্মতি প্রকাশ করে কি না, গবর্ণমেণ্টের অন্ততঃ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সভ্যতার যে সমস্ত সুফল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, জ্ঞানের আলোক যাহা অহর্নিশ আমাদের নয়নগোচর করিতেছে, এবং যাহার সুগন্ধি ব্যবসায়ের হিল্লোলে ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতেছে, আপনার সমাজ পরিত্যাগ না করিয়া তাহা উপভোগ করিতে পাইব না, ইহা হইতে আর বিড়ম্বনা কি হইতে পারে? যে ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়ের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তাহাই সময়ের উপর চাপিয়া রহিয়াছে। প্রতিবেশী সমাজসমূহ যানারোহণে উন্নতির পথে ধাবমান হইতেছে; আর হতভাগ্য হিন্দুসমাজ কুসংস্কার ভার স্কন্ধে বহিয়া যেখানে ছিল, সেই খানেই পড়িয়া রহিয়াছে। যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এই ভার বিমোচন না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এবং আমাদের বিশ্বাস যে যদি গবর্ণমেণ্ট শুধু দণ্ডবিধি আইনের কঠোর শাসনদ্বারা প্রজাবর্গকে শক্তিহীন করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবিধা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে না করেন, বাস্তবিক যদি গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে প্রজার হিতকামনা করেন, তবে প্রজাবর্গের সামাজিক রীতি নীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ইহার একান্ত কর্ত্তব্য, এবং আমরা যে উপায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, একমাত্র সেই উপায়ই গবর্ণমেণ্টের অবলম্বন করা বিধেয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার সার মর্ম্ম

(৪৯০ পৃষ্ঠার পর।)

তৃতীয় দিন।*

[তৃতীয় দিবসে গোপীনাথ ও বিনোদ গঙ্গাতীরে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের কথোপকথন আরব্ধ হইল।]

বিনোদ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় হইতেই মুক্তি লাভ করা যায়, এবং যদি জ্ঞান, কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে আমি কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিব না কেন?" কৃষ্ণ এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—"হে অর্জ্জুন কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না।"

বিনোদ। কৃষ্ণের কথার প্রমাণ কি?

গোপী। শুদ্ধ বিদ্যাধ্যয়নে যে জ্ঞান জন্মে তাহার দৃঢ়তা বা পরিপক্কতা নাই। সে জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। অল্প কারণে ঐ জ্ঞান বিলোড়িত বা বিনষ্ট হয়। কিন্তু কর্ম্ম করিতে করিতে যে জ্ঞান জন্মে সহজে তাহার বিনাশ হয় না।

বিনোদ। সে কিরূপ?

গোপী। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ম। তুমি পুস্তকাদি হইতে প্রণয় সম্বন্ধে কয়েকটী তত্ত্ব সংগ্রহ করিলে। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখিবে যে ঐ তত্ত্বগুলি অন্য অন্য মনুষ্য সম্বন্ধে প্রকৃত হইলেও তোমার সম্বন্ধে অপ্রকৃত। তাহার পরে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতে করিতে প্রণয় সম্বন্ধে তোমার অন্য এক রূপ জ্ঞান জন্মিবে। তুমি তখন বুঝিবে যে ঐ জ্ঞানই তোমার পক্ষে প্রকৃত। ফলতঃ সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিলে জ্ঞানের পূর্ণাবয়বতা সম্পাদিত হয় না।

২য়। আমার জীবনে একটি ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, যাহা হইতেও তুমি কৃষ্ণের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবে। আমি একদা কয়েকটি প্রাচীন ব্যক্তিকে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রজাবৃদ্ধির অহিতকারিতা সম্বন্ধে মিলের মতের ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। আমি বলিতেছিলাম "দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার দুইটী মাত্র উপায়।

(১ম) উপনিবেশ সংস্থাপন। (২য়) দারপরিগ্রহে বিতৃষ্ণা। যাঁহারা দার পরিগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের সন্তানোৎপাদনে বিরত

* এই প্রবন্ধে এক এক দিনের কথোপকথনে এক এক অধ্যায়ের সার মর্ম্ম প্রকটিত হইতেছে।

থাকা উচিত।" আমার কথা শুনিয়া তাঁহারা আমাকে বালক বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে অসার, কাপুরুষ, নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি এক্ষণে বুঝিয়াছি যে তৎকালে আমিই নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীনের ন্যায় কথা কহিয়াছিলাম।

বিনোদ। আমার জীবনে ও এইরূপ নানা ঘটনা ঘটিয়াছে। বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা করা যায়, সংসারে তাহার অধিকাংশই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ কেন হয় বলিতে পার?

গোপী। বোধ হয়, পারি। কোন একখানি পুস্তকে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার সমষ্টি। এই অভিজ্ঞতা ঐ ব্যক্তির জীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি না। কারণ আমার জীবন, আমার চরিত্র বুদ্ধি, তাঁহার জীবন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাংসারিক ঘটনা তাঁহার চক্ষে যেরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আমার চক্ষে সেরূপে না হইতে পারে। ফলতঃ আমাকেও তাঁহার ন্যায়, আমার নিজ প্রণালী অনুসারে, ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে সাংসারিক কর্ম্মসমূহ হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে।

বিনোদ। তবে কি পুস্তকপাঠে লাভ নাই?

গোপী। আছে। পুস্তকপাঠে মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি হয় এবং চিন্তাপ্রণালী পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু পুস্তকপাঠে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। সে যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণ কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"যত দিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, তত দিন সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে সংসার ছাড়িয়া জ্ঞানার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে পার।"

বিনোদ। আবার চিত্তশুদ্ধির কথা কোথা হইতে আসিল?

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন যে কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু ইহাদ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে কর্ম্ম করিলেই জ্ঞানলাভ হইবে। যাঁহারা ধনাশায় বা মানলোভে কর্ম্ম করিবেন তাঁহারা কর্ম্ম হইতে কেবল ধন মান লাভ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা চিত্তশুদ্ধির আশয়ে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। নিষ্কাম কর্ম্মই প্রকৃত জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়।

বিনোদ। কৃষ্ণ তবে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! তুমি প্রথমে জ্ঞানান্বেষণ করিও না। প্রথমে সংসারে থাকিয়াই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি লাভ কর। চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিতে পারিলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়ের আয়োজন করা হইবে। ইহা আমি বুঝিয়াছি। এক্ষণে কৃষ্ণ আর কি বলিলেন তাহার বর্ণনা কর।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—"জ্ঞান শূন্য

যে বৈরাগ্য তাহা হইতেও মুক্তিলাভ হয় না।"

বিনোদ। কেন?

গোপী। কৃষ্ণ নিজেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কেহই বিনা কর্ম্মে ক্ষণ মাত্রও অবস্থান করিতে পারে না। সকলেই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে সর্ব্বক্ষণ কর্ম্ম করিতেছেন। যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া বাহিরে কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন, তাঁহারা মনে মনে ভোগ সুখের বিষয় সমূহ চিন্তা করিয়া থাকেন। ঐরূপ সন্ন্যাসীকে বিমূঢ়াত্মা ও কপটাচারী বলা যায়।"

বিনোদ। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী যে এই রূপে মনে মনে বিষয় সুখের চিন্তা করেন ইহার প্রমাণ কি?

গোপী। যে একেবারেই বিষয় সুখের আস্বাদন করে নাই সে বিষয় সুখের অসারতা বুঝিতে পারে না। বিষয় সুখের উপর ঘৃণা না জন্মিলে বিষয় সুখের ভাবনা পরিত্যাগ করা যায় না। কিন্তু যে প্রথম হইতেই বিষয় সুখ পরিত্যাগ করে তাহার মনে এরূপ ঘৃণার উদয় হয় না। বিষয় সুখ দিল্লীর লাড়ু। যে খায় সে কেন খাইলাম বলিয়া পরিতাপ করে। যে না খায় সেও কবে খাইব বা কেন খাইলাম না বলিয়া পরিতাপ করে।

বিনোদ। বুঝিলাম। এক্ষণে কৃষ্ণ আর কি বলিলেন তাহার বর্ণনা কর।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—"যে ব্যক্তি জ্ঞান বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হৃদয়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভে সক্ষম হন।"

বিনোদ। তারপর?

গোপী। কৃষ্ণ এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সম্বন্ধ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া কর্ম্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। কর্ম্ম পরিত্যাগ হইতে কর্ম্ম অনেক শ্রেষ্ঠ। বিনা কর্ম্মে তোমার দেহ ধারণও অসম্ভব হইবে। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে তাহারাই কর্ম্মজালে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। তুমি ঈশ্বর প্রীত্যর্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম আচরণ কর।' কৃষ্ণ এইরূপে কর্ম্ম মাহাত্ম্য প্রকটনার্থে অর্জ্জুনকে তিনটি পরামর্শ দিলেন যথা—

(ক) জ্ঞানান্বেষণ করিও না। বিনা কর্ম্মে জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব।

(খ) বৈরাগ্য অবলম্বন করিওনা। বিনা কর্ম্মে মন হইতে বিষয় সুখের আশা বা স্মৃতি পরিত্যাগ করা অসম্ভব। যাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয় তাহারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়া রাখে সত্য, কিন্তু তাহারাও মনে মনে বিষয় সুখের চিন্তা করে। এজন্য তাহাদিগকে বিমূঢ়াত্মা ও মিথ্যাচার বলাযায়।

(গ) নিষ্কামচিত্তে কর্ম্ম আচরণ কর। তাহা হইতেই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিবে।

বিনোদ। অর্জ্জুন ইহার উত্তরে কিছু বলিলেন কি না?

গোপী। অর্জ্জুন কিছু বলিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ কর্ম্ম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও কয়েকটি যুক্তি প্রয়োগ করিলেন। আমি এক একটি করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করিতেছি। কৃষ্ণ বলিলেন—"পূর্ব্বকালে প্রজাপতি প্রজা ও যজ্ঞ উভয়ই এককালে সৃজন করিয়া প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন—'হে প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হও। যজ্ঞ তোমাদের কামনা পূর্ণ করুক। এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণের উপকার করিবে এবং এই যজ্ঞ হেতুই দেবগণ তোমাদের উপকার করিবেন। এই রূপে তোমরা ও দেবতারা পরস্পর পরস্পরের উপকার করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে'।"

বিনোদ। কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া এখানে আবার কিরূপে বলিলেন যে 'যজ্ঞ তোমাদের কামনা পূর্ণ করুক।'

গোপী। কৃষ্ণ প্রজাপতির কথা উদ্ধৃত করিতেছেন। যাহারা সাধারণ হিন্দুর ন্যায় প্রজাপতির উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিত, কৃষ্ণ তাহাদিগকেও নিজমতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কৃষ্ণ যেন বলিতেছেন 'হে অর্জ্জুন। দেখ তোমাদের প্রজাপতিও কর্ম্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন।'

বিনোদ। তবে কি তুমি বলিতে চাও কৃষ্ণ নিজে প্রজাপতির কথা বিশ্বাস করিতেন না?

গোপী। আমার বিশ্বাস সেইরূপই বটে। কিন্তু হিন্দুরা এ ব্যাখ্যা স্বীকার করিবেন না। এজন্য আমি বলিতে চাই যে যেখানে হিন্দুরা 'কামনা' অর্থে নিজ ধনমান যশঃ প্রভৃতি বুঝিয়াছেন, সেখানে কৃষ্ণ পৃথিবীর মঙ্গল বুঝিতেছেন। হয় বলিতে হইবে যে কৃষ্ণ হিন্দুর বিশ্বাসের বিপরীত কথা বলিতেছেন, নয় স্বীকার করিতে হইবে যে কৃষ্ণ হিন্দুর বিশ্বাসের বিপরীত অর্থ করিতেছেন। কৃষ্ণের বিশ্বাস অনুসারে 'যজ্ঞ তোমাদের কামনা পূর্ণ করুক' অর্থে বুঝিতে হইবে, যে 'যজ্ঞ দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হউক।' এ অর্থ করিলে কৃষ্ণের 'নিষ্কাম কর্ম্ম' ও 'কামনা' এ উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বিসম্বাদ ঘটিবে না। সে যাহা হউক এক্ষণে কৃষ্ণের দ্বিতীয় যুক্তির কথা শুন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! প্রাণি-হিতরত দেবগণ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তোমাদিগকে বৃষ্টি প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন। তোমাদেরও উচিত যে তোমরা দেবপ্রীত্যর্থে কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।'

বিনোদ। কৃষ্ণের এ যুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিলাম না।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে স্বর্ণে ও মৃত্তিকায় বিনিময় হয় না। স্বর্ণের সহিত স্বর্ণের ও মৃত্তিকার সহিত মৃত্তিকার বিনিময় হওয়া উচিত। মনুষ্য সাধারণতঃ দেবতাদিগকে ধ্যানধারণা প্রভৃতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। যদি দেবতারা শুদ্ধ চিন্তা বা ইচ্ছা দ্বারা মনুষ্যের উপকার করিতেন, তাহা হইলে মনুষ্যও নিজ চিন্তা বা ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিত। কিন্তু যেখানে দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর কর্ম্ম দ্বারা প্রাণিগণের উপকার করিতেছেন, সেখানে প্রাণিগণেরও উচিত যে

কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদন করেন। অন্ততঃ এজন্যও মনুষ্যের কর্ম্ম করা উচিত। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'যাহারা দেবতাদিগের নিকট হইতে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্ম প্রত্যর্পণ না করে, তাহারা চৌর। যাঁহারা দেবপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিয়া পরে আত্মজীবন ধারণের চেষ্টা করেন তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাঁহারা আত্মোদর পরিপূরণের জন্যই সংসারে বাস করেন, দেবপ্রীতির চেষ্টা করেন না, তাঁহারা পাপভোজী।'

তুমি এস্থলেও দেখিবে যে কৃষ্ণ কর্ম্মের নিষ্কামত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন। দেবপ্রীত্যর্থে বা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম কর, নিজের জন্য কর্ম্ম করিও না ইহাই কৃষ্ণের উপদেশ।

বিনোদ। কৃষ্ণের দ্বিতীয় যুক্তির কথা বুঝিলাম। এক্ষণে তৃতীয় যুক্তির অবতারণা কর।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! সংসার চক্রের কথা ভাবিয়া দেখিলেও কর্ম্মের মহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। দেখ পরব্রহ্ম সকল পদার্থের মূল। পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা হইতে কর্ম্মের উদ্ভব। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণিগণের উদ্ভব হইতেছে। যে এই সংসারচক্রের গতির সাহায্য না করে, সেই ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব পাপাত্মার জীবন বৃথা।'

বিনোদ। সংসার-চক্র কি বলিতেছ আমি বুঝিতেছি না।

গোপী। সংসার-চক্র জীবনী-শক্তি বিশিষ্ট একটি যন্ত্র স্বরূপ। ইহার প্রত্যেক অংশের মূল্য ও ব্যবহার আছে। যদি কোন কারণ বশতঃ এই মহাযন্ত্রের কোন অংশ কোনরূপে নিজ কার্য্য হইতে বিরত থাকে, তাহা হইলে এই যন্ত্রের গতি রোধ হইবে। প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক পরমাণু সংসারচক্রের গতির সাহায্য করিতেছে। যদি কোন মনুষ্য আলস্য বশতঃ বা অন্য কোন কারণে নিজ করণীয় কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রকারান্তরে সংসারচক্রের গতির ব্যাঘাত সমুৎপাদন করেন। অন্ততঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াও অর্জ্জুনের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

বিনোদ। কৃষ্ণের এই যুক্তিটী বড় হৃদয় গ্রাহিণী। সংসারকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও চক্র (organs) বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণ এই চক্রের যে যে অংশ গুলির নাম নির্দ্দেশ করিলেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সেই সব অংশের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

গোপী। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের সাধারণ যুক্তি অক্ষুণ্ণই থাকিতেছে। কালসহকারে সংসারচক্রের বিবরণ অধিকতর পরিস্ফুট রূপ জানা যাইতেছে। আবার আরও কয়েক শতাব্দী পরে এতৎসম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু কৃষ্ণের যুক্তিটী চিরকালই বলবতী থাকিবে। যদি সংসার চক্র যন্ত্র স্বরূপ হয়, তাহা হইলে এ যন্ত্রের প্রত্যেক অংশের কার্য্য করা উ-

চিত। তুমি আমি, বৃক্ষ লতা, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত আমাদের সকলের কর্ম্মের উপর এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের জীবন ও গতি নির্ভর করিতেছে। তুমি আমি কেহই কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারি না।

বিনোদ। আমি কৃষ্ণের যুক্তির অমান্য করিতেছি না। কিন্তু কৃষ্ণ সংসার-চক্রের যে যে অংশের নাম করিলেন আমি তাহা-হাদের অর্থও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি-তেছি না।

গোপী। উহাদের অর্থ ভাল করিয়া না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। তথাপি তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমি সংক্ষেপে উহাদের ব্যাখ্যা করিতেছি। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপী পরব্রহ্ম সকল পদার্থের মূল। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পরব্রহ্মের অংশ বি-শেষ। পরব্রহ্ম নিশ্চেষ্ট কিন্তু ব্রহ্মা কর্ম্মময়। এজন্য ব্রহ্মকে কর্ম্মের স্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যজ্ঞ কর্ম্মের প্রকার ভেদ মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে যতরূপে কর্ম্ম করা যায় যজ্ঞ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বিনাকর্ম্মে যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ আহরণ, পুষ্পচয়ন, ব্রাহ্মণান্বেষণ, ঘৃতায়ো-জন প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতে হয় এজন্য কর্ম্মকে যজ্ঞের মূল বলা হইয়াছে। যজ্ঞোদ্ভূত বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি অস-ম্ভব নয়। যদি প্রতিগৃহে হোম করা হয়, তাহা হইলে ঐ বাষ্প হিমালয়ের পার্শ্বে আবদ্ধ থাকিয়া মেঘের উৎপত্তি করিতে পারে। পরে মেঘ হইতে জল, জল হইতে শস্য, ও শস্য হইতে প্রাণির উদ্ভব হইতেছে। এই রূপে সংসার-চক্র প্রতিনিয়ত ঘূর্ণমান হইতেছে।

বিনোদ। বুঝিয়াছি। কোন ইংরেজ পণ্ডিত কৃষ্ণের এই সংসার বর্ণনা শুনিলে পরিহাসপরায়ণ হইয়া হিন্দুশাস্ত্র মাত্রের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তুমি কৃষ্ণের যুক্তির অসার অংশ পরিত্যাগ ক-রিয়া কেবল সার অংশ গ্রহণ করিতেছ দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম।

গোপী। ইংরাজদের কথা বলিও না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Indo Ayrans পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে ইংরেজদের মতে আমাদের দেশে পূর্ব্বে অট্টালিকা ছিল না, শিল্পকার্য্য ছিল না, ভাস্কর বিদ্যা ছিল না। আবার James Mill প্র-ণীত ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে যে আমাদের দেশে কাব্য ছিল না, দর্শন ছিল না, ধর্ম্ম ছিল না। মেকলে সাহেব ত বলিয়াছেন যে আমাদের নীতি নাই, কিন্তু দুর্নীতি আছে। এবার হয়ত কোন পণ্ডিত প্রমাণ করিবেন যে আমাদের দেশে নদী পর্ব্বত বৃক্ষাদি কিছুই নাই, প্রমাণ করিবেন যে টেম্‌স্‌ নদীর জল লইয়া গ-ঙ্গার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে, আল্‌পস পর্ব্বতের দুই একটা প্রস্তরখণ্ড একত্রিত হইয়া হিমালয় গঠিত হইয়াছে এবং একটা বায়স ওক বৃক্ষের ফল খাইয়া ভারতবর্ষে উড়িয়া আসিয়াছিল, তাই ভারতবর্ষে বট ও অশ্বত্থের জন্ম হইয়াছে। পরাধীন জাতির মনুষ্যত্ব থাকে না। তাই তোমরা দেশীয় পণ্ডিতের অপমান করিয়া কুসং-

স্কারান্ধ আত্মাভিমানী, বাচাল, ইংরাজ পণ্ডিতের নিকট হইতে সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষার প্রয়াস কর। সে যাহা হউক এক্ষণে কৃষ্ণের চতুর্থ যুক্তির বিষয় শ্রবণ কর। তুমি যে মনোযোগ দিয়া এখনও আমার কথা শুনিতেছ এজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই।

বিনোদ। তোমার সম্বন্ধে আমার যে বক্তব্য তাহা আমি পরে বলিব। এইক্ষণে তুমি কৃষ্ণের চতুর্থ যুক্তির কথা বল।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ—'হে অর্জ্জুন! পৃথিবীতে সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। কেবল যিনি চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহার আত্মাতেই প্রীতি, যাঁহার আত্মাতেই আনন্দ, যাঁহার আত্মাতেই সন্তোষ তাঁহার করণীয় কার্য্য নাই। কার্য্য করিলে তাঁহার পুণ্য হয় না, কার্য্য না করিলে তাঁহার পাপ হয় না। তাঁহাকে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি প্রথমে সংসারে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধি করণান্তর পরে এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন তাঁহার করণীয় কার্য্য নাই। কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য সকলেই কার্য্য করিতে বাধ্য।

বিনোদ। এ যুক্তিতে নূতন কথা বড় কিছু নাই।

গোপী। না। এক্ষণে পঞ্চম যুক্তির কথা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ম্মদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও কর্ম্মে অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ জ্ঞানী লোকেরা যেরূপ আচরণ করেন, ইতরেরাও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। জ্ঞানী লোকেরা যাহার প্রতি ভক্তি করেন, ইতরেরাও তাহার প্রতিই ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। আমার নিজের কথা ভাবিয়া দেখ। দেখ পৃথিবীতে আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; আমার করণীয় কার্য্য কিছুই নাই; কিন্তু তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। কারণ যদি আমি কার্য্যে অবহেলা করি, তাহা হইলে অন্য সকলেও আমার দৃষ্টান্ত অনুসারে কার্য্যে অবহেলা করিবে। এইরূপে পৃথিবীস্থ প্রজা সমূহ বিনষ্ট হইবে। এবং আমিই ঐ বিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য হইব।' অন্ততঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কার্য্য করা উচিত।

বিনোদ। ঠিক কথা। যে জ্ঞানী তাহার এইরূপ বিচার করাই উচিত। যে জ্ঞানী সে আত্মসুখের কথা মাত্র ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে যেসমস্ত ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব ব্যক্তিরা সংসার-চক্রের গতির সাহায্য না করে তাহাদের জীবনই বৃথা।

গোপী। তৎপরে কৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন 'মূর্খেরা সকামচিত্তে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঐরূপে নিষ্কামচিত্তে কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা মূর্খদের হৃদয়ে বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, অর্থাৎ কখনও তাহাদের হৃদয়ে কর্ম্মের উপর বিদ্বেষ বা সন্দেহ উদ্রিক্ত করিবেন না।'

বিনোদ। তবে কি কৃষ্ণের মতে মূর্খদিগকে জ্ঞান প্রদান করাও নিষিদ্ধ?

গোপী। হাঁ নিষিদ্ধ। স্বামী টিকা স্থলে বলিতেছেন, 'তেষাং বুদ্ধি বিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তে জ্ঞানস্য চানুৎপত্তে স্তেষাং উভয়-ভ্রংশং স্যাৎ'। অর্থাৎ যদি তুমি অজ্ঞানীর মনে জ্ঞানোদ্রেক করিতে চাও, তাহার জ্ঞানলাভত হইবেই না, কিন্তু তাহার কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ও বিদ্বেষ জন্মিবে। এইরূপে তাহার উভয় কূলই বিনষ্ট হইবে'।

বিনোদ। কেন?

গোপী। জ্ঞানলাভের জন্য যে কয়টী গুণের প্রয়োজন, (অর্থাৎ শান্তি, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি, স্বার্থত্যাগ, মহত্ত্ব, ঔদার্য্য, প্রভৃতি) তাহা অজ্ঞানীর নাই। এই কয়টি গুণ নাথাকিলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইবে না।

বিনোদ। যাঁহার এই কয়টি গুণ এক্ষণে নাই সে চেষ্টা করিয়া ঐ গুলি অর্জ্জন করিতে পারিবে না ইহার প্রমাণ কি?

গোপী। যাহার যেরূপ স্বভাব তাহাকে তদনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। গুরূপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা স্বভাবের ব্যতিক্রম বহুকাল সাপেক্ষ। বরং অন্য দিকে স্বভাব অনুসারে জ্ঞানের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ স্বভাব, সে তাহার জ্ঞানকেও নিজ স্বভাবের অনুযায়ী করিয়া ফেলে। ক্যালিব্যান প্রস্পেরোকে বলিয়াছিলেন—'তুমি আমাকে বিদ্যাদান করিয়াছ। ইহাদ্বারা আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি তোমাকে মনের সাধে পণ্ডিতের ন্যায় সাধুভাষায় গালাগালি দিতে পারি।' ফরাশিশ রাজবিদ্রোহের সময় প্রজারা সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃভাব এই তিন মহৎ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিল। কিন্তু ঐ জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাদের এই লাভ হইল যে তাহারা অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে পিশাচের ন্যায় অবলা কুলবধু ও অপোগণ্ড শিশুর প্রাণহত্যা করিয়া সভ্যতা ও স্বাধীনতা নামের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিল। এইরূপে দেখিতে পাইবে যে সহজেই স্বভাব অনুসারে জ্ঞানের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান অনুসারে স্বভাবের ব্যতিক্রম একেবারে অসম্ভব না হইলেও দুরূহ, বহুকাল সাপেক্ষ ও বহ্বায়াস সাধ্য। এস্থলে অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে তাহার নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। এইজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন—"যে অজ্ঞানী তাহার স্বভাবই এই যে সে সকামচিত্তে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকে ঐরূপেই কর্ম্ম করিতে দাও। তাহার বুদ্ধি বিচালন জন্মাইও না'।

বিনোদ। অর্থাৎ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যে যে পশু সে পশুই থাকুক তাহাকে মনুষ্য করিবার প্রয়োজন নাই?

গোপী। হাঁ প্রায় ঐ কথাই বটে। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে গাধা ঘোড়া হইবে না। গাধা গাধাই থাকুক। যদি উহাকে ঘোড়া করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে উহার গাধাত্বও নষ্ট হইবে এবং ঘোটকত্বও

[ল]াভ হইবে না। আজিকালি সাম্যের দিনে এই বৈষম্যের কেহ অনুমোদন করিবে না। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে বৈষম্যই স্বাভাবিক, সাম্য কবিকল্পনা মাত্র। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ পণ্ডিতে ও মূর্খে আরও কি কি প্রভেদ করিলেন শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিলেন 'আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ স্বভাববশে পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু যাহারা মূর্খ তাহারা অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আপনাদিগকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। আর যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্ম কর্ত্তা। তাঁহারা এইরূপ বুঝিয়া কর্ম্মে আসক্ত হইয়া পড়েন না।' অর্থাৎ পণ্ডিত ইন্দ্রিয়কে কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন। মূর্খ ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। পণ্ডিতে ও মূর্খে এই মাত্র প্রভেদ।

বিনোদ। মূর্খে ও পণ্ডিতে অনেক প্রভেদ। তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কৃষ্ণ আর কি বলিলেন তাহা বল।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—'জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাও নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। সকল প্রাণীরাই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। স্বভাবের প্রতিরোধ করা অসম্ভব। স্বভাবতঃ আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ কতকগুলি বিষয়ে অনুরক্ত ও কতকগুলি বিষয়ে বিরক্ত। ইন্দ্রিয় সকলের স্বাভাবিক গতির অবরোধ করা উচিত নয়। তবে ইন্দ্রিয়বশও হইবে না। যে ইন্দ্রিয়বশ সে মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না।'

বিনোদ! ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতি রোধ করিও না ও ইন্দ্রিয়ের বশও হইও না, এ দুইটি মতের সামঞ্জস্য কোথায়?

গোপী। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রাবল্য বশতঃ যে কার্য্যে তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সে কার্য্য তুমি কর। কিন্তু ইহাও তোমার বুঝা উচিত যে তুমি এই সমস্ত কার্য্য করিতেছ না, তোমার ইন্দ্রিয় সমস্তই তোমাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত তোমার ঐক্য সংস্থাপন করিও না। ইন্দ্রিয় হইতে অন্ততঃ মনে মনে তোমার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখ। এইরূপে প্রথমে ইন্দ্রিয় সমূহ তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে যতই তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হইবে ততই তুমি ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইবে। সেতুবন্ধন দ্বারা নদীর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিও না। নৌকা প্রস্তুত করিয়া নদীর সাহায্যে অভীপ্সিত পারে গমন কর। স্বভাবের সহিত কলহ না করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম-সাহায্যে স্বভাবের উপর আধিপত্য সংস্থাপন কর।

বিনোদ। তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গোপী। যখন প্রবলঝটিকা উত্থিত হইয়া নদী তরঙ্গাকুল হয়, তখন নাবিক কিরূপ আচরণ করে তাহা ভাবিয়া দেখ। নাবিক যদি স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে

সে তখনি জলমগ্ন হয়। এজন্য সে স্রোতের অভিমুখেই নৌকা প্রবাহিত করে। কিন্তু ঐ ঝটিকা মধ্যেও সে নিজ স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে না। স্রোতের অভিমুখে যাইয়াও নিজ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করে। এইরূপে সংসারী লোকেরা স্বাভাবিক গতির অনুসারে চলিয়াও নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবেন, পরে ঐ স্বাতন্ত্র্যের অল্পাধিক ব্যবহারে নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন— 'এই রূপে নিজ স্বভাব অনুসারে চলিয়া যদি নিধন প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও ভাল তথাপি অন্যের স্বভাব অনুকরণ করা অবিধেয়।'

বিনোদ। যদি অন্যের স্বভাব অনুকরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ঐ অনুকরণকে গর্হিত বলিবে কেন?

গোপী। এক জন অন্যের স্বভাব অনুকরণ করিতে অসমর্থ। কোন্ বাঙ্গালী ইংরাজের অনুকরণ করিতে পারিয়াছে? আর কোন্ ইংরাজেই বা বাঙ্গালীর অনুকরণ করিতে পারে? নিজ স্বভাব অনুসারে চলিলে যেখানে পাঁচবৎসর জীবন রক্ষা হইবে অন্যের স্বভাবের অনুকরণ করিলে সেখানে একবৎসরের মধ্যেই জীবন শেষ হইবে। আর সংসারের এমনই সুশৃঙ্খলা যে সকলে যদি যে যাহার স্বভাবের মতে চলিতে পায় তাহা হইলে কাহারও বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বিনোদ। কিন্তু কৃষ্ণের এই যুক্তির সহিত পাপপুণ্যের কি সম্বন্ধ? যদি পাপ করাই আমার স্বভাব হয়, তাহা হইলে কি আমি পাপই করিতে থাকিব?

গোপী। পাপ করা কাহারও স্বভাব হইতে পারে না। সে যাহা হউক অর্জ্জুন এতৎসম্বন্ধে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'হে বার্ষ্ণেয়! আমরা পাপ করি কেন? যদি স্বভাবই পাপের মূল হয় তাহা হইলে আবার পাপে অনিচ্ছা হয় কেন?' পাপপুণ্যের সহিত স্বভাবের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা কৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে বুঝাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন—'কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত পাপ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। (ঐ রজোগুণ ও সত্বগুণ উভয়ই এককালে মনুষ্য হৃদয়ে কার্য্য করে। রজোগুণ প্রবল হইলেও সত্বগুণ দুর্ব্বলভাবে হৃদয় মধ্যে অবস্থিতি করে। এজন্য পাপ করিতে করিতেও মনুষ্যের পুণ্যের দিকে কথঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকে।) প্রথমে রজোগুণ প্রবল ও সত্ত্বগুণ দুর্ব্বল থাকে, পরে কাল সহকারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হইলে সত্বগুণ প্রবল ও রজোগুণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অগ্নি প্রজ্বলিত করার সময় প্রথমে ধূমের প্রাবল্য ও অগ্নির দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হয়। পরে ধূমের দৌর্ব্বল্য ও অগ্নির প্রাবল্য সঞ্চারিত হয়। প্রথমে জরায়ু প্রবল ও জরায়ুজ সন্তান দুর্ব্বল থাকে। পরে সন্তানের বলাধান হইলে জরায়ুর বিনাশ ও সঙ্কুচন হয়। প্রথমে দর্পণ ধূলিরাশি দ্বারা আবৃত থাকে। পরে যত ধূলির হ্রাস হয় ততই দর্পণের আভা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই রূপে যদিও মনুষ্যের মনে প্রথমে পাপই প্রবল থাকে সত্য

থাপি কালসহকারে পাপের বিনাশ ও পুণ্যের আবির্ভাব হয়। ইহাই মনুষ্যের স্বভাব।' 'যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে করিতেও অল্পে অল্পে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে শিক্ষা করেন। প্রথমে ইন্দ্রিয়কে বশ করিতে হয়। ইন্দ্রিয়বশ হইলে পরে মনকে বশ করিতে হয়। মন স্বায়ত্ব হইলে বুদ্ধি ও বুদ্ধি স্বায়ত্ব হইলে আত্মাকে স্বায়ত্ব করিতে হয়। যিনি এই রূপে নিজ চেষ্টায় আত্মাকে বশ করিতে পারেন তিনিই কামকে বশ করিতে পারেন।' * শুদ্ধ সংসার-ত্যাগে ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হয় না।

বিনোদ। আজি অনেক কথা হইল। আজি এই খানেই ক্ষান্ত হও।

যোগী। তাই ভাল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীঃ—

* ইন্দ্রিয় = Senses

মন = Volitional part of mind.

বুদ্ধি = Consciousness or mind in general.

আত্মা = Self in Mind and body together.

আয়ুর্ব্বেদ।

(৪১৬ পৃষ্ঠার পর।)

ঋতুচর্য্যা।

আর্য্য পণ্ডিতগণ সংবৎসরকে ছয়ঋতুতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—হেমন্ত, শিশির বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ। তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত। মাঘ ও ফাল্গুণ শিশির। চৈত্র ও বৈশাখ, বসন্ত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম। শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। (১)

শিশির, বসন্ত, ও গ্রীষ্ম, এই ঋতুত্রয়-ব্যাপক কালকে উত্তরায়ণ বা আদান বলা যায়। এই কালে সূর্য্য উত্তরদিকে সরিয়া অয়ন (গমন) করেন, এবং অত্যন্ত তীব্র কিরণ দ্বারা পৃথিবীর জলীয়াংশ আদান (গ্রহণ) করিয়া থাকেন। এইকাল স্বভাবতঃ আগ্নেয়।

বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত, এই ঋতুত্রয়, ব্যা-

(১) তত্র মাঘাদয়ো দ্বাদশমাসাঃ দ্বিমাসিকমৃতুংকৃত্বা ষড়ৃতবোভন্তি। তে শিশির-বসন্ত গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরদ্ধেমন্তাঃ। তেষাংতপস্তপস্যৌশিশিরঃ। মধু মাধবৌ বসন্তঃ। শুচি শুক্রৌগ্রীষ্মঃ। নভোনভস্যৌবর্ষা। ইষর্জৌশরৎ। সহঃ সহস্যৌহেমন্তঃ। (সুশ্রুত)

পক কালকে দক্ষিণায়ণ বা বিসর্গ বলা-যায়। এইকালে সূর্য্য দক্ষিণদিকে সরিয়া অয়ন (গমন) করেন এবং বৃষ্টি ও শিশিরাদি বিসর্গ (বর্ষণ) দ্বারা পৃথিবী সমধিক শীতলা ও রসযুক্তা হয়। এই কাল স্বভাবতঃ সৌম্য (শীতল)। (২)

বিসর্গকালের আদি বর্ষা এবং আদান কালের অন্ত গ্রীষ্ম, এই ঋতুকালে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ হীনবল হইয়া থাকে। এবং বিসর্গকালের মধ্যবর্ত্তি শরৎ এবং আদানকালের মধ্যবর্ত্তি বসন্ত, এই দুই ঋতুকালে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ মধ্যবলযুক্ত হইয়া থাকে। এবং বিসর্গকালের অন্ত হেমন্ত ও আদানকালের প্রথম শিশির এই দুই ঋতু কালে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ উত্তমবলশালী হইয়া থাকে। (৩)

হেমন্ত চর্য্যা।

হেমন্তকালে শীতল বায়ু-সংস্পর্শে অভ্যন্তর সংরুদ্ধ জঠরাগ্নি অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং গুরুপাক দ্রব্য আহার কিংবা অধিক মাত্রায় আহার করিলেও তাহা অনায়াসে জীর্ণ হইয়া থাকে। উক্ত প্রদীপ্ত জঠরাগ্নি উপযুক্ত পচনীয় দ্রব্য না পাইলে শরীরস্থ জলীয় ধাতুকে শোষণ করিয়া থাকে, জলীয় ধাতুর শোষণ হেতু বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া নানাবিধ অসুখ উৎপাদন করে। অতএব হেমন্তকালে অধিক পরিমাণে স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ রস বিশিষ্ট দ্রব্য এবং ঔদক (কচ্ছপাদি) মাংস, অভ্যাসানুসারে আনূপ (বরাহাদি) মাংস, বিলেশয় (শজারু প্রভৃতি) মাংস, প্রসহ (শ্যেণ, কোরাল প্রভৃতি পক্ষী) মাংস এবং নূতন অন্ন ভক্ষণ ও মদ্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, বসা, তৈল ও উষ্ণজল পান করা কর্ত্তব্য।

এইকালে গাত্রে তৈল মর্দ্দন ও ঔষধচূর্ণ দ্বারা গাত্রমর্জন, রৌদ্র সেবা, সুসংবৃত ও উষ্ণ গৃহে বাস, এবং শাল, বনাত, কম্বল প্রভৃতি রোমজাত গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র এবং তসর, গরদ প্রভৃতি কৌষেয় বস্ত্র যথা যোগ্য পরিধানে, অঙ্গাবরণে শয়নে ও আসনে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এইকালে লঘু ও বায়ুবর্দ্ধক অন্ন ও পান, অল্প আহার, উদমন্থ (দ্রব দ্রব্য দ্বারা আলোড়িত থৈ প্রভৃতির চূর্ণ) উত্তর ও পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। (৪)

(২) ইহখলুষড়ঙ্গ মৃতুবিভাগেন বিদ্যাৎ। তদাদিত্যস্যোদ্গমন মাদানঞ্চ ত্রীনৃতূন্ শিশিরাদীন্ গ্রীষ্মান্তান্ ব্যবস্যেৎ। বর্ষাদীন্ পুনর্হেমন্তান্ দক্ষিণায়নং বিসর্গঞ্চ। * * * বিসর্গঃ সৌম্যঃ আদানং পুনরাগ্নেয়ং তত্র রবির্ভাভিরাদদানোজগতঃ স্নেহং * * * বর্ষাশরদ্ধেমন্তেষুতু দক্ষিণাভিমুখেঽর্কে কালমার্গে সলিল প্রশান্ততাপে জগতীত্যাদি॥ (চরক)

(৩) আদাবন্তেচ দৌর্ব্বল্যং বিসর্গাদানয়োর্নৃণাং মধ্যে মধ্যবলং ত্বন্তে শ্রেষ্ঠমগ্রেচ নির্দ্দিশেৎ॥ (চরকঃ)

(৪) শীতে শীতানিলস্পর্শসংরুদ্ধো [illegible] বলিনাং বলী, পক্তাভবতি হেমন্তে মাত্রাদ্রব্য গুরুক্ষমঃ। সযদানেন্ধনং যুক্তং লভতে [illegible] হজং তদা, রসং হিনস্ত্যতো বায়ুঃ শীতঃ শীতে প্রকুপ্যতি। তস্মাত্তু [illegible]